বাংলার মন্দির

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

প্রণব রায়, এফ. এ. এস.

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৭ জানুয়ারী ১৯৯৯

প্রকাশক ঃ ইন্দুভূষণ অধিকারী
পূর্বাদ্রি প্রকাশনী
তমলুক, মেদিনীপুর

সোমনাথ ঘোষ

পরিবেশক ঃ পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণবিন্যাস ঃ ইম্প্রেশন
তমলুক, মেদিনীপুর

মুদ্রণ ঃ ইউরেকা
৯১/এ বৈঠকখানা রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

পূজ্যপাদ পিতৃদেব
পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ
ও
পূজনীয়া মাতা সুধা দেবী স্মরণে

বিষয়সূচি

পরিশিষ্ট

প্রথম সংস্করণের

মুখবন্ধ

প্রস্তুত গ্রন্থে বাংলার মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মন্দিরগুলি আজ খুবই অবহেলিত ও ধ্বংসের পথে। এগুলি রক্ষা করার তেমন কোন উদ্যোগ আজও নেওয়া হয়নি। তাই বহু মন্দির আজ উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে। অনেকগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। যুগ যুগ ধরে এগুলি নির্মিত হয়ে এসেছিল। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থানরূপে নয়, এগুলির মধ্যে স্থাপত্য ও অলংকরণের যে অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছিল, তা আজ অনেকের কাছে গবেষণার বিষয়। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলার মন্দির নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে বেশ কিছুকাল আগে থেকে। হিন্দু আমলের বা প্রাক-মুসলিম যুগের দেউল-দেবালয়ের সংখ্যা অবশ্য খুবই অল্প। ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে প্রাচীন বাংলার এই ধর্মীয় স্থাপত্যের কিছু কিছু নমুনাও উদ্ধার করা গেছে। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ থেকে যে মন্দির-দেবালয় নির্মিত হতে থাকে, তার সংখ্যা বেশ কয়েক হাজার। এই সময়ে স্থাপত্য ও অলঙ্করণশিল্পের ক্ষেত্রে একটিনতুন ধারার সৃষ্টি হয়। তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে সর্বভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য-ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রে বাংলার মন্দির এক স্বতন্ত্র পথের ইঙ্গিত দেয়। শুধু ভারতে নয়, সমগ্র পূর্বভারতেও এই মন্দিরশৈলী স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক।

গ্রন্থটির প্রথমভাগ 'পূর্বাদ্রি'র ১৯বর্ষ ২য় বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তার সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগে পশ্চিমবাংলার মন্দিরের এক সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। 'পূর্বাদ্রি'র সম্পাদক শ্রী ইন্দুভূষণ অধিকারী গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। পাঠকেরা গ্রন্থটি পাঠ করে সামান্যতম উপকৃত হলেও আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

মহালয়া

অক্টোবর, ১৯৯৮ — প্রণব রায়

প্রথম ভাগ ঃ তত্ত্বমুখ

১

বাঙালি-সত্তার বিকাশ ও মন্দিরস্থাপত্যের আঞ্চলিক রীতি

লার ধর্মীয় স্থাপত্য নিয়ে আলোচনার আগে অখণ্ড বাংলা দেশ ও বাঙালিসত্তার উদ্ভব প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে যে বাঙালিচরিত্র গড়ে ওঠে, তার ফলে সে সৃষ্টি করে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। তার জীবনচর্যা, ধ্যানধারণা থেকে জন্ম নেয় সাহিত্য, শিল্প, দর্শন। এক স্বতন্ত্র সত্তায় সে আত্মপ্রকাশ করে। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পারিপার্শ্ব এসবের উৎসমূলে থাকলেও রাজনৈতিক প্রভাবও তার সৃষ্টিকর্মে বহুলাংশে ইন্ধন জুগিয়েছে।

সমগ্র ভারতেব অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে এই দেশ একসময় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল। এখনও তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি এবং তা সম্ভবও নয়। কিন্তু এক বিশেষ পরিবেশ - পরিমণ্ডল, জলবায়ু, মাটি, নদনদী এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল স্বতন্ত্র সত্তার। সেই সত্তাকে বিকশিত কবে তুলতে তাব নিজস্ব ভাষার জন্ম হয়েছে। অবিরত মননের মধ্য দিয়ে সে সৃষ্টি করেছে তার সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন। এই স্বতন্ত্র সত্তার বিকাশ ঘটেছে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের মধ্যেই।

ভারতেব পূর্বভাগে অবস্থিত বর্তমান বাংলা বা বাংলাদেশ প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, সুহ্ম, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত — এইসব প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজ্য বা জনপদগুলিই পরবর্তী কালে এক অখণ্ড বাংলা বা বাংলাদেশ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন যুগে ঐ সব জনপদের সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে বহুবার। প্রাচীন বঙ্গ জনপদের ভূভাগ মোটামুটিভাবে গঠিত ছিল বর্তমান বাংলাদেশেব ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে, যদিও নানা সময়ে এর পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক বাংলা বা বাংলাদেশ প্রাচীনকালে চারটি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল --- বরেন্দ্রী, সুহ্ম (বা রাঢ়া), বঙ্গ ও কামরূপ। 'গৌড় বলতে সাধাবণত রাঢ় - বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম বাংলা আর বঙ্গ শব্দে বঙ্গ-কামরূপ অর্থাৎ দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরপূর্ব বাংলা বোঝাত। (সেন, সুকুমার ঃ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ১৯৭২ পৃ. ৮)। প্রাগার্য বিভিন্ন জাতি অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গল এখানকার অধিবাসী ছিল। এদের ছিল নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। মৌর্যবিজয়ের পর থেকে (আ. খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) এই অঞ্চলে আর্যীকরণ শুরু হয় এবং তা চলে আঃ ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তার আগে এখানে 'আর্যভাষার এবং আনুষঙ্গিক উত্তর ভারতের গাঙ্গ উপত্যকার সভ্যতার বিকাশ ঘটে নাই' বলে কারও কারও অভিমত[১]। এই সময়ের মধ্যে এখানকার অধিবাসীরা ধীরে ধীরে নিজেদের ভাষা ও আচার - ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। উত্তর ভারতের আর্যসভ্যতা ও ভাষার ক্ষেত্রে মাগধী প্রাকৃতের প্রভাবে দেশজ অধিবাসীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুনভাবে বিকশিত হতে থাকে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের 'আর্যীকরণ' বলতে প্রাচীন বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদের প্রচার ও প্রসারই মুখ্যত অভীপ্সিত। ঐ মতবাদগুলির আলোকে এখানকার বাসিন্দাদের জীবন আলোকিত করার চেষ্টা চলে এই সময়ে। জৈন 'আয়ারঙ্গ সুত্তে' অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, এই কাজ করতে এসে জৈন প্রচারকদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। রাস্তাঘাট-বিহীন জাঙ্গল ভূভাগে জৈন সন্তদের পিছনে

কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। হয়তো এই গোটা অঞ্চলের মানুষেরা এরূপ ছিল না। জৈন সাধুপ্রচারকেরা মগধের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার উত্তরপশ্চিমে বর্তমান পুরুলিয়ায় প্রবেশ করেন এবং আদি বাসিন্দাদের তাদের মতে এনে অহিংস করে তোলার চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টা খারাপ ছিল না। তবুও প্রথমদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা বহিরাগত জৈন প্রচারকদের বিরোধিতাই করেছিল। কিন্তু কালক্রমে তারা ধীরে ধীরে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণে এক আমূল পরিবর্তন আনে। সংস্কৃতজ মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাষার মিশ্রণে এক নতুন ভাষা জন্ম নেয়। অবশ্য, এই পরিবর্তন ঘটেছিল দীর্ঘকাল ধরে। জীবনযাত্রার ধরণধারণ ও ভাষার পরিবর্তনের সাথে 'উত্তরভারতীয় মিশ্র আর্য'দের সঙ্গে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের মিশ্রণে যে জাতির উদ্ভব হোল, তাদের বংশধর বর্তমান বাঙালি। এই সংমিশ্রণে তাদের মধ্যে দেখা গেল উন্নততর পর্যায়ের মানসিক পরিবর্তন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

'এইরূপে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য্য— এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল । উত্তর ভারতের গাঙ্গ সভ্যতাই যেন নবসৃষ্ট আর্য্যভাষী বাঙ্গালী জাতির জন্মনীড় হইল। রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙ্গালী মুখ্যত অনার্য্য ছিল। যেটুকু আর্য্যরক্ত বাঙ্গালী জাতির গঠনে আসিয়াছিল সেটুকু আবার উত্তর-ভারতেই অনার্য্যমিশ্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আর্য্যভাষার সঙ্গে সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি একটা নূতন মানসিক নীতি বা বিনয়-পরিপাটি,যাহাকে ইংরেজিতে discipline বলে, তাহা পাইল; বাঙ্গালীর অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য্য মনের ছাপ পড়িল। ইহা তাহার পক্ষে মঙ্গলের কারণই হইল। আর্য্যমনের-ব্রাহ্মণ্যের-এই ছাপটুকু, আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালীকে একটা চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল।' ('বাঙ্গালীর সংস্কৃতি',পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ পৃ. ৭-৮, ১৯৯০)

এই অঞ্চলে মৌর্যদের আধিপত্য বিস্তারের প্রথমদিকে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনে মৌর্য শাসনব্যবস্থা যে ভালো রকম কায়েম হয়েছিল, তা স্থানীয় শাসকের একটি লিখিত আদেশ থেকে জানা যায়। এই আদেশটি প্রাকৃত ভাষায় অশোকের সময়ের ব্রাহ্মীহরফে একটি লেখে খোদিত এবং আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ। লেখটি বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত মহাস্থানগড় (বগুড়া জেলা) থেকে পাওয়া গেছে। আদেশটি পুণ্ড্রনগরের 'মহামাত্র'কে দেওয়া হয় । কাজেই ঐ সময় বা তার আগে থেকে অশোকের স্তম্ভ অনুশাসনে ব্যবহৃত প্রাকৃতের চলন পুণ্ড্রবর্ধনে (বর্তমান উত্তরবঙ্গ) ছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্তসম্রাটদের আমলে সমগ্র বাংলাদেশ তাদের অধীনে আসে এবং সেসময় এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। নানা স্থানে বেশ কিছু মন্দিরাদি নির্মিত হয়, যার ধ্বংসাবশেষ ঐ সব স্থানে পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক দিক থেকে গুপ্তসম্রাটদের সুশাসনে বর্তমানের অখণ্ড বাংলা ভালোভাবেই শাসিত হয়েছিল। তার প্রমাণ, এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া কয়েকটি শিলালেখ ও তাম্রশাসন। এই লেখ ও শাসনগুলিতে গুপ্তরাজাদের সময়ে বাংলাদেশ যে নানা বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত ছিল, তা জানা যায় এবং এই সব বিভাগ ও উপবিভাগের শাসনকর্তার কিছু কিছু নাম ও উপাধিও জানা যায় । 'লেখ' ও 'শাসন' সবই সংস্কৃতে রচিত । কাজেই সংস্কৃত যে তখন রাজভাষা ছিল,তাতে কোন সন্দেহ নেই । গুপ্ত-বংশীয় রাজগণ-কোন সময় পাটলিপুত্র ও কখনও বা উত্তরবঙ্গ (পুণ্ড্রবর্ধন) থেকে শাসনকার্য সম্পন্ন করতেন। মাগধী প্রাকৃত ছিল পূর্বাঞ্চলের কথ্যভাষা।

গুপ্তশাসনের অবসানে শশাঙ্কের সময়েও (খ্রি. সপ্তম শতকের প্রথম পাদ) বাংলায় তাঁর সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ণসুবর্ণে তাঁর রাজধানী ছিল। শশাঙ্কের রাজ্যসীমা দক্ষিণপশ্চিমে দণ্ডভুক্তি (বর্তমান মেদিনীপুর ও ওড়িশার বালেশ্বর)পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মেদিনীপুর অঞ্চল থেকে তাঁর আমলের তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এগুলি থেকে জানতে পারা যায়, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও গ্রামমুখ্যের মাধ্যমে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হোত। তাম্রশাসনে বহু গ্রাম, কোন কোন 'বিষয়' (জেলা) এবং 'অধিকরণের' নাম পাওয়া যায়। ভুক্তিপতি, বিষয়পতি ও স্থানীয় শাসনকর্তাদের নাম ও উপাধিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা অনেকেই স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন। আবার, কখনও বা রাজধানী থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিক বা শাসনকর্তাকে নিযুক্ত করা হত। ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনুরক্ত পরমশৈব শশাঙ্কের সময়ে গৌড়বঙ্গে যে আর্যব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা অনুমেয়।

তাম্রলিপ্ত সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দর ও বৌদ্ধধর্মকেন্দ্র তাম্রলিপ্ত অন্তত খ্রি. অষ্টম শতকে পালরাজত্ব শুরু হওয়া পর্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই তাম্রলিপ্তে বহু হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধ বিহার যে ছিল, চীনা পরিব্রাজক ফা-সিয়েন ও সুয়াঙ সাঙ (হিউয়েন সাঙ)-এর বিবরণী থেকে তা পরিস্ফুট। সেকালে সুহ্মদেশের রাজধানী যে তাম্রলিপ্ত বা 'দামলিপ্ত' ছিল, তা খ্রি. সপ্তম শতকের লেখক কবি দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' থেকে জানা যায়। উত্তর চব্বিশ পরগণার চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসস্তূপ প্রাচীন 'গাঙ্গে' নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার মহাস্থানগড়ের ধ্বংসস্তূপকে কেউ কেউ প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করেন। এছাড়া আরও অনেক ধ্বংসস্তূপ বা ধ্বংসাবশেষ আছে যেমন, মঙ্গলকোটে (বর্ধমান) এবং মহানাদে (হুগলি) যেগুলি প্রাচীন কোন সমৃদ্ধ নগরীর অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়।

এগুলি থেকে প্রাচীন বাংলার খণ্ড খণ্ড চিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। কিন্তু একটি অখণ্ড বাংলা বা একটি সামগ্রিক বাঙালিসত্তা তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। এমনকি, তার ভাষাও পূর্ণরূপ লাভ করেনি। পালবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বে বেশ কিছুকাল ধরে চলেছিল রাজনীতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের প্রধমার্ধে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্রভূমিতে পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও অন্য ধর্মমতে উদারহৃদয় পালসম্রাটরা এক নবযুগের সূচনা করলেন। তাঁদের রাজত্বকালে বাংলাভাষা তার নিজস্বরূপ নিতে শুরু করে। মাগধী প্রাকৃত ও বাংলায় প্রচলিত অপভ্রংশ— উভয়ের সংমিশ্রণে এক নতুন দেশীয় ভাষার উদ্ভব হোল আনুমানিক দশম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। বর্তমান বাংলাভাষার এটিই হোল আদিরূপ। রচিত হল বৌদ্ধ গুরুদের দ্বারা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য— চর্যাপদ। পরবর্তীকালে চর্যাপদের এই ভাষা যাকে 'সন্ধাভাষা' বলা হয়, আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এবং এই ভাষায় রচিত হল উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য। পালসম্রাটরা বাঙালি ছিলেন, এটা অনেকের ধারণা। তাঁদের সুশাসনে বাংলায় পূর্ববর্তী অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দূর হোল। পুণ্ড্রবর্ধনে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সম্রাট রামপালদেবের সময়ে গৌড়ের 'রামাবতী'তে রাজধানী নতুন করে তৈরি করা হয়। পাল-বংশের প্রথম রাজা গোপালদেবের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী দেদ্দদেবীর বিবাহ হয় এবং তার ফলে গোপালদেব গৌড়সিংহাসন লাভ করেন। গোপালদেবের পুত্র বিখ্যাত ধর্মপালদেব তাঁর রাজ্যসীমা বহুদূর বিস্তৃত করেন এবং পাহাড়পুরে (রাজশাহি জেলা) প্রসিদ্ধ সোমপুর মহাবিহার স্থাপন করেন। পরবর্তী প্রসিদ্ধ সম্রাট মহীপালও (৯৭৭ খ্রি. - ১০২৭ খ্রি.) ছিলেন বিরাট যোদ্ধা। রামপালদেব গৌড়ে রামাবতী নামে যে রাজধানী স্থাপন করেন, তা ছিল গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী স্থান।

পাল-বংশের পর সেনরাজবংশের রাজধানী এরই কাছাকাছি ছিল গঙ্গা ও মহানন্দার মধ্যবর্তী স্থান। পরে তা 'লক্ষ্মণাবতী' নামে পরিচিত হয় শেষ সেনরাজা লক্ষ্মণসেনের নামে। মুসলমানবিজয়ের পর এরই কাছাকাছি গৌড় নগরী ও বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাল-বংশের দীর্ঘশাসনে বাঙালি এক পৃথক জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার আপন ভাষায় চর্যাপদের মতো সাহিত্যসম্পদ সৃষ্ট হওয়া ছাড়াও স্থাপত্যশিল্পে এক নতুন যুগের উদ্ভব হয়। গুপ্তযুগে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্প সমৃদ্ধ হয়েছিল, পালযুগে তা সমৃদ্ধতর হয় ও এক নতুন শৈলী জন্মলাভ করে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এই শৈলীকে আমরা 'পূর্বী ধারা' বা 'ইস্টার্ন স্কুল' নামে অভিহিত করতে পারি। বিটপাল, ধীমানের মতো শিল্পী তাঁদের অসংখ্য মূর্তিভাস্কর্যে এই নতুন শিল্পরীতিকে অমর করে রেখেছেন। টেরাকোটা-শিল্পেরও এক নতুন ধারা গড়ে ওঠে। পাহাড়পুর-মন্দিরের (আ. খ্রি. নবম শতক) ধ্বংসাবশেষ থেকে যেসব 'টেরাকোটা'- ফলক পাওয়া গেছে, সেগুলি বৃহদায়তন এবং এগুলির কারুকার্যে স্বাচ্ছন্দ্য, পরিচ্ছন্নতা ও সজীবতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেযুগের সামাজিক চিত্রও এখানকার অনেক টেরাকোটা-ফলকে প্রতিফলিত। প্রস্তরমূর্তিগুলির মধ্যে গুপ্তযুগের মতো দেহসৌষ্ঠব ও ভাবপ্রকাশের প্রাধান্য থাকলেও অলঙ্করণের দৈন্য নেই। তবে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে সেন-আমলের মূর্তির মতো অলঙ্করণ ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় না। গুপ্তযুগে 'দালান' মন্দির থেকে এবং 'দালানের' ওপর 'শিখর' স্থাপন করে যে 'নাগর' -শৈলীর মন্দিরস্থাপত্যের উদ্ভব হয় এবং উত্তর ও মধ্য ভারতে এবং ওড়িশায় বিস্তার ও উৎকর্ষ লাভ করে , পালযুগে পূর্বভারতের মগধে তার এক নিজস্ব ধারার উন্মেষ ঘটে। ইঁটের মন্দিরগুলিতেই ঐ রূপটি বিশেষভাবে ধরা পড়েছিল। বাংলায় এইরূপ অনেক মন্দির নির্মিত হয়— ইঁট ও পাথর এই দুই উপাদানেই। সেন-যুগে ঐ একই স্থাপত্য-শৈলী অব্যাহত থাকে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন বাংলায় মন্দিরস্থাপত্যের এই 'শিখর' রীতিকে 'পাল-সেন রীতি' নামেই অভিহিত করা যায়। এই সব নয়নাভিরাম মন্দিরগুলি বন্ধুবর্মার 'মান্দাসোর শিলালেখে' উল্লিখিত দশহর নগরের 'কৈলাসতুঙ্গ-শিখরের' মতো ছিল। পরবর্তী আলোচনায় তা পরিস্ফুট হবে। মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ স্থাপত্যালঙ্কারের অপরূপ সৌন্দর্য (বিশেষ করে, ইঁটের মন্দিরে), রেখাবিন্যাস ও স্বতঃস্ফূর্ত 'অঙ্গশিখর', 'ভূমি আমলক' এবং 'রিলিফে' উৎকীর্ণ অন্যান্য নকশা বা অল্পস্বল্প মূর্তি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালেখে উল্লিখিত আছে, প্রাচীন বাংলা-মন্দিরগুলির শিখর ছিল খুবই উচ্চ, তাদের শিরোভাগে থাকত স্বর্ণকলস, এরা যেন সূর্যের গতিকে বাধা দিত। মন্দিরগুলি ছিল যেন পৃথিবীর ভূষণ বা অলঙ্কার।[২] এই ধরনের মন্দির যা প্রাসাদের একটি শৈলী, সেটি 'পুণ্ড্রবর্ধনক' নামে 'সমরাঙ্গণসূত্রধার' নামক শিল্পশাস্ত্রগ্রন্থে স্বীকৃত হয়।[৩] প্রাসাদ ছিল 'হল'-ঘরযুক্ত অট্টালিকা এবং এর ছাদের চারদিকে থাকত শিখর।[৪] এরূপ মন্দির ছিল হরির প্রিয়। 'সমরাঙ্গণসূত্রধার' গ্রন্থের বিবরণী থেকে পুণ্ড্রবর্ধনে বা পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তিতে এইরূপ অনেক মন্দির যে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর একটি নিজস্ব শৈলীর সৃষ্টি হয় যা 'পুণ্ড্রবর্ধনক' নামে পরিচিত হয়। সুয়াঙ সাঙের (হিউয়েন সাঙ) বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সেইসময়ে (খ্রি. সপ্তম শতকের প্রথম পাদ) তিনি সারা বাংলা ভ্রমণ করে তিনশরও বেশি মন্দির লক্ষ্য করেছিলেন।[৫] তিনি ভিতরগাঁও-এর (কানপুর জেলা, মন্দিরটি এখনও বর্তমান ও অক্ষত) ইঁটের 'শিখর'-মন্দিরটিও দর্শন করেন। বিশাল মহাবোধি মন্দিরও তিনি দেখেন। পালযুগে অতলায়তন সরোবর বা দীঘি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চ 'শিখর'-মন্দিরও অধিক সংখ্যায় নির্মিত হ'ত।[৬] সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে'

শোণিতপুরের (দেবীকোট, বাণগড়) ঐশ্বর্যবর্ণনার মধ্যে বলা হয়েছে, এখানকার বহু মন্দির ভক্ত-উপাসকদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত এবং দীঘিগুলো প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে পূর্ণ ছিল।[৭] 'রামচরিতে' 'রামাবতী' নগরীর বর্ণনায় তাকে 'সুরেশ্বরপুরী' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৮] অর্থাৎ নগরীটি ছিল 'মন্দিরপুরী' এবং এখানে সারিবদ্ধ প্রাসাদ ছিল। গৌড়ে রামাবতী ছিল পালরাজবংশের শেষ রাজধানী।

পাল-সেন যুগে বাংলায় আঞ্চলিক 'শিখর'-স্থাপত্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু এই আঞ্চলিক 'শিখর'-স্থাপত্য ছাড়া উত্তর ভারতীয় 'নাগর'-শৈলীর ওড়িশা রাজ্যে বিবর্তিত 'রেখ'-দেউল নামে পরিচিত মন্দিরস্থাপত্যও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় একই সময়ে প্রচলিত হয়। কোন কোন শিলালেখে (হোলাল থেকে প্রাপ্ত) 'নাগর', 'দ্রাবিড়' এবং 'বেসর'-শৈলীর সঙ্গে 'কালিঙ্গ' এর উল্লেখ আছে।[৯] ওড়িশী রীতির মন্দিরগুলিকে এই শৈলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু শিল্পশাস্ত্র 'মানসার' গ্রন্থে 'কালিঙ্গ' হোল এক প্রকার সৌধ, পরন্তু কখনই একটি পৃথক শৈলী নয়, একথা বলা হয়েছে। অতএব 'কালিঙ্গ' যে শুধু 'নাগর'-শৈলীর অন্তর্ভুক্ত, তা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। যেহেতু, উক্ত শৈলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও এই রীতি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এবং কলিঙ্গের স্থপতিদের হাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং ওড়িশার বিখ্যাত মন্দিরগুলি ঐ রীতিতে তৈরি হয়েছিল, তাই পৃথক মর্যাদায় ভূষিত করার জন্য শিল্পশাস্ত্র ও শিলালেখে একে 'কালিঙ্গ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রীতির শুধুমাত্র 'রেখ'-দেউল (জগমোহন-বর্জিত) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় বেশ কিছু নির্মিত হয়েছিল প্রাক-মুসলিম যুগে, যার কোন কোন নিদর্শন এখনও লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী আলোচনায় তা জানা যাবে। তাই পাল-সেন যুগে আঞ্চলিব 'শিখর'-স্থাপত্যের সঙ্গে আঞ্চলিক ওড়িশী 'রেখ'- স্থাপত্য দুটিই পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। এর পেছনে রাজনীতিক একটি কারণ হল, পাল ও সেনবংশীয় সম্রাটরা উত্তর, পূর্ব, কামরূপ (প্রাগজ্যোতিষ) ও মধ্য বঙ্গে এবং মগধ, এমনকি, বারাণসী পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করলেও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ওড়িশার গঙ্গ-বংশীয়দের শাসন অব্যাহত ছিল। গঙ্গরাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ খ্রি. একাদশ শতকের শেষভাগে ত্রিবেণী (হুগলি) পর্যন্ত তাঁর রাজ্যবিস্তার করেন। অবশ্য, মুসলমান-বিজয়ের পর ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণদিকে কিছু অংশ হাত ছাড়া হয়ে যায়। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গঙ্গরাজাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ওড়িশী সংস্কৃতির প্রসার ও ওড়িশী শৈলীর বহু মন্দির ঐ অঞ্চলে নির্মিত হয়। এর মধ্যে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের 'ভৌমকর'রাও কিছুকাল মেদিনীপুর অঞ্চলে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তা জানা যায়, কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত একটি খণ্ডিত শিলালেখ থেকে। ভৌমকরদের রাজধানী ছিল খিচিং-এ। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার মাধবপুরে প্রাপ্ত এই খণ্ডিত শিলালেখটি আঠার সারির এবং এতে 'ভৌমকর' অব্দাঙ্ক ৩৬৮ উৎকীর্ণ বলে অনুমান করা যায়, যা ১১০৪ খ্রিস্টাব্দের সমাঙ্ক। শিলালেখের অক্ষরের ছাঁদ বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রপট্ট (আ. ১১৫৯ - ১১৭৯) এবং লক্ষ্মণসেনের (আ. ১১৭৯ - ১২০৬) আনুলিয়া তাম্রপট্টলেখের অক্ষরের সদৃশ। আবিষ্কৃত শিলালেখটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, 'সুবর্ণ' নামে এক নির্মাণদক্ষ ব্যক্তি শিবমন্দিরের ওপর একটি 'শিখর' নির্মাণ করেন। 'রাঢ়াশ্রী' বিশেষণযুক্ত অর্থাৎ 'রাঢ়ের গৌরব' এক ভক্তিমতী মহিলা 'সহাস্য' অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে মন্দিরটি শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। সেই শিবলিঙ্গটি ছিল 'বঙ্গের অলঙ্কার'। খণ্ডিত এই লিপি থেকে একটি শিবমন্দিরে 'শিখর' যোগ করার ('যদ্‌বিমানীকৃতং শিবমন্দিরম্‌') কথা জানা যায়। অতএব

ঐসময় মেদিনীপুরের ঐ স্থানে মাধবপুর বা তৎসন্নিহিত স্থানে বা নিকটবর্তী অন্য কোন স্থানে 'শিখর'-দেউল নির্মাণের কথা আমরা জানতে পারি।[১০] লেখের হরফ 'প্রায়-বঙ্গাক্ষর'। কিন্তু কথায় ও অঙ্কে ৩৬৮ বা 'অষ্টাষষ্ঠ্যধিকত্রিশতবৎসরপ্রগতে' থাকায় এটি 'ভৌমকর' অব্দ বলে অনুমান। এই অব্দের প্রচলন হয় ৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে। আলোচ্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১১০৪ খ্রিস্টাব্দ। তখন বাংলায় রামপালদেবের শাসন অপ্রতিহত। গৌড়ের 'রামাবতী'তে তাঁর রাজধানী। সেন-বংশের শাসন তখনও বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

উপরি আলোচিত 'শিখর' বা 'রেখ'-স্থাপত্য শৈলীর সঙ্গে অপর যে শৈলীর স্থাপত্য প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে, তা ছিল 'পিঢ়' বা 'ভদ্র' রীতির। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের ছাদ ওপরে ক্রমহ্রস্বায়মান 'পিঢ়া' বা 'থাক' যুক্ত হয়ে শীর্ষদেশে মিলিত হোত। কিন্তু সমকালীন সাহিত্যে বা শিলালেখে 'শিখর'-শৈলীর মন্দিরের উচ্চ প্রশংসা করা হলেও 'পিঢ়' রীতির মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই শৈলীর মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শনও তেমন পাওয়া যায় না। তবুও বহু মূর্তিভাস্কর্যে এর আদর্শ প্রতিরূপ উৎকীর্ণ থাকায় (এই বিষয় পরে আলোচ্য) এই শৈলীর মন্দিরের অস্তিত্ব অনুমান করা কঠিন নয়। তবে এই পিঢ়-রীতির মন্দিরসম্পর্কে সরসীকুমার সরস্বতী বলেছেন ঃ বাংলার পিঢ় - মন্দিরগুলির 'পিঢ়া' বা 'থাক' ওড়িশার পিঢ়ের তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, প্রতিটি 'পিঢ়া' এক একটি তল বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া এগুলিতে 'রথ'-বিন্যাসও আছে। প্রাচীন বাংলার 'পিঢ়'-দেউলগুলি যে 'রথ' যুক্ত ছিল, তা বোঝা যায় (Temples of Bengal. J. I.S.O.A., Vol II, 1934, P. 132) ।

পালযুগে আলোচ্য এই স্থাপত্যরীতির আঞ্চলিক রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অখণ্ড ভারতের অংশরূপে এই অঞ্চলে এইসময় বাঙালি জাতির উদ্ভব এবং এই সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষা মাগধী অপভ্রংশে সাহিত্যরচনার সূচনা হলেও সংস্কৃত গুপ্তযুগের মতো উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের ভাষা ছিল। পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতিধর প্রভৃতি যেসব কবি ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে, তাঁরা সকলে সংস্কৃতেই তাঁদের সাহিত্য রচনা করেন। সেই সব কাব্য ও রচনা কালের গণ্ডী পেরিয়ে আজও সমাদৃত। সেসময়ের বাঙালির মাতৃভাষা সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা লাভ করেনি। সন্ধা-ভাষায় রচিত চর্যাগীতিগুলি উচ্চ বিদ্বৎসমাজেও বিশেষ সমাদর লাভ করতে পারে নি। অবশ্য, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' সংস্কৃতের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কিছুটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় বাংলায় সেন-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে হিন্দুযুগও শেষ হোল। মুসলমান-বিজয়ের ফলে বাংলায় এল এক নতুন যুগ । গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগের অবসান পর্যন্ত স্থাপত্যশিল্পে সর্বভারতীয় ঐতিহ্যেব যে এক ধ্রুপদী রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেও যা ছিল সমুজ্জ্বল, তার বিকাশ ও গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ল। সু-উচ্চ 'শিখর' ও অন্যান্য দেউলগুলি যা ছিল প্রাচীনবাংলার সম্পদ ও গৌরব, সুলতানী শাসনের প্রথম প্রায় দুশ বছরে সেগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সেই ধ্বংসাবশেষ দিয়ে মসজিদ, মাজার তৈরি করাই ছিল মূল লক্ষ্য। সুন্দর সুন্দর মূর্তিগুলি ভেঙে তার অবশিষ্ট অংশে ফারসী আরবী লিপিতে মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হল। বাংলার গৌড়, পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী এবং হুগলির পাণ্ডুয়ায় নির্মিত হ'তে থাকল বিশালায়তন মসজিদ ও কবরসৌধ। কিন্তু সে ইতিহাসে আসার আগে প্রাক-মুসলিম বাংলায় পূর্বোক্ত মন্দিরস্থাপত্যশৈলীর বিকাশধারার স্বরূপটি আমাদের জানা প্রয়োজন।

২
প্রাচীন মন্দিরস্থাপত্যের বিকাশধারা : প্রবাহ ও প্রকৃতি

বাংলায় মুসলমান-পূর্ব যুগে প্রাচীন মন্দিরস্থাপত্য-শৈলী সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা হলেও এই স্থাপত্য-শৈলীকে চারটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই চার প্রকার শৈলীর মন্দির আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে সুলতানী আমলের মধ্যেও খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত কমবেশি নির্মিত হতে থাকে। এগুলির মধ্যে প্রথমটি হোল ,'ইন্দো-আর্য ' বা উত্তরভারতীয় 'নাগর'-শৈলীর যে বিশুদ্ধ রূপটি আমরা ভুবনেশ্বরের আদি মন্দিরগুলিতে পাই, যেমন পরশুরামেশ্বর, স্বর্ণজালেশ্বর, বৈতাল প্রভৃতি মন্দিরে, যেগুলির সঙ্গে তৎসমসাময়িক আইহোলের হুচ্চপ্পাইয়া বা পত্তদাকলের জম্বুলিঙ্গ মন্দিরের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উক্ত দুটি মন্দিরই খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে নির্মিত। এই সময়ে গুপ্তযুগে উদ্‌ভাবিত উত্তরভারতীয় 'শিখর'-এর রূপটি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।[১১] খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে বর্তমান কানপুর জেলার ভিতরগাঁওয়ে ইঁটের মন্দিরটিতে প্রাচীনতম 'শিখরের' সম্পূর্ণ রূপটি আমরা পাই। খ্রিস্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠশতকে উত্তরভারতীয় 'নাগর'-শৈলীর মন্দিরের ওপরে ক্রমশ 'শিখরে'র ঈষৎ অবস্থান লক্ষ্য করা যেতে থাকে[১২] যা পরবর্তীকালে উত্তরভারতের নানাস্থানে বিকাশলাভ করে। ভুবনেশ্বরের পূর্বোক্ত খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকের মন্দিরগুলিতে 'শিখরে'র পূর্ণ রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। মূল মন্দিরের সামনে একটি 'মুখমণ্ডপ'ও যুক্ত হতে থাকে এই সময়ে। পশ্চিমবাংলার বরাকরের 'বেগুনিয়া'গোষ্ঠীর খর্বাকৃতি চতুর্থ মন্দিরটির সঙ্গে ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর-মন্দিরের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কেউ কেউ এটি ঐ সময়ের বলে মনে করেন! কিন্তু সম্ভবত এটি আরও পরবর্তীকালের বলে কারও কারও ধারণা।[১৩]

ওড়িশায় বিকশিত 'নাগর'-শৈলীর আদি মন্দিরগুলি পরবর্তীকালের ওড়িশার মন্দিরের (বিশেষ করে ভুবনেশ্বর ও পুরীতে) তুলনায় অনেকটা সাদামাটা। পূর্বোক্ত বরাকরের চতুর্থ মন্দিরটিতে যেন তার ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু ঐ মন্দিরটির কাছেই আর তিনটি 'শিখর'-মন্দির, যেগুলি খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে নির্মিত হয়, সেগুলি চতুর্থটির তুলনায় অনেক উচ্চ এবং আকার ও ভঙ্গীতেও কিছুটা পৃথক। ওড়িশার 'নাগর'-শৈলীর মন্দিরের ময়ূরভঞ্জের খিচিং-এ 'মুখমণ্ডপ' বা 'জগমোহন' বর্জিত এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জরাজাদের রাজধানী ছিল খিচিং-এ। এখানে খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত যে অল্প কয়েকটি মন্দির আজও বর্তমান, সেগুলি লক্ষ্য করলে মুখমণ্ডপ-বিবর্জিত 'শিখর'-দেউলের যে সৌন্দর্য, তা উপলব্ধি করা যায়। এই রীতির দেউল দক্ষিণবাংলার জেলায়, বিশেষ করে বাঁকুড়া ও বর্ধমানে লক্ষ্য করা গেছে যেমন, বরাকরের 'বেগুনিয়ার' মন্দিরগুলিতে, একথা কেউ কেউ মনে করেন এবং এগুলি পালযুগে আ. খ্রি. নবম-দশম শতকে নির্মিত বলে তাঁদের ধারণা।[১৪] কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্ত, তা প্রমাণিত হয় 'বেগুনিয়া'-গোষ্ঠীর পূর্বোক্ত তিনটি মন্দিরের একটিতে যে লিপি আছে তা থেকে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ বলে জানা যায়। এই তিনটি মন্দিরের সঙ্গে খিচিং-এর মন্দিরগুলির (একাদশ-দ্বাদশ খ্রিস্টীয় শতক) অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার তেলকূপিতেও (সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত'-এ তৈলকম্পা নামে উল্লিখিত) এ ধরনের কিছু কিছু মন্দির নির্মিত হয়েছিল (যেগুলি আজ দামোদরপাঞ্চেৎ-বাঁধের জলে নিমজ্জিত)। এই মন্দিরও 'মুখমণ্ডপ'-বর্জিত

ছিল। শুধুমাত্র এককক্ষযুক্ত গর্ভগৃহে বিগ্রহের অধিষ্ঠান ছিল।[১৫] এইরূপ 'শিখর'-মন্দিরে শুধুমাত্র গর্ভগৃহছাড়া আর অন্য কোন কক্ষ লক্ষ্য করা যায় না, কদাচিৎ কোন কোনটিতে সামনে নামমাত্র 'মুখমণ্ডপে'র অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ-প্রসঙ্গে মন্দির-সমালোচক পার্সি ব্রাউন বলেছেন যে, 'কিন্তু (এর মধ্যে) বাঁকুড়ার বহুলাড়ায় দশম শতকের সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরটি অলঙ্করণপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধ। এই ধরনের অসংখ্য মন্দির দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় এবং বিহারের মানভূম জেলায় (বর্তমান পুরুলিয়া জেলা) দেখা যায়। এগুলি মোটামুটিভাবে পালরাজাদের শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল। অতএব এদের সময়কাল অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে।[১৬]

কিন্তু পার্সি ব্রাউনের উপরি উক্ত মন্তব্য স্বীকার করা যায় না। প্রথমত, বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরকে পূর্বোক্ত খিচিং-শৈলীর সঙ্গে একীভূত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ইঁটের ওপর খোদিত অলংকরণে ভূষিত এই মন্দিরটি মণ্ডপ-বর্জিত হলেও এর শৈলী পূর্বোক্ত খিচিং-শৈলীর থেকে পৃথক। পরবর্তী আলোচনায় তা পরিস্ফুট হবে। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের মন্দির দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় অসংখ্য ('যেগুলি অষ্টম থেকে একাদশ শতকের') একথাও ঠিক নয়। কারণ, বাঁকুড়ার সোনাতপল (ভগ্ন সূর্যমন্দির), বর্ধমানের সাতদেউলিয়া,পুরুলিয়ার বড়াম, তেলকূপির নিমজ্জিত মন্দির,পাড়া, ছররা প্রভৃতি স্থান এবং দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার জটার মন্দিরগুলি ছাড়া এই ধরনের মন্দির পাওয়া যায় না। মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের কোন মন্দির লক্ষ্য করা যায় না। পক্ষান্তরে, খ্রিস্টীয় নবম থেকে একাদশ শতকের কোন মন্দির পূর্বোক্তগুলি ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও পুরুলিয়ায় আর আছে কিনা সন্দেহ। মেদিনীপুর জেলায় প্রাক-মুসলিম যুগের বলে অনুমিত দুএকটি মন্দির, যেমন,জিনশহরের পাথরের ভগ্ন ও জীর্ণ দেবালয় এবং ডাইনটিকরির পাথরের 'পিঢ়'-রীতির ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে পূর্বোক্তগুলির অপেক্ষা পৃথক। ইঁটের একটি উচ্চ 'শিখর' দেউল এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সেটি অজয়নদতীরবর্তী বর্ধমান জেলার গৌরাঙ্গপুরের 'ইছাই ঘোষের দেউল' নামে পরিচিত। কিন্তু মন্দিরটি আরও পরবর্তীকালের। আনুমানিক খ্রি. ষোড়শ শতকে নির্মিত। পূর্বোক্ত আলোচ্য মন্দিরস্থাপত্যশৈলীর দ্বিতীয় ধারাটি হোল, পাল-সেন শাসনাধিকাবে বিহার ও বাংলায় 'নাগর' শিখর শৈলীর একটি স্বতন্ত্র রূপ। এর সঙ্গে পূর্বোক্ত ওড়িশী-রীতির পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইঁটের মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে এই পার্থক্য আরও স্পষ্ট। এই রীতির মন্দিরে চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপরিভাগে যে 'শিখর' নির্মিত হয়েছিল তার গাত্রদেশে 'রিলিফে' খোদিত ভাস্কর্যেব মধ্যে হরতনের আকারে 'চৈত্য' বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। মূর্তির বাহুল্য তেমন ছিল না, শুধুমাত্র 'কৃত্তিমুখ' বা পুরুষসিংহমূর্তি কোন মুখ। এছাড়া, হংসলতা,অলঙ্কৃত বাঁকানো রেখা, ঘট, পল্লবশীর্ষ ঘট, লতাপাতা, বিশেষ ধরনের ফুলও লক্ষ্য করা যায়। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর দেউল বা বর্ধমানের সাতদেউলিয়ার মন্দিরগাত্রে এরূপ দেখা যায়। অলংকরণ ও খোদাইকাজগুলি খুবই প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত। নীচের চতুষ্কোণ 'গর্ভগৃহ' ('বাঢ়') ও তার ওপরের 'শিখরে'র (গণ্ডী) বিভাগ সুস্পষ্ট।একমাত্র প্রবেশপথ অনেকক্ষেত্রে ত্রিভুজাকৃতি, যেমন, বড়াম (পুরুলিয়া)[১], সোনাতপল (বাঁকুড়া) এবং সাতদেউলিয়া(বর্ধমান)। মন্দিরের নিচের অংশের চেয়ে 'শিখরে'র ভাস্কর্য-অলঙ্করণ অধিকতর পরিস্ফুট। বড়ামের মন্দিরের 'শিখর'-গাত্রের সম্মুখে 'রিলিফে' খোদিত 'অঙ্গশিখর'-টি যেন ঐ মন্দিরেরই প্রতিচ্ছবি। এর শীর্ষে 'বেকি', 'আমলক', 'কলস' চিহ্নিত রয়েছে দেখা যায়। কিন্তু আসল 'শিখর'টির অগ্রভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে। বহুলাড়ার 'শিখর'-মন্দিরটির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। সাতদেউলিয়ার 'শিখর'-মন্দিরের 'শীর্ষ' ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলেও তা অনেকটা

ক্ষয়ে গেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার 'জটা'র দেউলে কয়েকবার সংস্কারের চিহ্ন থাকলেও এটিও প্রাক্-মুসলিমযুগের পূর্বোক্ত দেউলগুলির ন্যায় একটি স্বতন্ত্রগোষ্ঠীভুক্ত। আয়তন, আকার, অলংকরণ এবং উচ্চতার ক্ষেত্রে পূর্বকথিত ওড়িশী স্থাপত্যশৈলীর মন্দিরের সঙ্গে এই গোষ্ঠীভুক্ত মন্দিরগুলির একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। এ প্রসঙ্গে, 'ওড়িশী'-শৈলীর অনুসরণে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার আরও কয়েকটি মন্দিরের নাম (যেগুলির প্রায় সবই পাথরে তৈরি) উল্লেখ করা যায়, যেমন দেউলভিড়্যা, অম্বিকানগর(উপরিভাগ সম্পূর্ণ ভগ্ন), আটবাইচণ্ডী (ভগ্ন), ময়নাপুরের হাকন্দমন্দির এবং হাড়মাসরার মন্দির। শেষোক্তটি এখনও অক্ষত এবং ক্ষুদ্রাকৃতি। দেউলভিড়্যার মন্দিরে জৈন 'তীর্থঙ্কর' পার্শ্বনাথ ছিলেন জানা যায়। এতে ওড়িশী মন্দিরস্থাপত্যরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। দেউলভিড়্যার মন্দিরেও 'ওড়িশী' প্রভাব স্পষ্ট। এই মন্দিরগুলি সবই পাথরে তৈরি এবং আনুমানিক খ্রি. নবম-দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়ে থাকবে। আলোচ্য দ্বিতীয় ধারার পাল-সেন পর্বের মন্দিরগুলিকে উপরি উক্ত কারণে এগুলির সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলা যায় না। মন্দিরগুলি প্রায় সবই জৈনমন্দির ছিল বলে অনুমান করা যায়। এগুলির সন্নিহিত স্থানে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে অনেক জৈনমূর্তিও পাওয়া গেছে, যেগুলি স্বাভাবিকভাবেই উক্ত মন্দিরসমূহে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীকালে জৈনধর্মের প্রভাব কমে এলে ঐসব মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরমন্দিরও আদিতে জৈনমন্দির ছিল। এখান থেকে জৈনমূর্তিও পাওয়া গেছে এবং মন্দিরসংলগ্ন এলাকায় 'নিবেদনস্তূপ'ও লক্ষ্য করা গেছে। পুরুলিয়ার বড়াম ও বর্ধমানের সাতদেউলিয়ার মন্দিরদুটিও জৈনমন্দির ছিল মনে করা যায়।

প্রাক্-মুসলিমযুগের উপরি উক্ত দেউলগুলি তাই সবই ওড়িশী মন্দিরস্থাপত্যরীতির ছিল, একথা মনে করা ভুল হবে। পক্ষান্তরে,পাল-সেন রাজাদের আনুকূল্যে পূর্বভারতে 'নাগর'-শৈলীর মন্দিরস্থাপত্যের এক 'পূর্বী রীতি'র উদ্ভব হয়েছিল। মন্দিরস্থাপত্যের এই ঐতিহ্য মগধ অঞ্চল থেকে উত্তরপূর্বে প্রসারিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িশী প্রভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই কারণে ডেভিড ম্যাককাচ্চন বলেছেন, 'এইগুলিকে (পূর্বোক্ত পাল-সেন) আকর্ষণীয় ওড়িশী স্থাপত্যের অনুসারী বলা প্রথাগত হয়ে দাঁড়ালেও বাংলার এই প্রাক্-মুসলিম 'রেখ' দেউলগুলি মগধের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য-পরম্পরায় এসেছে। কারণ, প্রাচীনকালে এই দুটি রাজ্যই একই সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।'[১৯] ব্রাউনের মতেও 'ইস্টার্ন স্কুল' বা 'পূর্বী রীতি'র স্থাপত্য-ভাস্কর্য বাংলায় পাল-সেন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্ভূত হয় এবং সংলগ্ন অঞ্চলের শিল্পকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। এই শিল্পরীতিপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায় মুসলমান-আক্রমণের পর থেকে[২০] অর্থাৎ খ্রি. ত্রয়োদশ শতব থেকে। কিন্তু মুসলমানবিজয়ের পরও দূরবর্তী স্থানে দেউল মন্দির নির্মাণ চলেছিল বিক্ষিপ্তভাবে। যেমন, আনুমানিক চতুর্দশ শতকে নির্মিত বাঁকুড়ার ডিহরে সারেশ্বর ও শৈলেশ্বরের মন্দির। এই দুই মন্দিরের 'শিখর'- অংশের বেশিব ভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে (শুধু নিচের গর্ভগৃহটি বর্তমান)।

পাল-সেন আমলে, বিশেষভাবে, সেন-শাসনাধিকারে এই আঞ্চলিক 'পূর্বী রীতি'র শিখর -দেউল যে নেহাৎ কম ছিল না, তার অজস্র প্রমাণ পূর্বোক্ত মন্দিরগুলি ছাড়াও পাওয়া গেছে হুগলি জেলার ত্রিবেণী ও পাণ্ডুয়ায় এবং (মালদহের) গৌড়ের লক্ষ্মণাবতীতে। এই ধরনের বেশ কিছু মন্দির ও প্রাসাদ-সৌধ ছিল, যেগুলি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয় এবং মসজিদ-মাজারের নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। গৌড়ের লক্ষ্মণাবতীতে সুবিশাল প্রাসাদ ও মন্দিরাদি ভেঙে ফেলে সেগুলি দিয়ে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার রাজধানী এবং বিশালাকার আদিনা মসজিদ

নির্মাণ করা হয়।[২১] এই ভাবে পাণ্ডুয়ার 'আদিনা মসজিদ'-টি সম্পূর্ণ হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও লক্ষ্মণাবতীতে সেন-রাজাদের প্রাসাদের ভগ্ন অংশ থেকে নির্মিত হয়েছিল। (নির্মাণকাল ৭৭০ হিজিরা বা ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দ) এই মসজিদে যে তিনশটি কারুকার্যযুক্ত স্তম্ভ বর্তমান, সেগুলি সবই পাওয়া যায় হিন্দু সৌধ থেকে। তাছাড়া, 'বাদশাহ-কা-তখ্‌ত' এর প্রবেশদ্বার পথটিও কোন হিন্দুসৌধের বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। এ বিষয়ে পার্সি ব্রাউন বলেছেন : '..... the Adina Mosque presents a certain grave and stately dignity .... None of the stone work is original, it was all stripped from pre-existing Hindu structures at Lakhnauti and places in its immediate neighbourhood. It is very doutful whether the Mosl em overlords ever obtained any of their stone from the natural sources of the Rajmahal quarries, all their masonry being evidently composed of ready-made spoils. Proofs of this may be seen in many parts of the Adina mosque, of carved blocks being inserted with their figure-surfaces embedded in the interior of the walls. as in the nimbar of the sanctuary; of whole door-ways being placed wherever required as in the entrance to the Badshah-Ka-Takht, and there is good reason to believe that all the three hundred pillars have been appropriated from Hindu structures. Many temples and places appear to have been dismantled to provide the amount of stone required and it is not improbable that the finest monuments of the Hindu capital of Lakhnauti were demolished in order to produce this one Mohammedan mosque.'[২২]

পাল-সেন আমলে তৈরি কিছু কিছু উচ্চ 'শিখর'দেউল-মন্দির হুগলি ও বর্ধমান জেলায় ছিল বলে জানা যায়। মুসলমানবিজয়ের পর বিশেষভাবে হুগলির কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে পাণ্ডুয়ায় (হুগলি) সূর্য ও নারায়ণের মন্দিরদুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরদুটির ধ্বংসাবশেষ দিয়ে পাণ্ডুয়ার 'বাইশ দরওয়াজা' মসজিদ ও পার্শ্ববর্তী পঞ্চতলযুক্ত বিজয়স্তম্ভটি তৈরি হয়। 'বাইশ দরওয়াজা' মসজিদের ভেতর কালো বেসল্ট পাথরে নির্মিত ও সুন্দর খোদাই কাজ যুক্ত যে বহু থাম লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি সূর্যমন্দিরেরই অংশ এবং ঐ স্থানেই মসজিদটি নির্মিত হয়। বর্তমানে ভগ্ন ঐ মসজিদটি খুবই বিশাল আকারে সেসময় নির্মাণ করা হয়। মসজিদটি সম্পর্কে পার্সি ব্রাউন অনুমান করেন, যদি এটি চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়েরও আগে তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে এই বাইশগম্বুজ মসজিদটি পূর্বোক্ত বিশালায়তন প্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদের আদর্শস্থানীয় ছিল। কারণ, আদিনা মসজিদটি তৈরি হয় ১৩৬৪ খ্রীঃ থেকে ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সিকন্দর শাহের সময়।[২৩] অবশ্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মসজিদটি নির্মিত হয় হিজিরা ৭৭০ বা ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে। (দ্র. 'মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ')। নারায়ণ মন্দিরটির স্থানে যে বিজয়স্তম্ভ (মিনার) নির্মিত হয়, সেটি সম্ভবত মুসলিম সন্ত শাহ্ সুরি-উদ্দীনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। তিনি সে-সময় পাণ্ডুয়ার রাজাকে পরাজিত করে এই স্মারক বিজয়স্তম্ভটি স্থাপন করেন। ঐ স্তম্ভ বা মিনারের প্রবেশপথের ইঁটের দেওয়ালের একস্থানে প্রায়-বঙ্গাক্ষরে(প্রোটো-বেঙ্গলি) খোদিত একসারি লিপি উল্টো করে বসানো আছে দেখা যায়। সম্ভবত সেটি কোন হিন্দুমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শাহ্ সুরি-উদ্দীন বা শাহ্ সুফীর প্রসিদ্ধ মাজার নিকটেই অবস্থিত। একগম্বুজযুক্ত কতকটা 'চারচালা'-রীতির এই 'আস্তানা'র প্রাঙ্গণে কালো বেসল্ট পাথরে খোদিত তিনটি আরবি লিপি

লক্ষ্য করা যায়। বড় শিলালিপির পেছনদিকে মস্তকবিহীন ভগ্ন একটি সূর্যমূর্তি বর্তমান। সারথি অরুণ সূর্যের সাতটি অশ্বকে বল্‌গা আকর্ষণ করে সংযত করেছেন। রথে সূর্যদেব দণ্ডায়মান। তাঁর দুপাশে দুই পার্শ্বদেবতা এবং নিচে বৈতালিক। সূর্যের দুই পদযুগলে হাঁটু পর্যন্ত জুতো পরা দেখা যায়। মূর্তিটির অলঙ্করণ লক্ষ্য করে এটি নিশ্চিতরূপে সেন-আমলের মনে করা যায়। মূর্তিটি নিশ্চয়ই পূর্বোক্ত ধ্বংস -প্রাপ্ত সূর্যমন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল। আরও যে দুটি ক্ষুদ্র শিলালিপি-খন্ড আছে তারও পিছনদিকে দেবদেবী মূর্তি যে ছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই 'আস্তানা'র পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসায় ও আস্তানার প্রবেশপথে বেসল্ট পাথরের সুন্দর থাম লক্ষ্য করা যায়। এগুলি সবই হিন্দুমন্দিরের অংশ, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে উক্ত দুটি মন্দিরকে রুকনুদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৫-১৪৭৪ খ্রি.) পুত্র শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) সময়ে যথাক্রমে মসজিদ ও মিনারে রূপান্তরিত করা হয়।[২৪]

পাণ্ডুয়ার আরও দক্ষিণে ভাগীরথী-তীরবর্তী ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজীর যে কবরটি আছে সেখানেও বিধ্বস্ত প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের 'রিলিফে' খোদিত বহু বিষ্ণুনারায়ণ মূর্তি উল্টো করে কবরের ইঁটের দেওয়ালে বসানো আছে। এছাড়া আরও অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেওয়ালে স্থাপিত। তাছাড়া, প্রায়-বঙ্গাক্ষরে খোদিত 'সীতাবিবাহঃ' প্রভৃতি মূর্তিভাস্কর্যের পরিচয়জ্ঞাপক ফলকও বসানো আছে। এই কবরের পাশে একটি মসজিদে যে আরবি লিপিফলক পাওয়া যায়, তার পাঠোদ্ধার থেকে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দ প্রতিষ্ঠাকাল বলে জানা যায়। মসজিদটি যদিও অত পুরানো নয় বা পরবর্তী বহুবার সংস্কারের চিহ্ন এতে আছে, তবুও এই সময়ের আগে এই স্থান যে মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়। জাফর খাঁ গাজী সম্ভবত এই অঞ্চল জয় করেন। বিজয়ী মুসলমান শাসকদের দ্বারা হিন্দুমন্দির ধ্বংসকর্ম অন্তত খ্রি. পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত চলে। খ্রি. ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের মধ্যে হুগলি, বর্ধমান ও অন্যান্য স্থানের বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। সুন্দর সুন্দর দেব-দেবীমূর্তিগুলি ভগ্ন করে নদী বা দীঘিতে নিঃক্ষিপ্ত করা হয়। পাল-সেন পর্বের যে মন্দির-স্থাপত্যরীতি পূর্ব ভারতে বিকশিত হয়েছিল, তার গতি স্তব্ধ হয়ে যায় মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে। বস্তুতপক্ষে, মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে পাল-সেন আমলের 'শিখর'-মন্দিরনির্মাণ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বর্ধমানে যে কটি ঐ শৈলীর মন্দির টিকে রইল, সেগুলিও ছিল সেসময়ে পরিত্যক্ত জৈন মন্দির। তাই হয়তো সেগুলি কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে গেল। সেগুলি আমাদের কাছে সেযুগের শিখর-মন্দিরশৈলীর মূল্যবান দৃষ্টান্ত হয়ে বেঁচে রইল। পরবর্তীকালে ঐ মন্দিরগুলিতে কোন কোন হিন্দুদেবদেবীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত হয়েছিল। অপরপক্ষে, দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষ করে, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ওড়িশী স্থাপত্য-শৈলীর মন্দির বেশি সংখ্যায় নির্মিত হতে থাকল। এই দিকে ওড়িশার গঙ্গ-বংশীয় রাজাদের খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে যে প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়, তা অন্তত ওড়িশায় পাঠান-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বজায় থাকে। মুসলমান-আক্রমণের হাত থেকে সেকারণে এই অঞ্চলের অনেক মন্দির রক্ষা পেয়ে যায়।

ওপরের আলোচনায় এটা বোঝা যায়,বাংলায় সুলতানী শাসনকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সব থেকে বেশি বিশেষ করে, সু-উচ্চ 'শিখর'-মন্দিরগুলি। এই ধরনের উচ্চ মন্দির-নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয় এবং যেগুলি ছিল, সেগুলিও ধ্বংস করা হয়। (দ্রষ্টব্য, 'মুসলমান মসাজেদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী, ফাল্গুন ১৩১২)

তার ফলে, প্রাক্-মুসলিম যুগের এইরূপ মন্দিরের ঐতিহ্য পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্যোত্তর যুগে নতুন রীতির মন্দিরগুলিতে আর অনুসৃত হয় নি। সেইজন্য সেনযুগের ঐতিহ্য একেবারে হারিয়ে গেল। নতুন রীতির মন্দির সম্পর্কে পূর্বে কিছুটা আলোচনা করা হলেও এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। পরবর্তীকালে খ্রি. পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মন্দিরশিল্পে যে নতুন ধারার উদ্ভব হল, সে এক অন্য ইতিহাস।

মন্দিরশৈলীর আলোচ্য পূর্বোক্ত চারটি ধারার মধ্যে তৃতীয় ধারাটি হল হিন্দুবৌদ্ধ, যেগুলির নিদর্শন প্রাচীন বিহারগুলির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিহিত। এই মন্দিরগুলির স্থাপত্যশৈলী-সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা করা কঠিন। বর্তমান বাংলাদেশের (রাজশাহি জেলা) পালসম্রাট ধর্মপালদেবের প্রতিষ্ঠিত 'সোমপুরবিহার' নামক মহাবিহারে মন্দিরপ্রাচীর ও মন্দির-দেওয়ালে পোড়ামাটির বহু মূর্তিফলক পাওয়া গেছে। এখানে একটি বিশালায়তন প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এটি 'শিখর'-শীর্ষ ভদ্র-রীতিব ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। (দ্রষ্টব্য ঃ পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকলা: সরসীকুমার সরস্বতী, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩৩৯)। বিহারটি বিখ্যাত পালসম্রাট ধর্মপাল- কর্তৃক খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের শেষ দিকে নির্মিত হয়। এই মহাবিহারটি ছাড়া বাংলাদেশের মহাস্থানগড় (বগুড়া) রংপুরের বিরাটে পাহাড়পুর মন্দিরের সদৃশ একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও ময়নামতীব (কুমিল্লা) বিহারের ধ্বংসাবশেষও উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবাংলার কর্ণসুবর্ণে 'রক্তমৃত্তিকা' বিহার ছিল। এখানকার 'রাজবাড়িডাঙ্গা'য় একটি পঞ্চায়তন মন্দিরেরও চিহ্ন পাওয়া গেছে। এটি আনুমানিক গুপ্ত বা তার কিছু পরবর্তী কালের বলে অনুমান। ('পঞ্চায়তন' বলতে মূল মন্দিরের চারকোণে চারটি মূলমন্দিরেব তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মন্দির একই পীঠিকায় স্থাপন করা হত।) কেন্দ্রের প্রধান মন্দিরটি ছিল 'ত্রিরথ'। 'রাজবাড়িডাঙ্গা'র এই 'পঞ্চায়তন' মন্দিরগৃহ (টেম্পল কমপ্লেক্স) গঠিত হয়েছিল এইভাবে। ১. (একটি প্রশস্ত চত্বরের চারদিকে) আয়তক্ষেত্রাকার বহিঃপ্রাচীর ২. চাবকোণে চারটি বর্গক্ষেত্রাকার মন্দির ৩. প্রধান (কেন্দ্রীয়) মন্দিরটি ছিল 'ত্রিরথ' ৪. উত্তরদিকে ছিল একটি আয়তক্ষেত্রাকার মণ্ডপ, সুরকির দ্বারা গঠিত একটি মঞ্চ প্রভৃতি। চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীরের পশ্চিমদিকের দৈর্ঘ্য ২০ ৮৭ মি. এবং এর দক্ষিণ দিকের সামনে পীঠিকায় কয়েকটি 'অভিক্ষেপ', এদিকে আছে কয়েকটি সুন্দব কুলুঙ্গি।

আয়তক্ষেত্রাকার প্রধান মন্দিরেব আয়তন ৭ ৮৪ x ৭ মি.। এর উত্তরদিকে প্রবেশপথ বাদ দিয়ে তিন দিকের দেওয়ালে 'রথ'-বিন্যাস থাকায় এটি 'ত্রিরথ'-শ্রেণীর ছিল। প্রধান মন্দিরটির ভেতরের আয়তন ৪ ৪১ x ৩·৪ মিটার, মেঝে সুরখিতে গঠিত হ'য়ে ইঁটবিছিয়ে উঁচু করা হয়েছিল। প্রধান মন্দিরটির উত্তরদিকে আয়তক্ষেত্রাকার মণ্ডপটি, যার আয়তন ৬ ০৯ x ৪ ৫৭ মিটার, পরবর্তী সময়ে নির্মিত হয়। এই মন্দিরের দক্ষিণদিকে অপর একটি লম্বাকার আয়ত (অবলং) মন্দিরগৃহ ছিল। তার মধ্যে ছিল দেওয়াল, মঞ্চ এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবেশপথমঞ্চ। এগুলি ছিল একটি আয়তক্ষেত্রাকার ভিত্তির উপর। চব্বিশ পরগণার বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়ে একটি বিশাল-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও লক্ষ্য করা গেছে। মন্দিরটির 'গর্ভগৃহ' ছিল বড়ো এবং বর্গক্ষেত্রাকার। এর তিন দিকের দেওয়াল ছিল উদ্গত বা ত্রিরথযুক্ত এবং চারপাশ প্রদক্ষিণপথযুক্ত। সম্মুখে সংলগ্ন একটি আবৃত আয়তক্ষেত্রাকার অন্তরাল ('ভেস্টিবিউল') ও তৎসম্মুখে একটি আয়তক্ষেত্রাকাব উন্মুক্ত 'মণ্ডপ'-এ ওঠার জন্য ছিল সোপানশ্রেণী প্রভৃতি।[২৫] এই ধরনেব মন্দির গুপ্তযুগের গোড়ার দিকের মন্দির-স্থাপত্যে বহুল প্রচলিত ছিল। বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পূর্ব দিনাজপুর জেলার বৈগ্রামে

যে প্রাচীন একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল, সেটি জনৈক শিবনন্দীর প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ-স্বামীর মন্দির বলে সনাক্ত করা গেছে। ১২৮ গুপ্তাব্দে লিখিত একটি তাম্রপট্টে (খ্রি.৪৪৭-৪৪৮) একথা জানা যায়। এর বর্গক্ষেত্রাকার গর্ভগৃহের চারপাশে বেষ্টিত ছিল একটি প্রদক্ষিণপথ। এর চারদিকে ছিল দেওয়াল। পশ্চিমদিকে ছিল এর একমাত্র প্রবেশদ্বার। ভূমি-নকশা থেকে এটা স্পষ্ট। গুপ্তযুগের আদি মন্দিরগুলির একটি বিশেষ শৈলী, যা ছিল সমতল ছাদযুক্ত এবং চারদিকে একটি প্রশস্ত লম্বা প্রদক্ষিণপথযুক্ত বহিঃকক্ষের দ্বারা আবৃত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে মন্দিরটির ছাদের গঠন সম্পর্কে জানা যায় না।[২৬]

বাংলার মন্দিরশিল্পধারার চতুর্থ বিভাগটি হোল, তার নিজস্ব রীতি— 'চালা'। এর উদ্ভব বহু প্রাচীনকালে হলেও শেষ-মধ্যযুগের বাংলায় এই 'চালা' নতুন ক'রে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলার গ্রামাঞ্চলের কাঠ, বাঁশ, খড়ের চাল দেওয়া 'মেটে' ঘর বা পাতার ঘর বা খড়ের ঘর বহু প্রাচীন কাল থেকেই সাধারণ মানুষের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই এই ধরনের লোকপ্রচলিত ও ব্যবহৃত আবাসগৃহ দেবমন্দিররূপেও স্বীকৃত হয়েছিল। একে কেউ কেউ 'লোকায়ত'বা 'লোক-স্থাপত্য' বা 'ফোক আর্কিটেকচার' বলে উল্লেখ করেছেন।[২৭] পার্সি ব্রাউনের মতে, বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের স্থাপত্যভাবনার 'দেশজ রূপ' ('ইণ্ডিজিনাস ফর্ম') এই সৌধ-শিল্প বা 'চালা'। এর ঢালু চাল, বাঁকানো কার্নিশ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এসেছে সুদীর্ঘকালের কাঠ, বাঁশ ও খড়ের 'চালা' থেকে। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের নয়, বাংলার সর্বাংশেই 'চালা'-কুটির সাধারণ মানুষের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তবে দক্ষিণবাংলায় এই 'চালা' ঘর বড়ো সুঠাম, সাবলীল ও প্রাণবন্ত, কার্নিশের বা ছাঁচার বক্র আকার নয়নাভিরাম— এরূপ আর অন্য কোথাও তেমন দেখা যায় না। তাই এদিকের 'চালা'-শৈলীর মন্দিরগুলির খুবই ঢালু চাল ও ধনুকের মতো বাঁকানো কার্নিশ (যাকে চলতি কথায় 'ছাঁচা' বলা হয়) এত স্বাভাবিক মনে হয়, অন্য কোথাও সেরূপ মনে হয় না। অন্যান্য জেলায় যেমন, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে চালার চাল কতকটা খাড়া হয়ে উপরে উঠে যায়। বিশেষ করে 'চারচালা'র ক্ষেত্রে। শুদ্ধভাষায় এটি 'গৌড়ীয় রীতি'র অন্তর্গত। পুরীর 'মার্কণ্ডেয় সরোবরে'র কাছে একটি সুদৃশ্য 'চারচালা'-রীতির মন্দির এই শৈলীর এক পরিচ্ছন্ন রূপ। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বহু স্থানে. যেমন, মেদিনীপুর. বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলিতে 'চালা'-শৈলীর অজস্র মন্দির আছে।

প্রাচীন বাংলায় বহুল প্রচলিত 'শিখর'-দেউলের পূর্বোক্ত নিদর্শনগুলি থেকে যেমন আমরা ঐ রীতির স্থাপত্যশৈলী সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা করতে পারি, সেরূপ 'চালা'-শৈলী সম্পর্কে করা যায় না। কারণ, এই স্থাপত্য-শৈলী বেশ প্রাচীন হলেও বাংলায় প্রাক-মুসলিম যুগের এর কোন নিদর্শন আমরা পাই না। কিন্তু প্রাচীনকালে এই শৈলীর মন্দির ভারতে অপরিচিত ছিল না। 'চালা'র এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত. তামিলনাড়ুর মামল্লপুরম-এ (মহাবলীপুরম) দ্রৌপদীর 'চারচালা'-শৈলীর 'রথ', যা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে 'পল্লব'রাজাদের আমলে নির্মিত। এছাড়া, সারনাথ থেকে পাওয়া শুঙ্গযুগের একটি স্তম্ভে 'রিলিফে' খোদিত 'দোচালা'-মন্দিরের প্রতিকৃতিও লক্ষ্য করা গেছে।[২৮] এর থেকে 'চালা'র প্রাচীনত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়।

কিন্তু সুলতানী আমলে নব-উদ্ভাবিত 'চালা'র মতো প্রাচীন বাংলায় 'ভদ্র' রীতির মন্দির যে জনপ্রিয় ছিল, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য মূর্তিভাস্কর্যে। এইসব মূর্তিকে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকৃতি 'পিঢ়' বা 'ভদ্র'-রীতির দেউলে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা গেছে। 'পিঢ়ে'র সর্বপ্রাচীন রূপটি

ঢাকার আশরফপুর ব্রোঞ্জ চৈত্যে লক্ষ্য করা যায়। এটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের। এর রূপটি হল, দুটি থামের ওপর ছাদ ক্রমহ্রস্বায়মান দুটি 'পিঢ়া' বা 'থাকের' সমষ্টি। সর্বশেষ থাকের ওপরে 'স্তূপিকা' ('ফিনিয়েল') ক্রমে এই ছাদের 'থাক' আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অলঙ্কৃত হয়। যেমন, দিনাজপুরের হিলি থেকে পাওয়া কল্যাণসুন্দরের মূর্তি যা বর্তমানে 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদে' অবস্থিত।[২৯] এতে তিনটি 'পিঢ়া' লক্ষ্য করা যায়। তার ওপরে একটি ক্ষুদ্র 'বেকি' (ঘাড়), ওপরে একটি গোলাকার পাথর (কিন্তু 'আমলক' নয়) এবং সকলের ওপরে 'মোচাকৃতি' 'স্তূপিকা' ('কনিক্যাল ফিনিয়েল')। এগুলির সব কটিরই একটিমাত্র প্রবেশপথ আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ধরনের প্রতিকৃতি মন্দিরগুলির সামনে তিনটি 'খিলান'-প্রবেশপথ ও ছাদে তিন, চার ও পাঁচটি করে 'পিঢ়া' স্থাপিত হ'তে থাকে। এর সকলের ওপরে স্থাপিত হয় 'আমলক' ও তার ওপরে 'কলশ', বৌদ্ধমন্দির হলে 'স্তূপ' শীর্ষদেশে থাকে। এই ধরনের কয়েকটি নিদর্শন হল, চব্বিশ পরগনার কুলদিয়ায় সূর্যমূর্তি, রাজশাহির (বাংলাদেশ) বড়িয়ায় সূর্যমূর্তি, ঢাকা বিক্রমপুরের রত্নসম্ভবমূর্তি, মধ্যপাড়া (ঢাকা) থেকে বুদ্ধমূর্তি, মন্দৈল (ঢাকা) থেকে দ্বারপ্রস্তরের কুলুঙ্গীতে খোদিত ঈশানের মূর্তি এবং কুমারপুর (ঢাকা) থেকে পাওয়া কোন স্থাপত্যের ভগ্ন অংশ যাতে পিঢ়-মন্দিরের 'পঞ্চরথ' বিন্যাস আছে। উল্লিখিত প্রায় সব মন্দির-প্রতিকৃতিতেই 'রথপগ' বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের মন্দির 'রথপগ'-বিন্যাস যুক্ত হয়েই নির্মিত হোত। কুমারপুর থেকে পাওয়া নিদর্শনটিতে দেখাযায় মন্দিরের ছাদ চারটি 'পিঢ়া'র সমষ্টি, 'বেকির' ওপর বৃহৎ 'আমলক'-শিলা বিসদৃশ আয়তনের। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরচত্বরে যে 'পিঢ়' বা 'ভদ্র'-রীতির 'নন্দীমণ্ডপ'-টি আছে, তার ছাদ ক্রম-হ্রস্বায়মান তিনটি থাকের সমষ্টি; চারটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের ওপর এটি অবস্থিত। এটির শীর্ষদেশে কোন 'আমলক'-শিলা বা কোন 'স্তূপিকা' নেই। তবুও এর থেকে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে, আমাদের প্রাচীন বাংলায় এই রীতির মন্দিরগুলির আকৃতি কীরূপ ছিল। ব্রহ্মদেশে (বার্মা) যে বহু 'থাক'-বিশিষ্ট 'প্যাথ্যাৎ' (সংস্কৃত 'প্রাসাদ') বা 'প্যাগোডা' লক্ষ্য করা যায় এবং নেপালেও এ ধরনের অনেক মন্দির দেখা যায়, তা প্রাচীন বাংলার এই 'ভদ্র'-রীতির দেউলগুলির অনুসরণে নির্মিত হয়েছিল, একথা কেউ কেউ মনে করেন। এ সম্পর্কে সরসীকুমার সরস্বতী বলেছেন ঃ "This lost temple-type of Bengal travelled further. In Siam. Cambodia, Campa, Java and Bali a series of temples closely approximates in general shape and outline, this pyramidal type. These temples or towers are simple sanctuaries which rise in storeys, each storey set back, so as to form the stepped pyramidal roof to be seen in the Bengali sculptures described above. These storeyed pyramids appear to be derived from the terraced roof of the ancient Bengali temples we have noticed before. The contact of Bengal with the Indonesian countries is a well known fact ....."(S.K. Saraswati. 'Temples of Bengal', Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol II,1934. pp 136 -140).

উপরি উক্ত প্রতিকৃতি দেউলগুলির ভূমি-নকশায় চতুষ্কোণ গর্ভগৃহটির প্রতিদিকের দেওয়ালে এক বা দুই 'রথ'-বিন্যাস থাকায় ক্রুশাকারের বা 'রেখে'র (Cruciform) সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও সর্বপ্রাচীন আশরফপুর ব্রোঞ্জ চৈত্যের 'পিঢ়া'য় এই বক্রাকার রেখা-বিন্যাস ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালের মন্দিরগুলিতে এই বক্ররেখা-বিন্যাস বা 'রথ'-বিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এটাও বাংলার খোড়ো চালের আদলে তৈরি বলে কারও কারও ধারণা। কেননা, সেকালে মাথার সঙ্গে ওপরে খড়ের চালকে বাঁশ ও দড়ি দিয়ে বহু ক্ষেত্রে এইভাবে বাঁধা হোত[৩০] প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে চালকে রক্ষা করার জন্য। 'পিঢ়া'য় 'রথ'-বিন্যাসগুলির সৃষ্টি সম্ভবত এই কারণেই হয়েছিল।

প্রাচীন বাংলার উপরি উক্ত মূর্তিগুলি ছাড়াও পাণ্ডুলিপিতে চিত্রিত কোন কোন মন্দিরের প্রতিকৃতি থেকে আমরা সেকালের স্থাপত্যশৈলী-সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপিতে কুমিল্লা জেলার (বাংলাদেশ) চম্পিতলার লোকনাথদেবের দণ্ডায়মান চিত্রটি রয়েছে একটি 'আটচালা' কুটিরে। পাণ্ডুলিপির অনুলিপি হয় নেপালে ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন বাংলায় আমাদের মন্দিরশৈলী কিরূপ ছিল। বাংলার গ্রামাঞ্চলে একালের মতো সেকালেও খোড়ো 'দোচালা', 'চারচালা', 'আটচালা' প্রভৃতি প্রচুর তৈরি করা হোত। একটি উচ্চ 'চারচালা' খোড়ো ঘরের নিচের চারপাশের দেওয়াল থেকে আরও চারটি চাল তৈরি ক'রে 'আটচালা'র সৃষ্টি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এর অনুকরণেই 'আটচালা' মন্দিরের সৃষ্টি।[৩১] প্রাচীনবাংলার এই ধরণের দুটি 'পিঢ়া'-বিশিষ্ট মন্দির পরবর্তীকালে 'আটচালা'য় রূপান্তরিত বলে কারও কারও অভিমত। এই দুটি 'পিঢ়া'র মধ্যে ওপরের 'পিঢ়া'টি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, এখনকার 'আটচালা'য় যেমনটি দেখা যায়।

সম্ভবত প্রাচীনবাংলায় এই 'পিঢ়' বা 'ভদ্র'-রীতির দেউল থেকেই শেষ-মধ্যযুগে আমাদের বাংলার 'চালা'-র পরিণত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। বাঁশ, কাঠ, খড় ও দড়ি দিয়ে যখন মাটির বা 'ছিটেবেড়া'র ঘরের ওপরের দুটি চাল বা চারটি চাল ছাওয়া হয়, তখন কাঠ,বাঁশ ও দড়ি দিয়ে চারচালা কাঠামো তৈরি করে নিচ থেকে প্রতিদিকের চালে এক একটি ক'রে 'থাক' বাঁধা হতে থাকে। প্রতি থাকের ওপরে ওপরে সব থাকগুলি বাঁধা হলে একেবারে শীর্ষস্থানে (Apex) 'মটকা' বাঁধা হয়। প্রায় সবক্ষেত্রেই 'থাক'গুলিকে তখন আর আলাদা করে চেনা যায় না। সব থাকগুলি সমষ্টিগতভাবে একটি চালের সৃষ্টি ক'রে। 'দোচালা' ঘর হলে সামনে ও পেছনে এই ধরনের বহু থাকযুক্ত দুটি 'চাল' এবং 'চারচালা' হলে চারদিকে এইরূপ চারটি 'চাল' হয়। 'আটচালা' ঘর হলে বহু ক্ষেত্রে মাটির দ্বিতল ঘর তৈরি করে ওপরের চারটি চাল তৈরি করে নিতে হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ওপরের কোন তল না করে একটি উচ্চ চারচালারই চারপাশ কৌশলে এমনভাবে কাটা হয়, যাতে ওপরে একটি ছোট চারচালের সৃষ্টি হয়। একে কাটা 'আটচালা' বলা হয়। বহু গ্রামে এই ধরনের কাটা 'আটচালা' লক্ষ্য করা গেছে। এইরূপ কাটাচালের 'আটচালা' পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে অনেক, যাকে 'বিষ্ণুপুরী আটচালা' বলা হয়।

প্রাচীন 'ভদ্র'-রীতির দেউলগুলি উপরিউক্ত চালের 'থাক'-গুলির সুস্পষ্ট নির্দেশক। কোন কোন ক্ষেত্রে, নিচের ও ওপরের থাকের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা রেখে একটি তলের সৃষ্টি করা হয় এবং সেই তলে কখনও কখনও মূর্তিও বসানো হয়। বর্তমানের টালির ছাওয়া চালে থাকগুলি স্পষ্ট থাকে বলে 'পিঢ়া'-দেউলগুলির সঙ্গে এর সাদৃশ্য স্পষ্ট। তাছাড়া, 'পিঢ়া'গুলির প্রান্তদেশের উদ্‌গত অংশ (অফসেট) টালিতেও দেখা যায়। তাই, এখনকার টালির ছাওয়া ঘরের সঙ্গে 'পিঢ়া'-দেউলের নিকট-সাদৃশ্য স্পষ্ট। প্রাচীনবাংলার 'পিঢ়া' বা 'ভদ্র'রীতির দেউলগুলি এই 'থাক'-বিশিষ্ট খড়ের বা পাতার ছাওয়া 'চালা' ঘরের আদলে তৈরি হয়েছিল, ওপরের আলোচনা থেকে এই ধারণা করা যেতে পারে। কারণ, সে সময়ে যেসব কুটির ছিল, তার চাল ঐরূপ 'থাক'-যুক্ত নিশ্চয়ই ছিল। যেমন, এখনও অনেক গ্রামের ঐরূপ থাকযুক্ত চাল আমরা লক্ষ্য করছি। ষোল-

সতেরো শতকে তৈরি এইরূপ 'থাক' যুক্ত বহু মন্দির আছে, বিশেষ ক'রে, মেদিনীপুর জেলায় এগুলি বেশি দেখা যায়। ওড়িশী স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব এগুলিতে পড়লেও বাংলার চালু খড়ের চালের আকার এতে ধরা পড়েছে। তাই এদের থাকগুলি খাড়া ও সোজা না হয়ে কতকটা ঢালু হয়েছে। যেমন, পঁচেটের কিশোবরায়ের 'জগমোহন' বা মালঞ্চের নন্দেশ্বরের 'জগমোহন'। সাঁকোয়ার (খড়্গপুর লোক্যাল) চন্দনেশ্বরের দেউলের 'পিঢ়া' কতকটা ঢালু হয়ে গেছে ঠিক 'চালা'র মতো। তবে নেড়াদেউলে (কেশপুর থানা) কামেশ্বরের 'জগমোহনে' চালার ছাপ বেশ স্পষ্ট।

প্রাক-মুসলিম যুগেব বলে অনুমিত একটি পিঢ়-দেউলের সন্ধান আমবা পেয়েছি।[৩২] মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থানাব ডাইনটিকরি গ্রামের তথাকথিত রঙ্কিণীদেবীর মন্দির। মন্দিরটি বহু কাল পরিত্যক্ত। রঙ্কিণী এই মন্দিরে পরে অধিষ্ঠিতা হলেও আদিতে এটি একটি জৈনমন্দির ছিল বলে অনুমান করা যায়। মন্দিরটি কাঁসাই নদী-তীববর্তী। মন্দির জীর্ণ হলেও এখনও মোটামুটি অক্ষত। তবে ছাদের সাতটি 'পিঢ়া' ভগ্ন ও খুবই জীর্ণ। মন্দিরের চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের চাবদিকেব দেওয়ালে 'রথ'-বিন্যাস লক্ষ্য করা যায। সম্ভবত ছাদের 'পিঢ়া'গুলিতেও 'রথ'-বিন্যাস ছিল। এখন আর বোঝা যায না। এটি প্রাচীন বাংলাব 'পিঢ়'-দেউলের একটি নিদর্শন। তবে এটিকে সম্পূর্ণ ওড়িশী প্রভাব বর্জিত বাংলার নিজস্ব 'পিঢ়' বা 'ভদ্র'-রীতির দেউল বলে মনে করা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত মূর্তিভাস্কর্যগুলিতে উৎকীর্ণ 'পিঢ়' দেউলগুলির স্বরূপ আলোচনা করে প্রাচীন বাংলায় এ ধরনের যে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়। কিন্তু মুসলমান-বিজয়ের পর সেগুলির প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে, বিশেষ করে হুগলি, বর্ধমান ও গৌড়ে। এই রীতির মন্দিব ঐ অঞ্চলে ছিল বলে অনুমান কবা যায।

'শিখর' ও 'পিঢ়'-রীতিব মন্দিরের পর আর একটি রীতির মন্দির সম্পর্কে জানা যায, কোন কোন প্রাচীন মূর্তিভাস্কর্য ও চিত্র থেকে। এটি 'ভদ্র' ও 'শিখর' পরস্পর যুক্ত করে নির্মাণ করা হত। এটিকে 'শিখর-ভদ্র' বলা চলে। এই রীতির মন্দিব প্রাচীন বাংলায় যে ছিল, তা নলিনীকান্ত ভট্টশালী কোন কোন মূর্তিভাস্কর্য থেকে আবিষ্কার করেন। একটি ভদ্ররীতির মন্দিবের ওপরে একটি 'রেখ' বা 'শিখর'-রীতির মন্দিরকে চূড়ারূপে মূর্তিভাস্কর্যে দেখানো হয়েছে। ফুসার (Foucher) তাঁর Iconographic Bouddhique গ্রন্থে লেখযুক্ত যে প্রতিকৃতি মন্দিরের চিত্র দিয়েছেন, তাতে আছে, পুণ্ড্রবর্ধনের ত্রিশরণবুদ্ধ ভট্টালক এরূপ একটি মন্দিরে অধিষ্ঠিত। এটিও প্রাক-মুসলিম বাংলাব মন্দিবের অন্যতম একটি নিদর্শন। আরও তিনটি মূর্তিভাস্কর্য --- অবপচন মঞ্জুশ্রী (বাংলার কোন এক স্থান থেকে পাওয়া যায়), দ্বিতীয়টি হল বুদ্ধের, যা ঢাকা জেলার মহাকালী থেকে পাওয়া গেছে এবং তৃতীয়টি খুলনা জেলার শিববাটি থেকে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি। ঐগুলিতেও ঐ একই ধরনের মন্দিরের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা গেছে। ডুরোসিল (Duroiselle) একসময় এই রীতির মন্দিরের উদ্ভব উত্তরভাবতীয় মন্দির থেকে বলে উল্লেখ করে পরে তা দক্ষিণভারতীয় মন্দিরের আদর্শে উদ্ভূত হয় বলে বলেন। কিন্তু বাংলায় পূর্বোক্ত মূর্তিগুলিতে এই রীতির মন্দিরের মূল আদর্শপ্রতিরূপ উৎকীর্ণ থাকায় বাংলাতেই এই রীতির উদ্ভব, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।[৩৩]

এই রীতির মন্দিরের কোন নিদর্শন আজ আর নেই। কিন্তু মূর্তিভাস্কর্য ও চিত্রে এর অবিকল প্রতিরূপ (Replica) এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, এই রীতির মন্দির সেসময় বাংলায় প্রচলিত ছিল। সরসীকুমার সরস্বতী এই রীতিকে 'শিখরশীর্ষভদ্র' বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া তাঁর মতে চার

শ্রেণীর মন্দির প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল ঃ ভদ্র বা পিঢ় দেউল, রেখ বা শিখর দেউল, স্তূপশীর্ষ পিঢ় বা ভদ্র দেউল এবং শিখর শীর্ষ 'পিঢ়' বা 'ভদ্র' দেউল।[৩৪] এর মধ্যে প্রথম দু শ্রেণীর অল্প যে কয়েকটি নিদর্শন এখনও বর্তমান, তা পূর্বে বলা হয়েছে। পরবর্তী শ্রেণীর স্থাপত্য সম্ভবত তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু 'শিখরশীর্ষভদ্র' দেউলকে আমরা শেষ মধ্যযুগে উদ্‌ভাবিত 'রত্ন'-মন্দিরের মূল আদর্শ বা আদিরূপ (archetype) বলে মনে করতে পারি।

৩
মধ্যযুগের মন্দিরস্থাপত্যের উদ্ভব ও ইসলামী ধর্মীয় স্থাপত্য

প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলায় মন্দির স্থাপত্যশৈলীর বিকাশধারার আলোচনা-প্রসঙ্গে যে কয়টি রীতির মন্দিরের কথা জানা গেল, সেগুলির উদ্ভব ও বিকাশ — এই দুটির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা। পালরাজাদের দীর্ঘকালের রাজত্বে বাঙালির জাতিত্ববোধের উন্মেষের ফলে সাহিত্য ও মন্দিরস্থাপত্যশিল্পের যে ঐতিহ্যভিত্তিক আঞ্চলিক বিকাশ আশাতীতভাবে সংঘটিত হয়, তার ছেদ পড়ে মুসলমানবিজয় থেকে। বাংলার ইতিহাসে এ এক ক্রান্তিকাল বা যুগ-সন্ধিক্ষণ। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের ইতিহাসেও এল এক নবযুগ।

দিল্লী এবং সারা ভারতে ও বাংলায় সুলতানী শাসনের প্রথম দুশ বছর ছিল ঘৃণা, ধর্ম-বিদ্বেষ ও ধ্বংসের যুগ। সে সময় বাংলার সুলতানেরা ছিল দিল্লীর তুর্কী সুলতানের অধীন। তাদের অঙ্গুলি-সংকেতে চলত সারা দেশ। তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল হিন্দুদের বিশালকায় দেবমন্দিরগুলি একেবারে ধ্বংস করে ফেলা এবং তার ধ্বংসাবশেষ দিয়ে বড়ো মসজিদ ও মাজার তৈরি করা। কতো পবিত্র ও প্রসিদ্ধ মন্দির যে তারা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এবং অপরূপ ভাস্কর্য নিদর্শন বিভিন্ন দেবমূর্তিগুলিকে তারা বীভৎসভাবে ধ্বংস করেছিল, তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ-সম্পর্কে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ' নামক প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। বাংলাতে এই ধ্বংসকার্য চলেছিল পুরোদমে। বাংলায় সর্বপ্রাচীন মুসলমান বসতি গড়ে ওঠে হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে। এখানকার বহু স্থান মুসলমান আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরবর্তী একটি বিষ্ণুমন্দিরকে জাফর খান গাজীর সমাধিস্থানে পরিণত করা হয়, যার কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য মন্দির ও দেবস্থানগুলি কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, সে ইতিহাস পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পার্সি ব্রাউন বলেছেন ঃ ভারতে মুসলমানদের আগমনে একটি যুগের শেষ হল। পুরানো নিয়ম চলে গেল। আর কোন দেশে ইসলামীকরণের আন্দোলন এতখানি যুগান্তকারী ছিল না। কারণ, মুসলমানেরা তাদের বিশ্ববিজয়ের যাত্রাপথে যে নানা সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে, তার মধ্যে আর কেউ ভারতীয়দের মতো মুসলমান আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ছিল না।[৩৫]

তুর্কী আক্রমণে বাঙালির কাছ থেকে কোন প্রতিরোধ এল না। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে 'তখন বাঙ্গালীর মধ্যে প্রান্তিক বা প্রাদেশিক জাতীয়তার বোধ হয় নাই-তখনকার দিনের বাঙ্গালির সাহিত্যিক গৌরব ছিল না, বাঙ্গালি নিজেকে এক অখণ্ড ভারতেরই প্রত্যন্ত বা প্রদেশবাসী বলিয়া মনে করিত। .... তাহাকে বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। কিন্তু এই বৈতসী বৃত্তির

মধ্যে তাহার জীবনী শক্তি অটুট রহিল।[৩৬] পাল-আমলে নবসৃষ্ট বাঙালি জাতির ভাষা ও স্থাপত্যশিল্প-ভাবনার যে বিকাশ ঘটছিল, মুসলমান-বিজয়ের পর তার গতি রুদ্ধ হোল। তার ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু, বিধর্মী সুলতানদের ভয়ে এগুলির চর্চা থেকে তারা সম্পূর্ণ বিরত থাকে, যদিও মল্লভূম (বাঁকুড়া) ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর অঞ্চল মুসলিম শাসনের আওতার বাইরে থাকায় এই দিকে ওড়িশা-প্রভাবিত মন্দিরাদির নির্মাণ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকেও চলছিল।

তুর্কী বিজেতাদের রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল প্রথম দিকে গৌড়ে এবং পরে পাণ্ডুয়ায়। লক্ষ্মণ- সেনের রাজধানী 'লখনৌতি' বা 'লক্ষ্মণাবতী' নগরী ও সেখানকার দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করে তার সুন্দর সুন্দর অংশ, যেমন, কালো বেসল্ট পাথরের কারুকার্য করা দ্বারপথ বা কালো বেসল্টের কারুকার্য করা অসংখ্য স্তম্ভ, মন্দিরগাত্রের মূর্তিসহ বিভিন্ন অংশ দিয়ে বড়ো বড়ো মসজিদগুলো গড়ে ওঠে, যাদের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বহু দেবমূর্তি মসজিদের প্রবেশপথের সোপানশ্রেণীতে স্থাপন করা হয়, আবার কখনও বা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের গর্ভগৃহে স্থাপিত বৃহদাকার মূর্তিগুলির অঙ্গহানি করে তাদের পিছনের দিকে আরবি বা ফারসি লিপি খোদাই করে মসজিদের সামনে স্থাপন করা হত। এইভাবে বাংলায় সুলতানী শাসনের প্রথম দুশ বছরের মধ্যে শেষ একশ বছর কেটে যায় বড় বড় মসজিদ নির্মাণের মধ্যে। এই সময়ের ধর্মীয় স্থাপত্য বলতে প্রাদেশিক মসজিদ-স্থাপত্য ও কবর-সৌধ।

বাংলায় ইসলামীয় স্থাপত্যশিল্পের তিনটি পর্বের অনুসন্ধান করেছেন পার্সি ব্রাউন। প্রথম দিকে, গৌড়ে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর থেকে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুসলিম স্থাপত্য হল রাজধানী থেকে অনেক দূরে হুগলির ত্রিবেণীতে এক বৃহৎ মসজিদ এবং জাফর খান গাজীর কবর এবং এর কিছু দূরে পাণ্ডুয়ায় বাইশগম্বুজযুক্ত বিশাল মসজিদ। (এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। এরপর চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে পাণ্ডুয়ায় (মালদহ) যখন রাজধানী স্থানান্তরিত হল, তখন নির্মিত হল বিশালাকার আদিনা মসজিদ (১৩৬৯ খ্রি.)। সুলতান সিকন্দর শাহের দ্বারা এই মসজিদ স্থাপিত হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ের ইসলামীয় স্থাপত্য ছিল আরব-ইরাণ (পারস্য) থেকে আমদানী করা স্থাপত্যশিল্পের থেকে পৃথক। খ্রি. পঞ্চদশ শতকের গোড়া থেকেই এই ধরনের ইসলামীয় স্থাপত্যের সূচনা হয়। বাংলাদেশের জলবায়ু, মাটি, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা এ সবের কথা চিন্তা করে কিছুটা এদেশীয় প্রচলিত 'চালা'র অনুকরণে যাতে ধর্মীয় সৌধগুলির স্থায়িত্ব বেশি দিন হয়, সেভাবে তৈরি হয়েছিল। মোটামুটিভাবে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী প্রায় দেড়শ বছরের মধ্যে পূর্ববর্তী বৃহদায়তন ধর্মীয় সৌধ অপেক্ষা ছোট ছোট মসজিদ, কবর বা অন্যান্য সৌধগুলি নির্মিত হয়।[৩৭] এই সময় পাণ্ডুয়া বা গৌড়ের সুলতান দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার ক'রে প্রায় স্বাধীনভাবে দেশ শাসন ক'রতে থাকেন। ধর্মীয় সৌধগুলির মধ্যে প্রথমেই পাণ্ডুয়ার একলাখী কবরসৌধের উল্লেখ করতে হয়। এর সম্ভাব্য নির্মাণকাল ১৪১১-১৪১৫ খ্রিস্টাব্দ। কারও কারও মতে ১৪২৫ খ্রি.। এই সৌধের কার্নিশের ঈষৎ বক্রভাব দেশীয় চালার 'ছাঁচা'র কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বাধীন সুলতানদের আমলে গৌড়ে এ ধরনের অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হয়। এগুলি প্রায় সবই পঞ্চদশ শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। গৌড়ের কয়েকটি একগম্বুজযুক্ত মসজিদ, যেমন লত্তন মসজিদ (খ্রি. ১৪৭৫), কদম রসুল (এতে পয়গম্বরের পদচিহ্ন রক্ষিত), চিকা মসজিদ প্রভৃতি বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন, যেগুলির

মধ্যে দেশীয় প্রয়োগ-কৌশল লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত এগুলির আদর্শ ছিল যদু বা জালালুদ্দীনের কবর 'একলাখী সৌধ'। এটিকে কেউ কেউ আঞ্চলিক ইসলামীয় স্থাপত্য রীতির আদি নিদর্শন বলে মনে করেন। পরবর্তী মুসলিম স্থাপত্যের (মসজিদ ইত্যাদির) আদিরূপ বলে এটিকে মনে করা হয়।[৩৮]

বাংলায় ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলীর তৃতীয় ও সর্বশেষ ধারাটি হোল, সুলতানদের রাজধানী পাণ্ডুয়া (মালদহ) থেকে গৌড়ে স্থানান্তরিত হওয়ার পর যেসব মসজিদ ও মাজার তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যে। ওপরের আলোচনায় এগুলির কয়েকটির উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়সীমা মোটামুটি ধরা যায় আনুমানিক ১৪৪২ খ্রি. থেকে ১৫৭৬ খ্রি. পর্যন্ত।[৩৯] এই সময়ের মধ্যে মসজিদগুলি 'একলাখী' সৌধের আদর্শে নির্মিত হলেও (অর্থাৎ বেশিরভাগই একগম্বুজযুক্ত ও ঈষৎ বক্রাকার কার্নিশযুক্ত), বহু গম্বুজযুক্ত বিশালাকার মসজিদও নির্মিত হয়, যেমন, গৌড়ের 'বড় সোনা মসজিদ' (সুলতান নসরত শাহের নির্মিত, ১৫২৬ খ্রি.) এবং ফিরুজপুরে (গৌড়) 'ছোট সোনা মসজিদ' (সুলতান হুসেন শাহের সময়ে ওয়ালি মুহম্মদ কর্তৃক নির্মিত, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.)। এর গম্বুজগুলির মধ্যে একটি সুন্দর 'চারচালা'ও স্থাপিত।[৪০] এর থেকে প্রমাণিত হয়, সুলতানী আমলের শেষের দিকে চির পরিচিত বাংলার 'চালা'-শৈলী মুসলিম স্থাপত্যে স্থান করে নিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন, এর কৃতিত্ব মুসলিম শাসকদের।[৪১] গৌড়ে কদম রসুলের পার্শ্ববর্তী ফৎখানের সমাধিগৃহ পূর্ণ 'দোচালা' রীতির। এটি খ্রি. পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় রাজা কংসের সময় নির্মিত বলে কেউ কেউ মনে করেন। রাজা কংস (মুসলিম ঐতিহাসিকদের ভাষায় 'কানস্') বা দনুজমর্দনদেব সুলতানী আমলে একমাত্র হিন্দুরাজা (১৪১০ খ্রি.-১৪১২ খ্রি.) ছিলেন। মন্দিরটিতে হিন্দু দেববিগ্রহ স্থাপিত ছিল। তার প্রমাণও আছে।[৪২] এই 'দোচালা' সৌধটি বহু আগে তৈরি হলেও এর মধ্যে ঔরঙ্গজেবের কর্মচারী দিলির খানের পুত্র ফৎখানের সমাধিটি স্থাপিত হয় আনুমানিক খ্রি. ১৬৫৭ থেকে ১৬৬০ খ্রি.-এর মধ্যে।[৪৩] এই 'দোচালা'টির ওপরের চাল খুবই ঢালু এবং সাধারণ বাংলা কুটিরের মতো। চালের 'ছাঁচা' দেওয়াল ছড়িয়ে কিছুটা নিচে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। এই ধরনের 'দোচালা'কে 'একবাংলা'ও বলা হয়। এটি যদি সত্যই রাজা কংস-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমন্দির হয়ে থাকে, তাহলে চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত এটিই হোল সব থেকে প্রাচীন 'দোচালা' সৌধ, যা মুসলমান-পরবর্তী যুগের একটি আদর্শ 'চালা'-শৈলীর নিদর্শন।

উপরি উল্লিখিত ফিরুজপুরের 'ছোট সোনা মসজিদে'র ওপর 'চারচালা' ও ফৎখানের 'দোচালা' কবর থেকে এটা স্পষ্ট যে, সুলতানী আমলের শেষভাগে এই স্থাপত্যশৈলী শুধুমাত্র যে প্রচলিত ছিল তাই নয়, এটি একটি পরিণত রূপও পেয়েছিল। কাজেই মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে প্রথম একশ বছর তুর্কী শাসকদের এদেশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত হলেও এবং এই সময়ের মধ্যে সু-উচ্চ ও সুদৃশ্য হিন্দু মন্দিরগুলির প্রায় সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও ইসলামীয় ধর্মীয় সৌধের পাশাপাশি বাংলার একান্ত নিজস্ব পল্লীবাংলার চালাকুটির দেবমন্দিরে রূপান্তরিত হতে থাকে। বাঙালি হিন্দুরা পরাক্রান্ত মুসলমান শাসকদের কাছে 'বৈতসী বৃত্তি' অবলম্বন করে থাকলেও তাদের প্রাণশক্তি অটুট ছিল। তাই অত্যাচারের ভয়ে তুর্কী বিজয়ের গোড়ার দিকে খড়ের চালাঘরে হিন্দুরা দেব-দেবীর আরাধনা করছিল, 'চালা'র অনুকরণে। পরে তারা অনুচ্চ 'চালা' মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিল। বাংলার দেশজ স্থাপত্য 'চালা'র উদ্ভব সম্পর্কে আমরা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করলেও পরবর্তী আলোচনায় তা আরও বিশদীকৃত হবে। তবে দেশজ 'চালা'র

স্থাপত্যে রূপায়ণ সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন যে, গ্রামের 'চালা' কুঁড়ে ঘরে বাংলার যে সব লোকপ্রিয় বা লৌকিক দেবতাদের পুজোপাট হত, তারা শাস্ত্রীয় মর্যাদা লাভ করার পর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা যখন তাদের পূজোয় নিযুক্ত হলেন, বা তাদের পুজোর জন্যে যখন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের দরকার হল, তখন সেইসব দেবদেবীর মূর্তি পাকা ইঁটের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল। আর মন্দিরের আকৃতি তৈরি হল আসল খড়ের চালার অনুকরণে। এইভাবেই দেশীয় রূপটি পাকা মন্দিরে এসে গেল।[৪৪]

৪
মন্দির-স্থাপত্যের বিকাশ ও পরিণতি : মধ্যযুগ

মুসলমান শাসনাধিকারে বাংলার দেশীয় স্থাপত্যের উদ্ভবের পশ্চাতে অন্য এক ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস নতুন বাঙালি-সংস্কৃতির উদ্ভবের ইতিহাস। খ্রি. পঞ্চদশ শতকের সুরু থেকেই বাঙালির সেই নবসংস্কৃতির উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়। এই সময় থেকে বাংলায় রাজনীতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র — সাহিত্য ও শিল্পে এক আমূল পরিবর্তনের আভাস মেলে। একে পরবর্তীকালের শ্রীচৈতন্য-আন্দোলনের ফলে বাংলার 'নবজাগরণ' না বললেও এই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। যেহেতু, গৌড়ের রাজনীতি সে সময়ের বাংলাকে নিয়ন্ত্রিত করছিল, সে-কারণে চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে এক রাজনীতিক পরিবর্তন এল, তার ফলে অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মহম্মদ ইলিয়াস শাহ অবিভক্ত বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি একক রাজ্যে পরিণত করেন এবং স্বাধীন সুলতানী শাসনের পত্তন করেন। এই প্রথম একটি ঐক্যবদ্ধ বাংলা স্বাধীন সুলতানের শাসনাধীন হল। এই ঐক্যবদ্ধ বাংলা সেই থেকে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন সুলতানদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। বাংলার এই রাজনীতিক অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠা করা খ্রি. অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পালযুগের আদিপর্বে বাংলার তদানীন্তন পরাক্রান্ত শাসকদের ঈপ্সিত ছিল। পাল-বংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বাঙালি-চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ও বাঙালিরূপে তার আত্মসত্তার বহিঃপ্রকাশের চেষ্টা চলছিল। সমগ্র বা বৃহত্তর বাংলাকে এক রাজনীতিক ছত্রচ্ছায়ায় বাঁধবার জন্য পাল ও সেনবংশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজগণ সে চেষ্টা করলেও সফলকাম হতে পারেন নি। অথবা এ-বিষয়ে তাদের আংশিক সাফল্য লাভ হলেও তা ছিল নেহাতই অস্থায়ী। যখনই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে দুর্বলতার আভাস পাওয়া যেত, তখনই সংকীর্ণ স্থানীয় শক্তিগুলি নিজেদের স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইত এবং এর ফলে অখণ্ডতা বিঘ্নিত হত। বাংলাদেশকে স্থায়ীরূপে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে অখণ্ড রাজনীতিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং কেন্দ্রীয় (নিজেদের) কর্তৃত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে স্বাধীন সুলতানেরা এর একটি সুনির্দিষ্ট রাজনীতিক ও ভৌগোলিক আয়তন ও আকার দান করলেন। তাঁরা বাংলার অধিবাসীকে উপহার দিলেন একটি আঞ্চলিক সত্তা এবং ঐক্যবদ্ধতার প্রয়াস।[৪৫]

দিল্লীর সুলতানের কর্তৃত্বকে অস্বীকার ক'রে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসনের পত্তন হোল। স্বাধীন সুলতানরা তাঁদের রাজনীতিক কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং তাদের চারপাশে যেসব প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি পশ্চিমে জৌনপুরে, দক্ষিণপশ্চিমে ওড়িশায় ও উত্তরপূর্বে কামরূপে

সক্রিয় ছিল, তাদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে নিজেদের রাজ্যের স্থানীয় রাজা, জমিদার বা ঐরূপ ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের নিজের নিজের এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখলেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করলেন। বাংলার অধিবাসীদের ধর্মীয় স্থাপত্যের উদ্ভব ও বিকাশ এবং সৃজনশীল সাহিত্যসৃষ্টির জন্য উৎসাহ দিলেন। এটা এই সময় বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, দিল্লীর হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের আশঙ্কা তখনও ছিল, যদিও তিমুরের আক্রমণে পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় দিল্লীর শাসন কার্যত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সময় বাংলায় যে সব ইসলামী স্থাপত্য সৃষ্ট হয়েছিল, সেগুলিতে আঞ্চলিক হিন্দুস্থাপত্যের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এসে যায়, বিশেষ ক'রে, 'চালা'র অনুকরণটা মসজিদে, মাজারে লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আবার, হিন্দু-স্থাপত্যেও ইসলামী স্থাপত্যের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন গর্ভগৃহের ভিতরের ছাদে গম্বুজাকৃতি 'ভল্ট', 'খিলানে'র ব্যবহার প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান স্থপতিরা ইসলামী স্থাপত্যকলার এই বৈশিষ্ট্যগুলি এদেশে যেসব মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, তাতে ফুটিয়ে তোলেন এবং হিন্দু মন্দির-স্থাপত্যের 'চালা'র বক্রাকৃতি কার্নিশ বা মূর্তিবিহীন 'টেরাকোটা' নকশা, যেমন, ফুল, লতাপাতা বা জ্যামিতিক নকশা মসজিদ বা মাজারের দেওয়ালে অলংকরণরূপে ব্যবহার করেন। পক্ষান্তরে, হিন্দু স্থপতিরা মন্দিরস্থাপত্যে 'খিলান' ও 'ভল্টে'র ব্যবহার করে মন্দির নির্মাণে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন।

এটা বর্তমানে কেউ কেউ স্বীকার করেন, খ্রি. ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানবিজয়ের পর ধর্মীয় বা অন্য কোন সৌধনির্মাণে মুসলমানরা আরব-পারস্য (বর্তমানের ইরান) দেশ থেকে স্থাপত্যগত বিদ্যা আয়ত্ত করে 'খিলান' ও 'ভল্টে'র (ওপরের ছাদ বা ভেতরের ছাদ) নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছিল। এতে স্থাপত্যকর্মের স্থায়িত্ব হিন্দুদের উদ্ভাবিত 'কর্বেলিং' বা 'সরদল' বা 'লহরা' পদ্ধতির থেকে অনেক বেশি ছিল। মুসলমানরাই প্রথম এদেশের সৌধে 'ভল্ট' ও 'খিলান'-পদ্ধতির সূত্রপাত করেন। এ সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন, ভারতীয় সূত্রধরেরা শত শত বৎসর ধরে সুন্দর সুন্দর আকৃতির বিরাট বিরাট পাথরের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাদের এই শিল্পসৃষ্টির জন্যে বিজেতারা (মুসলমান) তাদের কৃতিত্ব নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু এইসব দেশীয় কারিগরেরা দীর্ঘ সময়ে আর কোন উন্নত পদ্ধতি অথবা বিজ্ঞানসম্মত সৌধ-নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই তাদের নির্মাণকৌশল একই রকম থেকে গেছে ক্রমাগত একই পদ্ধতি অনুসরণ করে। অপরপক্ষে, বিজেতাদের সঙ্গে কেবলমাত্র যে নতুন রক্তের উদ্দীপনা বা প্রেরণা এসেছিল তাই নয়, পক্ষান্তরে তারা নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রয়োগকৌশল সঙ্গে আনে যা তারা অন্যান্য দেশ থেকে লাভ করেছিল।[৪৬] মুসলমান স্থপতিদের প্রয়োগকৌশল বলতে খিলান বা ভল্টের ব্যবহারের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা হলেও ভারতীয় স্থপতিরা এইরূপ প্রয়োগবিজ্ঞানে যে অজ্ঞ ছিলেন, তা নয়। সুপ্রাচীন কালে সিন্ধুসভ্যতায় (আ. ৩০০০ খ্রি. পূর্বাব্দ) এই খিলান ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় স্থপতি- কারিগরেরা এই খিলানপদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে জানতেন। তার নিদর্শন বা প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তযুগে নির্মিত ভিতরগাঁও-এর (পূর্বে উল্লিখিত) ইঁটের দেউলমন্দিরে (আ. খ্রি পঞ্চম শতক), মীরপুর খাসএর স্তূপে এবং বুধগয়ার মন্দিরে। ভিতরগাঁও-এর মন্দিরের সামনের মণ্ডপে ইঁটের তৈরি গোঁজাকৃতি গোলাকার খিলান পাওয়া যায়। আবার গর্ভগৃহের একস্থানে ভল্টের ব্যবহার আছে।[৪৭] বুধগয়া মন্দিরের প্রবেশদ্বারেও ইঁটের তৈরি খিলানের সুস্পষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, স্থাপত্যবিদ মনোমোহন

গাঙ্গুলী একে 'খিলান' বলে মনে করেন না। (দ্রষ্টব্য, 'স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা', ১৯৫৯, পৃ. ৩৭)।

ভারতীয় কারিগরেরা এই 'খিলান' বা 'ভল্টে 'র ব্যবহার বা প্রয়োগ প্রাচীনকালে খুব ভালই জানতেন, এ থেকেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাঁদের ধারণা ছিল, খিলান বেশিদিন স্থায়ী হয় না। 'The arch never sleeps ' — বাস্তুবিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশলের এই নীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। তাই সৌধনির্মাণে 'খিলান' বা ভল্টের প্রয়োগ থেকে তাঁরা সরে আসেন এবং সু-উচ্চ মন্দিরনির্মাণে 'করবেলিং'-পদ্ধতির প্রয়োগে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। একটার ওপরে একটা চাপিয়ে পাথরখণ্ড বা ইঁটের গাঁথনিতে তাঁরা অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন এবং এই পদ্ধতিই যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। প্রাচীন দেবালয়ের অনেকগুলিই আজও দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি, সতের-আঠার শতকের কিছু মন্দিরেও এই 'করবেলিং' বা 'লহরা'-পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে।

সুলতানী আমলে মুসলমান কারিগরেরা বিভিন্ন সৌধনির্মাণে চুন-সুরকি মশলার ব্যবহার চলিত করেন। তার পূর্বে গাঁথনির এইরূপ মশলার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না— এটিও মধ্যযুগের সৌধনির্মাণে মুসলমানদের অবদান,একথা কেউ কেউ বলে থাকেন। কিন্তু চুনসুরকির এবং চুনের মিহি প্রলেপের বহুল ব্যবহার আমাদের দেশে প্রাচীন কালেও ছিল। কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ) 'রক্তমৃত্তিকা বিহারে'র ধ্বংসস্তূপ ও কর্ণসুবর্ণের কয়েকটি স্থানে উৎখনন ক'রে 'র‍্যামিং' করা চুনসুবকির মেঝে বা দেওয়ালের গাঁথনিতেও মশলার ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। আ. খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক বা তারও পূর্বে এখানকার সৌধ নির্মিত হয়েছিল।[৪৮] চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকেও এ ধরনের জিনিস লক্ষ্য করা গেছে।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের আমলে ইসলামীয় ও হিন্দু—উভয়প্রকার ধর্মীয় সৌধনির্মাণে খিলান, ভল্ট এবং গাঁথনির মশলার নতুন করে ব্যবহার হতে থাকে। হিন্দু আমলের পুরানো প্রয়োগকৌশল পরিত্যক্ত হয়। মুসলিম স্থাপত্যের প্রয়োগকৌশল ও উপাদান বিজ্ঞানসম্মত ছিল। সহজসাধ্য ও দীর্ঘফলদায়ী হওয়ায় তা হিন্দুকারিগরদের দ্বারা গৃহীত হয় এবং পরবর্তীকালে নির্মিত অসংখ্য মন্দিরে কারিগরেরা এগুলির প্রয়োগ করতে থাকেন। ঐতিহ্যবাহী উচ্চ 'শিখর'-মন্দির বা শাস্ত্রানুমোদিত অন্যান্য মন্দিরনির্মাণ এইসময় একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। এখন তা সম্ভবও ছিল না অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে। ভৌগোলিক গণ্ডীতে আবদ্ধ ও একটি রাজনীতিক বৃত্তের মধ্যে অখণ্ড বাংলাদেশে বাঙালির নিজস্ব ঘরানায় মন্দিরশৈলীর এক নতুন যুগের সূচনা হল। প্রথমে 'চালা' নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে থাকল। কারণ, 'চালা'ই ছিল সাধারণ বাঙালির একান্ত আপন প্রিয় আবাসগৃহ। চালার ঢালু চাল, বাঁকানো 'ছাঁচা' ও কাঠামোর ভিতরের ফাঁকা জায়গা— এসবই 'চালা' মন্দিরে অনুসৃত হোল। এসময় ইসলামীয় স্থাপত্যেও এগুলি সাদরে গৃহীত হয়েছিল। কারণ, সুলতানেরা এদেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিম এসিয়ার ইসলামীয় সংস্কৃতির এক সমন্বয় সাধনে তখন আগ্রহশীল, কতকটা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী করে নেওয়ার জন্য। তারা তখন সর্বভারতীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা চিরস্থায়ী করার জন্যে এদেশের জনসাধারণের সঙ্গে মিলে-মিশে চলার নীতি অনুসরণ করছিল। এর ফলেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এল ভাববিপ্লব। বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের নবজন্ম দেখা দিল। কিন্তু এর সঙ্গে পূর্বতন প্রাক্-মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর তেমন কোন মিল ছিল না। প্রাচীন বাংলার সেই 'থাকে থাকে' উঠে যাওয়া চাল, যা 'পিঢ়'-দেউলের সমগোত্রীয় মন্দির এখন আর তৈরি হতে দেখা গেল না। পরিবর্তে, চতুষ্কোণ বা আয়তক্ষেত্রাকার গর্ভগৃহের দেওয়ালের ওপর গোলগম্বুজ বা আয়তক্ষেত্রাকার খিলানের

('দোচালা' ও 'জোড়বাংলা'র ক্ষেত্রে) ওপর ভাঙাচোরা ইঁট বা 'খোয়া' এবং চুনসুরকির মশলা দিয়ে ঢালু চাল তৈরি করা হত; বৃষ্টির জল থেকে দেওয়ালকে রক্ষা করার জন্যে চালের 'ছাঁচা' (কার্নিশ) দেওয়ালের মাথা থেকে কিছুটা নিচে বিস্তার করা হত, যেমনটি আমরা গৌড়ের পূর্বোক্ত ফৎ খানের সমাধিতে লক্ষ্য করেছি। মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যেও 'চালা'র এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসৃত হয়ে একটি আঞ্চলিক ইসলামীয় স্থাপত্যের সৃষ্টি করে। খ্রি. পঞ্চদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নির্মীয়মান ধর্মীয় ইসলামীয় স্থাপত্যে যার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাঙালির আঞ্চলিক সত্তার উন্মেষ, এক অখণ্ড বাংলাদেশের সৃষ্টি এবং পরিশেষে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইসলামীয় ধর্মীয় স্থাপত্যের আবির্ভাব এবং আঞ্চলিক হিন্দুস্থাপত্যে মুসলিম স্থাপত্যের গঠনকৌশলের প্রয়োগ —এ সবই সাংস্কৃতিক বিকাশের নতুন দিগন্ত সূচিত করে। হিন্দু বাঙালি ও মুসলমানের মধ্যে 'সংস্কৃতি-সহযোগিতা' এ সময়ে শুরু হয়।

দীর্ঘকাল বাংলা ভাষার বিকাশের যে গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার পুনরুজ্জীবন ও বিবর্ধন হতে থাকে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হয় (আ. খ্রি.পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ), চণ্ডীদাস ও মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদাবলী এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্য (রচনাকাল খ্রি. আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগ) জনমানসে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। গৌড়ের এক সুলতান কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতও রচিত হয় এর পরে। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুলতান রুকন-উদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৫-১৪৭৪ খ্রি.) আনুকূল্যে মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যরচনা ক'রে 'গুণরাজ খান' উপাধি পান। বাঙালির মনে গভীর ধর্মভাব জাগ্রত হয়। 'লোকভাষা' বাংলা এইভাবে সাহিত্যের উপযোগী হয়ে ওঠে। সংস্কৃত পুরাণের আদলে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। এই সময়ে মুসলমান সুফী, পীর, দরবেশ, আউলিয়াদের ধর্মের সঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালিদের তেমন কোন সংঘাত দেখা দেয়নি। বরং, মুসলমান পীর-ফকিরেরা অহিংস ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁরা অর্জন করেছিলেন। তুর্কীবিজয়ের পর প্রথম দিকে যে সব মুসলমান সন্ত বাংলায় ইসলামের ধ্বজা জোর ক'রে তুলে ধরতে সক্রিয় ছিলেন জালালুদ্দিন তাব্রেজী, আলাওল হক, নুর কুতব উল আলম এবং যাঁদের পিছনে পরাক্রান্ত রাজশক্তির বিরাট সমর্থন ছিল এবং তার ফলে দলে দলে লোক মুসলমান হয়ে যায়, এখন সেই ধরনের প্রচারক ছিলেন না। পক্ষান্তরে, পীর-সুফী-দরবেশ-আউলিয়াদের ধর্মের সঙ্গে বাংলার লোকধর্মের একটা সমন্বয় ঘটেছিল।

বাংলায় এই রাজনীতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তন খ্রি. চতুর্দশ শতকের শেষ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হতে থাকে। এর মধ্যে পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব এক যুগান্তকারী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভাববন্যা বাংলার সংস্কৃতি -জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। সাহিত্য ও শিল্প বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। বাংলার মন্দিরস্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এক নবযুগের সৃষ্টি হোল। স্বাধীন সুলতানদের আমলেও গোড়ার দিকে মন্দিরস্থাপত্যে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার অবকাশ ছিল না। অতিসাধারণ 'চালা'তেই বাঙালির স্থাপত্যচিন্তা সীমাবদ্ধ রাখতে হত। তাই 'দোচালা', 'চারচালা'র মধ্যেই এসময়ের হিন্দু স্থাপত্যচর্চা সীমিত থেকে যায়। হিন্দু 'চালা'-মন্দির মসজিদের থেকে কোনক্রমেই উঁচু করা যেত না। এমনকি, এই 'চালা'-

মন্দিরও ছিল সংখ্যায় নগণ্য। খ্রি. পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে রাজা গণেশ (রাজা কংস) বা দনুজমর্দনদেবের সময়ে নির্মিত বলে অনুমিত 'দোচালা'টি সাধারণ 'চালা'স্থাপত্যের একটি একক দৃষ্টান্ত। ঘাটাল-কোন্নগরের (মেদিনীপুর জেলা) সিংহবাহিনীর 'চারচালা'মন্দির ও সংলগ্ন 'চারচালা' 'জগমোহন' ১৪১২ শকাব্দ বা ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বলে সংস্কারকালীন লিপিতে উল্লিখিত হলেও স্থাপত্যদৃষ্টে এটি আরও পরবর্তীকালের মনে করা যায়। যদি ধরাও যায়, এটি ঐ সময়েই তৈরি হয়েছিল, তাহলেও এটি ছিল নেহাতই সাদামাটা। দুএকটি ছোট-খাটো 'রিলিফে' উৎকীর্ণ মূর্তি ও প্রাচীন কয়েকটি ফুলকারি নকশা ছাড়া ও গোটা দুই তিন টেরাকোটা মূর্তি এবং ফুল ছাড়া তেমন কোন অলংকরণ ছিল না। উচ্চতাও সাধারণ। পক্ষান্তরে, এই সময়ের বা কিছু পরবর্তী কালের মসজিদগুলি উচ্চতা ও স্থাপত্যসৌকর্যে এই সাধারণ মানের মুষ্টিমেয় 'চালা'র থেকে উৎকৃষ্ট ছিল। এটা গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় এই সময়ে নির্মিত পূর্ব আলোচিত মসজিদগুলি দেখলেই বোঝা যায়। মুসলমানরা 'চালা'- স্থাপত্যের কিছু কিছু প্রয়োগকৌশল তাদের মসজিদ ও কবরসৌধে গ্রহণ করে কার্যসাধনের উপযোগী মনে করে। পক্ষান্তরে, হিন্দু কারিগরেরাও তাদের মন্দিরে 'ডোম' বা 'ভল্ট' এবং 'আর্চ'-এর প্রয়োগ করে। এইভাবে 'ইন্দো-মুসলিম' স্থাপত্যশৈলীর উদ্ভব হয়। এই 'চালা'- মন্দিরগুলিতে গোড়ার দিকে টেরাকোটা- ফলকে দেবদেবীর মূর্তিবিন্যাস বর্জন করা হয়েছিল মসজিদের অনুকরণে। শুধুমাত্র ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশা ও পোড়ামাটির ফুল মন্দিব-দেওয়ালের অলংকরণরূপে সজ্জিত হয়। খ্রি. অন্তত ষোল শতকের শেষদিকে কয়েকটি মন্দিরে, যেমন, বৈঁচিগ্রাম (হুগলী), বৈদ্যপুর (বর্ধমান) এবং গোকর্ণের (মুর্শিদাবাদ) মন্দিরে খুব সাধারণ অলংকরণ এবং অল্প-স্বল্প মূর্তিবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তি-আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা, পৌরাণিক দেবদেবীলীলার কথকতা, রামায়ণগান, মহাভারতকথা মঙ্গলকাব্যের পালাগানের জনপ্রিয়তা বাঙালি-মানসে আনে এক ধর্মোদ্দীপনা। এ সময়ে তুর্কী শাসনের শেষ পর্যায়, মুঘল রাজশক্তির অভ্যুদয় বাঙালির স্বাধীন চিন্তায় স্থাপত্য-চর্চাব এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার সৃষ্টি কবল। এখন আর 'চালা'- মন্দিরেই তার স্থাপত্যচর্চা সীমাবদ্ধ রইল না। এল উচ্চশ্রেণীর 'রত্ন'মন্দিরেব পরিকল্পনা, দোচালা-চারচালার পর উচ্চ 'আটচালা'র অভ্যুদয ঘটল।

মুসলমান-বিজয়ের পর বাঙালির শিল্পসৃষ্টির সাময়িক বিরতি ঘটলেও উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তা স্ফূর্তি লাভ করতে পাবে নি। প্রাক-মুসলিম যুগের বাংলার নিজস্ব শৈলীর দুই 'থাক' বিশিষ্ট 'পিঢ়'-দেউলের রূপান্তর ঘটল 'আটচালা'- রীতির মন্দিরে। আঠার- উনিশ শতকে 'আটচালা' তার পরিপূর্ণ বা পরিণত রূপ লাভ করার আগে (অর্থাৎ বেশ ঢালু চাল ও কার্নিশের বক্রভাব) সতের শতকের দিকে যেসব দেউল মন্দিরের 'পিঢ়'-রীতির 'জগমোহন' লক্ষ্য করা যায়, সেগুলিতে চালার ভাবটা অনেকটা ফুটে উঠেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার অন্তর্গত শিহর গ্রামের (জয়রামবাটির কাছাকাছি) শান্তিনাথ শিবের দেউলের সংলগ্ন 'জগমোহনে'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এর চালগুলি খুবই ঢালু, কিন্তু কার্নিশ সোজা। ওপরের চারটি চাল বা 'পিঢ়া' ও নিচের চারটি চালাকৃতি 'পিঢ়া'য় 'আটচালা'র ভাবটি ফুটে উঠেছে। আবার ঐ জেলারই ওন্দা থানার অন্তর্গত বিক্রমপুর গ্রামে রাধাকৃষ্ণেব দেউলমন্দিরের সামনেই 'জগমোহনের' ওপর যে 'পিঢ়া'র সন্নিবেশ করা হয়েছে, সেগুলিও পরবর্তীকালের 'চালা'র পরিচয় বহন করে। এই দুটি মন্দিরই খ্রি. সপ্তদশ শতকে তৈরি হয। প্রথমটির লিপি না থাকলেও স্থাপত্যদৃষ্টে সপ্তদশ শতকে

নির্মিত এবং দ্বিতীয়টি মল্লভূমের রাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ (বীর হাম্বির বা বীরসিংহের পুত্র) ১৬৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৯] মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় কঙরেশ্বর শিবের ও নিকটবর্তী কানুরাম দাসের 'পিঢ়' দেউলদুটির 'পিঢ়া'য় চালার ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে।[৫০] এগুলিও ষোল-সতের শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। এই জেলার কেশপুর থানার কুঁয়াই গ্রামের 'নেড়া দেউল' মন্দিরের 'জগমোহনে'র পিঢ়গুলিও চালার আকার ধারণ করেছে, লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়।[৫১] আরও অনেক 'পিঢ়'-দেউলের চাল ক্রমশ চালার রূপ নিতে শুরু করেছিল। পুরানো 'আটচালা' যেমন, তালডাংরা থানার (বাঁকুড়া) সাত্রাকোণের রাধাকৃষ্ণ মন্দির (১৬৭৭), বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী তেজপালের রাধাকৃষ্ণ মন্দির (১৬৭২),[৫] মেদিনীপুরের গড়বেতার রাধাবল্লভের মন্দির (১৬৮৬)-গুলিতে কোন তল ছাড়াই 'আটচালা'র সৃষ্টিতে পুরানো পিঢ়-দেউলগুলির বিবর্তনই লক্ষ্য করা যায়। এর আরও অনেক পরে মেদিনীপুরের শিলদায় (বিনপুর থানা) কিশোর-কিশোরীর আটচালাটিও (১৮২০) ঐ একই রীতির। এগুলি পল্লীবাংলার খড়ের ঘরের কাটাচালের অনুকরণেও তৈরি হতে পারে। তবে প্রাচীন পিঢ়-দেউল যে ক্রমশ 'চালা'য় রূপান্তরিত হচ্ছিল, বিশেষ করে, সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে, তা ওপরের আলোচনা থেকে অনুমান করা যায়। দেউলের 'জগমোহন'গুলির চাল পিঢ়ার আকারে 'থাকে থাকে' ক্রমহ্রস্ব হয়ে ওপরে শীর্ষস্থানে মিলিত হলেও চালগুলিতে ঢালু চালার ভাবটি যে পরিস্ফুট হচ্ছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এর পর ওড়িশী-শৈলীর দেউল-মন্দিরের সম্মুখ-সংলগ্ন পিঢ়া-দেউলের স্থান অধিকার করে 'চারচালা' বা কোন কোন ক্ষেত্রে 'দোচালা'। মেদিনীপুর জেলার তমলুকের বর্গভীমা ও পাইকভেড়ির (ভগবানপুর থানা) শ্যামসুন্দরজীউর দেউলের 'চারচালা' জগমোহন লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে 'আটচালা' জগমোহনও লক্ষ্য করা গেছে। সরসীকুমার সরস্বতীও এই প্রাচীন পিঢ় দেউল থেকে 'আটচালা'র উদ্ভব হয় বলে মনে করেন। পূর্বে আলোচিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কিত চম্পিতলার লোকনাথকে একটি দেউলে অধিষ্ঠিত দেখানো হয়েছে যেটি 'আটচালা' বলে তিনি মনে করেন। প্রাচীন বাংলার পিঢ়-মন্দিরগুলির একটি পিঢ়া থেকে অন্যটির ব্যবধান সুস্পষ্ট থাকায় এই ব্যবধান একটি তলের ইঙ্গিত দেয়। তাই এইরূপ দুটি পিঢ়াযুক্ত দেউল পরবর্তীকালে 'আটচালা'য় এবং তিনটি পিঢ়ায় 'বারোচালা' রীতির উদ্ভব হয় বলে মনে করা যেতে পারে। ছোটখাটো চতুষ্কোণ 'আটচালা'গুলি বাদ দিলে বড়ো বা আয়তক্ষেত্রাকার 'আটচালা'-গুলির গর্ভগৃহসংলগ্ন ঢাকা বারান্দা কতকটা সামনের মণ্ডপের কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে এইরূপ বহু 'আটচালা' নির্মিত হতে দেখা গেছে। 'আটচালা'র সামনের ঢাকা বারান্দা ছাড়া অপর দুই বা তিন দিকের কোন বারান্দা সাধারণত লক্ষ্য করা যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'আটচালা' বা 'বারোচালা'র (যদিও বারো চালা সংখ্যায় খুবই কম) ওপরের 'চারচালা'গুলি শুধুমাত্র উচ্চতা ও কিছুটা অলংকরণের জন্য তৈরি করা হয়। গ্রামের খড়ের আটচালা ঘরও 'আটচালা'র রূপায়ণে বাংলার মন্দিরস্থপতিদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। একদিকে ঐতিহ্যানুসারী প্রাচীন 'পিঢ়'-শৈলীর মন্দিরনির্মাণের অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে খড়ের 'আটচালা' ঘর বাংলার স্থপতিদের 'আটচালা' নামে একটি পৃথক চালারীতির মন্দির সৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। তার মধ্যে এই রীতিটি দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল খ্রি. সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত। এমনকি, বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও এই রীতির মন্দির অনেক তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক কালেও এই রীতির ছোটখাটো মন্দির নির্মিত হতে দেখা গেছে। সমগ্র বাংলায় 'আটচালা' অসংখ্য নির্মিত হয়েছিল, যতটা 'চারচালা'

তৈরি হতে পারে নি। কারণ, গ্রামবাংলার বেশির ভাগ লোকের ঘরই খড়ের 'আটচালা' ছিল। একতলায় মুখ্য আবাসগৃহ ছাড়া দ্বিতলেও একটি কক্ষ এই আটচালা ঘরগুলিতে দেখা যায়। সামনে বা দুপাশে অথবা চারপাশে যে বারান্দা থাকে, তা কোন কোন সময় ঢাকাও থাকে। তবে সামনের বারান্দাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। 'আটচালা' মন্দিরগুলির সামনের ঢাকা বারান্দা বহুক্ষেত্রে মণ্ডপের কাজ করে, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দুই বা তিনদিকে এই বারান্দা লক্ষ্য করা যায় না। আবার, দ্বিতলে একটি পৃথক কক্ষ বা ওপরে ঐ কক্ষটিতে যাওয়ার সিঁড়ি কোন কোন বৃহৎ 'আটচালা'য় ক্বচিৎ দেখা যায়। মেদিনীপ . জেলার মহিষাদলের রামবাগের 'আটচালা'য় এই ধরনের কক্ষ ও সিঁড়ি আছে। 'চালা'-শৈলীর মধ্যে 'দোচালা' ও 'জোড়বাংলা' 'আটচালা'র তুলনায় তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। এই ধরনের চালাঘর সেকালে কমই নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'জোড়বাংলা'-মন্দির বাংলার নানা স্থানে অনেকটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আকার, আয়তন, প্রাচীনত্ব ও উৎকৃষ্ট অলংকরণের দিক থেকে বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫খ্রি.) আদর্শস্থানীয়। বাংলার আরও বহু স্থানে সতের শতকে 'জোড়বাংলা'-রীতির মন্দির তৈরি হয়েছিল এবং এই মন্দির উনিশ শতক পর্যন্ত তৈরি হতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে বাংলায় 'রত্ন'-মন্দিরের উদ্ভব এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রাক-মুসলিম যুগে হিন্দু রাজাদের আমলে এই 'রত্ন'-মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। স্বাধীন সুলতানদের আমলেও এই শৈলীর মন্দিরের উদ্ভব হয় নি। ঐ সময়ের মধ্যে নির্মিত কোন 'রত্ন'-মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। 'রত্ন'-মন্দির 'চারচালা' বা সমতলছাদযুক্ত 'দালানে'র ওপর এক বা পাঁচ অথবা নয় প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকৃতি 'দেউল'-রত্ন অথবা সমান্তরাল খাঁজযুক্ত দেউলরত্ন বসিয়ে নির্মাণ করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে দালান বা চালার ছাদের ওপরে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের 'চারচালা'-রত্নও স্থাপন করা হোত। 'রত্ন'-শৈলী' পর্যায়ে 'একরত্ন' থেকে 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' পর্যন্ত মন্দির নির্মিত হ'তে দেখা গেছে নানা স্থানে।

প্রাক-মুসলিম যুগে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই 'রত্ন'-মন্দিরের উদ্ভব সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন, স্বাধীন সুলতানী আমলে উদ্ভাবিত ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের ফল হল এই 'রত্ন'মন্দির। শিখর-দেউলের মতো রত্নমন্দিরেরও দুটি অংশ—নিম্ন ও উর্ধ্বভাগ (sub-structure and superstructure) । এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটেছিল, তার ফলে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যে-হিন্দুদের বক্র কার্নিশযুক্ত 'দালান' যেমন একদিকে মুসলিম স্থাপত্যে গৃহীত হয়, অন্যদিকে দালানের ছাদে গোলাকার গম্বুজ, হিন্দুস্থাপত্যে 'রত্নে'র আদর্শরূপে গৃহীত হয়। এই নীতির প্রয়োগে 'দালানে'র ছাদে ঐতিহ্যাগত 'শিখর'-দেউলের রূপান্তরিত সরলীকৃত ক্ষুদ্রাকার দেউল স্থাপন কবার রীতি প্রচলিত হয়। শুধুমাত্র এই ধরনের সরলীকৃত দেউল বাংলায় সতের শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত অসংখ্য নির্মিত হয়েছিল। এই যুগে প্রাক-মুসলিম যুগের সু-উচ্চ 'শিখর' দেউল মন্দির-নির্মাণধারা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেলেও তার পরিবর্তে ওড়িশা থেকে আগত 'রেখ'-দেউলের অনুকরণে ছোট ছোট 'দেউল' নির্মিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে সেগুলিতে 'চালা'র ভাব অনেকটা এসে গিয়েছিল। এই সরলীকৃত 'রেখ'-দেউলগুলির ক্ষুদ্র রূপ 'দালান' বা 'চালা'র ছাদে বসানো হতে থাকে। অনেক সময় এই দেউলগুলির উপরিভাগের দেওয়ালে সমান্তরাল খাঁজ ধাপে ধাপে তৈরি করে প্রাচীন 'পিঢ়া'র অনুকরণও করা হয় এবং এই ধরনের 'রত্ন'-দেউলও বসানো হয়। আবার সম্পূর্ণ এই ধরণের

দেউলও বহু স্থানে লক্ষ্য করা যায়।

'রত্ন'-মন্দিরের উদ্ভবের গোড়ার দিকে 'একরত্ন'কে যদি প্রথম ধরা যায়, তাহলে এটি একগম্বুজযুক্ত মসজিদ বা কবরসৌধের আদর্শে গঠিত হয়েছিল, এই ধারণা প্রথাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সমর্থনে পাণ্ডুয়ার (মালদহ) 'একলাখী কবরসৌধ'কে আদর্শ বলে মনে করা হয়। পূর্বে আলোচিত এই সৌধটি বাংলার 'একরত্ন'-শৈলীর উদ্ভবের পশ্চাতে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই 'রত্ন'-মন্দিরের উদ্ভব যে ইসলামীয় গম্বুজশীর্ষ মসজিদের অনুকরণে হয়েছিল অথবা ঐরূপ মসজিদ 'রত্ন'-মন্দির-উদ্ভবেব পশ্চাতে আদর্শরূপে কাজ করেছিল, একথা কেউ কেউ মনে করেন। মসজিদে কেন্দ্রীয় গম্বুজটির চারপাশে মিনার স্থাপন করার রীতিও সেসময় প্রচলিত হয়। 'রত্ন'-মন্দিরের ক্ষেত্রে 'পঞ্চরত্ন' প্রভৃতির উদ্ভবের পশ্চাতেও এটা প্রেরণারূপে কাজ করে থাকবে। খ্রি. পনেরো শতকে এই ধরণের বহু মসজিদ বা কবরসৌধ গৌড়,পাণ্ডুয়া ও অন্যান্য স্থানে নির্মিত হতে থাকে। 'রত্ন'-মন্দিরের উদ্ভব আরও পরে। সম্ভবত ষোল শতকে এর উদ্ভব হয়, কিন্তু ঐসময়ের কোন 'রত্ন'-মন্দির লক্ষ্য করা না গেলেও সপ্তদশ শতকে নির্মিত বহু 'রত্ন'-মন্দির পরিপূর্ণরূপ লাভ করে।[৫৩] এই শৈলীর মন্দির মল্লরাজাদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল। প্রাচীন 'রত্ন'মন্দিরগুলি মল্লভূমের নানা স্থানে সপ্তদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেমন, বীরসিংহের (বাঁকুড়া) বৃন্দাবনচন্দ্রের (১৬৩৮) মন্দির (ধ্বংসপ্রাপ্ত, সম্ভবত 'পঞ্চরত্ন' ছিল), গোকুলনগরের গোকুলচাঁদের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩), বিষ্ণুপুরের শ্যামচাঁদের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩), বৈতলের রাধাকৃষ্ণের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৬০) প্রভৃতি। 'একরত্ন' মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত দ্বাদশ-বাড়ির 'একরত্ন'টি বেশ প্রাচীন, যদিও খুবই জীর্ণ। এর 'রত্ন'টি আটকোণা এবং চারদিক খোলা। আনুমানিক খ্রি. সতের শতকের প্রথমার্ধে এটি নির্মিত হয়। বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ অঞ্চলের কালাচাঁদের 'একরত্ন'টি ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। ওন্দা থানার অন্তর্গত যাদবনগরের যাদবরায়ের মন্দিরটি মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহ ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। এর 'রত্ন'টি নিচের 'দালানে'র প্রায় সর্বাংশ জুড়ে অবস্থিত, যা একান্তই অভিনব— অনেকটা 'শিখর'-দেউলের মতো।[৫৪] এই ধরনের আর একটি সুদৃশ্য 'একরত্ন' (যা অনেকটা 'শিখর' দেউলের মতো) মেদিনীপুর জেলার মোহনপুরে জগন্নাথের মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়।[৫৫]

কেউ কেউ মনে করেন 'রত্ন'মন্দিরের নিম্নভাগে বাংলার লোকায়ত 'চালা'-স্থাপত্যের সঙ্গে ছাদের উপরিভাগে যে ঐতিহ্যাগত শিখরকে 'রত্ন'রূপে স্থাপিত করা হয়,তার ধারণাটা এসেছে মুসলমানদের আঞ্চলিক ধর্মীয় স্থাপত্য গম্বুজশীর্ষ সৌধের থেকে। এইরূপ সৌধের নিম্নভাগে 'চালা'-কুটিরের অবস্থান এবং তার ওপরে মুসলমানদের ঐতিহ্যাগত গম্বুজ স্থাপন— এই দুইএর সংযোগে অখণ্ড একটি স্থাপত্যশৈলীর উদ্ভব হয়। মুসলমানদের একগম্বুজ মসজিদ বা কবরসৌধের সঙ্গে এর সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে বাংলার 'রত্ন'মন্দিরের পুরোগামী রূপে একে বলা যেতে পারে। 'রত্নে'র সর্বাপেক্ষা সরলীকৃত যে রূপ 'একরত্ন', তার সঙ্গে মুসলমানদের একগম্বুজ স্থাপত্যের পার্থক্য শুধু হোল ওপরের অংশটিকে নিয়ে।[৫৬] ইসলামীয় স্থাপত্যে বহু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় গম্বুজের চারদিকে 'ছত্রী' স্থাপন করা হয়। বাংলার 'পঞ্চরত্ন' প্রভৃতি মন্দির সম্ভবত এরই আদর্শে তৈরি হয়ে থাকবে, এমন ধারণাও প্রচলিত আছে। এইভাবে 'রত্ন'মন্দিরগুলির পূর্বসূরি বা আদর্শ যে মুসলিম গম্বুজশীর্ষ সৌধগুলি, এই ধারণা একরূপ বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু 'রত্ন'মন্দিরের এই উদ্ভবসূত্র সমর্থনযোগ্য নয়। মধ্যযুগে মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যে

কিছুটা আঞ্চলিকতার ছাপ পড়লেও বাংলার 'রত্ন'মন্দির-স্থাপত্য গম্বুজযুক্ত ইসলামীয় ধর্মীয় সৌধের প্রভাবান্বিত ছিল, একথা মনে করলে ভুল করা হবে। মুসলমান শাসনাধিকারে প্রাচীন বাংলার মন্দিরচর্চার সাময়িক বিরতি ঘটলেও দক্ষ কারিগরদের মধ্যে সেই চর্চার ধারা তখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। 'নাগর'-শৈলীর অন্তর্ভুক্ত ওড়িশীরীতির 'দেউল' মন্দির অজস্র নির্মিত হয়েছিল এইসময়ে, বিশেষ করে, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় এবং বর্ধমানের স্থানে স্থানে। অলংকরণ-প্রাচুর্যে ভরপুর তুঙ্গশিখরযুক্ত ওড়িশী দেউল বা স্থাপত্যালংকারে ভূষিত পাল-সেন পর্বের জৈন-বৌদ্ধ 'শিখর' দেউল-মন্দির নির্মাণের পরিবর্তে তার সরলীকরণ চলল— সৃষ্টি হল সরল কিন্তু পরিচ্ছন্ন এক নতুন 'দেউল'মন্দিরের। এর মধ্যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ ছিল না, কিন্তু ছিল প্রাণের স্পর্শ, বাংলার গ্রামাঞ্চলের পরিবেশ-পরিমণ্ডলের উপযোগী একটি নতুন শ্রেণীর দেউল। এগুলি ছিল আকারে ছোট, নিচের খাড়া চারটি দেওয়ালের ওপর ঈষৎ বক্রাকার শিখরটি নেহাতই সাদামাটা যেন নিম্নভাগের থেকে তার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তার মধ্যে 'চালা'র ভাবটাও কিছুটা এসে গেছে। এই ক্ষুদ্রাকার দেউলগুলির অধিকাংশেরই সামনে কোন 'জগমোহন' বা মণ্ডপ নেই, থাকলেও তা যেন কতকটা দায়সারা গোছের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এর সামনে একটিমাত্র প্রবেশপথ, কোন ঢাকা বারান্দা নেই, চারদিকের দেওয়ালে উদ্‌গত রেখাবিন্যাস আলো-আঁধারির সৌন্দর্যসৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। সামনের দিকে অল্পস্বল্প অলঙ্করণ— এই ছিল আলোচ্য দেউলগুলির বৈশিষ্ট্য। অনেকসময় দেউলগুলির ঊর্ধ্বাংশের দেওয়াল সমান্তরাল খাঁজকাটা; অথচ বক্রাকার রেখা-বিন্যাস স্পষ্ট। সৃজনশীল বাঙালি স্থপতির মানসপটে নতুন এক শৈলী জন্ম নিল। তা হোল 'রত্ন'-মন্দির। এতদিন ধরে সে শুধু 'চালা' ও সমতল ছাদযুক্ত 'দালান' মন্দির নির্মাণ ক'রে আসছিল। এখন দালানকে আরও উচ্চ ও অলংকৃত করার কথা সে চিন্তা করল। প্রথমে দালানের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্রাকার রেখ-দেউল বা সমান্তরাল খাঁজকাটা দেউল 'রত্ন'-রূপে বসানো হল। এর উদ্ভব সম্ভবত 'শিখর'-দেউল থেকে। লক্ষ্য করা গেছে, প্রাচীন কাল থেকেই 'শিখর'দেউল দুটি সুস্পষ্ট অংশ নিয়ে একটি অখণ্ড রূপ লাভ করেছিল। এর নিচের অংশটি চতুষ্কোণ 'দালান'। গুপ্তযুগে নব-উদ্ভূত মন্দির-স্থাপত্যের গোড়ার দিকে শুধুমাত্র 'দালান'ই ছিল দেব বিগ্রহের অধিষ্ঠান বা গর্ভগৃহ।[৫৭] পরবর্তীকালে এই দালানের ওপরই 'শিখর' নির্মিত হতে দেখা যায়। 'দালানে'র সামনে অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর কারুকায করা থামের ওপরে যে মণ্ডপ (porch) থাকত, পরবর্তীকালে সেটিকে আরও প্রসারিত করা হয়। আইহোলে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে নির্মিত লাড়খান মন্দিরে এ ধরনের স্থাপত্য লক্ষ্য করা যায়, যদিও এখানে 'শিখর' নামমাত্র। দালান ও তার সামনের মণ্ডপটি প্রশস্ত।[৫৮] পূর্বোক্ত হুচ্ছিমল্লী মন্দিরটির (আইহোল, খ্রি. অষ্টম শতক) সামনেও প্রশস্ত মণ্ডপ, মূল গর্ভগৃহের ওপর শিখর স্থাপিত, কিন্তু প্রসারিত মণ্ডপটি এরই অংশ।[৫৯] পূর্বোক্ত পত্তদাকলের জম্বুলিঙ্গ মন্দিরের নিচের দালানের সঙ্গে ক্ষুদ্রাকার মণ্ডপ এবং ওপরের 'শিখর'-এর দুটি ভাগও সুস্পষ্ট। বাংলায় এই 'শিখর' বা 'রেখ' দেউলের দুটি বিশিষ্ট বিভাগ লক্ষ্য করা যায়— দালান ও শিখর (Sub-structure ও Superstructure)।

বাংলায় সতের-আঠার শতকে নির্মিত 'রত্ন'মন্দিরগুলিতে লক্ষ্য করা যায়, নিচের সমতল ছাদযুক্ত দালানটিকে চারদিকে প্রসারিত ক'রে এবং সামনে অথবা দুই দিক বা চার দিকেই ঢাকা বারান্দা যুক্ত ক'রে মাঝখানে বা অল্পকিছু ক্ষেত্রে দালানের একেবারে পেছনের দেওয়াল ঘেঁষে 'শিখর' স্থাপন করা হয়েছে। এইভাবে একটি রত্ন-শিখর স্থাপিত ক'রে 'একরত্ন'-শৈলীর উদ্ভব

হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিচের দালানের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে শিখরটি স্থাপিত হয়েছিল। 'একরত্ন'-শৈলীর বলে মনে হলেও এতে দেউলরূপটিই সামগ্রিকভাবে ফুটে ওঠে। এ ধরনের একটি মন্দির পূর্বোক্ত যাদবরায়ের মন্দির (১৬৫০, বাঁকুড়া) এবং মোহনপুরের (মেদিনীপুর) জগন্নাথমন্দির (আ. আঠার শতক)। আরও পরবর্তীকালে নির্মিত অপর একটি দৃষ্টান্ত, ভগবানপুর থানার বাঘাদাঁড়ির (মেদিনীপুর) রঘুনাথের 'একরত্ন' মন্দির। এ থেকেই অনুমান করা যায়, শেষ-মধ্যযুগে দেউল মন্দিরকে আদর্শ রেখে 'বত্ন'-মন্দিবের উদ্ভব হয়েছিল। লক্ষ্য করা যায়, বাংলার 'রত্ন'মন্দিরগুলির নিম্নভাগ অর্থাৎ গর্ভগৃহেব (sanctum) প্রায় সবই 'দালান'রীতির। বহু ক্ষেত্রে সমতল ছাদযুক্ত দালানের কার্নিশ ঈষৎ বক্র করা হয়েছে, আবার সমতল কার্নিশও বহু লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ওপরের চালের ঢালু ভাবটা অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় না। বিষ্ণুপুরে লালবাঁধ এলাকার 'একরত্ন'গুলিতে এবং পাত্রসায়রের (বাঁকুড়া) কালঞ্জয় শিবমন্দিরে চালার ওপর 'রত্ন' লক্ষ্য করা যায়। আবার, বাংলাদেশের পুঠিযায় (রাজশাহি জেলা) নিচের চালার ছাদে 'চারচালা' রত্নগুলি বসানো হয়েছে।[৬০] পশ্চিমবাংলার কোন কোন মন্দিরে 'চারচালা'-রত্নের ব্যবহার লক্ষ্য কবা যায়, যেমন, খানাকুল-কৃষ্ণনগবের (হুগলি) রাধাবল্লভ এবং নদীয়ার কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী কালী মন্দিব। এই 'চারচালা'- রত্ন আবার জোড়বাংলা মন্দিরেও 'রত্ন'রূপে স্থাপিত হয়েছে। (দৃষ্টান্ত, বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা')। 'দেউল' ও 'চালা'-শৈলীর বহুল প্রচলনের ফলে বাঙালি কারিগরেরা এগুলিকে 'বত্ন' হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তাই শেষমধ্যযুগে সরলীকৃত দেউলের বহুল প্রচলন হওয়ায় সেটি যেমন 'রত্ন' হিসেবে ব্যবহাব করা হয়েছে, তেমনি লোকায়ত 'চালা'স্থাপত্যকেও নিচের প্রশস্ত দালানের ওপর 'রত্ন'রূপে স্থাপিত করা হয়েছে, 'চারচালা'-রত্নের ক্ষেত্রে নীচের 'চারচালা'র ওপর স্থাপিত হলে এটিকে 'আটচালা' বলেও মনে হতে পারে (খানাকুল-কৃষ্ণনগরের রাধাবল্লভ মন্দির, হুগলি)। অবশ্য, এই ক্ষেত্রে বাংলার খড়েব 'আটচালা' কুটিরের সঙ্গেই এব সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়। শুধুমাত্র 'চারচালা' এক-রত্নের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

বাংলার 'একরত্ন'-মন্দিরের ভিন্ন একটি রূপ কতকটা চালা-আকারের আটকোণা রত্ন, যা অনেক মন্দিরে লক্ষ্য কবা যায়— যেমন গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রের মন্দির (সতের শতক), বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব মন্দির, বলিহারপুবেব ব্রজরাজকিশোরের মন্দিব (দাসপুর, ১৭৭০) প্রভৃতি। 'একরত্ন' স্থাপত্য-সৃষ্টির পশ্চাতে তাই 'দেউল' ও 'চালা'-শৈলীর ধারণা থাকা খুবই সম্ভব। 'পঞ্চরত্ন'-শৈলীর ক্ষেত্রে প্রাচীন 'পঞ্চায়তন' মন্দিরের কথা মনে হতে পারে। অর্থাৎ মূল কেন্দ্রীয় মন্দিবটির সঙ্গে একই পীঠিকায় চারকোণে চারটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার দেউল নির্মাণ করে সেসময় এই 'পঞ্চায়তন' মন্দির হত। বোধগয়ার মহাবোধিমন্দির 'পঞ্চায়তন' মন্দিরের এক উল্লেখ্য নিদর্শন, যদিও অনুমান, কোণের চারটি 'দেউল' পরবর্তীকালের। ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মেশ্বর মন্দির পঞ্চায়তন শ্রেণীর। মালদা জেলার ওয়াড়িতেও একটি 'পঞ্চায়তন' শ্রেণীর মন্দির ছিল (১৫৪৫ খ্রি.) বলে অনুমান।[৬১] 'পঞ্চায়তন'মন্দিরকে পরবর্তীকালে চারদিক দিয়ে একটি ঢাকা বারান্দার দ্বারা যুক্ত করে দেওয়া হয়। তখন এটি পঞ্চরত্নের মতো দেখায়। মধ্যপ্রদেশের রেওয়া অঞ্চলে বা ত্রিহুতে পঞ্চায়তন মন্দিরটি এইভাবে একটি সৌধে পরিণত হয়েছে দেখা যায়।[৬২] সম্ভবত প্রাচীন বাংলার 'পঞ্চায়তন' মন্দিরগুলি থেকে 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরগুলির উদ্ভব হয়। তবে, প্রাক-মুসলিম যুগে পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে যে 'প্রাসাদ' শ্রেণীর বহু মন্দির ছিল (পূর্বে আলোচিত) যার 'দালান'গুলির চারদিকে 'শিখর' বসানো থাকত, সেই শ্রেণীর মন্দির থেকে রত্নমন্দির এবং 'পঞ্চরত্ন'

বা 'নবরত্ন' শ্রেণীর মন্দিরের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর। পুণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী। এই অঞ্চলে 'প্রাসাদ'-রীতির যে বহু মন্দির নির্মিত হয়, শেষ-মধ্যযুগে বাংলার 'রত্ন'-মন্দিরগুলি তাদেরই পরিবর্তিত ও সরলীকৃত রূপ। 'নবরত্ন' মন্দিরের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। প্রায়ক্ষেত্রে 'দালানে'র ছাদের ওপরে আর একটি ক্ষুদ্রাকার 'দালান' তৈরি করে তার ওপর পাঁচটি দেউলরত্ন স্থাপিত করা হয়। কেন্দ্রীয় রত্নটি বৃহৎ আকার হয় স্বাভাবিকভাবে। এরপর ওপরে আরও দুএকটি তল বাড়িয়ে 'ত্রয়োদশরত্ন', 'সপ্তদশরত্ন', এমন কি, 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' পর্যন্ত মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সর্বাধিক চারটি তলের অধিক তল লক্ষ্য করা যায় না। সর্বাধিক পঁচিশটি 'রত্ন' এই তলগুলির মধ্যেই সন্নিবেশিত করা হয়। পাঁচশটি 'রত্ন' স্থাপন করতে গেলে নিয়ম অনুসারে যে ছয়টি তলের প্রয়োজন হয়, বাংলার কোন 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দিরে তা দেখা যায় না। সর্বাধিক চারটি তলেই 'রত্ন'গুলির সমাবেশ ঘটে। কালনার (বর্ধমান) 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দিবগুলিতে (আঠার শতক) চারটি তল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সুখাড়িয়ার (হুগলি) আনন্দময়ীর মন্দিরের (১৮১৩) তিনটি তলেই পঁচিশটি চূড়া সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

'রত্ন'-মন্দিরেব এই অভাবনীয় বিকাশ চৈতন্যোত্তর যুগের বাংলার মন্দিরশিল্পের গৌরবোজ্জ্বল চিত্রটি উপস্থিত করে। 'চালা', 'দেউল' ও 'রত্ন'-শৈলীর মন্দির সতের শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে অজস্র তৈরি হয়। এগুলি ছাড়া 'দালান' ও 'চাঁদনি' শৈলীর মন্দিরও প্রচুর তৈরি হয়। সমতল ছাদ এবং সরল বা কার্নিশযুক্ত মন্দির সুপ্রাচীন গুপ্তযুগ থেকেই নির্মিত হয়ে আসছে।

এই রীতির মন্দির 'দালান' ও 'চাঁদনি' দুটি নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রশস্ত আয়তনযুক্ত লম্বা 'হল'ঘর এবং সামনে বহু প্রবেশপথযুক্ত 'দালান' আঠার-উনিশ শতকে অসংখ্য তৈরি হয়েছিল। বিশেষ ক'রে, দুর্গা ও কালীদালানগুলি প্রশস্ত আয়ত, মূল গর্ভগৃহ ও সংলগ্ন ঢাকা বারান্দা— এই দুটি অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এগুলিকে 'চণ্ডীমণ্ডপ'ও বলা হোত। রাজা-জমিদারদের প্রাসাদ-সংলগ্ন ছিল এই সব 'দালান' মন্দির। অনেক 'দালান মন্দিরে 'পঙ্কে'র অলংকরণে ফুললতাপাতার নকশা সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য তৈবি করা হোত। কিন্তু 'চাঁদনি' সমতলছাদযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডপরূপে তৈরি করা হোত। এটি চতুষ্কোণ বা আয়তক্ষেত্রাকার হলেও সামনে 'খিলান' প্রবেশপথ এক থেকে তিনের মধ্যে থাকত। 'চাঁদনি'-রীতির মন্দিরগুলি গ্রামবাংলার আনাচে কানাচে লক্ষ্য করা যায়। এগুলি যেন অভিজাত শ্রেণীর বিশালাকার 'দালানে'র তুলনায় বেশি লোকায়ত। ক্ষুদ্রাকার 'চাঁদনি'র সংলগ্ন একটি ঢাকা বারান্দা 'মুখশালা'র (ante-chamber) কাজ করত। এই শ্রেণীর কোন কোন মন্দির লিপিতে 'চাঁদনি' বা 'চান্দনি' কথাটি স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে।[৬৩] অপরপক্ষে, কোন কোন 'দালান' মন্দিরের লিপিতেও 'দালান' কথাটি আছে।[৬৪] আবার, আয়তন ও গঠনকৌশলের দিক থেকে এই দুটি যে পৃথক্ শৈলী (উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও), তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। 'চাঁদনি' শৈলীটির সঙ্গে গুপ্তযুগের সমতলছাদযুক্ত মন্দিরের সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হতে হয়।[৬৫] গুপ্তযুগের এই রীতির মন্দিরের সামনে যে সুন্দর কারুকার্যযুক্ত থামের ওপর ন্যস্ত মণ্ডপ লক্ষ্য করা যায়, শেষ মধ্যযুগের বাংলায় তার পরিবর্তে সুন্দর 'ইমারতি' থামের ওপর ন্যস্ত ঢাকা বারান্দা যুক্ত হয়ে মন্দিরটির সামগ্রিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। গুপ্তযুগে এইরূপ মন্দিরের ওপর 'শিখর' স্থাপনের প্রয়াস পরবর্তীকালে দেখা যায়।[৬৬] কাজেই বাংলায় এই 'চাঁদনি' মন্দির যে সুপ্রাচীন একটি মন্দিরশৈলীর বিবর্তিত রূপ, তাতে সন্দেহ নেই। সরসীকুমার

সরস্বতী গুপ্তযুগের সমতলছাদযুক্ত মন্দির সম্পর্কে বলেন, 'The simplest type may be seen in the small single celled flat roofed shrine with a shallow porch in front ....The ground plan of the sanctum is almost always a definite square, though a rectangular plan of the sanctum is also occasionally met with.... The flat roof, the plain square or rectangular form and the stern simplicity of the walls, all point to the rock-hewn cave as its proto-type.'[৬৭]

অন্ত-মধ্যযুগে বাংলার আঞ্চলিক মন্দিরস্থাপত্যে এইভাবে এক নতুন ধারার উদ্ভব হয়। এই ধারা যুগপৎ পাল-সেনপর্বের ঐতিহ্য ও বাঙালির লোকায়ত দেশজ স্থাপত্যশিল্পের সংমিশ্রণজাত, যে লোকায়ত দেশীয় স্থাপত্য 'চালা' এই অঞ্চলের মানুষের একান্ত আপন ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হল মুসলিম স্থাপত্যের কিছু কলাকৌশল। এই বিভিন্ন উৎস থেকে নেওয়া হল মন্দিরের নকশা, গঠনরীতি ও বাহ্যরূপ প্রাথমিক পর্যায়ে যার সমীকরণ চলল পনের শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষোল শতকের মধ্যে।[৬৮] যদিও 'চালা'-স্থাপত্য অনেক আগেই পূর্ণরূপ পেয়েছিল, কিন্তু 'দেউল', 'রত্ন' 'চাঁদনি' ও 'দালান'-শৈলীর উদ্ভব এই সময়েব মধ্যেই হয়েছিল অনুমান করা চলে, যার চরম উৎকর্ষ আঠার শতকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই 'দালান' বা 'চাঁদনি'র ওপর আর একটি 'চাঁদনি' বা 'দালান' স্থাপন করে 'দ্বিতল' 'দালান' বা দ্বিতল 'চাঁদনি' মন্দিরও কিছু কিছু নির্মিত হয়। উনিশ শতকের মধ্যে নবপর্যায়ের এই মন্দিরস্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত হয় আরও কোন কোন শৈলী যেগুলি সম্পূর্ণরূপেই এক-ক, কতকটা পাশ্চাত্যস্থাপত্যশৈলীর প্রভাবজাত। কোন কোন ক্ষেত্রে গির্জার চূড়ার মতো ক'রে 'রত্ন' স্থাপন (লাউজীউর মন্দির, ১৮৫১ মহানাদ, হুগলি) আবার, অন্য এক ধরনের আটকোণা ছত্রাকার দেউল (রাজরাজেশ্বর মন্দির,১৭৫৪, শিবনিবাস, নদীয়া)। বাংলাদেশে এইরূপ নানা শ্রেণীর মন্দির তৈরি হয়েছিল।[৬৯] এই মন্দিরগুলির শৈলী পূর্ব আলোচিত শৈলীগুলির কোনটির মধ্যেই পড়ে না। এগুলি বাঙালি স্থপতির নিজস্ব সৃষ্টি— য়ুরোপীয় ও ইসলামীয় স্থাপত্যের সংমিশ্রণ অথবা প্রভাবজাত। আঠার শতকের শেষাশেষি থেকে উনিশ শতকের দিকেই এগুলির বেশিরভাগ তৈরি হয় কিন্তু কখনই জনমনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাই প্রতিষ্ঠাতা ও কারিগর প্রচলিত শৈলীরই অসংখ্য মন্দির তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন। এই সঙ্গে তাঁরা যে অসংখ্য 'রাসমঞ্চ' ও 'দোলমঞ্চ' তৈরি করেন, সেগুলির মধ্যে একটি বিশেষ শৈলীর উদ্ভব হয়। রাসমঞ্চগুলির বেশির ভাগেরই 'রত্ন' ছিল 'বেহারীরসুনের মতো চূড়া যুক্ত। ম্যাক্‌কাচ্চন যাকে বলেছেন 'European baroque art'। বাংলার কোন কোন অঞ্চলের স্থপতিরা একে 'বেহারীরসুন চূড়া' বলেছেন। উচ্চ বেদির ওপর অবস্থিত চারদিক খোলা গোলাকার দালানের ওপর এই ধরনের কোন ক্ষেত্রে নয়টি, অথবা সতেরোটি বা পঁচিশটি চূড়া বসানো হোত। আবার প্রচলিত দেউলরত্ন বা আনুভূমিক খাঁজযুক্ত রত্নও বসানো হত। দোলমঞ্চগুলি ছিল সাদামাটা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি ছিল 'একরত্ন'।

নব পর্যায়ের বাংলার মন্দিরের সংখ্যা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ। বহু মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত ও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবুও, এখনও যা অবশিষ্ট বা অক্ষত আছে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। ষোল শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে নতুন শৈলীর মন্দিরগুলি সর্বাধিক নির্মিত হয়। একদিকে শ্রীচৈতন্যের নবপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে আপামর জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ-নিম্নের ভেদাভেদবোধ অনেকটা দূর হল এবং রাধাকৃষ্ণ-

উপাসনা প্রাধান্য লাভ করল, অন্যদিকে এই সময়ে রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এল, তার ফলে শুধুমাত্র অভিজাত রাজা-জমিদারের বদলে নতুন এক ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব হোল। এরা সমাজে তথাকথিত নিচু 'অজলচল' অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হলেও কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে এক নতুন ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি করল। পূর্বতন ভূস্বামী- জমিদারদের মতো এদেরও মন্দিরপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজে উচ্চশ্রেণীভুক্ত হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে বহু মন্দির নির্মিত হতে থাকল।[৭০] কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে মন্দিরের সংখ্যাধিক্য বা বিচিত্র ধরনের নানা মন্দির তৈরি হতে থাকলেও উৎকর্ষ ও গুণমানের দিক থেকে স্থপতিদের কারিগরী শক্তির দৈন্যই লক্ষ্য করা যায়। অত্যধিক সংখ্যা বৃদ্ধি ও নানা শ্রেণীর মন্দিরের আবির্ভাব, কিন্তু উৎকর্ষের ন্যূনতা নির্মীয়মান এই অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে ফুটে উঠছিল। কেননা, সমাজের বিত্তবান অভিজাতশ্রেণীরা ছাড়াও 'নবশাখ', 'অজলচল' এবং 'অন্ত্যজ' ধনীব্যক্তিরা মন্দিরপ্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এলেও তারা গতানুগতিক স্থাপত্যশৈলীর মন্দিরই বেশি প্রতিষ্ঠা করেছিল। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে উপরি উক্ত জাতিভুক্ত ব্যক্তিরা যেখানে 'শিখর', 'রত্ন' ও 'দালান'রীতির মন্দির নির্মাণেই বেশি আগ্রহী ছিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ,কায়স্থ ও বৈদ্য (যারা উচ্চ বর্ণের বলে পরিচিত) 'চালা'-রীতির মন্দির নির্মাণেই ছিলেন বেশি তৎপর।[৭১] মন্দির- অলংকরণের জন্য পৌরাণিক দেবদেবী-লীলাদৃশ্যের ফলক সংস্থাপনেই পূর্বোক্ত জাতিদের আগ্রহ ছিল বেশি। পক্ষান্তরে, অভিজাতশ্রেণীভুক্ত উচ্চবর্ণের ধনীরা পৌরাণিক দৃশ্যচিত্রের তুলনায় সামাজিক ঘটনাবলীর দৃশ্য রূপায়ণেই আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। এই দুই পরস্পর বিপরীতধর্মী মানসিকতা থেকে এটা স্পষ্ট, তদানীন্তন সমাজে নিম্নবর্গীয় ব্যক্তিদের মধ্যে 'সংস্কৃতায়ন পদ্ধতি' (Sanskritization) কাজ করছিল। তাঁরা মন্দিরনির্মাণে ঐতিহ্যানুসারী স্থাপত্য ও অলঙ্করণ-বিন্যাসের পরিপোষকতা করে উচ্চবর্গে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কারণ, তৎকালীন সমাজে মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করা যেত এই ধরনের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। (যেমন, এখনকার অর্থাৎ বিশশতকের শেষ ভাগের সমাজে অর্থকৌলীন্য এবং রাজনীতিক মতাদর্শই আভিজাত্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে হীনব্যক্তিরাও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠছে)। পক্ষান্তরে, উচ্চ বর্ণের ধনী জমিদারশ্রেণী সমাজের সাধারণ মানুষের আরও কাছে আসতে চাইছিলেন। 'চালা' শৈলী এবং অলঙ্করণের জন্য সমসাময়িক ঘটনাবলীর চিত্ররূপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে। এঁরা স্থাপত্য ও মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, এঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলোতে য়ুরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব পড়েছে এবং টেরাকোটায় সমকালীন চিত্রের মধ্যে য়ুরোপীয়দের উপস্থিতি বেশি নজরে পড়েছে। এর একটি দৃষ্টান্ত হোল, মহিষাদল-রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে লুপ্ত রাসমঞ্চ যার চূড়াগুলি গির্জার চূড়ার অনুসরণে তৈরি হয়েছিল। সেকালে সামান্য অবস্থা থেকে ধনী হয়ে উঠলে 'দালান' বা উচ্চ শিখরযুক্ত 'রত্ন'-মন্দির প্রতিষ্ঠা একটা সামাজিক প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়। প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ার পর বিশাল দুর্গাদালান বা চণ্ডীমণ্ডপে মহাসমারোহে দুর্গা বা কালীপূজা করার মধ্যে ভক্তির প্রকাশ যতটা না ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল আড়ম্বর ঐশ্বর্য প্রকাশের চেষ্টা। এইভাবে সমগ্র বাংলায় অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন জঙ্গল মহালের অন্তর্গত

তদানীন্তন মল্লভূমের রাজারা। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মন্দিরস্থাপত্য ও বিস্ময়কর 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণের সৃষ্টি ক'রে মল্লরাজারা যে এবিষয়ে অগ্রণী হয়ে উঠেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র তাঁদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে নবপর্যায়ের প্রায় সব রীতির মন্দিরই তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন নি, বিষ্ণুপুরের বাইরে বহু স্থানেও 'রত্ন'-শৈলীর অনেক মন্দির তাঁরা তৈরি করান। এর কয়েকটির নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরেব 'গড়' এলাকায় শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩), কেষ্টরায়ের জোড়বাংলা (১৬৫৫) এবং শাঁখারীপাড়ায় মদনমোহনের 'একরত্ন' মন্দির (১৬৯৪) ইঁটের 'টেরাকোটা'-অলংকরণে সমৃদ্ধ মন্দিবরূপে এখনও 'ক্ল্যাসিক' দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এছাড়া 'জোড়বাংলা'র পার্শ্ববর্তী রাধাশ্যামের পাথরের 'একরত্ন' (১৭৩৮) স্থাপত্য ও প্রস্তরভাস্কর্যের ক্ষেত্রে একটি অনবদ্য রচনা। লালবাঁধ অঞ্চলের 'একরত্ন'গুলি পবিছন্ন সৌন্দর্যের প্রতীক। পূর্বোক্ত ইঁটের মন্দিরগুলির 'টেরাকোটা'ফলকের কোন কোন 'মোটিফ', যেমন 'রাসমণ্ডলচক্র', ফলকের চারপাশের সূক্ষ্ম নকশা পার্শ্ববর্তী হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর অঞ্চলের মন্দির-অলংকরণের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এব প্রমাণ নানা স্থানের মন্দিবে পাওযা গেছে। বিষ্ণুপুরের সুবিশাল রাসমঞ্চ একটি একক ও অনন্য স্থাপত্য। মল্লরাজগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম নব বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে বাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এইসব মন্দির উৎসর্গ কবেন। হিংসা পরিত্যাগ করে তাঁরা অহিংসাব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করেন। কিন্তু তার আগে তাঁরা নিষ্ঠুর দস্যুবৃত্তিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। কারণ, বৃন্দাবন থেকে শ্রীজীব গোস্বামী-প্রেরিত গাড়িতে যেসব অমূল্য বৈষ্ণবপুঁথি বাংলাদেশে আসছিল, বীরহাম্বির সেগুলি ধন মনে ক'রে অপহরণ করেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। সুবিখ্যাত রাসমঞ্চটি তাঁরই কীর্তি। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, সেসময় জঙ্গল-অধ্যুষিত এই অঞ্চলে মল্লভূমের অধিপতিরা কিরূপ প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মন্দির-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁরা সমাজে কতখানি মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠেন। মল্লভূম তথা বিষ্ণুপুরের উৎকৃষ্ট মন্দির-সৌধগুলি বাংলায় নবপর্যায়ের মন্দিরচর্চার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হয়ে আছে। ষোড়শ শতকের শেষদিকে কিছু কিছু দেউল ও 'রত্ন'-মন্দির (যেমন হুগলিব বৈঁচিগ্রাম' (১৫৮০ খ্রি.), বর্ধমানের বৈদ্যপুর (১৫৯৮), মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ (১৫৮৮) নির্মিত হলেও বিষ্ণুপুরের 'রত্ন' ও 'জোড়বাংলা' মন্দিব সমগ্র বাংলায অনন্য। অতএব সতের শতকেই 'বত্ন' ও 'চালা'-শৈলীর মন্দির যে চরম উৎকর্ষে উপনীত হয়েছিল, এগুলি তারই সাক্ষ্য দেয়।

সতের শতকে মল্লভূমের রাজাদের হাতে 'রত্ন'-মন্দিরগুলি যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল এবং আঠার শতকে আবও যে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়, সেগুলির আদর্শ ছিল মল্লভূম-বিষ্ণুপুরের এই মন্দিরগুলি। কিন্তু কোনটিই এগুলির সমকক্ষ হতে পারে নি। বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত দিনাজপুরের জমিদার প্রাণনাথ আঠার শতকের গোড়ার দিকে তাঁর বাজধানী কান্তনগরে যে 'নবরত্ন' মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু করেন, সেটি তাঁর পুত্র রামনাথ ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন।[৭২] স্থাপত্য ও 'টেরাকোটা' সমাবেশের দিক থেকে এটি বিষ্ণুপুরের পূর্বোক্ত কোন কোনটির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। অবশ্য বহু কাল আগে এই কান্তজীউর মন্দিরের রত্নগুলি ভেঙে গেছে। জে. ফার্গুসনের *'হিস্টরি অভ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ আরকিটেকচার'* গ্রন্থে নয়টি 'রত্ন'সহ এই মন্দিরেব একটি চিত্র দেওয়া আছে। (দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থ প্লেট নং ৩৫৪ এবং জর্জ মিশেল সম্পাদিত 'ব্রিক

টেম্পলস্ অভ বেঙ্গল' গ্রন্থের (১৯৮৩) প্লেট নং ৬০৫ ও ৬০৬)। ঐ শতকের মাঝামাঝি সময় বর্ধমান রাজপরিবার বেশ কয়েকটি মন্দির তাঁদের রাজ্যের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে কালনার (বর্ধমান) মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে অন্তত তিনটি 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির আছে। বর্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্র কালনায় একশ আটটি শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন এবং চন্দ্রকোণার (মেদিনীপুর) রঘুনাথবাড়ি(অযোধ্যা) ও মল্লেশ্বরমন্দিরের (মল্লেশ্বরপুর) সংস্কার করেন। আঠার শতকে অপর উল্লেখযোগ্য রাজা নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলোতে বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের এক নতুন শৈলীর উদ্ভব হয়। শিবনিবাস ও গঙ্গাবাসে . মন্দিরগুলোতে টেরাকোটা-অলংকরণবর্জিত হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, যদিও কৃষ্ণচন্দ্রেব পূর্বপুরুষ রাজা রাঘব নদীয়ার দিগনগরে রাঘবেশ্বরের 'চারচালা'মন্দিরে (১৬৬৯) 'টেরাকোটা'র সুন্দর সমাবেশ করেন। রাজা রুদ্ররায়-প্রতিষ্ঠিত মাটিয়ারীর রুদ্রেশ্বরের 'চারচালা'তেও অলংকরণ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার এই নবপর্যায়ের মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কে পরিশেষে একটা কথা বলা যায়, আলোচিত স্থাপত্যশৈলীর আবার অঞ্চলবিশেষে একই কালে কিছু রূপান্তর লক্ষ্য করা গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'চারচালা'-রীতির মন্দির অঞ্চলবিশেষে প্রশস্ত ঢালু চালের পরিবর্তে খাড়া চালের সৃষ্টি করেছে, মাথাটা হয়ে গেছে অনেকটা সরু। হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে যেমন সুদৃশ্য প্রশস্ত ঢালু চাল ও বক্র কার্নিশ চারচালায় বা আটচালায লক্ষ্য করা গেছে, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ায় তেমনটি পাওয়া যায় না, পরিবর্তে খাড়া চালই বেশি চোখে পড়ে, যেমন, দিগনগর, মাটিয়ারি, জলেশ্বর(শান্তিপুর, নদীয়া), গোকর্ণ, বড়নগর(মুর্শিদাবাদ)। আবার, নদীয়া জেলার পালপাড়ায় একটি প্রশস্ত ঢালু চালের সুদৃশ্য বৃহৎ 'চারচালা'ও লক্ষ্য করা যায়। এগুলি প্রায় সবই সতের শতকে তৈবি হয়। দেউলের ক্ষেত্রে 'শিখর' প্রকৃত শিখরেব মতো না হয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় গম্বুজাকৃতি হয়ে গেছে, বহিঃপ্রাচীরে অনেক সময় উদ্‌গত করা হয়েছে আনুভূমিক খাজ। নানা স্থানে এ ধরনেরও বহু মন্দির লক্ষ্য করা গেছে। দেউলের শিখর আবার অনেকসময় 'চালা'র রূপ নিয়েছে। এর কারণ, বিশেষ ক'রে 'চালা'র ক্ষেত্রে, বাংলার বিভিন্ন স্থানে একই কালে চালাকুটিরের রূপ স্থানীয়ভাবে অন্যান্য অঞ্চলের থেকে কিছুটা পৃথক ছিল। 'চালা'-শৈলীতে সেই কারিগরী কৌশলই লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে কবা যায়, নির্দিষ্ট রূপগুলিব কোন সময় যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় পশ্চাতে যেমন অনেক সময় সূক্ষ্ম কারিগরী দক্ষতার অভাব ছিল, তেমন মন্দিরদাতাব ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট শৈলীর কোন কোনটির কিছুটা রূপান্তর ঘটেছিল। বস্তুতপক্ষে, চালা, রত্ন, দেউল, দালান ও চাঁদনি— এই পাঁচটি নির্দিষ্ট শৈলীর মন্দির অসংখ্য নির্মিত হলেও আরও অনেক শ্রেণীভেদ অঞ্চল ও কালভেদে উদ্ভূত হয়।

৫

মধ্যযুগে 'টেরাকোটা'-শিল্পের নতুন ধারা

'মৃৎফলক-কলা' বা 'টেরাকোটা'-শিল্প বলতে প্রধানত মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পই অভিপ্রেত। অবশ্য, মসজিদ-গাত্রে 'টেরাকোটা'-বিন্যাস লক্ষ্য করা গেলেও তা ফুল, লতাপাতার প্রতিকৃতি বা

নকশা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুলতানী আমলে কোন কোন মসজিদ বা মাজারে কিছু কিছু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিফলক লক্ষ্য করা গেলেও আসলে সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন মন্দিরের অংশবিশেষ। পক্ষান্তরে, মধ্যযুগের বাংলায়, বিশেষত, শেষ-মধ্যযুগে (খ্রি. ষোল শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত), মন্দির-গাত্রে টেরাকোটার যে অভাবনীয় প্রাচুর্যের সমাবেশ ঘটেছিল, তা বৈচিত্র্য ও শৈল্পিক সুষমার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। মন্দিরাশ্রিত এই 'টেরাকোটা'-শিল্পের আকার, প্রকার ও রীতি-নীতি প্রাচীন বাংলার 'টেরাকোটা'র থেকে যে বহুলাংশে ভিন্নধর্মী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও এর সূচনার পূর্বাভাস পাল-যুগের মাঝামাঝি সময় থেকেই (খ্রি. অষ্টম-নবম শতক) দেখা যেতে থাকে পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ও ময়নামতীর (স্থানগুলি সবই বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত) ধ্বংসাবশেষ থেকে। কিন্তু সে শুধু সূচনামাত্র। প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলার মন্দির-টেরাকোটা সম্পর্কে বিস্তৃত আরও কিছু জানার সুযোগ আমাদের আর নেই।

মধ্যযুগে বাংলার মন্দিরাশ্রিত 'টেরাকোটা'-শিল্পে যে এক নতুন ধারার সূচনা ও বিকাশ ঘটে, যাকে আমরা স্বাধীন, স্বচ্ছ ও লোকায়ত শিল্প বলতে পারি, তার পূর্বাভাস পূর্বোক্ত স্থানে পাওয়া গেলেও সুদীর্ঘকাল এই শিল্পের বিকাশধারার গতিপথ কোন এক অজ্ঞাতকারণে রুদ্ধ হয়ে যায়। কোন কোন শিল্পসমালোচক এর কারণরূপে সেন-যুগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শাস্ত্রানুসারী শিল্পচর্চাকে উল্লেখ করে থাকেন। কেননা, পাল-সেন পর্বে বা এই দুই রাজন্যবর্গের শাসনাধিকারকালে বাংলায় যে সব ইঁটের মন্দির তৈরি হয়, সেগুলিতে (অন্তত এখনও যেগুলি অস্তিত্ব রক্ষা করে আছে) মূর্তিবিন্যাস অল্প হলেও প্রাচীন শিল্প শাস্ত্রানুমোদিত অলংকরণবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, এগুলির প্রায় সবই বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির। যেমন, বহুলাড়া ও সোনাতপল (বাঁকুড়া) এবং সাতদেউলিয়া (বর্ধমান), দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জটা— যেগুলিতে মূর্তির চেয়ে ফুল, লতাপাতার নকশাই বেশি। অবশ্য, এই সম্প্রদায়ের মন্দিরে মূর্তিসন্নিবেশের অবকাশ একপ্রকার নেই বললেই চলে।

শাস্ত্রানুমোদিত বা প্রাচীন ভারতের শিল্পশাস্ত্রসম্মত প্রস্তরভাস্কর্য ও টেরাকোটাশিল্প খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু হয়ে খ্রিস্টোত্তর দ্বিতীয় শতকে শক-কুষাণ যুগে যে পরিণতি লাভ করে ও বিশেষ এক শৈলীব সৃষ্টি করে, তা সর্বভারতীয় শিল্পাদর্শরূপে পরিগণিত হয়। গুপ্তযুগে এই শিল্পে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং শিল্পাদর্শরূপে উত্তরভারত তথা বাংলায় গৃহীত হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাংলার আঞ্চলিক কোন শিল্পরীতি গড়ে ওঠেনি, যদিও বিক্ষিপ্তভাবে পশ্চিমবাংলার তমলুক, পান্না (মেদিনীপুর), চন্দ্রকেতুগড় (উত্তর চব্বিশ পরগনা) এবং কর্ণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদ) ধ্বংসাবশেষ থেকে পোড়ামাটির কিছু কিছু মূর্তিফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত গুপ্ত শিল্পাদর্শের ছায়াপাত ঘটেছে দেখা যায়। সেই খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে অষ্টম-নবম শতক পর্যন্ত তখনও বাংলার কোন আঞ্চলিক শিল্পাদর্শ গড়ে ওঠেনি। উত্তরভারতের সর্বভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের মতো সর্বভারতীয় এক শিল্পাদর্শ বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রচলিত ছিল। উপরি উক্ত স্থানগুলিতে এদের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

তবে প্রস্তরভাস্কর্যের মতো মৃৎফলকশিল্প প্রাচীন বাংলায় বিশেষ অভিজাত মর্যাদা লাভ করেনি। এটা ছিল 'প্রাকৃত স্তরের শিল্প'। এই শিল্প ছিল অপভ্রংশ-পংক্তির শিল্প। অভিজাত সংস্কৃত স্তরের শিল্পের সঙ্গে একাসনে এর স্থান নেই, শিল্পশাস্ত্রেও নেই। 'জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সৃজনক্রিয়ার এই সব নিদর্শন উচ্চ কোটি ও সংস্কৃত শিল্পসাধনার নিপুণতর নিদর্শনের পাশে কোথাও দাঁড়াইবার

সুযোগ পায় নাই.....'। এই শিল্প রায়ের মতে 'জনসাধারণের লোকায়ত জীবনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ও ময়নামতীর বিহারগাত্রে এই শিল্পের যে নিদর্শনগুলি লক্ষ্য করা গেছে, তাতে এই শিল্পের এক নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

কিন্তু কি ছিল এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য? নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এই টেরাকোটা-শিল্পের সাবলীল গতিময়তা, স্বচ্ছন্দ প্রাণপ্রবাহ এবং প্রত্যক্ষগোচর দৈনন্দিন জীবনের সমৃদ্ধ বস্তুময়তা লোকায়ত শিল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রকাশ করেছে। দৈনন্দিন জীবনের যে সাধারণ ছবিগুলি আমরা এর মধ্যে পাই, তা হল, লাঙ্গল নিয়ে চাষী, গৃহপ্রবেশরতা নারী, মৎস্যবহনরতা ও মৎস্যকর্তনরতা নারী, কূপে জল আহরণরতা ও জলপাত্রবাহিনী নাবী, স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধা, শিকারবহনরতা ব্যাধ, ধর্মাচরণরত ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক, অস্থিচর্মসার সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক, মল্লবীর, মোরগ ও ষাঁড়ের লড়াই, দ্বারপাল ইত্যাদি। দেব-দেবী মূর্তিগুলির মধ্যে বেশি আছেন শিব, এবপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ। বৌদ্ধ দেব-দেবীর মধ্যে মহাযান-বজ্রযানবর্গের বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা। কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত দেব-দেবী প্রায় নগণ্য। এই সব মূর্তির মধ্যে (টেরাকোটা-ফলক) মার্জিত রুচি, কারুকার্যের সূক্ষ্মতা বা গভীর ব্যঞ্জনার প্রকাশ ততটা নেই, যতটা আছে এদের সাবলীল গতিচ্ছন্দ, সজীব প্রাণের স্পর্শ, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীব আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে শিল্পীকুলের গভীর সচেতন দৃষ্টি। নীহাররঞ্জন রায় একেই প্রথাবদ্ধ প্রতিমাশিল্পেব চেয়ে লৌকিক শিল্প বলে মনে করেন। এটি বাংলার একান্ত নিজস্ব শিল্প, যা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। এই শিল্পকৃতির কয়েকটি নিদর্শন আমরা কলকাতার 'আশুতোষ চিত্রশালা'য় লক্ষ্য করি। টেরাকোটা-ফলকগুলির আকার বেশ বড় (অনেক ক্ষেত্রে ১ ফুট x ১ ফুট)। 'রিলিফে' খোদিত পার্শ্ব চিত্রগুলির প্রতিটিতে দেশজ লোকায়ত ভাব-গম্ভীর প্রকাশ বেশিমাত্রায় এগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের এই ফলকগুলি সম্ভবত তারও আগে কোন ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগাত্রে সন্নিবেশিত হয়েছিল। পরে মন্দিবটি ধ্বংস হয়ে গেলে ঐ মন্দিরের বহু ফলক (এর মধ্যে প্রস্তর ফলকও আছে) পালসম্রাট ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত অষ্টম শতকের মধ্যভাগে নির্মিত ঐ বিহাবে স্থাপিত হয়। সরসী কুমার সরস্বতী এই মূর্তিফলকের তিনটি শ্রেণী লক্ষ্য করেছেন। সেগুলিকে তিনি যথাক্রমে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতকে বাংলার শৈলীর বিবর্তন বলে মনে করেন। তাঁর মতে প্রথম দুটি শ্রেণীতে গুপ্ত শিল্পধারার এক ধরনেব রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর মূর্তিগুলিতে খাঁটি দেশজ বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

এই তৃতীয় বিভাগ বা ধারার অন্তর্ভুক্ত 'বাস-রিলিফে' (Bas-Relief) খোদিত মূর্তিফলকেব অনেকগুলি ক্ষয়ে গেছে, কোন কোনটি ঠিকমতো বোঝা যায় না। এতে পৌরাণিক কৃষ্ণকথা ও রামায়ণের রামকথার অনেক চিত্র পাওয়া যায়, যেমন, দেবকী কর্তৃক নবজাতক কৃষ্ণকে বসুদেবেব কাছে সমর্পণ, কংসের কারাগার থেকে বালকৃষ্ণকে বসুদেবেব বহন, বালকৃষ্ণের ননী ভক্ষণ, রাখাল বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের ক্রীড়া, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের রাসক্রীড়া, কৃষ্ণ কর্তৃক প্রলম্বাসুববধ ইত্যাদি। আবার রামায়ণকাহিনীর মধ্যে রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণে রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ, ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি।

কিন্তু এই শ্রেণীভুক্ত মূর্তিগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও সংযত পরিমিতি না থাকলেও এগুলির মধ্যে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হতে শুরু হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত গুপ্তযুগে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য বাংলাব ভাস্কর্যে অনুসৃত হওয়া প্রথাগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উত্তর-ভারতের

অন্যান্য স্থানে গুপ্তযুগে প্রবর্তিত ভাস্কর্যরীতি অনুসৃত হত। কিন্তু বাংলায় খ্রি. সপ্তম শতকের শেষ বা অষ্টম শতকের গোড়া থেকে ভাস্কর্যশিল্পে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ক্রমশ প্রকট হচ্ছিল এবং একটি পৃথক শৈলী সেন-রাজাদের রাজত্বকালের শেষ বা মুসলমানবিজয়ের আগে পর্যন্ত (খ্রি. দ্বাদশ শতক পর্যন্ত) প্রচলিত হয়েছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে শুরু হয়ে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পাল-সেন শাসনাধিকারের পুরো সময় ধরে এর বিকাশপর্ব চলেছিল অনুমান করা যায়। কিন্তু এই এক নির্দিষ্ট 'বাংলা শৈলী'র নিদর্শন পূর্বোক্ত পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থান ছাড়া আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কারও কারও মতে 'এই প্রাচীন শিল্প মুসলমানেরা মঠগুলোকে বিনষ্ট করার বহু আগেই সম্ভবত লুপ্ত হয়েছিল (একাদশ শতকের পাহাড়পুর মন্দিরের সংস্কারকার্য থেকে দেখা যায়, নতুন ফলক আর সুলভ নয়) এবং প্রাক-মুসলিম যে সমস্ত হিন্দু বা জৈন মন্দির এখনও টিকে আছে, তার কোনটিতেই অন্তত এর হদিশ মেলে না' — এগুলোকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে খোদাই করা ইটে প্লাস্টারের (স্টাকোব) সাহায্যে অলঙ্কৃত করা হয়। আবার কারও কারও ধারণা, পাহাড়পুর বা ময়নামতীর বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত টেরাকোটা ফলকগুলির মত এ ধরনের শিল্পের বেশ কিছুকাল পরেও আর কোন মন্দির বা বিহারে লক্ষ্য করা যায়নি, প্রতিমা শিল্প-শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসনের ফলে দীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন শৈলীই পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছিল।

খ্রি. তের শতকের শুরুতে মুসলমানবিজয় ও পরবর্তী দীর্ঘ তিন শতক ধরে ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও মসজিদ-স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ফলে মন্দির স্থাপত্য ও মন্দিরাশ্রিত 'টেরাকোটা'-শিল্পের বিকাশের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। সুলতানী শাসনের শেষ পর্যায়ে বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের যে নতুন করে অভ্যুদয় ঘটল, ('ইতিহাস অনুসন্ধানের ১৩' সংখ্যায় বাঙালির স্থাপত্যচর্চা শীর্ষক বর্তমান লেখকের নিবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে)। তার সঙ্গে মন্দিরাশ্রিত 'টেরাকোটা'-শিল্পেরও এক নতুন ধারার পত্তন হল। খ্রি. অষ্টম-নবম শতকের পর এই দীর্ঘ বিরতি টেরাকোটা শিল্পের রূপ ও চরিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। খ্রিস্টীয় পনের শতক থেকে মন্দির স্থাপত্যের যে নতুন শৈলী, যাকে 'বাংলা-শৈলী' বলা যায়, তার সঙ্গে যেন সামঞ্জস্য রেখে টেরাকোটা শিল্পের একটি নতুন ধারা জন্মলাভ করল। নবপর্যায়ের এই মন্দির-স্থাপত্য ও টেরাকোটা-অলংকরণের উদ্ভব ও বিকাশ বাংলায় শেষ-মধ্যযুগের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই শিল্পসৃষ্টির পশ্চাতে সে-যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ও ইসলামীয় ধর্মীয় অনুশাসনের বিধি-নিষেধের বেড়াজাল তখন অনেকটা দূরীভূত। রাজশক্তি তখন রাজনৈতিক সংকীর্ণতা থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে সাহিত্য ও শিল্পের পুনরুজ্জীবনে বাধা সৃষ্টি থেকে বিরত হতে পেরেছে। অন্যদিকে, লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যগাথা সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করায় কবিরা জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্যগুলি রচনা করতে শুরু করেছেন। রামকথা, ভাবতকথা অবলম্বনে রামায়ণ ও মহাভারতের মতো জনপ্রিয় পাঁচালি কাব্যগুলি যেমন এ যুগে রচিত হচ্ছিল, তেমনি পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে কৃষ্ণমঙ্গল, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-জাতীয় কাব্যও রচিত হয়েছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যে সমৃদ্ধি, তা এ-যুগের বাঙালি-মানসের সৃষ্টিকর্মের এক মহান অবদান। এরপর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাঙালি জাতিকে এনে দিল নতুন প্রাণ, বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিল প্রেমভক্তির বাণী। নতুন করে বাংলাসাহিত্য সৃষ্ট হল, যা পরিণত হয় সুললিত কান্তকোমল পদাবলী সাহিত্যে। বলা বাহুল্য, এই সব কিছু মন্দির-শিল্পীদের প্রেরণার কাজ করেছিল।

খ্রি. পনের শতকে তৈরি দু-একটি 'চালা'শৈলীর মন্দির (গৌড়ে তথাকথিত ফৎ খানের 'দোচালা' সমাধি যা পূর্বে একটি হিন্দুমন্দির ছিল বলে বলা হয় এবং ঘাটাল কোন্নগরের (মেদিনীপুর) সিংহবাহিনীর 'চারচালা' (১৪৯০ খ্রি.) সাক্ষ্য দেয় যে, এই ধরনের মন্দির আরও কিছুকাল আগে থেকেই তৈরি হতে শুরু করেছিল। কিন্তু তখনও টেরাকোটা, মন্দিরসজ্জার অঙ্গরূপে প্রচলিত হয়নি। অবশ্য, মসজিদগাত্রের টেরাকোটা ফলকে ফুল লতা-পাতার নকশা অনেক আগেই স্থান পেতে থাকে। মন্দিরগাত্রেও এই ধরনের বহু নকশাফলক স্থান পেয়েছিল। মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা-অলংকরণের আদিপর্বে এই ধরনের নকশাফলক মূর্তির বদলে প্রথমে স্থান পেতে থাকে। পূর্বোক্ত কোন্নগরের 'চারচালা'য় আমরা এই ধরনের প্রাচীন নকশাফলক লক্ষ্য করেছি। অবশ্য, এর সঙ্গে দুএকটি কৃষ্ণমূর্তিও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে খ্রি. ষোল শতকের শেষদিকে টেরাকোটা মূর্তিফলক অল্প সংখ্যায় কোন কোন মন্দিরে স্থান পেতে থাকে। কিন্তু তখনও নকশার প্রাধান্য খর্ব হয়ে যায়নি। দৃষ্টান্ত, হুগলির বৈঁচিগ্রাম (গোপালজীউ), মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ (নৃসিংহদেব) এবং বর্ধমানের বৈদ্যপুর (শ্রীকৃষ্ণ)। প্রায় এই সময়কার ছিল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের 'রাসমঞ্চ'। পরীক্ষামূলকভাবে এই অগভীরভাবে খোদিত টেরাকোটা ফলকগুলো বসানো হয়েছিল বলে মনে হয়। বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চে কীর্তনের যে কয়েকটি ফলক পাই, সেগুলিও কতকটা এই ধরনের— এর মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল নব প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্মের সুদূরপ্রসারী প্রভাব, যা আরও পরবর্তীকালে টেরাকোটা-অলংকরণের বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ।

মধ্যযুগে নবপর্যায়ের এই টেরাকোটা-শিল্পের উদ্ভবের পশ্চাতে এই যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কথা উল্লেখ করা হল, তা প্রাচীন বাংলার তুলনায় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিক। এই টেরাকোটা-শিল্পের মধ্যে লোকায়ত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল। 'গ্রাম্য কৃষিজীবী জনসাধারণের ভাব ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ' দেশীয় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, মঙ্গলকাব্য, বারমাস্যা, গীতিগাথা, পদাবলীতে দেশ ও জাতির যে মর্মবাণী ব্যক্ত হয়েছিল, তারই প্রতিধ্বনি ইঁটের তৈরি মন্দিরের অসংখ্য টেরাকোটা ফলকে যেন শুনতে পাওয়া যায়। আজও সেগুলি বাংলার পল্লীর আনাচে-কানাচে বা কোন কোন শহরাঞ্চলে সে যুগের মানুষের ভাব ও চিন্তার পরিচয় বহন করছে।

টেরাকোটা-শিল্পের এই নতুন ধারা জন্ম নিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সামাজিক প্রেক্ষাপটে। প্রকার ও প্রকৃতিতে এর ভিন্নভাবে রূপায়ণ ঘটল। টেরাকোটা-শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলেন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও বিভিন্ন মঙ্গল ও পাঁচালি কাব্যের কথকতা, যাত্রা পালাগান শ্রবণ ও দর্শন ক'রে। তাঁরা প্রথাবদ্ধ শিক্ষায় তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট 'টেরাকোটা' মূর্তি ফলকসমূহে চিন্তা ও মননশীলতার অসাধারণ ব্যাপ্তি বিস্ময় সৃষ্টি করে। সর্বোপরি, সমসাময়িক বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের মহাপ্লাবন তাদের মানসলোককে এক উচ্চ ভাবধারায় অভিষিঞ্চিত করেছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাদের সামনে উজ্জ্বল দীপবর্তিকার মত বিরাজমান ছিলেন। অসংখ্য 'টেরাকোটা' মূর্তিফলকে যে ছবিগুলি তাঁরা অঙ্কিত করেছিলেন, তার মধ্যে গ্রাম্য লোকায়ত জীবনযাত্রার সঙ্গে সমকালীন লোকধর্ম বৈষ্ণব ভক্তিবাদের এক সমন্বয় ঘটেছিল।

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় লক্ষ্য করা গেছে যে, খ্রি. পনের-ষোল শতকের ইঁটের মন্দিরে টেরাকোটা মূর্তি-ভাস্কর্যের তেমন প্রচলন ঘটেনি। শুধুমাত্র পুরানো ধাঁচের কিছু কিছু কাল্পনিক

লতা-পাতা ও ফুলের নকশা (যে নকশাগুলি সুলতানী আমলের কোন কোন মসজিদে লক্ষ্য করা গেছে) ও টেরাকোটা [illegible] তার সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে দুচারটি মূর্তি, যেমন, মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মন্দিরের সামনের দিকে, বিশেষ করে খিলান-প্রবেশপথের ওপরে স্থাপন করা হত। ষোল শতকের একেবারে শেষের দিকে সংকীর্তনদৃশ্যের ফলক স্বল্প সংখ্যায় সন্নিবেশিত হতে থাকে (উদাহরণ, বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ)। এরপর সতের শতক থেকে টেরাকোটামূর্তি মন্দিরের অলংকরণরূপে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সতের শতককে 'টেরাকোটা'-শিল্পের 'স্বর্ণযুগ' বলা যায়। এই সময়ে বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় (১৬৪৩), কেষ্টরায় (১৬৫৫), মদনমোহন (১৬৯৪), বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্তবাসুদেব (১৬৭৯) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মানের মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। এগুলির দেওয়াল অসংখ্য টেরাকোটা-ফলকে অলঙ্কৃত করা হয়। এছাড়া গ্রাম-বাংলার নির্জন প্রান্তে কত শত মন্দির যে এই শতকে তৈরি হয় তার সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও গাঙ্গেয় উপত্যকা সন্নিহিত স্থানসমূহে নরম পলিমাটিতে গড়া অসংখ্য টেরাকোটা-ফলক মন্দির-অলংকরণের জন্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। আঠার ও উনিশ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে এই টেরাকোটা-ফলকের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সতের শতক, এমনকি, আঠার শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত টেরাকোটা-ফলকগুলি ক্ষুদ্রায়তন ও সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত ছিল। মূর্তিগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছাঁচে তৈরি হলেও শিল্পীর নিপুণ হস্তে তা ত্রিমাত্রিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। এগুলির প্রায় সবই পার্শ্বচিত্র, 'বাস-রিলিফে' খোদাই করা, আয়ত বা বর্গক্ষেত্রাকার ফলকের চারপাশে সূক্ষ্ম নকশা-কাটা (শ্যামরায়, অনন্তবাসুদেব, মদনমোহন)। এক সামগ্রিক সৌন্দর্য এই সময়ের ফলকগুলিতে রূপায়িত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে আর দেখা যায় না।

নবপর্যায়ের এই 'টেরাকোটা'-মূর্তিসজ্জার বিষয় ও সংস্থান পদ্ধতির জন্য সাধারণভাবে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা হত। বিষয়বস্তুকে মোট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে— রাম-কাহিনী ও মহাভারত-উপাখ্যান, কৃষ্ণলীলা ও সামাজিক। এছাড়া, পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি-সন্নিবেশও লক্ষ্য করা যায়। লক্ষণীয়, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমনকি শিবের মন্দিরে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পারিষদবর্গের সংকীর্তন দৃশ্যফলক বিপুল সংখ্যায় বসানো হয়। রাম-কাহিনীর মধ্যে আবার কয়েকটি ঘটনা, যেমন, সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন, মারীচবধ, সীতাহরণ ও জটায়ু, লঙ্কাযুদ্ধ, রাম-রাবণের মুখোমুখি সংঘর্ষ, রামরাজা টেরাকোটা-'মোটিফ'রূপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং টেরাকোটাসজ্জিত প্রায় প্রতিটি মন্দিরে পাওয়া যায়। মহাভারত-কাহিনী রামকথার মতো [illegible] শিল্পীদের কাছে ততটা জনপ্রিয় হয়নি। কারণ, এর দৃশ্যফলক খুব কমই পাওয়া [illegible], মহাভারতের জনপ্রিয় 'মোটিফ' কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা। মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণের জনপ্রিয়তা এত বেশি যে, মহাভারতের অন্য কাহিনী তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। কৃষ্ণলীলার অসংখ্য ফলক সতের-আঠার শতকের মন্দিরে অজস্র পাওয়া যায়। তবে বাল্যলীলার থেকে শ্রীকৃষ্ণের গোপীবিলাস বিশেষ গুরুত্ব পায়। বাল্যলীলার মধ্যে ননীচুরি, কালীয়দমন, শকটাসুর তৃণবর্তাসুরবধ অনেক মন্দিরে দেখা গেলেও বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাসদৃশ্য প্রায় মন্দিরেই লক্ষ্য করা গেছে। এই কালের টেরাকোটা ফলকে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তির চেয়ে তাঁর দশাবতার মূর্তি বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু দশাবতারের অন্যতম বুদ্ধের বদলে জগন্নাথ বা কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের মূর্তি পাওয়া যায়। আর প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ দেব-দেবীর যে মূর্তি-ফলক পাওয়া

যায়, এইকালে তা একেবারেই বিস্মৃত। পক্ষান্তরে, শিব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রায় সব মন্দিরেই উপস্থিত। 'শিববিবাহ' একটি জনপ্রিয় 'মোটিফ'রূপে বহু মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে, বিশেষ করে আঠার-উনিশ শতকের মন্দিরে। লৌকিক দেবীর মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের 'কমলে-কামিনী'কে ধনপতি ও শ্রীপতির দুদিকে নৌকাযাত্রার মাঝখানে দেখানো হয়েছে।

সমাজজীবনের বিভিন্ন দৃশ্য এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর মধ্যে রাজা বা জমিদারের শিকারযাত্রা, যুদ্ধদৃশ্য, অপরাধীর শাস্তির জন্য হিংস্র জন্তুর মুখে নিক্ষেপ, হার্মাদদস্যু-রণতরী ও যুদ্ধজাহাজ, তামাকুসেবী বাবু, সাধু-সন্ন্যাসী, মোহান্ত, মুঘল-পাঠানসেনার যুদ্ধযাত্রা ও কুচকাওয়াজ, ফিরিঙ্গিসেনা, মিথুনদৃশ্য, ভালুকনাচ, বাজিকর, চড়কদৃশ্য, মহিলার শিব পূজা, হরিণশিকার, ঝাম্পানে জমিদারের গমন, য়ুরোপীযদের তামাকুসেবন প্রভৃতিব অজস্র 'টেরাকোটা'-ফলক পাওয়া গেছে। যোল শতকে এদেশে য়ুরোপীয়দের আগমন এবং দীর্ঘকাল ধরে বাংলাব গ্রাম-গ্রামান্তরে তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রাব বহু দৃশ্যফলকও শিল্পীরা তৈরি করেছিলেন।

মূর্তিফলক সন্নিবেশের যে পদ্ধতি বা নীতি এই সময়ে প্রচলিত হয়েছিল, তাতে দেখা যায়, একেবারে নিচের দিকে (ভিত্তিবেদির সংলগ্ন মন্দির দেওয়ালে) পশুপক্ষী ও অন্যান্য জীবজন্তুর ছবি, এর ঠিক ওপরের প্যানেলে আকর্ষণীয় সামাজিক দৃশ্য। এর পর স্তম্ভ এবং দুপাশের দেওয়ালের ছোট্ট ছোট্ট কুলুঙ্গিতে উল্লম্বভাবে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিফলক বসানো হত। ছাদের সংলগ্ন বক্রাকৃতি কার্নিশের নিচে আনুভূমিক রেখায় অবস্থিত কুলুঙ্গিসমূহেও বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবী, সাধু-সন্ন্যাসীর মূর্তিফলক স্থাপনের রীতি প্রচলিত হয়। এর নিচে এবং খিলান প্রবেশপথের ওপরে যে বিস্তীর্ণ অংশ (প্রস্তাব) থাকে, তাতে রামায়ণ বা মহাভারত কাহিনী, বিশেষ করে রাম-রাবণের সম্মুখ-যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ-লীলার বিভিন্ন দৃশ্যফলক স্থাপন করা হত। এই বিস্তীর্ণ অংশটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রস্থে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলা হত। এর দুপাশের প্রস্থে হয় রামায়ণের অন্যান্য কাহিনী অথবা কৃষ্ণলীলার নানা কাহিনীর ফলক বসানো হত। যেসব মন্দিরের দুই বা তিনদিকের দেওয়ালেও টেরাকোটা-ফলক বসানো হত (যেমন শ্যামরায়, কেষ্টরায়, মদনমোহন, অনন্তবাসুদেব), সেখানেও ঐ একই রীতি প্রচলিত ছিল।

নবপর্যায়ের এই 'টেরাকোটা'-শিল্পের অবক্ষয় শুরু হয় আঠার শতকের শেষ দিক থেকে। যদিও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বহু টেরাকোটা-অলংকরণযুক্ত মন্দির তৈরি হয়েছে, কিন্তু মূর্তিফলক ও ফুলকারি নকশাগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্মতা ও ত্রিমাত্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টিব সাধনা একসময় শিল্পীদের মন অধিকার করত, তার বিশেষ অভাব দেখা দিল। পবিবর্তে, মূর্তিগুলির দেহসৌষ্ঠবে এল স্থূলত্ব ও রেখার বিন্যাস। ফলকগুলোতে মূর্তিকে সোজাসুজি দেখানো হতে থাকল। সুদক্ষ শিল্পীর অভাব ও এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস পেল। অলংকরণবিহীন বহু মন্দিব তৈরি হল। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত মন্দিরেও 'টেরাকোটা'-সন্নিবেশ দেখা যায়। কিন্তু তা নিতান্ত দায়সারা গোছের। তবুও মনে হয় এ শিল্পের মৃত্যু নেই।

৬
মন্দির-অলংকরণ : চরিত্র ও বিন্যাস

প্রাক্-মুসলিম যুগে হিন্দু, **বৌদ্ধ ও** জৈনমন্দিরে যে অলংকরণ-রীতি প্রচলিত ছিল, পূর্বোক্ত

নবপর্যায়ের মন্দিরে স্থাপত্যশৈলীর বিবর্তনের সঙ্গে তারও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটল। মন্দিরগাত্রে 'টেবাকোটা' ও প্রস্তরফলকের অলংকরণ-- উভয় ক্ষেত্রেই মন্দিরের অঙ্গসজ্জায় এই পরিবর্তন এল। প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরগুলির অঙ্গসজ্জায় মূর্তির চেয়ে বিচিত্র ধরনের নকশা, যেমন ফুল, সর্পিলগতি লতাপাতা(meandering creeper), কল্পলতা, কৃত্তিমুখ, চৈত্যগবাক্ষ, ক্কচিৎ মনুষ্যমুখ বা মনুষ্য অথবা দেবমূর্তি প্রাধান্য লাভ করেছিল। হিন্দুমন্দিরগুলিতে বিষ্ণুনারায়ণ, রামায়ণের কিছু কিছু দৃশ্যচিত্র এবং পৌরাণিক দৃশ্যও উপস্থিত করা হেত। কিন্তু এই অলংকরণ বা অঙ্গসজ্জা ছিল গতানুগতিক ঐতিহ্যানুসারী গুপ্তযুগেব অলংকরণ-শৈলীধারায় অভিষিঞ্চিত। বাংলার কোন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তখনও স্ফুর্তিলাভ করেনি। যদিও পালসম্রাট ধর্মপাল (আ. ৭৭০ - ৮১০ খ্রি.)-প্রতিষ্ঠিত পাহাড়পুরে সোমপুব-মহাবিহারের একটি প্রাচীন মন্দিরগাত্রের যে অজস্র টেরাকোটামূর্তিফলক পাওয়া গেছে, তাতে অলংকরণের এক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৭৩] উল্লেখযোগ্য, এটি একটি বৌদ্ধবিহার হলেও এখান থেকে যেসব টেরাকোটা ও প্রস্তরমূর্তিফলক পাওয়া গেছে, তাতে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তিই বেশি। এই মূর্তিফলকগুলির তিনটি ধাবা বা শ্রেণীবিভাগ করা যায়। সরসীকুমাব সরস্বতী এই তিন শ্রেণীর ভাস্কর্যকে যথাক্রমে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতকে বাংলা শিল্পশৈলীর বিবর্তন বলে মনে করেন। অবশ্য, তাঁর মতে প্রথম দুটি শ্রেণীতে গুপ্তশিল্পধারার এক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর মূর্তিফলকগুলিতে খাঁটি ও অবিমিশ্র দেশজ বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।[৭৪] তৃতীয় বিভাগ বা ধারার অন্তর্ভুক্ত 'বাস-রিলিফে' (Bas-Relief) খোদিত মূর্তিফলকগুলি অজস্র হলেও এর অনেকগুলি ক্ষয়ে গেছে, কোন কোনটি ঠিকমত বোঝা যায় না। এই মূর্তিফলকগুলির মধ্যে আছে দেবকীকর্তৃক নবজাত কৃষ্ণকে বসুদেবেব কাছে সমর্পণ, কংসের কারাগার থেকে বালকৃষ্ণকে বসুদেবেব বহন, বালকৃষ্ণের ননিভক্ষণ, রাখালবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের ক্রীড়া, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের রাসক্রীড়া, কৃষ্ণকর্তৃক প্রলম্বাসুরবধ, অর্জুনকর্তৃক সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধ অথবা এটিকে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধও মনে করা যায়, বাবণকর্তৃক সীতাহরণে রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ, ত্রিশিবাসুরের তপস্যা, কংসেব সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ অথবা ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন-ধারণ প্রভৃতি। এছাড়া পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তিও লক্ষ্য করা গেছে। এটি পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি একক বৌদ্ধ ভাস্কর্য।

উপরি উক্ত এই পৌরাণিক চিত্রগুলি ছাড়াও সমকালীন অনেক সামাজিক চিত্রও এখানকার অনেক ফলকে পাওয়া গেছে, যেমন, সাবলীল গতিতে সুন্দরী নর্তকীর নৃত্য, কতিপয় দ্বারপালমূর্তি এবং মৈথুনরত স্ত্রীপুরুষ। এছাড়া অন্যান্য চিত্রের মধ্যে আছে নানা ধরনের লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, জনপ্রিয় কাহিনীচিত্র, আলাপচারী দুই তপস্বী, কিন্নর, বিদ্যাধর, যুদ্ধদৃশ্য, আমোদপ্রমোদের দৃশ্য।

এই তৃতীয় ধারার মূর্তিভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সরস্বতী বলেছেন ঃ মূর্তিগুলি ভারী ও স্থূল— অনুপাত ও আকারে সামঞ্জস্যবিহীন। মূর্তির রূপদানে ও খোদাইকাজে সূক্ষ্মতার বদলে সব চেয়ে বেশি রূঢ়তার পরিচয়ই মেলে।[৭৫] প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার মূর্তিভাস্কর্যে এইগুলি চোখে পড়ে না। প্রথম শ্রেণী ভুক্ত একটি মিথুনফলক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পনেরোটি মূর্তিফলকের মধ্যে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, যেমন যমলার্জুন, কংসের মল্লযোদ্ধা চানূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে কৃষ্ণবলরামের মল্লযুদ্ধ, কেশিবধ প্রভৃতি। এর সঙ্গে আছে ইন্দ্র, অগ্নি, কুবের, শিবের অনেকগুলি

মূর্তি, গণপতির মূর্তি। ব্রহ্মা এবং বৃহস্পতি, শিব এবং চন্দ্র ও শিব বা মনুর মূর্তিগুলি যথার্থ কিনা সন্দেহজনক। প্রথম শ্রেণীভুক্ত মূর্তিগুলির মধ্যে সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য যতটা লক্ষ্য করা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তগুলির মধ্যে ততটা পাওয়া যায় না।

কিন্তু, তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মূর্তিগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও সংযত পরিমিতি না থাকলেও এগুলির মধ্যে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হতে সুরু হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত গুপ্তযুগে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য বাংলার ভাস্কর্যে অনুসৃত হওয়া প্রথাগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গুপ্তযুগে প্রবর্তিত ভাস্কর্যরীতি অনুসৃত হত। কিন্তু বাংলায় খ্রি. সপ্তম শতকের শেষ বা অষ্টম শতকের সুরু থেকে ভাস্কর্যশিল্পে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ক্রমশ প্রকট হচ্ছিল এবং একটি নির্দিষ্ট 'বাংলা-রীতি' সেনরাজাদের রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শুরু অবধি গড়ে উঠেছিল।[৭৬] পোড়ামাটি ও প্রস্তরভাস্কর্য-শিল্পের এই বিকাশ অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছিল সেন-আমলের শেষ পর্যন্ত। পাহাড়পুর-মন্দিরের ফলকগুলি ছিল লম্বা ও চওড়ায় এক ফুটের মতো অর্থাৎ বেশ বড়ো। এই শিল্প বেশ জোরালো এবং স্থূল। এখানের বিশাল মন্দিরের গাত্রে একসময় প্রায় তিন হাজার এই ধরনের ফলক সন্নিবেশিত ছিল, যার খুব কমই এখন যথাস্থানে আছে। এইসব ফলকে পূর্বোক্ত দৃশ্যচিত্রগুলি ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর নর-নারী, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, কাজকর্ম, জীবিকা, আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক জীবন, খেলাধূলা, অবসরকালীন বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ, ধর্মানুরাগ ও বিশ্বাস, দেবমূর্তি, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত জনপ্রিয় কথা ও কাহিনী অবলম্বনে দৃশ্যচিত্র প্রভৃতি রূপায়িত হয়েছে। এছাড়া আছে নানা জন্তুজানোয়ার, পক্ষী ও মৎস্যের বাস্তব চিত্র।

পাহাড়পুর ছাড়াও বাংলার আরও অনেক প্রাচীন স্থানে উৎখননের দ্বারা পোড়ামাটির বহু ফলক পাওয়া গেছে, যার অনেকগুলিই প্রাচীন মন্দিরগাত্রে সন্নিবেশিত ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি হোল, রাঙামাটি (মুর্শিদাবাদ), চন্দ্রকেতুগড় ও বেড়াচাঁপা (উত্তর চব্বিশ পরগনা), দেউলপোতা ও হরিনারায়ণপুর (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা), তমলুক ও পান্না (মেদিনীপুর)। এইসব অঞ্চলের 'টেরাকোটা'-ফলকগুলিতে গুপ্তযুগের শিল্পরীতির ছাপ স্পষ্ট। এছাড়া আরও অনেক স্থানে বহু ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, গুপ্তযুগে টেরাকোটা ও প্রস্তরফলকে যেসব মন্দির অলঙ্কৃত করা হত, তার একটি নির্দিষ্ট শৈলী গড়ে ওঠে এবং বাংলায় সেই ধারাটি আবশ্যিকভাবে অনুসৃত হয় কয়েক শতক ধরে। কিন্তু পাহাড়পুরের তৃতীয়পর্যায়ের মন্দির 'টেরাকোটা'-ফলকে যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তা প্রথাগত ধারা থেকে ভিন্ন এবং বাঙালিশিল্পীর নিজস্ব কল্পনায় সৃষ্ট অনেকটা লোকায়ত শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। এই শিল্পের নিদর্শন পাহাড়পুর ছাড়াও মহাস্থানগড় (বগুড়া, বাংলাদেশ) এবং কুমিল্লার (বাংলাদেশ) ময়নামতীতে পাওয়া গেছে। কারও কারও ধারণা, 'এই প্রাচীন শিল্প মুসলমানেরা মঠগুলোকে বিনষ্ট করার বহু আগেই সম্ভবত লুপ্ত হয়েছিল (১১শ শতকের পাহাড়পুরমন্দিরের সংস্কারকার্য থেকে দেখা যায়, নতুন ফলক আর সুলভ নয় তখন) এবং প্রাক্-মুসলিম যে-সমস্ত হিন্দু বা জৈন মন্দির এখনও টিকে আছে, তার কোনটাতে অন্তত এর হদিশ মেলে না— এগুলোকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে খোদাই-করা ইঁটে প্লাস্টারের (স্টাকোর) সাহায্যে অলঙ্কৃত করা হয়।'[৭৭] আবার কারও কারও ধারণা, পাহাড়পুর বা ময়নামতীর বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত টেরাকোটাফলকগুলির মতো এ ধরনের শিল্প এর বেশ কিছুকাল পরেও আর কোন মন্দির বা বিহারে লক্ষ্য করা যায় নি, কঠোর

শাস্ত্রীয় অনুশাসনের চাপের ফলে গুপ্তযুগে বিধিবদ্ধ অনুশাসনের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা শিল্পরূপই পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছিল।[৭৮]

মুসলমান-আক্রমণ ও শাসনাধিকারে এই শিল্পের অগ্রগতি ও বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। খ্রি. পনের শতক থেকে মন্দিরস্থাপত্যশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে এই শিল্পেরও পুনরুভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু অলঙ্করণের জন্যে টেরাকোটা ও প্রস্তরফলকে দেবলীলাবিষয়ক বা অন্য কোন মূর্তিবিন্যাস আরও অনেক পরে চলিত হয়। ইসলামীয় ধর্মীয় সৌধগুলিতে (বিশেষ ক'রে, ইঁটের তৈরি সৌধ) মূর্তির বদলে যেমন বিমূর্ত ফুলের নকশা, ঝুলন্ত বাতি, সর্পিলগতি পদ্মনাল (meandering lotus stalk), পরস্পরযুক্ত জ্যামিতিক নকশা বা জোড়া গোলাপের চিত্র স্থান পায়, তেমনি বাংলার গোড়ার দিকের সাদামাটা মন্দিরসমূহেও এইরূপ অলঙ্করণ প্রচলিত হতে থাকে। এমনকি, ষোল শতকের গোড়ার দিকে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ-আন্দোলনের ফলে রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা জনগণের ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং আচণ্ডাল দরিদ্র এই সরল সহজ ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করলেও মন্দিরভাস্কর্যে পৌরাণিক কাহিনী বা কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কোন দৃশ্যচিত্র এই শতকের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত কোনও মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়নি। ঘাটাল-কোন্নগরের (মেদিনীপুর) সিংহবাহিনীর 'চারচালা'-মন্দিরের (প্রতিষ্ঠাকাল ১৪৯০ খ্রি., মন্দিরসংস্কারকালীন লিপিতে উল্লেখিত) সামনের দেওয়ালে মূর্তির পরিবর্তে (কৃষ্ণের দুএকটি মূর্তি ছাড়া) সূক্ষ্মকারুকার্যযুক্ত ফুলের নকশা ও পোড়ামাটির কয়েকটি পদ্মফুল লক্ষ্য করা যায়। পনের শতকের মসজিদেও এই ধরনের নকশা বা পোড়ামাটির ফুল লক্ষ্য করা যায় (যেমন, গৌড়ের কয়েকটি মসজিদে)। এরপর বেশ কিছুকাল 'টেরাকোটা'-অলংকরণযুক্ত উল্লেখযোগ্য কোন মন্দির লক্ষ্য করা যায় নি, অন্তত ষোল শতকের শেষভাগ পর্যন্ত। ষোল শতকের একেবারে শেষের দিকে বিভিন্নস্থানে যে কয়েকটি মন্দিরে বিমূর্ত অলংকরণ ও পরীক্ষামূলকভাবে দুএকটি মূর্তি-সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি হল, বৈঁচিগ্রামে (হুগলি) গোপালজীউর পরিত্যক্ত দেউল (১৫৮২ খ্রি., সম্ভবত বর্তমানে বিধ্বস্ত), যশোহরের (বাংলাদেশ) রায়নগর (১৫৮৮ খ্রি.), গোকর্ণের (মুর্শিদাবাদ, ১৫৯০ খ্রি.) একটি 'চারচালা' এবং বর্ধমানের বৈদ্যপুরের (১৫৯৮ খ্রি.) মন্দির। বৈঁচিগ্রামের পরিত্যক্ত এবং বর্তমানে লুপ্ত মন্দিরটিতে গ্রন্থকার লক্ষ্য করেছিলেন (লেখকের অনুসন্ধানকাল ১৭ই নভেম্বর সোমবার, ১৯৭৫) মন্দিরটি দেউলরীতির হলেও তার শিখর-অংশ চব্বিশটি সমান্তরাল খাঁজ যুক্ত ছিল। মন্দিরের সামনের দিকে পোড়ামাটির একটি লিপি ছিল বলে জানা যায়। সামনের দিকটা পড়ে যাওয়ায় সেই মূল্যবান লিপিটি ধ্বংস হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, তাতে ১৫০৪ শকাব্দ (= ১৫৮২ খ্রি.) লিখিত ছিল। খুব পাতলা ইঁটের ব্যবহার, গাঁথনিতে কাদার ব্যবহার, অপ্রশস্ত প্রবেশপথ (অবশ্য, সব প্রবেশপথই বন্ধ) প্রভৃতি থেকে মন্দিরটি ঐসময়ের বলে অনুমান করা যায়। সর্বোপরি এই মন্দিরে অস্পষ্ট ও ক্ষুদ্র দুএকটি মনুষ্যমূর্তি ছাড়া দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের ওপরে ও চারপাশে পোড়ামাটির কয়েকটি ফুল, লতাপাতার কাজ, সাপজাতীয় লম্বা একটি প্রাণী সেযুগের মন্দিরে অল্পস্বল্প 'টেরাকোটা'- অলংকরণ-সন্নিবেশের ইঙ্গিত দেয়। মন্দিরটির পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকে প্রবেশপথের চিহ্ন থাকলেও তা বন্ধ ছিল। দক্ষিণের মূল প্রবেশপথটি কোন কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশেই বসবাসকারী সিং-পরিবারের পূর্বপুরুষ জনৈক গোকুলসিংহ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলে জানা যায়। গোপালজীউয়ের এই মন্দিরের পার্শ্ববর্তী একটি দোলমঞ্চও মন্দিরের সমকালীন। মূলমন্দিরের তুলনায় এই দোলমঞ্চটি খুবই ছোট হলেও লেখকের

অনুসন্ধানকালে সেটি অক্ষত ছিল। দোলমঞ্চটি একটি উচ্চ পাদপীঠের ওপর অবস্থিত। শিখরটি মূলমন্দিরের মতো সমান্তরাল খাঁজযুক্ত। নিচে চারদিকের অংশ খোলা হলেও চারদিকের চারটি প্রবেশপথে 'ইমারতি' থাম লক্ষ্য করা যায়। শিখরের নিচের তিনদিকের অংশে (দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব) উচ্চমানের নকশাকাজের মধ্যে পোড়ামাটির ফুল, লতাপাতা গাছের সূক্ষ্ম নকশা তখনও বেশ অক্ষত ছিল। কার্নিশের নীচে ও থামের ওপরের প্রস্থের কিছু কিছু অংশে পোড়ামাটির খুব ছোট ছোট মনুষ্য বা দেবমূর্তি (সম্ভবত রাধাকৃষ্ণ বা গোপী) জোড়ায় জোড়ায় ছিল। কয়েকটি স্থানে যুগল রাধাকৃষ্ণমূর্তি (খুবই ছোট) সন্নিবেশিত ছিল। তবে মূর্তিব তুলনায় ফুল, লতাপাতার নকশা বেশি ও সুন্দর। পাতলা ও উৎকৃষ্ট ইঁট. ইঁটের ওপর সূক্ষ্ম ও উচ্চমানের নকাশি কাজ এবং সর্বোপরি বড় বা স্পষ্ট মনুষ্য বা দেবমূর্তির অভাব এই দুটি মন্দিরে যতটা চোখে পড়ে, বৈঁচিগ্রামের অন্য কোন মন্দিরে তেমন চোখে পড়ে না। যদিও পরবর্তীকালে নির্মিত এখানের কয়েকটি 'টেরাকোটা'-মন্দিরে প্রচুর পোড়ামাটিমূর্তির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ কয়েকটি মন্দির এখানে উল্লেখ্য ঃ ১. পূর্বপাড়ায় তাম্বুলীজাতীয় সেনেদের প্রতিষ্ঠিত শিবের (পরিত্যক্ত) 'আটচালা' (১৭১৫ খ্রি.), ২. চন্দ্রদের (গন্ধবণিক) তিনটি 'আটচালা', ৩. 'পাঁচমন্দিরতলা'য় নকুলেশ্বরের 'আটচালা' (১৭০৯?), ৪. বুড়োশিবতলায় বুড়োশিবের পবিত্যক্ত 'আটচালা' (১৭২৭), ৫. বারোয়ারীতলায় শিবের 'আটচালা'— এখানে টেবাকোটার মধ্যে একটি 'রাসমণ্ডলচক্র' ও মহিষমর্দিনী দুর্গাব সুন্দর একটি মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরগুলি সবই প্রায় একই ধাঁচের — 'টেরাকোটা'-মূর্তিগুলি ছোট্ট ছোট্ট টালিতে উৎকীর্ণ, টালির চারপাশ নকশা করা, দেবদেবীর মূর্তিগুলি একই ভঙ্গীর, ফুল-লতাপাতার নকশাগুলিও প্রায় একরকমের। মন্দিরগুলির প্রায় সবই আঠার শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত।

গোকর্ণের নবসিংহের 'চারচালা' মন্দিরের (১৫৯০ খ্রি.) মূর্তি থাকলেও নকশার প্রাধান্য লক্ষ্য করার মতো।[৭৯] ইঁটের ওপর খোদাই করা সুন্দর সুন্দর 'বাতিদান', জড়ানো লতায় সুন্দব সুন্দর ফুল, একটি অপরূপ চতুর্ভুজা মহিষাসুরমর্দিনী ও গরুড়বাহন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য অলংকরণ। বৈদ্যপুরে কৃষ্ণের দেউল মন্দিরের (১৫৯৮ খ্রি) জগমোহনের সামনে মূর্তির থেকে নকশার প্রাধান্যই লক্ষ্য করা যায়।[৮০] কয়েকটি ফলকে মূর্তিগুলি বাস-রিলিফে(Bas-relief) অগভীরভাবে উৎকীর্ণ। ফুল লতাপাতার নকশার যে সূক্ষ্ম কাজ আছে, তার সঙ্গে প্রাচীন মসজিদগুলির নকশাকাজের সাদৃশ্য আছে। এছাড়া ঐ সময়ে বা আরও কিছু পরে কোন কোন মন্দিরে মূর্তির থেকে নকশারই প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে; যেমন, কোদলা মঠ (খুলনা, বাংলাদেশ, আ. ১৭শ শতক)। অবশ্য, এরও কিছু আগে 'পরিণত আলঙ্কারিক নকশা' কৃষ্ণলীলা, সামাজিক দৃশ্যাবলী ও দেবমূর্তির সমাবেশ ময়ূরভঞ্জের হরিপুরগড়ে আনুমানিক ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত রসিকরায়ের মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে।[৮১] বিষ্ণুপুরে বীরহাম্বির-প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমিত বিশাল রাসমঞ্চটিতে 'বাস-রিলিফে' অগভীরভাবে খোদিত অল্পস্বল্প কয়েকটি টেরাকোটা মূর্তিফলক লক্ষ্য করা যায়।

সতের-আঠার শতকের মধ্যেই নবপর্যায়ের পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির অঙ্গসজ্জায় টেরাকোটা বা প্রস্তরমূর্তিফলক প্রচুর পরিমাণে স্থান পেতে থাকে। যেহেতু পাথর বাংলাদেশে সহজলভ্য ছিল না, সেইহেতু ইঁটের মন্দিরই অধিকসংখ্যায় নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরগাত্রে 'টেরাকোটা' মূর্তিফলকের প্রাধান্যও সেই একই কারণে। খ্রিস্টীয় তের-চোদ্দ শতকের ইঁটের তৈরি মসজিদগুলিতে পোড়ামাটির

ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা দিয়ে শেষমধ্যযুগে 'টেরাকোটা'-অলংকরণের যে সূচনা হল, মন্দিরগুলিতে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত টেরাকোটামূর্তি-অলংকরণের প্রাচুর্য এই শিল্পের শেষ পর্যায় ঘোষিত করল, যদিও শিল্পসৌকর্য ও উৎকর্ষ আঠার-উনিশ শতকে অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। সতের ও আঠার শতকের বহু মন্দিরে ছাঁচে তৈরি টেরাকোটা-ফলকই বেশি তৈরি হয়। এর দুটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায় - ছোট্ট ছোট্ট আকারের একশ্রেণীর ফলকে মূর্তি বা নকশা অগভীরভাবে খোদাই করা হলেও সূক্ষ্ম কলাকৌশল, অঙ্গসৌষ্ঠব, পার্শ্বচিত্রের মধ্যে শিল্পরূপের উৎকর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে। ছাঁচ ছাড়া অপেক্ষাকৃত একটু বড়ো ফলকে বড়ো বড়ো মূর্তি তৈরি করে সেগুলি হাত ও যন্ত্রের সাহায্যে ফলকে গভীরভাবে খোদাই করে রূপ দেওয়া হত। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ফলকগুলি সতের শতকে তৈরি মন্দিরগুলিতে বেশি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, অঞ্চলভেদে এর কিছুটা রূপান্তরকরণও যে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩ খ্রি.) ও কেষ্ট রায়ের 'জোড়বাংলা' মন্দিরের (১৬৫৫খ্রি.) উৎকৃষ্টমানের 'টেরাকোটা'-মূর্তিগুলি বেশ কিছু ছাঁচে তৈরি হলেও সেগুলিকে হাত বা যন্ত্রের সাহায্যে স্পষ্টতা আনার জন্য কেটে গভীর করা হয়েছে। মদনমোহনের 'একরত্ন'মন্দিরের (১৬৯৪খ্রি) 'টেরাকোটা'-ফলকগুলির বেশির ভাগ কিছুটা অগভীরভাবে খোদিত, কিন্তু ফলকের চারপাশ সুন্দর নকশা করা। এই মন্দিরের 'টেরাকোটা'-ফলকগুলি একটি বিশেষ শৈলীর সৃষ্টি করেছিল। পার্শ্ববর্তী কোন কোন জেলায, যেমন, মেদিনীপুর, হুগলির অনেক মন্দিরে এখানকার ফলকগুলি আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া, শ্যামরায়-মন্দিরের সুদৃশ্য 'রাসমণ্ডলচক্র'ও বাংলার বহু মন্দিরের অলংকরণে আদর্শরূপে গৃহীত হয়। উক্ত তিনটি মন্দিরের 'টেরাকোটা'-অলংকরণের যে একটি নতুন শৈলীর উদ্ভব হয়, বাংলার পরবর্তী কালের বহু মন্দিরে তা অনুসৃত হতে থাকে। বস্তুতপক্ষে, বিষ্ণুপুরের 'টেরাকোটা'-মন্দিরগুলি বিভিন্নস্থানের মন্দিরগাত্রের অলংকরণের আদর্শরূপে স্বীকৃত হয়। এমনকি, 'টেরাকোটা'-মূর্তিগুলির মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের যে সব কাহিনী, পৌরাণিক দেবদেবীলীলা, কৃষ্ণলীলা এবং অন্যান্য সামাজিক দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছিল, বাংলার পরবর্তীকালের প্রায় সব 'টেরাকোটা'মূর্তি-অলংকৃত মন্দিরে তার কিছু না কিছু লক্ষ্য করা যায়।

খ্রিস্টীয় ষোল শতকের শেষ থেকে মন্দিরদেওয়ালে শুধুমাত্র ফুল, লতাপাতার নকশার বদলে মূর্তিসমাবেশের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এইসময়ে হিন্দু আমলের বিষ্ণু, সূর্য, দুর্গা বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব-দেবীর মন্দিরের পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণের মন্দির নির্মিত হতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের ফলে বাঙালিমানসে রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে। শ্রীচৈতন্যের নবপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বাঙালির মনকে ভক্তির ভাবরসে অভিষিঞ্চিত করল, রাধাকৃষ্ণের লীলাগীতি জনপ্রিয়তা লাভ করল। সেই সঙ্গে রামায়ণী কথা, কথকতা, মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক দেবদেবীদের গীতিগাথা বাঙালিচিত্তে সংঘটিত করল এক অভূতপূর্ব ভাববিপ্লব। কথকতা, যাত্রাগান-পালা, লৌকিক দেবদেবী যেমন, মঙ্গলচণ্ডী, শিবের লীলাগানযাত্রা ও পালাগানের মধ্যে দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করল। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীমাহাত্ম্য, ধনপতি-শ্রীমন্তসদাগরের উপাখ্যান, মনসামঙ্গলের কাহিনী, শিবের লৌকিক উপাখ্যান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সাহিত্যে উপস্থিত হোল এক নতুন ভাববন্যা। শুধুমাত্র প্রাচীন বাংলার চর্যাপদের দার্শনিক তত্ত্ব বা পুরাণের বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যশ্রবণে বাঙালি এখন আর তৃপ্ত হতে পারল না। তাই উক্ত গীতিগাথাগুলি তার মনকে দারুণভাবে নাড়া দিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) ফলে বাঙালির

পুনর্জাগরণ হল — সাহিত্যে, ধর্মে, শিল্প-সংস্কৃতিতে। মন্দিরে মন্দিরে যেমন রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলেন, সেই সঙ্গে মন্দিরের গাত্রালংকরণে 'টেরাকোটা'-মূর্তির প্রচুর সমাবেশ হতে থাকল। রাধাকৃষ্ণলীলা, রামলীলা, দশাবতার, মহিষাসুরমর্দিনী, রামরাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ যেমন সামনের ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থগুলিতে স্থান পেল, তেমনি লৌকিক চণ্ডীর উপাখ্যানের মধ্যে 'কমলেকামিনী'-মোটিফ, লৌকিক শিব-উপাখ্যানের মধ্যে শিববিবাহ এবং সেইসঙ্গে ঈশ্বরাবতার শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবিহ্বল সংকীর্তনদৃশ্য 'টেরাকোটা'-ফলকে শিল্পীরা মূর্ত করে তুললেন। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য ও পার্ষদগণের সঙ্গে হরিনাম-সংকীর্তনদৃশ্য অসংখ্য 'টেরাকোটা' ফলকে রূপায়িত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য অবতাররূপে গৃহীত হওয়ায় দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের পরিবর্তে তাঁকে অনেকসময় অবতাররূপে মূর্ত ক'রে তোলা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধাবতারে জগন্নাথকেও দেখানো হয়েছে। লৌকিক চণ্ডী উপাখ্যান এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল মঙ্গলকাব্যের কথকতা ও পালাগানের মধ্য দিয়ে যে, 'টেরাকোটা'-শিল্পীরা ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রাপথে সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় 'কমলে-কামিনী' দৃশ্যকে বহু 'টেরাকোটা'-মন্দিরে সন্নিবেশিত করেছেন। সিংহলরাজ শালবানের আদেশে মশানে শ্রীমন্তকে হত্যা করার পূর্ব মুহূর্তে জরতীবেশিনী চণ্ডীর আবির্ভাবদৃশ্যও রূপায়িত হয়েছে। এছাড়া চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু- উপাখ্যানের গোধিকাবেশিনী চণ্ডীরও কিছু কিছু চিত্র 'টেরাকোটা'- ফলকে উপস্থিত হয়েছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী বা 'চণ্ডীমঙ্গলে'র অন্যান্য কবিদের কাব্য, কথকতা ও পালাগানের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হওয়ায় এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা যে কতটা ছিল, তা বোঝা যায় 'টেরাকোটা'-ফলকগুলির মধ্যে। সে তুলনায় মনসামঙ্গল বা ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর কথকতা বা পালাগান অল্পস্বল্প প্রচলিত থাকলেও 'টেবাকোটা'-ফলকে তা স্থান করে নিতে পারে নি। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীচিত্র পশ্চিম বাংলার প্রায়- 'টেরাকোটা'-মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে।

ষোল শতকের গোড়ায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে 'পৌরাণিক নবজাগরণে' (Puranic renaissance) বাংলার মন্দির-'টেরাকোটা'-শিল্পে মূর্তিসমাবেশের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেল। বৈষ্ণবধর্ম উচ্চ-নিচ জাতির মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে এক সমন্বয়বাদী ধর্মের সূচনা করল। আচণ্ডাল দ্বিজ বৈষ্ণবধর্মের প্রবল ভক্তিভাবে আপ্লুত হল। ধর্মে ধর্মে বিরোধ ও জাতিবর্ণের ভেদ দূরীভূত হওয়ার ফলে মন্দির-টেরাকোটাশিল্পে এক নবপ্রাণের সঞ্চার হোল। শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মে ধর্মে যে বিভেদ-কলহ ছিল, হিন্দু-ইসলামের মধ্যে বিপরীতমুখী সংঘাত ছিল, তা অপগত হওয়ার ফলে স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে কোন বাধা রইল না। মন্দির 'টেরাকোটা'-অলংকরণে এই সমন্বয়ধর্মী ভাবটি যেন আরও বেশি ক'রে লক্ষ্য করি। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব— সর্ব ধর্মের দেবদেবীর মূর্তিই মন্দিরগাত্র-অলংকরণে শিল্পীরা সন্নিবেশিত করেছেন। বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ মূর্তির কাছে বা পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই চতুর্ভুজা কালী, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী দেবী দুর্গার মূর্তি, শাক্ত দেবীর সম্মুখে বলিদানের জন্য ছাগ। এছাড়া, একদিকে যেমন কৃষ্ণলীলা, রামলীলার দৃশ্য, অন্যদিকে, দেবী চণ্ডী বা দশভুজার আবির্ভাব অসুরনিধনের জন্য। তিলন্তপাড়ার (সবং, মেদিনীপুর) জানকীবল্লভের মন্দিরের (১৮১১) একদিকের পুরো দেওয়ালে মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর প্রধান প্রধান দৃশ্যের চিত্ররূপ পাওয়া যায়।

মোটামুটিভাবে প্রায় সব 'টেরাকোটা'-মন্দিরে মূর্তিফলক-সন্নিবেশের একটি নিয়ম বা প্রথা চলিত হয়। বেশিরভাগ মন্দিরের সামনের অংশ (ফ্যাসাড) মূর্তি বা নকশা-ফলকে

সজ্জিত করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই দিক অলংকৃত হত দুএকটি মূর্তি এবং কয়েকটি ফুল বা ফুলকারি নকশায়। চারদিকের বাইরের দেওয়ালে মূর্তিসমাবেশ খুবই বিরল। আবার, বিষ্ণুপুরের পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির বাহির ও ভিতরের সব স্থানেই 'টেরাকোটা'-ফলক সন্নিবেশিত হয়েছে, বিশেষ করে শ্যামরায় ও জোড়বাংলামন্দিরে। এ-ধরনের 'টেরাকোটা'-সজ্জার সমারোহ আর কোথাও পাওয়া যায় না। দিনাজপুরের (বাংলাদেশ) পূর্বোক্ত কান্তনাথের মন্দিরেও প্রচুর 'টেরাকোটা'-মূর্তিসমারোহ আছে জানা যায়। কোন কোন মন্দিরের দ্বিতলের বাইরের দেওয়ালেও মূর্তিসন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায় (যেমন, বাগরুই-এর লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' ও বাদাড়ের জগন্নাথের 'নবরত্ন', কেশপুর, মেদিনীপুর)। 'টেরাকোটা'-ফলকগুলিকে বসানোর জন্য কার্নিশের নিচে সমান্তরাল এক বা দুই সারিতে কতগুলি ছোট্ট ছোট্ট কুলুঙ্গি তৈরি করা হোত এবং দেওয়ালের বাম ও ডানদিকে দুপাশে প্রলম্বিত ঐ একই কুলুঙ্গী থাকত। বহু মন্দির লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে কুলুঙ্গীতে কোন ফলকই বসানো হয় নি, সেগুলি শূন্যই থেকে গেছে। ঐসব কুলুঙ্গী বা খোপে সাধারণত পৌরাণিক দেবদেবী মূর্তি, যেমন, দশাবতার, মহিষমর্দিনী, সাধুসন্তের মূর্তি, কোন কোন ক্ষেত্রে 'মিথুনদৃশ্য' স্থান পেত। কিন্তু প্রধান আকর্ষণীয় ছিল সামনে 'খিলান' প্রবেশপথের (বহুক্ষেত্রে 'ত্রিখিলান প্রবেশপথ') ওপরের প্রস্থে নানা দৃশ্য-যেগুলি মুখ্যত ছিল রামায়ণের কোন কাহিনীচিত্র, কৃষ্ণলীলাদৃশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে মহাভারতের যুদ্ধদৃশ্য অথবা বৈষ্ণবসংকীর্তনদৃশ্য। রামায়ণের 'লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য' ওপরের একটি প্রস্থে রূপায়িত করা প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়, প্রায় সব মন্দিরেই এই দৃশ্যটি উপস্থিত। রথারূঢ় পরস্পর মুখোমুখি রাম ও রাবণ এবং পাশে ও নিচে বানর ও রাক্ষসসেনার পরস্পর যুদ্ধ - কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাব 'দেবীভাগবতে'র অকালবোধনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরে তিনটি প্রস্থ থাকলে মাঝখানের প্রস্থে এই দৃশ্যটি স্থাপন করা প্রথাগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাশের কোন প্রস্থে কৃষ্ণলীলার মধ্যে কালীয়দমন, গোপীদের বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাস প্রভৃতি 'মোটিফ' খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতিটি মন্দিরেই কৃষ্ণলীলার এই দৃশ্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের আর একটি 'মোটিফ' জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেটি হোল, রামসীতার সিংহাসন-আরোহণ বা 'রামরাজা'। এছাড়া, পৌরাণিক বা লৌকিক শিবকাহিনীর মধ্যে শিবের বিবাহদৃশ্যও বহু মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়। প্রায় প্রতিটি 'টেরাকোটা'-মন্দিরে মহিষাসুরমর্দিনী এককভাবে বা কার্ত্তিক-গণেশ ও লক্ষ্মী-সরস্বতী সহ উপস্থিত। এই ওপরের প্রস্থে বহু ক্ষেত্রে 'কমলেকামিনী'দৃশ্য লৌকিক কাহিনীর একটি জনপ্রিয় 'মোটিফ'রূপে গৃহীত হয়। বহু মন্দিরের সামনের একটি প্রস্থে বা সামনের অন্য কোন স্থানে এটি লক্ষ্য করা যায়। এই দৃশ্যে দেখানো হয়েছে, সিংহলের যাত্রাপথে সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর আসীনা দেবী কমলেকামিনী (চণ্ডী) যিনি গণেশকে ক্রোড়ে ধারণ ক'রে 'গণেশজননী'রূপে প্রসিদ্ধা। তাঁর দুইপাশে নৌযানে সমাসীন ধনপতি ও শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি, অবাব বিস্ময়ে এই অদ্ভুত মূর্তি দর্শন করছেন। এগুলি ছাড়া সামনের প্রবেশপথের স্তম্ভের কোন কোন স্থানে 'টেরাকোটা'-ফলক বসানো হত। এগুলি ছিল মুখ্যত দেবদেবী ও সাধুসন্তের মূর্তি বা কিছু ফুল। নিচের দিকে ভিত্তিবেদিসংলগ্ন দেওয়ালে সমান্তরালভাবে যেসব ফলক স্থাপন করা হত, সেগুলি ছিল জীবজন্তুর মূর্তি, জমিদার বা রাজার বন্যজন্তু-শিকার বা 'ঝাম্পানে' অন্যত্র গমন, যুদ্ধের জন্য সেনাদের কুচকাওয়াজ, বৃহৎ নৌযানে জলদস্যুদের যাত্রা— বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র নৌযান বা জাহাজ, এমনকি, দেশী ময়ূরপঙ্খী নৌকা বা পানসি সেকালের নৌযানের পরিচায়ক।

এছাড়া, সমকালীন সামাজিক দৃশ্যপটের মধ্যে অপরাধীকে হিংস্র শ্বাপদের মুখে নিঃক্ষেপ, চড়কদৃশ্য, গ্রাম্য কন্যা বা বধূর শিবপূজা, উটের ওপর আরোহী, অশ্বারোহী সেনা, রাজ-অন্তঃপুর, ধনী বা জমিদারের 'ফরসিবিলাস', বাঁদরনাচ বা ভল্লুকনাচ, বাজিকর, মিথুনদৃশ্য প্রভৃতি অসংখ্য দৃশ্যপট উপস্থিত, যা সেকালের সমাজচিত্রকে উপস্থিত করে। প্রায় সব মন্দিরেই এই দৃশ্যগুলি নিচের দিকে স্থাপন করা হত। আঠার-উনিশ শতকের বহু মন্দিরে সাহেবদের কিছু কিছু দৃশ্যপট লক্ষ্য করার মতো-এদের মধ্যে গোরাসৈন্য এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা স্থানীয় শাসনকর্তার চিত্রও উপস্থিত। সতের শতকে নির্মিত অনেক মন্দিরে মুঘল বা পাঠান সেনার মূর্তি 'টেরাকোটা'-ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে, আর রয়েছে বিচিত্র নৌযানে হার্মাদ জলদস্যুরা, নিরীহ বন্দীকে যারা ওপর থেকে সমুদ্রে হিংস্র জলজন্তুব মুখে নিঃক্ষেপ করত-তাদের সেই নিষ্ঠুর কর্মের দৃশ্য। 'টেরাকোটা'-ফলকে তা খুবই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন সমাজজীবনের বিচিত্র ছবি অসংখ্য টেরাকোটা-ফলকে ধরা পড়েছে।

মন্দিরের ভিত্তিবেদিসংলগ্ন দেওয়ালের নিম্নভাগ থেকে ওপরে ছাদেব কার্নিশের নিম্নদেশ পর্যন্ত মূর্তিফলক-সংস্থাপনের পূর্বোক্ত রীতি বিভিন্ন সময়ে নির্মিত প্রায় সব মন্দিরেই অনুসৃত হয়েছিল। টেরাকোটার বিষয়বস্তু বা তার সন্নিবেশরীতি এক হলেও স্থানিক ও কালিক পর্যায়ে রচনাশৈলীর ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কালিক পর্যায়ে একথা বলা যায় যে, ষোল বা সতের শতকের মূর্তিফলকগুলির কারুকার্য, গঠন ও ভঙ্গিমায় আঠার ও উনিশ শতক অপেক্ষা সূক্ষ্মতার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস বিস্ময়করভাবে উপস্থিত। আঠার শতক থেকে মূর্তির গঠনে কিছুটা স্থূলতাব আভাস পাওয়া যেতে থাকে এবং মূর্তির দেহসৌষ্ঠব ও পোষাক-আসাকে রেখাবিন্যাস দেখা যেতে থাকে। উনিশ শতকে মূর্তিগুলি আরও স্থূলাকার হতে দেখা যায়, কিন্তু শিল্পোৎকর্ষ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। আবার বিভিন্ন অঞ্চলে 'টেবাকোটা'-শৈলীব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। একই শিল্পীগোষ্ঠীর তৈবি 'টেরাকোটা'-মূর্তিগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়।

বাংলার আঞ্চলিক মন্দিরস্থাপত্য ও টেবাকোটা শিল্পের এক বিস্ময়কর যুগের অবসান হোল বিশ শতকের শুরু থেকে। নব উদ্ভাবনী শক্তি ও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মন্দির স্থপতিরা তাঁদের ঐতিহ্যপূর্ণ পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় নিযুক্ত হলেন। ফলে, এবও পরে যে অল্পকিছু মন্দিব ও টেবাকোটা নির্মিত হোল, সেগুলি হোল নিম্নমানেব। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রকৃত শিল্পীর এখনও অভাব ঘটেনি। তার সাক্ষ্য মিলবে সম্প্রতিকালেও বিভিন্ন কার্যালয়, স্টেশন ও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশতোরণে সুন্দর সুন্দর 'টেরাকোটা'-ফলকের সন্নিবেশ। তাই এই শিল্পের মৃত্যু নেই।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী সংস্করণ, ১৯৯০,পৃ ৭

২ Saraswati S K Temples of Bengal (*Journal of the Indian Society of Oriental Art (JISOA)*, 1934, pp 136-140 Majumder N G Inscriptions of Bengal, Vol III, pp 48-49

৩. সমরাঙ্গণসূত্রধার, উদ্ধৃতি, গাইকোযাড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ ৩২, পৃ ১২৫

'পুণ্ড্রবর্ধনকং ক্রমঃ প্রাসাদং বল্লভং হবেঃ।

এমনেন্ মূলসীমা'পৃক্ বৃত্তমাদৌ সমন্ততঃ।।

তচ্চালকর্ণসংযুক্তং কর্তব্যং সর্বতোদৃশম্।' এবং Dinajpur Pillar Inscription (*J R A S B Vol VII*, 1911,pp 615-619)

৪. Saraswati, S K op cit pp 136-140

৫. Watters *Yuan Chwang Vol II* pp 184-185, 187, 190, 191. Ref to Saraswati, op cit

৬. মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার . গৌড়লেখমালা, পৃ ৯৭ ; Ref to Saraswati ,op cit

৭. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, মহামহোপাধ্যায়(সং) : রামচরিতম্ of Sandhyakarnandin (*M A S B Vol III* Chapter III, V 9. p 63. 146

৮ সন্ধ্যাকরনন্দী ঃ 'রামচরিতম্' (৩৩১) শ্লোক ঃ
'দধতীং বত্নানাং পটলং পৃথুলং কামিতাং সুরেশ্বরপুরীম্।
বামাবর্তীমতিশুভাং স বিভীষণশাসনামৃতস্নাতাম্॥
পুণ্যজনানাং বসতিমসাধুব্যবহারসঙ্কথাশূন্যাম্।
সংকথাবিপুলমানবাভয়দামুদ্রগ্রদেবকুলজাতাম্॥'

৯ *Progress Report of the Assistant Archaeological Superintendent for Epigraphy*, Southern Circle, 1914-15 p 90

১০ মুখোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ ও রায়, প্রণব '৩৬৮ অব্দের নব আবিষ্কৃত খণ্ডিত মাধবপুর শিলালেখ', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ৯৫ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা পৃ ৯১-৯৫, Mukherjee, B N and Ray, P 'Madhavpur Fragmentary Inscription of the year 368' *Indian Museum Bulletin*, Calcutta, 1991 Vol XXVI pp 42-45

১১. Michell, George *The Hindu Temple*,1977,London pp 104-105

১২ ঐ, ঐ, পৃ. ৯৬ উদ্ধৃতি : "Doubtless the fifth and the sixth centuries witnessed the emergence of a superstructure rising from the walls of the sanctuary as a distinct characteristic of the northern style" (p-96)

১৩ Brown Percy *Indian Architecture (Buddhist and Hindu)*, *Vol I*, 1971 edition p 149-50

১৪ ঐ, ঐ, পৃ ১৪৯-১৫০, উদ্ধৃতি 'Locally known as the Begunnia group owing to a fancied resemblance to the fruit of the egg-plant (begun) they are probably of the Pala period and therefore of the 9th and 10th centuries'

১৫ Bose, Nirmal Kumar *Canons of Orissan Architecture*, 1932,
১২০ পৃষ্ঠার পরবর্তী আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

১৬ Brown Percy পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৯ ১৫০,
উদ্ধৃতি but undoubtedly the most ornate is the Siddheswara temple at Bahulara in the Bankura district of the 10th century Built of brick enriched with terracotta reliefs carried over its entire surface yet this profusion of pattern does not offend it serves to emphasize its graceful lines Numerous other temples of this order are to be found distributed throughout south-western Bengal and in the Manbhum district of Bihar, all apparently built while the Pala-dynasty was in power and therefore dating between the eighth and eleventh centuries (pp 150)

১৭ Bose, Nirmal Kumar : পূর্বোক্ত, ১২১ পৃষ্ঠার পূর্ববর্তী আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য

১৮ Mccutchion, David. J : *The Temples of Bankura District*,1972, পৃ ৩২ এর পর ৮ম চিত্র

১৯ Mccutchion, David. J : *Late Mediaeval Temples of Bengal*, 1972, Asiatic Society
' It is customary to associate these with the imposing Orissan tradition of which so much still remains but it seems likely that Pre-Muslim Rekha deuls of Bengal were in a tradition coming down through Magadha, which was part of the same empire' (p 3)

২০ Brown. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০

২১. Brown, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯

২২ Brown, *Indian Architecture (Islamic Period)* 1975, p 37

২৩ Brown, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫। দ্রষ্টব্য, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ',

বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', তৃতীয় খন্ড, ১৯৮০, পৃ.৩৫১

২৪ Majumder, R C , *History of Mediaeval Bengal*, 1974, p 42

উদ্ধৃতি "Shamsuddin Yusuf Shah (1474-1481 A.D), son of Ruknuddin Barbak Shah (1455-1474)-'It was during his rule that the Surya and Narayana temples of Pandua (Hooghly district) were converted into a mosque and a minar, respectively, and the huge image of the Sun-god was mutilated and utilised for a stone inscription on one face The above-mentioned mosque of Pandua is now known as 'Bais Darwaza' and many stone pillars and relics of Hindu temples are to be found ' শাহ্ সুফীর দরগায় পূর্বোক্ত ভগ্ন সূর্যমূর্তির পিছনে আরবী লিপির পাঠোদ্ধারে জানা গেছে, 'বাইশ দরওয়াজা মসজিদ' ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে ১৪৭৭ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। পাঠোদ্ধার ঠিক হলে মসজিদটি সুলতানী আমলের শেষদিকে তৈরী হয়। (দ্র. ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য . বাংলার তীর্থ, পৃ ৮৬-৮৭)

২৫. *Indian Archaeology*, 1963-64,

উদ্ধৃতি . 'The massive temple at Chandraketugarh had a large square sanctum cella with projections on three sides and a covered ambulatory passage The bigger square was preceded by a rectangular covered vestibule with a rectangular open porch in front, complete with a flight of steps Around the larger square, the vestibule and the porch, was a rectangular structure with projections on three sides, corresponding to those of the inner square Rising from the same level as that of the main temple, its facade and the two sides upto the vestibule were decorated with shallow niches, possibly plastered with stucco, and embellished with rounded offsets and string course of dentils made of moulded bricks ' (P. 64)

২৬. *History of Bengal, Vol I (Hindu Period)* 1971 ed and *A S I* 1934-35, P 42

প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি : 'The remains of the temple at Baigram (Dinajpur) identified with the temple of Sivanandi, mentioned in the copperplate grant dated 128 G E (447-448 A D) Originally it appears to have consisted of a square sanctum surrounded by a circumambulatory passage enclosed by a wall (A S I - 1934-35, p 42) There is only one entrance door-way towards the west In plan it is identical with a particular group of Gupta temples, represented by a flat-roofed square shrine within an outer hall of circumambulation, but in the case of this contemporary Bengal example, the method followed in roofing the inner sanctum and the outer hall is not known ' (*ASI* 1934-35, p 42)

At Baigram in the Dinajpur District the ruins have been exposed of a brick temple of an identical plan, but the method of roofing the sanctum and outer hall of circumambulation is not known According to copperplate inscription dated 128 G E (447-448 A D) found at the site, the remains represent the temple of Lord Govindaswamin erected by one Sivanandin, for the maintenance of worship and repair of which some land was purchased and made over by Bhoyila and Bhaskara, the two sons of the builder'– S K Saraswati, Temple Architecture in the Gupta age' (*Journal of the Indian Society of Oriental Art Vol VIII*, 1940 p 146 159)

২৭. Brown *Indian Architecture(Hindu and Buddhist Periods)* p 150

২৮. Banerjee, Adris *Temples of Tripura Varanasi, 1968 Frontis piece*

২৯. Bhattasali, N K *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*,p 123, Saraswati S K Temples of Bengal (*J I S O A , Vol II*, 1934 pp 136-140)

৩০. *History of Bengal, Vol I (Hindu period)*, 1971 ed pp 493-510

উদ্ধৃতি, 'The similarity with the temple carved in relief on the Ashrafpur votive stupa is striking, only the outline of the tiers in those late examples has grown curvilinear instead of the straight slope in the earlier form The curvilinear form may be said to be an imitation of thatched huts in which the bamboos are lashed together at the apex

৩১. Mccutchion, David J : *Late Mediaeval Temples of Bengal*, 1972 উদ্ধৃতি, . . 'a tall central char-chala with mud walls from which project verandah roofs at a lower level

supported on bamboo poles- precisely what we find to be the principle of the large domestic atchala today. (p 6)

৩২. রায়, প্রণব : মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ, পৃ. ১৪০

৩৩. Saraswati S K Temples of Bengal (*JISOA, Vol II*) উদ্ধৃতি . . 'thanks to the representations of similar terrace-roofed Sikhara-topped temples of miniature paintings and stone images of Bengal, it is now clear that the type was derived from Bengal, and it is the total disappearance of the proto-types in the land of its origin which is responsible for the conjectures that have hitherto prevailed ' (pp 136-137)

৩৪. ঘোষ, বিনয় : 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' ; ৩য় খন্ড, (১৯৮০) গ্রন্থে সরসীকুমার সরস্বতীর প্রবন্ধ 'পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকলা', পৃ ৩৩৬

৩৫ Brown, op cit (*Islamic period*,Taraporewala ed ,1975) উদ্ধৃতি 'With the advent of the Mahammedans in India an era ends The old order passes And in no country was the movement of Islamization more epoch-making For of the various civilizations with which Mohammedans came into contact in the course of their world conquest,none could have been more diametrically opposed to their ideals than that of the people of India' (p 1)

৩৬. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার প্রাগুক্ত, পৃ.৯

৩৭ Brown, op cit , pp 4-5 উদ্ধৃতি, 'The second of these styles the Provincial refers to those modes of building practised in some of the more self contained portions of the country, usually after their governors had thrown off the allegiance to Delhi when they proceeded to develop a form of architecture in accordance with their own individual ideals What may be termed the "pivotal year" of the movement was A D. 1400 when the central power at Delhi, has been taken by the invasion of Timur (Tamerlane) and its original prestige declined that date "

৩৮ Brown op cit, p 38

' ... in the beginning of the fifteenth century an early example of what may be termed the regional Islamic style comes into view. This is a Mausoleum at Pandua known as the Eklakhi tomb, recorded to be that of Sultan Jalaluddin Mohammed Shah (A D 1414-31) and therefore dating from about A D 1425 It is a building which assumes importance for three reasons, firstly it is a structure for marked architectural character in itself, secondly it forms an evolutional landmark as it is the initial building of its kind and thirdly it is the proto-type of most of the subsequent Islamic architecuture of Bengal

৩৯ Brown op cit p 38

৪০ M Abid Ali Khan, Khan Sahib *Memoirs of Gaur and Pandua*, Reprint,Govt of West Bengal,1986,p 64

৪১ Michell, George (ed) Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion, Princeton University Press Edition New Jersey,1983,p 6

উদ্ধৃতি · 'Only under the Muslim rulers does a distinctly regional style of architecture evolve for the first time The buildings erected by the Sultans combined traditional Islamic techniques (arches, vaults, domes) and types (mosques, tombs, forts) with local materials (brick and terracotta) and forms(hut) The credit for first translating the vernacular idiom in mud, bamboo and thatch into a monumental expression in brick belongs, therefore, to these rulers '

৪২ M Abid Ali Khan,Khan Sahib op cit p 51,

উদ্ধৃতি, F N 'It seems to the author that the building is of the time of the Hindu Kings (possibly Raja Kans) and that it was used for a temple An arrangement for hanging a chain and bell by an iron hook in the central part of the ceiling is still visible and the building itself lies north to the south There are door openings on three sides only. From all these facts, it may be concluded that a Hindu god was worshipped here '

এই গ্রন্থে plate V দ্রষ্টব্য।

৪৩. op cit , F N p 51

৪৪. Michell, George op cit p 10
উদ্ধৃতি 'Most popular deities in Bengal were worshipped in thatched huts in the villages When worship of some of the deities came to be transformed into orthodox cults that incorporated the services of brahmins, their images were housed in brick temples that copied their original settings in this way brick temples came to imitate vernacular forms

৪৫ Sanyal, Hites Ranjan Religious Architecture in Bengal (15th–17th century) A study of the Major trends *Journal of Indian Anthropological Society*, 5, 1970 p 188
'By unifying Bengal permanently within definite limits, and by establishing a stable central authority, the independent Sultans gave a concrete and geographical shape to the regional identification of the people of Bengal and to their urge for unification '

৪৬ Brown, op cit , pp 1-2

৪৭ op cit , P 45

৪৮. Das Sudhir Ranjan *Rajbadidanga , Chiruti Jadupur* , The Asiatic Society, 1968 দ্র plates XVII - XIX , দ্র. pp 38 - 39

৪৯ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার . বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি , পূর্তবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭১, আলোকচিত্র ২৬ ও ৫৫ পৃ. ১২২-১২৩ ও ৭৮

৫০ Mccutchion, David op cit plate 20

৫১. রায়, প্রণব · পূর্বোক্ত, ১৩ - সংখ্যক আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য

৫২ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার পৃ ১১৮, ৫৪ - ৫৫

৫৩ Mccutchion op cit P 8

৫৪ Mccutchion op cit plate 54

৫৫ op cit ,plate 58

৫৬ Sanyal Hites Ranjan op cit , p 196, উদ্ধৃতি ' Thus the Ratna-type of temple is a composite structure designed by combining the features of the folk chala architecture of Bengal with the traditional Sikhara type of temple The combination was conceived on the lines suggested in the regional religious architecture of the Muslims in which a substructure resembling the chala hut both in plan and elevation was combined with the traditional dome to produce an integrated structure Externally the similarity is so close that the single - domed structures of the muslims may be taken to be the precursor of the Ratna type of temple The simplest form of the Ratna - type i e the single Ratna temple differs from the single-domed structures of the regional style of the Muslims only in the shape of the surmounting element

৫৭ Deva, Krishna *Temples of North India* National Book Trust Second Edition, 1977, P 9 plate I

৫৮. Michell, George *The Hindu Temple* London 1977 p 80, ৩১ নং চিত্র ও চিত্র পরিচিতি Ladkhan Temple Aihole seventh century The sloping roofs reproduce in stone the forms of Thatch and Timber'

৫৯ op cit P 104, চিত্র ৪৬ , হুচ্চাপ্পায়া I 'Huchchappayya temple Aihole, eighth century, showing a clear demarcation of sanctuary with supersturture hall and porch

৬০ Mccutchion, op cit . চিত্র ৬০

৬১ Mccutchion 'Pinnacled Temples of Bengal. *Quest*, P 44;
উদ্ধৃতি · 'But there is a plausible case to be made out for deriving the 'Pancha-Ratna' design from the early Hindu panchayatana layout of five temples, one in the centre and four at the corners of the common plinth

৬২ op cit , P 44

৬৩ রায়, প্রণব · পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪ ৩৫, ৯৮ ৯৯

৬৪ রায়, প্রণব . পূর্বোক্ত , পৃ ১৩৬

৬৫. Deva, Krishna op cit, plate 1 Gupta temple, Sanchi;

উদ্ধৃতি : 'The earliest group of Gupta temples, dating from 5th century and showing a single-celled sanctum with a shallow portico resting on 4 pillars in front, is represented by temple 17 at Sanchi (the site of the famous Buddhist stupa of the 2nd century B C)

As suggested by the flat roof square or rectangular form, the plain treatment of the walls and modestness of size, these temples, must obviously have been derived from rock-cut proto-types of which early Gupta examples occur at Udaygiri near Sanchi Temple 17 at Sanchi is a classic example of lucid diction perfect articulation and restrained decoration' (P 9)

৬৬ Saraswati, S K Temple Architecture in the Gupta Age (*J I S O A, Vol VII*, 1940 pp 146 - 159), উদ্ধৃতি . The Durga and Hucchimalligudi temples at Aihole each exhibits a tower on the top of the flat roof of the sanctum

৬৭ op cit

৬৮ Sanyal, Hitesh Ranjan 'Temple Promotion and Social Mobility' ('*History and Society* - Essays in honour of Nihar Ranjan Ray 1978, P 345)

উদ্ধৃতি : ' the regional Bengali temples are actually a conglomeration of elements derived from two widely divergent sources, one indigenous and the other West Asian The indigenous sources may be divided into two categories The first category was the folk architecture of Bengal and the second category is the simplified version of the antiquated Sikhara which was also used in designing the superstructure of the Ratna temples The practice of assembling different features of plan construction and outer form derived from these divergent sources had started at the initial stage of temple building in the second half of the 15th and the 16th century'

৬৯ Mccutchion, op cit, plates 97 98,99,100,102,104,106

৭০ Sanyal, Hites Ranjan, op cit, 347

উদ্ধৃতি : ' The sharp increase in the participation of the people from the lower rungs of the society drastically changed the situation by divesting the upper caste landholders of their position of pre-eminence in the field of temple building On the other hand, the consistently high rate of temple-building by the comparatively ordinary and socially handicapped people indicate that temple-building h·' become a part of a broad based social movement through which people from the lower strata of the society had been trying to move up to eminence and acquire social power'

৭১ Sanyal, op cit, pp 358 and 363 Table 2&3

৭২. Ahmed, Nazimuddin 'Epic Stories in Terracotta Depicted on Kantanagar Temples, Bangla Desh', The University Press Limited, Dacca, 1990 P 21,

উদ্ধৃতি সংস্কৃত লিপি ঃ শ্রীশ্রীকান্ত ঃ

৭ শাকে বেদাব্ধিকালক্ষিতিপবিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ

প্রাসাদঞ্চাতিরম্যসুরচিতনবরত্নাখ্যমস্মিন্নকার্ষীৎ।

রুক্মিণ্যাঃ কান্ততুষ্ট্যৈ সমুদিতমনসা রামনাথেন রাজ্ঞা

দত্তঃ কান্তায় কান্তসা তু নিজনগরে তাতসংকল্পসিদ্ধৌ।।'

৭৩ Majumder, R C *History of Ancient Bengal*, chap XV, 1971, pp 628-629, উদ্ধৃতি :'.........The lower part of the basement wall of this temple is decorated with sixty three stone sculptures in a fair state of preservation . . In the first place, there is a great variation among these sculptures in regared to artistic style Some of them follow the Gupta tradition of 'eastern version' but many others, forming a majority of the group show, according to K N. Dikshit, S K Saraswati and others, 'distinct original tendency in which one may recognise the beginnings of the Bengal School' (Saraswati Sculpture, pp 35-36)

৭৪ Saraswati, S K *Hist of Bengal* (ed), *Sculpture*, pp 45-47 of Majumder, R C *History of Ancient Bengal*, pp 633-634

উদ্ধৃতি, : ' the three groups which belonged to different periods of time and represent more or less gradual evolution of this Bengal school of art, may be referred, respectively, to the sixth, seventh and eighth century, though it is regarded as possible that both the first and the second groups belong to the seventh century He (Saraswati) further suggests that while the first two groups show respectively pure and subdued Gupta plastic traits, the third group represents a genuine and undiluted indigenous tradition '

৭৫. Saraswati op cit , pp 41-42

উদ্ধৃতি, 'The figures are exceptionally heavy with neither the proportion nor the definition of form the execution and modelling are coarse and crude in the extreme '

৭৬. Majumder, R C op cit pp 634-636

উদ্ধৃতি, ' the local traditions and ideas gradually began to assert themselves from the end of the seventh or beginning of the eighth century A D
These ultimately led to the evolution of a regional school of sculpture with its own distinctive and characteristic features which may be truly called the Bengal school of sculpture This art flourished from the eighth to the end of the Hindu rule at the beginning of the thirteenth century A D covering the periods of Pala and Sena rule in Bengal '

৭৭. ম্যাককাচ্চন, ডেভিড্ ঃ ' বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ', পশ্চিমবঙ্গ, ৭ই জুলাই ১৯৭২ , পৃ ৬৮২ ('সাহিত্যপত্রে' ১৩৭৭ , আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত এবং ' পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় সংক্ষেপে পুনর্মুদ্রিত)।

৭৮. Haque, Julekha *Terracotta Decorations of Late Mediaeval Bengal Portrayal of a Society*, The Asiatic Society of Bangla Desh, 1980, p 17

উদ্ধৃতি ' The popular and humane character of the art of this phase arouses in an observer curiosity as surprise, when he remembers that art in other phases and periods in India has usually been the product of the court and the religious cult The art of the people, representing their common society has not usually been given such prominence on monuments whose construction was controlled by the gentry and hieratic religious orders But despite this patronage, the use of terracotta art in adorning architectural buildings seems to have undergone a total eclipse in Bengal after the Palas possibly under the pressure of hieratic art of succeeding periods

৭৯ Michell, George (ed) *Brick Temples of Bengal* (1983) plates 494 -497

৮০. op cit plates 322-326

৮১. ম্যাককাচ্চন, ডেভিড ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮৩

দ্বিতীয় ভাগ ঃ বিষয়মুখ

৭

বাংলার মন্দির : শেষ মধ্যযুগ

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রাক্‌-মুসলিম যুগে, বিশেষ করে, পাল-সেন আমলে যে বহু মন্দির তৈরি হয়েছিল, সুলতানী আমলের প্রথম দুই শতকের মধ্যে তার প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়।

কিন্তু শেষ-মধ্যযুগে (সুলতানী আমলের শেষ দিককে আমরা 'শেষ মধ্যযুগ' বলতে পারি) অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিছু আগে থেকে (খ্রি. পনের শতক থেকে) বাংলার নানা স্থানে যে অসংখ্য মন্দির তৈরি হতে থাকে (বেশির ভাগই ইঁটের), সেগুলির স্থাপত্যবৈচিত্র্য ও 'টেরাকোটা'-অলংকরণ বাঙালির স্থাপত্য ও শিল্পচর্চায় তার মহান্‌ উত্তরসূরিরূপে উপস্থিত হয়েছিল। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থান হিসেবে মন্দিরগুলি তৈরি হয়নি, এগুলি ছিল দক্ষ শিল্পীদের শিল্পচর্চার সার্থক উদাহরণ। যুগ যুগ ধরে পল্লী ও শহর-বাংলার আনাচে-কানাচে, নদীর ধারে কত বিচিত্র শ্রেণীর মন্দিরের জন্ম হোল এবং বহু মন্দিরের দেওয়াল 'টেরাকোটা'য় সজ্জিত হল, সেগুলির সঠিক সংখ্যা আজও নিরূপিত হয় নি। কালের প্রকোপে অজস্র মন্দির-দেবসৌধ অনেকদিন আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও এখনও যা আছে, জেলায় জেলায় সমীক্ষা করে তার চোখধাঁধানো সংখ্যা আমাদের বিস্ময়ান্বিত করবে।

পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশে শেষ- মধ্যযুগের এই মন্দিরগুলিকে প্রধানত পূর্ব আলোচিত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— 'চালা', 'রত্ন', 'দেউল' এবং 'চাঁদনি-দালান'। চালার মধ্যে একটিমাত্র চালযুক্তকে 'একচাল' বা 'একচালা', দুটি চাল বা 'দোচালা' যাকে 'একবাংলা'ও বলা হয়, আবার দুটি দোচালাকে সামনে-পিছনে যুক্ত ক'রে হয় 'জোড়বাংলা' (বিষ্ণুপুরে কেষ্টরায়ের বিখ্যাত 'জোড়বাংলা')। এর পর চারদিকে চারটি চাল নিয়ে 'চারচালা'। 'চারচালার' ওপর আরও চারটি চাল বসিয়ে 'আটচালা' এবং তার ওপর আরও ক্ষুদ্রাকৃতি 'চারচালা' বসিয়ে 'বারচালা' পর্যন্ত মন্দির দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, 'চালা'-মন্দিরের ধারণাটা এসেছিল বাঙালির অতি পরিচিত খড়ের চালা ঘর থেকে। শহরে এই চালা বিরল হয়ে গেলেও গ্রামাঞ্চলে সে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। 'চালা'-মন্দিরের সঙ্গে 'চাঁদনি' ও 'দালান'-শৈলীর কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও 'চাঁদনি' ও 'দালানের' ছাদ সমতল , কিন্তু চালার চাল ঢালু। কার্নিশ পূর্বোক্তের ক্ষেত্রে বেশির ভাগেরই বাঁকানো হওয়ার বদলে সোজা ভাবটিই লক্ষ্য করা যায়। চাঁদনির থেকে দালানের পার্থক্য স্পষ্ট, আয়তনের দিক থেকে; আকার এক হলেও আয়তন হয়েছে বিশাল ও অনেকগুলি প্রবেশপথ। কলকাতা ও গ্রামাঞ্চলের দুর্গাদালানগুলি লক্ষ্য করলে তা বোঝা যায়। সেক্ষেত্রে 'চাঁদনি' থেকে গেছে মাত্র এক থেকে দুটি প্রবেশপথ নিয়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে, চালা, চাঁদনি ও দালানের মধ্যে সরল সাদামাটা স্থাপত্যচিন্তাই বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ছিল বাংলার একান্ত নিজস্ব স্থাপত্য; সুপ্রাচীন কাল থেকে এই রীতির বাসগৃহ তৈরি হয়ে এসেছে। চৈতন্যাবির্ভাবের বেশ কিছুকাল আগে থেকে মন্দিরে এই রীতির প্রয়োগ দেখা দিল, যা একান্তই হয়ে উঠল এক নতুন স্থাপত্যচিন্তার ফসল। গৌড়ে (মালদহ) 'কদমরসুলে'র কাছাকাছি 'দোচালা' সৌধটি সর্বপ্রাচীন 'চালা'-শৈলীর হিন্দুমন্দির ছিল বলে মনে করা যায়। পরবর্তীকালে এটি ফৎ খাঁনের সমাধিতে পরিণত হয় (১৬৫৭ খ্রি.)। কিন্তু এটি রাজা কংসের সময় (১৪১২-১৪১৫ খ্রি.) একটি হিন্দুমন্দির

ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। (দ্রষ্টব্য ঃ এম. আবিদ আলি খান, মেমোয়ার্স অভ গৌড় অ্যাণ্ড পাণ্ডুয়া, রিপ্রিন্ট, প: ব: সরকার, ১৯৮৬, পৃ. ৫৯)। 'চারচালা'-মন্দিরের প্রাচীনতম নিদর্শনটি পাওয়া যায় ঘাটাল শহরের কোন্নগর পল্লীতে— কর্মকারদের সিংহবাহিনীর 'চারচালা' ও তৎসংলগ্ন চারচালা 'জগমোহন' (প্রতিষ্ঠাকাল ১৪৯০খ্রি.)। উল্লেখ্য, এগুলি নেহাতই সাদামাটা মন্দিব। কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা, 'টেরাকোটা'-অলংকরণের উল্লেখযোগ্য কারুকার্য কোন কিছুই এগুলিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থাপত্যকৌশলে নতুনত্বের আভাস পাওয়া যায় অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের গঠনে। বিশেষ করে, ভেতরের ছাদে গোলাকার গম্বুজ বা ভল্টের প্রয়োগে।

বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা লক্ষ্য কবা যায় 'রত্ন'- শৈলীর মধ্যে। মধ্যযুগীয় মন্দিরস্থাপত্যের চরম বিকাশ লক্ষ্য কবা যায় এই শৈলীর মধ্যে। নিচে চালা, চাঁদনি বা দালানের ছাদে ছোট আকারের দেউলকে চূড়া বা 'রত্ন'-রূপে বসিয়ে নতুন আলাদা এক শৈলী বা রীতি সৃষ্টি করা হোল। কিন্তু চূড়া বা 'রত্ন' বসাবার একটা শৃঙ্খলা ছিল। এর ফলে উদ্ভব হল, এই 'রত্ন', স্থাপত্যেরই কয়েকটি শ্রেণী— 'একরত্ন'. 'পঞ্চরত্ন', 'নবরত্ন', 'ত্রয়োদশরত্ন', 'সপ্তদশরত্ন', 'একবিংশতিরত্ন' ও 'পঞ্চবিংশতিরত্ন'। সর্বোচ্চ চারটি তলেই পঁচিশটি চূড়া বসানো হত। 'দেউল'-রীতির যে অজস্র মন্দির দেখা যায়, সেগুলি প্রাচীন 'রেখ' ও 'শিখর' দেউলের রূপান্তরিত ও সরলীকৃত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন দেউল মন্দির, যা গ্রাম-গঞ্জের সর্বত্রই আমাদেব চোখে পড়ে। এই ধরনের মন্দির অজস্র লক্ষ্য করা যায়, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, দুই চব্বিশপরগনা ও কিছু পরিমাণে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায়।

উল্লিখিত এই মন্দিরগুলি ছাড়া আরও কোন কোন শ্রেণীর মন্দির আমরা লক্ষ্য করেছি, যেগুলি পূর্বোক্ত কোন রীতির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু সেগুলি প্রথাগত এই শৈলীর না হলেও আমাদের আলোচ্য নিবন্ধের অন্তর্গত।

এই সব মন্দির পলিমাটিতে গড়া শস্যশ্যামল বাংলার একান্ত নিজস্ব, যা স্থপতিশিল্পীদের নিজহাতে তৈরি, বাঙালি সংস্কৃতির এক উন্নত আলোকোদ্ভাসিত চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করে। ইঁটের মন্দিরগুলিতে বহুক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনী এবং দেবদেবী-লীলাদৃশ্যের 'টেরাকোটা'-ফলক ছাড়াও সমকালীন উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সামাজিক দৃশ্য এবং সাধারণ মানুষের জীবনধারার যে জ্বলন্ত ছবি রূপায়িত হয়েছে, তার ফলে 'টেরাকোটা'-মন্দিরগুলির মধ্যে ইতিহাসের মূল উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আকর্ষণীয় লিপিফলক। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ নয়, অনেক দীর্ঘলিপিতে অজ্ঞাত ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেগুলি ইতিহাস-প্রেমী মাত্রেরই গবেষণার বস্তু। মধ্যযুগে মন্দিরসজ্জার জন্য 'টেরাকোটা' একটি পৃথক শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের কিছুকালের মধ্যেই এই শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে, যাকে কেউ কেউ লোকায়ত শিল্প বলে মনে করেন। যারা মাটির মানুষের কাছাকাছি,তাদের চিন্তা, ধ্যানধারণা এই শিল্পের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। মূর্তিফলকগুলিতেগ্রামীণ সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি যেমন স্পষ্ট, তেমনই মূর্তিগুলির ভাবভঙ্গি, বেশভূষা ও আকারে রয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনধারার বিচিত্র প্রকাশ। এই মন্দিরগুলি বাঙালির নিজস্ব কল্পনাতেই সৃষ্ট হয়েছিল। এগুলিকে তাই ধর্মীয় মোড়কে পোরা 'আফিং' মনে করে তাচ্ছিল্য না করে বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয়, বিদেশে ও আমাদেব দেশে যেখানে মসজিদ ও গীর্জাগুলি খুবই সুরক্ষিত

অবস্থায় বর্তমান, সেখানে শিল্পকৃতির এই বিরল নিদর্শনগুলি অবহেলা-অনাদরে ভগ্ন, জীর্ণ ও পরিত্যক্ত হয়ে দ্রুত অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। স্থানীয় মানুষদের ঔদাসীন্য আকাশছোঁয়া হলেও সরকারিযন্ত্র এদের সুরক্ষার বিষয়ে অস্বাভাবিক নীরব ও নিঃস্পৃহ। ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (আরকিওলজিক্যাল সারভে অভ ইন্ডিয়া) বিষ্ণুপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থানের উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলির সংরক্ষণের চেষ্টা করলেও রাজ্যসরকারের তরফে আমাদের এই গৌরবময় প্রাচীন নিদর্শনগুলির সুরক্ষার প্রায় কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। অপরূপ শিল্পসুষমায় ভরা বহু মন্দিরকে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে আমরা দেখেছি এবং খুব শীঘ্র আরও অনেক মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরও লক্ষ্য করা গেছে, মন্দির-দেওয়াল থেকে সুন্দর সুন্দর অজস্র 'টেরাকোটা'-ফলক খুলে তা অন্য জায়গায় বিক্রি করা হয়েছে ও বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এই 'ভ্যান্ডালিজম' এর প্রতিবাদ করার কেউ নেই, বরং এই কাজকে খুবই স্বাভাবিক মনে করা হয় এবং এ কাজ যে অতি নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য, তা কারও কখনও মনে হয় না। রাজনীতিক মানুষরা রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, মন্দিরের সুরক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো কারুরই 'অপচয়' করার মতো সময় নেই। মাঝে-মাঝে সরকার দায়সারা গোছের দু একটি মন্দিরের সংস্কার করে কাজ সারে। কিন্তু বেশির ভাগ মন্দিরই কালে কালে ধ্বংস হতে থাকে। আমরা এইরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত, ভঙ্গুর এবং জীর্ণ কোন কোন মন্দিরের বিবরণী উপস্থিত কবব। তবে তার আগে খ্রিস্টীয় ষোল শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত মন্দির-'টেবাকোটা' শিল্পের এক নতুন ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

যেহেতু ইঁটের মন্দিরের সংখ্যা উভয় বাংলাতে সর্বাধিক এবং পাথরের মন্দিব নগণ্য, সেকারণে নদীমাতৃক বাংলার পলিমাটিতে গড়া অঞ্চলগুলিতে ইঁটের মন্দির ও তার টেরাকোটা-অলংকরণই আমাদের আলোচ্য। একথা সত্য, উত্তরবাংলার তুলনায় দক্ষিণবাংলার চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় বিচিত্র শ্রেণীর ইঁটের অসংখ্য মন্দির দীর্ঘকাল ধরে তৈরি হয়ে এসেছে। এই বিশাল অঞ্চলকে 'বাংলা' মন্দিরের 'হৃদয়ভূমি'-রূপে বলা যায়। নিতান্ত অনাদৃত অবহেলিত বঙ্গসংস্কৃতির এই অমূল্য নিদর্শনগুলি বহু বিদেশীর কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হলেও এদেশীয়দের কাছে তা নিতান্তই অবজ্ঞার বিষয়। কিন্তু একসময় এগুলিকে যে এক একটি শিল্পকর্মরূপে গড়ে তোলা হোত, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) মন্দির। স্থাপত্য ও টেরাকোটার সূক্ষ্ম কাজ বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিকে উৎকৃষ্টমানের শিল্পমর্যাদায় ভূষিত করেছে, সে- বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাংলার মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের যে নতুন ধারাটি শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের কিছু পরবর্তীকাল থেকে গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের অমোঘ প্রভাব। শুধু ধর্মজীবন নয়, বাঙালি-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই এই প্রভাব ছিল অপরিসীম। সাহিত্য ও শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটল এই সময়ে। মন্দির-স্থাপত্যের পূর্বকথিত শৈলীগুলি এই সময়েই আত্মপ্রকাশ করে। 'টেরাকোটা'-শিল্পের নতুন ধারার সূচনা হয়। প্রাক-মুসলিম বা প্রাক-সুলতানী আমলে গুপ্তযুগ থেকে পাল-সেন যুগপর্যন্ত 'টেরাকোটা' শিল্পের যে ধারাটি ছিল, তার সঙ্গে চৈতন্য-পরবর্তীকালে 'টেরাকোটা' শিল্পের পার্থক্য সুস্পষ্ট— বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, কারুকার্যের সূক্ষ্মতা, টেরাকোটা-ফলকের আকার-আয়তন সর্বক্ষেত্রেই এই পার্থক্য ধরা পড়ে। পালযুগে আনুমানিক নবম শতকে পাহাড়পুরেব (রাজশাহি জেলা, বাংলাদেশ) মন্দির-টেরাকোটা ফলকগুলির সঙ্গে

তুলনা করলে এটা চোখে পড়ে। চৈতন্য-পরবর্তীকালে মন্দির দেওয়াল সজ্জার জন্যে টেরাকোটা-ফলকগুলির আয়তন ছোট, বেশির ভাগই ছাঁচে ঢালাই করা— ষোল-সতের শতকে তৈরি টেরাকোটাগুলিতে মূর্তিফলকের সূক্ষ্ম কাজ, সুন্দর নকশা লক্ষ্য করা যায়। টেরাকোটা-ফলকসমূহে রাধাকৃষ্ণলীলাদৃশ্যই বেশি এবং রামলীলা, মহাভারতের কাহিনী, দশাবতার, পৌরাণিক অন্যান্য কাহিনী ও সমসাময়িক ঘটনাবলী পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩ খ্রি.) , কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫ খ্রি.) এবং মদনমোহনের 'একরত্ন' (১৬৯৪খ্রি.)— এই তিনটি ইঁটের মন্দিরকে সমগ্র বাংলার মধ্যে স্থাপত্য ও টেরাকোটা-অলংকরণের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বলা যায়। বাংলাদেশের পূর্ব দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীউর মন্দিরটিও (পূর্বে এটি 'নবরত্ন'- রীতির ছিল) এই পর্যায়ে পড়ে। এই সব মন্দিরের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সজ্জায় অসংখ্য টেরাকোটা- মূর্তি ও নকশাফলক ব্যবহার করা হয়েছে। মেদিনীপুব, হুগলি ও বর্ধমান জেলার বহু মন্দিরেও আমরা সুন্দর সুন্দব টেরাকোটাফলক (মূর্তি ও নকশা) লক্ষ্য করেছি। উদাহরণস্বরূপ, মেদিনীপুবের দাসপুরের সিংহদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬), লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯১), ঘাটাল-নবগ্রামে রায়েদের 'পঞ্চরত্ন' (১৭০৯), হুগলি জেলার দশঘরা, আঁটপুর, বৈঁচিগ্রাম, গুপ্তিপাড়া এবং বর্ধমান জেলার কালনার মন্দিরগুলির কথা বলা যেতে পারে। বিষয়বৈচিত্র্য, শিল্পসুষমার ক্ষেত্রে উক্ত মন্দিরগুলির 'টেরাকোটা' অলংকরণ খুবই প্রশংসনীয় এবং শিল্পরসিকদের কাছে বিশেষ আদরের সামগ্রী।

৮

বাঁকুড়ার মন্দির

বাংলাব মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম ও উচ্চমানের টেরাকোটা আরও বহু মন্দিরে পাওয়া যায় যেগুলি অবিলম্বে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই ধরনের বহু মন্দির অনেক আগেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এখনও যে কয়েক হাজার মন্দির পশ্চিমবাংলাব নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলি শিল্পরসিক ও পর্যটকদের বিস্ময়ের কারণ হতে পারে। এদের বেশির ভাগই গাছ-গাছালিতে ভরা, ভগ্ন ও জীর্ণ। কিছু কিছু মন্দির কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আজও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

পশ্চিমবাংলার জেলাওয়ারী সমীক্ষায় দেখা গেছে, বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুরে বেশি মন্দির থাকলেও বর্ধমান ও হুগলিতেও মন্দিরের সংখ্যা কম নয়। এব পব বাঁকুড়া জেলা। বাঁকুড়া জেলায় বেশ কিছু মন্দিব আছে যেগুলি হিন্দু আমলের বা প্রাক- মুসলিম যুগের। এদের দুএকটির উল্লেখ আগে কবা হয়েছে।

বর্তমান আলোচনায় বাঁকুড়া জেলার মন্দিবগুলিই প্রথম আলোচ্য। একদিকে এই জেলায় প্রাক - মুসলিম যুগের বিরল মন্দিরগুলি যেমন আছে, অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তিধর্মের প্রভাবে মন্দিরচর্চার যে নতুন ধারাব সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটে, তার ফলশ্রুতিরূপে সমগ্র বাঁকুড়া জেলায়, বিশেষ করে, বিষ্ণুপুরে মন্দিরস্থাপত্য ও টেরাকোটা-অলংকরণের অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ও অন্যান্য স্থানে মধ্যযুগের মন্দিরস্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করার মতো। পশ্চিম বাংলার আর কোন জেলায় এতটা লক্ষ্য করা যায় নি।

বাঁকুড়ার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিব বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর ও সোনাতপলের দেউল। দ্বারকেশ্বর নদেব কাছাকাছি এই দুটি মন্দিরই ইঁটের তৈরি। তবে প্রথমটির শীর্ষদেশ ভেঙে গেলেও বাকি অংশ অক্ষত আছে, কিন্তু শেষোক্ত মন্দিরটি খুবই জীর্ণ। বর্তমানে অনেকটা সংস্কার করা হয়েছে। বহুলাড়া মন্দিরের বাইরের অলংকরণ স্থাপত্যের অঙ্গীভূত হয়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। মন্দিরবিশেষজ্ঞদের মতে এই ধরনের স্থাপত্য ও অলংকরণরীতি নিঃসন্দেহে প্রাক-মুসলিম যুগের এবং আনুমানিক খ্রি. অষ্টম-নবম শতক থেকে একাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়ে থাকবে। দ্বারকেশ্বর তীববর্তী অপর দুটি প্রাচীন মন্দির ডিহবের সারেশ্বর ও শৈলেশ্বরের পাথরের ভগ্ন দেউল। দুটি মন্দিরেরই শুধুমাত্র নিচের অংশ বর্তমান। 'শিখর' বা ওপরের অংশ দীর্ঘকাল ভগ্ন ও লুপ্ত। সারেশ্বরের একটি বিলুপ্ত লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়। এই দুটি যে দেউল মন্দির ছিল, তা নিচের অংশ ('বাঢ়') দেখেই বোঝা যায়। বহুলাড়া ও সোনাতপলের দুটি মন্দিরও দেউল রীতির। তবে এগুলিতে উত্তর ভারতীয় 'নাগর'-রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট, যে-রীতিটি মগধের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। উত্তর ভারতীয় 'নাগর'-রীতির মন্দির ছাড়াও ওড়িশী 'রেখ'-দেউল রীতির বহু মন্দির বাঁকুড়ার নানা স্থানে তৈরি হয়। এর বহু নিদর্শন এখনও বর্তমান।

বাঁকুড়া জেলায় প্রাক-সুলতানী-আমলের পাথরে তৈরি কয়েকটি 'দেউল' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অম্বিকানগবের (রাণীবাঁধ থানা) শিব, আটবাইচণ্ডীর বাসুলী, চণ্ডী ও শিবের মন্দির, দেউলভিড়্যার (তালডাংরা থানা) পরিত্যক্ত দেউল এবং হাড়মাসরার (তালডাংরা থানা) দেউল প্রাক-মুসলিম যুগে কোন সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান। এর মধ্যে প্রথমোক্ত দুটি মন্দির

খুবই জীর্ণ ও ভগ্ন। হাড়মাসরার মন্দিরে ওড়িশী 'রেখ'-দেউলের প্রভাব স্পষ্ট।

প্রাক-মুসলিম যুগের এই মন্দিরগুলি সবই প্রায় 'দেউল'-রীতির ছিল যার উৎসমূল ছিল উত্তরভারতের 'নাগর'-শৈলীর 'শিখর' মন্দির। শেষমধ্যযুগে উদ্ভাবিত পূর্বোক্ত বিভিন্ন শৈলীর মন্দির তখন ছিল না। নাগর-শৈলীর প্রাচীন, মগধে বিকশিত পূর্বী-রীতির যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর মন্দির পূর্বোক্ত বহুলাড়া ও সোনাতপলে এবং পুরুলিয়া ও বর্ধমানের পূর্বকথিত স্থানসমূহে লক্ষ্য করা গেছে, সেগুলি ছাড়াও ওড়িশায় বিকশিত রেখ-শৈলীর মন্দিরও প্রাক- মুসলিম যুগে বহু নির্মিত হয়, যার অনেক দৃষ্টান্ত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় বর্তমান। এদের বেশির ভাগই ধ্বংসপ্রাপ্ত, ভগ্ন ও জীর্ণ। প্রায় সবই পাথরে তৈরি। পুরীর জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ বা অন্যান্য 'রেখ' দেউল-মন্দিরের সঙ্গে এগুলির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, যদিও বিশালতা, স্থাপত্যালংকার ও মূর্তিভাস্কর্যের যে সমারোহ ওড়িশার ঐ মন্দিরগুলিতে লক্ষ্য করা যায়, এখানে তার প্রায় কিছুই নেই বললেই চলে। বাঁকুড়ার হাড়মাসরা মন্দিরের সঙ্গে ওড়িশী রেখ-দেউলের নিকট সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়েছে। অবশ্য, মন্দিরটি খুবই ছোট আকারের। ওড়িশী 'রেখ' ছাড়া 'পিঢ়'-রীতির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মন্দিরও প্রাচীন বাংলায় নির্মিত হত, যার দৃষ্টান্ত আটবাইচণ্ডী মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুর জেলার ডাইনটিকরি গ্রামেও (বিনপুর থানা) এই 'পিঢ়' বা 'ভদ্র'-রীতির জীর্ণ মন্দির আমরা লক্ষ্য করেছি। এগুলি উচ্চ রেখ দেউলের চেয়ে অনেকটা খর্বাকৃতি এবং এর ওপরের ছাদ 'থাকে থাকে' ('পিঢ়া') ওপরে উঠে গিয়ে শীর্ষদেশে মিলিত হয়। মূলত দর্শকদের 'প্রেক্ষাগৃহ'রূপে ব্যবহারের জন্য এগুলি মূল 'রেখ'-দেউলের সামনে যুক্ত করা হত। দৃষ্টান্ত, লিঙ্গরাজ বা জগন্নাথের 'জগমোহন', নাটমন্দির ও 'ভোগমণ্ডপ' অথবা কোণার্কের মন্দির। এই 'পিঢ়' রীতির মন্দির এককভাবে 'গর্ভগৃহ' (স্যাঙ্‌টাম্) বা বিগ্রহাধিষ্ঠান গৃহরূপেও ব্যবহৃত হত। মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে সর্বমঙ্গলা, কপিলেশ্বর ও কাশীশ্বর মন্দিরগুলি এই রীতির। দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মন্দিরও এইরূপ।

বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরে ওড়িশী 'রেখ' ও 'পিঢ়া'-রীতির মন্দির যতবেশি নির্মিত হয়েছে, অন্য আর কোন জেলায় এতটা দেখা যায় না। সীমান্ত পশ্চিম বাংলার এই অঞ্চল ওড়িশার প্রভাবমণ্ডলের আওতায় দীর্ঘকাল থাকায় এবং ওড়িশার 'গজপতি' ও 'গঙ্গ'-বংশীয় রাজাদের শাসন এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল কায়েম থাকায় নানা স্থানে জগন্নাথ ও শিব উপাসনার সঙ্গে এইরূপ স্থাপত্যচিন্তারও উন্মেষ ঘটেছিল, তা অনুমান করা যায়।

প্রাক-মুসলিম যুগের উপরি উক্ত মন্দিরগুলির পর মধ্যযুগের বাংলায় নতুন যে মন্দিরচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল, তার চরম উৎকর্ষ বাঁকুড়াতেই লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত মল্লরাজাদের আনুকূল্যেই এখানে মন্দিরশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। বিষ্ণুপুর তো বটেই, বিষ্ণুপুরের বাইরে ইঁট ও পাথর উভয় উপাদানেই নির্মিত 'চালা', 'রত্ন' ও 'দেউল' মন্দিরের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। আকারের বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা এবং স্থাপত্যকৌশলের চমৎকারিত্বে উক্ত রীতির মন্দিরগুলি পশ্চিমবাংলার অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে কয়েকটির নাম এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য। যেমন. গোকুলনগরের (জয়পুরথানা) ল্যাটারাইট পাথরে তৈরি গোকুলচাঁদের পরিত্যক্ত ও ভগ্ন এবং জীর্ণ 'পঞ্চরত্ন' মন্দির। মন্দিরটি মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহের সময়ে ৯৪৯ মল্লাব্দ বা ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। বিশাল আয়তনের (দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ৪৫ ফুট বা ১৩.৫ মিটার) এবং আনু. উচ্চতা ৪৫ ফুট । মন্দিরটির চারদিকের ত্রিখিলান প্রবেশ-পথযুক্ত বারান্দা

ছাড়াও গর্ভগৃহের চারপাশে প্রদক্ষিণ পথও বর্তমান, যা খুব কম মন্দিরেই দেখা যায়। এছাড়া, দশাবতার প্রভৃতির অনেক ভাস্কর্যও এই মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ি ছাড়াও 'রত্ন' বা চূড়াগুলিতে 'পিঢ়' -অংশ সুস্পষ্টভাবে 'পিঢ়া'- দেউলের পরিচয় বহন করে। দেওয়ালে মূর্তিভাস্কর্যের ফলকগুলি সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরূপ একটি সুদৃশ্য 'পঞ্চরত্ন'-স্থাপত্যের নিদর্শন গাছগাছালিতে পূর্ণ হয়ে আজ একেবারে ধ্বংসোন্মুখ। সম্প্রতি সংস্কারের কাজ হচ্ছে বলে জানা গেছে। 'রত্ন'-শৈলীর অপর আর একটি ধ্বংসোন্মুখ মন্দির দ্বাদশবাড়িব (বিষ্ণুপুর থানা) পরিত্যক্ত 'একরত্ন'। এটিও কোন মল্লরাজার প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমান করা যায় এবং স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যদৃষ্টে এটিও সতের শতকের বলে অনুমান। বিষ্ণুপুর শহর থেকে দ্বাদশবাড়ির দূরত্ব খুবই কম। কিন্তু মন্দিরটির শোচনীয় অবস্থা ও সকলের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করার মতো। মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ এর ছত্রাকৃতি 'রত্ন'। আটকোণা গম্বুজাকৃতি রত্নটির চারপাশ খোলা— কতকটা রাস বা দোলমঞ্চ আকারের। এই প্রাচীন 'একরত্ন'-স্থাপত্য প্রায় ধ্বংসের পথে। বিষ্ণুপুরের বাইরে অপর একটি সুন্দর 'পঞ্চরত্ন' মন্দির বৈতল গ্রামের (জয়পুরথানা) শ্যামচাঁদের। পাথরে তৈরি এই মন্দিরও বিশাল আয়তনের এবং এর ছাদের রত্নগুলিও 'পিঢ়'-রীতির বা থাকযুক্ত। প্রতিষ্ঠালিপিটি থেকে জানা যায় মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহ ৯৬৬ মল্লাব্দ বা ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটিরও স্থাপত্যকৌশল পূর্বোক্ত গোকুলনগর মন্দিরের মতো।

বহি-র্বিষ্ণুপুরের অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল, এল্যাটির বিশেষ ধরনের এক দেউল যা কতকটা দীর্ঘাকৃতি পিরামিড আকাবের। মন্দিরটি ইঁটের তৈরি, দ্বারকেশ্বর-তীরবর্তী। দেওয়ালে কিছু ফুলকারি নকশা আছে। এটিও মল্লরাজাদের আমলে সতেরো শতকেব কোন সময়ে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। পরিত্যক্ত এই 'দেউল'-মন্দির প্রথম রঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠা করেন বলে কারও কারও ধারণা। নিচের বর্গক্ষেত্রাকার গর্ভগৃহেব ওপর হেলানো দীর্ঘাকার শিখরটি এই মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ যা উর্ধ্বে ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে '[illegible]' ও 'আমলকের' নিম্নদেশে মিলিত হয়েছে। শিখরের উপরিভাগ থেকে নিম্নদেশ পর্যন্ত প্রসারিত প্রলম্ব 'রথ'-বিন্যাস (রেখা) অগভীর। কিন্তু 'শিখরের' সর্বাংশে সমান্তরাল রেখা যেন 'পিঢ়ার' সৃষ্টি করছে বলে ভ্রম হয়। আসলে এটি একটি বিশিষ্ট ধবনের দেউলমন্দির যা মল্লশাসনকালে পরীক্ষা- নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে অনুমান।

বাঁকুড়া জেলায় মল্লরাজাদেব আমলে বেশ কিছু দেউল মন্দির নির্মিত হয়েছিল। প্রধানত সতের-আঠার শতকের মধ্যে এগুলি তৈরি হয়। পূর্বোক্ত প্রাক-মুসলিম দেউল -স্থাপত্যের সঙ্গে এগুলির পার্থক্য সুস্পষ্ট। উভয়ের স্থাপত্যদৃষ্টে এটা সহজেই বোঝা যায়। বিক্রমপুরের (ওঁদা থানা) পাথরে তৈরি সুদৃশ্য রাধাকৃষ্ণের 'দেউল' ও তৎসংলগ্ন 'পিঢ়' 'জগমোহন' নির্মাণ করেন ৯৬০ মল্লাব্দ বা ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা বীরসিংহের মহিষী এবং শ্রীরঘুনাথ সিংহের মাতা। মন্দির, বিশেষ করে, 'জগমোহন' (পরিদর্শনকক্ষ) বেশ ভগ্ন হলেও স্থাপত্যের মধ্যে ঋজু ও বলিষ্ঠভাব ফুটে উঠেছে। এই জেলার আর একটি সুদৃশ্য 'দেউল' মন্দির আছে কোতুলপুর থানাব অন্তর্গত সিহরে। মন্দিরের বিগ্রহ শান্তিনাথ শিব। মাকড়া পাথরে তৈরি 'জগমোহন'যুক্ত এই ওড়িশী 'রেখ'-দেউল-স্থাপত্যে খাঁটি ওড়িশী শৈলীর ছাপ পড়েছে। প্রশস্ত 'জগমোহনের' চালের 'পিঢ়া' দুটিতে কিছুটা ঢালুভাব থাকায় কতকটা চালার আকার নিয়েছে। বাংলা 'আটচালা' এইভাবে যে

সৃষ্ট হয়েছিল, তা এই 'জগমোহন'-টি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও স্থাপত্যদৃষ্টে এটি সতের শতকের বলে অনুমান করা যায়। বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী ধরাপাটের (বিষ্ণুপুর থানা) শ্যামচাঁদেব 'রেখ' দেউল মন্দিরও ওড়িশী 'রেখ' শৈলীর। মন্দিরের প্রবেশপথের ওপরের একটি লিপি থেকে জানা যায়, 'মল্ল মহীপাল শ্রী হম্বীর সিংহে'র সময়ে ১৫২৫ শক বা ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে এটি তৈরি হয়। মন্দির 'শিখরের' তিনদিকের দেওয়ালে প্রাচীন তিনটি পাথরেব মূর্তি বাসুদেব, আদিনাথ ও পার্শ্বনাথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চল যে একসময় জৈন ধর্মের কেন্দ্র ছিল, আদিনাথ ও পার্শ্বনাথের মূর্তিই তাব প্রমাণ। মূর্তিগুলি বেশ প্রাচীন এবং পালযুগের বলে অনুমান করা যায়। পূর্বোক্ত হাড়মাসরা গ্রামেও আমরা একটি জৈনমূর্তি লক্ষ্য করেছি যেটিকে ভ্রমক্রমে স্থানীয় লোকেরা দেবীজ্ঞানে পুজো করে থাকেন। বাঁকুড়া অঞ্চলে একসময় যে জৈনধর্মের প্রাবল্য ছিল, এইসব মূর্তিই তাব প্রমাণ। বড়জোড়া থানাব অন্তর্গত জগন্নাথপুরের রত্নেশ্বর শিবের 'রেখ'-দেউলও ওড়িশী শৈলী-প্রভাবিত। মাকড়া পাথরে নির্মিত এই মন্দিরটিও স্থাপত্যদৃষ্টে সতেরো শতকের বলে অনুমিত। মন্দিরেব 'শিখরে'র নিম্নভাগের দুটি প্রস্থ— প্রস্থের দেওয়ালের ধাপগুলি লক্ষণীয। বাঁকুড়া জেলায় আরও বহু দেউল মন্দির বর্তমান। ওড়িশী 'রেখ'-দেউল স্থাপত্যেব গাম্ভীর্য ও বলিষ্ঠতা এই জেলাব দেউলগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর জেলায় বেশ কিছু 'রেখ' দেউল পুরোপুরি ওড়িশী-রীতিতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু তাছাড়াও বহু সাদামাটা দেউল মেদিনীপুর জেলার বহু স্থানে নির্মিত হয়েছিল। এই ধরনের সাদামাটা জগমোহনবিহীন দেউলের সংখ্যা মেদিনীপুর ছাড়া হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান ও ২৪ পরগনায অনেক লক্ষ্য করা গেছে।

বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির প্রসঙ্গে আসার আগে বহির্বিষ্ণুপুরের আরও কয়েকটি স্থানের মন্দির-সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। জনপ্রিয় 'চালা'-শৈলীব সুন্দর কয়েকটি নিদর্শনের মধ্যে পাথরে তৈরি নারিচাব (পাত্রসায়ের থানা) 'চারচালা'-শৈলীর সর্বমঙ্গলা মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'চারচালার' ঢালু চাল, সুঠাম গঠন, দীর্ঘ আয়তন খুবই আকর্ষণীয়। এ-ধরনের নিদর্শন মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ে সনকার পাথরের মন্দির এবং নদীয়ার পালপাড়ায় (চাকদহ) পরিত্যক্ত একটি ইটের মন্দির। নারিচার এই মন্দিরটিতে পাথরের অল্প দুয়েকটি ভাস্কর্যও উল্লেখযোগ্য। মন্দিরাভ্যন্তরে রক্ষিত পাথরের গণেশ ও মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তি (আ. বারো তের শতকে নির্মিত) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'আটচালা'-রীতির উৎকৃষ্ট মন্দিরগুলি লক্ষ্য করা গেছে তেজপাল (বিষ্ণুপুর থানা), সাব্রাকোণ (তালডাংরা থানা) ও সিমলাপালে (সিমলাপাল থানা)। এই আটচালা -রীতির আরও দুয়েকটি মন্দির আছে পাত্রসায়ের ও বালসীতে। তেজপালের পাথরে তৈরি রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটি রাজা রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহ ৯৭৮ মল্লাব্দ বা১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করান। সাব্রাকোণের পাথরের রাধাকৃষ্ণের 'আটচালা' মন্দিরের তিনিই নির্মাতা ছিলেন ৯৮৩ মল্লাব্দ বা ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে। সিমলাপালের বলরামজীউর 'আটচালা' মন্দিরের সামনে 'গথিক'স্তম্ভ শোভিত একটি 'দালান' 'জগমোহন' রূপে তৈরি করা হয়েছিল। অবশ্য, এটি পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করা যায়।

বাঁকুড়া জেলার আটচালা-রীতির মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট্য হোল, ওপরের চারটি চাল পৃথক একটি তলযুক্ত না হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রামবাংলায় বহুল প্রচলিত কাটাচালের রূপ নিয়েছে। এই মন্দির কাটা আটচালা যা 'বিষ্ণুপুরী আটচালা' নামেও পরিচিত। বিষ্ণুপুর ও

তৎসন্নিহিত এলাকায় এই রীতির মন্দির অনেক তৈরি হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, গড়বেতার (মেদিনীপুর) রাধাবল্লভ মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ মন্দিরটি রাজা বীরসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়ায় 'দোচালা' মন্দির নেই বললেই চলে। বিষ্ণুপুরে মদনমোহন মন্দিরের কাছে গোস্বামীপাড়ায় একটি দ্বিতল নহবৎখানার দ্বিতলের 'দোচালা'টি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'দোচালাটিতে' গ্রামের 'দোচালা' কুটিরের আদলটি যে ধরা পড়েছে, তা আমরা লক্ষ্য করেছি।

বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুরকে বাদ দিলে মন্দিরবহুল স্থানরূপে সোনামুখীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি একটি শহরও বটে। এখানে 'রত্ন', 'দালান', 'চাঁদনি' এবং 'দেউল' - এই তিন রীতির মন্দির আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তবে এখানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, তন্তুবায়- পরিবারের শ্রীধরজীউর 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির। তলের সংখ্যা না বাড়িয়ে মাত্র দুটি তলে এই মন্দিরের সব চূড়াগুলিই বসানো হয়েছে। মন্দিরে যে লিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং মন্দিরেব স্থপতি বা সূত্রধর ছিলেন হরি সূত্রধর। সম্ভবত এই হরি সূত্রধর বা রামহরি সূত্রধর সোনামুখীরই 'চন্দ্র'পাড়ার চন্দ্রদের দেউল এবং বর্ধমানের কালনায় প্রতাপেশ্বরের দেউল মন্দির (১৮৪৯) নির্মাণ করেন। শ্রীধবমন্দিরের চাবদিকের দেওয়ালে, এমনকি, ঢাকা বারান্দার গায়ে পোড়ামাটির অজস্র মূর্তিফলক সন্নিবেশিত। মূর্তিফলকে রামায়ণ-মহাভাবতের কাহিনীর চিত্র, কৃষ্ণলীলা, সমকালীন সমাজদর্পণ, ফুলকারি নকশার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'টেরাকোটা'য় সূক্ষ্ম কারুকার্য বলতে কিছু নেই। সোনামুখীর 'গিরিগোবর্ধন' মন্দিরও (১৮৩৫ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রপাড়ার পূর্বোক্ত দেউলের 'শিখর' গম্বুজাকৃতি খাঁজকাটা, প্রতাপেশ্বর দেউলের সঙ্গে এর সাদৃশ্য স্পষ্ট এবং বর্ধমানের শ্রীবাটীতেও (কাটোয়া) কতকটা এই ধরনের মন্দির লক্ষ্য করা গেছে। উনিশ শতকেব প্রথমার্ধে এবং দ্বিতীয়ার্ধেও এই ধরনের খাঁজকাটা গম্বুজাকৃতি 'শিখর' এযুগের দেউলের মধ্যে এক নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল, যার অপর একটি নিদর্শন মেদিনীপুরের চেতুয়া-বাসুদেবপুরে (দাসপুর) বর্তমান। এটিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। সোনামুখীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলার একটি সাদামাটা 'দালান' মন্দিরও এখানে আছে এবং তার কাছাকাছি শিবের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরও বর্তমান। এখানে কয়েকটি দুর্গাদালানও লক্ষ্য করা যায়। বহু প্রাচীন পুজো এইসব দালানে অনুষ্ঠিত হ'তে দেখা যায়। বিশেষ করে, 'কবিরাজ'- (বৈদ্য) সম্প্রদায়ের কোন কোন পুজো বেশ প্রাচীন।

বাঁকুড়ার তথা সারা পশ্চিমবাংলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরে লক্ষ্য করা যায়। ইঁট ও পাথর-এই দুই উপাদানেই গঠিত মন্দির এখানে আছে। তবে 'টেরাকোটা'র আশ্চর্য ও উৎকৃষ্ট অলংকরণের জন্য বিষ্ণুপুরের ইঁটের মন্দিরগুলি সমগ্র বাংলার এক বিস্ময়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-এই উভয় ক্ষেত্রেই বিষ্ণুপুরের সমকক্ষ আর কোন মন্দির আছে কিনা সন্দেহ।

মধ্যযুগের প্রায় সব রীতির মন্দিরই বিষ্ণুপুরে নির্মিত হয়েছিল। এগুলি হোল 'রত্ন', 'চালা' ও 'দেউল'। এগুলির মধ্যে সর্বোৎকর্ষের জন্য 'রত্ন'- মন্দিরগুলির কথাই বিশেষ করে মনে হয়। তবে প্রাচীনত্ব ও স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যের জন্য বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাসমঞ্চ উল্লেখযোগ্য। মাকড়া পাথরের একটি উচ্চ বিশাল বেদির ওপর পিরামিড আকৃতির বিশাল আয়তন এই দেবালয়টির ছাদের প্রতি দিকের কোণে একটি করে সুদৃশ্য ক্ষুদ্রাকৃতি 'চারচালা' এবং তার মাঝে চারটি করে 'দোচালা'

স্থাপিত। তিনপ্রস্থ খিলানযুক্ত প্রদক্ষিণপথ গর্ভগৃহ ও তৎপার্শ্বস্থ একটি কক্ষকে আবর্তন করেছে। এইরূপ নতুন স্থাপত্য পশ্চিম বাংলায় বিরল। সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য, রাসমঞ্চটির পূর্বদিকের বাইরের দেওয়ালে 'টেরাকোটার' অল্প কয়েকটি মূর্তি ও ফুল। মূর্তিগুলির মধ্যে অপরূপ সংকীর্তনদৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। 'বাস- রিলিফে' উৎকীর্ণ 'টেরাকোটা'- গুলিতে সূক্ষ্ম কারুকার্য টেরাকোটা-শিল্পের উৎকর্ষের পরিচায়ক। রাসমঞ্চটি বীর হম্বিরের প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমিত এবং আনুমানিক ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। সেই সবে মন্দিরদেওয়ালে শুধুমাত্র ফুল, লতাপাতা নকশার বদলে কিছু কিছু 'টেরাকোটা' মূর্তি সন্নিবেশিত হতে শুরু হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে। মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ, বর্ধমানের বৈদ্যপুর এবং হুগলির বৈঁচিগ্রামের যে মন্দিরগুলি ষোল শতকের শেষাশেষি তৈরি হয়েছিল, সেগুলিতেও খুব অল্প পরিমাণে 'টেরাকোটা'- ফলক স্থাপিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের এই রাসমঞ্চে যে অল্প কয়েকটি 'টেরাকোটা' আমরা লক্ষ্য করি, সেগুলি মন্দিরাশ্রিত 'টেরাকোটা'-শিল্পের প্রারম্ভিক সূচনা মনে করা যায়। 'টেরাকোটা'-শিল্পের যে নতুন একটি ধারা মধ্যযুগের বাংলার মন্দিরকে আশ্রয় করে উদ্ভূত হয়েছিল, তার প্রারম্ভিক সূচনা অনুমান করা যায় পনের শতকের শেষদিক থেকে, যার কিছু নমুনা আমরা পেয়েছি কোন্নগর পল্লীর (ঘাটাল শহর) সিংহবাহিনীর 'চারচালা' জোড়ামন্দিরে।

রাসমঞ্চের পরেই প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বরমন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি 'দেউল'রীতির ছিল বলে অনুমান। মাকড়া পাথরে তৈরি এই মন্দিরটির 'শিখর' ভেঙে গেলে তার বদলে আটকোণা একটি চূড়া স্থাপিত হয়। উৎসর্গলিপিটি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি বীরসিংহ ৯২৮ মল্লাব্দ বা ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। এই বীরসিংহকে কেউ কেউ বীর হম্বির বা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে মনে করেন। বিষ্ণুপুরের দুর্গ এলাকার পাথরদরজার উত্তরপশ্চিমে কৃষ্ণ ও বলরামের নামে চলিত ইঁটের দুটি 'দেউল' মন্দির উল্লেখযোগ্য। এগুলির স্থাপত্যদৃষ্টে আঠার শতকেব কোন সময় প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমান করা যায়। এছাড়া, 'জোড়বাংলা' মন্দিরের কাছে আরও দুটি 'দেউল' মন্দির বর্তমান। এর দেওয়ালে অল্প কিছু 'টেরাকোটা'-অলংকরণদৃষ্টে এগুলিও আঠার শতকের বলে মনে করা যায়।

'রত্ন'-মন্দিরেব ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরে 'একরত্নে'র (একচূড়া) সংখ্যা বেশি। ইঁট ও পাথর - উভয় উপাদানেই তৈরি 'একরত্ন' মন্দিরগুলি সমগ্র বাংলার মধ্যে এই রীতির স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন মন্দির (ইঁটের তৈরি, ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ দুর্জনসিংহদেব- প্রতিষ্ঠিত), দুর্গ এলাকায লালজীউ (বীরসিংহ কর্তৃক ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) ও রাধাশ্যাম (চৈতন্যসিংহের দ্বারা ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) এবং লালবাঁধ এলাকায় 'জোড়মন্দির' গোষ্ঠীর মন্দিরগুলি 'একরত্ন'- রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। লালবাঁধের দক্ষিণে কালাচাঁদ, রাধাগোবিন্দ, নন্দলাল ও রাধামাধবের মন্দিব এবং এগুলির কিছু পশ্চিমে 'জোড় মন্দির'-গ্রুপের মন্দিরগুলি 'একরত্ন'-শৈলীর। এছাড়া বিষ্ণুপুর শহরের নানা স্থানে মুরলীমোহন, মদনমোহন, চিন্ময়ী ও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরও এই রীতির। নিচেব প্রশস্ত চালার কার্নিশের বক্রতা ও চালের ঢালুভাবের সৌন্দর্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ছাদের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত বিচিত্র ধরনের 'রত্ন'- শিখর (দ্রষ্টব্য, মদনমোহন, রাধাশ্যাম ও লালবাঁধের রাধাগোবিন্দ ও নন্দলাল মন্দিরের আলোকচিত্র। 'Bishnupur by S S Biswas, Published by the Director-General, Archaeological Survey of India, New Delhi, Plates V, VIII, IX, XI) সমগ্র মন্দিবদেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়ক

হয়েছে।

উপরি উল্লিখিত মন্দিরগুলির প্রায় সবই পাথরে তৈরি একমাত্র মদনমোহন মন্দির ছাড়া। 'জোড়মন্দির'-গোষ্ঠীর মন্দিরগুলি ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে গোপাল সিংহ প্রতিষ্ঠা করেন। রাধামাধব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন কৃষ্ণ সিংহ ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে এবং রাধামাধবের মন্দির রাজা বীরসিংহের অন্যতমা মহিষী শিরোমণি দেবী ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করান। রাধাশ্যাম মন্দির এগুলির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেও (১৭৫৮) এব দেওয়ালের মূর্তিভাস্কর্যগুলি নতোন্নত পদ্ধতিতে (বাস-রিলিফ) খোদিত এবং প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয়। বিষয়, কৃষ্ণ ও পৌরাণিক দেবদেবীলীলা, দশাবতার প্রভৃতি। 'লালবাঁধগোষ্ঠীর' মন্দিরের মধ্যে কালাচাঁদ মন্দিরটি সর্বপ্রাচীন (১৬৫৬, রাজা রঘুনাথ সিংহের প্রতিষ্ঠিত)। মাকড়া পাথরের এই মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে 'বাস-রিলিফে'র মূর্তিভাস্কর্যগুলি উল্লেখযোগ্য। রাধাগোবিন্দ মন্দিরেও (১৭২৯) কিছু কিছু ভাস্কর্য লক্ষ্য কবা যায়। কালাচাঁদ মন্দিরের কাছাকাছি রাধামাধব মন্দিরেও (১৭৩৭) মূর্তি ও অন্যান্য অলংকরণ উল্লেখযোগ্য। দুর্গের পাথরদরজার কাছে রাধাশ্যাম মন্দিবের পার্শ্ববর্তী লালজীউর মন্দির (১৬৫৮) অলংকরণবিহীন হলেও এর স্থাপত্য আকর্যণীয়।

বিষ্ণুপুরের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির মদনমোহনের 'একরত্ন'। ইঁটের তৈরি এই মন্দিরের দেওয়ালে সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মূর্তিফলকগুলি ছাড়াও ফুললতাপাতার অপরূপ নকশা খুব কম মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্লেট ৬)। টেরাকোটা' ফলকগুলির বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি ফলকের চারপাশে ফুলকারি নকশার বেষ্টনী এবং ফলকগুলি সচরাচর মাপের থেকে আয়তনে বড়ো। টেরাকোটা - ফলকের এই রীতিটি পরবর্তীকালের অনেক মন্দিরে আমরা লক্ষ্য করেছি। এই ধরনেব নকশাকাটা ফলক মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি জেলার অনেক মন্দিরে অনুসৃত হয়েছিল যাকে আমরা 'বিষ্ণুপুরী টেরাকোটা' বলতে পারি। মন্দিরের পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিমাংশে ত্রিখিলান প্রবেশপথ যুক্ত আবৃত বারান্দা। সামনের দিকে যে টেরাকোটা-ফলকগুলি আছে, তাতে কৃষ্ণলীলাদৃশ্য এবং সংকীর্তনদৃশ্য রূপায়িত। অপর তিন দিকের দেওয়ালে খিলানের ওপরে-নিচে অজস্র ফলক সজ্জিত। এর মধ্যে কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, পৌরাণিক কাহিনী উৎকীর্ণ রয়েছে। খিলানের ওপরের অংশে মহাভারতের যুদ্ধদৃশ্য বর্ণিত। মহাভারতের যুদ্ধদৃশ্য এই মন্দিরে যতটা লক্ষ্য করা যায়, অন্য কোন মন্দিরে তেমন পাওয়া যায় না। তাছাড়া সংকীর্তনদৃশ্যের বহু ফলক, সাধু- সন্ন্যাসীর মূর্তিফলক এবং পৌরাণিক দেবতার বহু ফলক এই মন্দিরে আছে। তবে নকাশি কাজের যে সূক্ষ্ম নিদর্শন এই মন্দিরে পাওয়া যায়, তা পশ্চিম বাংলার অন্য কোথাও বিরল।

বিষ্ণুপুরের দুর্গ এলাকায় কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' ও শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন'-এই দুটি ইঁটের মন্দির স্থাপত্য ও উৎকৃষ্টমানের অলংকরণের জন্য সুপরিচিত। বিশালতা, নিখুঁত স্থাপত্যকৌশল, 'টেরাকোটা'- অলংকরণের সূক্ষ্ম কৃৎকৌশল ও দৃশ্যবৈচিত্র্যের জন্য এই দুটি মন্দিরের সমকক্ষ আর কোন নিদর্শন পশ্চিমবাংলায় নেই বললেই চলে। মধ্যযুগের 'টেরাকোটা' শিল্পে যে এক নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল, তার সর্বোৎকর্ষ এই দুটি মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। এই দুটি মন্দিরেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহ, যিনি বিষ্ণুপুর ও তার আশপাশে বেশ কিছু মন্দির নির্মাণ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রাচীনত্বের ক্ষেত্রেও এই মন্দিরটি উল্লেখের দাবি রাখে। শ্যামরায়ের মন্দিরটি ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে এবং 'জোড়বাংলা' ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিষ্ণুপুরে শ্যামরায়ের ইঁটের মন্দিরটি ছাড়া আর একটি মন্দির হল পাথরের তৈরি মদনগোপালের। কিন্তু উৎকর্ষের ক্ষেত্রে শ্যামরায়ের মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। প্রশস্ত আয়তন এই মন্দিরের কেন্দ্রীয় 'রত্নটি' একটু ভিন্ন ধরণের। এটি একটি আয়ত চালার ওপর আটকোণা খর্বাকৃতি চূড়াযুক্ত। অপর চারটি 'রত্ন' (চূড়া) কতকটা পিঢ়-দেউলের মতো হলেও এগুলির মধ্যে কিছুটা 'চালার' ভাব স্পষ্ট। এই মন্দিরের নিচের অংশটিতে 'চারচালার' চালের ঢালু ও সহজ ভাবটি বেশি পরিস্ফুট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেখানে 'দালান' বা 'চাঁদনি'র ওপরে 'রত্ন' বসান 'রত্ন' মন্দিরগুলি আমরা লক্ষ্য করি, সেখানে এইরূপ 'চালা'র প্রয়োগ খুবই বিরল। লালবাঁধগোষ্ঠীর পূর্বোক্ত 'একরত্ন'-সমূহেও আমরা এই চালার প্রযোগ লক্ষ্য করি। চালার কার্নিশ ধনুকের মতো বাঁকানো এবং ছাঁচা বাইরে কিছুটা ঝুলন্ত অবস্থায় বর্তমান।

শ্যামরায়-মন্দিরে 'টেরাকোটা'র সীমাহীন প্রাচুর্য লক্ষ্য করার মতো। শুধুমাত্র বাইরের দেওয়ালগুলিতে 'টেরাকোটা' ফলকের সমাবেশ নয়, ভেতরের দেওয়াল, ভেতরের ছাদ এবং রত্ন সমূহের প্রায় সবগুলিতেই 'টেবাকোটা' মূর্তিসজ্জা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে ফুললতাপাতার সুন্দর নকশা কাজও আছে। মূর্তি-অলংকরণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণলীলাদৃশ্য প্রাধান্য পেয়েছে, বিশেষতঃ এই মন্দিরে বৃহদাকার 'রাসমণ্ডলচক্র'গুলি এতই বলিষ্ঠ ও সাবলীল যে, দূরের অনেক মন্দিরে অলংকরণের জন্য এটি একটি 'আদর্শ' রূপে (মোটিফ) গৃহীত হয়েছিল। বহু টেরাকোটা ফলকে দুজন গোপীর মাঝখানে কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে। সংকীর্তনদৃশ্যের বহু ফলকও এখানে লক্ষ্য করা যায়। আবৃত বারান্দার ভেতরের দেওযালে বিশালাকার টেবাকোটা-ফলকের মধ্যে বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব উপাখ্যান, যেমন পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, বিভিন্ন দেবদেবীব মূর্তি — শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা, ছিন্নমস্তা, গণেশ প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এছাড়া মন্দিরের অভ্যন্তরে এক স্থানে পদ্মেব ওপর সমাসীন দশবাহু পঞ্চানন শিবমূর্তি এবং তার নিচে জ্যোতিষ্মান নরসিংহদেব দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

শ্যামরায় মন্দিরের খিলান প্রবেশপথগুলির ওপরে দেব, দানব, বীর ও যোদ্ধাদের রথারূঢ় বা অশ্বারূঢ় অবস্থায় যুদ্ধরত লক্ষ্য করা যায়। দেওয়ালেব নিম্নভাগে রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সামাজিক দৃশ্যচিত্রও রূপাযিত-যেমন, ঝাম্পান বা পালকিতে রাজার স্থানান্তর-গমন ইত্যাদি। এই মন্দিরে এক অদ্ভুত ধরনেব প্রাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, পক্ষযুক্ত সিংহের সঙ্গে হস্তীর যুদ্ধ অথবা বিশালাকার উটপাখীর মতো এক প্রাণীর হস্তিভক্ষণ। মন্দিরটির গর্ভগৃহের ভেতরেব দেওয়ালে ফুললতাপাতার নকশা কাজগুলি বেশ প্রশস্ত। টেরাকোটার সব কাজের মধ্যেই যেন রয়েছে একটা ছন্দ, গতিময়তা ও লালিত্য। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এগুলির সূক্ষ্মতা পরিমাপ করা কিছুটা কঠিন।

বিষ্ণুপুরের 'জোড়বাংলা' মন্দিরকে এই রীতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন মনে করা যেতে পারে। মন্দিরটি কেষ্টরায়ের জন্য রাজা রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। বিশালতা, বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব, 'বাংলা' রীতির সুনিপুণ প্রয়োগ, 'টেরাকোটার' সীমাহীন প্রাচুর্য, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি সম্মুখভাগের 'একবাংলা'র শীর্ষদেশে একটি সুদৃশ্য ও সুললিত 'চারচালা'র সন্নিবেশে এই মন্দিরটি সাবা বাংলায় একটি আদর্শস্থানীয় দেবালয়। ইঁটের অপর একটি 'জোড়বাংলা' মন্দির মহাপ্রভুর, যা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কেষ্টরায়ের দক্ষিণমুখী 'জোড়বাংলা' মন্দিরটির 'টেরাকোটা' মূর্তিগুলি খুবই উচ্চমানের। এখানেও স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণলীলাদৃশ্যই প্রাধান্য লাভ করেছে-এর

মধ্যে বাল্যলীলাদৃশ্যগুলি উল্লেখযোগ্য-যেমন, পূতনা, তৃণাবর্ত ও শকটাসুর বধ, কৃষ্ণ-বলরামের পরিচর্যা, ননিচোর বালকৃষ্ণ, বকাসুর, অজগররূপী অঘাসুর, অরিষ্ট, ধেনুকাসুরের দাবানল ভক্ষণ, শঙ্খচূড়, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রত্যাবর্তন, ঘোটকাসুর কেশী, বলরাম ও বড়াই বুড়ির সঙ্গে কদমতলে কৃষ্ণ ও রাধা, কংসের ধোপার মৃত্যু, কংসের হস্তী কুবলয়াপীড়ের মৃত্যু, মল্লযোদ্ধাদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের যুদ্ধ, রথাসীন প্রতিস্পর্ধী যোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ (সম্ভবত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ)। মন্দিরের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে অনেক রামলীলাদৃশ্য বর্তমান। মন্দিরের সম্মুখভাগে নৌকাবিলাস ও বস্ত্রহরণদৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেওয়ালের নিম্নদেশে বহু ক্ষেত্রে পৌরাণিক ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর দৃশ্যচিত্র রূপায়িত হয়েছে। পশ্চিম দিকে 'রামায়ণ প্যানেলে'র মধ্যে যে দৃশ্যগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হোল, সিন্ধুবধ, ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ এবং তার ফলে রাজা দশরথের চার ছেলের জন্ম, রাক্ষসগণের দ্বারা বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ পণ্ড, বিশ্বামিত্রের রামকে নিয়ে বনগমন, তাড়কাবধ, রামের হরধনুভঙ্গ এবং সীতার বিবাহ। শ্যামরায়-মন্দিরের মতো এখানেও কিছু কিছু অদ্ভুত আকৃতির পৌরাণিক জীবজন্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। এছাড়া বন্দুকধারী সৈন্যদের নৌযুদ্ধ, কর্তব্যরতা স্ত্রীর স্বামীর পদসেবা প্রভৃতি বৈষয়িক দৃশ্যও টেরাকোটায় প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলি ছাড়া এই মন্দিরে বিভিন্ন জীবজন্তুর চিত্র, যেমন পলায়মান মৃগ, বানরদের লম্ফ-ঝম্ফ, বাঘের ডাক, বন্যশূকর জীবন্তরূপে উপস্থিত হয়েছে। একস্থানে (উত্তরে) খিলানপথের ওপরে লঙ্কাযুদ্ধের জ্বলন্ত দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বানরদল ও রাক্ষসদের মধ্যে যুদ্ধদৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। দশাবতার ও দিক্‌পালদের টেরাকোটা-ফলকও এখানে আছে। কোন কোন স্থানে দেওয়ালের নিম্নাংশে অভিজাত বাবুবিলাসের দৃশ্যও উপস্থিত। একটি বিশাল আকারের প্রায় তিন ফুট উচ্চতার ষড়ভুজ কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গমূর্তি গর্ভগৃহের দেওয়ালে বর্তমান, যা সাধারণত কোন মন্দিরে দেখা যায় না। মহাপ্রভুর বিধ্বস্ত 'জোড়বাংলা' মন্দিরও কেষ্টরায়ের মন্দিরের অনুরূপ ছিল বলে মনে করা যায়। এটি গোপাল সিংহের রাজত্বকালে ১৭৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে কারও কারও ধারণা। (দ্রষ্টব্য, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭১ পৃ ৯৩)

বিষ্ণুপুরে শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' ছাড়া অপর একটি 'পঞ্চরত্ন' গোয়ালপাড়ার মদনগোপালের। এটি পাথরে তৈরি। দেওয়ালে পদ্মফুলের কিছু ভাস্কর্য ছাড়া অন্য কোন মূর্তিভাস্কর্য নেই। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন প্রথম রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহের মহিষী শিরোমণি বা চূড়ামণি। ৯৭১ মল্লাব্দ বা ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বসুপাড়ায় শ্রীধরের 'নবরত্ন' মন্দির বিষ্ণুপুরে এই শৈলীর একমাত্র মন্দির বলে কেউ কেউ মনে করেন। (দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থ, পৃ,৯১)। এটি স্থানীয় বসুবংশের কোন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত। টেরাকোটার কিছু মূর্তিফলক মন্দিরের পুবদিকের দেওয়ালে নিবদ্ধ। এর মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনী, কৃষ্ণলীলা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সেযুগের বন্দুকধারী য়ুরোপীয় সৈনিকদেরও কিছু মূর্তি এখানে স্থান পেয়েছে। বিষ্ণুপুরের 'খড়বাংলাপাড়া'য় রাধাবিনোদ ও রাধারমণের মন্দিরদুটি 'আটচালা' রীতির, যদিও প্রথমটির সামনের অংশ বহুকাল আগে বিধ্বস্ত। এগুলি পূর্বোক্ত বিষ্ণুপুরী কাটাচাল আটচালা-রীতিতে নির্মিত হয়। ৯৬৫ মল্লাব্দ বা ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা রঘুনাথ সিংহের মহিষী এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

ওপরের আলোচিত মন্দিরগুলি থেকে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্মের যে এক দৃঢ় ভিত্তিভূমি

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ষোল শতকের শেষ থেকে এখানে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সময় শ্রীনিবাসাচার্য মল্লভূম-বিষ্ণুপুরে মল্লরাজ বীর হাম্বিরকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। তার পূর্বে সম্ভবত এঁরা শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর শিব এঁদের কুলদেবতা ছিলেন। এটা জানা যায় মল্লেশ্বর মন্দিরের লিপিতে 'কুলীনাথ' এই কথাটি থেকে। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত বীরহাম্বির প্রথম যে দেবসৌধটি স্থাপন করেছিলেন, সেটি বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাসমঞ্চ (১৬০০ খ্রি.), যার মধ্যে আমরা প্রথম মহাপ্রভুর নামসংকীর্তনের টেরাকোটা-ফলক লক্ষ্য করি। পরবর্তী মল্লরাজারা সব মন্দিরই রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেন। ইঁট ও পাথরে তৈরি এই সব মন্দিরে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে মহাসমারোহ ঘটেছিল, তা আজও সমগ্র বাংলায় আদর্শস্থানীয় হয়ে আছে। এদের সমকক্ষ আর কোন মন্দির পশ্চিম বাংলা তথা বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের পূর্ব দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনাথের ভগ্ন 'নবরত্ন'টিকে (সব 'রত্ন'ই ভগ্ন, ১৭৫২ খ্রি) কেউ কেউ 'জোড়বাংলা' বা 'শ্যামরায়' মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে এই তুলনা সমীচীন নয়।

বিষ্ণুপুরের বাইরে বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানে আমাদের আলোচিত পূর্বোক্ত মন্দিরগুলিও শুধুমাত্র প্রাচীনত্বের দিক থেকেনয়, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য। শেষমধ্যযুগে বাংলার মন্দির-শৈলী ও মন্দিরাশ্রিত অলংকরণের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী বিপ্লব উপস্থিত হোল, বিষ্ণুপুরে সতের শতকের আরম্ভ থেকেই তার গভীর প্রভাব পড়েছিল। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের রসধারায় স্নাত হয়ে সেই স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষ ঘটল গৌড়বঙ্গের এই অংশেই। এরই প্রভাবমণ্ডলে মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় পরবর্তীকালের মন্দিরগুলি নির্মিত হয়। কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সেগুলির মধ্যে পড়লেও বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে যে 'আদর্শ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার অনুসরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে পশ্চিমবাংলার বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুরের শেষ মধ্যযুগীয় মন্দিরগুলি এই বাঁকুড়ার 'আদর্শের' অনেকটাই অনুসরণ করেছিল বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে থাকায়।

৯

মেদিনীপুরের মন্দির

বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণপার্শ্ব সংলগ্ন মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মন্দিরের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সীমান্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাব অন্তর্ভুক্ত মেদিনীপুর জেলায় অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল মধ্যযুগ থেকে। তার মধ্যে ওড়িশী ও বাংলা এই দুই শৈলীর মন্দিবের অভূতপূর্ব বিকাশ এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। তিন ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি গৌড়বঙ্গীয়, ওড়িশী ও আদিবাসী সংস্কৃতির সমন্বয় মেদিনীপুর জেলার মতো বাংলার আর কোন জেলায় হয়নি। এই জেলাব মন্দিরশিল্পের ক্রমবিকাশে এই সংস্কৃতি-সমন্বয় তাই একসময় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। জেলার উত্তর আর উত্তব-পূর্বাংশে প্রাচীন বঙ্গীয় সংস্কৃতি, দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল ওড়িশার আওতায় দীর্ঘকাল থাকার ফলে ঐ অঞ্চলে ওড়িশী সংস্কৃতি এবং পশ্চিমাংশের অরণ্যানী সমাকীর্ণ অঞ্চলে আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকায় আদিবাসী সংস্কৃতি বিকাশলাভ করেছে দীর্ঘকাল ধরে। এই তিন ভিন্ন সংস্কৃতিব মিলনক্ষেত্র মেদিনীপুর জেলায় মন্দিরশিল্পেব লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছে পূর্বোক্ত দুটি নির্দিষ্ট শৈলীর মধ্য দিয়ে। মেদিনীপুর জেলায় পাল-সেন যুগের 'শিখব' মন্দির নির্মাণের ঐতিহ্যবাহী ধারাটি তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। পাল-সেন যুগে প্রচলিত সু-উচ্চ 'নাগর' রীতির অলঙ্কৃত শিখর-মন্দিরের বদলে ওড়িশায় বিবর্তিত 'নাগব' শৈলীর প্রাচীন 'রেখ' ও 'ভদ্র' রীতির মন্দির এই জেলায় অধিক সংখ্যায় লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে, চৈতন্যপরবর্তী যুগে 'চালা', 'চাঁদনি', 'দালান', 'দেউল' এবং 'রত্ন' মন্দিরগুলির যে অভূতপূর্ব বিকাশ সাবা বাংলায় মন্দিরস্থাপত্যের ক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্তন করে এবং যার উল্লেখযোগ্য বিকাশকেন্দ্ররূপে বর্ধমান, বাঁকুড়া- বিষ্ণুপুর অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায়, মেদিনীপুর জেলার উত্তব ও পূর্বাংশে সেই 'বাংলা' রীতির মন্দিরের সবিশেষ উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। এই দুটি শৈলীর বিকাশক্ষেত্ররূপে এই জেলার দুটি ভৌগোলিক সীমা চিহ্নিত করা যেতে পারে। এক, দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম ভূভাগ যেখানে প্রধানত ওড়িশী 'শিখর' মন্দিরের আধিক্য। দুই, উত্তর ও পূর্ব ভাগ যেখানে 'বাংলা'-শৈলীব মন্দিরের সর্বাধিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুর জেলার মন্দিরগুলি এই দুটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিপুল সংখ্যায় নির্মিত হয়েছিল দুটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের ইতিহাসে এই কারণে মেদিনীপুর জেলার গুরুত্ব খুবই বেশি।

এই জেলার বেশির ভাগ মন্দিরই নির্মিত হয়েছে শেষ-মধ্যযুগে। কিন্তু আদিমধ্যযুগের মন্দিরের অস্তিত্বও এই জেলার বিস্তীর্ণ ভূভাগের কোন কোন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীনকালে এখানের ভূখণ্ডে মন্দিরস্থাপত্যশৈলী কীরূপ ছিল, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না করা গেলেও বিভিন্ন যুগে এই জেলার নানাস্থানে যে অনেক মন্দির-দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা অনুমান ক'রে নেওয়া যায়। কয়েকজন চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণী থেকে জানতে পারা যায়, প্রাচীনকালে এখানে বিশেষ করে তাম্রলিপ্তে বেশ কিছু হিন্দু মন্দির ছিল। ফা-সিয়েন, সুয়ান সাঙ প্রমুখ পরিব্রাজক তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারামগুলির সঙ্গে অনেক হিন্দু মন্দিরও দেখেছিলেন। সুয়ান সাঙের (খ্রি. সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ) বিবরণী থেকে জানতে পারা যায়, সে-সময় তিনি পঞ্চাশটি হিন্দুমন্দির তাম্রলিপ্তে দেখেছিলেন। কিন্তু সেসব মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী কিরূপ ছিল, তা আজ আর জানার কোন উপায় নেই। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, মেদিনীপুর জেলার সীমান্তবর্তী পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া

জেলায় এবং বর্ধমান ও চব্বিশপরগনায় পাল-সেন যুগের যে কয়েকটি মন্দির তাদের অস্তিত্ব এখনও বজায় রেখেছে, এই জেলায় সে-সময়ের কোন মন্দিরের অস্তিত্ব কিন্তু আজও নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ অনুসন্ধান করে এই জেলায় বেশ প্রাচীন কয়েকটি মন্দিরের অস্তিত্ব জানতে পারা গেছে। এগুলি হোল্, ঢেকিয়ার ঝাড়েশ্বর (খড়্গপুর), খড়্গপুরের খড়্গেশ্বর (দুটিরই 'বাঢ়' অংশ প্রাচীন, 'গণ্ডী' ও অন্যান্য অংশ নবীকৃত), জিনশহরের (খড়্গপুর) পবিত্যক্ত ও ভগ্ন দেবালয় এবং ডাইনটিকরির (বিনপুর) তথাকথিত বঙ্কিণীদেবীর মন্দির। ডাইনটিকরিব মন্দির 'পিঢ়' বা 'ভদ্র' রীতির এবং এখনও অক্ষত। এই মন্দিরগুলির সবই মাকড়া পাথরে তৈরী। ঢেকিয়া ও খড়্গেশ্বরের মন্দির 'শিখর'-রীতির ছিল যার 'গণ্ডী' অংশ ভেঙে যাওয়ায় নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল। অপরপক্ষে, জিনসহরের মন্দিরশৈলীর সঠিক ধারণা করা কঠিন। সংকীর্ণ গর্ভগৃহের চারপাশে প্রদক্ষিণপথ এবং সামনে দুটি পার্শ্বপ্রকোষ্ঠসহ (যার একটি ভগ্ন) ভগ্ন 'মুখমণ্ডপ' (যদিও এই মুখমণ্ডপের অনেকটাই বিধ্বস্ত) এখনও লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটির ওপরের অংশ বহুকাল বিধ্বস্ত। দেওয়ালে 'পঞ্চরথ' বিন্যাস এবং দুদিকের দেওয়ালে 'পুরুষসিংহ' ও সিংহমূর্তির দুটি অস্পষ্ট ভাস্কর্য নিঃসন্দেহে প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। ঢেকিয়ার মন্দিরে 'বাঢ়' অংশের 'জাংঘে' যে শূন্য চৈত্য লক্ষ্য করা যায়, সেখানে পূর্বে কোন মূর্তিভাস্কর্য প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে অনুমান করা যায়। ডাইনটিকরির মন্দিরের 'তলজাংঘের' 'রাহা' অংশগুলিতেও এধরণের চৈত্য দেখা যায়। এই সব চৈত্যের উপরিভাগে কলশ চিহ্নিত আছে। মন্দিরটির ছাদ সাতটি পিঢ়ার সমষ্টি এবং গর্ভগৃহ খুবই সংকীর্ণ। উপরি উল্লিখিত মন্দিরগুলির ভিতরের ছাদ সবই 'লহরা' কবা।

এই মন্দিরগুলি ছাড়া মেদিনীপুর জেলার আরও কয়েকটি লুপ্ত প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব অনুমান করা গেছে। এগুলির সবই এই জেলার পশ্চিমাংশে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় অবস্থিত ছিল। রোহিণীর (শাঁকরাইল থানা) ভৈরবডাঙার উঁচু ঢিবিটি একটি উচ্চ 'শিখর'-মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ বলে জানা যায়। ধ্বংসস্তূপের নিচে মাকড়া পাথরের দেওয়ালে 'রথ'-বিন্যাস ও পা-ভাগের মোলডিং এখনও লক্ষ্য করা যায়। এটি সুবর্ণরেখার সন্নিকটবর্তী। উল্লেখ্য, ওপারে রামেশ্বরনাথের উচ্চ 'শিখর' মন্দিরটি অবস্থিত। গিধনির সন্নিহিত নুনিয়ায় (জাম্বনী) বিধ্বস্ত জগন্নাথ মন্দির (বর্তমানে এটিকে একেবারে ভেঙে দিয়ে নূতন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে) এবং অদূরবর্তী পরিহাটিতেও (বিনপুর) জগন্নাথের একটি মন্দির ছিল। শিলদার (বিনপুর) সন্নিহিত ওড়গোন্দায় এবং কেশিয়াড়ি থানার কিয়ারচাঁদ প্রান্তরে লুপ্ত 'শিখর' মন্দিরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এসব স্থানে একাধিক বৃহৎ 'আমলক' খণ্ড লক্ষ্য করা গেছে। কিয়ারচাঁদ প্রান্তরে মাকড়া পাথরের ছোট ছোট অনেক 'প্রতিকৃতি দেউল' মৃৎপ্রোথিত ছিল (বর্তমানে সেগুলির বেশির ভাগই অপসারিত)। এই প্রান্তরে পতিত একটি বৃহৎ আমলক প্রস্তর এটাই প্রমাণ করে, কোন না কোন সময়ে এখানে একটি উচ্চ 'শিখর' মন্দির অবস্থিত ছিল। হয়তো তারই চার পাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিকৃতি মন্দিরগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। কিয়ারচাঁদের আরও পশ্চিমে পাথরকাটি গ্রামে (শাঁকরাইল) 'প্রস্তরপুরী বিহার' নামে পরিচিত মাকড়া পাথরের যে প্রাচীন ইমারতের ধংসাবশেষ ও কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি বর্তমান গ্রন্থকারকর্তৃক দৃষ্ট হয়েছে, সেটিও একটি প্রাচীন মন্দির বা বিহারের ধ্বংসস্তূপ বলে অনুমান করা যায়। এইসব ধ্বংসাবশেষ বা মন্দিরের অংশ থেকে এটা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে, মেদিনীপুর জেলায় প্রাচীনকাল থেকেই বিহার ও মন্দির-নির্মাণরীতি প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে, জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমাংশে বিহার ও মন্দির-নির্মাণ বেশ কিছুকাল

রে চলেছিল।

মুসলমান-আক্রমণের আগে পাল-সেন যুগের বৈশিষ্ট্যযুক্ত উচ্চ 'শিখর' মন্দির এই জেলাতেও নির্মিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়া ও সোনাতপল, পুরুলিয়ার ড়াম, বর্ধমানের সাতদেউলিয়া, বরাকর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জটার মতো সেই সময়ের অলঙ্কৃত উচ্চ 'শিখর' মন্দির এই জেলায় একটিও পাওয়া যায় না। অবশ্য, জৈন বা বৌদ্ধ বিহারের উপস্থিতি ওপরের আলোচনা থেকে কিছুটা অনুমান করা যাচ্ছে। জিনশহবের মন্দিরকে একটি প্রাচীন জৈন বিহার বলে অনুমান করলে অসঙ্গত হয় না। এই স্থানের একটি পাথরের ফ্রেমে কয়েকটি জৈনমূর্তি চিহ্নিত আছে দেখা যায়। জিনশহর নামটিও এক্ষেত্রে তাৎপর্যবহ। মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলে জৈনধর্ম যে এককালে বিশেষ প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈন ভাস্কর্যের কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন পরিহাটি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। জৈনমূর্তি আরও পাওয়া গেছে জেলার নানা স্থান থেকে। উত্তর- পশ্চিমে বগড়িডিহিতে (গড়বেতা) আবিষ্কৃত জৈনতীর্থঙ্কর আদিনাথেব মূর্তিটি (আঃ ১০ম শতাব্দী) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। পক্ষান্তরে, বুদ্ধমূর্তির সংখ্যাও কম নয়। এই জেলার স্থানে স্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রসারও হয়েছিল প্রাচীনকালে। চন্দ্রকোণা ও উত্তরবাড়ে (দাসপুর) কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া বিষ্ণু ও সূর্যের প্রাচীন মূর্তিও এই জেলার নানা স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব মূর্তি প্রাচীনকালে কোন না কোন মন্দিবে অধিষ্ঠিত ছিল, একথা অস্বীকার কবা যায় না। এই জেলার বহু মন্দিরে অনেক প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি এখনও লক্ষ্য করা যায়। পাথরের মূর্তির অনেকগুলিতে প্রাচীন বাংলার পিঢ় বা ভদ্র-রীতির দেউল চিহ্নিত দেখা যায়। অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পাণ্ডুলিপি থেকে (১০১৫ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত) যেসব মন্দিরের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করেছেন, তার মধ্যে প্রাচীন বাংলার দণ্ডভুক্তির যজ্ঞপিণ্ডিলোকনাথের একটি মন্দিরের প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে। সেটি প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত 'স্তূপশীর্ষভদ্র' রীতির বলে জানা যায়। (দ্রষ্টব্য, Architecture of Bengal, Book 1, 1976/ S. K. Saraswati , পৃষ্ঠা ৭২-৭৩)। প্রাচীন দণ্ডভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ও তৎসংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও ওড়িশার বালেশ্বর নিয়ে গঠিত ছিল বলে জানা যায়। এই দৃষ্টান্তটি থেকে মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন মন্দিরস্থাপত্যশৈলীর এক পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত শিখর, পিঢ় বা ভদ্র, স্তূপশীর্ষ ভদ্র ও শিখরশীর্ষভদ্র- এই চার প্রকার মন্দির এই জেলাতেও নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

এই জেলার মন্দিরশিল্প প্রাচীনকালে, বিশেষত আদিমধ্যযুগে, দক্ষিণদিক থেকে আগত ওড়িশার 'শিখর'-মন্দিরশৈলীর দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল, একথা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে, বিশেষ করে, মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে ওড়িশার যোগসূত্রটা সেসময় খুবই ঘনিষ্ঠ থাকায় ওড়িশী-রীতির 'শিখর'-মন্দির (যা প্রাচীন ভারতের 'নাগর' রীতিরই এক বিবর্তিত রূপ) এই জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের ওড়িশা-সংলগ্ন অঞ্চলে নির্মিত হতে থাকে, বাঁকুড়া ও বর্ধমানেও এই শৈলী ক্রমপ্রসারিত হয়। মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন শিখরমন্দিরগুলির সবই তাই ওড়িশী 'নাগর'-রীতিতে নির্মিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার খুব কম জেলাতেই এখানকার মতো খাঁটি ওড়িশী রীতিতে তৈরি মন্দির দেখা যায়। এই ওড়িশী শিখরমন্দিরশৈলীর দুই ভিন্ন প্রবাহ বা রূপ মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানাসংলগ্ন ওড়িশার বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ

জেলা থেকে এই জেলাব দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত রূপ লাভ করে। এই দুই ভিন্ন রূপের একটি হোল, ময়ুরভঞ্জের খিচিং-এ বিকশিত একাদশ-দ্বাদশ শতকে ভঞ্জরাজাদের শাসনকালে 'মুখমণ্ডপ'-বর্জিত শিখর-রীতি। (দ্রষ্টব্য), Note on Some Ancient Monuments of Mayurbhanj-R P. Chanda, Journal of thc Bihar and Orissa Research Society. June, 1927. । এই রীতির প্রচলন বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে এবং বাঁকুড়া ও বর্ধমানে হয়েছিল (দ্রষ্টব্য, Indian Architecture, Brown Vol I, পৃষ্ঠা ১৪৯)। মেদিনীপুর জেলায় এই রীতির প্রাচীন মন্দির খুব কম হলেও পরবর্তীকালে এই জেলার নানা স্থানে নির্মিত সরলীকৃত দেউলরূপটির সঙ্গে (মুখমণ্ডপ-বর্জিত) এই রীতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই দেউলগুলি আঠার-উনিশ শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছে বেশি এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে এগুলির রূপও বহুলাংশে পরিবর্তিত। খিচিং শৈলীর এক প্রাচীন নিদর্শন দেখা যায় গিলাকাঁটিয়ার (গোপীবল্লভপুর থানা) তথাকথিত মদনমোহনের ইঁটের পরিত্যক্ত মন্দিবে। উল্লেখ্য, এই স্থান ময়ূরভঞ্জ জেলার প্রান্তবর্তী। 'জগমোহন'-বর্জিত এই দেউলটি খিচিংশৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। অথচ, এরই প্রায় দশ কিলোমিটার পূর্বে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী রামেশ্বরনাথের মন্দিরটিতে জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ যুক্ত রয়েছে দেখা যায়। ওড়িশী শিখরশৈলীর দ্বিতীয় রূপটি 'বিমান' বা মূল শিখর মন্দির এবং তার সম্মুখ-সংলগ্ন জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। 'বিমান' ছাড়া বাকি সবগুলি পিঢ় বা ভদ্ররীতিতে তৈরি। মেদিনীপুর জেলার এই রীতির মন্দিরগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাট-মন্দির ও ভোগমণ্ডপ দেখা যায় না। এই জেলার নানাস্থানে এই রীতির মন্দির বেশ কিছু নির্মিত হয়েছে। তাদের জগমোহনের সঙ্গে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 'বারদুয়াবী' নাটমন্দির যুক্ত হয়েছে। মূলমন্দিব বা বিমানও কোন কোন ক্ষেত্রে শিখররীতির না হয়ে পিঢ় রীতির হয়েছে, যেমন কেশিয়াড়ির সর্বমঙ্গলা (এখানকার বারদুয়ারী নাটমন্দির লক্ষণীয়)।

এই দ্বিতীয় রীতির মন্দিরগুলির বেশিরভাগই মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কয়েকটি অবশ্য উত্তরাংশেও লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণাঞ্চলের স্থানগুলি হল, সহস্রলিঙ্গ বা সন্তনি ও দেউলবাড় (নয়াগ্রাম), কেশিযাড়ি, দাঁতন, এগরা, বাহিরী (কাঁথি) প্রভৃতি। উত্তরাঞ্চলের স্থানগুলি কর্ণগড় (শালবনি), ধলহরা ও কুঁয়াই (কেশপুর), গড়বেতা ও চন্দ্রকোণা (রঘুনাথবাড়ি)। একমাত্র কেশিয়াড়িব সর্বমঙ্গলা ও বাহিরীর পরিত্যক্ত জগন্নাথ মন্দির ছাড়া কোন স্থানের মন্দিরেই লিপি নাই। বাহিরী (১৫৮৪ খ্রি.) ও কেশিয়াড়ির (১৬০৬-১৬১২ খ্রি.) মন্দির যথাক্রমে ষোল শতকের শেষ ও সতের শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। উল্লেখযোগ্য, বাহিরী ও কেশিয়াড়ির মন্দিরে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ওড়িয়া লিপি আছে। সুবর্ণরেখার দক্ষিণতীরবর্তী নয়াগ্রাম থানার সন্তনি গ্রামের সহস্রলিঙ্গ ও দেউলবাড়ের রামেশ্বরনাথের মন্দির জগমোহন প্রভৃতি যুক্ত। এগরার হটনাগর ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত বলে জানা যায়। এটিই একমাত্র ইঁটের তৈরি। দাঁতনের শ্যামলেশ্বর ভদ্ররীতির। বাহিরীর মন্দিরও জগমোহনযুক্ত, তবে ভদ্ররীতির নয়। কর্ণগড়ের দণ্ডেশ্বর ও মহামায়া, ধলহরার বটেশ্বর, কুঁয়াই-এর কামেশ্বর (স্থানীয়ভাবে এটি 'নেড়াদেউল' নামে পরিচিত), গড়বেতার সর্বমঙ্গলা এবং রঘুনাথবাড়ির (অযোধ্যা, চন্দ্রকোণা) রঘুনাথমন্দির জগমোহন যুক্ত। গড়বেতার সর্বমঙ্গলায় জগমোহনের সঙ্গে 'অন্তরাল' বা 'যোগমণ্ডপ' এবং একটি বৃহৎ 'চারচালা' নাটমন্দির (চতুর্দশদ্বারী) যুক্ত হয়েছে। গড়বেতায় কণ্ডরেশ্বর মন্দিব 'ভদ্র'রীতির, কিন্তু জগমোহন নেই। নিকটবর্তী কানু গোঁসাই এর সমাধিমন্দিরও এই রীতিতে তৈরি। উল্লিখিত সব মন্দিরই

আনুমানিক পনের শতক থেকে আঠারো শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। তবে এগুলির মধ্যে সহস্রলিঙ্গ, রামেশ্বরনাথ, কামেশ্বর ও গড়বেতার সর্বমঙ্গলা আরও প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়। সব মন্দিরেই পিষ্ট, বাঢ়, গন্ডী ও শীর্ষ নির্দিষ্টভাবে উপস্থিত।

এই মন্দিরগুলি মেদিনীপুর জেলায় ওড়িশী শিখর বা পিঢ়রীতির স্থাপত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে বিবেচিত হলেও এরূপ খাঁটি ওড়িশী রীতির মন্দির আরও পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে, যেমন, কেদার গ্রামে (এগরা) গিরিমোহান্তদের কেদার ভুড়ভুড়ির দেউল ও মাড়োতলায় (সত্যপুর, ডেবরা) সত্যেশ্বর দেউল। এই দুটি মন্দিরেই জগমোহন নেই। ডেবরা থানার কেদার গ্রামে কেদার ভুড়ভু ড়ির দেউল জগমোহন ও নাটমন্দির যুক্ত। কিন্তু সংস্কারের ফলে এটির আসল রূপ অনেকটা পরিবর্তিত। আবার ইঁটের তৈরি রাজনগরের (পাঁশকুড়া) ঝাড়েশ্বরের দেউলটি অনেকটা পরিবর্তিত হলেও এতে ওড়িশী শিখর রীতির রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। ওড়িশী শিখরমন্দিরের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তমলুকের বর্গভীমা, জিষ্ণুহরি, রামজীউ ও তমলুক রাজবাড়ির দেউলগুলিতে। প্রতিটির সঙ্গেই 'চারচালা' জগমোহন যুক্ত হয়েছে। কিন্তু শীর্ষে আমলকের ওপর স্তূপের মতো একটি গোলাকার বস্তু বর্তমান, বিশেষ করে, বর্গভীমায় এটি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এটি কি প্রাচীন স্তূপশীর্ষ-ভদ্র বা দেউলের পরিবর্তিত রূপ? চারচালা জগমোহনযুক্ত অপর একটি দেউল মন্দির পাইকভেড়ির শ্যামসুন্দর (ভগবানপুর)। আবার মালঞ্চের (খড়গপুর) নন্দেশ্বর (১৭২০ খ্রি.), নিকটবর্তী চণ্ডীপুরের বীজেশ্বর এবং পঁচেটের (পটাশপুর) কিশোররায়ের শিখরমন্দিরের সঙ্গে যে জগমোহন যুক্ত রয়েছে তার চাল 'থাকে থাকে' সন্নিবদ্ধ হলেও চালার ভাবটি স্পষ্ট। শিখররীতির আরও বহু মন্দির এই জেলার দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে।

মেদিনীপুর জেলায় এই ওড়িশী রীতির মন্দিরগুলির সংখ্যাধিক্যের পশ্চাতে দুটি কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, এগারো শতকের শেষদিকে ওড়িশার রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সময় থেকে এই জেলার প্রায় সমস্ত অংশই ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ওড়িশী সংস্কৃতি এই জেলার বিস্তীর্ণ ভূভাগকে প্রভাবিত করেছিল। পরে বাংলাদেশে মুসলমান-বিজয়ের গোড়ার দিকে উৎকলরাজ অনঙ্গভীমদেবের সময়ে ওড়িশী সংস্কৃতি আরও প্রসার লাভ করে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই দুই দিকেই সমগ্র মেদিনীপুর জেলা ওড়িশা রাজ্যের প্রভাবাধীন থাকে অন্তত খ্রি. ষোল শতকের মাঝামাঝিমুকুন্দদেবের সময় পর্যন্ত সম্ভবত এই সময়ের মধ্যেই পূর্ব কথিত বিলুপ্তপ্রায় মন্দিরগুলি এবং আরও বহু মন্দির এই জেলার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমাংশের বহু স্থানে নির্মিত হয়েছিল। কেশিয়াড়ি থানার গগনেশ্বর গ্রামে কুরুমবেড়া দুর্গে গগনেশ্বর শিবের যে ওড়িশী শিখরমন্দিরের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়, সেটিও পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজা কপিলেন্দ্রদেবের শাসনকালে নির্মিত হয় বলে জানা গেছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে যখন মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত, সেসময়ে ওড়িশা ও বর্তমান মেদিনীপুর জেলার প্রায় সর্বাংশে ওড়িশার হিন্দু রাজাদের শাসন অব্যাহত। সুলতানী শাসন এই দিকে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। এর ফলে ধর্মীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ওড়িশী রীতির 'শিখর'-মন্দির নির্মাণ নির্বাধে চলতে থাকে।

ওড়িশী শিখররীতি ছাড়া শেষ-মধ্যযুগের 'বাংলা'-রীতির মন্দির এই জেলায় নির্মিত হয়েছে অসংখ্য। পূর্বকথিত পরিবর্তিত দেউলরীতির মন্দিরও এই সময় অনেক তৈরী হয়েছে। এই জেলার 'চালা' 'চাঁদনি, 'রত্ন' ও পরিবর্তিত ওড়িশী 'দেউল' মন্দিরগুলি উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশেই সর্বাধিক সংখ্যায় নির্মিত হয়েছে সতের শতক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। ওড়িশী

শিখর মন্দিরের ধারা যেমন দক্ষিণে ওড়িশা থেকে এই জেলার নানা অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল, শেষ-মধ্যযুগীয় 'বাংলা' মন্দিরশৈলীর প্রবাহও সেইরূপ উত্তরে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চল থেকে গড়বেতা ও সংলগ্ন স্থানসমূহের মধ্য দিয়ে ক্রমশ পূর্বদিকে রূপনারায়ণ ও কংসাবতী-তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে প্লাবিত করেছিল। 'বিষ্ণুপুর-ঘরানা'র অন্ততঃ তিনটি প্রাচীন মন্দির গড়বেতা অঞ্চলে আছে— গড়বেতায় রাধাবল্লভের আটচালা (১৬৮৬ খ্রি.), উড়িয়াশাহির বিধ্বস্ত মন্দির (১৬৯০ খ্রি.) এবং রঘুনাথবাড়ির (বগড়ি) পরিত্যক্ত নবরত্ন (আ. ১৭ শতকের শেষ)। গোয়ালতোড়ের সনকার 'চারচালা'ও এই সময়ের বলে মনে করা হয়। উক্ত মন্দিরগুলি মাকড়া পাথরে তৈরি। রঘুনাথবাড়ির মধ্যে ভাস্কর্যের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গড়বেতাসহ বগড়ি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মন্দিরগুলি তৈরি হয়েছিল। পরে আঠারো শতকের শুরু থেকে বিষ্ণুপুর শৈলীর 'চালা' ও 'রত্ন' মন্দির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অধিক সংখ্যায় নির্মিত হয়েছে রূপনারায়ণ উপত্যকাসন্নিহিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। পরবর্তীসময়ে বহু সংখ্যক ইঁটের ও টেরাকোটা অলংকৃত মন্দির এই জেলার উত্তর ও পূর্বাংশে নির্মিত হয়েছে। মেদিনীপুর জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দু-ভাগে ভাগ করলে উত্তরে চন্দ্রকোণা থেকে দক্ষিণে দাঁতন পর্যন্ত যে একটি বিভাজনরেখা পাওয়া যায় (রেলপথও এই রেখার সমান্তরালে অবস্থিত), সেই রেখার পূর্বভাগে পূর্বোক্ত রীতির মন্দিরগুলির সর্বাধিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই অংশে উত্তর দিক থেকে শুরু করে চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর, কেশপুর, ডেবরা, পাঁশকুড়া, তমলুক, পিংলা, ময়না, সবং, ভগবানপুর, পটাশপুর, কাঁথি থানাগুলি অবস্থিত। শিলাই, কাসাই, রূপনারায়ণ ও হুগলি নদীর পলিমাটিতে গড়া এই সব অঞ্চল। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে সব চেয়ে বেশি 'বাংলা'-রীতির মন্দির রয়েছে চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর, কেশপুর, ডেবরা, পিংলা ও পাঁশকুড়া থানায়। চন্দ্রকোণার কয়েকটি মন্দির ও তার পাশাপাশি কিছু কিছু স্থান ছাড়া মন্দিরগুলি সবই ইঁটের তৈরি। চালা, চাঁদনি ও রত্নরীতির মন্দিরগুলি সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছে ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, ক্ষীরপাই ও জাড়ায় এবং দাসপুর থানার নানা স্থানে। এই সব স্থানে 'একচালা' ও 'দোচালা'-রীতির মন্দির একপ্রকার নেই বললেই চলে। অন্যত্রও খুবই বিরল। রামপুরে (দাসপুর) কালুরায়ের 'দোচালা' (আ· ১৯ শতক) ও পাইকপাড়ির (ডেবরা) সিংহবাহিনীর দোচালা নাটমন্দির, শিলদা রাজবাড়ির (বিনপুর) প্রবেশপথের ওপরও দোচালা লক্ষ করা যায়। দোচালার মতো 'চারচালা' অল্প না হলেও খুব বেশি বলা যায় না। মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে খড়ের চালার বাঁকানো কার্নিশ ও চালের ঢালু ভাবটি এসব মন্দিরে সুস্পষ্ট। সুন্দর চারচালা ও তৎসংলগ্ন চারচালা মুখমণ্ডপ কোন্নগরের (ঘাটাল) সিংহবাহিনী মন্দির। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল, এইটি বাংলার 'চালা' শৈলীর প্রাচীনতম মন্দির (১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ)। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকারের বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেছে ১৪১২ শকাব্দ বা ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের লিপিটি প্রকৃত পক্ষে সংস্কারকালীন। ১৭১৭ শকাব্দ বা ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি যখন সংস্কার করা হয় তখন পোড়ামাটির দুটি লিপিফলক সন্নিবেশিত হয়। গঠন-বৈশিষ্ট্য ও টেরাকোটা অলংকরণ পর্যবেক্ষণ করে এটি আঠারো শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত বলে মনে করা যেতে পারে। এই জেলার 'চারচালার' অপর একটি সুন্দর নিদর্শন গোয়ালতোড়ের সনকা। মাকড়া পাথরে তৈরি এই মন্দিরটির লিপি না থাকলেও গঠনবৈশিষ্ট্যে এটি সতেরো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে মনে করা যায়। 'চারচালা'র অপর নিদর্শনগুলি চন্দ্রকোণার রঘুনাথবাড়ির

রঘুনাথের 'তোষাখানা'। এটিও মাকড়া পাথরের এবং আনুমানিক আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি। জয়ন্তীপুরে (চন্দ্রকোণা) রাধাবল্লভ ও রঘুনাথপুরের (চন্দ্রকোণা) মন্দিরদুটিও চারচালা। এগুলি ছাড়া কেশপুর থানার মোষদায় বিশালাক্ষী (১৭৬৩ খ্রি.), অজিড়িয়ায় (দাসপুর) সাঁইদের 'রথ'বিন্যাসযুক্ত মনসার চারচালা এবং বিনপুর থানার শিলদা ও জয়পুরেও কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি চারচালা আছে। দেউলমন্দিরের সঙ্গে 'চারচালা'র 'জগমোহন'রূপে ব্যবহারও হয়েছে। যেমন, পাইকভেড়ি (ভগবানপুর) এবং বর্গভীমা (তমলুক)। সমাধি মন্দিরের ক্ষেত্রে এই শৈলীটি জেলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল একসময়, বিশেষ করে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে। ডিহিবলিহারপুরে (দাসপুর) গিরিধারীলাল গোস্বামীর 'চারচালা' সমাধিমন্দির বেশ প্রাচীন বলে মনে হলেও লিপির অভাবে সঠিক কাল নিরূপণ করা কঠিন। এই শৈলীর সমাধি মন্দির আরও আছে রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা), তমলুক (মহাপ্রভুবাড়ি) এবং গোপীবল্লভপুর বৈষ্ণবমঠের সমাধিক্ষেত্রে।

'আটচালা' মন্দির সর্বাধিক নির্মিত হয়েছে এই জেলায়। শুধু সংখ্যায় নয়, আটচালার বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায় অনেক স্থানে। আয়তন ও গঠনেও আটচালার বৈচিত্র্য বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে নিচের চারচালাটি ওপরের তুলনায় এত বড়ো যে ওপরের চালাটিকে শুধুমাত্র অলংকরণমাত্র মনে হয়। এই জেলার আটচালার অন্য একটি রূপ দেখা যায় ওপরের চালাটি একটি পৃথক কক্ষের আকার না নিয়ে চারচালার ওপরেব চারিদিক কেটে দিলে যেমন দেখায়, সেইরূপ। অনেক খড়ের চালার ওপরের চারপাশ এইভাবে কাটা থাকে, তাতে ওপরের অংশকে একটি আলাদা চালার মতো দেখায়। বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে এই রীতির সূত্রপাত বলে কেউ কেউ মনে করেন (দ্রষ্টব্য, 'বাংলার মন্দির'- পঞ্চানন রায়)। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা এই রীতির কিছু কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (দ্রষ্টব্য, Late Mediaeval Temples of Bengal, Mccutchion, পৃষ্ঠা ৩২)। এধরনের আটচালা মন্দিরস্থপতিদের কাছে 'বিষ্ণুপুরী আটচালা' নামে পরিচিত ছিল। (দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৬)। এই জেলার 'বিষ্ণুপুরী আটচালা'র নিদর্শন, গড়বেতার রাধাবল্লভ (১৬৮৬) এবং সম্ভবত উড়িয়াশাহী (গড়বেতা) মন্দির (১৬৯০ খ্রি.)। অপর দৃষ্টান্ত শিলদার (বিনপুর) কিশোর কিশোরী (১৮২০ খ্রীঃ) ও রাজার গড়ের (কর্ণগড়) পরিত্যক্ত মন্দির। মেদিনীপুরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে এই রীতিটি প্রচলিত হলেও অন্যত্র তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। অবশ্য, ঘাটাল মহকুমার কোন কোন স্থানে এই রীতির মন্দির নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। আটচালার অপর একটি রূপ হোল, নিচের চালাটি অনেক ক্ষেত্রে বেশ খাড়া ও উঁচু হয়ে ওঠার পর ওপরের চালাটি খর্বাকৃতি হয়। অনেক সময় শীর্ষে তিনটি স্তূপিকা বা শিখা (ফিনিয়েল) বসানো থাকে। এই রীতির মন্দির জেলার নানা স্থানে নির্মিত হয়েছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উনিশ শতকের দিকে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নির্দশন ঃ (১) শীতলানন্দ (ক্ষীরপাই, হাটতলা, ১৮৩৯ খ্রি.) ও খড়কেশ্বর (ক্ষীরপাই,কদমকুণ্ডি ১৮৬১ খ্রি.), উমাপতি (গঙ্গাদাশসপুর, চন্দ্রকোণা, আ. ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), তারকনাথ (গোবিন্দপুর, পাঁশকুড়া, ১৮৮১ খ্রি.) এবং শীতলানন্দ (ছয়রসিয়া, পাঁশকুড়া, ১৮৯৮ খ্রি.)। অপর একটি রূপ, ওপরে একটি পৃথক কক্ষযুক্ত চালা। বাসুদেবপুরে (দাসপুর) রণরামের মন্দির এর একটি নিদর্শন ছিল। বহুকাল আগে মন্দিরটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই জেলার বৃহদায়তন আটচালাগুলি নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, যেমন খুকুড়দহের শিব (দাসপুর, আ: ১৯ শতক) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২২ ফুট ৬ ই. X ২২ফুট ১ই. এবং আ. উচ্চতা ৪৫ ফুট, লালজিউ (চন্দ্রকোণা, রঘুনাথবাড়ি, আ: আঠার শতকের প্রথমার্ধ)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ

যথাক্রমে ৩৬ ফুট ৯ ই. X ২৪ফুট এবং আ. উচ্চতা ৪০ ফুট, রাধাগোবিন্দ (চাঁইপাট, দাসপুর, ১৭৫৯ খ্রি.)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২৩ ফুট X ২০ফুট ২ ই. এবং আ: উচ্চতা ৪৫ ফুট, জগন্নাথ (তমলুক, হরিরবাজার)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৩৩ ফুট ১১ ই. X ২৮ফুট ১১ ই. এবং আ. উচ্চতা ৫০ ফুট, জগন্নাথ (রামবাগ, মহিষাদল ১৭১০ খ্রি.)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৪১ ফুট ৬ ই. X ৩৭ফুট ২ ই. এবং আ: উচ্চতা ৬০ ফুট, রামসীতা (বাসুদেবপুর, এগরা)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২৭ ফুট ৫ ই. X ২৬ ফুট এবং আ: উচ্চতা ৫০ ফুট এবং শ্যামাঠাকুরাণী (মালঞ্চ, খড়্গপুর, ১৭১২ খ্রি.)দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২৫ ফুট ৫ ই. X ২৩ ফুট এবং আ. উচ্চতা ৪৬ফুট ৬ ই.। আটচালার সঙ্গে মুখমণ্ডপরূপে অপর একটি আটচালাও যুক্ত দেখা যায়, যেমন, কুশপাতার (ঘাটাল) শিবমন্দির।

'বারো চালা' রীতির মন্দিরের প্রচলন খুব কমই হয়েছে মেদিনীপুব জেলায়। এই শৈলীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত, জলসরার (ঘাটাল) জলেশ্বর এবং নতুক-জয়কৃষ্ণপুরে (ঘাটাল) সাঁতরাদের দুটি মন্দির। অপর একটি মন্দির এগরা থানার চিরুলিয়ার রামচন্দ্রের মন্দির (১৮৪৩ খ্রি., দ্রষ্টব্য, ম্যাককাচ্চন,পৃষ্ঠা ৪০)।

বার চালার মতো 'জোড়বাংলা'-শৈলীটিও এই জেলায় তেমন দেখা যায় না। সর্বপ্রাচীন মন্দিরটি চন্দ্রকোণার দক্ষিণবাজারে অবস্থিত। মাকড়া পাথরে তৈরি পরিত্যক্ত ও ভগ্ন এই মন্দিরটি সতেরো শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। বারান্দার ভেতরে, গর্ভগৃহে ও বাইরের দেওয়ালে মূর্তি খোদিত। মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। অপর নিদর্শন লালগড় রাজবাড়ির (বিনপুর) রাধাকৃষ্ণ , জেলেপাড়ার (মেদিনীপুর শহর) ধর্মের মন্দির এবং পাইকপাড়ির (ডেবরা) প্রামাণিকদের সিংহবাহিনী (১৮১৬ খ্রি., পরিত্যক্ত)

চালার ন্যায় 'চাঁদনি' নামে এক রীতির মন্দির এই জেলায় প্রচুর নির্মিত হয়েছে। কেউ কেউ এই রীতির মন্দিরকে 'দালান' নামে উল্লেখ করেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, দালানের সঙ্গে 'চাঁদনি'ব এক সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। আকার ও আয়তনের দিক থেকে চাঁদনি ও 'দালান' পৃথক বলেই মেদিনীপুরের মন্দিরস্থপতিবা এই দুটি স্বতন্ত্র রীতিকে 'চাঁদনি' ও 'দালান' এই দুই ভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। মন্দিরলিপিতেও তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। প্রকৃত দালানকে তাঁরা লিপিতে 'দালান' ও প্রকৃত 'চাঁদনি'কে তাঁরা লিপিতে 'চাঁদনি' বলে উল্লেখ করেছেন। ক্ষীবপাই এর (চন্দ্রকোণা) 'হাটতলায়' শিবপ্রসাদ দের প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের (১৮৬৪ খ্রি.) টেরাকোটা লিপিতে 'চাঁদনি' এই কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রামজীবনপুরের পুরাতনহাটে নন্দীদের কালীর ভগ্ন মন্দিরে সংস্কারকালীন যে লিপি আছে, তাতে 'চাঁদনি' এই কথাটি পাওয়া যায়। তমলুকের হরির বাজারে জগন্নাথ ও রামজীউ মন্দিরের সামনে যে নাটমন্দিরদুটি বর্তমান, সেখানেও 'চাঁদনি' এই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চাঁদনি দুটি তৈরি করেন হুগলি জেলার সেনহাটির অশ্বিনীকুমার মিস্ত্রী ১৯২০ সালে। চাঁদনি রীতির মন্দির প্রায় সবই ক্ষুদ্র, আয়ত বা বর্গক্ষেত্রাকার, সমতল ছাদ ও সরল কার্নিশ যুক্ত। সামনের বারান্দার দুটির বেশি খিলানপ্রবেশপথ থাকে না এবং গর্ভগৃহের একটিমাত্র প্রবেশপথ। উল্লিখিত লিপিযুক্ত মন্দিরগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ফারসি 'দালান' শব্দটির 'লম্বা পাকা ঘর', 'পাকাবাড়ি', 'বারান্দা', 'দরদালান' এইসব অর্থ 'চলন্তিকা'য় (১৩৮০ সং, পৃ. ৩২৯) এবং 'লম্বাপাকা ঘর'. 'পাকাবাড়ি', 'ঘরদালান', 'হলের মত ঘর' এই অর্থ 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' (১৯৬৬ সং. ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০০) পাওয়া যায়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লম্বা পাকা ঘর ও দরদালান অর্থেই 'দালান' শব্দটির বহুল প্রচলন হয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্য-গুলি

দালান মন্দিরগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। জাড়ার এই মন্দিরও লম্বা পাকা ঘর এবং সামনে বারান্দার ও গর্ভগৃহের প্রতিটির তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বর্তমান। আরও উল্লেখযোগ্য, ঐ দালানটির ছাদে একটি ছোট্ট চাঁদনিও স্থাপিত (চলন্তিকা মতে 'চাঁদনি' শব্দের অর্থ 'ছাদের উপরিস্থিত গৃহ', 'বঙ্গীয়শব্দকোষে' এটিকে 'প্রাসাদোপরিস্থ গৃহ' বলা হয়েছে। 'চাঁদনি' ও 'দালানে'র পার্থক্যটি এ থেকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায়। 'চাঁদনি' মন্দিরগুলি মেদিনীপুর তথা পশ্চিমবাংলার নানা স্থানে অসংখ্য নির্মিত হয়েছে ছাদের ওপরের ঘরের অনুকরণে। এই স্থাপত্যে চন্দ্রশালার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলাই মন্দিরশিল্পীর উদ্দেশ্য। সামনে স্তম্ভের ওপর বারান্দা সমতল ছাদযুক্ত আয়ত বা বর্গক্ষেত্রাকার মন্দির গুপ্তযুগেও প্রচলিত ছিল। (দ্রষ্টব্যঃ Temple Architecture in the Gupta Age, S.K. Saraswati, Journal of the Indian Society of Oriental Art, vol 7, 1940)। বাংলাদেশে আঠারো-উনিশ শতকে নির্মিত চাঁদনি রীতির অসংখ্য দেবালয় গুপ্তযুগের সেই সমতল ছাদযুক্ত মন্দিরগুলিব কথা মনে করিয়ে দেয়। এই 'চাঁদনি' মন্দিরের অনুকরণে সম্ভবত নদী বা পুকুরের বাঁধানো ঘাটের মুখে ঠিক এই ধরনের চারদিক খোলা চাঁদনি নির্মিত হতে দেখা গেছে। পক্ষান্তরে, 'দালান' বলতে বহুদ্বারযুক্ত পাকা ঘরকে বোঝায়। ধনীদের বাসগৃহরূপে এই দালান নির্মিত হয়েছে। ধনী ব্যক্তি ও জমিদারেরা দুর্গা ও কালীপুজোর জন্য আঠারো-উনিশ শতকে অনেক 'দালান' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঐসব 'দালান' 'দুর্গাদালান' বা কালীদালান' নামে পরিচিত। যে কোন বর্ধিষ্ণু গ্রাম বা শহরে এই ধবনের 'দালান' মন্দির লক্ষ্য করা যায়। ডেভিড ম্যাককাচ্চনও ঐ সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবে সমতল ছাদ ও কার্নিশযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি ঐ মন্দিরগুলিকে যে 'চাঁদনি' নামে উল্লেখ করেছেন, তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। (ম্যাককাচ্চন, পৃষ্ঠা, ১৫ ও ৬২)।

মেদিনীপুর জেলায় 'চাঁদনি' মন্দির এত বেশি তৈরি হয়েছে যে তার সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। এই মন্দির অধিক সংখ্যায় লক্ষ্য করা যায় চন্দ্রকোণা, জাড়াও রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা), দাসপুর, আমনপুর (কেশপুব) প্রভৃতি স্থানে। লিপিদৃষ্টে এই জেলার দাসপুর থানার ডিহিবলিহারপুরে অধিকারীদের রাধাকৃষ্ণেব চাঁদনিটি সর্বপ্রাচীন (১৭২৪ খ্রি.)। কিন্তু এরও আগের যে চাঁদনি মন্দির ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। চাঁদনির বহু নিদর্শনের মধ্যে রামকৃষ্ণপুরের (দাসপুর) গোঁসাইদেব (১৭৮৪ খ্রি.), শিলদা বাজবাড়ির বাধাকৃষ্ণ (আ. ১৯ শতক), গোঁসাইবাজারের (চন্দ্রকোণা) 'দে'পরিবাবেব পরিত্যক্ত মন্দিবগুলি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতল চাঁদনিও এই জেলায় বিরল নয়। কাটানের (ঘাটাল) প্রামাণিকদের, খাঞ্জাপুরের (দাসপুর) গুঁইপরিবারের ও দক্ষিণবাড়ের (দাসপুর) চক্রবর্তীদের, নতুক-জয়কৃষ্ণপুরের (ঘাটাল) সাঁতরাদের মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। তবে এগুলির বেশির ভাগই দ্বিতল পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। 'দালান' মন্দিরও খুব কম নির্মিত না হলেও সেগুলির বেশির ভাগ উনিশ শতকের দিকে নির্মিত হয়েছে। এগুলি সবই দুর্গা ও কালী দালান, অবশ্য লাওদার (দাসপুব) ভূতনাথ শিবের মন্দির 'দালান' রীতির। পক্ষান্তরে, 'চাঁদনি'তে রাধাকৃষ্ণ, দামোদর বিগ্রহই বেশি স্থান পেয়েছে। এই জেলায় 'দালান'-রীতির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত, নাড়াজোল-রাজবাড়ির দুর্গাদালান, রঘুনাথবাড়ির (পাঁশকুড়া) রঘুনাথ, ঘোষপুরে (পাঁশকুড়া) 'দে' পরিবারের লক্ষ্মীবরাহ প্রভৃতি। 'দালান' মন্দিরের থাম, খিলান, কারুকার্য প্রভৃতির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য স্থাপত্যরীতির কিছু প্রভাব স্পষ্ট।

মেদিনীপুর জেলায় প্রশস্ত চাঁদনির ওপর 'রত্ন' মন্দির সন্নিবেশের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই ধরনের মন্দিরের সব কটি ক্ষেত্রেই 'পঞ্চরত্নের' সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত, পিংলার

পালচৌধুরীদের রাধাকান্ত (১৮৫৭ খ্রি.), পাইকভেড়ির (ভগবানপুর) মাইতিদের শ্যামসুন্দর (আ. ১৯ শতক, ১৭৩০ খ্রি. বিশ্বাসযোগ্য নয়) এবং ঈশ্বরপুরের (ঘাটাল) ঘোষেদের শ্রীধর (১৯ শতক)।

মেদিনীপুর জেলার 'রত্ন'-মন্দিরগুলি সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে এত বেশি যে অল্পকথায় সে সকলের আলোচনা সম্ভব নয়। 'একরত্নে'র থেকে 'পঞ্চরত্নের' সংখ্যাই অধিক। 'নবরত্নের' স্থান 'পঞ্চরত্নের' পরেই। এয়োদশ, সপ্তদশরত্নগুলি বিরল। 'রত্ন' মন্দিরের অধিক সমাবেশ দেখা যায় চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, খড়ার, দাসপুর, নাড়াজোল, আনন্দপুর (কেশপুর), রাজবল্লভ (পিংলা), জলচক (পিংলা), লোয়াদা (ডেবরা) প্রভৃতি স্থানে। রঘুনাথবাড়ির (চন্দ্রকোণা) লালজীউমন্দিরে রক্ষিত শিলালিপি থেকে জানা যায়, চন্দ্রকোণার 'ভান'রাজাদের আমলে গিরিধারীলালের 'নবরত্ন' মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে। লিপিসাক্ষ্যে সেটিই এই জেলার প্রাচীনতম 'রত্ন' মন্দির ছিল। এখন তার কোন চিহ্নই নেই। দাসপুরে শ্যামরায়ের 'একরত্ন' (১৬৯৯ খ্রি.) বেশ কয়েক বছর আগে লুপ্ত। বর্তমান গ্রন্থকার মন্দিরটি দেখেছিলেন। উক্ত দুটি মন্দিরই লিপিসাক্ষ্যে এই জেলার প্রাচীনতম মন্দির ছিল বলে অনুমান করা যায়। এই জেলায় 'একরত্নে'র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন (প্রাচীনত্বের দিক থেকে) শ্যামরায় (ভগ্ন ও পরিত্যক্ত, রানির বাজার, আ. ১৭ শতকের শেষ), দাসপুরের গোপীনাথ (১৭১৬ খ্রি.) ও মামুদপুরের (দাসপুর) কালী (ভগ্ন ও পরিত্যক্ত, আ. ১৮ শতক), রাধাকান্তপুরের (দাসপুর) গোপীনাথ (আ. ১৮ শতকের প্রথম), শিরোমণির (শালবনি) সিংহবাহিনী (পরিত্যক্ত), রাজারগড়ের (কর্ণগড়,শালবনি) পরিত্যক্ত মন্দির (আ. ১৮ শতক), বলিহারপুরের (দাসপুর) গেঁড়িবুড়ি (১৭৫৭ খ্রি.) ও ব্রজরাজকিশোর (১৭৭২ খ্রি.), বৈকুণ্ঠপুরের (দাসপুর) মদনমোহন (আ. ১৮ শতকের প্রথম) প্রভৃতি মন্দিরগুলি উল্লেখ যোগ্য। এগুলি ছাড়া আঠার শতকের শেষ বা উনিশ শতকে নির্মিত গড়বেতার লক্ষ্মীজনার্দন, আনন্দপুরে (কেশপুর) কুণ্ডুদের রাধামাধব প্রভৃতি মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। আলঙ্গিরি (এগরা) ও মোহনপুরে (মোহনপুর) যথাক্রমে গোকুলানন্দকিশোর ও জগন্নাথের মন্দিরদুটির রত্ন বেশ দীর্ঘাকৃতি, (ম্যাককাচ্চন, পৃষ্ঠা ৪২)।

এই জেলায় 'পঞ্চরত্নে'র মধ্যে লিপিসাক্ষ্যে সর্বপ্রাচীন নবগ্রামের (ঘাটাল) সিংহবাহিনী (১৭০৯ খ্রি.)। এর পরেই মাকড়া পাথরে তৈরি রাধানগরের (ঘাটাল) গোপীনাথমন্দিরটি (পরিত্যক্ত) নির্মিত হয়েছিল (১৭১৮ খ্রি.)। দক্ষিণ ময়নাডালের (পাঁশকুড়া) মধ্বাচার্যমঠের রাধাগোবিন্দের মন্দির সংস্কারকালে ঐ মন্দিরেরই বিচ্যুত লিপিফলক থেকে জানা যায়, ১৭৩৮ খ্রি. নির্মিত হয়েছিল। দাসপুরে পালেদের লক্ষ্মীজনার্দন (১৭৯১ খ্রি.), চেঁচুয়ার (দাসপুর) রাধাগোবিন্দ (১৭৮১ খ্রি.), মল্লেশ্বরপুরের (চন্দ্রকোণা) মল্লেশ্বর (মাকড়াপাথরে তৈরি আ. ১৮ শতক), নাড়াজোলের (দাসপুর) জয়দুর্গা (আ. ১৮ শতকের শেষার্ধ), শ্যামসুন্দরপুরের (পাঁশকুড়া) সিদ্ধিনাথ (বর্তমানে কোন লিপি নেই, ম্যাককাচ্চন-১৭৬৮ খ্রি. পৃষ্ঠা ৪৭), গোঁসাইবেড়ের (পাঁশকুড়া) রাধাবল্লভ (আ. ১৮ শতকের প্রথমার্ধ), রাজবল্লভ গ্রামে (পিংলা) পালিতদের পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন (আ. ১৮ শতক), বাসুদেবপুরের (দাসপুর) বিদ্যাবাগীশপাড়ার (বর্তমানে লুপ্ত) পঞ্চরত্ন (আ. ১৮ শতাকের শেষ), পূর্বগোপালপুরের (পাঁশকুড়া) রাধাগোবিন্দ, পাইকপাড়ির প্রামাণিকদের সিংহবাহিনী (১৭৭০ খ্রি., বর্তমানে একরত্নে পরিণত) প্রভৃতি মন্দিরগুলি সবই আঠারো শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছে। উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য পঞ্চরত্নের নিদর্শন লোয়াদার (ডেবরা) বামুনবেড়ে

পরিত্যক্ত মন্দির (১৮০৫ খ্রি.), শ্যামসুন্দরপুর-পাটনায় (পাঁশকুড়া) পাহাড়িদের পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন (১৮১৩ খ্রি.), তিলন্ত পাড়ার (সবং) জানকীবল্লভ (১৮১১ খ্রি.), ক্ষীরপাইয়ের শীতলা ও রাধাদামোদর (১৮১৭ খ্রি.), কাণাশোলের (কেশপুর) ঝাড়েশ্বর (১৮৩৪খ্রি.), জলচকের (পিংলা) রামচন্দ্র (১৮১৭ খ্রি.), গৌরায় (দাসপুর) হাঁড়াদের লক্ষ্মীজনার্দন (১৮২৭ খ্রি.), উত্তর ধানখালে (দাসপুর) ভুঁএগ্রাদের লক্ষ্মীজনার্দন (১৮৩৩ খ্রি.)। এই মন্দিরগুলি টেরাকোটার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য। দাসপুর থানার আরও বহু 'পঞ্চরত্ন' উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষভাগ পর্যন্ত নির্মিত হয়। আনন্দপুরে (কেশপুর) বাগেদের ও সরকারদের 'পঞ্চরত্ন' দুটি এই শতকের শেষ দিকে তৈরি হয়। এগুলিতেও প্রচুর টেরাকোটা লক্ষ্য করা যায়।

এই জেলায় বর্তমান 'নবরত্ন' মন্দিরের মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলে মনে করা যায় রঘুনাথবাড়ির (গোয়ালতোড়, বগড়ি) মাকড়াপাথরের পরিত্যক্ত মন্দির। উল্লেখ্য, এই মন্দিরের সব রত্নই 'চালার' ছাদের উপর সন্নিবেশিত। আনুমানিক সতের শতকের শেষ দিকে এটি নির্মিত হয়েছিল। এখানে প্রচুর ভাস্কর্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নবরত্নগুলি জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। টেরাকোটা ও স্থাপত্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন— রাণাপুরের (দাসপুর) রঘুনাথ (১৮০১ খ্রি.) ও লাওদার (দাসপুর) বাঁকারায় (১৮০১ খ্রি.), লস্করদীঘির (পাঁশকুড়া) রঘুনাথ (১৭৯৬ খ্রি.), কোন্নগরের (ঘাটাল) বৃন্দাবনচন্দ্র (১৭৯৪ খ্রি.), দলপতিপুরে (ঘাটাল) সঙ্কর্ষণ রাধাদামোদর (১৮০৩ খ্রি.), কুশপাতার (ঘাটাল) পরিত্যক্ত লক্ষ্মীজনার্দন (আ. ১৮ শতকের শেষ), ধেলুয়ার (ভগবানপুর) রাধাগোবিন্দ (আ. ১৮ শতক), কাজলাগড়ের (ভগবানপুর) পরিত্যক্ত গোপাল (আ. ১৮ শতকের শেষ), মাড়োতলার (ডেবরা) শীতলানন্দ রাধাকৃষ্ণ (আ. ১৯ শতকের প্রথম), মহিষাদলের (রাজবাড়ি) মদনগোপাল (আ. ১৮ শতক), বাগরুই (কেশপুর)-এর মাইতিদের লক্ষ্মীবরাহ ও জানাদের লক্ষ্মীজনার্দন (দুটিই পরিত্যক্ত এবং আ. উনিশ শতকে নির্মিত), বাদাড়ের (কেশপুর) জগন্নাথ (আ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ), রাজবল্লভ গ্রামে (পিংলা) ঘোষেদের পরিত্যক্ত ও ভগ্ন শ্যামসুন্দর (আ. আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), ভেমুয়ার (সবং) ভট্টাচার্যদের রামচন্দ্র (আ. ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), রামচন্দ্রপুরে (ময়না) ঘোড়াইদের পরিত্যক্ত নবরত্ন (আ. ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), নজরগঞ্জে (মেদিনীপুর শহর) জানাদের রাধাবল্লভ (১৮০৮ খ্রি.), মিত্রসেনপুরের (চন্দ্রকোণা) শান্তিনাথ (১৮২৮ খ্রি.), লোছিপুর (ঘাটাল) বাগেদের শ্রীধর (১৮৫৬), রামজীবনপুর (বামুনপাড়া, চন্দ্রকোণা) চাটুজ্যেদের রাধাকান্ত (১৮২২ খ্রি.) প্রভৃতি মন্দির। এই নবরত্নগুলির সবই দ্বিতল কক্ষযুক্ত এবং বেশ কয়েকটিতে ওপরে ওঠার সিঁড়ি আছে, যেমন ধেলুয়া, রামচন্দ্রপুর, বাগরুই ইত্যাদি। ত্রয়োদশ ও সপ্তদশরত্ন এই জেলায় খুব কমই নির্মিত হয়েছে দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য ত্রয়োদশরত্নের নিদর্শন খড়ারে (ঘাটাল) মাঝিদের সীতারাম (১৮৬৪ খ্রি.) এবং রামগড় (বিনপুর) রাজবাড়ির কালাচাঁদ (১৮৫৬ খ্রি.)। রামগড়ের মন্দিরটি স্থাপত্য ও টেরাকোটা প্রাচুর্যের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশরত্নরীতির একটিমাত্র মন্দির আছে চন্দ্রকোণার রঘুনাথপুরে। এটি পার্বতীনাথ শিবের মন্দির। আনুমানিক ১৯ শতকে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।

এই জেলার রত্নমন্দিরের শিখরগুলির সঙ্গে ওড়িশী 'রেখ' দেউলের পরিবর্তিত রূপটির মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি কতকটা 'চালার' রূপ নিয়েছে। আবার অনেব রত্নের শিখরাংশ সমান্তরালভাবে খাঁজকাটা, কতকটা পিঢ়ের অনুকরণে তৈরি হয়েছে। খাঁটি ওড়িশী 'শিখর' রত্ন এই জেলার একটিমাত্র মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে— সেটি মাড়োতলার (ডেবরা)

শীতলানন্দ রাধাকৃষ্ণের পূর্বোক্ত নবরত্ন। এর কেন্দ্রীয় শিখরটির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী সত্যেশ্বর মন্দিরের অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, সত্যেশ্বর মন্দিরটি খাঁটি ওড়িশী শিখর মন্দিরের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। 'রত্ন'মন্দিরগুলির নিচের অংশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাঁকানো কার্নিশযুক্ত 'চালা' রীতিতে তৈরি হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সরল কার্নিশযুক্ত চাঁদনির ওপর রত্নগুলি সন্নিবেশিত দেখা যায়।

এই জেলায় ওড়িশী 'শিখর' মন্দিরের শৈলী বহুলাংশে পবিবর্তিত হয়েছে আঠার-উনিশ শতকে, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এই পরিবর্তিত রীতির 'দেউল'মন্দির জেলার নানা স্থানে বিপুল সংখ্যায় নির্মিত হয়েছিল। ওড়িশী শিখররীতির 'বাঢ়' ও 'গণ্ডী' এই দুটি অংশ নামমাত্র এই সব দেউলে লক্ষ্য করা যায়। শীর্ষে আমলক,কলশ, চক্র ইত্যাদি থাকলেও আমলক অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে। কোন কোন মন্দিরে বৃহৎ আমলকও দেখা যায়। 'রথ'- বিন্যাস প্রায়ই অগভীর এবং স্থাপত্যগত অলংকরণ বহুলাংশে বর্জিত। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়, 'গণ্ডী'র বক্রভাব অনেকটা হ্রাস পেয়ে সেটি কতকটা চালার রূপ নিয়েছে। গণ্ডি অংশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরলীকৃত, আবার অনেক সময় গণ্ডীতে সমান্তরাল খাঁজ ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। সামনে জগমোহন নেই বললেই চলে। ভেতরের ছাদে লহরার পরিবর্তে ভলট ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গণ্ডী গোলাকার গম্বুজের রূপ নিয়েছে। এধরণের দেউল মন্দির শুধু মেদিনীপুর জেলায় নয়, পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় বেশ কিছু দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর থানায় এই দেউল মন্দির সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। আবার পাঁশকুড়া, তমলুক, কেশপুর,পিংলা প্রভৃতি থানার স্থানে স্থানেও এই মন্দির নির্মিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু ওড়িশা-সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলায এই রীতির মন্দির প্রায় একটিও নেই। এই রীতির কয়েকটি মন্দিরের নিদর্শন সিংহডাঙার (ঘাটাল) শিব (এর শিখরটি খুব ভাবী ও কতকটা গোলাকার, আ. ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), রামজীবনপুর বামুনপাড়ার দেউল, দলপতিপুরের (ঘাটাল) শীতলানন্দ (১৮৫০ খ্রি),দাসপুর হোসনাবাজারের শীতলানন্দ (১৮৪৯ খ্রি.), বৈকুণ্ঠপুরের (দাসপুর) শিব (আ. ১৯ শতক), জনার্দনপুবের (দাসপুর) সীতাবাম (১৮১৪ খ্রি.), বেলেঘাটার (দাসপুর) শীতলানন্দ (আ. ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), পশ্চিম রাজনগবে (পাঁশকুড়া) সামন্তদের ঝাড়েশ্বর ও কামেশ্বর (ঝাড়েশ্বর প্রাচীন, আ. ১৮ শতকের শেষ), রাজহাটির (পাঁশকুড়া) গোস্বামীদের পরিত্যক্ত যুগলকিশোর (আ. ১৯ শতক), বলরামপুরের (ডেবরা) মল্লিকবেড়ে শিব (১৮৫৬ খ্রি.) ও সীতারাম (১৮৬০-১৮৬১ খ্রি., এর সামনে জগমোহনের চালগুলি থাকে থাকে সন্নিবদ্ধ), লোয়াদায় (ডেবরা) পোদ্দারদের পরিত্যক্ত রাধাগোবিন্দ (১৮৫৮-৬০ খ্রি.), লোয়াদাবাজারে রাধাকৃষ্ণ (১৮৪৩ খ্রি.), চকবাজিত গ্রামে (ডেবরা) শিব (১৮৬৫-৬৬ খ্রি.), পিংলার সিংহপাড়ায় বাণলিঙ্গ (আ. ১৯ শতক) ও উত্তরপাড়ায় চৌধুবীদের শিব ইত্যাদি। বেশ উচ্চ ও ক্ষীণাকৃতি শিখরযুক্ত কিছু কিছু মন্দিরও এই জেলার মেদিনীপুর শহর, চিল্‌কিগড়ের (জাম্বনি) কনকদুর্গা ও রাজবাড়িতে আছে। বিনপুর থানার শিলদা, শুকজোড়া ও রাজপাড়া গ্রামে পরিবর্তিত ওড়িশী শিখররীতির দেউল দেখা যায়। এগুলি সবই উনিশ শতকে নির্মিত।উপরিউল্লিখিত দেউলমন্দিরগুলির কয়েকটি দাসপুর-সূত্রধরদের নির্মিত।

এই জেলার রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ ও তুলসীমঞ্চগুলি রত্নরীতির এবং এক্ষেত্রেও পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, সপ্তদশরত্ন প্রভৃতি রীতির প্রচলন হয়েছে। রাসমঞ্চগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নবরত্ন ও

সপ্তদশরত্নরীতির। কিছু কিছু স্থানে 'রত্ন' দেউলরীতির হলেও বেশিরভাগ রাসমঞ্চের রত্নগুলি এক বিশেষ শৈলীতে অর্থাৎ রত্নগুলি কতকটা রসুনের কোয়ার মতো স্থূলাকৃতি হয়ে শীর্ষে ক্রমসূক্ষ্মভাব ধারণ করেছে। দাসপুরসূত্রধরেরা এর নাম দিয়েছেন 'বেহারী রসুনচূড়া' বা 'রসুনচূড়া' ('European baroque art'- Mccutchion,পৃষ্ঠা ৭৩)। এই রীতি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মেদিনীপুর জেলার উল্লেখযোগ্য রাসমঞ্চ--- রামগড় রাজবাড়ি (১৭ চূড়া, আ. ১৯ শতক), মহিষাদল (১৭ চূড়া, ১৮২৭ খ্রি., বর্তমানে লুপ্ত), মাংলই-শ্যামবল্লভপুর (পাঁশকুড়া, ১৭ চূড়া, ১৮৫৯ খ্রি.), পূর্বগোপালপুর (পাঁশকুড়া, ১৭ চূড়া, সংস্কার ১৮৯১ খ্রি.), নাড়াজোল (দাসপুর,পঁচিশ চূড়া, আ. ১৯ শতক), গোপালপুর (দাসপুর, ন চূড়া, ১৯ শতক), ডিহি বলিহারপুর (দাসপুর, ন চূড়া,১৮২৭ খ্রি.) প্রভৃতি গ্রামে আছে। এগুলির মধ্যে নাড়াজোল ও ডিহিবলিহারপুরে দেউলরত্ন এবং গোপালপুরে চালারত্ন সন্নিবেশিত হয়েছে। দোলমঞ্চ ও তুলসীমঞ্চ একরত্ন ও পঞ্চরত্ন-রীতিতে তৈরি হয়েছে, কিন্তু কোন কোন স্থানে আটচালা তুলসীমঞ্চও লক্ষ্য করা যায়। নিদর্শন স্থল ঃ দলপতিপুরের মাখালদের সঙ্কর্ষণ রাধাদামোদর ও দ্বন্দ্বীপুর (ঘাটাল) এবং লস্করদীঘির (পাঁশকুড়া) রাসমঞ্চ। উনিশ শতকের গোড়ায় ঘাটাল গম্ভীরনগরের 'দে'পরিবারের নির্মিত 'দেউলরত্নের' একটি পঞ্চরত্ন তুলসীমঞ্চ টেরাকোটা কাজের এক সুন্দর নিদর্শন। কিছু কিছু তুলসীমঞ্চ 'বিষ্ণুপুব রীতি'তে কতকটা 'ইমারতি' থামের আকারে তৈরি হয়েছে। বিষ্ণুপুর- মন্দিবপ্রাঙ্গণেও ঠিক এই জাতীয় তুলসীমঞ্চ দেখা যায়। গড়বেতার পূর্বোক্ত রাধাবল্লভ, শিলদার কিশোর- কিশোরী ও দাসপুরের গোপীনাথ এই রীতির তুলসীমঞ্চের নিদর্শন।

উপরি উক্ত আলোচনায় মেদিনীপুর জেলার অসংখ্য মন্দিরের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থিত করা হয়েছে মাত্র। এই মন্দিরগুলির প্রায় সবই ইঁটের তৈরি। এর মধ্যে বেশ কিছু টেরাকোটা-অলংকরণে সমৃদ্ধ। লক্ষ্য করার বিষয়, এই জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে রত্নরীতিব মন্দির যে একেবারে নেই, তা নয়। তবে সেগুলি স্থাপত্য ও অলংকরণের দিক থেকে নিম্ন শ্রেণীর বলা চলে। দুএকটি অবশ্য সুদৃশ্য রত্নমন্দিব ঐ অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়, যেমন নারায়ণগড় রাজবাড়ির নবরত্ন, চিল্‌কিগড়েকনকদুর্গাব পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন অথবা রোহিণীব (শাঁকরাইল) ষড়ঙ্গীদের পঞ্চরত্ন। কিন্তু সাধারণভাবে রত্ন বা চালারীতি নির্মাণের ব্যাপারে ঐ অঞ্চল খুবই পশ্চাৎপদ। সাম্প্রতিক কালে দু-একটি রত্নমন্দির নির্মাণে স্থপতিদের অপটুতা লক্ষ্য করা গেছে, যেমন, কেশিয়াড়ির হাসিমপুর পল্লীতে সাহুদের কৃষ্ণবলরামের পঞ্চরত্ন, এর নিচের 'চাঁদনি' অংশটিকে অনাবশ্যক উচ্চ ও খাড়া করে ওপরে খর্বাকৃতি রত্নগুলি বসানো হয়েছে। অপর একটি নিদর্শন, ঝাড়গ্রাম মহকুমার আলামপুর গ্রামে (জাম্বনি থানা) পড়িয়াদের মন্দির। এটি চালা ও চাঁদনির একটি মিশ্ররূপ পেয়েছে, যদিও প্রচেষ্টাটা ছিল শিখর মন্দিরের ব্যাপারে। এ মন্দিরটি ১৯ শতকের শেষার্ধে নির্মিত হয়েছে। ঐ সময়ের আরও কয়েকটি মন্দির ঝাড়গ্রাম মহকুমায় নির্মিত হয়েছে যাদের প্রায় সবগুলিই প্রশস্ত দালানের ওপর গির্জার চূড়ার মতো অথবা পিরামিডাকৃতি উচ্চ শিখরযুক্ত। এই ধরনের নিদর্শন ঝাড়গ্রামের সাবিত্রীমন্দির, নুনিয়ায় (জাম্বনি) পণ্ডাদের ও দুবড়ায় (জাম্বনি) ষড়ঙ্গীদের মন্দিরগুলিতে পাওয়া যাবে। জঙ্গল-অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রাচীনকালে শিখরমন্দির নির্মাণ যতখানি প্রসার লাভ করেছিল, শেষ- মধ্যযুগ বা আরও পরবর্তীকালে চালা, চাঁদনি ও রত্নরীতির মন্দির নির্মাণ সেখানে একরূপ হয়নি বললেই চলে। এর কারণ, সম্ভবত ঐসব অঞ্চলে উপযুক্ত মন্দির স্থপতি বা ধনী ব্যক্তির আনুকূল্যের অভাব। অপরপক্ষে, মেদিনীপুরের

উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে শিলাই, কাঁসাই, রূপনারায়ণ ও হুগলি নদীর পলিমাটিতে গড়া বিস্তীর্ণ ভূভাগে আঠার-উনিশ শতকে গড়া যে সুদক্ষ সূত্রধরকুলের উদ্‌ভব হয়েছিল, তার ফলেই এই অংশে সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা মন্দির গড়ে ওঠে।

মেদিনীপুব জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানা স্থানে আঠার- উনিশ শতকের মধ্যে মন্দিরস্থপতি সূত্রধরসম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠেছিল। রূপনারায়ণের পশ্চিমতীরবর্তী ঘাটাল, দাসপুর এলাকার অদূরবর্তী হুগলি জেলার সেনহাটিতেও মন্দিরস্থপতি শিল্পীদের বসতি ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ বা তার কিছু পরেও ঘাটাল অঞ্চল হুগলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলের বেশ কিছু মন্দির নির্মিত হয়েছিল সেনহাটির মিস্ত্রীদের দ্বারা। তবে দাসপুর অঞ্চলে যে বহু সূত্রধরবসতি গড়ে ওঠে, তাঁরাই এই দিকের অনেক মন্দির তৈরি করেছিলেন। লিপিসাক্ষ্যেও এর প্রমাণ মিলছে। প্রথমদিকে তাঁদের বৃত্তি ছিল মন্দির ও টেরাকোটা নির্মাণ এবং কাঠের খোদাই কাজ। পরে জীবিকার প্রয়োজনে এসব কাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁরা সাধারণ দালান নির্মাণ এবং অন্যান্য কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেছে, মন্দির-সূত্রধরদের বসতি কেন্দ্রীভূত ছিল এই জেলার কয়েকটি স্থানে। সেগুলি হোল, দাসপুর, কলমিজোড়,নাড়াজোল, গৌরা, খেপুত, রাজনগর, হরিরামপুর (দাসপুর থানা); খড়ার ও বরদা (ঘাটাল থানা); ক্ষীরপাই, কাশীগঞ্জ, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা থানা); রঘুনাথবাড়ি ও রাজহাটী (পাঁশকুড়া থানা) এবং পাথরা (মেদিনীপুর সদর)। মন্দিরলিপি থেকে তাঁদের বাসস্থানের এই ঠিকানা জানা গেছে। অবশ্য, এই জেলার আরও অনেক স্থানে সূত্রধরদের কিছু ঠিকানা পাওয়া যায়, যেমন তোড়াপাড়া, নেহড়পাড়া, পোল, ময়ালবন্দিপুর ইত্যাদি। তবে পূর্ব আলোচিত বেশিরভাগ মন্দির দাসপুর ও দাসপুর থানার মিস্ত্রীরা তৈরি করেছিলেন। এমনকি, কোন মন্দিরে তাঁদের নাম ঠিকানা না থাকলেও তাঁদের তৈরি মন্দির বুঝতে অসুবিধে হয় না। দাসপুর ও নিকটবর্তী কলমিজোড়ের মিস্ত্রীরা দাসপুর এলাকা ছাড়িয়ে পাঁশকুড়া, ডেবরা, কেশপুর, পিংলা, সবং, খড়গপুর থানার নানা স্থানে বহু সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেছেন। এই সব মিস্ত্রীর পদবী ছিল শীল, দাস, চন্দ বা চন্দ্র, দে, সাঁই, কুণ্ডু ইত্যাদি। অনেক শিল্পী তাঁদের নামের পাশে 'মিস্ত্রী', 'সূত্রধর' 'কারিকর' এই উপাধিগুলিও ব্যবহার করতেন। এমনকি, 'ছুতার' শব্দটিও কোন কোন শিল্পী তাঁর নামের পাশে জুড়ে দিতেন, যেমন, বেড়-জনার্দনপুবেব (খড়গপুর লোক্যাল) মজুমদারদের প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা মন্দিরে (১৭৮৭ খ্রি.) পাথরার (মেদিনীপুর) নারায়ণ ছুতারের নাম আছে। উল্লেখ্য, পাথরা বেড়জনার্দনপুরের বিপরীত দিকে কাঁসাই-তীরবর্তী। ঐ গ্রামের (বেড় জনার্দনপুর) মজুমদারদের একটি পঞ্চরত্নের লিপিতে তাঁর নাম 'নারায়ণ কারীকর' পাওয়া যাচ্ছে। রামজীবনপুরের এক মন্দিরে ওখানেরই এক মিস্ত্রীর নামের উল্লেখ আছে 'পেলারাম সূত্রধর'। তিনি রামজীবনপুরের পিরিপাড়ায় প্রামাণিকদের দামোদরের পঞ্চরত্নটি তৈরি করেছিলেন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে। কাশীগঞ্জের (চন্দ্রকোণা) হারাধন সাউ ও রামদয়াল মিস্ত্রি ক্ষীরপাই অঞ্চলে কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেন উনিশ শতকের শেষদিকে। পাঁশকুড়া থানার রঘুনাথবাড়ির শ্রীরাম মিস্ত্রি ও চন্দ্রকোণা ইলামবাজারের ভক্তারাম দাস মিস্ত্রি উভয়ে আনন্দপুরে বাগেদের রাধাকৃষ্ণ ও দামোদরের পঞ্চরত্ন নির্মাণ করেন ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। বিষ্ণুপুরের কোন কোন মিস্ত্রি গড়বেতা অঞ্চলে যে মন্দির করেছিলেন সেকথা আগে বলা হয়েছে। প্রাচীন মন্দিরে তাঁদের নাম পাওয়া যায় না। তবে বগড়ি কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণরায়ের পঞ্চরত্নে (১৮৫৫ খ্রি.) সনাতন মিস্ত্রি নামে একজন মিস্ত্রির নাম পাওয়া যায়।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মন্দিরলিপিতে মিস্ত্রিদের নামের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে আঠার শতকের শেষ দিক থেকেই। অবশ্য, চন্দ্রকোণার লালজীউ মন্দিরে রক্ষিত শিলালিপিতে (১৬৫৫ খ্রি.) যে গোকুল দাসের নাম পাওয়া যায় তিনি বিলুপ্ত নবরত্নটির স্থপতি ছিলেন কিনা বলা কঠিন।

দাসপুর-সূত্রধরদের মধ্যে লিপিসাক্ষ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মন্দির তৈরি করেছেন ঠাকুরদাস শীল। এই জেলায় পর পর তিনি যে মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন সেগুলি হোল— (১) দাসপুর গ্রামে রাসবিহারী চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠিত দধিবামনের পঞ্চরত্ন (প্রচুর টেরাকোটা আছে, ১৮৪৬ খ্রি.), নিকটবর্তী সুরৎপুরগ্রামে শীতলার পঞ্চরত্ন (প্রচুর টেরাকোটা, ১৮৪৫ খ্রি.), দাসপুর হোসনাবাজারে বিন্দাদেবীর ছোট্ট পঞ্চরত্ন তুলসীমঞ্চ (এখানেও প্রচুর টেরাকোটা আছে, ১৮৫৩ খ্রি.), বলরামপুরে (ডেবরা) শিবের দেউল (১৮৫৬) ও সীতারামের জগমোহনযুক্ত দেউল (১৮৬০-৬১ খ্রি.) এবং চকবাজিত গ্রামে (ডেবরা) শিবের দেউল (১৮৬৬ খ্রি.)। ঠাকুরদাস আরও কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু লিপির অভাবে সেগুলি তাঁর কিনা সনাক্ত করা কঠিন। কিন্তু তারও আগে দাসপুরের স্থপতি সাফলরাম চন্দ্র চেঁচুয়ার রাধাগোবিন্দের মন্দির নির্মাণ করেন ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে। দাসপুরের গোপাল চন্দ, বৃন্দাবন চন্দ, শত্রুঘ্ন চন্দ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে লোয়াদা বামুনবেড়ের দুটি টেরাকোটা রত্নমন্দির নির্মাণ করেন। হরহরি চন্দ মিস্ত্রি পাইকপাড়ি (ডেবরা) ও জোতমুরি (দাসপুর) গ্রামে দুটি মন্দির করেছিলেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। আনন্দমিস্ত্রি পিংলার বোসেদের চাঁদনি, উত্তর গোবিন্দনগরের (দাসপুর) একটি আটচালা এবং চন্দ্রামেড়ের একটি 'রাসমঞ্চ' তৈরি করেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। কলমিজোড়ের বদনচন্দ্র মিস্ত্রী ও হরি মিস্ত্রী যথাক্রমে পাশকুড়া থানার হরেকৃষ্ণপুর ও দক্ষিণ ময়নাডালের মন্দির নির্মাণ করেন। কলমিজোড়ের রাজারাম চন্দ হোসেনপুর ও চাঁদপুরের মন্দিরনির্মাতা ছিলেন। বর্তমান বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও দাসপুরের মিস্ত্রীরা নানাস্থানে মন্দির করেছেন, যেমন. শশিভূষণ শীল চকবাজিতে ও ধামতোড়ে (ডেবরা) যথাক্রমে চাঁদনি ও দেউলমন্দির নির্মাণ করেছিলেন এই শতকেরই গোড়ার দিকে। শিবনারায়ণ চন্দ চকবাজিতে একটি পঞ্চরত্ন 'রাসমঞ্চ' ও 'চাঁদনি' নির্মাণ করেন ১৯০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। মাধব দাস মিস্ত্রি রামচন্দ্রপুরে (ময়না) ঘোড়াইদের বিশাল দালান নির্মাণ করেন ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। ঐ দালানটি সাড়ে দশহাজার টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছিল। আরও বহু দাসপুর মিস্ত্রীর নাম অনেক মন্দির-গাত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

দাসপুরের এই সূত্রধর-সম্প্রদায় মেদিনীপুর জেলার এই অঞ্চলে টেরাকোটা-অলংকরণ ও মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এক পৃথক শৈলীর প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। এঁদের তৈরি দেউল ও রত্ন মন্দিরগুলিতে স্থাপত্য-সৌন্দর্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে দেখা যায়। সুদৃশ্য দেউলমন্দির নির্মাণেও এঁরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। রত্নমন্দিরের ক্ষেত্রে চালার সহজসুন্দর বঙ্কিম কার্নিশ ও রত্ন শিখরগুলির ঋজু ও বলিষ্ঠভাব এঁদের হাতে ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা মন্দিরস্থাপত্যের বেশ কয়েকটি নিজস্ব পরিভাষারও উদ্‌ভাবন করেছিলেন, যেমন,একরত্নের তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'আলগোছটুঙ্গি'। এই নামটি খুবই তাৎপর্যবহ অর্থাৎ চালার ওপর চূড়াটিকে এমনভাবে বসাতে হবে দূর থেকে দেখলে মনে হবে চূড়াটি ছাদের সঙ্গে যুক্ত নয়। এরমধ্যে সৌন্দর্য ফুটে উঠত বেশি। দাসপুবে এরূপ মন্দির এখনও কয়েকটি আছে, যেমন সিংহদের গোপীনাথ, বলিহারপুরের গৌড়িবুড়ি ও ব্রজরাজকিশোর এবং রাধাকান্তপুরের গোপীনাথ। মন্দিরের প্রবেশপথের খিলান ও স্তম্ভের এবং মন্দিরঅলংকারের তাঁরা অনেকগুলি নাম দিয়েছিলেন। খিলানের নাম ঃ দরুণ, হাঁসগলা,

হাইকোর্ট, চামচিকা ও গোল। থামের নাম ঃ ইমারতি, কলাগেছ্যা, চৌকা, গোল ও চুমকি। মন্দির অলংকারঃ তুরুজ, কমলাতুরুজ, কোণ, কল্‌কা, সোনাগেছ্যা এবং খাঁজবন্দী। বর্তমান গ্রন্থকার-কর্তৃক খিলানের আরও কয়েকটি নাম জানা গেছে, যেমন গোলন্দর, মেহরাব, বাদামী ও সুরাইদার। দাসপুর-সূত্রধরদের উদ্ভাবিত ঐসব পরিভাষার অর্থ ডেভিড ম্যাককাচ্চন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ১৫-১৬)।

টেরাকোটা, প্রস্তরভাস্কর্য ও কাঠ-খোদাই কাজে সব শিল্পীই দক্ষতা দেখিয়েছেন কম-বেশি। মেদিনীপুর জেলাতেও তা বিরল নয়। কিন্তু এই জেলায় পাথরে তৈরি প্রাচীন 'শিখর' মন্দিরগুলিতে কারুকার্য তেমন চোখে পড়ে না। পক্ষান্তরে, ইঁটের তৈরি মন্দিরে টেরাকোটা-অলংকরণ লক্ষ্য করার মতো। প্রাগুক্ত ইঁটের 'চালা', 'চাঁদনি', 'দেউল' ও 'রত্ন'মন্দিরগুলির অন্তত কুড়ি শতাংশ মন্দিরে এই অলংকরণ কমবেশি স্থান পেয়েছে। চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর ও পাঁশকুড়া থানার কোন কোন মন্দিরে টেরাকোটার প্রাচুর্য বিস্ময় সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে টেরাকোটা মূর্তিগুলির প্রায় সবই ছোট-বড়ো টালিতে 'বাস-রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি একখিলান বা ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরে, কার্নিশের নিচে ও দুপাশে ছোট্ট ছোট্ট কুলুঙ্গীতে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্তম্ভগাত্রে এই ধরনের টেরাকোটা টালি স্থাপন করা হয়েছে দেখা যায়। সাধারণত মন্দিরের সামনের দিকেই টেরাকোটা সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মন্দিরের দুদিক বা তিনদিকেও লক্ষ্য করা গেছে। তবে মন্দিরের গর্ভগৃহের বারান্দাসংলগ্ন দেওয়াল ছাড়া ভিতরের দেওয়ালে টেরাকোটা আদৌ স্থান পায়নি। অবশ্য, কোন কোন মন্দিরের দ্বিতলের দেওয়ালেও টেরাকোটার সমাবেশ হয়েছে, যদিও এধরনের মন্দিরের সংখ্যা খুবই কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাণাপুর, বাগরুই, বাদাড় ও রামচন্দ্রপুর মন্দিরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। টেরাকোটা অলংকরণের মধ্যে দেবতা, মানুষ ও পশুপক্ষীর মূর্তি, ফুল ও লতাপাতার নকশা স্থান পেয়েছে। বেশির ভাগ মন্দিরের ভিত্তিবেদিসংলগ্ন দেওয়ালে পশুপক্ষী ও সেকালের সামাজিক দৃশ্যের (যেমন, পশুশিকার, যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি) প্যানেল সন্নিবেশিত থাকে। স্তম্ভগাত্রে কার্নিশ ও দুপাশের কুলুঙ্গীতে দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন প্রচলিত রীতি। কিন্তু বারান্দার খিলান প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থে রামায়ণীয় ঘটনাবলী ও রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য সব টেরাকোটা মন্দিরেই প্রথাগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সঙ্গে স্থানে স্থানে পৌরাণিক কাহিনী ও কৃষ্ণলীলাদৃশ্যও উপস্থিত থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় প্রতিটি টেরাকোটা-মন্দিরে যেক্ষেত্রে রামায়ণের কাহিনী আবশ্যিকভাবে রূপায়িত হয়েছে, সেখানে মহাভারতীয় দৃশ্যচিত্র অতি অল্প। পশ্চিমবাংলার খুব কম মন্দিরেই মহাভারতীয় উপাখ্যান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। টেরাকোটায় রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে খিলানের ওপরের প্রস্থে আবশ্যিক রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য ছাড়া সীতাহরণ, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ, অশোকবনে সীতা, রাম-সীতার রাজ্যাভিষেকপ্রভৃতি চিত্র লক্ষ্য করা যায়। রামরাবণের যুদ্ধদৃশ্যের মাঝখানে কোন কোন স্থানে মহিষমর্দিনী দশভুজার মূর্তি সন্নিবেশিত থাকে। চাঁইপাটের (দাসপুর) রাধাগোবিন্দের আটচালায় (১৭৫৯ খ্রি.) লঙ্কাযুদ্ধের এক জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। খিলান প্রবেশপথের ওপরের গোটা অংশটাতেই বানর ও রাক্ষস সেনার ভয়ঙ্কর যুদ্ধদৃশ্য স্থান পেয়েছে। এই মন্দিরের ভিত্তিবেদি সংলগ্ন প্যানেলগুলিতে সেকালের সামাজিক দৃশ্যের বহু টেরাকোটা সন্নিবেশিত ছিল। বেশ কয়েকটি বর্তমানে লুপ্ত।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী ও শ্রীচৈতন্যের ভাবাদর্শের প্রভাবে লৌকিক চণ্ডী উপাখ্যান এবং

চৈতন্যলীলার কিছু কিছু টেরাকোটা ফলকও মন্দিরগাত্রে সন্নিবেশিত হয়েছিল। তবে লৌকিক চণ্ডীর সদাগর উপাখ্যানের মধ্যে কমলেকামিনীদৃশ্য ও দুপাশে ধনপতি ও শ্রীপতির নৌকাযাত্রা দৃশ্যই বেশি লক্ষ করা যায়। কালকেতু-উপাখ্যান খুব কম মন্দিরেই উপস্থিত। গৌর-নিতাই এর সংকীর্তনরত মূর্তি বহু মন্দিরে স্থান পেয়েছে। পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যে প্রায় সব মন্দিরেই দশাবতার, মহিষমর্দিনী, কালী প্রভৃতির মূর্তিফলক স্থাপিত। দশাবতারমূর্তির মধ্যে বুদ্ধমূর্তির বদলে জগন্নাথ অথবা শ্রীচৈতন্যের মূর্তি এই জেলায় ওড়িশার জগন্নাথ ও বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ মহাপ্রভুর প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক। এর সঙ্গে বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ প্রচ্ছন্ন। এছাড়া কৃষ্ণলীলা-উপাখ্যান কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত সব মন্দিরেই লক্ষ্য করা গেছে। কৃষ্ণলীলার সাধারণ দৃশ্যগুলি, যেমন, গোপীদের বস্ত্রহরণ, কালীয়দমন, কদম্ববনে কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপ্রত্যাবর্তন ও গোপীদের বিলাপ প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি টেরাকোটা মন্দিরে উপস্থিত।

মিথুনফলকের বিচিত্র সমাবেশ মেদিনীপুর জেলার টেরাকোটা-মন্দিরগুলিতে যতখানি লক্ষ্য করা যায় অন্য কোন জেলার মন্দিরে সেরূপ দেখা যায় না। এই জেলার প্রাচীন 'শিখর' মন্দিরসমূহে মিথুনদৃশ্য কিছু কিছু স্থান পেয়েছে সত্য, কিন্তু প্রাগুক্ত ইঁটের মন্দিরগুলিতে মিথুনফলক অধিক মাত্রায় স্থান পেয়েছে। ওড়িশার মিথুনভাস্কর্য একসময় যে এই জেলার টেরাকোটাশিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, মিথুনদৃশ্যের বাহুল্যই তার প্রমাণ। এছাড়া, আঠার শতকের শেষ থেকে য়ুরোপীয়দের সঙ্গে সংস্রবের ফলে স্থাপত্য ও অলংকরণে যে য়ুরোপীয় প্রভাব পড়েছে তাও বোঝা যায়। উনিশ শতকের বহু মন্দিরে ফ্যানলাইট, অর্ধোন্মুক্ত ভিনিসীয় দরজায় প্রতীক্ষারতা নায়িকা, সাহেব-মেমের মূর্তি এবং টেরাকোটা মূর্তির সাজপোষাকে য়ুরোপীয় প্রভাবের পরিচয় দেয়।

এই জেলার টেরাকোটা-মন্দিরসমূহে স্থান ও কালের ব্যবধানে অলংকরণ-রীতিরও যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, খ্রি. ১৭ শতক বা ১৮ শতকের গোড়ার দিকে ঘাটাল ও দাসপুব অঞ্চলে যে-সব মন্দির নির্মিত হয়েছে, সেখানে মূর্তিগুলি ছোট ছোট টালিতে অগভীরভাবে অঙ্কিত হলেও বেখা-বিন্যাস ও ভাবভঙ্গীর ক্ষেত্রে উন্নত শৈলীর পরিচয় দেয়। এ-ধরণের নিদর্শন রাণীর বাজারের (ঘাটাল) শ্যামরায় বা শ্যামপুরের (ঘাটাল) প্রাগুক্ত মন্দির। অদূরবর্তী নবগ্রামের (ঘাটাল) সিংহবাহিনীতেও (১৭০৯ খ্রি.) ঐ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। ঐ একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় দাসপুর ও রাধাকান্তপুরের গোপীনাথ, বৈকুণ্ঠপুরের নিম্বার্কমঠের পরিত্যক্ত মদনমোহন এবং মামুদপুরের ভগ্ন কালীমন্দিরে। দাসপুরের চৌধুরীদের শ্যামরায়ের একরত্নেও (বর্তমানে লুপ্ত, ১৬৯৯ খ্রি.) ঐ একই বৈশিষ্ট্য ছিল। ঐ ধরনের আরও অনেক টেরাকোটা-মন্দির এইসব স্থানে এবং অন্যান স্থানে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। টেরাকোটা-শিল্পের এই বৈশিষ্ট্য কিছুকাল অব্যাহত ছিল। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যেসব টেরাকোটা-মন্দির এই অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে, সেগুলিতে টালি ও মূর্তির আকার আরও বড়ো হতে দেখা গেছে, রেখা ও ভঙ্গির ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। এই ধরনের টেরাকোটার দৃষ্টান্ত রয়েছে দাসপুরে পালেদের লক্ষ্মীজনার্দন (১৭৯১ খ্রি.), পুরুষোত্তমপুরের (দাসপুর) ব্রজরাজকিশোর (১৭৭২ খ্রি.), ডিহিবলিহার পুরের (দাসপুর) রাধাগোবিন্দ (১৭৯৮ খ্রি.), পূর্বগোপালপুরের (পাঁশকুড়া) রাধাবিনোদ (১৭৫৯ খ্রি.), চেঁচুয়ার রাধাগোবিন্দ (১৭৮১ খ্রি.), রাণাপুরের (দাসপুর) রঘুনাথ (১৮০১ খ্রি.), লাওদার (দাসপুর) বাঁকারায় (১৮০১ খ্রি.) মন্দিরে। এগুলির মধ্যে আবার কোন কোনটিতে বড়ো বড়ো মূর্তিফলক

সন্নিবেশিত হয়েছে, যেমন চেঁচুয়া ও লাওদায়।

উনিশ শতক থেকে টেরাকোটা অলংকরণ-শৈলীর অবক্ষয়ী রূপটি চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর, কেশপুর, ডেবরা, পাঁশকুড়া প্রভৃতি স্থানের বহু মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। মূর্তিগুলির স্থূল আকার ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কলেবর এসময় প্রধান্য লাভ করায় রৈখিক সৌন্দর্য বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। চন্দ্রকোণার টেরাকোটার মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে এটা বেশি করে চোখে পড়ে। তবুও কিছু কিছু মন্দিরে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন, নিমতলায় হেমন্তনাথের আটচালা (যদিও এটি প্রায় নিকটবর্তী রাণাপুর মন্দিরের সমসাময়িক), ব্রাহ্মণবসানের (দাসপুব) মন্ডলদেব আটচালা, বাগরুইয়ের লক্ষ্মীবরাহ, বাদাড়ের জগন্নাথ, ভেমুয়ার (সবং) ভট্টাচার্যদের নবরত্ন ইত্যাদি। উনিশ শতকে এই জেলায় টেরাকোটা মন্দির অনেক তৈরী হয়েছে।প্রচুর টেরাকোটার সমাবেশ প্রাগুক্তগুলি ছাড়া আনন্দপুরে বাগেদের ও কাণাশোলের (কেশপুর) ঝাড়েশ্বর, মাংলই-শ্যামবল্লভপুবে (পাঁশকুড়া) মাইতিদের রাসমঞ্চ, তিলন্তপাড়ার (সবং) জানকীবল্লভ, বৃন্দাবনপুরেব (দাসপুর) মহাপ্রভু প্রভৃতি মন্দিরের নাম কবা যেতে পারে। ঐসময়েব মন্দিবগুলিতে টেরাকোটার সঙ্গে 'স্টাকো' মূর্তি ও 'পঙ্কে'র অলংকরণ প্রচুব লক্ষ্য কবা যায়। পঙ্কের অলংকরণে নানা রঙের ব্যবহারও দেখা যায়। আনন্দপুরের হেটলাপাড়ায় সরকারদের পঞ্চরত্নে (১৮৯৩ খ্রীঃ) টেরাকোটার সঙ্গে 'স্টাকো' ও 'পঙ্কে'র কাজের সমাবেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সবগুলিই নিম্নমানের পরিচায়ক। তিলন্ত পাড়ার মন্দিরে 'টেরাকোটা' ও 'স্টাকো' দুইই সন্নিবেশিত হয়েছে। 'স্টাকো'র দ্বারী মূর্তি এসময়ের প্রায় সব মন্দিরেই দেখা যায়। ফুল-লতাপাতার উৎকৃষ্ট রঙীন পঙ্কের কাজ কম-বেশি বহু মন্দিরের গর্ভগৃহের মণ্ডপে বা গর্ভগৃহ প্রবেশপথের ওপরে লক্ষ্য করা যায়। পূর্বোক্ত বাগেদের মন্দিরে এবং রামজীবনপুরের কয়েকটি মন্দিবের গর্ভগৃহ-মণ্ডপে 'পঙ্কে'র সুন্দর অলংকরণ লক্ষ্য করা গেছে।

'টেবাকোটা' ছাড়া কাঠখোদাই কাজেও মেদিনীপুরের শিল্পীরা উন্নত রুচির পবিচয় দিয়েছেন। মন্দিবের কাঠের দরজায় সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও নকশা এবং দরজার চারপাশেব ফ্রেমের সূক্ষ্ম কারুকার্য বেশকিছু মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। মন্দিরদরজায় উল্লেখযোগ্য খোদাই কাজের নিদর্শন আছে শ্রীধরপুবের (দাসপুর) সামন্তদের মন্দিরে (আ: ১৮৯৩ খ্রীঃ), চেঁচুয়ার রাধাগোবিন্দ, উত্তর ধানখালে (দাসপুর) ভূএগ্রাদের লক্ষ্মীজনার্দন, রানির বাজার অঞ্চলে এবং রামগড়ের (বিনপুর) টিনের আটচালার কাঠের খুঁটিতে। মেদিনীপুর জেলায় পেতল ও কাঠের রথও তৈরি হয়েছে বেশকিছু। রামগড়ের (বিনপুর) নবরত্ন পেতলের রথটি পঞ্চতলযুক্ত। তিওরবেড়িয়ার (দাসপুর) রথটিও পিতলের। বৈকুণ্ঠপুর (দাসপুর) নিম্বার্কমঠে একটি ছোট্ট একরত্ন পিতলের রথ সুদৃশ্য। কাঠের বিশাল রথ আছে রঘুনাথবাড়ি (পাঁশকুড়া), মহিষাদল প্রভৃতি স্থানে। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত মন্দিরগুলি ছাড়া এই জেলায় বিস্তীর্ণ ভূভাগে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মন্দির। কোন কোন মন্দিরে উন্নতমানের পোড়ামাটির অলঙ্কবণও লক্ষ্য করা যায়। অঞ্চলভেদে স্থাপত্য ও অলঙ্করণে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যে নেই, এমন নয়। তবে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হলেও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে প্রাগুক্ত নির্দিষ্ট দুটি শৈলীই অনুসৃত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালে নির্মিত ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের কয়েকটি মন্দির অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কিন্তু সেগুলি বিচ্ছিন্ন নিদর্শনমাত্র এবং খুবই অর্বাচীন।

মেদিনীপুর জেলার বহুবিচিত্র ও পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি একদা কাদের হাতে তৈরি হয়েছিল এবং কারা এগুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সে-সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়

বেশ কিছু প্রতিষ্ঠালিপিফলক থেকে। মন্দির-স্থপতিরা 'সূত্রধর' বা চলিত কথায় 'ছুতার' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা একই সঙ্গে মন্দিরের গঠন ও তার অলংকরণকর্মে দক্ষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক শ্রেণী কাঠের কাজ কবতেন। তাঁরা মন্দিরের দরজা ও তার কারুকার্য, দেববিগ্রহের অধিষ্ঠানের জন্য কাঠের সিংহাসন, কাঠের রথ প্রভৃতি তৈরি করতেন। সূত্র বা সূতার দ্বারা নিখুঁত মাপজোপ করে তাঁরা সুন্দর সুন্দর মন্দির, দালান ও সূক্ষ্ম কারুকার্য যুক্ত কাঠেব আসবাব পত্র তৈরি করতেন। মাটি, পাথর ও কাঠ— এই তিন প্রকার কারুকার্যে তাঁদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৃতির পরিচয় মেলে। ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণে 'সূত্রধার' বা 'সূত্রধরকে' হীনজাতি বলে উল্লেখ করা হলেও (দ্রষ্টব্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্মখণ্ড, ১০ম অধ্যায়) প্রাচীনকালে এই জাতি উচ্চ বলে গণ্য হতেন। সেসময় 'সূত্রধর' 'রথকাব' অর্থাৎ রথ তৈরি করতেন এবং তাঁদেব উপনয়নের ব্যবস্থাও ছিল।

মেদিনীপুর জেলার যেসব মন্দিরের লিপিফলকে মন্দিবসূত্রধরের নাম ও বাসস্থান উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে এই জেলাব সূত্রধব সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। অবশ্য প্রতিটি লিপিফলকেই যে তাঁদেব নাম-ধামের উল্লেখ আছে তা নয়। তবু বেশ কিছু লিপিফলক থেকে তাঁদেব পরিচয় জানতে অসুবিধে হয় না। এই জেলার শিলাই, রূপনারায়ণ ও কাঁসাই নদীর সংলগ্ন স্থানসমূহে প্রধানত মন্দিবস্থপতি -সূত্রধরদেব বসতি কেন্দ্রীভূত ছিল। এই অংশেব মধ্যে চন্দ্রকোণা, ঘাটাল ও দাসপুর থানার নানা স্থানে তাঁরা একসময় দলবদ্ধভাবে বসবাস করতেন। আর এই অংশেই বেশির ভাগই তাঁদেব হাতে গড়া অনেক মন্দির লক্ষ্য করা যায়। এঁদের হাতে তৈরি বহু মন্দির আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও যেসব মন্দিরে এখনও তাঁদের নাম-ধামের বিবরণ রয়েছে, সেগুলি গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান। লিপিসাক্ষ্য এবং বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, সূত্রধরশিল্পীদের সর্বাধিক বসতি গড়ে উঠেছিল দাসপুর ও তার আশপাশের আবও অনেক গ্রামে। এই শিল্পীরা দূর দূরান্তর গ্রামাঞ্চলে যে সব মন্দিব করেছিলেন, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মোটামুটি আঠারো শতক থেকে বর্তমান বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। দাসপুর থানাব অনেক স্থানে মন্দির নির্মাণ করা ছাড়াও এই জেলার কেশপুব, ডেবরা, পিংলা, সবং, খড়্গপুর থানাব বেশকিছু মন্দিব দাসপুরেব মিস্ত্রীবা নির্মাণ করেছিলেন। অনেক মন্দিব কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বেশ কয়েকজন মিস্ত্রীর নাম আজ আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। তবু, বহু লিপিফলক থেকে দাসপুর সূত্রধর-গোষ্ঠীর মোটামুটি এক পরিচয় পেতে আমাদের অসুবিধে হয় না। দাসপুরের এই সূত্রধরকুল 'চালা', 'চাঁদনি', 'রত্ন', ও 'দেউল'- এই চারপ্রকার মন্দির নির্মাণেই নিপুণ ছিলেন। তাঁদের হাতে তৈরি মন্দিরসমূহে তাঁদের নিজস্ব শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি, কোন কোন মন্দিরে তাঁদের নাম-ঠিকানার উল্লেখ না থাকলেও এগুলি তাদের তৈরি চিনে নিতে তেমন অসুবিধে হয় না। এঁদের তৈরি চালার সহজসুন্দর বঙ্কিম কার্ণিশ এবং রত্ন ও দেউলের সুচারু শিখর খুবই দর্শনীয়। দীর্ঘকাল ধরে মন্দির নির্মাণের কাজে নিযুক্ত থাকায় দাসপুরের মিস্ত্রীরা মন্দিরস্থাপত্যের কয়েকটি 'স্থানীয় পরিভাষারও সৃষ্টি করেছিলেন। সেগুলিকে আঞ্চলিক মন্দির-গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যায়। প্রচলিত 'একরত্ন'রীতির মন্দিরকে তাঁরা বলতেন 'আলগোছটুঙ্গি'। ওড়িশী 'শিখব-রীতির মন্দির যা তাঁদের হাতে আঠারো-উনিশ শতকে কতকটা 'চালার' রূপ নিয়েছিল তার নাম তাঁরা দিয়েছিলেন 'উৎকলীয়', ছোট আকারের সমতল ছাদযুক্ত চৌকা বা আয়তক্ষেত্রাকার মন্দিরকে তারা 'চাঁদনি' বলতেন। এই 'চাঁদনি' নামটি খুবই তাৎপর্যবহ। বড়ো পাকা বাড়ি বা দালানের ছাদের ওপরে যে ছোট্ট চিলেকোঠা দেখা যায়, তাকে বলা হয়

'চাঁদনি'। এই ধরনের যে বহু মন্দির মেদিনীপুর জেলা তথা পশ্চিমবাংলার নানা স্থানে দেখা যায়, সেগুলিকে চাঁদনি মন্দির বলা হয়। 'বিষ্ণুপুরী আটচালা' বলে এক ধরণের আটচালার তাঁরা নাম দিয়েছেন যার ওপরের চারটি চাল খোড়ো ঘরের ওপরের চারপাশ কাস্তে দিয়ে, কেটে দিলে যেমন দেখায় তেমনি দেখাত। বিষ্ণুপুরের আসপাশে এই রীতির মন্দির বেশ কিছু তৈরি হয়েছিল। 'আলগোছটুঙ্গি' নামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। চাঁদনি বা চালার ছাদের ওপর একটি চূড়া এমনভাবে বসানো হোত যেটিকে নিচু থেকে দেখলে মনে হোত, যেন চূড়াটি 'আলগোছ' বা আলতোভাবে বসানো হয়েছে। ছাদের সঙ্গে যেন চূড়াটির কোন সংযোগ নেই। স্থাপত্যসৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য দাসপুরের মিস্ত্রীরা এধরনের অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। দাসপুর ও তার আসপাশে এই 'আলগোছটুঙ্গি' মন্দির এখনও কিছু আছে। এই রীতির বেশ কিছু মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া 'ইসলামীয়-দেউল' নামে এক ধরনের মন্দিরের তাঁরা নামকরণ করেছিলেন যার 'শিখর' কতকটা গোলাকার গম্বুজের মতো করে তৈরি করা হত। এই প্রকারের কিছু মন্দির শুধু মেদিনীপুর জেলায় নয়, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, এই রীতির মন্দির যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি, তার প্রমাণ এর অল্প কয়েকটি নিদর্শন। বর্ধমান জেলায় কালনার প্রতাপেশ্বরের দেউল এই রীতির মন্দিরের এক সুন্দর নিদর্শন। মেদিনীপুর জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে (দাসপুর থানা) শিবের দেউল আর একটি নিদর্শন। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে এই ধরনের গম্বুজাকৃতি শিখরযুক্ত কয়েকটি মন্দির আছে, যেমন, চন্দ্রপাড়ার কামারগলিতে শিবমন্দির (১৮৩৭ খ্রি.), এটি সোনামুখীর রামহরি মিস্ত্রীর তৈরি, যিনি কালনার প্রতাপেশ্বর দেউলটিও তৈরি করেছিলেন ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। সোনামুখীর রানিরবাজারে বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ-প্রতিষ্ঠিত এরূপ একটি মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের শ্রীবাটিতেও (কাটোয়া) এ ধরনের মন্দির আছে।

দাসপুরের মিস্ত্রীরা মন্দিরপ্রবেশপথের 'খিলান' ও 'থামের'ও আঞ্চলিক ভাষায় নামকরণ করেছিলেন। খিলানের নামগুলি হল - 'দরুণ', 'হাঁসগলা', 'চামচিকা', 'বাঁশফালা', 'হাইকোর্ট', ও 'গোল'। নানা আকারের থামের তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'ইমারতি', 'কলাগেছ্যা', 'গোল', 'চৌকা' এবং 'চুমকি'। এই নামগুলি তাঁরা কিভাবে উদ্ভাবন করেছিলেন, তা আজও রহস্যাবৃত থেকে গেছে। তবে, বহুকাল ধরে পূর্বপুরুষদের মুখে মুখে এই নামগুলি শুনে তাঁদের বংশধরেরাও এগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সেটা অনুমান করা যায়। প্রবেশপথের ওপরে কতকগুলি অর্ধবৃত্তাকার বক্র রেখার সমন্বয় ক'রে 'দরুণ' খিলান তাঁরা নির্মাণ করতেন। এই খিলান অনেক প্রাচীন মসজিদেও লক্ষ্য করা যায়, যেমন, গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদ, ত্রিবেণীর (হুগলি) জাফর খাঁর মসজিদ ও আরও অনেক মসজিদে। মুসলমান আমলে মসজিদ প্রভৃতিতে প্রথম ও আরও অনেক মসজিদে। এই খিলানের প্রচলন হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। 'হাঁসগলা'র আকার কতকটা হাঁসকলের ন্যায়। 'দরুণ'-এর অর্ধবৃত্তাকার বলয়ের কৌণিক অংশগুলি পরস্পর নিম্নে প্রসারিত হয়ে ঈষৎ বক্রাকার যে চ্যাপ্টা অংশের সৃষ্টি করে, সেটি কতকটা হাঁসকল বা হাঁসের গলার মতো দেখতে হত। ওপরে-নিচে পরপর চারটি অর্ধবৃত্তাকার বলয় সন্নিবেশিত ক'রে 'চামচিকা' খিলান তাঁরা তৈরি করতেন। আধফালা বাঁশের মতো দেখতে হত 'বাঁশফালা' খিলান। গথিক-স্থাপত্যে যে ধরনের প্রবেশ খিলানের ব্যবহার আছে, কতকটা পরস্পর সেই ধরনের খিলান তাঁরা বেশকিছু মন্দিরে নির্মাণ করেছিলেন। এর নাম তাঁরা দিয়েছিলেন 'হাইকোর্ট' খিলান। সম্ভবত কলকাতা হাইকোর্টের খিলানগুলি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একক বৃত্তাকার খিলানের নাম

ছিল, 'গোল'। বলা বাহুল্য, মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে উপরি উক্ত খিলানগুলির সুন্দর নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এর প্রতিটির মধ্যেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করার প্রয়াসটা চোখে পড়ে।

বারান্দার প্রস্তার যে স্তম্ভগুলির ওপর ন্যস্ত থাকে, সেই স্তম্ভগুলিরও স্থানীয় কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে 'ইমারতি' থাম তৈরি হত বত্রিশ থাক ইঁট বা পাথর দিয়ে। এই থামের ওপর ও নিচু অংশ চওড়া, কিন্তু মাঝের অংশ সরু। মুসলমান-পূর্ববর্তী যুগের কিছু কিছু ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির ও পরবর্তীকালে মসজিদেও এই ধরনের থামের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, হুগলি জেলার ত্রিবেণী ও পাণ্ডুয়ায়। জানা যায়, এই দুটি স্থানেরই মসজিদ প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কলাগাছের মতো করে তৈরি করা হত কলাগেছ্যা থাম। একসঙ্গে চার থেকে ষোলটি কলাগাছের কাণ্ডের মতো থাম যুক্ত করে এই থাম তৈরি করা হত। গোলাকার থাম হলে বলা হত 'গোল' এবং চারকোণা থামের নাম হোত 'চৌকা'। 'চুমকি' ঘটির মতো থামকে বলা হত 'চুমকি'। নানা আকারের এই থামগুলি শুধুমাত্র দর্শনীয় হত না, এগুলির প্রতিটির মধ্য দিয়ে মন্দির-প্রবেশপথের সামগ্রিক সৌন্দর্য প্রকটিত হত। মন্দিরগাত্রের কিছু কিছু স্থাপত্যালংকারের স্থানীয় নামও পাওয়া যায়, যেমন - তুরুজ, কমলাতুরুজ, কোণ, কলকা, সোনাগেছ্যা, খাঁজবন্দী ইত্যাদি। খিলানের আরও কিছু নাম সম্প্রতি জানতে পারা গেছে, এগুলির নাম— মেহরাব, গোলন্দর, বাদামী ও সুরাইদার। বলাবাহুল্য, এই নামগুলি সবই যে দাসপুর-সূত্রধরদের উদ্‌ভাবিত, তা বলা যায় না। কিছু কিছু নাম তারা নিজেরা উদভাবন করলেও পরম্পরাক্রমে যে এগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রচলিত হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়। ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের শাস্ত্রীয় পরিভাষা ও ওড়িশার আঞ্চলিক পরিভাষার কথা বাদ দিলে বাংলার মন্দিরশিল্পের নিজস্ব অনেক পরিভাষা যে স্থানীয় সূত্রধরদের উদভাবিত, তা অস্বীকার করা যায় না। দুঃখের বিষয়, এই সব পরিভাষা আজ অনেকটাই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। গ্রন্থকারের পিতৃদেব প্রয়াত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় দাসপুর অঞ্চলের প্রবীণ অনেক মন্দিরসূত্রধরের মুখে এর কিছু কিছু শুনেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থকার আরও কোন কোন সূত্রধরের কাছ থেকে নতুন কিছু পরিভাষা উদ্ধার করেছেন, যার কয়েকটি ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এসম্পর্কে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

দাসপুর গ্রাম ছাড়া এই জেলায় আরও যে-সব স্থানে মন্দির-সূত্রধরদের বসতি গড়ে উঠেছিল, সেগুলির নাম হল ঃ কলমিজোড় (এখানে যুগলচন্দ্র নামে একজন মন্দির তৈরি করতেন), নাড়াজোল, গৌরা, খেপুত, নিমতলা, রাজনগর, হরিরামপুর (দাসপুর থানা), ঘাটাল গম্ভীরনগর, খড়ার, উদয়গঞ্জ, নবগ্রাম (ঘাটাল থানা), ক্ষীরপাই, কাশীগঞ্জ, লাহিরগঞ্জ, জাড়া, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা থানা), রাজহাটি, রঘুনাথবাড়ি (পাঁশকুড়া থানা) পাথরা (মেদিনীপুর সদর)। ঘাটাল মহকুমার পার্শ্ববর্তী হুগলি জেলার সেনহাটিতেও মন্দির-সূত্রধরদের এক প্রধান ঘাঁটি ছিল। এখানকার মিস্ত্রীরা ঘাটাল থানার যে যে স্থানে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, কয়েকটি মন্দিরলিপি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি, দাসপুর থানার কোন কোন স্থানেও তাঁরা মন্দির নির্মাণ করেছেন। বহু মন্দির কালকবলিত ও বিধ্বস্ত হওয়ায় জেলার অন্যান্যস্থানেও যে তাঁদের বসতি গড়ে উঠেছিল, তা আজ আর জানার উপায় নেই। বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে উপরিউক্ত স্থানসমূহে যে তাঁদের বসতি ছিল, সেবিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া গেছে। মন্দিরলিপির ঠিকানায়ও উপরি উক্ত স্থানগুলির কয়েকটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সূত্রধরদের পদবী ছিল চন্দ্র, দে, দাস, কুন্ডু, শীল, সাঁই। মন্দিরলিপিতেও তাঁদের এই সব পদবী পাওয়া যাচ্ছে। (পরবর্তী তালিকাটি

থেকে তা প্রমাণিত হবে।) তবে অনেক লিপিতে তারা নিজেদের সূত্রধর, ছুতার, মিস্ত্রি, কারিগর এইসব পেশাগত পদবীতে ভূষিত করেছেন। কোন কোন মন্দিরলিপিতে 'চিত্রকার', 'শিল্পী' এই নামেও নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। সূত্রধর-সম্প্রদায় মন্দির ও পোড়ামাটির মূর্তি নির্মাণ ছাড়াও কাঠের কাজ ও মাটির পুতুল তৈরি করতেন। দালান নির্মাণও তাদের পেশা ছিল। ময়না থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে ঘোড়াইদের বিরাট দালান তৈরি করেছিলেন দাসপুরের মাধবচন্দ্র মিস্ত্রি ১২৭১-১২৮১ বঙ্গাব্দের মধ্যে। এই দালানের পার্শ্ববর্তী তিনটি মন্দির মাধব মিস্ত্রীরই তৈরি বলে জানা যায়। তিনি আরও পঁচিশটি স্থানে মন্দির তৈরি করেছিলেন। তাঁরই বংশধর সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র ঐ রামচন্দ্রপুর গ্রামেই কাঠের কাজ করেন। সুরেন চন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গোষ্ঠচন্দ্র জয়চণ্ডীগ্রামে (পাঁশকুড়া থানা) এখন মাটির পুতুল ও প্রতিমা তৈরি করেন।

মন্দিরশিল্পী সূত্রধর-সম্প্রদায় কালক্রমে তাঁদের এই পেশা ছেড়ে দিয়ে কাঠের কাজ, প্রতিমা ও মাটির পুতুল তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকেন। কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ ভিন্নবৃত্তি জীবিকার জন্য গ্রহণ করেছেন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সংখ্যাল্পতাই এর প্রধান কারণ। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই জেলায় কিছু কিছু মন্দির নির্মিত হয়েছে। কিন্তু তাদের পূর্ব উপজীবিকা পরিত্যাগ করলেও এখনও এই জেলার দাসপুর থানার কোন কোন শিল্পী সাম্প্রতিককালেও মন্দির নির্মাণে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ১৩৭৮ সালে (ইং ১৯৭১) চেঁচুয়া-গোবিন্দনগর গ্রামে ঘাঁটিদের সত্যেশ্বর শিবের 'আটচালা' মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন গৌরা ও রাধাকান্তপুর গ্রামের (দাসপুর থানা) যথাক্রমে পঙ্কজকুমার চন্দ ও বিভূতি দে। সিমেন্টের পলেস্তারায় আবৃত ক্ষুদ্রাকৃতি এই মন্দির নির্মাণ করতে প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন ঘাঁটির সেসময় খরচ পড়েছিল ছয় হাজার টাকা। মেদিনীপুর শহরের সুকুলপাড়ায় (মাণিকপুর মহল্লা) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে শিবের একটি ছোট্ট 'আটচালা' মন্দির নির্মাণ করেছেন পাঁশকুড়ার এক মিস্ত্রি শেখ আখতার। প্রতিষ্ঠাতা নাড়ুগোপাল সুকুলের কাছে মিস্ত্রির নাম জানা গেছে। এছাড়া পাঁশকুড়া স্টেশনের কাছে সাম্প্রতিক কালেও একটি 'আটচালা' রীতির মন্দির নির্মিত হয়েছে দেখা যায়। 'চালা', 'দেউল' ও রত্নরীতির বহু সমাধি মন্দির এখনও তৈরি হতে দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার গ্রামেগঞ্জে। এ থেকে মনে হয়, মন্দির নির্মাণ-ধারার সাময়িক বিরতি ঘটলেও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর। এছাড়া, গ্রামেগঞ্জে 'চারচালা', আটচালা', রত্ন', 'দেউল'-রীতির বহু সমাধি মন্দির আজও নির্মিত হতে দেখা যায়।

মেদিনীপুর জেলার প্রায় বেশিরভাগ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভূস্বামী জমিদার ও সামন্তরাজ পরিবার। সমৃদ্ধিশালী বণিক-সম্প্রদায়ও মন্দির-নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন কমবেশি। সম্পদ ও বিত্তের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে তাঁরা পুণ্যার্জনের জন্য দেবালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়েছিলেন। রাজা ও ধনী ভূস্বামীদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা এক পারিবারিক প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অপরপক্ষে, বিত্তবান বণিক-সম্প্রদায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, সাধারণ অবস্থা থেকে ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা যে সব ব্যক্তি প্রভূত বিত্ত লাভ করেছিলেন তারা সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য সেকালে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। তখন বড়োলোক হলেই 'দুর্গাদালান' বা 'কালী-দালান' তৈরি করে মহাসমারোহে পুজো করা এক প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বেশির ভাগ বিত্তবানদের এক ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, দৈবানুকূল্য ছাড়া অধিকতর ঐশ্বর্যলাভ সম্ভবপর নয়। এইভাবে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। জমিদার ও ভূস্বামীরা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ জাতীয় হলেও বণিক ও ধনবান কৃষিজীবী পরিবার সেসময় তথাকথিত নিচু জাতি

বলে সমাজে গণ্য ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় এই সব সমৃদ্ধ পরিবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছিলেন সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, তাম্বুলি, তন্তুবায়, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, গোপ, কর্মকার-জাতি। এই জেলায় যেসব বৈষ্ণব মঠ-মন্দির আছে, সেগুলি বৈষ্ণব মঠাধ্যক্ষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও কোন সম্পন্ন ব্যক্তির আর্থিক সহায়তায় সেগুলি নির্মিত হয়েছিল। কোন কোন সমৃদ্ধিশালী তথাকথিত নিচুজাতীয় ব্যক্তি মন্দির নির্মাণ ক'রে বৈষ্ণব গোস্বামীকে দান করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও এই জেলায় বহু দেখা যায়। মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এই জেলার নানা স্থানে মাহিষ্য ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনেক বৈষ্ণব মন্দির নির্মিত হয়েছিল। উচ্চ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থপরিবারও কিছু কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই অল্প।

উপরি উক্ত আলোচনায় মন্দির-সূত্রধর ও প্রতিষ্ঠাতার যে বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে, তার মূল সূত্র হচ্ছে মন্দিরলিপি। কিন্তু বহু লিপিবিহীন মন্দির আজও রয়েছে মেদিনীপুর জেলায়, যাদের স্থপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। আবার, অনেক লিপিযুক্ত মন্দিরেও এঁদের কারুরই নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এবিষয়ে তাই আমাদের জ্ঞান আজও সীমিত।

১০

মেদিনীপুরের শৈবমন্দির

মেদিনীপুর জেলার অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে শৈবমন্দিরই সর্বাপেক্ষা বেশি, একথা সমীক্ষার নিরিখে বলা যেতে পারে। তার পরেই বিষ্ণু-নারায়ণ ও রাধা-কৃষ্ণমন্দির। শুধু মেদিনীপুর জেলায় নয়, গাঙ্গেয় উপত্যকা সন্নিহিত বাংলায় ইঁটের মন্দিরগুলির মধ্যে শিবের মন্দিরের সংখ্যা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি। বর্তমান লেখকের বিভিন্ন জেলায় মন্দির-সমীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথা বলা যেতে পারে। যেমন, একটি গ্রামে যেখানে হয়তো কোন বৈষ্ণব, শাক্ত বা ধর্মমন্দির লক্ষ করা যায় না, সেখানেও এক বা একাধিক শৈবমন্দির লক্ষ করা গেছে। মন্দিরযুক্ত যে কোন গ্রামে একটিমাত্র মন্দির থাকলেও সেটি যে শৈবমন্দির— এ বিষয়ে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য সর্বাংশে সত্য। পরবর্তী আলোচনা ও পরিসংখ্যানে তা প্রমাণিত হবে।

কিন্তু মেদিনীপুরে শৈবমন্দিরের সংখ্যা কেন এত বেশি, এর উত্তর দেওয়া কঠিন। পক্ষান্তরে, শাক্তমন্দির খুবই কম। বিষ্ণু-কৃষ্ণ মন্দির যে শৈবমন্দিরের পরেই, সে কথা আগে বলা হয়েছে। এ-কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে হ'তে পারে, শিবই বাংলা তথা মেদিনীপুরের অত্যন্ত লোকপ্রিয় দেবতা। ইনি সাধারণ মানুষের অতি কাছের দেবতা। শিবের মন্দিরে সর্বসাধারণের প্রবেশ অবাধ— উপচার-নৈবেদ্যেরও কোন আড়ম্বর নেই। গাজনের সময় ভক্তারা বেশির ভাগই হন তথাকথিত নিচুজাতির, যাঁরা গাজন উৎসবে অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে তাঁদের প্রিয় দেবতাকে তুষ্ট ক'রে থাকেন। নানা দৈহিক নির্যাতনও তাঁরা অক্লেশে সহ্য করেন।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রাচীন ভারত তথা বাংলায় যে একসময় বিভিন্ন ধর্মমত প্রচারিত হয় এবং যার ফলে সেই সেই ধর্মের বহু প্রাতিষ্ঠানিক মঠ ও তীর্থস্থানের উদ্ভব হয়, শৈবমতের ক্ষেত্রে ঠিক ততটা হয়নি। বাংলায় বৈষ্ণব মঠ ও শাক্ততীর্থের সংখ্যা যতটা বেশি, শৈবমঠ বা শৈবতীর্থ ততটা নয়। তাছাড়া, শৈবতীর্থ বা শৈবমঠের প্রভাবও সুদূরপ্রসারী ছিল না। তবুও, শিব সাধারণ বাঙালির মনে স্থায়ী আসন লাভ করতে পেরেছেন। ব্যক্তিগত বা গৃহদেবতার পূজা গ্রহণের পরিবর্তে শিব সাধারণের দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

বাংলায় গুপ্ত ও গুপ্তোত্তরযুগে (৩৫০ খ্রি.-৭৫০ খ্রি.) শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা তেমন না হলেও '*সমৃদ্ধ পৌরাণিক শৈবধর্ম*' সেসময় কিছুটা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সেসময় লিঙ্গপূজা যে প্রবর্তিত হয়েছিল, তার প্রমাণ '৪ নং দামোদরপুর লিপি'তে পাওয়া যায়। এই লিপি থেকে জানা যায়, উত্তরবঙ্গের এক দুর্গম স্থানে শিবলিঙ্গ-পূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। খ্রি. ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় মহারাজ বৈন্যগুপ্তের আনুকূল্যে শৈবধর্ম পূর্ব বাংলায় বিস্তার লাভ করে। গৌড়রাজ শশাঙ্ক (৬০১-৬২৫ খ্রি.) পরম শৈব ছিলেন। পাহাড়পুর (রাজশাহি জেলা, বাংলাদেশ) মন্দিরের পীঠ ও প্রাচীরগাত্রের ফলকে চন্দ্রশেখর শিবের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়নেত্র, ঊর্ধ্বলিঙ্গ, জটামুকুট, বৃষ, ত্রিশূল, অক্ষমালা এবং কমণ্ডলু প্রভৃতি লক্ষণ কোন কোন ফলকে পাওয়া যায়। পাল-সেন পর্বে পূর্ণতর শিবের যেসব মূর্তি পাওয়া যায়, তা এই ধরনের প্রতিমা থেকে উদ্ভূত হয় বলে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন। (বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, ১৪০২ ব., পৃ. ৫০০)।

এই শৈবধর্ম খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে শিবশ্রীকণ্ঠ ও তাঁর শিষ্য লাকুলীশ প্রবর্তন করেন যা

'পাশুপত ধর্ম' নামে পরিচিত হয়। পাল-সেনযুগে বাংলায় এই ধর্মই বিস্তার লাভ করেছিল বলে অনুমান করা যায়। পাল-বংশের রাজা রামপাল রামাবতীতে শিবের তিনটি মন্দির, একাদশ রুদ্রের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। আর্যাবর্ত বা উত্তর-ভারতে এই শৈব পাশুপত ধর্ম যা গুপ্ত ও গুপ্তোত্তরকালে উদ্ভূত হয়েছিল, তা ক্রমশ বাংলাদেশে পাশুপতধর্মী ব্রাহ্মণ গুরু ও তাঁদের শিষ্যদের দ্বারা বাংলায় প্রচার লাভ করে। শৈবমন্দিরও অনেক তৈরি হয়। পাল, চন্দ্র ও কম্বোজ যুগে লিঙ্গরূপী শিব বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একলিঙ্গ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ পূজাও প্রবর্তিত হয়। কিন্তু শিবের অন্যান্য রূপকল্পনায় চন্দ্রশেখর, সদাশিব, নৃত্যরত উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, কল্যাণসুন্দর (শিববিবাহ) মূর্তিও প্রাচীনবাংলায় প্রসিদ্ধ ছিল। এরূপ বেশ কিছু মূর্তি নানা স্থানে পাওয়া গেছে। এতএব অনুমান করা যায়, ঐসব মূর্তি প্রাচীন মন্দিরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান লেখক কয়েক বছর আগে (১৯৮৫) মাধবপুর থেকে (চন্দ্রকোণা থানা) যে একটি প্রাচীন খণ্ডিত শিলালিপি পেয়েছিলেন, তার আংশিক পাঠোদ্ধার করে জানা গেছে যে, ঐ সময় অর্থাৎ ১১০৪ খ্রিস্টাব্দে (৩৬৮ ভৌমকর অব্দ) একটি শিবমন্দির তৈরি হচ্ছিল, সেখানে বঙ্গদেশ থেকে আনা শিবের একটি বৃহৎ মূর্তি '*রাঢ়াশ্রী*' বিশেষণে ভূষিতা (নামটি মুছে গেছে) এক মহিলা প্রতিষ্ঠা করেন।

ওপরের আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে, প্রাচীন বাংলায় শিবের লিঙ্গ ও মূর্তি উভয়ই পূজিত হত। শিবের অন্যান্য মূর্তির মধ্যে দ্বিহস্ত ও চতুর্হস্ত ঈশান মূর্তি, দশ বারো হাত যুক্ত নটরাজ মূর্তিও উল্লেখযোগ্য। শিবের সদাশিবমূর্তিও প্রাচীন বাংলায় পূজিত হত। '*রুদ্রযামল*' গ্রন্থে শিবের ছয় রূপ ঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরাশিব। একটি সদাশিব মূর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ চিত্রশালা'য় আছে।

পাল-সেন পর্বে (১০ম-১২ শ খ্রি. শতক) এই সব মূর্তি মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হত। রুদ্রশিবের বটুক ভৈরব ও অঘোর রুদ্র মূর্তিও পাওয়া গেছে।

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় বাংলায় মুসলমান আক্রমণ ও মুসলমান শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এক বিপর্যয় নেমে এল। বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস হয়ে গেল। স্বাধীন সুলতানী আমলের শেষ দিকে (পনের শতকের শেষ) রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে যে নতুন পরিবেশ-পরিমণ্ডল সৃষ্ট হ'ল এবং সর্বোপরি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যে নবজাগরণ দেখা গেল, তার ফলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোঁড়ামি দূরীভূত হয়ে এক নতুন যুগের সূচনা হল। বাংলার মন্দিরস্থাপত্য, প্রস্তরভাস্কর্য ও 'টেরাকোটা'-অলংকরণের এক নতুন ধারার উদ্ভব হল। শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগপর্বে মন্দির ও মন্দিরাশ্রিত অলংকরণ এক বিশেষ মাত্রা পাওয়ায় মন্দিরের দেববিগ্রহ অনেকটা প্রাধান্য হারাল। খ্রিস্টিয় পনের শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলার নানা স্থানে যে অসংখ্য মন্দির তৈরি হয়, তার মধ্যে স্থাপত্য ও অলংকরণের উৎকর্ষ যতটা লক্ষ্য করা যায়, দেববিগ্রহগুলিতে ততটা পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাংলায় (গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগ পর্যন্ত) আমরা অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত নানা দেবদেবীর যে অসংখ্য মূর্তি লক্ষ করি, শেষ মধ্যযুগে (খ্রি.১৫ শ শতক - খ্রি. ১৮ শ শতক) সে তুলনায় দেবমূর্তিভাস্কর্য অনেকটা গৌণ হয়ে পড়ে। শৈবমন্দিরে শিবলিঙ্গই প্রতিষ্ঠিত হ'ল, বিষ্ণুমন্দিরে শালগ্রামশিলা অথবা রাধাকৃষ্ণমূর্তি, ধর্মমন্দিরে ধর্মশিলা বা পূর্ণমূর্তি শাক্তমন্দিরে কালী বা দুর্গামূর্তি স্থাপিত হল। আবার মন্দিরস্থাপত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলায় যে তুঙ্গশিখর দেউল আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছিল, শেষ মধ্যযুগের মন্দিরগুলি সে তুলনায়

অনেকটা খর্বাকৃতি হলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। '*চালা*' শৈলীর বিকাশ ও উৎকর্ষ ছাড়া '*রত্ন*', '*চাঁদনি*','*দালান*' ও পরিবর্তিত '*দেউল*' মন্দির শহর ও গ্রাম-গঞ্জে অসংখ্য তৈরি হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় এইসব শৈলীর মন্দির একপ্রকার অজ্ঞাত ছিল।

শেষ মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যোত্তরপর্বে এই যে মন্দিরশৈলীর কথা বলা হল, মেদিনীপুরেও সেইসব শৈলীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তবে ওড়িশার 'রেখ'-দেউল শৈলীর মন্দির বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় এই জেলায় বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। আরও লক্ষ করার বিষয় হ'ল, এই ওড়িশী 'রেখ'-শৈলীর মন্দির প্রায় সবই শৈবমন্দির। মেদিনীপুরের বেশির ভাগ অংশ একসময় ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাভাবিক কারণে এই প্রাচীন '*রেখ*'-শৈলী বর্তমান মেদিনীপুরের বেশির ভাগ অংশে অনুপ্রবেশ করে। ওড়িশা সংলগ্ন মেদিনীপুরের দিকে তো বটেই, আরও দূরবর্তী স্থান সমূহে যেমন গড়বেতা, চন্দ্রকোণা (উত্তর মেদিনীপুর) অঞ্চলেও তা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। খাঁটি রেখ শৈলীর মন্দির ছাড়া এই রীতির অনুসরণে সরলীকৃত '*দেউল*' শৈলীর অজস্র মন্দির আঠার-উনিশ শতকের মধ্যে প্রচুর তৈরি হয়।

মেদিনীপুর জেলার মন্দির-সমীক্ষায় লক্ষ করা গেছে, এই জেলার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের অনেক স্থানে খাঁটি '*ওড়িশী শৈলী*'র প্রায় সব মন্দিরগুলিই হ'ল শৈবমন্দির। দু'একটি জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এর একটি তালিকা এখানে দেওয়া গেল ঃ

সহস্রলিঙ্গ বা সস্তনি (নয়াগ্রাম) ঃ বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জের সন্নিকটবর্তী এটি সহস্রলিঙ্গ শিবমন্দির। মাকড়াপাথরে তৈরি পশ্চিমমুখী মন্দির। মন্দিরের তিনটি অংশ— বড় দেউল, অন্তরাল ও '*জগমোহন*'। '*জগমোহনে*'র সামনে বৃষভনাটমন্দির '*পিঢ়া*' বা 'ভদ্র' রীতির। শিবলিঙ্গের বৈশিষ্ট্য হল, বৃহৎ লিঙ্গটির গায়ে দশটি '*থাক*'। প্রতিটি '*থাকে*' একশ'টি করে ক্ষুদ্রাকৃতি লিঙ্গ। এ-ভাবে দশটি '*থাকে*' এক হাজার লিঙ্গ বর্তমান। সে কারণে নাম 'সহস্রলিঙ্গ'। গ্রামের নামও শিবলিঙ্গের নামে। দেবতার নামে যে অনেক গ্রাম-নাম পাওয়া যায়, এই গ্রামটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

দেউলবাড় (নয়াগ্রাম) ঃ সুবর্ণরেখা তীরবর্তী। রামেশ্বরনাথ শিবের এটি একটি প্রসিদ্ধ শৈবমন্দির। মাকড়াপাথরে নির্মিত ও পূর্বমুখী। মন্দিরটির চারটি অংশ '*বড়দেউল*' '*সপ্তরথ*' '*রেখ*'-রীতির, '*জগমোহন*' '*বৃষভনাটমন্দির*' ও '*নাটমন্দির*' '*ভদ্র*'-রীতির। প্রতিষ্ঠাকালীন কোন লিপি নেই। তবে অনুমান, উক্ত দুটি মন্দিরই ওড়িশার গঙ্গ-গজপতি-বংশের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। দেবালয়টিতে ওড়িশী '*রেখ*'-স্থাপত্যশৈলীর প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই উপস্থিত। রামেশ্বরনাথ শিবলিঙ্গটির বৈশিষ্ট্য হ'ল, গর্ভগৃহের গম্ভীরায় গৌরীপট্টের মধ্যে পদ্মাসনে একটি বৃষভমূর্তি এবং তার ওপর শিবলিঙ্গ। লিঙ্গটির তিনটি জটা স্পষ্টভাবে খোদিত। সহস্রলিঙ্গ এবং রামেশ্বরনাথ এই অঞ্চলে প্রাচীনকালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং ওড়িষ্যার বিখ্যাত শৈবতীর্থস্থানের ন্যায় এই দুটি স্থানও যে প্রসিদ্ধ ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। রামেশ্বরনাথ-মন্দিরের আশপাশে এককালে অনেক ঘরবাড়ি ছিল, তার চিহ্নও লক্ষ করা যায়।

কেশিয়াড়ি (কেশিয়াড়ি) ঃ এই স্থানের দুটি শৈবমন্দির উল্লেখযোগ্য ঃ বিখ্যাত সর্বমঙ্গলা মন্দিরের কিছু পুবে কাশীশ্বর শিবের পঞ্চরথ 'ভদ্র'-রীতির মন্দির। মন্দিরের দু'টি অংশ— মূল মন্দির ও '*জগমোহন*'। মাকড়াপাথরে তৈরি ও পশ্চিমমুখী। দুটিই '*পিঢ়*' বা '*ভদ্র*'রীতির। দেওয়াল পলেস্তারায় ঢাকা এবং কোন লিপি নেই। কিন্তু স্থাপত্যশৈলীদৃষ্টে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সমসাময়িক খ্রি. ১৭ শতকের প্রথমার্ধ মনে হয়। কেশিয়াড়ির '*তলকেশিয়াড়ি*' পল্লীতে কপিলেশ্বরের পঞ্চরথ

'*পিঢ়*' মন্দিরটির পৃথক কোন '*জগমোহন*' নেই, শুধুমাত্র মূলমন্দিরের সম্মুখসংলগ্ন প্রতিকৃতি '*জগমোহন*' দুটি '*পিঢ়া*'র সমষ্টি। এটিও মাকড়াপাথরে তৈরি। কোন লিপি নেই। তবে স্থাপত্যদৃষ্টে আ. ১৭ শতক অনুমান করা যায়।

দাঁতন (দাঁতন) ঃ শ্যামলেশ্বর শিবের নামে উৎসর্গীকৃত এটিও একটি প্রসিদ্ধ শৈবমন্দির। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ওড়িশার বালেশ্বর-ময়ূরভঞ্জের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এটিও কেশিয়াড়ির পূর্বোক্ত দু'টি মন্দিরের মতো '*পিঢ়*' রীতির। এর '*গণ্ডী*' অংশ পাঁচটি 'পিঢ়া'র সমষ্টি এবং শীর্ষের 'আমলক'টি বেশ বড়। এটিও অনেকটা দেখতে কেশিয়াড়ির সর্বমঙ্গলার মূল মন্দিরের মতো। তাই এটিও তার সমসাময়িক (আ. খ্রি. ১৭ শতকের প্রথম ভাগ) মন্দিরটির সামনে এক খর্বাকৃতি '*চারচালা*' নাটমন্দির বর্তমান।

চোরচিতা (গোপীবল্লভপুর) ঃ চোরেশ্বর শিবের '*দেউল*' ও '*জগমোহন*'। ঠিক খাঁটি ওড়িশী রেখ দেউল নয়। পরিবর্তিত। প্রতিষ্ঠাকাল অজ্ঞাত।

কেদার (বেলদা) ঃ গিরিমোহান্তদের কেদার ভুড়ভুড়ির দেউল। ওড়িশী শৈলী প্রতিফলিত। শিবলিঙ্গ মন্দিরগর্ভগৃহে একটি কুণ্ডে নিমজ্জিত। প্রতিষ্ঠাকাল অজ্ঞাত। মন্দির মাকড়াপাথরে তৈরি পশ্চিমমুখী। ক্ষুদ্রাকৃতি '*জগমোহন*'-যুক্ত।

এগরা (এগরা) ঃ হটনাগর শিবের পশ্চিমমুখী ইঁটের '*শিখর*'-দেউল মন্দির। মন্দিরের তিনটি অংশ '*বড়দেউল*' (বিমান) ও তার সংলগ্ন '*পিঢ়*' জগমোহন এবং উন্মুক্ত বারদুয়ারী। এটি খাঁটি ওড়িশীরীতির একটি সুন্দর দেবালয়। লিপি নেই। তবে জানা যায়, উৎকলরাজ মুকুন্দদেব '*হরিচন্দন*' খ্রিস্টিয় ষোল শতকের মাঝামাঝি (আ. ১৫৬০ খ্রি.) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

সাঁকোয়া (খড়্গপুর) ঃ চন্দনেশ্বরের '*ভদ্র*'-রীতির মন্দির ও '*জগমোহন*'। মন্দির মাকড়া পাথরে তৈরি ও পশ্চিমমুখী। কেশিয়াড়ির মন্দিরসাদৃশ্যে বলা যায়, এটিও খ্রি. সতের শতকের প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠিত। চন্দনেশ্বরের গাজন ও চড়ক দর্শনীয়। গাজনমেলার দিন কাছাকাছি '*জানকীমিশ্র*' নামে একটি পুকুরে পাঁচজন '*ভক্ত্যা*' স্নান ক'রে গ্রামের লোকের দ্বারা বাহিত '*পঞ্চরত্ন খাঁড়াপাটে*' চড়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসেন। বর্তমান লেখকের এখানকার গাজন দেখার সুযোগ হয়েছে। চন্দনেশ্বর শিবলিঙ্গ মন্দিরের নিচু গর্ভগৃহে গম্ভীরায় অধিষ্ঠিত।

খড়্গপুর (খড়্গপুর টাউন) ঃ খড়েশ্বর শিবের '*দেউল*' ও '*জগমোহন*'। মাকড়াপাথরে তৈরি ও পূর্বমুখী। মন্দিরটির ওপরের অংশ সংস্কারের ফলে নবকলেবর প্রাপ্ত। কিন্তু নিচের অংশ প্রাচীন। প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না। শিবলিঙ্গ গম্ভীরায় অধিষ্ঠিত।

ঢেকিয়া (খড়্গপুর লোক্যাল) ঃ স্থানটির নাম 'উটপুকুর'। ঝাড়েশ্বর শিবের দেউল, কিন্তু ওপরের অংশ পরিবর্তিত। মাকড়াপাথরে তৈরি, পুবমুখী। মূলমন্দিরের 'বাঢ়'-অংশের 'পা-ভাগ', 'তলজাংঘ', 'বান্ধনা', 'উপরিজাংঘ' ও 'বরণ্ডি' স্পষ্টরূপে চিহ্নিত। মন্দির 'সপ্তরথ' শ্রেণীর। লিপি অভাবে প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না।

চণ্ডীপুর (খড়্গপুর লোক্যাল) ঃ বীজেশ্বর শিবের দেউল ও জগমোহন। মাকড়াপাথরে তৈরি, পশ্চিমমুখী। ঠিক খাঁটি ওড়িশী দেউল নয়। স্থাপত্যে চালার ভাব পরিস্ফুটিত। প্রতিষ্ঠাকাল আ. ১৮ শতক।

মালঞ্চ ঃ চণ্ডীপুরের সংলগ্ন গ্রাম। নন্দেশ্বরের দেউল ও জগমোহন। মাকড়াপাথরে তৈরি ও পশ্চিমমুখী। প্রতিষ্ঠাকাল ১১২৭ বঙ্গাব্দ (১৭১৯-২০ খ্রি.)। বীজেশ্বরের মতো এতেও 'চালা'র

ভাব স্পষ্ট।

কর্ণগড় (শালবনী) ঃ বিখ্যাত দণ্ডেশ্বরের খাঁটি ওড়িশী রীতির দেউল ও জগমোহন। এই আকাশচুম্বী মাকড়াপাথরে তৈরি পশ্চিমমুখী মন্দিরটি প্রকৃত ওড়িশী '*রেখ*' ও '*ভদ্র*' রীতির মন্দির। মেদিনীপুরের এটি একটি বিখ্যাত শৈবমন্দির। দণ্ডেশ্বর লিঙ্গ গর্ভগৃহের কুণ্ডে নিমজ্জিত। এটি কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ খ্রি. ১৮ শতকের গোড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন বলে অনুমান। দণ্ডেশ্বরের 'জগমোহন'-কক্ষের একটি বেদিতে বসে কবি রামেশ্বর চক্রবর্তী তাঁর প্রসিদ্ধ '*শিবমঙ্গল*' কাব্য রচনা করতেন। দণ্ডেশ্বরের পার্শ্ববর্তী মহামায়া মন্দিরও খাঁটি ওড়িশী রীতির।

ধলহরা (কেশপুর) ঃ বটেশ্বর শিবের দেউল ও জগমোহন। এটিও প্রকৃত ওড়িশী রীতির মন্দির। মাকড়াপাথরে তৈরি, পশ্চিমমুখী। পূর্বোক্ত কর্ণগড়ের মতো এরও আকৃতির পরিবর্তন হয়নি। প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না।

নেড়াদেউল (কেশপুর) ঃ কামেশ্বরের প্রসিদ্ধ দেউল। মাকড়াপাথরে তৈরি ও পূর্বমুখী। প্রাচীন দেউল সন্দেহ নেই। ফান ডেন ব্রুকের মানচিত্রে (১৬৬০ খ্রি.) এই দেউল চিহ্নিত হয়ে আছে। তাছাড়া ভারতচন্দ্রের '*অন্নদামঙ্গলে*'ও এই 'নেড়াদেউলে'র উল্লেখ আছে। কিন্তু বহুবার সংস্কারের ফলে দেউলের রূপ অনেকটা পরিবর্তিত।

মন্দিরের ওপরের '*আমলক*' শিলাটি না থাকায় (বর্তমান লেখক এই স্থানচ্যুত শিলাটি গর্ভগৃহে লক্ষ্য করেছেন) এটি '*নেড়া দেউল*' নামে পরিচিত। তবে এটির 'রাঢ়া দেউল' নামও হতে পারে। কারণ প্রাচীনকালে দেউলটি রাঢ় ও উৎকলের সীমারেখায় অবস্থিত ছিল।

কানাশোল (কেশপুর) ঃ প্রসিদ্ধ ঝাড়েশ্বর শিবের '*পঞ্চরত্ন*' মন্দির। ইঁটের তৈরি ও দক্ষিণমুখী। লিপিসাক্ষ্যে মন্দিরটি ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলে জানা যায় (বঙ্গাব্দ ১২৪১)। সামনের দেওয়ালে প্রচুর '*টেরাকোটা*' আছে। ঝাড়েশ্বরের গাজন এই অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ।

গড়বেতা (গড়বেতা) ঃ 'রায়পাড়া'য় কণ্ডরেশ্বর শিবের 'পিঢ়'-রীতির মন্দির। শিবলিঙ্গ বৃহৎ। এটি '*ঘটিমারা শিব*' নামেও প্রসিদ্ধ। স্থাপত্যদৃষ্টে মন্দিরটি যে বেশ প্রাচীন, তাতে সন্দেহ নেই। বিশালাকার না হলেও মেদিনীপুরের এটি একটি উল্লেখযোগ্য শৈবমন্দিররূপে পরিগণনযোগ্য। ওড়িশী 'পিঢ়'-শৈলীর এটি সুন্দর নিদর্শন।

কেদার (ডেবরা) ঃ এটি 'কেদার ভুড়ভুড়ি' নামে পরিচিত। শিবের নাম চপলেশ্বর বা কেদারেশ্বর। মাকড়াপাথরে তৈরি ও পশ্চিমমুখী। মন্দিরের পেছনে '*কেদারকুণ্ড*' নামে যে একটি 'কুণ্ড' আছে, সেখানে সব সময়েই জলে বুদবুদ ওঠে। দেউল '*রেখ*', 'জগমোহন' ও নাটমন্দির 'পিঢ়'-রীতির হলেও এগুলিতে প্রকৃত ওড়িশী শৈলী পরিস্ফুট হয় না। বহুবার সংস্কারে এর আকার বদলেছে। তবে জেলার এটি একটি প্রসিদ্ধ শৈবমন্দির। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না।

উপরি উক্ত শৈবমন্দিরগুলির প্রায় সবই মেদিনীপুরের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বেশির ভাগই খাঁটি ওড়িশী শৈলীর, অনেকগুলির শিবলিঙ্গ কুণ্ডমধ্যবর্তী। ওড়িশার প্রভাবমণ্ডলের মধ্যে এসব স্থান দীর্ঘকাল থাকায় ওড়িশার এককালের শৈবধর্মমতের প্রভাবে এইদিকে উক্ত শিবমন্দিরগুলি তৈরি হয়েছিল। এই ধরনের শৈবমন্দির আরও অনেক ছিল ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিভিন্ন স্থানে। সেইসব মন্দিরের বহু ভগ্ন অংশ বর্তমান লেখকের চোখে পড়েছে। যেমন রোহিণীর (শাঁকরাইল) ভৈরবডাঙায় ভৈরবেশ্বরের একটি মন্দির ছিল। তার ধ্বংসাবশেষ আমাদের চোখে পড়েছে। শিলদার নিকটবর্তী গুড়গোন্দায় একটি প্রাচীন শৈবমন্দির ছিল অনুমান করা যায়। সেই

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ঐ গ্রামে লক্ষ করা যায়। সেখানে বৃহৎ 'আমলক'শিলা ও একটি পাথরের ষাঁড় এখনও আছে।

কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐ শৈবমন্দিরগুলি ছাড়া মেদিনীপুরের অসংখ্য গ্রামে যে আরও অজস্র শিবের মন্দির আছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান আজও দেওয়া যায়নি। নিচে এগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল। দেবাদিদেব মহাদেব এই অঞ্চলের মানুষের ধর্মজীবনে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, এই তালিকা থেকে কিছুটা জানা যাবে। এছাড়া, আরও জানা যাবে দেবতা শিবের কত বিচিত্র নাম আমরা ঐসব মন্দিরে লক্ষ করেছি।

আজুড়িয়া (দাসপুর) ঃ 'মাড়োতলা' এলাকায় শিবের তিনটি 'আটচালা' ইঁটের। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়।

আমনপুর (কেশপুর) ঃ বুড়ো শিবের 'দেউল'। আ. ১৯ শতকের প্রথমার্ধ।

উত্তর-গোবিন্দনগর (দাসপুর) ঃ ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' (১৮৫০), পার্বতীনাথের 'দেউল' (আ. ১৯ শতক)।

উত্তরবাড় (দাসপুর) ঃ কালিন্দীনাথ শিবের 'আটচালা'। আ. ১৯ শতক।

কাটান (ঘাটাল) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (আ. ১৯ শতক)।

ক্ষীরপাই (চন্দ্রকোণা) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (হাটতলা) (১৮৩৯ খ্রি.)।

কদমকুণ্ডি ঃ খড়কেশ্বর শিবের 'আটচালা' (১৮৬১)।

খড়ার (ঘাটাল) ঃ মৃত্যুঞ্জয় ও শশিশেখরের দুটি 'আটচালা' (১৯০৫)।

খেলাড় (খড়্গাপুর লোক্যাল) ঃ শম্ভুনাথের 'আটচালা'।

গঙ্গাদাসপুর (চন্দ্রকোণা) ঃ উমাপতি শিবের 'আটচালা' (আ. ১৯ শতক)।

ময়না (ময়না) ঃ ময়নাহাটে শিবের 'দেউল' (১৯০১)।

গোপমহল (ঘাটাল) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (১৭৭৪), বুড়ো শিবের 'দেউল' (১৯০৪)।

গোপালপুর (দাসপুর) ঃ ভুবনেশ্বর ও গগনেশ্বর শিবের দু'টি 'আটচালা'-গগনেশ্বর (১৭৯৫)।

গোপীবল্লভপুর (গোপীবল্লভপুর) ঃ হাটতলায় শিবের 'আটচালা'।

গোবিন্দপুর (পাঁশকুড়া) ঃ তারকনাথের 'আটচালা' (১৮৮১)।

গোঁসাইবাজার (চন্দ্রকোণাটাউন) ঃ শান্তিনাথ শিবের 'আটচালা' (আ. ১৯ শতক)।

গৌরা (দাসপুর) ঃ 'শিবের মাড়ো'য় হটনাগর শিবের 'আটচালা' (১৮০৬, সংস্কার ১৮৭৯), শিবের 'দেউল' (মণ্ডলপাড়া) (১৮৫০)।

ঘনশ্যামবাটী (দাসপুর) ঃ বৈদ্যনাথের 'আটচালা' (মাড়োতলা) (১৭৯৫)।

জকপুর (খড়্গাপুর লোক্যাল) ঃ যক্ষেশ্বরের 'আটচালা' (আ. ১৯ শতক)।

চকবাজিত (ডেবরা) ঃ কাশীশ্বর শিবের 'দেউল' ও রামেশ্বরের 'দেউল'-রামেশ্বর ১৮৬৫।

ছয়রসিয়া (পাঁশকুড়া) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (১৮৯৮)।

জনার্দনপুর (দাসপুর) ঃ যোগেশ্বরের 'আটচালা' (আ. ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)।

জলসরা (ঘাটাল) ঃ বুড়োশিবের (সম্ভবত জলেশ্বর) 'বারোচালা' (আ. ১৯ শতক)।

া (চন্দ্রকোণা) ঃ 'বাজারপাড়া'য় গঙ্গাধর শিবের 'আটচালা' (আ. ১৯ শতক)।

জাড়া (চন্দ্রকোণা) ঃ ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' (১৮২৪) (চকবাজার). রামেশ্বরের 'চাঁদনি' (১৭৯৫) ('বাবু'দের বাড়ি), গঙ্গাধরের 'আটচালা' (১৮১৪), উমাপতি শিবের 'চাঁদনি' (১৮৬৬), 'কুমোরপাড়া'য় নীলকণ্ঠশিবের 'আটচালা' (আ. ১৯ শতক), শান্তিনাথের 'চাঁদনি' (১৮৯৯)।

জোতমুরি (দাসপুর) ঃ গঙ্গাধরের 'আটচালা' (১৮২৮)।

তলকুই (মেদিনীপুর) ঃ বুড়ো শিবের 'পিঢ়'-রীতির মন্দির (বেশ প্রাচীন)।

দলপতিপুর (ঘাটাল) ঃ শীতলানন্দ ও মল্লেশ্বরের দু'টি 'দেউল'।

দক্ষিণবাজার (চন্দ্রকোণা টাউন) ঃ শান্তিনাথ শিবের 'নবরত্ন' (আ. ১৯ শতক)।

দাসপুর ঃ শীতলানন্দ শিবের মন্দির (আগে 'দেউল' ছিল। বর্তমানে পরিবর্তিত) (১৮৪৯)।

দেউলিয়া (পাঁশকুড়া) ঃ সিদ্ধেশ্বর শিবের 'চারচালা' (১৭২০)।

দোলগ্রাম (নয়াগ্রাম) ঃ বালকেশ্বর শিবের 'দেউল'।

ধামতোড় (ডেবরা) ঃ বিশ্বেশ্বর শিবের 'পঞ্চরত্ন' (আ. ১৯ শতকের শেষ)।

নৈপুর (পটাশপুর) ঃ বাঘেশ্বর শিবের 'দেউল' (আ. ১৯ শতক)।

পান্না (ঘাটাল) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'চাঁদনি' (১৭৮৪)।

পিংলা ঃ সদানন্দ শিবের 'দেউল' (১৮৬৯)।

পুরুষোত্তমপুর (চন্দ্রকোণা শহর) ঃ শান্তিনাথ শিবের 'ত্রয়োদশরত্ন' (আ. ১৯ শতক)।

বলরামপুর (ডেবরা) ঃ (মল্লিকবেড়) শিবের 'দেউল' (১৮৫৬)।

বাঘাদাঁড়ি (ভগবানপুর) ঃ সিদ্ধেশ্বরের দেউল ও জগমোহন।

বেড়জনার্দনপুর (খড়্গপুর লোক্যাল) ঃ শিবের ৪টি 'আটচালা' (১৭৮৪-১৭৮৭)।

বৈকুণ্ঠপুর (দাসপুর) ঃ শিবের 'দেউল' (আ. ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)।

বাসুদেবপুর (দাসপুর) ঃ শিবের 'দেউল' (হাটপাড়া) (আ. ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)।

ভগবানপুর ঃ (শিববাজার) বুড়ো শিবের 'দেউল' ও 'চারচালা' 'জগমোহন'।

মলিঘাটী (ডেবরা) ঃ দ্বাদশ 'আটচালা' শিবমন্দির (১২৫২ বঙ্গাব্দ, ১৮৪৪-৪৫ খ্রি.)।

মল্লেশ্বরপুর (চন্দ্রকোণা টাউন) ঃ মল্লেশ্বর শিবের 'পঞ্চরত্ন' (আ. ১৮ শতক)।

মিত্রসেনপুর (চন্দ্রকোণা টাউন) ঃ শান্তিনাথ শিবের 'নবরত্ন' (১৮২৮)।

রঘুনাথবাড়ি (পাঁশকুড়া) ঃ খড়্গেশ্বর শিবের 'চারচালা'।

পশ্চিম রাজনগর (পাঁশকুড়া) ঃ ঝাড়েশ্বর ও রামেশ্বর শিবের দুটি 'দেউল' (আ.১৯ শতক)।

পূর্ব রাজনগর (পাঁশকুড়া) ঃ শিবের 'আটচালা'। শিবলিঙ্গ বিশাল আকার।

রামচন্দ্রপুর (ময়না) ঃ শিবের 'আটচালা' (১৮৫৪), রামেশ্বর শিবের 'চাঁদনি' (১৯৪৬)।

রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা) ঃ পার্বতীনাথের 'আটচালা' (১৮০১-১৮০২) পুরাতনহাট, বুড়োশিবের 'আটচালা' (১৮৬৬)।

রামবাগ (মহিষাদল) ঃ দুটি শিবের 'আটচালা'।

রোহিণী (সাঁকরাইল) ঃ রোহিণীশ্বর শিবের 'দেউল' (১৯১০)।

লোছিপুর (ঘাটাল) ঃ শিবের দুটি 'দেউল' (১৮৬০)।

লাওদা (দাসপুর) ঃ ভুতনাথ শিবের 'দালান' (আ. ১৯ শতক)।

শিরোমণি (মেদিনীপুর) ঃ বামদেব শিবের 'দেউল' (১৮৪১)।

শিলদা (বিনপুর) ঃ (রাজার বাঁধ) উমেশ্বরনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৫), উত্তর শিলদায় শম্ভুনাথের 'দেউল' নতুন বাজারে দ্বাদশনাথ শিবের 'চারচালা'।

শুকজোড়া (বিনপুর) ঃ (মুচিপুকুর) শিবের 'দেউল'।

শ্যামচাঁদপুর (কেশপুর) ঃ শিবের 'আটচালা' ও 'পঞ্চরত্ন' (আ. ১৯ শতক)।

শ্যামসুন্দরপুর (পাঁশকুড়া) ঃ সিদ্ধিনাথ শিবের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৬৮?), হরগৌরীনাথের 'আটচালা' ও বাণলিঙ্গ শিবের 'দেউল'।

সত্যপুর (মাড়োতলা, ডেবরা) ঃ সত্যেশ্বর শিবের 'দেউল', শীতলানন্দ ও রাধাকৃষ্ণের 'নবরত্ন'।

সুরৎপুর (দাসপুর) ঃ মল্লেশ্বর শিবের 'দেউল' (১৮৩১)।

মহাকালপোতা (দাসপুর) ঃ বাণেশ্বরের 'আটচালা' (১৮১৯)।

হবিবপুর (মেদিনীপুর শহর) ঃ (সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরপ্রাঙ্গণ) শিবের 'চারচালা' ও শিবের একটি 'আটচালা'।

হরিনারায়ণপুর (ডেবরা) ঃ শিবের একটি 'আটচালা' (শিবপুকুর)।

উপরি উল্লিখিত শৈবমন্দিরগুলি মেদিনীপুর জেলার মতো এক বিরাট জেলার পক্ষে খুবই সামান্যমাত্র। বর্তমান লেখকের প্রত্যক্ষ সরেজমিন অনুসন্ধানে আরও অনেক এ-ধরনের মন্দির লক্ষ্য করা গেছে। নিম্নে আরও কয়েকটি (শুধুমাত্র দাসপুর থানার) উল্লেখ করা হ'ল।

আড়খানা (দাসপুর) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (আ. ১৯ শতকের শেষ)।

কলমিজোড় (দাসপুর) ঃ শিবের 'আটচালা' (১৮২৪)।

কলাইকুণ্ডু (দাসপুর) ঃ শিবের দেউল (১৮৩৫)।

কিস্মৎরাধাকান্তপুর (দাসপুর) ঃ বিশ্বেশ্বরের 'দেউল' (আ. ১৯ শতক)।

কামালপুর (দাসপুর) ঃ (হাটতলা) শিবের 'দেউল'।

খাঞ্জাপুর (দাসপুর) ঃ হরনাগর শিবের 'আটচালা'।

খুকুড়দহ (দাসপুর) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (বৃহদাকৃতি)।

গদাইপুর (দাসপুর) ঃ শিবের 'আটচালা'।

গাদিঘাট (দাসপুর) ঃ শিবের 'দেউল'।

গোকুলনগর (দাসপুর) ঃ শিবের 'দেউল' (১৮৩৬)।

গোপালনগর (দাসপুর) ঃ ঝাক্‌ড়েশ্বরের 'আটচালা' (১৮৮৪)।

গোপীনাথপুর (দাসপুর) ঃ শিবের 'আটচালা'।

চাঁদপুর (দাসপুর) ঃ শিবের 'আটচালা'।

জগন্নাথবাটী (দাসপুর) ঃ মৃত্যুঞ্জয় শিবের 'আটচালা'।

ঝুমঝুমি (দাসপুর) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (১৮৫৩)।

তাতারপুর (দাসপুর) ঃ শিবের 'আটচালা' (আ. এই বিশ শতকের প্রথম পাদ)।

দক্ষিণবাড় (দাসপুর) ঃ (হাটতলা) দণ্ডেশ্বরের 'চাঁদনি'।

দুর্গাপুর (দাসপুর) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (১৮১৯)।

দুবরাজপুর (দাসপুর) ঃ শিবের 'আটচালা'।

নিমতলা (দাসপুর) ঃ হেমন্তনাথ শিবের 'আটচালা' (আ. ১৯ শতকের প্রথম)।

নির্ভয়পুর (দাসপুর) ঃ জলেশ্বর শিবের 'আটচালা'।

নিশ্চিন্তপুর (দাসপুর) ঃ (মাড়োতলা) কালিন্দীনাথ শিবের 'আটচালা'।

নৈহাটী (ঐ) ঃ কালিন্দীরায় শিবের 'চাঁদনি'।

পদমপুর (ঐ) ঃ শিবের দুটি 'আটচালা' (১৯১০)।

পার্বতীপুর (ঐ) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা'।

বসন্তপুর (ঐ) ঃ শীতলানন্দের 'আটচালা' (সংস্কার ১৯১১)।

বড়শিমুলিয়া (ঐ) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (আ. ১৯ শতকের শেষ)।

বালিতোড়া (ঐ) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা'।

বালিপাতা (ঐ) ঃ শিবের 'দেউল'।

বাড়জালালপুর (ঐ) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা'।

বিষ্ণুপুর (ঐ) ঃ শীতলানন্দের 'দেউল'।

বেলিয়াঘাটা (ঐ) ঃ শীতলানন্দের 'দেউল'।

মকারামপুর (ঐ) ঃ শিবের 'দেউল'।

রসিকগঞ্জ (ঐ) ঃ শীতলানন্দের 'আটচালা'।

রাধাকান্তপুর (টালিভাটা, ঐ) ঃ তারকেশ্বরের 'আটচালা' (উনিশ শতকের শেষ দিক)।

রামপুর (ঐ) ঃ শিবের 'আটচালা' (১৭৫৫)।

রামদেবপুর (ঐ) ঃ শীতলানন্দের 'দেউল'।

শ্রীপুর (ঐ) ঃ শীতলানন্দের 'দেউল' (১৮৬২)।

সয়লা (ঐ) ঃ শিবের 'দেউল' (১৮৬৪)।

হাটসরবেড়িয়া (দাসপুর) ঃ শিবের 'আটচালা'।

সাহাচক (ঐ) ঃ নীলকণ্ঠ শিবের 'আটচালা' (১৮৮৮)।

সিংহচক (ঐ) ঃ হরশঙ্করের 'আটচালা'।

সুরানয়নপুর (ঐ) ঃ শম্ভুনাথের 'দেউল', শীতলানন্দের 'আটচালা' (১৮৩৫-৩৬)।

সোনামুই (ঐ) ঃ (মাড়োতলা) যুগেশ্বর শিবের 'আটচালা'।

সৈয়দপুর (ঐ) ঃ ধনেশ্বর শিবের 'আটচালা'।

হরিরামপুর (ঐ) ঃ শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা'।

চককৃষ্ণবাটী (ঐ) ঃ অযোধ্যানাথ শিবের '*আটচালা*' (সম্ভবত নাড়াজোলের রাজা অযোধ্যারাম খাঁনের নামে)।

চেতুয়া-রাজনগর (ঐ) ঃ শীতলানন্দের 'দেউল' (১৮৩৮), (বোসপাড়ায়) শিবের দেউল (১৮৪৫), (কাঁকিনদীতীরবর্তী) উমাপতিশিবের 'আটচালা' (১৮৯৪— এখানে ইংরাজি সাল দেওয়া আছে)।

ওপরের এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় এটাই প্রতিফলিত, দাসপুরের মতো একটি ছোট্ট থানায় শৈবমন্দিব কত বেশি তৈরি হয়েছিল! আরও লক্ষ্য করার বিষয়, শৈবমন্দিরগুলি বেশির ভাগই '*চালা*' ('আটচালা'ই বেশি) ও '*দেউল*'-রীতির। খুব কম ক্ষেত্রেই '*রত্ন*'-মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও বিস্ময়ের কথা, প্রায় সব মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাক-মুসলিম পর্বের বাংলায় যেখানে আমরা শৈবমূর্তি-ভাস্কর্য বেশ কিছু পেয়েছি যেগুলি অবশ্যই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত

ছিল, সেখানে অন্তমধ্যযুগের বাংলায় মূর্তির বদলে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজা-রাজড়ারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ ক'রে, নদীর তীরে দ্বাদশ বা এক শ' আট শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করতেন। মেদিনীপুর জেলায় শিবলিঙ্গ দু'শ্রেণীর লক্ষ্য করা যায় ঃ গম্ভীরায় প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ এবং মাটির ভেতর থেকে উঠে আসা প্রস্তরময় লিঙ্গ, যার সঙ্গে কিছু কিছু কাহিনী কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে। এই শিবের স্থানীয় নাম '*বুড়ো শিব*'। এইভাবে বুড়ো শিবের নামে '*বুড়োশিবতলা*' নামের অনেক স্থান-নাম পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর জেলায় শিব এখনও খুবই জনপ্রিয় দেবতা। এখনও বহু স্থানে শিবমন্দির তৈরি হয়। প্রায় সাদামাঠা '*চালা*'-রীতির মন্দিরে শিব স্থান পান। এই জেলার তথা বাংলা সাহিত্যের '*শিবমঙ্গলে*'র বিখ্যাত কবি রামেশ্বর চক্রবর্তীর (সতের-আঠার শতক) '*শিবায়ন*' কাব্যে শিব সাধারণের লৌকিক দেবতারূপে চিহ্নিত হয়েছেন। বাংলার ঘরে ঘরে বা প্রতি গ্রামেই সাধারণের দেবতারূপে শিব পূজিত হ'তে থাকেন। বহু শৈবমন্দির এইভাবেই নির্মিত হয়। এই মন্দিরগুলির বেশির ভাগই খ্রি. সতের শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়। এই জেলায় প্রাচীন ও প্রাক-মুসলিম পর্বের শৈবমন্দিরগুলির কথা আগে কিছুটা বলা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের ফলে পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ ধর্মের প্রভাবে অসংখ্য রাধাকৃষ্ণ-মন্দির নির্মিত হয়। কিন্তু প্রাক-চৈতন্য যুগে শৈবধর্মের যে প্রাধান্য ছিল তার ফলে বহু প্রাচীন শৈবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। চৈতন্যোত্তর যুগে বহু রাধাকৃষ্ণ ও বিষ্ণু মন্দিরের সঙ্গে শৈবমন্দিরও অজস্র নির্মিত হয়েছিল, ওপরের তথ্য অনুসারে তা প্রমাণিত হয়। শুধুমাত্র মেদিনীপুর জেলায় নয়, সারা বাংলায় শৈবমন্দিরের সংখ্যা সকলের থেকে বেশি।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

রায় নীহাররঞ্জন ঃ *বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব*, দে'জ, ১৪০২, কলিকাতা

রায় প্রণব ঃ *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ* সরকার, কলিকাতা, ১৯৮৬

রায় পঞ্চানন ও রায় প্রণব ঃ *ঘাটালের কথা*, ঘাটাল, ১৯৭৭

রায় প্রণব (সম্পাদিত ও লিখিত) ঃ ১ '*মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন*, ১ম খণ্ড, 'সাহিত্যলোক', কলিকাতা, ১৯৮৯, ২ '*মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন*', ২য় খণ্ড, 'সাহিত্যলোক', কলিকাতা, ১৯৯৮

রায় প্রণব ঃ '*বাংলার মন্দির ঃ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য*', 'পূর্বাদ্রি' বিশেষ সংখ্যা, তমলুক, ১৯৯৮

১১
হুগলির মন্দির

গঙ্গা-ভাগীরথীর পলিমাটিতে গড়া হুগলি জেলার নানা স্থানে বহু মন্দির এককালে তৈরি হয়েছিল। সেগুলির বেশির ভাগই ছিল খাঁটি বাংলা শৈলীর অর্থাৎ চালা, চাঁদনি, দালান, রত্ন এবং দেউল রীতির। জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পুরানো মন্দিরগুলির প্রায় সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এখনও যেগুলি তাদের অস্তিত্ব কোন রকমে বজায় রেখেছে, তাদের কোন কোনটি সম্পর্কে এর আগে আলোচনা করা হয়েছে। সাহাগঞ্জে গঙ্গার ধারে ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি একটি 'আটচালা' মন্দিরের দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা-ফলক ছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল খুবই জরাজীর্ণ। পৌরাণিক দেবদেবী-লীলাদৃশ্য ছাড়াও সামাজিক দৃশ্যের বেশ কিছু টেরাকোটা-ফলকে সমকালীন সমাজের ছবিও প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। এরূপ প্রাচীন মন্দির খুবই জরাজীর্ণ ও অসংরক্ষিত অবস্থায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল। নদীর ধারের এই মন্দিরটির ওপারেই হালিশহর। সেখানেও সুন্দর কয়েকটি 'টেরাকোটা' মন্দির বর্তমান। গঙ্গার দুই তীরে খ্রি. সতের থেকে উনিশ শতকের মধ্যে এমন সুন্দর সুন্দর কত মন্দির তৈরি হয়েছিল, যেগুলি আমাদের শিল্পস্থাপত্যের এক গৌরবময় অধ্যায় সূচিত করে।

হুগলি জেলায় এত সুন্দর সুন্দর 'টেরাকোটা' মন্দির আছে, যেগুলি আমাদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন একটি মন্দির হল, দশঘরায় বিশ্বাসদের গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' মন্দির। এটি একটি ঠাকুরবাড়ি— দুর্গাদালান, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, শিবের আটচালা, ঝুলনমন্দির সবই বর্তমান। বিশ্বাস পরিবার সাবেক জমিদার। কাছারি ও বৈঠকখানা বর্তমান। গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন'টি স্থাপত্য ও টেরাকোটা অলংকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পুরানো লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৭২৯ সালে তৈরি হয়। মন্দিরের বাইরের তিন দিকের দেওয়ালে (পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ পাশে) বহু টেরাকোটা ফলক বসানো আছে। এর মধ্যে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অনেক ফলক নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলি আবার কলকাতার কুমারটুলির এক শিল্পীকে দিয়ে তৈরি করিয়ে দেওয়ালে যথাস্থানে বসানো হয়। নতুন ফলকগুলির মধ্যে আছে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের সপারিষদ ভক্তগণসহ সংকীর্তন, দশভুজা মহিষমর্দিনী, লক্ষ্মী, সবস্বতী ইত্যাদি। সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের তিনটি প্রস্থে সুপরিচিত লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য উপস্থিত। ওপরে কার্নিশের নীচে খোপে চারপাশে নকশাকাটা ছোট ছোট টালিতে 'বাস-রিলিফে' পোড়ামাটি মূর্তি আছে। সেকালের সামাজিক দৃশ্যের ফলকও লক্ষ্য করা যায়, যেমন, স্ত্রীলোকের চরকাকাটা, মিথুনদৃশ্য, শ্রীকৃষ্ণ (এগুলি সবই নতুন টালি)। দক্ষিণ ও উত্তরদিকে পোড়ামাটি মূর্তির বদলে ফুল ও লতাপাতার বহু সুন্দর সুন্দর টালি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতলে চূড়াগুলির গায়ে ফুল ও লতাপাতার 'টেরাকোটা'-ফলক সন্নিবেশিত। গোপীনাথ মন্দিরের সামনে একটি নাটমন্দির। এটি ১৮৩৬ সালে তৈরি হয়, লিপি থেকে জানা যায়। পাশের দুর্গাদালানটি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়।

দশঘরার এই বিশ্বাস পরিবারের যে দুর্গাপূজা হয়, সেখানে দেবীমূর্তি মহিষাসুরমর্দিনী, কিন্তু চতুর্ভুজা। লক্ষণীয়, এই প্রতিমার কার্তিক-গণেশ 'মেড়ে'র ওপরে থাকে, নিচে থাকে লক্ষ্মী-সরস্বতী মূর্তি। দেবী দুর্গার সামনের ডানহাতে তরোয়াল এবং সামনের বামহাতে ঢাল, ওপরের উত্থিত ডান হাতে ত্রিশূল দিয়ে মহিষাসুরের বুকে আঘাত এবং নিচের বাম হাতে সাপের লেজধরা

অবস্থায় দেবী সিংহের ওপর দণ্ডায়মানা। বিশ্বাস পরিবারের এই দুর্গাপুজোর কিছু পারিবারিক আচার এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য। পুজোয় সপ্তমী, সন্ধি ও নবমীতে পাঁঠাবলি হয়। নবমীর দিন দুটি পাঁঠা, আখ, ছাঁচিকুমড়ো ও গোঁড়ালেবু বলি হয়। নাটমন্দিরের নিচে বলির স্থান।

প্রতিদিন বলি হয়ে গেলে মাটির সরায় বা খর্পরে রক্ত, মাংস ও কলা (রম্ভা) দেবীকে নিবেদন করার পর সেই সরা ঝুলন মন্দিরের ওপরের চিলেকোঠায় রেখে দেওয়া হয়। বিশ্বাসদের পারিবারিক এক আচার্য তারকেশ্বরের কাছে একটি গ্রামে বাস করেন। পুজোর সময় তাঁকে আনা হয় এবং বলির আগে তাঁর আদেশ নেওয়া হয়। তিনি আদেশ দিলে বলি হয়। তিন দিনের তিনটি সরা পরে বাড়ির পেছনে একটি বেলগাছের তলায় পুঁতে দেওয়া হয়। এছাড়া, বিজয়াদশমীর দিন পুজো হয়ে যাওয়ার পর বাড়ির কর্তা প্রথমে গোপীনাথ জীউ মন্দিরে এসে গোপীনাথকে প্রণাম করেন, সেইসময় তাঁর মাথায় গোপীনাথের একটি পুরানো কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়। এর পর পরিবারের কর্তা ও অন্যসকলে দেবীমূর্তির সামনে প্রণাম করেন।

দুর্গোৎসবে দেবীপূজার আগে গোপীনাথের পুজো হয়। দুর্গাপুজোর সময়ে গোপীনাথের কোন পুজো করা হয় না। তার আগেই গোপীনাথজীউর পুজো শেষ করতে হয়। বিশ্বাস পরিবার বংশপরম্পরায় বৈষ্ণব। বলির মাংস অপরকে দিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাসরা নেন না। গোপীনাথের প্রসাদও পুরোহিতকে দেওয়া হয়।

ঠাকুরবাড়ির বাইরে গোপীনাথের একচূড়া দোলমঞ্চ। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। কোন লিপি না থাকলেও গঠন ও ফুলের নকশা লক্ষ্য করে অনুমান করা যায়, এটিও মূল গোপীনাথ মন্দিরের সমসাময়িক অর্থাৎ আঠার শতকে তৈরি। কিন্তু রাসমঞ্চটি মনে হয় আরও পরবর্তী। সামনে একটি পুকুর। কাছাকাছি শিবের একটি 'আটচালা' মন্দিরও আছে। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী।

দশঘরার 'বামুনপাড়া'য় শিবের একটি 'আটচালা' মন্দির বেশ পুরানো। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী এবং ইঁটের তৈরি। সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথ, 'ইমারতি' থাম ও জোড়া 'দরুণ' খিলান। ওপরের টেরাকোটা লিপিটি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এই মন্দিরের ফুলকারি নকশার সঙ্গে বিশ্বাসদের গোপীনাথ মন্দিরের নকশার সাদৃশ্য স্পষ্ট। দুটিই একই মিস্ত্রীর তৈরি মনে হয়। মন্দিরটির ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের তিনপ্রস্থে 'টেরাকোটা'র ফুলকারি নকশা এবং প্রতিকৃতি পিঢ়-দেউলে শিব স্থাপিত। পোড়ামাটির কয়েকটি ফুল ও ফুলের সুন্দর সুন্দর নকশা ছাড়া কোন 'টেরাকোটা' মূর্তি এখানে নেই। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ১৫ ফুট ১০ ইঞ্চি ও ১৫ ফুট ২ ইঞ্চি এবং আনুমানিক উচ্চতা তিরিশ ফুট। মন্দিরটি ভঙ্গুর ও গাছগাছালিতে ভরা। এই মন্দিরেরই পাশে বিশালাক্ষীর 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। মন্দিরের অনেকদিন আগে সংস্কার করা হয়েছিল। গর্ভগৃহে বিশালাক্ষী দেবীমূর্তি দণ্ডায়মানা ও শাড়ীপরিহিতা। দশঘরার এই মন্দিরগুলি বাংলার প্রাচীন স্থাপত্য ও টেরাকোটার ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য।

হুগলি জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান গুপ্তিপাড়া। ভাগীরথীর কাছাকাছি এই স্থান একসময় খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। বাংলার প্রথম 'বারোয়ারি পুজো' গুপ্তিপাড়াতেই হয় বলে জানা যায়। দশনামী সম্প্রদায়ের মঠবাড়ি এলাকায় গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি বর্তমান। এগুলি সবই ইঁটের তৈরি। শুধুমাত্র বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলীর মন্দির নয়। এখানকার মন্দিরের 'টেরাকোটা' কারুকার্য খুবই প্রশংসনীয়। এই মঠবাড়ি এলাকায় মোট চারটি মন্দির বর্তমান মহাপ্রভুর 'জোড়বাংলা', বৃন্দাবনচন্দ্রের 'আটচালা', কৃষ্ণচন্দ্রের 'আটচালা' ও রামচন্দ্রের 'একরত্ন'। এই ঠাকুরবাড়ির চারপাশ

ইঁটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কৃষ্ণচন্দ্র ও বৃন্দাবনচন্দ্রের 'আটচালা' দু'টি খুবই বড়ো এবং বাংলার 'আটচালা' শৈলীর আকর্ষণীয় স্থাপত্যনিদর্শন।

মহাপ্রভুর 'জোড়বাংলা' মন্দির এই রীতির মন্দিরের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে কেউ কেউ মনে করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন কোন লিপিফলক এতে নেই। তবে ইঁটের পাতলাগড়ন ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের শেষ ও সতের শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। 'জোড়বাংলা'য় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও নিত্যানন্দের কাঠের বিগ্রহ অধিষ্ঠিত। বর্তমানে মন্দিরটিকে পশ্চিমমুখী করা হয়েছে, কিন্তু জানা যায় প্রথমে এটি পূর্বমুখী ছিল। পূর্বদিকে খিলানপ্রবেশপথ ও 'ইমারতি' থাম এবং বারান্দা আছে। প্রথম 'একবাংলা'টিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খিলান প্রবেশপথের ওপরে পোড়ামাটির কয়েকটি পদ্মফুল শেষমধ্যযুগের গোড়ার দিকের টেরাকোটাশিল্পের নিদর্শন। পোড়ামাটির ফুল ছাড়া ঝুলন্ত দীপদানও আছে। কিন্তু কোন মূর্তি ভাস্কর্য নেই। জানা যায়, এটি প্রথমে বৃন্দাবনচন্দ্রেরই মন্দির ছিল। অনেক পরে ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির তৈরি হ'লে মহাপ্রভুর মূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি মন্দিরেরই ভিত্তিবেদি উচ্চ। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। প্রতিটি মন্দিরের সঙ্গে সাঁকোর মতো সংযোগ করা আছে।

বৃন্দাবনচন্দ্রের 'আটচালা'রীতির মন্দিরটি বিশাল। এই মন্দিরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এর গর্ভগৃহ ও ঢাকা বারান্দার দেওয়ালে রয়েছে সুন্দর 'ফ্রেসকো পেন্টিং'। বিষয়বস্তু পৌরাণিক কাহিনী। গর্ভগৃহের বাম ও ডানদিকে ক্ষুদ্র কক্ষ এবং ঢাকা বারাদার বাম ও ডানদিকেও ঐ একই ধরনের কক্ষ। গর্ভগৃহে বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাধিকা এবং পেছনের উচ্চ বেদিতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ পূজিত হন। রথযাত্রার সময় এই বিগ্রহদের রথে বসানো হয়। গর্ভগৃহে আটধাতুর মহিষমর্দিনী দুর্গাও পূজিত হন এবং দুর্গাপূজার সময় ধুমধামও হয়। বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরশীর্ষে তিনটি স্তূপিকা বা শিখা (?) এবং প্রতিটিতে ধাতব কলস স্থাপিত। চারদিকে শক্ত লৌহশৃঙ্খল।

রামচন্দ্রের 'একরত্ন'-মন্দিরটি 'টেরাকোটা' কাজের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'রত্ন' আটকোণা। এই মন্দিরের গঠন পূর্বোক্ত অনন্তবাসুদেবের (বাঁশবেড়িয়া) মন্দিরের মতো। সামনের ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের তিনপ্রস্থে প্রচুর 'টেরাকোটা' থাম ও ভিত্তিবেদিসংলগ্ন দেওয়ালেও টেরাকোটা আছে। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালেও প্রচুর টেরাকোটা আছে। পোড়ামাটির অনেক ফুলও আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই ঠাকুরবাড়ির (temple complex) কৃষ্ণচন্দ্রের 'আটচালা'টিও বৃহৎ। কয়েকটি 'টেরাকোটা' ফুল ছাড়া দেওয়ালে অন্য কোন মূর্তি নেই। পুবমুখী এই মন্দিরের ত্রিখিলান প্রবেশপথ। গর্ভগৃহে কৃষ্ণচন্দ্র ও রাধিকা অধিষ্ঠিত।

এই মঠবাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে নবাব সিরাজউদ্দৌলার দেওয়ান ও মন্ত্রী মোহনলালের বাড়ি ছিল। তার আর কোন চিহ্ন নেই। শুধু একটি স্মারকস্তম্ভ বসানো হয়েছে বাঙলা ১৩৫৯ সালে (ইং ১৯৫২)।

হুগলি জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত সুখুড়িয়ায় আনন্দময়ীর পঁচিশচূড়া মন্দিরটি ('পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির)। জেলায় এই রীতির মন্দিরের একক দৃষ্টান্ত। মন্দিরের চারটি তলের দ্বিতলের মোট চারকোণের প্রতি কোণে তিনটি করে বারোটি, ত্রিতলে দুটি ক'রে আটটি ও চতুস্তলে মোট পাঁচটি খাঁজকাটা 'দেউল'রত্ন সন্নিবেশিত। এটিও একটি 'ঠাকুরবাড়ি' ('টেম্পল-কমপ্লেক্স'), যার চারপাশে আগে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। এখনও কিছু অংশে প্রাচীর আছে। 'পঞ্চবিংশতিরত্ন'

মন্দিরটির দু'পাশে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রতি সারিতে যে ছয়টি ক'রে মন্দির আছে, তার প্রতি সারির প্রথম মন্দিরটি 'পঞ্চরত্ন' ও বাকীগুলি 'আটচালা' রীতির। একটি 'পঞ্চরত্নে' গণেশমূর্তি ও বাকীগুলিতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। গণেশ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির সুন্দর কাজ আছে।

আনন্দময়ীর পাঁচিশচূড়া মন্দির উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত হয়। শুধুমাত্র স্থাপত্যের দিক থেকে এটি উল্লেখযোগ্য নয়, এর বাইরের তিনদিকের দেওয়ালের খোপে পোড়ামাটির বহু মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। মূর্তিগুলি স্থূলাকার ও নিম্নমানের হলেও প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের জন্য এগুলি আকর্ষণীয়। মূর্তিগুলির মধ্যে আছে কালী, অষ্টভুজা, সিংহবাহিনী, কৃষ্ণকালী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, শ্রীকৃষ্ণের বকাসুরবধ, মালজপরত কৌপীনধারী মোহান্ত, ফরাসবিলাসী জমিদার, শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রভৃতি। আনন্দময়ী ঠাকুরবাড়ির কাছাকাছি নিস্তারিণী ঠাকুরবাড়িতে নিস্তারিণী কালীর 'নবরত্ন' ও দু'পাশে সাতটি করে চোদ্দটি শিবমন্দির বর্তমান। প্রতিসারির প্রথম ও শেষটি 'পঞ্চরত্ন' এবং বাকীগুলি 'আটচালা'। সবগুলিতেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট' এই ঠাকুরবাড়ির সব মন্দির সংস্কার করে দিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। মূল 'নবরত্ন' মন্দিরে দক্ষিণাকালী পূজিতা হন। এই মন্দিরগুলির কোথাও কোন 'টেরাকোটা' নেই। এখানের হরসুন্দরী ঠাকুরবাড়ির চারপাশ জঙ্গলাকীর্ণ। হরসুন্দরীর মন্দির 'নবরত্ন'-রীতির।

হুগলি জেলার দাদপুর থানার সিনেটের পুরানো নাম সানিহাটী। এখন সিনেট নামেই পরিচিত। এখানে বিশালাক্ষীর 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি সুপরিচিত। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ইঁটের এই মন্দিরেব কয়েকটি টেরাকোটা মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে রাসমণ্ডলচক্র, পোড়ামাটির ছোট ছোট ফুল, সামাজিক দৃশ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্যে। বিশালাক্ষীর মূর্তি একটু অদ্ভুত ধরনের। মূর্তির বামহাতে পানপাত্র, ডানহাতে খাঁড়া, গলায় মুণ্ডমালা। শিব দেবীর পদতলে শয়ান। দেবীর ডান পা শিবের ওপর সংন্যস্ত এবং বাম পা একটি অসুরের খণ্ডিত মস্তকের ওপর স্থাপিত। এছাড়া এই মন্দিরে আরও বহু মূর্তি আছে। দেবীর মুখে উর্ধ্ব দন্তপংক্তি বিকশিত, স্মিতহাস্যযুক্ত। বিশালাক্ষীর জন্মতিথি জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তির দিনে বিরাট উৎসব ও ভোগ হয়। মন্দিরের সামনে পোড়ামাটির সাত সারি লিপি থাকলেও রং লেপনে তা অস্পষ্ট। শুধু প্রতিষ্ঠাকালটি পড়া যায়।

এই জেলার মন্দির ও তীর্থস্থান নিয়ে আলোচনা করতে গেলে গোস্বামী-মালীপাড়ার কথা অবশ্যই বলতে হয়। এই স্থান দাদপুর থানার অন্তর্গত। এটি একটি বৈষ্ণবতীর্থস্থান। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীপাদ খঞ্জ ভগবান আচার্য এবং তাঁর পুত্র রঘুনাথ আচার্য এবং তাঁর পুত্র ভাগবতানন্দ গোস্বামী এই গ্রামে রাধামাধব, মদনগোপাল, রাধাবল্লভ, বৃদ্ধামাতা দক্ষিণাকালী এবং রাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথ আচার্য দক্ষিণাকালী বুড়ী মাতা এং বংশীবদন শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করেন। গোস্বামী-মালীপাড়ায় তিনটি ঠাকুরবাড়ী আছে মদনগোপাল, রাধাকান্ত ও কেশবরায়ের ঠাকুরবাড়ী। মদনগোপাল ও রাধাকান্তের মন্দির দুটি 'আটচালা' রীতির। মন্দিরদুটির পুবদিকে প্রশস্ত নাটমন্দির এবং চারপাশে দ্বিতল 'চকমিলান' বারান্দা। রাধাকান্ত ঠাকুরবাড়ি শ্রীপাদখঞ্জ ভগবান আচার্যের পৌত্র ভাগবতানন্দ গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

মদনগোপালজীউর প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে রামনবমীর পর একাদশী তিথি থেকে সাতদিন মহোৎসব হয়। কীর্তন, ভোগ, রামায়ণগান প্রভৃতি সমারোহ সহকারে হয়। দুপুরে প্রতিদিন অন্নভোগ হয়। অতি সাধারণ ব্যঞ্জনের সঙ্গে 'মুগটেঁড়ি' নামে একরকম ব্যঞ্জন দেওয়া হয়। এটি হল, মুগকলাই

সেদ্ধ তার সঙ্গে আলু বা কচু দিয়ে তড়কার মতো। রাধাকান্ত ঠাকুরবাড়ির পুবদিকে বাইরে রাসমঞ্চটি একচূড়া। পুরানো রাসমঞ্চ ধ্বংসপ্রাপ্ত। রাসমঞ্চটির পশ্চিমে দোলমঞ্চ। রাসের সময়ও উৎসব হয়।

গোসাঁই মালীপাড়া গ্রামের কেন্দ্রস্থলে এই ঠাকুরবাড়িগুলি অবস্থিত। বহু প্রাচীন ভগ্ন ইমারত ঠাকুরবাড়ির আশপাশে ছড়িয়ে আছে। ছোট ছোট ইঁটের প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ অনেকগুলি দেখা যায়। সেগুলি গাছ-গাছালিতে ভরা ও বিধ্বস্ত। কেশবরায়ের ঠাকুরবাড়িতে বল্লভীবল্লভ বিগ্রহ অপহৃত হয়েছেন। কেশবরায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন স্বয়ং রঘুনাথ আচার্য শ্রীপাদখঞ্জ ভগবান আচার্যের পুত্র। শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীপাদখঞ্জ ভগবান আচার্য ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই গ্রামে বসতি করেন।

হুগলি জেলার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ স্থান কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানরূপে পরিচিত হলেও এখানে কয়েকটি পুরানো মন্দির বর্তমান। এগুলির কোন কোনটির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত। মন্দিরগুলি সবই ইঁটের তৈরি। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভিটার কাছেই যুগীদের প্রসিদ্ধ 'আটচালা'রীতির শিবমন্দির। এখানে তাঁর মাতা চন্দ্রমণিদেবীর দিব্যদর্শন হয়। এই গ্রামের কামারপুকুরের (যার নামে গ্রামের নাম কামারপুকুর) পাড়ে শিবের একটি ভগ্ন 'চাঁদনি' মন্দির উল্লেখযোগ্য। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যোন্মাদ অবস্থার ভবিষ্যৎ-বাণী হয়। মন্দিরটির পেছনেই প্রসিদ্ধ কামারপুকুর। লাহাবাবুদের প্রসিদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা। এই আটচালায় বালক গদাধর পাঠশালায় পড়তেন। এই চণ্ডীমণ্ডপের পেছনে দামোদরজীউর 'চাঁদনি' মন্দির। দুপাশে ও ওপরে খোপে খোপে টেরাকোটা আছে। পাইন বাড়ির সামনে শিবের পরিত্যক্ত ও ভগ্নজীর্ণ 'পঞ্চরত্ন' (অবশ্য এর চারটি চুড়ো বহুকাল বিধ্বস্ত)। মন্দিরটির সামনের এক প্রস্থে কয়েকটি 'টেরাকোটা' মূর্তির মধ্যে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের সংকীর্তন দৃশ্য আকর্ষণীয়। এই মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরে শিবরাত্রির দিন বালক গদাধর শিবের পালায় অভিনয় ক'রে ভাবসমাধি লাভ করেন।

স্থাপত্য ও টেরাকোটার কাজের জন্য হুগলি জেলার আঁটপুরের মন্দিরগুলি প্রসিদ্ধ। আঁটপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী আনারবাটি তীর্থস্থানও বটে। প্রথমে মন্দির প্রসঙ্গের আলোচনায় মিত্রদের রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' ও তৎসংলগ্ন 'দোচালা' জগমোহনযুক্ত মন্দির উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের আকার বিশাল। 'দোচালা জগমোহন'যুক্ত আটচালা-স্থাপত্য পশ্চিমবাংলায় বিরল। এই মন্দিরটি 'টেরাকোটা'র ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য। সামনে পোড়ামাটির কয়েক সারি লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের তিনটি প্রস্থে কার্নিশের নীচে এবং দেওয়ালের দু'পাশে বামে ও ডাইনে ছোট ছোট খোপে অজস্র টেরাকোটামূর্তি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া মন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালেও বহু টেরাকোটামূর্তি স্থাপিত। ভিত্তিবেদির ঠিক ওপরের প্যানেলগুলিতে সামাজিক দৃশ্যও আছে। এখানকার টেরাকোটাগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু অভিনবত্ব আছে। এর মধ্যে একটি বহুবাহু কালীমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাধাগোবিন্দের এই 'আটচালা' মন্দির প্রতিষ্ঠারও কয়েক বছর আগে রামেশ্বরের বৃহৎ 'আটচালা' মন্দির ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সীতারাম মিত্র। এই মন্দিরেরও সামনের দেওয়ালে প্রচুর টেরাকোটা মূর্তি আছে। ওপরে কার্নিশের নিচে পোড়ামাটির লিপি কিছুটা অস্পষ্ট। মিত্রদের প্রতিষ্ঠিত আরও দু'টি 'আটচালা' মন্দির আছে বড়পুকুরঘাটের দু'পাশে ফুলেশ্বর ও জলেশ্বর শিবের। বিখ্যাত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র বছর মন্দিরদুটি তৈরি হয়। এই মন্দিরগুলির মধ্যে পূর্বোক্ত

রাধাগোবিন্দ মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরের 'দোচালা' জগমোহনের ভেতরের ছাদে খয়েরী রঙের 'পঙ্কে'র ওপর সাদারঙের ফুল-লতাপাতার নকশাচিত্র উৎকৃষ্ট দেওয়ালচিত্রের পরিচায়ক। বর্তমান লেখকের পরিদর্শনকালেও (৪, নভেম্বর, ১৯৮৩) রঙের এতটুকু মালিন্য ঘটেনি। এই 'দোচালা'র ভেতরের দেওয়ালে ফুল-লতাপাতার 'টেরাকোটা'-ফলকগুলিও সুন্দর। সর্বোপরি রাধাগোবিন্দের এই মন্দিরের টেরাকোটা ফলকে সামাজিক দৃশ্যচিত্র নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আঁটপুরের এই মন্দির সেকারণে পশ্চিমবাঙলার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবালয়।

অপর একটি অনন্য শিল্পকর্মের জন্য যে আঁটপুরের প্রসিদ্ধি, তা হল, কাঠের একটি 'দোচালা' চণ্ডীমণ্ডপ ও তার অপূর্ব কারুকার্য। কিন্তু বর্তমানে এসবই ধ্বংসোন্মুখ। সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই নেই। এই বিখ্যাত চণ্ডীমণ্ডপটির চাল খড়ের। জানা যায়, এটি কন্দর্প মিত্র ১০৯০ সাল বা ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করান। চণ্ডীমণ্ডপটির সামনের থামগুলিতে কারুকার্য অতি সুন্দর। ওপরে কিছু কিছু মূর্তি আছে, যেমন, দশভুজা মহিষমর্দিনী, দশভুজা সিংহবাহিনী, ষষ্ঠীদেবী ইত্যাদি। অতি সূক্ষ্ম নকশা কাজও আছে। বাঁকানো কার্নিশের সূক্ষ্ম খোদাই কাজ প্রশংসনীয়। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে একটি নাটমন্দির প্রায় বছর ষাটেক আগের তৈরি ('৯৯)। আগে এখানেও কাঠের কারুকার্যযুক্ত 'আটচালা' ছিল। কোন সময় প্রবল ঝড়ে পড়ে যায়।

রাধাগোবিন্দের মন্দির এলাকার বাইরে বৃহৎ বকুলগাছের কাছে এক স্থানে একটি মার্বেলফলকে লেখা আছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কামারপুকুর যাওয়ার পথে মিত্রদের বাড়িতে (বর্তমানে বাড়িটি প্রায় নিশ্চিহ্ন) কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছিলেম। তখন তিনি 'গদাধর', ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ। এই বকুলগাছটির কাছে গঙ্গাধর শিবের একটি 'আটচালা' মন্দিরও বর্তমান। এখান থেকে কিছু দূরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম ঘোষ) জন্মস্থান। এখানে একটি মন্দির বেশ কয়েক বছর আগে করা হয়েছে। এরই অল্পদূরে যেখানে নরেন প্রভৃতি (স্বামী বিবেকানন্দ) নয়জন রামকৃষ্ণ-ভক্ত ১৮৮৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর একটি ধুনি জ্বালিয়ে সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করেন, সেই স্থানটিতে মন্দির তৈরি করা হয়েছে। দেওয়ালে প্লাস্টার অভ প্যারিসে 'বাস-রিলিফে' খোদিত নয়জন ভক্তমণ্ডলীর মূর্তি এবং চারপাশে রামকৃষ্ণলীলার টেরাকোটা ফলক সন্নিবেশিত। ধুনি জ্বালাবার স্থানটি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। এরই পাশে ঘোষেদের বৃহৎ দালান ও দুর্গামণ্ডপ। বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ) এখানে তাঁর মামাবাড়িতে ভূমিষ্ঠ হন। এখানে শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য রামকৃষ্ণশিষ্য কয়েকবার এসেছিলেন। আঁটপুরে পাকা রাস্তার ধারে সারদা-প্রেমানন্দ আশ্রম আছে। রাধাগোবিন্দের দোল ও রাসমঞ্চও এখানে দেখা যায়। দোলমঞ্চের পাশে সুন্দর কারুকার্যযুক্ত শিবের আর একটি 'আটচালা' মন্দিরও বর্তমান।

আঁটপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম আনারবাটীতে একটি বৈষ্ণব শ্রীপাট বর্তমান। এটি দ্বাদশ শ্রীপাটের অন্যতম একটি বৈষ্ণব-শ্রীপাট। চৈতন্যপার্ষদ পরমেশ্বর দাস শ্যামসুন্দর বিগ্রহ (গোপীনাথজীউ) ও শ্রীমতীকে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। জানা যায়, বিগ্রহটি প্রভুনিত্যানন্দসেবিত। বিগ্রহ বর্তমানে একটি 'দালান'-মন্দিরে নিত্য সেবিত হন। এখানে কালীপূজার পরদিন অন্নকূট উৎসব হয়। 'দালান'-মন্দিরটি আনুমানিক একশ ষাট বছর আগে নির্মিত। সামনে নাটমন্দির। মন্দিরের পেছনে পশ্চিমদিকে একটি বড়ো পুকুর। পরমেশ্বর দাস গোস্বামী এখানে স্নানাদি করতেন। শোনা যায়, একদিন স্নান করতে করতে তিনি একটি অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তি পান। তিনি সেটি বার বার জলে নিক্ষেপ করলেও সেটি তাঁর জটায় জড়িয়ে উঠে আসে। অগত্যা তিনি সেটি নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তিটি

এখন নেই। মন্দিরপ্রবেশমুখে একটি প্রাচীন বকুলগাছ দেখা যায়। গাছটির ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না। জানা যায়, পরমেশ্বর দাসের সমাধির ওপর গাছটি হয়েছে। এরূপ একটি বৈষ্ণব শ্রীপাট এখন খুবই অবহেলিত।

এই গ্রামের একটি স্থানে (আগে এই স্থান ভয়ঙ্কর শ্মশান ছিল) কালীপূজার আগের দিন রাতে শ্মশানকালীর খুব ধুমধাম করে পুজো হয়। ঐ রাতেই প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। ঐ সময় প্রচুর লোকসমাগম হয়। এইগ্রামে আরও দুএকটি স্থানে ঐ রাতে কালীপুজো হয়। গ্রামটি পূর্বে সমৃদ্ধশালী ছিল। এই গ্রাম ও আঁটপুর আগে 'বিশখালি' নামে পরিচিত ছিল।

আঁটপুরের পর রাজবলহাটও মন্দিরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রসিদ্ধ দেবী রাজবল্লভীর একটি 'দালান' মন্দির আছে। এই মন্দিরে রাজবল্লভী মূর্তির পাশে আনুমানিক পাল-সেনযুগে নির্মিত একটি বিষ্ণুমূর্তিও আছে। মন্দিরটির চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত। এই ঠাকুরবাড়ি চত্বরে শিবের তিনটি 'আটচালা' রীতির মন্দির বর্তমান। একটি মন্দির অবশ্য আটকোণা। রাজবল্লভী দেবীর মন্দিরের সামনে একটি নাটমন্দির। রাজবল্লভী দেবীর মাটির মূর্তি। মূর্তি দ্বিভুজা দণ্ডায়মানা। বাঁ পা উপবিষ্ট মহাদেবের মস্তকে স্থাপিত এবং ডান পা শয়ান কালভৈরবের মস্তকে ন্যস্ত। দেবীর মুখমণ্ডল প্রসন্ন। বাঁ হাতের তালুতে একটি পানপাত্র এবং ডান হাতে একটি খড়্গ। দুর্গাপূজার সময় ধুমধাম করে দেবীর পুজো হয়। মন্দিরের কিছু দূরে রাজবল্লভী মাতার বিরাট দীঘি। নাম 'রাজবল্লভী দীঘি'। কথিত আছে, ভুরশুটবংশীয় রাজা সদানন্দ দেবীমূর্তি ও দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজবলহাট শহরের উত্তরপাড়ায় ঘটকদের রাধাকান্ত মন্দিরটি 'আটচালা'-রীতির। মন্দিরটি বৃহদাকৃতি ও প্রচুর 'টেরাকোটা' যুক্ত। মন্দিরের সামনে উৎকৃষ্টমানের পোড়ামাটি মূর্তির সমারোহ, যেমন, রাম-রাবণের যুদ্ধ, নীচে সামাজিক দৃশ্য। মন্দিরটি বেশ পুরানো। প্রতিষ্ঠাকালীন লিপি থেকে জানা যায়, এটি ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। টেরাকোটা মূর্তি ছাড়া পোড়ামাটির অনেক ফুলও এই মন্দিরে আছে। শীলপাড়ায় দামোদরের 'আটচালা' মন্দিরেও অনেক পোড়ামাটির মূর্তি আছে। রাধাকান্ত ও এই মন্দিরটির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সাদৃশ্য বর্তমান। মনে হয় দুটিই একই মিস্ত্রীর হাতে তৈরি। মন্দিরটি ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

হুগলি জেলার উত্তর চন্দননগরের (যা 'ব্রিটিশ চন্দননগর' নামে পরিচিত) 'মন্দিরতলা'য় (পূর্বতন বকুলতলা) চন্দ্রশেখরের একটি 'নবরত্ন' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। স্থানীয় কারও কারও মতে ১১৭০ থেকে ১১৭৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে (১৭৬৩-১৭৬৮ খ্রিঃ) এটি নির্মিত হয়। মন্দিরটির পুব ও উত্তর দিকের দেওয়ালে প্রচুর টেরাকোটা আছে। বিষয়— রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী, সামাজিক চিত্র, যেমন, ঝাম্পানে বাহকের স্কন্ধে রাজা বা জমিদারের গমন, মিথুনদৃশ্য, প্রবেশখিলানের ওপরে প্রতিকৃতি দেউলে শিবলিঙ্গ মূর্তি, পদ্মফুল, ফুল লতাপাতার নকশা। মন্দিরটির চারকোণে লম্বায়মান টেরাকোটা ছিল। লেখকের পরিদর্শনকালে (১৪ অক্টোবর, ১৯৭৭) দুপাশের অনেকগুলি টেরাকোটা নষ্ট হয়ে গেছে দেখা গিয়েছিল। মন্দিরটির ভিত্তিবেদি মাটিতে অনেকটা বসে গেছে। উত্তরদিকে প্রবেশদ্বারের নিচে বর্তমানে দু'টি অর্ধচন্দ্রাকৃতি সিঁড়ি আছে। জানা যায়, এতে মোট বাইশটি সিঁড়ি ছিল। তাহলে ভিত্তিবেদি কতটা উঁচু ছিল, এটা সহজেই অনুমেয়। এখান থেকে গঙ্গা খুবই কাছে। এই স্থানটির বর্তমান নাম 'মন্দিরতলা'। 'বুড়ো শিবতলা' এর কিছুটা দক্ষিণে। ডেভিড ম্যাককাচ্চন তাঁর 'লেট্ মিডিভ্যান টেম্পলস অভ বেঙ্গল' গ্রন্থে 'মন্দিরতলা'র চন্দ্রশেখরের এই মন্দিরটিকে যে

বুড়ো শিবের মন্দির বলে অনুমান করেছেন, তা ঠিক নয় (দ্রষ্টব্য, ম্যাককাচ্চন, পৃ. ৫৩)। প্রকৃতপক্ষে, বুড়ো শিবের যে মন্দির আছে, তা অতি সাধারণ ঘরের মতো, বেশি দিন আগের নয়। 'মন্দিরতলা'র চন্দ্রশেখর মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা চন্দননগরের সেকালের প্রতাপশালী জমিদার কালাচাঁদ ঘোষের বলে জানা যায়। মন্দিরতলায় কালাচাঁদ ঘোষের বিশাল দুর্গাদালান লক্ষ্য করা যায়। কালাচাঁদ ঘোষের ভাঙা 'সাতমহল' অট্টালিকা এবং তার ভেতরে বিশাল 'দুর্গাদালান' এককালে খুবই দর্শনীয় ছিল। বর্তমান লেখকের পরিদর্শনকালে 'দুর্গাদালানে'র ছাদ ভেঙে পড়েছে লক্ষ্য করা গিয়েছিল (পরিদর্শনের তারিখ ২৩ জুলাই, ১৯৭৫)। দুর্গাদালানে 'পঙ্কের কাজ' প্রচুর ছিল। কিছু কিছু নমুনা, রঙিন ফুল লতা পাতার নকশা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

চন্দননগরে গোসাঁইঘাটের 'নবরত্ন' ও পার্শ্ববর্তী চারটি 'আটচালা' রীতির মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি 'কনে বউ-এর মন্দির' নামে পরিচিত। জনশ্রুতি, স্থানীয় ধনী সরকারদের জনৈকা বধূর কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় তিনি এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর নাম গৌরমণি দাসী। 'নবরত্ন'টির উত্তরদিকে তিনটি শিবমন্দিরের পুবদিকের দেওয়ালে গঙ্গার দিকে লিপি আছে। তা থেকে এই প্রতিষ্ঠাকাল (১৭৪৩ শকাব্দ ১৮২১ খ্রি.) জানা যায়। যদিও হুগলি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এগুলিকে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঠিক নয়। 'নবরত্ন'টির দক্ষিণপাশে শিবের আর একটি 'আটচালা' আছে। মাঝখানে বৃহৎ 'নবরত্নে'র একতলায় 'প্রবর্তক সংঘ' কর্তৃক শিবলিঙ্গ পূজিত হন। 'প্রবর্তক সংঘ' পুরানো মন্দিরটির সংস্কার করেছেন বলে জানা যায়। এই মন্দিরের সব চূড়াগুলিই ('রত্ন') খাঁজকাটা এবং প্রথাগতশৈলী অপেক্ষা এতে প্রাসাদের ভাবটাই বেশি প্রকটিত। কার্নিশ সোজা, আদৌ বাঁকানো নয় এবং দ্বিতল ও ত্রিতল বেশ প্রশস্ত। দ্বিতলে বারান্দা আছে। পোড়ামাটির কোন মূর্তি বা নকশার কোন কাজ এখানে নেই।

কাছাকাছি 'বড়াইচণ্ডীতলা'য় বড়াইচণ্ডীর 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি আনুমানিক উনিশ শতকে তৈবি হয়। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বড়াইচণ্ডী। অষ্টধাতুর চণ্ডীমূর্তি এই মন্দিরে অধিষ্ঠিতা আছেন। জানা যায়, মূর্তিটি খুব প্রাচীন। শ্রীমন্ত সদাগর এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন, এইরূপ জনশ্রুতি। সামনে একটি নাটমন্দির ও নহবৎখানা।

চন্দননগরের 'লালবাগান' অঞ্চলে নন্দদুলালের আয়তক্ষেত্রাকার গর্ভগৃহ ও তৎসংলগ্ন উচ্চ 'দোচালা' মণ্ডপ বা 'জগমোহন' এক নতুন স্থাপত্যকীর্তি। চন্দননগরে এটি একটি খুবই প্রসিদ্ধ মন্দির। চন্দননগরের তদানীন্তন ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১১৪৬) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। পোড়ামাটিতে খোদিত একটি লিপি থেকে এই প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায়। মন্দিরটির সামনে ও পশ্চিমদিকের দেওয়ালে পোড়ামাটির কয়েকটি ছোট ছোট ফুল ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। 'একবাংলা'টির (দোচালা) উচ্চতা মূল গর্ভগৃহের চেয়ে বেশি, এমনকি, ভেতরের জায়গাও গর্ভগৃহের চেয়ে বেশ প্রশস্ত। গর্ভগৃহে কোন দেববিগ্রহ নেই, তবে পূর্বতন বিগ্রহের একটি ছবি প্রত্যহ পূজিত হন। ছবিটি বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের। কষ্টিপাথরে নির্মিত আসল মূর্তিটির পায়ের ভগ্ন অংশ চন্দননগরের 'ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট'-এ রক্ষিত আছে। এই মন্দিরের কষ্টিপাথরে নির্মিত মূর্তিটি সম্ভবতঃ বর্গীর হাঙ্গামায় ভগ্ন হয়। পরে তার কি অবস্থা হয় জানা যায় না। অনুমান করা যায়, এরপর নিশ্চয়ই কোন বিগ্রহ স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তা কি করে অন্তর্হিত হল জানা যায় না। গর্ভগৃহের ঠিক উত্তরে একটা পুকুর। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অট্টালিকা সম্ভবত মন্দিরটির অল্প দূরে উত্তরদিকে ছিল। এখনও তার কিছু কিছু অংশ চোখে পড়ে (লেখকের

পরিক্রমাকাল ১৩ নভেম্বর, ১৯৭৫)। চন্দননগরে আরও কয়েকটি 'আটচালা' রীতির মন্দির আছে। 'বড়াইচণ্ডীতলা' পেরিয়ে আরও কিছুদূর গিয়ে রাস্তার ঠিক গায়ে আঃ ১৮২৪ বা ১৮৫৪ (বাংলা ১২৩১ বা ১২৬১) সালে নির্মিত শিবের একটি 'আটচালা' উল্লেখযোগ্য। 'বোড়াইচণ্ডীতলা'য় সংক্রান্তিতে 'পাটভাঙা উৎসব' ও গোসাঁইঘাটে অগ্রহায়ণ মাসে 'শ্রীখুন্তির উৎসব' প্রসিদ্ধ।

হুগলি জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান বৈঁচিগ্রাম। ইঁটের কয়েকটি সুন্দর টেরাকোটাযুক্ত পুরানো মন্দির এখানে লক্ষ্য করা যায়। এখানের সর্বাপেক্ষা পুরানো মন্দির ছিল গোপালজীউর দেউল। বর্তমান লেখক তাঁর পরিক্রমাকালে মন্দিরটি লক্ষ্য করেছিলেন (পরিক্রমাকাল ১৭ নভেম্বর, ১৯৭৫)। বর্তমানে সেটি লুপ্ত বলে জানা গেছে। মন্দিরটির দেওয়ালে বহু পূর্বে যে লিপিফলক ছিল, তা থেকে জানা যায়, সেটি ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি ছিল 'সপ্তরথ' সমান্তরাল খাঁজকাটা 'দেউল'। প্রায় এ ধরনের নিদর্শন আমরা পাই মাহেশের জগন্নাথ ও শ্রীরামপুরের চৌধুরীপাড়ার গৌরাঙ্গের মন্দিরে। মন্দিরটি পার্শ্ববর্তী বিহারীলাল বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল। পশ্চিমবাংলায় মধ্যযুগের এরূপ পুরানো মন্দির খুবই বিরল। বিশেষ করে পাতলা ইঁটের ব্যবহার, সংকীর্ণ প্রবেশপথ, ইঁটের কারুকার্যের মধ্যে শুধুমাত্র ফুল-লতাপাতার নকশার (মনুষ্যমূর্তি নেই বললেই চলে) সূক্ষ্মকাজ মধ্যযুগীয় 'টেরাকোটা' শিল্পের আদিপর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বৈঁচিগ্রামের উত্তরপাড়ার 'বড়মাকালীতলা'য় চন্দ্রদের রঘুনাথ জীউর 'আটচালা', চন্দ্রদের বুড়ো শিব ও আরও একটি শিবের 'আটচালা', বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিবের 'আটচালা' এবং 'পাঁচমন্দিরতলা'য় শিবের তিনটি 'আটচালা' মন্দির উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে নকুলেশ্বর শিবমন্দিরের লিপি আ. ১৬১৪ (?) শকাব্দ বা ১৬৯২ খ্রিস্টাব্দ। এখানের বারোয়ারি তলায়ও একটি 'আটচালা' বর্তমান। পুবপাড়ায় সেনেদের শিবের আটচালা ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। বুড়োশিবতলায় বুড়োশিবের মন্দির ১৭২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। 'করপুকুরের' পাড়েও শিবের একটি 'আটচালা' আছে। 'বড়মাকালীতলা'য় যে শিবের তিনটি 'আটচালা' দেখা যায়, তার মধ্যে রঘুনাথের মন্দিরটি খুব ভগ্ন। সামনের দিক পড়ে গেছে, কিন্তু এই অংশে প্রচুর 'টেরাকোটা' ছিল। দেওয়ালের পাশে খোপে খোপে ছোট ছোট সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তি ছিল। একটি ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্তিও লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমমুখী আর একটি পরিত্যক্ত 'আটচালা'য় পোড়ামাটির বহু মূর্তি বর্তমান। এছাড়া, ফুল লতাপাতার নকশাও প্রচুর দেখা যায়। টেরাকোটায় অনেক সামাজিক দৃশ্যও পাওয়া যায়। যেমন, শিকারদৃশ্য, যুদ্ধযাত্রা, মিথুনদৃশ্য প্রভৃতি। রাধাকৃষ্ণের অনেকগুলি মূর্তিও আছে। কোন লিপি না থাকলেও মন্দিরটি আঠার শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত অনুমান করা যায়। পূর্বোক্ত সব মন্দিরই সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা মূর্তি সজ্জিত। মূর্তিগুলির টালির চারপাশ নকশা করা। প্রায় সবগুলিই আঠার শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। 'পাঁচমন্দিরতলা'য় নকুলেশ্বরের 'আটচালা'য় দুটি 'রাসমণ্ডলচক্র' লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটি আঠার শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত।

বৈঁচিগ্রাম সেকালে খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানের ধনী বণিকসম্প্রদায় এই সুন্দর 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা। এঁদের পদবি ছিল দাঁ, কর, চন্দ্র। এখানের মুখোপাধ্যায় জমিদার উনিশ শতকের দিকে খুবই প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। দাঁয়েদের অভয়াদুর্গার পূজা খুবই সমারোহের সঙ্গে হয়। গ্রামটি সেকালে বেশ জনবসতিপূর্ণ ছিল। বেশ চওড়া চওড়া রাস্তা এখনও বর্তমান।

হুগলি জেলার সাহাগঞ্জে 'খামার-পাড়া খেয়াঘাট' আশ্রমের মধ্যে গঙ্গাতীরবর্তী পূর্বকথিত

একটি পরিত্যক্ত 'আটচালা' মন্দির প্রাচীনত্ব ও টেরাকোটা কাজের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান লেখকের পরিক্রমাকালে দৃষ্ট এই মন্দিরের একটি সংস্কৃতলিপি থেকে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দ জানা যায় (লেখকের পরিদর্শন সময় ১৮, নভেম্বর, ১৯৭৫)। মন্দিরস্থাপত্যে প্রাচীনত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। সামনের দিকে একটিমাত্র প্রবেশপথ, দুপাশে দুটি ছোট্ট থাম। সামনের নিচ থেকে ওপরে কার্নিশের নিম্নভাগ পর্যন্ত পোড়ামাটির প্রচুর মূর্তি ও ফুলকারি নকশা। খিলানের ওপরে একটিমাত্র প্রস্থে টেরাকোটার মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য, রামের পেছনে বানরসেনা, লক্ষ্মণ তীরধনুহাতে আক্রমণোদ্যত, বানর ও রাক্ষসদের যুদ্ধ, রাম-রাবণের মাঝে মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা। এখানকার 'টেরাকোটা' টালির চারপাশে নকাশি কাজ। টালিগুলি মন্দির দেওয়ালের খোপে খোপে ন্যস্ত। মূর্তিগুলির মধ্যে দশাবতার প্রভৃতি মূর্তি সন্নিবেশিত। কিছু কিছু সামাজিক দৃশ্যও আছে, যেমন, অপরাধীকে শূলে চড়িয়ে হত্যা, নদীবক্ষে নৌকা দৃশ্য। এই মন্দিরের দেওয়ালে পোড়ামাটির কয়েকটি প্রতীক 'আটচালা' মন্দিরে শিবলিঙ্গ। দুটি রাসমণ্ডলচক্রও আছে। টেরাকোটা মূর্তিগুলিতে সূক্ষ্ম কারুকার্য লক্ষণীয়। মন্দিরটির পার্শ্ববর্তী একটি আটকোণা রাসমঞ্চ আছে।

খামারপাড়ায় শিবের 'নবরত্ন' মন্দিরে পোড়ামাটির বহু মূর্তি এবং ফুল গাছ ও লতাপাতার বহু নকশা লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটির একটিমাত্র প্রবেশপথের দুপাশে দুটি ছোট্ট থাম। খিলানের ওপরের প্রস্থে ফুলের নকশাই বেশি। তবে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্যও আছে। কার্নিশের নিচে টেরাকোটা মূর্তির প্যানেলগুলি খোপে খোপে সন্নিবেশিত। এতে দেব-দেবীর মূর্তি আছে। নিচের প্যানেলগুলিতে সামাজিক দৃশ্যও কিছু কিছু আছে, যেমন, ঝাম্পানে জমিদারের গমন ইত্যাদি। তবে অনেক মূর্তিই নষ্ট হয়ে গেছে। এই মন্দিরের পাশে শিবের একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির বর্তমান। মন্দিরটির দু'দিকেই পোড়ামাটির কাজ। লতা বা ফুলগাছ, পোড়ামাটির ফুল, ছোট ছোট দেব-দেবীমূর্তি এই মন্দিরে আছে। নিচের মূর্তিগুলি বেশির ভাগই ক্ষয়ে গেছে। পোড়ামাটির ছোট ছোট মূর্তির মধ্যে রেখার সুন্দর বিন্যাস, নকশাগুলির সূক্ষ্মতা, মূর্তিগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রকাশ লক্ষ্য করে এটিকে খ্রি. আঠার শতকে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা যায়।

হুগলি জেলায় পূর্বোক্তগুলি ছাড়া আরও অজস্র মন্দির গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে আছে। মন্দিরবহুল ও একটি প্রাচীন স্থান হিসেবে মহানাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি পোলবা থানার অন্তর্গত। মহানাদে প্রাচীনকালে বিপুল জনবসতিপূর্ণ একটি সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। এখানে বেশ চওড়া ইঁটের দেওয়ালযুক্ত এক ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌধ গুপ্তযুগের বলে অনুমান। এছাড়া এখান থেকে বহু প্রাচীন মূর্তি, প্রাচীন হাঁড়ি-কুড়ির ভগ্নাবশেষ এবং গুপ্তযুগের সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় মহানাদের বহু পুরাবস্তু রক্ষিত আছে। মহানাদের মন্দিরগুলি অবশ্য তেমন প্রাচীন নয়। এখানে 'নাথ' ধর্মের একসময় বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু জটেশ্বরনাথের মন্দিরটি তেমন প্রাচীন নয়। মন্দির কতকটা 'দেউল' আকারের। আনুমানিক খ্রি. আঠার শতকের দিকে নির্মিত। 'কর'-পাড়ায় ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' মন্দিরটি ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এখানে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। এই পাড়ায় লালজীউর মন্দিরটি 'একরত্ন' রীতির হলেও চূড়াটি গির্জার আকারের। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। দক্ষিণপাড়ায় ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির 'নবরত্ন'-রীতির। কিন্তু এখানে দালানের ওপর 'রত্ন' বা চূড়াগুলি বড়ই বেমানান। মন্দিরে ব্রহ্মময়ী কালিকাদেবী, চারকোণে চারটি শিবলিঙ্গ এবং তিনতলার বৃহৎ চূড়ায় হংসেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

প্রাক-মুসলিম যুগে নির্মিত হুগলি জেলায় কয়েকটি প্রাচীন মন্দির ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া

যায়। সেগুলি এই অঞ্চলে মুসলমান শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধ্বংস করে ফেলা হয়। প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দিয়ে মসজিদ মাজার নির্মাণ ও অলংকৃত করা হয়। ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর সমাধিস্থানে যে বিষ্ণুমন্দির ছিল, সেটি ভেঙে ফেলে তার ওপর ঐ কবর তৈরি হয় এবং মন্দিরের গায়ে যেসব প্রস্তরফলকে নানা দেবদেবীর মূর্তি ছিল, সেগুলি কবরের দেওয়ালের নিচের দিকে বসানো হয়। ছোট ছোট প্রস্তরফলকে খোদিত নারায়ণ মূর্তি ঐ কবরের দেওয়ালে লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ফলককে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উলটিয়ে বসানো হয়েছে দেখা যায়। পাণ্ডুয়ায় (হুগলি) নারায়ণ ও সূর্যের দুটি মন্দিরকে যথাক্রমে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হয়। মসজিদটি 'বাইশ-দরওয়াজা মসজিদ' নামে পরিচিত। বর্তমানে বিধ্বস্ত ও ভগ্ন। প্রাচীন সূর্যমন্দিরের বহু কারুকার্যযুক্ত থাম এই ভগ্ন মসজিদে দেখতে পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেসল্টে তৈরি অপূর্ব সূর্যমূর্তির মস্তক ভগ্ন অবস্থায় পার্শ্ববর্তী শাহ সুফীর দরগায় নিতান্ত অবহেলিত অবস্থায় ওল্টানো ক'রে স্থাপিত। পেছনে অনেকখানি আরবী লিপিমালা। এখানের সু-উচ্চ মিনারটি নারায়ণ মন্দিরকে ভেঙে তৈরি করা হয়। প্রাক-বঙ্গাক্ষরে খোদিত কিছু লিপিফলক এই মিনারের নিচের দিকে এখনও দেখা যায় যেগুলি আগে মন্দিরে ছিল। পূর্বোক্ত জাফর খাঁ গাজীর কবরখানায়ও টেরাকোটা ফলকে খোদিত এরূপ লিপি আমরা লক্ষ্য করেছি। যেগুলি মন্দিরের গায়ে ছিল। এগুলিতে টেরাকোটা ফলকের বিবরণী দেওয়া আছে, যেমন- 'সীতাবিবাহঃ', 'রামেণ রাবণবধঃ'। উল্লেখযোগ্য, এইভাবে বিবরণাত্মক-ফলকগুলি প্রাচীন বাংলার মন্দির-দেওয়ালে বসানো হত। মুসলমানদের দ্বারা এই অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর মন্দির ভেঙে সেগুলি দিয়ে যেমন (নানা দেবদেবীর ফলক) কবরের দেওয়াল সাজানো হত, তেমনি বিবরণাত্মক এই ফলকগুলিও থাকত। এইভাবে বহু প্রাচীন মন্দিরগুলি সব ধ্বংস হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'হিস্টরি অভ মেডিঈভ্যাল বেঙ্গল' গ্রন্থে একথা বলেছেন। পশ্চিমবাংলার মধ্যে হুগলি এবং গৌড়-পাণ্ডুয়ায় হিন্দুমন্দির ধ্বংস বেশি ক'রে হয়েছিল।

১২

নদীয়ার মন্দির

মুসলমান রাজত্বকালে দীর্ঘ তিনশ বছর ধরে নদীয়ার প্রাচীন কোন মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দীর্ঘ সময়কে ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা যায়। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য সব কিছুরই অগ্রগতি এ সময়ে প্রায়-রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ষোল শতকের শুরুতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমবন্যায় বাঙালি জাতি আবার নবজীবন লাভ করল। শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটল এই সময়ে। নবদ্বীপ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সমগ্র নদীয়ায় তথা বাংলায় নব বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয় হল। শ্রীচৈতন্যের নব বৈষ্ণবধর্মের ছোঁয়া এ-যুগের সাহিত্য ও শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও এ-সময় এল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। মন্দিরশিল্প ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য অদ্ভুতভাবে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের নানাস্থানে অসংখ্য মন্দির পোড়ামাটি ও পাথরের কারুকার্যশোভিত হয়ে বিরাজ করতে লাগল। চৈতন্যোত্তর যুগের এসব মন্দির বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে, হুগলি ও বর্ধমান জেলায় বহু নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু নদীয়ায় এ-যুগে নির্মিত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মন্দির নেই বললেই চলে। অবশ্য, পালপাড়ার মন্দিরটিকে এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠাকাল- নির্দেশক লিপির অভাবে এটি ঠিক কোন্ সময়ে নির্মিত হয়েছিল, বলা কঠিন। তবে এই মন্দিরের সামনের একাংশে পোড়ামাটির যে ভাস্কর্যগুলি রয়েছে, তাদের কারুকার্য ও গঠনবৈচিত্র্য লক্ষ্য করে মন্দিরটিকে সতেরো শতকের বলে মনে করা যেতে পারে। রামায়ণোক্ত লঙ্কাযুদ্ধ বা রাম-রাবণের যুদ্ধ যা চৈতন্যোত্তর যুগের মন্দিরভাস্কর্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল, পালপাড়ার এই 'চারচালা' মন্দিরে তার নিদর্শন আছে। তবে এ মন্দিরের ইঁটের আকৃতি, বর্ণ ও সর্বোপরি মন্দিরের সামগ্রিক গঠনবিন্যাস লক্ষ্য করে এটি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালের কিছুটা পরবর্তী বলতে হয়। বহু পরবর্তীকালে নির্মিত নদীয়া জেলার অন্যান্য 'চারচালা' মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরটির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। পালপাড়ার এই মন্দিরটিকে যদি চৈতন্যের আবির্ভাবের কিছু পরে বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে নদীয়ায় এসময়ে এইটিই একমাত্র টিকে থাকা ইমারত বলে মনে করা যেতে পারে। এই মন্দিরটিকে বাদ দিয়ে নদীয়ায় আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষোল-সতেরো শতকে নির্মিত কোন প্রাচীন ইমারত আর আছে কিনা সন্দেহ। বর্তমান শহর নবদ্বীপ বা নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে যেসব মন্দির দেখা যায়, সেগুলি পালপাড়ার এই মন্দিরটির তুলনায় যে নতুন, তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তী যুগে (বিশেষ করে ষোল শতকে) বা তৎপূর্বে নির্মিত কোন ইমারত বা সৌধ নদীয়ায় আজ আর অবশিষ্ট নেই। এই জেলায় এ ধরনের ইমারত বা সৌধের আশ্চর্যজনক অনুপস্থিতি পুরাতত্ত্বপ্রেমীদের যে বিস্মিত ও ব্যথিত করবে তাতে সন্দেহ নেই। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা বা অর্থহীনযুক্তির আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেউ কেউ হয়তো ভাগীরথীর সর্বগ্রাসী তরঙ্গমালার কথা উল্লেখ করবেন, যার কবলে প'ড়ে সে-যুগের প্রসিদ্ধ ইমারত বা স্থানগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে, যেমন শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপের ঠিক কোন্ স্থানে, তা আজ কারুর পক্ষে সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। বিখ্যাত বিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থগুলিতেও এ যুগে নির্মিত ইমারত বা সৌধের সুস্পষ্ট কোন উল্লেখও পাওয়া যায় না— যার থেকে এ শতকের পুরাকীর্তিগুলি সম্পর্কে মোটামুটি একটা

ধারণা করা যেতে পারত। নদীয়ার আশপাশের জেলাগুলিতে যেমন, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও হুগলিতে ষোল শতকের শেষের দিকে তৈরি অনেকগুলি মন্দিরে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যেমন সুন্দর নিদর্শন মেলে, এ জেলায় সে ধরনের নিদর্শন প্রায় একটিও নেই বললেই চলে।

নদীয়ার বর্তমান মন্দির-সৌধগুলির (অবশ্য প্রাচীনত্বের দিক থেকে) প্রায় সবই নির্মিত হয়েছিল নদীয়া রাজবংশের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পর থেকে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের কাল থেকে (১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর পৌত্র রাঘবের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত কোন মন্দির বা উল্লেখযোগ্য ইমারতের ধ্বংসাবশেষ তেমন কিছু পাওয়া যায় না। কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত বানপুরের সন্নিহিত মাটিয়ারি গ্রামে ভবানন্দ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত গড় ও অট্টালিকার ক্ষয়িষ্ণু লুপ্তপ্রায় প্রাচীরের অংশ ছাড়া সেখানে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। রাঘবের পুত্র রুদ্ররায়ের প্রতিষ্ঠিত বলে পরিচিত রুদ্রেশ্বর শিবের একটি চারচালা মন্দির গড়ের কিছু দূরে এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু ভবানন্দ- প্রতিষ্ঠিত কোন দেবমন্দিরের অস্তিত্ব আজ আর খুঁজে বের করার কোন উপায় নেই। ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে রাঘবের সিংহাসনলাভের পর থেকে নদীয়ায় মন্দির-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা দেখা যায়। রাঘব স্বয়ং এই যুগের সূচনা করেন কয়েকটি সুন্দর দেবালয় নির্মাণ করে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দিরটি হল দিগনগরের রাঘবেশ্বরের, যার পোড়ামাটির অলঙ্করণ-ভাস্কর্য খুবই উন্নতমানের। সতেরো শতকের শেষের দিক (১৬৬৯ খ্রি. অ.) এই মন্দিরটির নির্মাণকাল। রাঘবের প্রতিষ্ঠিত আরও দু-একটি মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন 'মার্দানা' নামক গ্রামের (যার নাম তিনি 'শ্রীনগর' রেখেছিলেন) একটি মন্দির। এর প্রতিষ্ঠাকালজ্ঞাপক লিপিতে রাঘবের নামের উল্লেখ ছিল।[১] নবদ্বীপেও তিনি গণেশ-মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির তৈরি করতে আরম্ভ করেছিলেন, পরে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পুত্র রুদ্র মন্দিরটি সমাপ্ত করেন।[২] শেষোক্ত দুটি মন্দিরের আজ আর কোনটিরই অস্তিত্ব নেই। শান্তিপুরের মতিগঞ্জ-বেজপাড়ায় সুন্দর কারুকার্যময় ও সুউচ্চ জলেশ্বর মন্দিরটিও রাঘবের প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু প্রমাণযোগ্য কোন লিপির অভাবে ঠিক কার প্রতিষ্ঠিত, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। অবশ্য, জলেশ্বর-মন্দিরের সঙ্গে রাঘব-প্রতিষ্ঠিত দিগনগরের মন্দিরটির এক আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। একমাত্র উচ্চতা ছাড়া গঠন, অলঙ্করণ-বিন্যাস ও সুন্দর সুন্দর নকশা-কাজের সঙ্গে রাঘবেশ্বর মন্দিরের বেশ মিল আছে। তাছাড়া, দিগনগরের রাঘবেশ্বরমন্দির ও মাটিয়ারির (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) রুদ্রেশ্বর মন্দিরও প্রায় একই ধরনের— তবে প্রথমটিতে পোড়ামাটির কাজ অনেক বেশি। রাঘবেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েকবছর আগে শান্তিপুরের কাছাকাছি বাগআঁচড়া (ব্রহ্মশাসন) গ্রামে চাঁদরায় নামে এক ব্যক্তি সুন্দর একটি মন্দির তৈরি করেছিলেন। মন্দির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এটি বাংলা আটচালা শ্রেণীর। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৫৮৭ শকাব্দ বা ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ। মন্দিরটির অদ্ভুত কারুকার্য ও নকশা সেকালের মন্দির-ভাস্কর্যকলার সবিশেষ পরিচয় দেয়। সেটি এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বাগআঁচড়ার বিধ্বস্ত মন্দির ও দিগনগরের বর্তমান রাঘবেশ্বর মন্দিরের পূর্ববর্তী কোন মন্দির নদীয়ায় ছিল কিনা বলা কঠিন। থাকলেও সে সম্পর্কে জানার আজ আর কোন উপায় নেই। তবে এই জেলার কিছু কিছু দুর্গম পল্লীতে ঘুরলে কোন কোন ধ্বংসপ্রায় মন্দির চোখে পড়ে। অবশ্য, প্রমাণযোগ্য কোন লিপির অভাবে এগুলিকে আরও আগে ফেলা যাবে কিনা চিন্তা করার বিষয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কৃষ্ণনগর থেকে প্রায় ২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ববর্তী দোগাছি

গ্রামের একটি ধ্বংসপ্রায় মন্দির ও চাকদহ স্টেশন থেকে প্রায় ৬ মাইল পূর্বে কামালপুর গ্রামের বিধ্বস্ত জোড়া-'আটচালা' মন্দির। শেষোক্ত স্থানে ভগ্নলিপির অংশ এখনও বিদ্যমান। একদা নদীয়ায় অবস্থিত আলমডাঙা স্টেশনের চার মাইল পূর্ব-দক্ষিণে গোসাঁই-দুর্গাপুর গ্রামে (এইটি বর্তমানে বাঙলাদেশের অন্তর্বর্তী) জয়দিয়াবাসী রাজা রায়মুকুটের পুত্র শ্রীকৃষ্ণরায় রাধারমণদেবের মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে। তেহট্টের কৃষ্ণরায়ের জোড়বাংলা (১৬৭৮ খ্রি.) এবং বীরনগরের মুস্তোফীদের জোড়বাংলাটি (১৬৯৪ খ্রি.) এ জেলায় সতেরো শতকের উল্লেখযোগ্য মন্দির। শান্তিপুরের হাটখোলাপাড়ায় মধ্যমগোস্বামী বাড়ির অদ্বৈতপ্রভুর ও গোকুলচাঁদের আটচালা শ্রেণীর মন্দির দুটিকেও নানাকারণে এই শতকে ফেলা যেতে পারে। কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত মাটিয়ারির পূর্বোক্ত মন্দিরটি রুদ্রেশ্বরের বলে ঐ অঞ্চলে পরিচিত এবং স্থানীয় এক বৃদ্ধ ব্যক্তির মতানুসারে (যিনি প্রাচীন লিপিফলকটি দেখেছিলেন), মহারাজ রুদ্ররায় হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। রুদ্রের রাজ্যকাল ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে। অতএব এই মন্দিরটিও যে সতেরো শতকে তৈরি তাতে সন্দেহ নেই।

সতেরো শতকে নির্মিত বা নির্মিত বলে অনুমিত পূর্বোক্ত মন্দিরগুলি নদীয়ার তথা বাঙলার মন্দির-ভাস্কর্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় স্থান লাভ করবার যোগ্য। এইসব মন্দিরে 'টেরাকোটা' ছাড়াও সুন্দর নকশা প্রচুর পরিমাণে অঙ্কিত হয়েছে। পোড়ামাটির মূর্তিগুলি সুক্ষ্ম রেখায় মণ্ডিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থান গভীরভাবে খোদিত হয়েছে দেখা যায়। দেহের ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়েছে। এইসব মূর্তির প্রায় সবই পাশ থেকে দেখানো হয়েছে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর থেকে বা কিছু পূর্ব থেকে অর্থাৎ ষোল শতকের কিছু আগে থেকে সতেরো শতকের শেষ দিক পর্যন্ত বাংলার নির্মীয়মান টেরাকোটা-মন্দিরসমূহে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য টেরাকোটাশিল্পের এই 'স্কুল' চৈতন্যের কিছু আগে থেকেই যে চলিত ছিল, তার উপযুক্ত প্রমাণ বাংলার অত্যল্প দু-একটি মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়, যেমন মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরের সিংহবাহিনীর মন্দির।[৩] এই কালের পোড়ামাটির মূর্তিগুলি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথাক্রমে ৬ ও ৩ ইঞ্চিরও কম। নদীয়া জেলায় সতেরো শতকে নির্মিত পূর্বোক্ত মন্দিরগুলিতে টেরাকোটাশিল্পের এই 'স্কুল'টি যে পুরোপুরিভাবে অনুসৃত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বাঘবেশ্বর (দিগনগর), জলেশ্বর (শান্তিপুর), রুদ্রেশ্বর (মাটিয়ারি) ও কৃষ্ণরায়ের (তেহট্ট) মন্দিরগুলিতে এই স্কুলের বৈশিষ্ট্যগুলি নিখুঁতভাবে অনুসৃত হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়, 'বিষ্ণুপুরী' টেরাকোটার সঙ্গে এদের সাদৃশ্য খুবই বেশি। ফুল লতাপাতার সুন্দর সুন্দর নকশা ও কাজ, বাতিদান এবং বড়-ছোট আকারের ফুল এই মন্দিরগুলিতে ন্যস্ত হয়েছে। এই নকশার সঙ্গে গৌড় অঞ্চলের মসজিদে খোদিত নকশার সাদৃশ্যও খুব বেশি। এছাড়া খিলান ও প্রবেশদ্বারের দুপাশে ক্ষুদ্রায়তন স্তম্ভগুলির (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যা মাত্র দুইটি থাকে) সঙ্গে গৌড় বা অন্যান্য প্রাচীন মসজিদের খিলান ও স্তম্ভের নৈকট্য নদীয়া জেলার উল্লিখিত মন্দিরসমূহে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। খিলানটি অনেকক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার এ-ধরনের দুটি থামের ওপর ন্যস্ত। এর থেকে কেউ কেউ মুসলমান আমলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যবিদ্যার প্রভাব পরবর্তীকালে নির্মিত হিন্দু মন্দিরে লক্ষ্য করেছেন।[৪] অবশ্য এ সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কিছু বলা বেশ কঠিন।

আঠার শতকের তৃতীয় দশকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যকাল থেকে নদীয়ার দেবালয় সৌধের গঠন ও আয়তনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই শতকে নির্মিত নদীয়া

জেলায় মন্দিরের সংখ্যা অবশ্য পূর্ববর্তী শতকের তুলনায় কিছু বেশি হলেও ভাস্কর্যের দিক থেকে এইসব মন্দির একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে পৌছেছে। কিন্তু এগুলিতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, চিরাচরিত স্থাপত্যশৈলী থেকে একপ্রকার অস্বাভাবিক বিচ্যুতি, যাকে কতকটা বিকৃতিও বলা যেতে পারে। অবশ্য এই শতকে নির্মিত এ জেলার সব মন্দিরের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য নয়, পূর্বতন শৈলী অনুসারী কোন কোন মন্দিরও যে এ শতকে নির্মিত না হয়েছে, এমন নয়, যেমন শান্তিপুরের (শ্যামচাঁদপাড়ার) শ্যামচাঁদের (১৭২৬ খ্রি.) এবং কাঁচড়াপাড়ার কাঞ্চনপল্লী গ্রামের কৃষ্ণরায়ের (১৭৮৬ খ্রি.)। উচ্চতা, আয়তন ও গঠনের দিক থেকে এ দুটি মন্দির প্রায় একই রকমের। গতানুগতিক আটচালা পদ্ধতিতে নির্মিত এই দুটি মন্দিরে *পঙ্কের কাজ*, কিছু কিছু নকশা এবং অল্প কিছু পোড়ামাটির ফুল ছাড়া এখানে টেরাকোটা বলতে কিছুমাত্র নেই। গর্ভগৃহসংলগ্ন আবৃত বারান্দা (যাকে মন্দিরের পরিভাষায় 'জগমোহন' বা চলতি কথায় 'বৈঠকখানা' বলা চলতে পারে) ও 'ইমারতি' থামের ব্যবহার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে (যা নদীয়া জেলার অন্যান্য মন্দিরে একপ্রকার অনুপস্থিতই বলা যেতে পারে)। বাংলার অন্যান্য জেলায় ষোল বা সতেরো শতকের মন্দিরসমূহে গর্ভগৃহসংলগ্ন সম্মুখস্থ বারান্দা (যার ছাদ সর্বসাকুল্যে অন্যূন পাঁচটি অর্ধ ও পূর্ণস্তম্ভের উপর স্থাপিত) দুর্লভদর্শন হলেও এ জেলায় পূর্ববর্তী শতকে নির্মিত মন্দিরে তার একান্ত অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আঠারো শতকের একেবারে গোড়ায় ও শেষদিকে শ্যামচাঁদ ও কৃষ্ণরায়ের মন্দির-দুটি এদিক থেকে যে কিছুটা নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। এগুলির কথা বাদ দিলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি বাঙলার মন্দিরশিল্পের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। প্রথমত, চিরাচরিত স্থাপত্যশৈলী এসব মন্দিরে একান্তভাবে অনুপস্থিত অর্থাৎ বাঙলার নিজস্ব 'একচালা', 'দোচালা', 'জোড়বাংলা', 'চারচালা', 'আটচালা' প্রভৃতি স্থাপত্যরীতিকে একপ্রকার বাদ দিয়ে এসব মন্দির নতুন এক রীতিতে তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর সম্ভাব্য প্রতিফলন এই মন্দিরগুলির ওপর আত্যন্তিক না হলেও আংশিকভাবে পড়েছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রচিত কলকাতার লর্ড বিশপ হেবার সাহেবের ভ্রমণবিবরণীতে উপরি উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে। 'শিবনিবাসে'র মন্দিরগুলি সম্পর্কে হেবার সাহেব তাঁর Heber's Journal-এর প্রথমখণ্ডে একথা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন।[৫] 'শিবনিবাসে'র রামসীতার মন্দির হেবার সাহেবের ভাষায় 'a very handsome Gothic arch, with an arabesque border' এবং বুড়ো শিবের মন্দির 'Octagonal with domes not unlike with those of glass houses' বলে উল্লেখিত হয়েছে। মাঝের শিবমন্দিরটি (রাজ্ঞীশ্বরের) চারচালা রীতির হলেও ছাদ কতকটা পিরামিডাকৃতি। তৃতীয়ত, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরসমূহ টেরাকোটা বা কোনও প্রকার নকশাবর্জিত। শিবনিবাসের মন্দিরগুলি সংস্কার করা হলেও বহুদিন আগেকার কোন আলোকচিত্রেও এগুলিতে টেরাকোটা বিন্যাসের কোন চিত্র পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজরাজেশ্বরের (বুড়ো শিব নামে পরিচিত) মন্দিরটি ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলিবর্দী খাঁ-এর শাসনকালে এবং অপর দুটি মন্দির ১৭৬২ খ্রি. নির্মিত হয়েছিল। নবাবেব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনের ফলেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে মন্দিরস্থাপত্যকলার প্রয়োগে একদেশদর্শী ছিলেন না, শিবনিবাসের অন্তত দুটি মন্দিরে বিশেষ করে বুড়ো শিবের মন্দিরে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁরই সমসাময়িক বর্ধমান রাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরসমূহে কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রীয় রীতি স্বীকৃত হয়নি।

এক্ষেত্রে বর্ধমানরাজারা পূর্বাপর ঐতিহ্যানুসারী শৈলীরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে শিবনিবাসের উক্ত মন্দিরটি তৈরি হওয়ার মাত্র তিন বছর আগে বর্ধমান জেলার কালনায় ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশাল পঁচিশচূড়া মন্দিরটি নির্মিত হয়। কালনায় অনন্ত বাসুদেবের আটচালা মন্দিরটিও ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল। এসব মন্দিরে ভাস্কর্যের প্রাচুর্যও বর্তমান। কৃষ্ণচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত আমঘাটার নিকটবর্তী 'গঙ্গাবাসে'র হরিহরের মন্দিরেও (১৭৭৬ খ্রি. অ.) কৃষ্ণচন্দ্রীয় রীতি অনুসৃত— একটি আয়তক্ষেত্রাকার চাঁদনির ওপরে চতুষ্কোণাকৃতি চূড়া খাড়াই চালযুক্ত 'চারচালা'র মতো খানিকটা দেখতে হলেও এটিকে কোনমতেই বিশুদ্ধ 'চারচালা' শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে না। গঙ্গাবাসের অপর বিধ্বস্ত মন্দিরটিও সম্ভবত এ ধরনের ছিল। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রাজ্যকালের প্রথম বছরে (১৭২৮ খ্রি.) আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের একটি মন্দির তৈরি করেছিলেন।[৮] বর্তমানে মন্দিরটি কিন্তু নতুন ও দালানশ্রেণীর, পুরানোটি সম্ভবত নিশ্চিহ্ন।

পূর্ববর্তী ঐতিহ্যানুসারী শৈলী থেকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এই বিচ্যুতি শুধুমাত্র মন্দিরনির্মাণে পরিলক্ষিত হয় না, শিবনিবাসের বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদ ও কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদও গতানুগতিক সৌধনির্মাণশৈলীর বিপরীত ছিল। কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের বর্তমান তোরণপথও গতানুগতিক শৈলীকে অনুসরণ করে তৈরি হয়নি। পরবর্তীকালে কৃষ্ণচন্দ্রের উত্তরপুরুষ প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্র কৃষ্ণনগরে আনন্দময়ীর যে মন্দির (১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে) নির্মাণ করেছিলেন, সেখানেও কৃষ্ণচন্দ্রীয় ঐতিহ্যের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। আনন্দময়ীর মন্দির এবং নবদ্বীপের 'পোড়ামাতলা'য় ভবতারণ ও ভবতারিণীর মন্দির প্রায় সমসাময়িক ও গিরিশচন্দ্র-কর্তৃক নির্মিত। উচ্চতা, গঠন ও আয়তনে এই দুটি মন্দিরের সাদৃশ্য খুব বেশি। এগুলিকে প্রচলিত শৈলী অনুসারে 'একরত্নে'র পর্যায়ে ফেলা যাবে কিনা ভেবে দেখার বিষয়। আনন্দময়ীর মন্দির চাঁদনির ওপর উচ্চ 'চারচালা' শিখরযুক্ত ও পোড়ামাতলার ভবতারিণীর মন্দিরও এই ধরনের। আনন্দময়ীর মন্দিরে কিছু কিছু *পঙ্কের কাজ* ছাড়া পোড়ামাটির কোন মূর্তি নেই। অনুরূপভাবে ভবতারিণীর মন্দিরটির কথাও বলা যেতে পারে।

ওপরের আলোচনা থেকে আঠার শতকে নদীয়ারাজ-প্রবর্তিত মন্দিরশৈলীর এক স্বতন্ত্র ধারার পরিচয় পাওয়া গেলেও এই ধারায় পরবর্তীকালে কোন মন্দিরই প্রায় নির্মিত হয়নি দেখা যায়। যে অজ্ঞাত কারণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই স্বতন্ত্র শৈলীর প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর রাজ্যকালের সঙ্গে সঙ্গেই মন্দির নির্মাণের এই রীতি একরকম শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে নির্মিত আনন্দময়ী বা ভবতারিণীর মন্দির প্রচলিত একরত্নেরই একটি রূপ বলে মনে করা যেতে পারে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে (১৮১৮ খ্রি.) নির্মিত উলা-বীরনগরের দক্ষিণপাড়ায় (বর্তমানে ভক্তিবিনোদগোষ্ঠীর মন্দিরের অন্তর্ভুক্ত) এ ধরনের একটি উচ্চ একরত্ন মন্দির লক্ষ্য করা যায়। নদীয়া জেলার অন্যতম প্রাচীন স্থান উলায় (বর্তমান বীরনগরে) পূর্বোল্লিখিত '*জোড়বাংলা*' মন্দিরটি ছাড়াও আরও অনেক মন্দির দেখা যায়। এসবের মধ্যে বেশির ভাগই 'চালা'শ্রেণীর, যেমন মুস্তোফীপাড়ায় ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জোড়া আটচালা। অবশ্য রত্নমন্দির যে নেই, তা নয়— একটি ধ্বংসপ্রায় 'জোড়া পঞ্চরত্ন' (এতে কোন লিপি নেই) এবং উত্তরপাড়ায় শিবের পঞ্চরত্ন (১৮৩৬ খ্রি.) রত্ন বা বহুচূড়মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শহর নবদ্বীপে অবশ্য দু-একটি বহুচূড় মন্দির দেখা গেলেও সেগুলির তেমন কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। বীরনগরের পূর্বকথিত

মন্দিরগুলিতে (একমাত্র জোড়বাংলাটি ছাড়া) টেরাকোটার কোন চিহ্ন নেই। বীরনগর প্রসঙ্গে মুস্তোফীদের *কাঠের দুর্গাদালান* আবশ্যিকভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি এখন প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, শুধুমাত্র কয়েকখণ্ড সুন্দর কারুকার্যযুক্ত কাষ্ঠফলকছাড়া। বীরনগরে প্রাচীন ইমারতের মধ্যে এখানে-ওখানে মৃত্তিকাপ্রোথিত ইষ্টকপ্রাচীরের চিহ্ন, ভগ্ন রাসমঞ্চছাড়া আর বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না। এককালে এইস্থান যে ঘনজনবসতিপূর্ণ ও সৌধ-ইমারতে পূর্ণ ছিল, তা সহজেই চোখে পড়ে।

মন্দির-সমৃদ্ধ স্থান ও বিবরণী ঃ

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নদীয়া ছিল চুরাশিটি পরগণা নিয়ে গঠিত। সে-সময়ে উত্তরে পলাশী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ধুলিয়াপুর ও পশ্চিমে ভাগীরথী ছিল এ জেলার সীমা।[৭] ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে নদীয়া বলতে প্রেসিডেন্সী বিভাগকে বোঝাত। বর্তমানে উত্তরে কুষ্ঠিয়া, পূর্বে যশোহর, দক্ষিণে ২৪ পরগণা, পশ্চিমে বর্ধমান ও হুগলি এবং উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ বর্তমান নদীয়ার চতুঃসীমা। মন্দির-সমৃদ্ধ স্থানগুলিকে এই সীমাবেখার মধ্যে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

- উত্তরাঞ্চল (তেহট্ট ও করিমপুর থানা)
- পশ্চিমাঞ্চল (নবদ্বীপ থানা)
- মধ্যাঞ্চল (কৃষ্ণনগর থানা)
- পূর্বাঞ্চল (কৃষ্ণগঞ্জ থানা)
- দক্ষিণাঞ্চল (শান্তিপুর, রাণাঘাট ও চাকদহ থানা)

উত্তরাঞ্চল ঃ

তেহট্ট (তেহট্ট থানা) ঃ সমগ্র উত্তরাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র তেহট্টগ্রামেই দুএকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির লক্ষ্য করা যায়। গ্রামটি জলাঙ্গীর পূর্বতীরে অবস্থিত। কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে শিকারপুর রোড ধরে বাসে এখানে পৌঁছানো যায়। তেহট্ট গ্রামটি কৃষ্ণনগরের চব্বিশ-পঁচিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গ্রামটির প্রাচীন নাম ছিল ত্রিহট্ট। অর্থাৎ একসময় এইখানের তিনটি স্থানে সপ্তাহে দু-দিন করে হাট বসত। পরে স্থানীয় জনগণের নানা অসুবিধার কথা চিন্তা করে এই তিনটি হাটকে নদীতীরবর্তী একটি প্রশস্ত স্থানে এনে একত্র বসানো হয়। সেই থেকে এই স্থানটির নাম হল ত্রিহট্ট। ইংরেজ আমলে একে 'তেহাটা' বলা হ'ত। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এ গ্রামটি 'তেহট্ট' নামেই পরিচিত হয়েছে। তেহট্ট বাজারের অল্প পূর্বে ঠাকুরপাড়ায় কৃষ্ণরায়ের জোড়বাংলা মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। দুটি 'দোচালা' বা 'একবাংলা' আগে-পিছনে জোড়া দিয়ে এ ধরনের মন্দির সেকালে নির্মিত হত বলে এই স্থাপত্যশৈলীর নাম হয়েছে '*জোড়বাংলা*'। এই শৈলীটি এককালে যে বেশ জনপ্রিয় ছিল, তার প্রমাণ পশ্চিমবাংলার বহু স্থানেই পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট জোড়বাংলাটি (কৃষ্ণরায়ের, ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ) এই শৈলীর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তেহট্টে কৃষ্ণরায়ের এই মন্দিরটি ১৬০০ শকাব্দ বা ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে মন্দিরটির দক্ষিণাংশের দেওয়ালে পোড়ামাটির হরফে উৎকীর্ণ একটি লিপি থেকে জানা যায়। মূল সংস্কৃত লিপিটি যথাযথ উদ্ধার করা হল ঃ

১৬০০
শাকে শূন্যনভঃষড়িন্দুগণিতে মেষগতে ভাস্করে
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দনিরতঃ শ্রীরামদেব মহান
লক্ষ্মী র্যস্য পদারবিন্দসেবনবিধৌ ব্যাপারসম্পাদিনী
তস্য শ্রীপুরুষোত্তমস্য চ গৃহং যত্নৈরকার্ষীত্ স্বয়ং।।

সারিগুলি সংস্কৃত শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দের অনুসারী স্থাপিত। কিছু কিছু ব্যাকরণগত অশুদ্ধি থাকলেও পংক্তি-অনুসারী সারিস্থাপন ও অক্ষরবিন্যাস পোড়ামাটির লিপিফলকগুলিতে খুব কমই দেখা যায়। সেদিক থেকে এই লিপিটির প্রতি সারি, পংক্তি বা চরণানুযায়ী স্থাপিত হওয়ায় লিপিবিশারদদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই শ্লোকটির তৃতীয় পংক্তিতে দু অক্ষর বেশি আছে। শ্লোকটির অর্থ হল, ১৬০০ শকাব্দের (১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ) বৈশাখ মাসে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মসেবী রামদেব নামে এক ব্যক্তি যত্নসহকারে শ্রীপুরুষোত্তমের এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। লক্ষ্মীদেবী তাঁর পদসেবা করতেন এবং তাঁর উপাসনার জন্য রামদেব এই মন্দির নির্মাণ করেন। এই রামদেব এবং সম্ভবত তাঁর শিষ্যা বা কন্যা লক্ষ্মী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানা আজ আর সম্ভব নয়। জানা যায়, লক্ষ্মী রামদেবের বালবিধবা কন্যা ছিলেন। স্থানীয় অনেকে লিপিতে উল্লিখিত রামদেবকে 'বামদেব' পাঠ ধরে তাঁকে সুপ্রসিদ্ধ 'ভক্তমাল' গ্রন্থের বামদেবজীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু এ ধারণা যে ভুল, তার প্রথম যুক্তি হল, লিপিতে উল্লেখিত শব্দটি 'রামদেব'ই হবে, 'বামদেব' হবে না। সেকালে 'র' অক্ষর 'ব'-এর মাঝখান কেটে লেখা হত। লিপিতে অক্ষরটি এইভাবে আছে। 'ভক্তমাল' গ্রন্থ মূল হিন্দিতে রচিত। কাজেই ভক্তমালগ্রন্থে উল্লখিত বামদেবজীর সঙ্গে রামদেবের কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না। ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা রাঘবের পুত্র রুদ্রের

মন্দিরটি ইষ্টকনির্মিত ও পশ্চিমমুখী। সামনের 'দোচালা'টির আগে সংস্কার করার জন্যে পোড়ামাটির মূর্তি ও অলঙ্করণের স্থান দখল করেছে চুন-বালির পলেস্তারা। অবশ্য, স্থাপত্যগত সামগ্রিক কোন বিকৃতি হয়নি। প্রথম 'দোচালা'টির সামনের দিকে পোড়ামাটির বহু মূর্তি বা 'টেরাকোটা' ছিল, জানা যায়। জীর্ণ ও ভগ্ন হয়ে যাওয়ায় সংস্কারের সময় সেগুলি অপসারিত ও বিনষ্ট হয়েছে। বর্তমানে পিছনের দোচালাটির (বা গর্ভগৃহের) প্রবেশপথে যে ক্ষুদ্র সংলগ্ন তোরণ আছে, সেখানে প্রাচীন কারুকার্য ও সর্বসাকুল্যে পোড়ামাটির চারটি ক্ষুদ্র মূর্তি দেখা যায়। এদের মধ্যে দুটি চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের ও দুটি রাজকর্মচারী বা রাজার। এছাড়া মেঝের ঠিক ওপরে মন্দিরগাত্রে হংসশ্রেণী ও খিলানের চারপাশে সাতটি সাতটি করে প্রতীক 'আটচালা' শিবালয় অঙ্কিত। এছাড়া রয়েছে ফুল ও লতাপাতার সুন্দর সুন্দর কাজ। পোড়ামাটির কয়েকটি ফুলও এখানে দেখা যায়। প্রতীক মন্দিরগুলিকে বেষ্টন করে বারোটি বাতিদান লক্ষ্য করা যায়। গর্ভগৃহটি 'দোচালা' বলে বলাই বাহুল্য আয়তক্ষেত্রাকার। এর দক্ষিণে একটি দ্বার আছে। কৃষ্ণরায়ের ক্ষুদ্র মূর্তিটি ব্ল্যাক বেসল্ট জাতীয়, বিগ্রহটি একক, রাধিকা-বিহীন। কিছু কিছু শালগ্রাম শিলাও এখানে আছে। রাধিকাবিহীন কৃষ্ণরায় সম্পর্কে এই অঞ্চলে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সংক্ষেপে তা হল, লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণজীউর একনিষ্ঠভাবে সেবা করতে করতে হঠাৎ গর্ভবতী হন, এজন্যে তাঁর গুরু বা পিতা রামদেব তাঁকে তিরস্কার করেন। তখন তিনি রাধিকার বিগ্রহের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেলে, সেই বিগ্রহটি পরে পিছনের একটি পুকুরে বিসর্জিত হয়। সেই থেকে কৃষ্ণরায় বিরহীর জীবন

যাপন করে চলেছেন। অবশ্য এটি একটি কিংবদন্তী। সেই পুকুরটি আজও বর্তমান, তবে দৈন্যদশার মধ্যে। কৃষ্ণরায়ের একটি 'দোলমঞ্চ'ও ছিল মূল মন্দিরের বেশ কিছুটা দূরে। সেটি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। কৃষ্ণরায়ের এই মন্দির নদীয়ারাজের আওতায় ঠিক কতদিন আগে আসে, তা বলা কঠিন। বারদোলের সময় কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে এই বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া হয়।

তেহট্ট গ্রামের কেন্দ্রস্থলে 'চাতর' বলে একটি বিস্তীর্ণ স্থান আছে। এখানে অনেক আগে একটি চত্বর (চত্বর < চাতর) ছিল। হরিনাম-সঙ্কীর্তন, পূজা, যাগযজ্ঞ, হোম প্রভৃতি এইস্থানে অনুষ্ঠিত হ'ত। এই চত্বরের মধ্যে একটি উচ্চ দোলমন্দির ছিল। বর্তমানে এগুলি একপ্রকার নিশ্চিহ্ন। এই চত্বর থেকে এ পাড়ার নাম 'চাতরপাড়া' হয়েছে বলে মনে হয়। এইসব থেকে তেহট্ট স্থানটি যে এককালে বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, তা অনুমান করা যায়। কৃষ্ণরায়ের প্রভাব ও মাহাত্ম্য এই অঞ্চলে বহু কাহিনী ও উপকথার সৃষ্টি করেছে।

কৃষ্ণরায়ের মন্দির ছাড়া এই গ্রামে কালীর নির্দিষ্ট একটি বাঁধানো বেদি আছে। জনশ্রুতি এই, এই বেদিতে জনৈক শক্তিসাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। গাছতলায় বহুকালের একটি প্রাচীন খাঁড়াকে কালীজ্ঞানে যথাবিধি পূজা করা হয়। দেবীর কোন মূর্তি নেই। তেহট্ট গ্রামের নওদা পাড়ায় বড় পীরের একটি দরগাও আছে। এই দরগাটি বেশ প্রাচীন।[৮]

উত্তরাঞ্চলের মধ্যে করিমপুর থানার অন্তর্গত করিমপুর গ্রামে জলাঙ্গীর তীরে একটি প্রাচীন কালীমন্দির, শোভারাজপুর মৌজার অন্তর্গত নতিডাঙ্গায় রানিভবানী প্রতিষ্ঠিত কালীপূজার জন্য একটি বেদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শিকারপুরে সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থান ও মন্দির আছে।

***মুড়াগাছা (নাকাশীপাড়া থানা)* ঃ** এই গ্রামটি সদর কৃষ্ণনগর থেকে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এটি লালগোলা লাইনের একটি স্টেশন। এই গ্রামে দুটি মন্দির বর্তমান— একটি শিবের এবং অপরটি সর্বমঙ্গলার। সর্বমঙ্গলার মন্দিরটি হিজলির লবণ উৎপাদনকেন্দ্রের দেওয়ান দেবীদাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।[৯]

পশ্চিমাঞ্চল ঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপের 'দণ্ডপাণিতলা'য় দণ্ডপাণি শিবের আসল মূর্তিটি ১৩৩৮ সালের চৈত্রমাসে বিনষ্ট হয়ে গেছে বলে জানা যায়। ক্ষুদ্র একটি কক্ষে দণ্ডপাণি শিবের বর্তমান মূর্তিটি একটি কালো পাথরে খোদিত। আসল মূর্তিটি গাজনের সময় এক ভক্তসন্ন্যাসীর হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায় বলে জানা যায়, তখন সেই মূর্তিটিরই অনুরূপ আরেকটি মূর্তি পাথরে খোদাই করে রাখা হয় ও ভগ্নমূর্তিটি গঙ্গায় বিসর্জিত হয়। অষ্টধাতুনির্মিত সেই আসল মূর্তিটির একটি মুখোশও তৈরি করে রাখা হয়েছে। বর্তমান মূর্তিটি পুরোপুরি একটি শিবের। মূর্তিটি দণ্ডায়মান, বামপদের উরুতে ডানপদ স্থাপিত। মস্তক জটাজুটমণ্ডিত ও দুইদিকে সর্প। ডানহাত উর্ধ্বে ও বাম হাত নীচে। পদতলে একটি হংস ও মড়ার মাথার খুলি। বিনষ্ট মূর্তিটি স্থানীয় এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাশী থেকে এখানে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য, নতুন মূর্তিতে পুরানো মূর্তির সাদৃশ্য কতখানি রয়েছে, তা বলা সম্ভব নয়। 'নবদ্বীপমহিমা'-লেখক কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় কিন্তু আসল মূর্তিটি দেখে সেটিকে কোন বৌদ্ধশ্রমণ বা বুদ্ধমূর্তি বলেই মনে করেছিলেন। সেই মূর্তিটির মস্তকটি একটু অবনত আকারের ছিল বলে জানা যায়।[১০] বর্তমান মূর্তিতে কিন্তু মস্তকটি অবনত নয়। এছাড়া বর্তমান মূর্তিতে আরও অনেক ভাস্করকল্পিত কারুকার্যও আছে মনে হয়। 'দণ্ডপাণি' শব্দের অর্থ যম বা ধর্মরাজ

অর্থাৎ বুদ্ধ ('সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ'-অমরকোষ)। তাই এটিকে বুদ্ধমূর্তি বলা যাবে কিনা ভেবে দেখার বিষয়। দণ্ডপাণির মন্দিরে কতকটা তরমুজের ন্যায় লম্বা আকারের আরেকটি প্রস্তরও পূজিত হন।

দেয়াড়াপাড়ার 'এ্যালানে শিব' নামে পূজিত একটি লিঙ্গমূর্তি বর্তমানে ঐ পাড়ার একটি প্রাচীন দালানমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। নবদ্বীপের মধ্যে এই শিবটি গৌরীপট্টে স্থাপিত। জানা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই নবদ্বীপে প্রথম এই শিবটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমান জরাজীর্ণ দালানটির পাদপীঠের ইষ্টকরাশি বেশ প্রাচীন মনে হয়।

নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন স্থানে আরও বহু প্রস্তরখণ্ড শিবরূপে পূজিত হন, যেমন, 'বুড়োশিবতলা'র বুড়ো শিব, নবদ্বীপ থানার কাছে মালোদের শিব, দেয়াড়াপাড়ায় আলোকনাথ শিব, চারিচারাপাড়ায় বালকনাথ শিব প্রভৃতি। এসব প্রস্তরখণ্ডের কোন কোনটিতে বুদ্ধমূর্তি বা বৌদ্ধ প্রতীকচিহ্ন আছে বলে জানা যায়। পোড়ামাতলার ভবতারণ শিবের মন্দিরে ছোট একটি পাথরে একটি মূর্তি খোদিত দেখা যায়। অস্পষ্ট হলেও মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট কতকটা বুদ্ধমূর্তির ন্যায়। পাড়ডাঙ্গার প্রায় দুই মাইল দূরে, প্রাচীন গঙ্গাখাতের পশ্চিম তীরবর্তী কোবলা গ্রামে বাগ্‌দেবী নামে দুখণ্ড প্রস্তর পূজিত হন। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটটি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ এবং শিরোভাগে সামান্য কারুকার্য আছে। অপরখানি পিঙ্গলাভ ভগ্ন স্তম্ভখণ্ড।

উপরি উল্লিখিত মূর্তি বা প্রস্তরখণ্ড ছাড়াও বৈষ্ণব ও শাক্তদের প্রতিষ্ঠিত বহু মূর্তি, মঠ ও মন্দির এই শহরে আছে। এদের মধ্যে পাড়ার মা বা সিদ্ধেশ্বরী কালী এখানকার বেশ প্রাচীন দেবতা বলে পরিচিতা, বিদগ্ধজননী বা পোড়ামা, পোড়ামাতলায় একটি প্রাচীন বটগাছের তলে স্থাপিতা। কথিত আছে, পোড়ামা বা জগন্মাতার ঘট বৃহদ্রথ নামে এক সিদ্ধসন্ন্যাসী স্থাপন করেছিলেন। তারপর বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম চতুষ্পাঠী স্থাপন ক'রে দেবীর ঘটটিকে গ্রামের মধ্যে এনে একটি বটগাছের নিচে স্থাপন করেন। গাছটি একসময় পুড়ে গেলে দেবী 'পোড়ামা' নামে পরিচিতা হন।

এছাড়া নবদ্বীপে পঞ্চপ্রভুর মন্দিরসমূহে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসের মন্দির আছে। এদের মধ্যে মহাপ্রভুপাড়ায় 'মহাপ্রভুবাটি'তে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছেন। মহাপ্রভু- বাড়ির মধ্যে একটি পরিত্যক্ত পুরানো 'আটচালা'মন্দির দেখা যায়। এই সব মন্দিরে স্থাপত্য বা ভাস্কর্যগত উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই এবং এদের প্রাচীনত্বও সংশয়িত। অবশ্য শহরে দু'চারটি রত্নমন্দির যে নেই, এমন নয়— তবে সেগুলি কত প্রাচীন বলা কঠিন। পোড়ামাতলার ভবতারিণী ও ভবতারণের মন্দির দু'টি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্র-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে' উল্লেখ আছে, গিরিশচন্দ্রের জমিদারী বিক্রি হয়ে গেলেও তিনি ১২৩২ সালে (১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে) নবদ্বীপে দুটি বিরাটাকার মন্দির নির্মাণ করে তার একটিতে ভবতারিণী নামে দেবীমূর্তি ও অপরটিতে ভবতারণ নামে বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।[১১] ভবতারণ ও ভবতারিণী মূর্তি-সম্পর্কে জানা যায়, গিরিশচন্দ্রের পূর্বপুরুষ মহারাজ রুদ্র রাঘবেশ্বর নামে যে শিবলিঙ্গ নবদ্বীপের ভাগীরথীতীরে প্রতিষ্ঠা করেন, পরে গঙ্গার ভাঙনে রাঘবেশ্বরের মন্দিরটি ভেঙে গেলে বহুলোক ঐ শিবলিঙ্গকে বের করার পর শিবকে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা হয়। পরে গিরিশচন্দ্র ঐ শিবকে তুলে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমান ভবতারিণী মূর্তিটিও প্রথমে মহারাজ রাঘব-প্রতিষ্ঠিত একটি বিরাট গণেশমূর্তির ছিল। গণেশের মন্দিরও ভাগীরথীতে নিমগ্ন হলে পরে

মূর্তিটি দীর্ঘকাল মাটিচাপা অবস্থায় পড়ে থাকে। সেই মূর্তিটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য গিরিশচন্দ্র যখন মাটি থেকে তোলান, তখন মূর্তিটির শুঁড় ভেঙে গেলে নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজের মতানুসারে অঙ্গহীন মূর্তিকে ধ্যানানুযায়ী ভবতারিণী মূর্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।[১২] লম্বোদরা ভবতারিণীকে দেখলে এটি যে প্রাচীন গণেশমূর্তি থেকে রূপান্তরীকৃত হয়েছে তা বোঝা যায়। পোড়ামাতলার ভবতারিণীর মন্দিরের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ীতলার আনন্দময়ীর মন্দিরের স্থাপত্যগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তবে ভবতারিণীর মন্দিরের কোন শিলালিপি দেখা যায় না। মন্দিরটির শীর্ষদেশ বটবৃক্ষসমাচ্ছন্ন।

নবদ্বীপ শহরে মণিপুর রাজবাড়িতে অণুমহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। অণুমহাপ্রভুর মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল বেশিদিনের হবে বলে মনে হয় না।

***মায়াপুর (নবদ্বীপ থানা)* ঃ** প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যামদাস নামেও পরিচিত) তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে' বলেছেন ঃ

নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জনমিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান।।
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর।।

এই মায়াপুর গ্রামটি বর্তমানে ভাগীরথীর পূর্বতীরে 'ভক্তিরত্নাকর'-কথিত সীমন্তদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। এই সীমন্ত বা সামন্ত দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান মায়াপুর গ্রামটিকে আজ অনেকেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বলে বিশ্বাস করেন। প্রাচীন মিয়াপুর নাম থেকে মায়াপুর হয়েছে কিনা ভেবে দেখার বিষয়। এই মায়াপুর একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে গৌরবান্বিত, অন্যদিকে বল্লাল সেনের নামে প্রাচীন বল্লালদীঘি সেন-আমলের এক অবিস্মরণীয় পুরাকীর্তিরূপে পরিগণিত। 'চৈতন্যভাগবতে' আছে, মহাপ্রভু কীর্তনানন্দে নাচতে নাচতে সিমুলিয়া নগরে উপস্থিত হলেন, তারপর গঙ্গা পার হয়ে সেখান থেকে তিনি কুলিয়ায় গেলেন। এই সীমন্তদ্বীপ বা সামন্তদ্বীপেরই অপর নাম সম্ভবত সিমুলিয়া ছিল। মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সুউচ্চ মঠ ও মন্দির নির্মিত হয়েছে। এদের মধ্যে 'যোগপীঠ মঠ'টিই শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত। এটি গৌরাব্দ ৪৪৮ অর্থাৎ ১৩৪১ বঙ্গাব্দে নির্মিত। মঠনির্মাণের সময় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এখানে একটি ছোট সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি এই মঠে গৌরনিতাই বিগ্রহের সঙ্গে পূজিত হচ্ছেন। এঁর নাম 'অধোক্ষজ'। মূর্তিটি যে বেশ প্রাচীন, তা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়।

যোগপীঠ মঠের অল্প উত্তরে 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' বা শ্রীবাস অঙ্গন প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ, মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন চলাকালে কাজী মৃদঙ্গ বা খোল ভেঙে দিয়েছিলেন। 'যোগপীঠ মঠে' মহাপ্রভুর জন্মস্থান অংশটি একটি পাকা চালাগৃহ নির্মাণ করে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যোগপীঠ মঠের কিছু উত্তরে প্রসিদ্ধ বল্লালদীঘি। এই দীঘির পাড়ে অনেকদিন আগে একটি ধ্বংসস্তূপ ছিল এবং বাঙলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলে পরিচিত ছিল।[১৩] বর্তমানে তার চিহ্ন কিছুমাত্র নেই, একমাত্র দীঘির অভ্যন্তর ভাগের শুষ্ক ভূমি ছাড়া। দীঘিটি বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এটি স্থানীয় মঠের সম্পত্তি। বামনপুকুর বাজার পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখে পাকারাস্তার কিছু দূরেই বিরাট দীঘিটির চিহ্ন চোখে পড়ে।

মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে এই দীঘিতে স্নান করতেন বলে বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস উল্লেখ করেছেন।

মধ্যাঞ্চল ঃ

কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত মধ্যাঞ্চলে পুরাবস্তুসমৃদ্ধ গ্রামগুলি হল, সুবর্ণবেহার, গঙ্গাবাস, পানশীলা-ভালুকা, মাজিদা, দেপাড়া, সদর কৃষ্ণনগর, দোগাছি এবং দিগনগর।

সুবর্ণবেহার ঃ নবদ্বীপ মণ্ডলান্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত।

গঙ্গাবাস ঃ কৃষ্ণনগর-স্বরূপগঞ্জ পাকা রাস্তার ধারে আমঘাটা। এটি একটি স্টেশন। এই স্টেশনের আধ মাইল দুরে 'গঙ্গাবাস' গ্রাম। শহর-কৃষ্ণনগর থেকে ৫ মাইল দূরে এই গ্রাম। গ্রামটির নাম গঙ্গাবাস সম্ভবত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকেই হয়, কেননা কৃষ্ণচন্দ্র পরিণত বয়সে নিজের বাসের জন্যে এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। প্রাসাদের কোন চিহ্ন এখন আর নেই, কেবলমাত্র ভগ্ন প্রাচীরের কিছু ইষ্টকচিহ্ন ছাড়া। অবশ্য প্রাসাদটি খুব একটা বিস্তৃত ছিল বলে মনে হয় না। এর ঠিক পশ্চিমদিক দিয়ে তখন প্রবাহিত হত অলকানন্দা। এই অলকানন্দাতীরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৬৯৮ শকাব্দ বা ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে হরিহরের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য বলতে কিছুই নেই, আর ভাস্কর্য তো নেই-ই। মন্দিরটি একটি চাঁদনির ওপর দুটি খাড়াই চারচালা শিখর বা রত্ন। হরি ও হরের অভেদ প্রতিপাদনের জন্যে কৃষ্ণচন্দ্র এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে শিলালিপিটি থেকে জানা যায়। এই মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং অবস্থা খুবই শোচনীয়। মন্দিরাভ্যন্তরে একই বিগ্রহে হরিহরেব মূর্তি প্রকাশিত। মূর্তিটির একহাতে চক্র ও অন্যহাতে ত্রিশূল। এছাড়া আরও অনেক শিলাময় বিগ্রহ এই মন্দিরে আছে। শিলালিপিটি দক্ষিণদিকে মৃত্তিকাসংলগ্ন পাদপীঠে ন্যস্ত। লিপিটি উদ্ধৃত করা হলঃ

> গঙ্গাবাসে বিধিশ্রুত্যনুগতসুকৃতক্ষৌণিপালে শকেঽস্মিন্
> শ্রীযুক্তো বাজপেয়ী ভুবি বিদিতমহারাজরাজেন্দ্রদেবঃ।
> ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারিত্রিপুরহরভিদামজ্ঞাতাং পামরাণাং
> অদ্বৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহরমুময়া স্থাপয়োম্লনয়া চ ॥

শ্লোকটিব ভাবার্থ এই, 'যে সব অজ্ঞান শিব ও বিষ্ণুকে পৃথক পৃথক মনে করে পরস্পরকে বিদ্বেষ করে, সে সকল ব্যক্তিদের ভ্রান্তি দূর করার জন্যে ভুবনবিখ্যাত বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৬৯৮ শকে গঙ্গাবাসে এই মন্দির ও সেখানে হরিহরের ব্রহ্মরূপ অদ্বৈতমূর্তি লক্ষ্মী ও উমার সঙ্গে স্থাপন করলেন।

হরিহরের মন্দিরটির পূর্বপাশে আর একটি ভগ্ন মন্দির। এটিতে বর্তমানে মহাবীর, গণেশ ও শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ঠিক পাশেই এই মন্দিরটির ভগ্ন অংশ দেখা যায়। এখানকার মন্দিরগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। পরিত্যক্ত না হলেও অচিরে এই মন্দির দুটি ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি।

বিগত বিশ শতকের শুরুতে মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্রের সময়ে 'গঙ্গাবাসে'র ভগ্নপ্রাসাদের স্তূপ থেকে চারটি কামান পাওয়া গিয়েছিল বলে জানা যায়। কামানগুলি কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে রক্ষিত আছে। গঙ্গাবাসের প্রাসাদ সুবর্ণবিহারের প্রাচীন ইঁট ও পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছিল বলে জানা যায়। এখানে কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক আরও ছয়টি দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দেপাড়া ঃ কৃষ্ণনগর রোড স্টেশন থেকে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দেপাড়া বা দেবপল্লী

একটি পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থান। এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি বলতে নৃসিংহদেবের প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমান মন্দিরটি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা ক্ষিতীশচন্দ্র সংস্কার করেন। নৃসিংহদেবের মূর্তিটি খুবই প্রাচীন বলে অনেকের ধারণা। একটি বৃহৎ কষ্টিপাথরে মূর্তিটি খোদিত। এটির উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট। পদতলে প্রহ্লাদ ও অঙ্কে হিরণ্যকশিপু অবস্থিত। মূর্তিটির বেশ কিছুস্থানে অঙ্গহানি হয়েছে। নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপুবধদৃশ্য ভাস্কর বেশ ভালোভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। ভক্তিমান প্রহ্লাদের অবনতমস্তক প্রসিদ্ধ পৌরাণিক কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অঙ্গহানির কারণ হিসেবে একটি জনশ্রুতি হল, এই মূর্তিটির অঙ্গে একটি পরশপাথব ছিল, কোন সময় এক লোভী সন্ন্যাসী তা অপহরণের জন্যে অঙ্গহানি ঘটিয়েছে। নৃসিংহদেবের প্রাচীন মন্দিরটি অবস্থিত ছিল জঙ্গলাবৃত এক উচ্চ ভূখণ্ডের একাংশে। আগে এখানে কারুকার্যযুক্ত বহু প্রাচীন ইঁট ও পাথর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখা যেত। কোন্ সময় বা কে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা জানা আজ আর সম্ভব নয়। তবে কেউ কেউ অনুমান করেন, বৌদ্ধধর্মের অবনতির পর যখন হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হচ্ছিল শূর ও সেন রাজাদের আমলে এবং বহু বৌদ্ধমূর্তি হিন্দুমূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল, সেই সময় সম্ভবত এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৪] নৃসিংহদেবের প্রাচীন মন্দিরটি সম্পর্কে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় তাঁর 'নবদ্বীপ-মহিমা'য় (১৮৯১) বলেছেন ঃ

'পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এই দেবতার বিশাল মন্দির ছিল, সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দেবমন্দির বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। প্রাঙ্গণটি প্রায় কুড়ি বিঘা পরিমিত হইবে। প্রাঙ্গণের সর্বত্র কুচা পাথর ও ভগ্ন ইঁটে পূর্ণ।... ইষ্টকের যে বৃহৎ স্তূপ আছে, তাহার মধ্যে নানাজাতীয় ইষ্টক দেখা যায়। কতকগুলি অতি প্রাচীন ও কারুকার্যখচিত।'

অবশ্য এসব ধ্বংসাবশেষ এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। প্রায় দুশ বছর আগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার ও বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন বলে জানা যায়। কথিত আছে, মহাপ্রভু পরিক্রমায় বের হয়ে এখানে নৃসিংহমূর্তিদর্শনে এসেছিলেন। সেজন্য প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে এখানে মহোৎসব হয়।

নৃসিংহদেবের মন্দিরটির পাশেই 'চামটার বিল'। এই বিলটি আগে বিরাট ছিল। বেশ কিছুকাল আগে বিলের মধ্য থেকে ব্রোঞ্জনির্মিত সুন্দর একটি উগ্রতারামূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি খুব ছোট হলেও এর শিল্পোৎকর্ষ অদ্ভুত বলে শোনা যায়। উগ্রতারা বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লিখিত এক দেবী। এঁর অপর নাম চামুণ্ডা। এটিও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে সেন আমলে তৈরি বলে অনুমিত। মূর্তিটি অবশ্য উত্তোলন করার দোষে একটু অঙ্গহীন। নৃসিংহদেবের মন্দিরটির দেওয়ালে নতুন লিপিটি হল ঃ

> শ্রী শ্রীনৃসিংহদেবো জয়তি।
> নাগেন্দুগজভূশাকে শ্রীনৃসিংহপদাশ্রিতঃ।
> শ্রীক্ষিতীশো নৃসিংহস্য সংশ্চক্রে মন্দিরং নৃপঃ।

'শকাব্দ ১৮১৮ Repaired in 1896' শ্লোকটির অর্থ হ'ল, 'শ্রীশ্রী নৃসিংহদেবের জয় হ'ক। নৃসিংহদেবের পদাশ্রয়ী রাজা ক্ষিতীশ ১৮১৮ শকাব্দে নৃসিংহদেবের এই মন্দির সংস্কার করলেন।'

সদর কৃষ্ণনগর ঃ নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরের ইতিহাস শুরু হয়েছে রাঘবের রাজত্বকাল থেকে, যখন তিনি মাটিয়ারি (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) থেকে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন রেউই-এ।

রাঘবের পুত্র রাজা রুদ্র এই রেউইয়ের নাম পরিবর্তন করে 'কৃষ্ণনগর' নাম রাখেন। রেউইয়ের চারদিক তিনি পরিখাবেষ্টিত করেন। যা '*শহর পানারগড়*' নামে পরিচিত ছিল। এখানে তিনি বিরাট প্রাসাদ স্থাপন করেন। সে সময় নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও উলায় পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণীর বাসস্থান ছিল। রাঘব এঁদের সঙ্গলাভের জন্য রেউই-এ তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাঁর রাজ্যকাল ১৬১৮-১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ। তাই কৃষ্ণনগরের অভ্যুদয় সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে ধরা যায়। রাঘব বা তৎপুত্র রুদ্রের কোন কীর্তি আজ আর এখানে চোখে পড়ে না। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত হলেও কালক্রমে এর ওপর অনেক হাত পড়েছে। রাজবাড়ির বিরাট পূজামণ্ডপের কিছু অংশ কৃষ্ণচন্দ্র নির্মিত বলে জানা যায়। অপর কিছু অংশে পরবর্তী রাজাদের হস্তক্ষেপও পড়েছে। রাজবাড়ির এই বৃহৎ পূজামণ্ডপে '*পঙ্কে*'র বিচিত্র কারুকার্যগুলি প্রশংসার দাবী রাখে। তাছাড়া মণ্ডপের খিলান, থাম প্রভৃতি সব কিছুতেই রাজকীয় ছাপ লক্ষ্য করা যায়। মূল পূজার স্থানটি অনেকখানি প্রশস্ত এবং তার পেছনে ও সামনে পর পর কয়েকটি দেউড়ি বা অলিন্দ আছে। বিভিন্ন পূজাপার্বণ উপলক্ষ্যে যাত্রা, গান, কথকতা প্রভৃতির জন্যে মূল পূজাস্থানটির সম্মুখস্থ প্রশস্ত অঙ্গনটি নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এই বিরাট পূজামণ্ডপের অবস্থা খুবই শোচনীয়। এই ধরনের বৃহৎ মণ্ডপ পশ্চিমবাঙলায় খুব কমই আছে মনে হয়। রাজবাড়ির প্রবেশ ও তোরণপথ- দুটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্রের সময় এগুলির আবার সংস্কার করা হয়েছিল। তোরণপথের স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য একটু অদ্ভুত রকমের। মুসলিম স্থাপত্যের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুব বেশি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র- প্রতিষ্ঠিত প্রায় সব ইমারতেই এই ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এ যেন কৃষ্ণচন্দ্রেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জীবনরঙ্গমঞ্চে তিনি যেন দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করতেন। বাইরে তিনি ছিলেন অতিমাত্র উদার- দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। তাই রাজসভায় আগ্রা ও দিল্লীর মুসলমান ও রাজপুতদের আদবকায়দা ও কলার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না, কিন্তু ভেতরে তিনি ছিলেন অতিমাত্র গোঁড়া হিন্দু।[১৫] রাজবাড়ির কিছু কিছু স্থাপত্যে তাঁর এই উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থাও যে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল, সে যুগের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বিষয় চিন্তা করলে একথা সহজেই মনে হবে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি কৃষ্ণনগরে চোখে পড়ে না, অবশ্য প্রাচীন রাজবাড়ির কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ ছাড়া।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির অঙ্গনে দু-একটি প্রাচীন কামান দেখা যায়। কথিত আছে, কৃষ্ণচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত এই কামানগুলি লর্ড ক্লাইভের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন। ঐ কামানগুলি আজও কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে রক্ষিত আছে।[১৬] নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র ক্লাইভের সুপারিশে দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজরাজেন্দ্রবাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম একজন বিখ্যাত ধনুর্ধর ছিলেন। তিনি সাধারণের কাছে 'রঘুবীর' নামে পরিচিত ছিলেন। বারাকোটীর যুদ্ধে মুর্শিদকুলি খাঁনের পক্ষ অবলম্বন করে রাজশাহির বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণের সেনাপতি আলি মহম্মদকে তীরবিদ্ধ করে তিনি হত্যা করেন। তাঁর ব্যবহৃত কোন কোন কামানও কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে থাকা সম্ভব। 'গঙ্গাবাস' থেকে অনেকগুলি কামান মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রাজবাড়িতে এনেছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্র একজন তান্ত্রিকসাধক ছিলেন। রাজ্যলাভ করার

কয়েকবছর পরেই তিনি কৃষ্ণনগরে (বর্তমানে 'আনন্দময়ীতলা' নামক স্থানে) বিশাল একটি মন্দির নির্মাণ করে (মন্দিরটি একরত্ন শ্রেণীর) আনন্দময়ী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটির দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে 'আনন্দময়' নামক শিবের একটি মন্দিরও তিনি এইসঙ্গে স্থাপন করেন। আনন্দময়ীর মন্দির দক্ষিণমুখী। একটি বৃহৎ চাঁদনির ওপর 'রত্ন'টি 'চারচালা'। মন্দিরটি ইঁটের তৈরি, তবে কোন 'টেরাকোটা' নেই। '*পঙ্কে*'র কিছু কিছু কাজ অবশ্য আছে, লতাপাতার কাজই বেশি। মন্দিরের ভেতর শয়ান মহাকালের ওপর আসীনা দেবী আনন্দময়ী, অবশ্য দেবী নবদ্বীপ-পোড়ামাতলার ভবতারিণীর ন্যায় ভৈরবীমূর্তি নন। দেবীর মুখ দক্ষিণদিকে। এখানে পাথরের আরও অনেক দেব-দেবী মূর্তি আছে। মূর্তিগুলি বোধ হয় একই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল। মন্দিরটির পাদপীঠ সংলগ্ন প্রস্তরখোদিত সংস্কৃত লিপিটি এখন বেশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এর আর পাঠোদ্ধার করা যাবে কিনা সন্দেহ। লিপিটি এই—

> বেদাঙ্গেক্ষণগোত্রকৈরবকুলাধীপে শকে শ্রীযুতে
> কৈলাসপ্রতিরূপকৃষ্ণনগরে শ্রীমদ্‌গিরীশোৎসবে।
> নাম্নানন্দময়ী শুভ্যেহনি মহামায়া মহাকালভৃৎ
> রাজ্ঞা শ্রীলগিরীশচন্দ্রধরণীপালেন সংস্থাপিতা।।

এ শ্লোকটির ভাবার্থ হল, 'কৈলাসতুল্য কৃষ্ণনগরে শ্রীমান গিরীশের শুভ উৎসব দিনে ১৭২৬ শকাব্দে মহাকালধারিণী আনন্দময়ী নামে দেবী মহামায়াকে রাজা গিরীশচন্দ্র স্থাপন করলেন'। এখানে 'গিরীশোৎসবে' কথাটির অর্থ মহারাজ গিরীশচন্দ্রের অভিষেকোৎসব বা অন্যকিছু বোঝা যায় না। ১৭২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে গিরীশচন্দ্রের অভিষেকোৎসবও হতে পারে। এই মন্দিরটির ঠিক পূর্বপাশে ছোট ছোট দুটি 'চারচালা' মন্দির দেখা যায়। মন্দিরগুলির কোনখানেই অলংকরণ নেই। এই মন্দিরদুটির চাল খাড়াই পিরামিডাকৃতি। এই ধরনের মন্দির নদীয়ায় বেশ কিছু দেখা যায়। প্রতিটিতেই বিভিন্ন দেবদেবী আছেন। গিরীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপ 'পোড়ামাতলা'র দুটি মন্দিরের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই মন্দিরগুলি অবশ্য আনন্দময়ীর বেশ পরবর্তী।

আনন্দময়ীতলার অল্প দক্ষিণে পাকারাস্তার ঠিক ওপরেই একটি মন্দির দেখা যায়। এটি 'চারচালা'। এই মন্দিরটিও একটি ঠাকুরবাড়ির অন্তর্ভুক্ত। পূর্বমুখী মন্দিরটির ঠিক পাশেই একটি জীর্ণ দুর্গামণ্ডপ। মণ্ডপে এখনও দুর্গাপূজা হয়। 'চারচালা' শিবমন্দিরে পোড়ামাটির দু-একটি ফুল ছাড়া আর কোন অলংকরণ নেই। খিলানটি '*দরুণ*' শ্রেণীর। অবশ্য প্রবেশপথের খিলানের ওপর কয়েকটি প্রতীক 'আটচালা' মন্দির অঙ্কিত। প্রমাণযোগ্য কোন লিপির অভাবে মন্দিরটির যথাযথ প্রতিষ্ঠাকালেও প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায়নি। জানা যায়, আজ থেকে প্রায় দুশ-বছর আগে জহরলাল দত্ত নামে এক জমিদার এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আকার ও গঠন দেখে অবশ্য এটিকে আঠার শতকের শেষাশেষি ফেলা যেতে পারে। শক্তিনগরের 'চৌধুরীপাড়া'য় অপূর্ব কারুকার্যযুক্ত একটি বিধ্বস্ত মন্দির দেখা যায়। এটি শিবের মন্দির ছিল। এই মন্দিরটির পোড়ামাটির মূর্তি ও নকশাকাজের সঙ্গে দোগাছির বিধ্বস্ত মন্দিরটির সুন্দর মিল আছে।

দোগাছি ঃ কৃষ্ণনগরের প্রায় দুমাইল দক্ষিণে অবস্থিত দোগাছিগ্রামটি একটি পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ গ্রাম। কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত এই গ্রামটি কৃষ্ণনগরের পাশে নিতান্ত অবহেলিত হয়ে আজও অনেকের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। শক্তিনগর-হাসপাতালের চৌরাস্তা থেকে যে পথটি দক্ষিণদিকে

গেছে, সেই পথে প্রথমে বারুইহুদা গ্রাম পেরিয়ে আরও কিছু দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। বারুইহুদা গ্রামেও একটি অতি সাধারণ 'চারচালা' মন্দির রাস্তার পাশেই দেখা যায়। দোগাছি গ্রামের কিছু প্রাচীন সৌধের ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করলে এই স্থানটির এককালে সমৃদ্ধির কথা বুঝতে পারা যায়। এ স্থানের আকর্ষণীয় পুরাকীর্তিটি প্রচুর পোড়ামাটির কাজ করা একটি বিধ্বস্ত মন্দির। মন্দিরটি আর কিছুদিন পরেই ভূমিসাৎ হয়ে যাবে বলে মনে হয়। পুরাকীর্তি বিভাগ এই মন্দিরটির কোন সন্ধান জানেন কিনা বলা কঠিন। অবশ্য, এখন আর এটিকে রক্ষা করা কোনমতেই সম্ভবপর নয়। মন্দিরটির অগ্রভাগ বা শিখরদেশ ভগ্ন, তবে আকার দেখে এটিকে নদীয়া জেলার সেকালে বহুল প্রচলিত 'চারচালা'-শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। মন্দিরটির দেওয়ালগুলি এখন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এটি যে এককালে সুউচ্চ ও সুদৃশ্য মন্দির ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মন্দিরটির দুদিকে দুটি প্রবেশদ্বার। সামনের দিকে পোড়ামাটির ফুল ও সূক্ষ্ম নকশার কাজ প্রচুর পরিমাণে অঙ্কিত রয়েছে। এর অপর আর একদিকে এই ধরনের প্রচুর কাজের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। দু-একটি পোড়ামাটির মূর্তিও সেখানে আছে। এই দিকের (সম্ভবত উত্তরদিক) খিলানের ঠিক ওপরে চোদ্দটি প্রতীক 'আটচালা' মন্দির, মধ্যে শিবলিঙ্গ অঙ্কিত। খিলানটি 'দরুণ' শ্রেণীর (গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদের খিলানের অনুরূপ)। এ ধরনের খিলান নদীয়া জেলার প্রায় সব প্রাচীন মন্দিরেই অনুকৃত হয়েছে। অবশ্য, পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রাচীন মন্দিরে এ ধরনের খিলান লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটির সমুখদিকের বামে-ডাইনে উপরে-নিচে খোপে খোপে স্থাপিত টালিসমূহে পোড়ামাটির বিভিন্ন মূর্তি দেখা যায়। পাদপীঠের ঠিক ওপরেই ভিত্তিগাত্রে হংসপংক্তি, যা চিরাচরিত রীতিরূপে বাঙলার অনেক মন্দিরে অঙ্কিত দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহে পশুপক্ষী ও হংসপংক্তির সুদীর্ঘ প্যানেল ভিত্তিবেদির ঠিক ওপরেই সন্নিবেশিত দেখা যায়। দোগাছির এই মন্দিরটির বাম ও ডান দুপাশে বারোটি করে টেরাকোটা। কার্নিশের ঠিক নিচেও কয়েকটি টেরাকোটা আছে। বামদিকে একেবারে নিচের দুটি টালিতে 'মিথুনদৃশ্য' (এর পারিভাষিক সংস্কৃত শব্দ হল 'মণি')। তার কিছু ওপবে কৃষ্ণকর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণদৃশ্য। ডাইনে মৎস্যাবতারের একটি ক্ষুদ্র ভাস্কর্য আছে।

কিন্তু 'টেরাকোটা'গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল কয়েকটি যোদ্ধার মূর্তি। বেশভূষা লক্ষ্য করে এগুলিকে মোগলসেনা বলে অনুমান করা যেতে পারে। এ ধরনের সবসুদ্ধ চোদ্দটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি এ মন্দিরে দেখা যায়। মূর্তিগুলির বেশভূষায় আলখাল্লা ও মুখমণ্ডল শ্মশ্রুযুক্ত। এককালে এদের দোর্দণ্ডপ্রতাপের প্রভাব বাঙলার অনেক মন্দিরভাস্কর্যে যে পড়েছে, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সম্ভবত ঔরঙ্গজেব ভারতের সম্রাট থাকাকালে রাজা রাঘবের শাসনকালে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। রাজা রাঘবই হয়ত এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দিগনগরের রাঘবেশ্বর মন্দিরের টেরাকোটা ও নকশা-কাজের সঙ্গে এই মন্দিরের কাজের বেশ মিল আছে। তাছাড়া মুঘলযোদ্ধার মূর্তিও রাঘবেশ্বরমন্দিরে লক্ষ্য করা যায়— শেষেরটিতে আবার প্রতীক মন্দিরগুলিতে দণ্ডায়মান মুঘলসেনার মূর্তি অঙ্কিত, যা একদিক থেকে অভিনব। অবশ্য, এগুলি রথের ওপর মুঘলসেনার অবস্থিতিও সূচিত করে। এই মন্দিরের স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য ও ইঁটের গড়নের সাথে রাঘবেশ্বরমন্দিরের মিল আছে। দোগাছির এই মন্দিরের সঙ্গে শক্তিনগর-চৌধুরীপাড়ার একটি বিধ্বস্ত মন্দিরের অদ্ভুত মিল আছে।

দোগাছি গ্রামটি একটি উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু আবিষ্কারের দ্বারা গৌরবান্বিত। ১৯৫৮

খ্রিস্টাব্দে এই গ্রামের একটি গাছের তলভাগ খনন করে বিরাট একটি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। খননের সময়ে হোক বা যেভাবেই হোক, মূর্তিটি বর্তমানে ভগ্ন অবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ মিউজিয়মের' একতলায় রক্ষিত আছে। ব্ল্যাক বেসল্টের সূচিক্কণ পাথরে খোদিত মূর্তিটিকে মিউজিয়মের তদানীন্তন অধ্যক্ষ কপিলমুনির বলে অনুমান করেছিলেন। মূর্তিটির ধ্যানগম্ভীর মুখমণ্ডলে অপূর্ব দিব্যানুভূতি ফুটে উঠেছে। গাল ও চিবুক শ্মশ্রুযুক্ত এবং মস্তক জটাজুটমণ্ডিত। মূর্তিটির দুপাশে দুটি দণ্ডায়মান পার্শ্বচর। এটি কৃষ্ণনগর পৌরসভার পূর্বতন সহ-সভাপতি মোহনকালী বিশ্বাস আশুতোষ মিউজিয়মকে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

দোগাছি গ্রামে পূর্বোক্ত বিধ্বস্ত মন্দিরের অদূরে একটি প্রাচীন 'দালান' মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত এটি ঠাকুর বলরামদাসের *শ্রীপাট* ছিল। জানা যায়, নিত্যানন্দ এখানে এসেছিলেন। পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থান হিসেবে তাই এই গ্রামটি চিহ্নিত হবার যোগ্য।

দিগনগর ঃ কৃষ্ণনগর-কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত এই গ্রামটির প্রাচীন নাম ছিল দীর্ঘিকানগর। দিগনগর নাম এর থেকে হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। কৃষ্ণনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাঘব মাটিয়ারি থেকে রেউই-এ (বর্তমান নাম কৃষ্ণনগর) রাজধানী স্থাপন করার পর এই অঞ্চলের পথঘাট, জলাশয় প্রভৃতি পূর্তকর্মের খুব উন্নতি করেন। তিনিই কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুরের সড়ক তৈরি করেছিলেন এবং এই সড়কের (যা এখন দিগনগর নামে চিহ্নিত) ধারে একটি বিশাল দীঘি খনন করিয়েছিলেন। সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি সে সময় কুড়ি হাজার টাকা খরচ করে এই দীঘি কাটিয়েছিলেন। এই দীঘিটি লম্বায় ১৪৫২ হাত ও চওড়ায় ৪২০ হাত।[১৭] রাজা রাঘব এই দীঘির পূর্বদিকে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করে কাছাকাছি দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরদুটির মধ্যে একটি বর্তমানে প্রায়-বিধ্বস্ত এবং অপরটি মোটামুটি এখনও ভালো অবস্থায় আছে। এই মন্দিরটি মন্দিরদেবতা রাঘবেশ্বরের নামে পরিচিত। বাংলা 'চারচালা'-পদ্ধতিতে গঠিত এবং দক্ষিণমুখী এই মন্দিরে ব্ল্যাক বেসল্টের তৈরি রাঘবেশ্বর শিবলিঙ্গ পূজিত হন। মন্দিরটির লিপি সৌভাগ্যের বিষয় এখনও বর্তমান আছে, যা থেকে প্রতিষ্ঠাকাল ও দীঘিখননের বিষয় জানা যায়। এই লিপিফলকটি সামনের দিকে কার্নিশের নিচে স্থাপিত। নিচ থেকে এটির পাঠোদ্ধার করা একপ্রকার অসম্ভব। ফলকটির চারপাশের চুন-বালি বেশ আলগা হয়ে গেছে এবং যথেষ্ট দৃষ্টি না দিলে পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। পুরাতত্ত্ববিভাগ এ মন্দিরটিকে এখনও সংরক্ষিত পুরাকীর্তিরূপে ঘোষণা করেননি বা মন্দিরসংস্কারেরও কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না (১৯৭২)। কিন্তু এটি খ্রি. সতের শতকে নির্মিত উৎকৃষ্ট টেরাকোটায় সমৃদ্ধ যে একটি পুরাকীর্তি, তাতে সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে অনেক সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তির অঙ্গহানি ঘটেছে দেখা যায়। তার ফলে বহু উৎকৃষ্ট অলঙ্করণ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। লিপিটি যথাযথ উদ্ধৃত করা হল ঃ

> ১৫৯১ ।। শাকে সোমনবেষুচন্দ্রগণিতে পুণ্যৈক
> রত্নাকরো ধীরশ্রীযুতরাঘবো দ্বিজমণি
> র্ভূমীভুজামগ্রণীঃ।। নির্ম্মায় স্ফুরদূর্ম্মিনির্ম্মল
> জলপ্রদ্যোতিনীন্দীঘিকান্তত্তীবে
> কৃতরম্যবেশ্মনি শিবন্দেবং সমস্থাপয়ত্।।

ঠিক এইভাবেই লিপিফলকে সারিগুলি সাজানো দেখা যায়। 'র' অক্ষরগুলি 'ব'-এর

মাঝখান কাটা অবস্থায় উৎকীর্ণ। সংস্কৃত শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত এই শ্লোকটির প্রতি চরণে উনিশটি অক্ষর আছে। শ্লোকটির অর্থ হল, ১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে) পবিত্ররত্নাকরসদৃশ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভূমিপালদের প্রধান ও ধীরস্বভাব শ্রীযুত রাঘব স্বচ্ছতরঙ্গমালা ও নির্মল জলের দ্বারা সমুজ্জ্বল দীঘি খনন করে তার তীরে সুরম্য মন্দিরে শিবকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

টেরাকোটা বা পোড়ামাটিমূর্তির সূক্ষ্ম কাজ এ মন্দিরের বিশেষত্ব। উল্লেখযোগ্য 'টেরাকোটা'গুলি হল, ১. পাদপীঠসংলগ্ন মন্দিরগাত্রের একটি প্যানেলে জমিদার বা রাজার শিবিকারোহণে যাত্রা এবং সামনে-পিছনে ঘোড়সওয়ার ও লোকলস্কর, ২. একটি 'মিথুনদৃশ্য' (মণি)— মন্দিরগাত্রে এ ধরনের সবশুদ্ধ তিনটি টালি দেখা যায় ৩. কদম্ববৃক্ষে বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের বস্ত্রহরণদৃশ্য— যা বহু মন্দিরেই আবশ্যিকভাবে স্থান পেয়েছে ৪. খোল-করতাল সহযোগে হরিনাম-সংকীর্তন ৫. রাধাকৃষ্ণের বহু মূর্তি ৬. হংসপংক্তি ৭. বাঈজীনাচ ও জমিদারকে মদ্য পরিবেশন ৮. প্রবেশপথের খিলানের ওপরের চারপাশে 'চারচালা' *প্রতীক*শিবালয় ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ ৯. মন্দিরের দিকে একটি ফলকে ডান পায়ের উপর বাঁ পা রেখে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মানা এক নগ্ননারীমূর্তি, তার বাঁ-পাশে একটি হরিণ শিশু। এটি কোন গোপীর লীলাবিলাস মনে হয়। কিন্তু এ মন্দিরে টেরাকোটাগুলির মধ্যে লক্ষণীয় হল পুবদিকের দেওয়ালে রুদ্ধ দ্বারপথের খিলানের ওপরে রথ বা *প্রতীক*মন্দিরের মধ্যে দণ্ডায়মান মুসলমান যোদ্ধা। এই মন্দিরটির আরেকটি বিশেষত্ব হল, উৎকৃষ্ট প্রচুর নকাশি কাজ, যা নদীয়ার খুব কম মন্দিরেই মেলে। পোড়ামাটির মূর্তিগুলি সবই পাশ থেকে দেখানো রয়েছে এবং এগুলির গাত্রে রেখার সূক্ষ্ম কাজ এই শতকে নির্মিত ভাস্কর্যকলার বৈশিষ্ট্য বহন করে। একটি ফলকে গোষ্ঠবিহারে বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের ছবিটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত রয়েছে। ছোট ছোট ফলক, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা যা শিল্পকলার উৎকর্ষ সূচিত করে, এই মন্দিরে তার বহু নমুনা মেলে। মন্দিরটির দক্ষিণ ও পূর্বদিকে 'টেরাকোটা'গুলি সন্নিবেশিত।

রাঘবেশ্বরের এই মন্দিরটির ঠিক পূর্বদিকে আরেকটি পশ্চিমমুখী ভগ্ন মন্দির দেখা যায় এবং এতে 'টেরাকোটা'র কাজও যে বেশ ছিল, তা বোঝা যায়। মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। কোন লিপিও এখানে নেই। এটি রাঘবের বা অন্য কারও প্রতিষ্ঠিত কিনা জানার উপায় নেই। রাঘবেশ্বর-মন্দিরে উক্ত লিপিফলকে রাঘবপ্রতিষ্ঠিত একটিমাত্র মন্দিরেরই উল্লেখ করা হয়েছে। মহাকবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' রাঘবকর্তৃক দীঘিখনন ও শিবপ্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে এবং আরও বলা হয়েছে যে, তিনি দেগাঁয়ের কুমার দেপালের রাজ্য ও ধনসম্পদ লাভ করেছিলেন।[১৮]

পূর্বাঞ্চল ঃ

পুরাকীর্তির দিক থেকে নদীয়া জেলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এই অঞ্চলেও উল্লেখ করার মতো কয়েকটি পুরাকীর্তি এখনও বর্তমান আছে। এই পূর্বাঞ্চলটিকে কৃষ্ণগঞ্জ ও চাপড়া থানার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পূর্বাঞ্চলের পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থানগুলির সঙ্গে কৃষ্ণনগরের যোগাযোগ-ব্যবস্থার সুবিধা আছে। স্থানগুলির প্রায় সবই কৃষ্ণগঞ্জ থানার এক্তিয়ারভুক্ত মাটিয়ারি ও 'শিবনিবাস' গ্রামে অবস্থিত। চাপড়া থানায় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি বলতে তেমন কিছু নেই, একমাত্র সেখানে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত গীর্জা ছাড়া।

মাটিয়ারি ঃ কৃষ্ণনগর থেকে পূর্বে মাজদিয়া। মাজদিয়া-রানাঘাট-গেদে রেলপথের অন্যতম একটি স্টেশন। মাজদিয়া থেকে উত্তর-পূর্বে পাকারাস্তায় মাটিয়ারিতে পৌঁছানো যায়। এই গ্রামটি

বানপুর স্টেশনের কিছু পূর্বদিকে অবস্থিত। অবশ্য রানাঘাট-গেদে লাইন দিয়ে একেবারে বানপুর স্টেশনে নেমে সেখান থেকে মাটিয়ারি যাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর থেকে বাসযোগেও এখানে আসা যায়।

মাটিয়ারি গ্রামটি বেশ প্রাচীন। নদীয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার বাগোয়ান থেকে এই গ্রামে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। 'শূর'বংশীয় রাজা আদিশূর কর্তৃক বঙ্গে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষিতীশ ছিলেন অন্যতম। ভবানন্দ এই ক্ষিতীশেরই অধস্তন পুরুষ। যশোররাজ প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে সাহায্য করায় মহারাজ মানসিংহ ভবানন্দের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীরকে দিয়ে ভবানন্দকে ১০১৫ হিজরিতে (১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ) নদীয়া, মহৎপুর, লেপা, সুলতানপুর প্রভৃতি চোদ্দটি পরগনার জমিদারী প্রদান করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ভবানন্দকে সম্মানসূচক 'মজুমদার' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ভবানন্দ এইভাবে সম্মানিত হয়ে মাটিয়ারিতে গড় ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সেই গড় ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আজও ঐ গ্রামে লক্ষ্য করা যায়। রাজপুরীর চারপাশ যে এককালে গভীর পরিখাবেষ্টিত ছিল, তা এখনও বোঝা যায়। রাজপুরী যে স্থানে ছিল সেই জায়গাটি এখন উঁচু ডাঙার মতো, অনেকখানি স্থান বিস্তৃত। এর উত্তরদিকে গভীর পরিখাচিহ্ন দেখা যায়। এখন সেটি রাস্তায় পরিণত হয়েছে। এই পরিখাটি মিলিত হয়েছে পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটি বিলের সঙ্গে। এটির নাম '*হাতিয়ারি বিল*'। নদীয়া জেলার অন্যান্য বিলের মতো এই বিলটিও লম্বা ও অনেক দূর বিস্তৃত। গড়ের উত্তরদিকে পরিখাসংলগ্ন প্রাচীরের পুরানো ইঁট এখনও মৃত্তিকাপ্রোথিত দেখা যায়। তাছাড়া, এখানে প্রাচীন একটি পাকা ঘাটের বা তোরণপথের মৃত্তিকাপ্রোথিত ইষ্টকচিহ্ন ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। গড়টির কোন কোন অংশ জঙ্গলাকীর্ণ, অবশ্য বেশিরভাগ অংশে কৃষিকার্যাদি হচ্ছে। বহু প্রাচীন ইঁটের ও পাথরের টুকরো এখানে ওখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। গড়ের পশ্চিমে হাতিয়ারি বিলের সন্নিহিত একটি পুরানো মজাপুকুর দেখা যায়। এটিও গড় নির্মাণকালের বলে অনেকের ধারণা। ভবানন্দের পুত্র গোপাল তস্য পুত্র রাঘব, রাঘবের পুত্র রুদ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণের রাজ্যকালে মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া-বরদা পরগনার রাজা শোভা সিংহের আক্রমণে (১৬৯৫ খ্রি.) বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের মৃত্যু হ'লে তাঁর পুত্র জগদ্রাম নারীবেশে কৃষ্ণনগরে রামকৃষ্ণের আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি (রামকৃষ্ণ) জগদ্রামকে মাটিয়ারির প্রাসাদে লুকিয়ে রাখেন। পরে জগদ্রাম সেখান থেকে ঢাকায় যান।

ভবানন্দের গড়বাড়িছাড়া মাটিয়ারিতে রুদ্ররায়-প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন মন্দির উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি বাংলা 'চারচালা' রীতিতে গঠিত। এটি রাজা রুদ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। মন্দিরে রুদ্রেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ পূজিত হন। অবশ্য রুদ্ররায় এটি ঠিক প্রতিষ্ঠা করেন কিনা তা জানার জন্যে প্রমাণযোগ্য কোন লিপি এ মন্দিরে নেই। স্থানীয় এক বৃদ্ধ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে এই মন্দিরের স্থানচ্যুত-লিপিফলকটি ছিল বলে জানা যায়। তিনি বলেন, সেই লিপিফলকে রাজা রুদ্রপ্রতিষ্ঠিত শিবের নাম রুদ্রেশ্বর বলে উল্লেখ ছিল। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি দিগনগরের রাঘবেশ্বর-মন্দিরের অনুরূপ। দক্ষিণদিকের দরজা ছাড়া আর কোন দরজা এখানে নেই। পূর্বদিকে দেওয়ালের উর্ধ্বদিকে লিপিটি ছিল বলে জানা যায়, সম্ভবত মন্দিরসংস্কারের সময় সেটি স্থানচ্যুত ও পরে বিনষ্ট হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। দিগনগরের রাঘবেশ্বর-মন্দিরের মতো অনেকটা হলেও এই মন্দিরের শিরোভাগে তিনটি চূড়া। বলাবাহুল্য, এই চূড়াগুলি কোন 'রত্ন' বা শিখর নয়,

কলস-আমলক-ত্রিশূল চক্রের সমষ্টি। মাঝের চূড়াটি পদ্মাকৃতি। মন্দিরের সামনের দিকে বামে ও ডাইনে ছোট ছোট কুলুঙ্গীতে সজ্জিত যথাক্রমে সাতটি ও ছয়টি টালিতে উৎকীর্ণ মুঘলসেনার মূর্তি। এদের সকলেরই পরনে আলখাল্লা। খিলানটি পূর্বকথিত 'দরুণ' শ্রেণীর। প্রবেশপথের দু-পাশে দুটি ছোট থাম, কতকটা মসজিদমিনারের মতো, যা নদীয়ার প্রাচীন মন্দিরগুলির প্রায় সবগুলিতেই দেখা যায়। প্রবেশপথের খিলানের ওপর বারটি 'প্রতীক' আটচালা মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ। এছাড়া, লতাপাতার প্রচুর নকশা এই মন্দিরে দেখা যায়। খিলানের ওপরের প্রস্থে এই সুন্দর নকশা-কাজগুলি ছাড়া পোড়ামাটির কোন মূর্তি নেই। অবশ্য, পাদপীঠের সংলগ্ন দেওয়ালের গায়ে পোড়ামাটির মূর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল একটি প্যানেলে যুদ্ধদৃশ্য, যোদ্ধাদের হস্তে পতাকা, হস্তী ও অশ্বে আরোহণরত যোদ্ধা, আরেকটি প্যানেলে গোপীদের বস্ত্রহরণদৃশ্য ও নৌকাবিলাস। লক্ষণীয়, এই প্যানেলগুলিব ওপরে রয়েছে হংসপংক্তির দৃশ্য (বীরনগরের জোড়বাংলা মন্দিরেও এই রীতি অনুসৃত)। ডাইনের দিকে পাদপীঠসংলগ্ন ভিত্তিতে কৃষ্ণলীলা, সাহেবের ব্যাঘ্রশিকার, হরিণশিকার এবং হরিণের প্রাণভয়ে পলায়ন প্রভৃতি দৃশ্য। এগুলি ছাড়া আর কোন টেরাকোটা এ মন্দিরে নেই। শিবলিঙ্গটি ব্ল্যাক বেসল্টে নির্মিত। মন্দিরটির পশ্চিমে একটি নাটমন্দির বা ভোগশালা ছিল বলে অনুমান করা যায়। মন্দিরের পাদপীঠ ও কিছু কিছু অংশের সংস্কার করা হয়েছে।

শিবনিবাস ঃ কৃষ্ণনগর মাজদিয়া রোডে 'মন্দিরঘাট' বাস স্টপেজের দক্ষিণে চূর্ণীখালের পাড়ে 'শিবনিবাস' গ্রাম। প্রাসাদ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই গ্রামটির এই নাম দিয়েছিলেন। জানা যায়, তিনি এই গ্রামে সবসুদ্ধ ১০৮টি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।[১৯] সেগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি এখন অবশিষ্ট আছে। এই মন্দির তিনটির প্রতিটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। এগুলির একটিতে রামসীতা ও বাকি দুটিতে শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। 'শিবনিবাসে'র এই মন্দিরগুলির চূড়া দূরে বাসরাস্তা থেকেও লক্ষ্য করা যায়। চূর্ণীর খাল পেবিয়ে প্রথম মন্দিরটি রামসীতার। এটিকে 'একরত্ন'শ্রেণীর বলা যায়। আংশিক দালান আকারের কোঠার ওপর একটি উচ্চ শিখর স্থাপিত, যা কতকটা বর্গক্ষেত্রাকার। শিখরটির ছাদ পিরামিডের ন্যায়। 'শিখর'টির সর্বমোট তিনটি খিলান 'গথিক'স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। নিচে দালানের পাঁচটি খিলানও এই শ্রেণীর। শিখরটির চারকোণে আরবীয় পদ্ধতিতে কাজ করা মন্দিরের ভেতরে কালো পাথরের তৈরি রামচন্দ্রের আসীন মূর্তি, সীতাদেবী পাশে দণ্ডায়মানা। রামচন্দ্রের মূর্তিটি গাম্ভীর্য-উৎপাদক। এগুলি ছাড়া এখানে কৃষ্ণ ও একটি কালীমূর্তিও আছে। মন্দিরটি ১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দালানটির ওপরের দেওয়ালে প্রোথিত শিলালিপিটি এই—

> দেবঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ ক্ষিতিপতিতিলকো ব্রহ্মরাজর্ষিবংশে
> যোৎসৌ ভুকল্পশাখী শ্রুতিবসুবসুধেশাংশকে তুল্যসংখ্যে।
> প্রেয়স্যাস্তন্মহিষ্যাঃ পরমকৃতিকৃতে জানকীলক্ষ্মণাভ্যাং
> প্রাসাদে প্রাদুরাসীৎ ত্রিজগদাধিপতি শ্রীযুতরামচন্দ্রঃ।।

সংস্কৃত 'স্রগ্ধরা' ছন্দে রচিত এই শ্লোকটির প্রতি চরণে একুশটি অক্ষর আছে। শ্লোকটির ভাবার্থ হল, ব্রাহ্মণরাজর্ষিবংশে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রদেব নামে এক শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। তাঁর প্রিয় মহিষীর এই সুন্দর সৌধে ১৬৮৪ শকাব্দে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত ত্রিভুবনাধিপতি রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই মন্দিরের একাংশে রক্ষিত একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি এখানকার এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মূর্তিটি যে বেশ প্রাচীন তা বোঝা যায়। সম্ভবত এই মূর্তিটি অন্য কোন স্থান থেকে এনে

রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় মন্দিরটি রাজ্ঞীশ্বর নামক শিবের। এটি বাংলা 'চারচালা'-শ্রেণীর হলেও উচ্চতা ও গঠনে কৃষ্ণচন্দ্রীয় স্থাপত্যের পরিচয় বহন করে। শিবলিঙ্গটির উচ্চতা প্রায় ৭১/২ ফুট। বেদিতে দু'টি লম্বা সারির খোদিত একটি লিপিও দেখা যায়। লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হল ঃ '*যঃ শ্রীমানধিগত্য রাজতি মহারাজাধিরাজেন্দ্রতাং লক্ষ্মীস্তন্মহিষী হরেরিব মহারাজ্ঞীতি সংকীর্ত্তিতা। / তত্সংস্থাপিত এব দীব্যতি মহারাজ্ঞীশ্বরোৎয়ং শিবঃ খ্যাতঃ স্যাদ্গিরিশস্তদীশ্বরতয়া ভক্ত্যা শ্রিয়ৈ স্থাপ্যতে।*' প্রতিষ্ঠাকালের লিপিফলকটি প্রোথিত রয়েছে পাদপীঠের পুবদিকের দেওয়ালের একেবারে নিচে মাটির কাছাকাছি। লিপিটি যথাযথ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

১৬৮৪
যঃ সাক্ষাৎকৃতশৈবমূর্ত্তিবসুধেশানাংশকে সম্ভবাত্
সংখ্যাতঃ ক্ষিতিদেবরাজপদভাক্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ প্রভুঃ।
তস্য ক্ষৌণিপতে র্দ্বিতীয়মহিষী মূর্ত্তেব লক্ষ্মীঃ স্বয়ং
প্রাসাদপ্রবরে প্রসাদসুমুখং শম্ভুং সমস্থাপয়ত্।।

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় মহিষী স্বয়ং যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মী ছিলেন। তিনি এই উৎকৃষ্ট হর্ম্যে প্রসন্নবদন শিবকে ১৬৮৪ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শিবাংশে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর দেবরাজপদলাভ করেছিলেন।' শ্লোকটি সংস্কৃত শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। অতএব এটিও ১৬৮৪ শকাব্দ বা ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।

তৃতীয় মন্দিরটি এখানকার প্রসিদ্ধ বুড়োশিবের। এই শিবের প্রকৃত নাম রাজরাজেশ্বর। এখানকার তিনটি মন্দিরের মধ্যে এটি প্রাচীনতম। ১৬৭৬ শকাব্দ বা ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়। শিলালিপিটি দক্ষিণাংশের দেওয়ালের বেশ উচ্চে স্থাপিত। সংস্কৃত শ্লোকটি এই ঃ

যো জাতঃ খলু ভারতে সুরতরুর্জৈষ্টাদিসী শাংশকে
সেনানীমুখবাজিরাজবিলসৎ সংখ্যাবতীদম্পুরে।
কৃত্বা মন্দিরমিন্দুচুম্বিশিখরং ভূপালচূড়ামণিঃ
পৌত্রঃ শ্রীযুতকৃষ্ণচন্দ্রনৃপতিঃ শম্ভুং সমস্থাপয়ত্।।

'ইন্দুচুম্বিশিখরযুক্ত মন্দির নির্মাণ করে নৃপশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র এখানে শম্ভুকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।' এই মন্দিরটি বাঙলায় প্রচলিত রীতির কোন শ্রেণীতে পড়ে না। শিখরটি ছত্রাকার ও নিচে দেওয়ালের আটকোণে আটটি মিনারেব ধরনে আরবীয় অলঙ্করণ। একদা বাংলায় বহুল প্রচলিত দেউল মন্দিরের মতো শিবনিবাসের এই মন্দিরগুলির শীর্ষদেশকে দেউল আকৃতি করার চেষ্টা করা যে হয়েছিল, তা বেশ বোঝা যায়। তাই এদের উচ্চতাটাই বেশি করে চোখে পড়ে। রাজরাজেশ্বর শিবলিঙ্গটি ব্ল্যাক বেসল্টে নির্মিত ও উচ্চতায় প্রায় ৯ ফুট। এতবড় শিবলিঙ্গ পশ্চিমবাংলায় খুব কমই দেখা যায়, কলকাতার ভূকৈলাস রাজবাড়ির শিবলিঙ্গও উচ্চতায় এতখানি হবে কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য শিবনিবাসের এই মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির কারুকার্য বলতে কিছুমাত্র নেই। খিলানগুলি সবই গথিকস্থাপত্যের অনুকৃতি। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার তদানীন্তন বিশপ হেবার সাহেব জলপথে ঢাকা যাওয়ার সময় এখানে নেমে মন্দিরগুলি দেখে মুগ্ধ হন। এখানকার সৌধরাজির বিস্তৃত বিবরণী ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত জার্নালে তিনি প্রকাশ করেন।

এই মন্দিরগুলির পশ্চিমদিকে জঙ্গলে ঢাকা রাজবাড়ির বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। শোনা যায়, বর্গীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রাজধানী কৃষ্ণনগর থেকে এখানে সরিয়ে আনেন এবং চূর্ণী থেকে বর্তমান খালটি খনন করেন। এইখানেই তিনি বৃহৎ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। শিবনিবাসের চারপাশ কঙ্কণার আকারে নদীবেষ্টিত। তাই সেগুলি শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য পরিখাস্বরূপ। প্রচলিত একটি ছড়ায় এই স্থানকে কাশীতুল্য বলা হয়েছে। ছড়াটি হ'ল ঃ

শিবনিবাসী তুল্যকাশী ধন্য নদী কঙ্কণা।
উপরে বাজে দেবঘড়ি নীচে বাজে ঠন্ঠনা।।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'ও এই শিবনিবাসের উল্লেখ আছে। সেখানে 'মজুমদারের স্বর্গযাত্রা' অংশে অন্নপূর্ণা ভবানন্দকে বলছেন ঃ

... কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান।
কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সমান।।
বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেব মূর্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া।।

অন্নদামঙ্গলে'র রচনাকাল ১১৫৯ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সম্ভবত তার আগে থেকেই শিবনিবাসের প্রাসাদ নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। লক্ষণীয়, 'অন্নদামঙ্গলে' কিন্তু উক্ত তিনটি মন্দিরের কোন উল্লেখ নেই। কারণ, এ কাব্যটি এখানকার প্রাচীনতম মন্দির নির্মিত হওয়ার আগেই রচিত হয়েছিল। ঠিক এই কারণেই 'গঙ্গাবাস' বা সেখানকার মন্দিরাদিরও কোন উল্লেখ এই কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্র গঙ্গাবাস নির্মিত হওয়ার অনেক আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন (১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)। পূর্বোক্ত রামসীতা মন্দিরের অনুরূপ একটি শীতলার মন্দির কিছুটা পশ্চিমে ছিল। গ্রন্থকারের অনুসন্ধানকালে (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩) এটি ভগ্ন অবস্থায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এছাড়া বৃন্দাবন সরকার চৌধুরীর অট্টালিকার কাছে একটি চারচালা ভগ্নমন্দিরও পরিত্যক্ত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। ঐ স্থানের কিছু উত্তর-পশ্চিমকোণে রাজ্ঞীশ্বরের অনুরূপ একটি শিবমন্দিরও বর্তমান।

দক্ষিণাঞ্চল ঃ

পুরাকীর্তির দিক থেকে নদীয়া জেলার দক্ষিণাঞ্চলকে শান্তিপুর, রানাঘাট, চাকদহ ও হরিণঘাটা থানায় বিভক্ত করা যেতে পারে। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি থানায় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাগআঁচড়া (শান্তিপুর থানা) ঃ শান্তিপুর থেকে প্রায় ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বাগআঁচড়া গ্রাম। শান্তিপুর স্টেশন থেকে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়ে এই গ্রামে যাতায়াত করা যায়। বাগআঁচড়া গ্রামটি ভাগীরথী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এই গ্রামে প্রাচীন একটি ঠাকুরবাড়ি ছিল। একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চারদিকে চারটি মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে একটি শিবমন্দির ছিল বাংলা আটচালা রীতির। মন্দিরটি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। পূর্ব রেলওয়ে প্রচারিত ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের 'বাংলায় ভ্রমণ' ১ম খণ্ডের ৯৯, ১০০ ও ১০১ পৃষ্ঠায় মন্দিরটির কয়েকটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছিল। সেই আলোকচিত্র থেকে বোঝা যায়, এটি ছিল অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। সুন্দর সুন্দর

নকশা ও পোড়ামাটির মূর্তির প্রাচুর্য সেই মন্দিরে যতখানি ছিল, নদীয়া জেলার খুব কম মন্দিরেই তা বর্তমান আছে। মন্দিরটি চাঁদরায় নামক এক ব্যক্তির কীর্তি। এই চাঁদরায় কে, তা সঠিক বলা যায় না। লিপিফলকে মন্দিরটি চাঁদরায় প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ আছে। সুখের বিষয়, মন্দির নষ্ট হয়ে গেলেও লিপিফলকটি 'শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদে' রক্ষিত আছে। এই চাঁদরায়কে কেউ কেউ রাজা রুদ্ররায়ের দেওয়ান বলে মনে করেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তিনি প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথরায় চাঁদরায় বলে উল্লেখিত হয়েছেন। লিপি থেকে জানা যায়, ১৫৮৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। লিপিটি উদ্ধৃত করা হল ঃ

শাকে বারমতঙ্গবাণহরিণাঙ্কেনাঙ্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশু সুধা সুধাকরকরক্ষীরোদনীরোপমম্।
তস্মৈ সৌধমিদং মুদা সুজলদা নিলীনলোলধ্বজং
তৎপাদেরিতধীরধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায়ো দদৌ।।

'শিবপদে সতত নিমগ্ন ধীর স্থির চাঁদরায় ১৫৮৭ শকে শঙ্করকে স্থাপনা করে চন্দ্রকিরণ ও দুগ্ধসমুদ্রতুল্য এই সৌধ সানন্দে তাঁকে দান করলেন। এই সৌধের শিরোভাগে স্থাপিত ধ্বজ সুনির্মল মেঘরাশিতে নিলীন হয়ে চঞ্চল হয়।' মন্দিরটি তখন ছিল দুগ্ধধবলবর্ণ এবং মন্দিরগাত্রে খচিত পোড়ামাটির মূর্তি ও অলঙ্করণ ছিল এর গৌরব।

বাগআঁচড়ায় প্রসিদ্ধ বাগদেবী মাতার মন্দির ও জনৈক সাধুর সমাধিমন্দির আছে। বাগদেবীর কোন মূর্তি নেই। ঘটেই পূজাদি হয়ে থাকে। বাগআঁচড়ার অপর নাম 'ব্রহ্মশাসন'। কথিত আছে, রাজা রুদ্র একটি আদর্শ ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম স্থাপন করার মানসে এই গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু ব্রাহ্মণকে ভূসম্পত্তি দান করেন। সেইজন্যই এই গ্রামের নাম হয় ব্রহ্মশাসন। যোল শতকের মাঝামাঝি রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক সাধক বাগদেবী প্রতিষ্ঠা করেন।

শান্তিপুর ঃ শান্তিপুর যে খুবই প্রাচীন স্থান বহু গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর থেকে দক্ষিণে সরাসরি বাসপথে এখানে পৌছানো যায়। তাছাড়া রানাঘাটের পর কালীনারায়ণপুর জংশন থেকে শান্তিপুর লাইনের রেলপথেও এখানে আসা যায়। ধর্ম ও বিদ্যাচর্চার এক প্রাচীন পীঠস্থান এই শান্তিপুর। পুরাকীর্তির দিক থেকেও এই স্থান যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবী করে, তার প্রমাণ এখানকার প্রাচীন কয়েকটি মন্দিব, মসজিদ ইত্যাদি। এছাড়া বৈষ্ণব ধর্মাচার্য অদ্বৈতপ্রভু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বীর আশানন্দ ঢেঁকির স্মৃতিপূতস্থানও এই শান্তিপুরে আছে।

উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মন্দিরসমূহের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে জলেশ্বর মন্দিরের। এই মন্দিরটি শান্তিপুরের 'মতিগঞ্জ-বেজপাড়া'য় অবস্থিত। জলেশ্বর-শিবলিঙ্গ ব্ল্যাক বেসল্ট পাথরে নির্মিত। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী হলেও এর পূর্বদিকে দরজা আছে। মন্দিরটি উচ্চ এবং বাংলা 'চারচালা'-পদ্ধতিতে নির্মিত। এর কারুকার্যগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। কতকটা দিগনগরের মন্দিরের অনুরূপ হলেও এই মন্দিরের উচ্চতা দিগনগরমন্দির থেকেও বেশি। নকশা ও পোড়ামাটির মূর্তির সঙ্গেও রাঘবেশ্বর মন্দিরের কিছু কিছু সাদৃশ্য এতে লক্ষ্য করা যায়, মাটিয়ারির রুদ্রেশ্বরমন্দিরের সঙ্গেও এই মন্দিরের গঠন, আকৃতি ও কারুকার্যের অনেক মিল আছে, তবে সেটির থেকেও এ মন্দিরের উচ্চতা বেশি। প্রমাণযোগ্য কোন লিপির অভাবে এই মন্দির কার বা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। কোথাও কোথাও এটি রাজা রুদ্রের কনিষ্ঠপুত্র রামকৃষ্ণের মাতার প্রতিষ্ঠিত বলে বলা হয়েছে।[২০] কিন্তু একথা ঠিক কিনা ভেবে দেখার বিষয়। মন্দিরের

বর্তমান সেবায়েতের মতে এখানকার শিবের পূর্ব নাম ছিল রাঘবেশ্বর। রাজা রাঘব এঁকে প্রতিষ্ঠা করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইনি 'জলেশ্বর' নামে পরিচিত হন। একসময় শান্তিপুর অঞ্চলে দারুণ অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৃষ্টিপাতের জন্য সে সময় এই শিবের মাথায় জল ঢেলেছিলেন। তারপরই বেশ বৃষ্টিপাত হয়। আর সেই থেকেই এই শিবের নাম 'জলেশ্বর' হয়।

মন্দিরটির পূর্ব ও দক্ষিণ দেওয়ালে বেশ কিছু টেরাকোটা ও নকশার কাজ আছে। টেরাকোটাগুলি পৃথক পৃথক টালিতে সন্নিবেশিত। খিলান 'দরুণ'শ্রেণীর এবং ওপরে শিবের প্রতীক 'আটচালা' মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ। প্রবেশপথের দুপাশে দুটি থাম, কিন্তু গর্ভগৃহসংলগ্ন কোন অলিন্দ নেই। পরবর্তীকালে নির্মিত একটি নাটমন্দির দক্ষিণদিকে আছে। উল্লেখ্য, টেরাকোটাগুলির মধ্যে তীরন্দাজ-কর্তৃক অশ্বকন্যাকে তীর নিক্ষেপ (এটি পূর্বদিকের দেওয়ালের বাঁ দিকে আছে)। এছাড়া আছে সাহেবদের কোন কোন মূর্তি। পৌরাণিক লীলাচিত্রের মধ্যে কালীয়দমন, গরুড়বাহন বিষ্ণু, হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রভৃতি। একটি ফলকে গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে জনৈক মুনির ধ্যানমগ্ন অবস্থাটি বেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'মণি' বা মিথুনভাস্কর্যের কোন চিত্র এ মন্দিরে নেই।

মন্দিরের ভেতরের একটি কুলুঙ্গীতে রক্ষিত অভয়তারিণী দুর্গার একটি পেতলের মূর্তি আছে। প্রথম দর্শনে এটিকে বুদ্ধমূর্তি বলে ভুল হতে পারে। ঠিক বুদ্ধের ভঙ্গিমায় মূর্তিটি সমাসীন। দেবীর ডানহাতে বরাভয়মুদ্রা। মূর্তিটি খুব ছোট হলেও এতে নিখুঁত ভাস্কর্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়।

অদ্বৈতপ্রভু ও গোকুলচাঁদের মন্দির, হাটখোলাপাড়া **ঃ** 'হাটখোলাপাড়া'য় মধ্যমগোস্বামীর বাড়িতে অদ্বৈতপ্রভু ও গোকুলচাঁদের মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য। দুটি মন্দিরই বাংলা 'আটচালা'-রীতিতে নির্মিত। প্রতিষ্ঠাকালের কোন লিপি পাওয়া না গেলেও গঠন ও আকারে এই দুটি মন্দির বেশ প্রাচীন মনে হয়। গোকুলচাঁদের মন্দিরটি ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলে কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। গোকুলচাঁদ ও অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরের মধ্যে শেষোক্তটিতেই রয়েছে পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য। প্রথমটিতে পোড়ামাটির কোন মূর্তিভাস্কর্য না থাকলেও '*পঙ্কে*'র কিছু কিছু কাজ লক্ষ্য করা যায়। মধ্যমগোস্বামীর এই ঠাকুরবাড়িটি চারদিকে প্রাচীরবেষ্টিত। অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরটি পূর্বমুখী ও গোকুলচাঁদেরটি দক্ষিণমুখী। দুটি মন্দিরেই আবৃত অলিন্দ বা বারান্দা গর্ভগৃহ বা মূলমন্দির সংলগ্ন দেখা যায়। থামগুলি '*ইমারতি*'শ্রেণীর অর্থাৎ বত্রিশ 'থাক' ইটের সমবায়ে গঠিত। এই ধরনের থাম বিষ্ণুপুরমন্দিরে খুব বেশি দেখা যায় এবং পশ্চিমবাংলার অন্যান্য স্থানের অনেক মন্দিরেও আছে। খিলানগুলি 'দরুণ'শ্রেণীর। অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরে দু'টি পূর্ণ 'ইমারতি' ও দু'টি অর্ধ 'ইমারতি' থাম আছে। পাদপীঠসংলগ্ন ভিত্তিতে ভাস্কর্যগুলির বেশির ভাগই সামাজিক চিত্রের, যেমন ঝাঁপানে করে রাজা বা জমিদারের স্থানান্তর গমন, শিকারদৃশ্য, ব্যাঘ্রের আক্রমণ, শিকারীকুকুর, হরিণশিকার, নিহত হরিণকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। পৌরাণিক চিত্রের মধ্যে আছে— দশাবতার, দশভুজা মহিষমর্দিনী এবং দেবীর ডাইনে গণেশ ও লক্ষ্মী এবং বামে কার্তিকেয় ও সরস্বতী। বিকৃতাশ্ব সিংহের (অর্থাৎ সিংহ অনেকটা অশ্বের মতো) একটি ভাস্কর্যফলকও এই মন্দিরে আছে। ঢাকা বারান্দা দিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশপথ খুবই সঙ্কীর্ণ— এ ধরনের সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথ প্রাকচৈতন্যযুগের একটি স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য। গর্ভগৃহে

অদ্বৈতপ্রভু ও তাঁর পত্নী সীতাদেবীর প্রতিমূর্তি স্থাপিত। কোন লিপি না থাকায় বলা কঠিন, মন্দিরটি ঠিক কোন্ সময়ের। তবে এটি যে বেশ প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই।

অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরের ঠিক উত্তরপাশেই গোকুলচাঁদের 'আটচালা' মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরে অদ্বৈতাচার্যের অভিষিক্ত বলে কথিত কষ্টিপাথরে নির্মিত রাধাবিনোদের মূর্তি ছাড়া গোকুলচাঁদের মূর্তি (কাষ্ঠনির্মিত), ধাতুময়ী কয়েকটি ছোট ছোট মূর্তি ও শালগ্রাম শিলা আছে। পোড়ামাটির কোন ভাস্কর্য এখানে নেই। মন্দিরের গঠন ও আকার অদ্বৈতমন্দিরের অনুরূপ। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৬২ শকাব্দ (১৭৪০ খ্রি.) বলে জানা যায়।[১১] মধ্যমগোস্বামীবাড়ির মধ্যস্থলে একটি নাটমন্দির ও পাশে একটি 'দালানে' রামচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

শ্যামচাঁদমন্দির ঃ শান্তিপুরের শ্যামচাঁদপাড়ায় অবস্থিত এইটিই একমাত্র মন্দির যাতে শিলালিপিটি অক্ষত ও সুস্পষ্ট রয়েছে। এ মন্দিরটিও বাংলা 'আটচালা'শ্রেণীর, উচ্চতা আন্দাজ ১১০ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৬৮ ফুট। আটচালা শ্রেণীর মধ্যে এই মন্দিরটি পশ্চিমবাংলায় এই রীতির সমস্ত মন্দিরের মধ্যে (অবশ্য আয়তনের দিক থেকে) অন্যতম এক বিশাল মন্দির। অপর একটি মন্দির মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণায় অবস্থিত রঘুনাথবাড়ির লালজিউর মন্দির। শান্তিপুরের এই শ্যামচাঁদের মন্দিরটি গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরটির সঙ্গে একই রেখায় অবস্থিত বলে কেউ কেউ মনে করেন ('বাঙলার মন্দির' ঃ পঞ্চানন রায়, 'অমৃত', ২১ শে মাঘ, ১৩৭৮, পৃষ্ঠা ১৪)। শ্যামচাঁদের এই মন্দিরটির সঙ্গে নদীয়া জেলার কাঞ্চনপল্লীতে অবস্থিত কৃষ্ণরায়ের আটচালা মন্দিরটির আকার ও আয়তনের দিক থেকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, যদিও সেটি শ্যামচাঁদের বেশ পরবর্তী সময়ে নির্মিত। দক্ষিণমুখী শ্যামচাঁদের এই মন্দিরটি একটি উচ্চ পাদপীঠের ওপর অবস্থিত। লিপিফলকটি সামনের বাঁদিকে পঠনযোগ্য উচ্চতার মধ্যে প্রথম খিলানটির ঠিক নিচে স্থাপিত। লিপিটি প্রস্তর-খোদিত। সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত লিপিটি এই—

> শ্রীমতঃ শ্যামচন্দ্রস্য মন্দিরং পূর্ণতামিয়াত্।
> বসু বেদর্তুশুভ্রাংশু সংখ্যয়া গণিতে শকে।।

অর্থাৎ '১৬৪৮ শকে (১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে) শ্রীমান শ্যামচন্দ্রের মন্দির সম্পূর্ণ হল' ('বসুবেদর্তুশুভ্রাংশু' এই অংশের মধ্যে শকাঙ্ক উল্লেখিত হয়েছে)বসু= ৮, বেদ= ৪, ঋতু= ৬, শুভ্রাংশু= ১। 'অঙ্কের বামদিকে গতি' এই নিয়মানুসারে ১৬৪৮ হয়। এটি শকাব্দ। এই মন্দিরটির পাঁচটি 'চূড়া' বর্তমান। 'চূড়া' অর্থে এখানে 'রত্ন' বা 'শিখর' নয়। কলস, আমলক ও চক্রের দ্বারা চূড়া নিরূপিত হয়েছে। গর্ভগৃহের সংলগ্ন একটি অলিন্দ আছে। অলিন্দ দুটি পূর্ণ ও দুটি অর্ধ'ইমারতি' থামের ওপর স্থাপিত। খিলান 'দরুণ'শ্রেণীর। সর্বমোট পাঁচটি খিলান আছে। প্রতিটি খিলানের ওপরেই 'আটচালা' শ্রেণীর '*প্রতীক*' শিবালয় ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ। ওপরের দিকে কার্নিশের নিচে দুই প্রস্থে পোড়ামাটির ফুল এবং দুপাশের ওপরে-নিচেও একই রকমের ফুল মন্দিরটির অঙ্গ সজ্জারূপে বিন্যস্ত হয়েছে। খিলানগুলির ওপরের প্রস্থে '*পঙ্কে*'র কাজ ছাড়া কোন প্রকার মূর্তিভাস্কর্য নেই।

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিপুরের তন্তুবায়বংশীয় এক ধনী ব্যক্তি, নাম রামগোপাল খাঁ চৌধুরী। মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তিনি বহু খরচ করে দেশ-দেশান্তর থেকে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এখানে এনেছিলেন এবং সে সময় এক লক্ষ মুদ্রা নজরানা দিয়ে তদানীন্তন নদীয়ারাজকে (সম্ভবত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামকে) সভাগৃহের শিরোভাগে স্থাপন করেছিলেন। মন্দিরনির্মাণে

প্রায় দুলক্ষ টাকা লেগেছিল বলে জানা যায়।[২২] শ্যামচাঁদের বিগ্রহ কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত। বিগ্রহ প্রতিদিন পূজিত হন। মন্দিরটির অবস্থাও বেশ ভালো। সামনে একটি প্রশস্ত নাটমন্দির আছে এবং মন্দিরপ্রাঙ্গণ চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টিত।

শান্তিপুরে গোস্বামীদেরও একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির আছে।

রানাঘাট **:** এখানকার সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়ির মন্দিরটি 'দালান'শ্রেণীর। এটি রানাঘাট শহরের 'সিদ্ধেশ্বরী পাড়া'য় অবস্থিত। মূর্তিটি দক্ষিণাকালীর। সামনে একটি নাটমন্দির। এই কালী 'রানাকালী' বা 'ডাকাতে কালী' নামে প্রসিদ্ধ। 'দালান'শ্রেণীর এই মন্দিরটি দেড়শ বছরের মতো পুরানো বলে অনুমান করা যায়।

চূর্ণীতীরে 'হরধাম' থেকে আনীত একটি কালীমূর্তি রানাঘাটের কোন পাড়ায় পূজিতা হন। 'হরধামে' প্রাসাদের কোন চিহ্ন এখন আর নেই। তবে একটি জীর্ণ মন্দির আছে বলে জানা যায়। এছাড়া রানাঘাটে একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরও আছে।

আড়ংঘাটা (রানাঘাট থানা) **:** কলকাতা থেকে ৫৬ মাইল দূরে চূর্ণীনদীর তীরবর্তী আড়ংঘাটা একটি স্টেশন। রানাঘাট থেকে উত্তর-পূর্বে রানাঘাট-গেদে রেলপথে এই স্টেশনে পৌছানো যায়। আড়ংঘাটায় বর্তমানে যুগলকিশোর দেবের একটি 'দালান' মন্দির বর্তমান। যুগলকিশোরের একটি প্রাচীন মন্দির ছিল বলে জানা যায়, সেই মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীকৃষ্ণের একটি কিশোরমূর্তি প্রথমে গঙ্গারাম দাস নামে এক ব্যক্তি নবদ্বীপের কাছে 'সমুদ্রগড়ে' স্থাপন করেন, পরে তিনি সেখান থেকে আড়ংঘাটায় এসে একটি মন্দির নির্মাণ ক'রে বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্তিকাগর্ভ থেকে একটি রাধিকামূর্তি পেয়ে সেই রাধিকাকে ঐ কিশোরের সঙ্গে মিলিত করেন। সেই থেকে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ যুগলবিগ্রহ স্থাপিত রয়েছে। যুগলকিশোরের মন্দিরের দক্ষিণদিকে 'গোপীনাথ' নামে একটি প্রাচীন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে যুগলকিশোরের আগমনের পূর্বে জনৈক রামপ্রসাদ এই বিগ্রহটি স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। সেই রামপ্রসাদ ও গঙ্গারাম উভয়েই অবাঙালি ও একই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। বীরনগর গ্রাম থেকে পূর্বদিকের একটি রাস্তা ধরেও আড়ংঘাটায় পৌঁছানো যায়।

দেবগ্রাম (রানাঘাট থানা) **:** দেবপাল নামক কুম্ভকার-জাতীয় এক রাজার স্মৃতি বিজড়িত রানাঘাট থেকে পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত এই দেবগ্রামে একদা সুবিখ্যাত প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষের তেমন কোন চিহ্ন আজ আর চোখে পড়ে না। বেশ কিছুকাল আগে এখানে যে প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ ছিল, তা জানা যায়।[২৩] 'নদীয়া-কাহিনী' ও অন্যান্য গ্রন্থে গড়ের রাজা দেবপালেরই উল্লেখ আছে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' বলা হয়েছে যে, দেবী অন্নপূর্ণার রোষে দেবপালের পতন হয় এবং তাঁর রাজ্য ভবানন্দের পৌত্র রাজা রাঘবের হস্তগত হয়। কিংবদন্তী এই, রাজা দেবপাল এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একটি মূল্যবান স্পর্শমণি অপহরণ করে রাজ্যসম্পদ লাভ করেছিলেন এবং সেই সন্ন্যাসীর অভিশাপই তাঁর পতনের মূল। অপর আর একটি কিংবদন্তীতে একটি রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকার পাওয়া যায়। রাজা দেবপাল কোনসময় এক যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে একটি পায়রাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যাবার সময় তিনি রানিদের বলে যান, যদি তাঁর যুদ্ধে জয়লাভ না হয়, তাহলে পায়রাটি রাজধানীতে ফিরে আসবে এবং অন্তঃপুরের রানিরা যেন সম্মান রক্ষার জন্যে আত্মবিসর্জন দেন। রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করলেন বটে, দুর্ঘটনাবশত পায়রাটি হারালেন। পায়রাটি পূর্বশিক্ষামত ফিরে এলে রাজার মৃত্যু বুঝতে পেরে রানিরা পেছনের

খিড়কিপুকুরে আত্মবিসর্জন দিলেন। এদিকে রাজা যথারীতি ফিরে এসে এই মর্মান্তিক সংবাদ জানতে পেরে নিজেও এই খিড়কিপুকুরের জলে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

দেবগ্রামের গড়ের বাইরে যে কতগুলি প্রাচীন বৃহৎ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'List of Ancient Monuments in Bengal'-এ তার উল্লেখ আছে! এই গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"Outside the fort are the ruins of several large temples which appear to be of great interest and of some antiquity, as evidenced by the size of the bricks. They are the only undoubtedly pre-Muhammadan ruins seen or heard of in the district,"

সেইসব ধ্বংসাবশেষ প্রাকমুসলিম যুগের হলে এ স্থানটি কিরূপ প্রাচীন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্তমানে কিন্তু এ-সবের কোন চিহ্ন নেই।

উলা-বীরনগর ঃ কৃষ্ণনগর থেকে ১৩ মাইল দক্ষিণে ও রাণাঘাট থেকে ৫ মাইল উত্তরে বীরনগর গ্রামটির প্রাচীন নাম ছিল 'উলা'। বীরনগর স্টেশনটি কলকাতা থেকে ৫১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন ও বিখ্যাত দেবতা ওলাইচণ্ডীর নামানুসারে গ্রামটির নাম হয় উলা। অবশ্য, এই নামের উৎপত্তি বিষয়ে মতান্তর আছে। সে যাই হক অনেক আগে এই গ্রামের পাশ দিয়ে যে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, তা এখানকার প্রাকৃতিক গঠন দেখলেই বোঝা যায়। 'কবিকঙ্কণচণ্ডী'তে শ্রীমন্তসদাগরের সিংহলযাত্রাপথে উলার চণ্ডীর উল্লেখ আছে। উলার বহু পুরানো অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ (যা এখন বেশির ভাগই জঙ্গলাকীর্ণ), প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি গ্রামটির প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করে। পূর্বে এখানে সুন্দর সুন্দর অনেক মন্দির ছিল। কালক্রমে সেগুলি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তা বেশ বোঝা যায়। দু-একটি প্রাচীন মন্দির এখনও ইতিহাসের সাক্ষীরূপে বর্তমান আছে।

উলার প্রাচীন জমিদার রামেশ্বর মিত্র-প্রতিষ্ঠিত একটি কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির এখনও বর্তমান আছে। কথিত আছে, মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে সুবে বাংলার মুস্তৌফি (=নায়েব কানুনগো) পদে রামেশ্বর মিত্র নিযুক্ত হন। সম্ভবত এই উচ্চপদে নিয়োগের আগে তিনি উলার ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের একটি সুন্দর '*জোড়বাংলা*' মন্দির নির্মাণ করেন। দু'টি '*একবাংলা*' বা '*দোচালা*' যুক্ত হয়ে এই '*জোড়বাংলা*'। মন্দিরটির সামনের দিকে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ একটি লিপি আছে। লিপিটি যথাযথ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

> অঙ্গৈককালেন্দুমিতে শকাব্দে ১৬১৬ কায়স্থ
> কায়স্থহবেষ ধর্ম্মঃ। যো নির্ম্মমে শ্রীহরিযুগ্ম
> ধাম শ্রীযুত রামেশ্বরমিত্রদাস।

লিপির একাংশে শকাব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ভাবার্থ এই, '১৬১৬ শকাব্দে (১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে) কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীরামেশ্বর মিত্র শ্রীহরির যুগ্মগৃহ নির্মাণ করলেন।' মন্দিরে বর্তমানে রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ পূজিত হন। উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা' সজ্জায় এই মন্দিরটি অলঙ্কৃত। পাদপীঠসংলগ্ন ভিত্তি থেকে আরম্ভ করে সামনের দিকের প্রায় সব স্থানেই পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায়। পোড়ামাটির মূর্তিগুলির মধ্যে আছে শ্রীকৃষ্ণের নৌকোবিলাস, কার্তিকেয় ও গণেশ সহ দশভুজা দুর্গা, কৃষ্ণের কদম্ববৃক্ষে আরোহণ ও গোপীদের বস্ত্রহরণ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, শিবদুর্গা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবী। সামাজিক চিত্রের মধ্যে শিকারদৃশ্য, যুদ্ধদৃশ্য ও মুঘল যোদ্ধা ইত্যাদি। প্রথম একবাংলাটি মূলমন্দিরের গর্ভগৃহের বহির্বাটি স্বরূপ, যা চারটি থামের উপর অবস্থিত। প্রাচীন

হলেও মন্দিরটির অবস্থা এখনও ভালো।

মুস্তোফিপাড়ায় কাঠের তৈরি প্রাচীন '*দুর্গামণ্ডপ*'টি উৎকৃষ্ট কারুকার্যমণ্ডিত ছিল। বর্তমানে কাঠের ওপর খোদাই করা কয়েকটি মূর্তি ও সুন্দর সুন্দর কয়েকটি নকশার অংশমাত্র দেখা যায়। কাষ্ঠমণ্ডপটি একপ্রকার বিনষ্ট এবং কারুকার্যমণ্ডিত অংশগুলি পৃথক পৃথক করে একটি স্থানে রাখা হয়েছে। দুর্গামণ্ডপটির আশপাশে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে মুস্তোফিদের প্রাচীন অট্টালিকার জীর্ণ প্রাচীর রয়েছে। মাটির নিচেও অনেক ইষ্টক প্রাচীরের অংশ রয়েছে মনে হয়। মুস্তোফিপাড়ায় একটি ভগ্ন দোলমঞ্চ এবং ১১৯৭ বঙ্গাব্দে (১৭৯০ খ্রি.) নির্মিত '*জোড়া আটচালা*' মন্দিরও দেখা যায়। উত্তরপাড়ায় ১৭৫৮ শকে নির্মিত শিবের একটি 'আটচালা' মন্দির ও ঐ একই শকে নির্মিত (১৮৩৬ খ্রি.) বাজরের কাছাকাছি একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরও আছে। উত্তরপাড়ায় শিলালিপিযুক্ত আরও দু-একটি মন্দির দেখা যায়। বীরনগরের মুখোপাধ্যায়বংশীয় জমিদারদের বিস্তীর্ণ প্রাসাদেও আঠারো শতকের শেষাশেষি নির্মিত একটি ছোট 'আটচালা' শিবালয় আছে। মুখোপাধ্যায় বাড়ির অঙ্গনে রক্ষিত একটি পেতলের রথও আছে। দক্ষিণপাড়ায় ভক্তিবিনোদঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী বর্তমান। সেখানে শিবের 'আটচালা' দ্বাদশ মন্দির আছে। পূর্বোক্ত ইমারতগুলি ছাড়া উলায় প্রাচীন বেশ কিছু কিছু দীঘিও বর্তমান। এগুলির কোন কোনটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র খনন করিয়েছিলেন বলে জানা যায়। উলায় পলাশীর যুদ্ধের বীরনায়ক মীরমদনের জীর্ণ প্রাসাদটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। বিখ্যাত ওলাইচণ্ডীর স্থানটি একটি উন্মুক্ত প্রান্তর ও সেখানে প্রাচীন কয়েকটি বটগাছ দণ্ডায়মান।

কামালপুর (চাকদহ থানা) **:** চাকদহ স্টেশন থেকে প্রায় ৬ মাইল পূর্বমুখে বনগাঁ রোডের ধারে কামালপুর গ্রাম। এই গ্রামটি প্রাচীন নদীয়ার মধ্যে সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিন্তু বর্তমানে এখানে সমৃদ্ধির বিশেষ কোন চিহ্ন নেই। কামালপুর গ্রামটি পূর্বে 'ভট্টাচার্য-কামালপুর' নামে খ্যাত ছিল। পণ্ডিতপ্রধান এই গ্রামে প্রাচীন গাঙ্গুলি-বংশের বিখ্যাত পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ রঘুদেব বাচস্পতির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ত্রিবেণীর অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের গুরু ছিলেন। রঘুদেব বাচস্পতি রাজা রাঘবের দানভাজন মধুসূদনের পৌত্র ছিলেন। নব্যন্যায়চর্চায় এই গ্রামটি এককালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এছাড়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বনমালী বিদ্যাসাগরেরও জন্মস্থান ছিল এই গ্রাম। রঘুদেব বাচস্পতি রাজা রঘুরাম ও তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন।[২৪] এইসব কারণে এই গ্রামে প্রাচীন মন্দিরাদির সংখ্যা যে বেশ কিছু ছিল তা অনুমান করা যায়। বর্তমান কামালপুর স্কুলের পাশেই বটবৃক্ষসমাচ্ছন্ন দুটি প্রাচীন মন্দির দেখা যায়। এগুলি 'আটচালা' শ্রেণীর মন্দির বলে অনুমান। চূড়া ভগ্ন। একটি মন্দিরে পোড়ামাটির মূর্তি ও সূক্ষ্ম কারুকার্য বর্তমান। এখানে বর্তমানে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকলেও মন্দিরটি খুবই জরাজীর্ণ এবং শীঘ্র ভূপতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অপর মন্দিরটি পরিত্যক্ত ও অলংকরণবিহীন। এই মন্দিরদু'টির চতুষ্পার্শে বটগাছের শাখাপ্রশাখা বিস্তীর্ণ। পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। পোড়ামাটির দুটি দীর্ঘ লিপিফলকের ভগ্ন অংশ এখনও এর উত্তর ও দক্ষিণাংশের দেওয়ালের অনেক উঁচুতে স্থাপিত আছে। অবশ্য, তার পাঠোদ্ধার করা একান্ত দুরূহ। মন্দিরের পৃথক পৃথকদিকে প্রতিষ্ঠিত এই দুটি লিপির ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের কোন মন্দিরে এ ধরনের লিপিবিন্যাস আর আছে কিনা জানা নেই। প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ সম্ভবত উত্তরদিকের লিপিতে ছিল, তা একপ্রকার নষ্ট বলা যায়। এর একটু অংশ হল... শকাঙ্কসংখ্যবর্ষে হরিসদ্ম...। এর থেকে অবশ্য শকাঙ্ক উদ্ধার করা যায় না, তবে বোঝা যায় যে, মন্দিরটি কৃষ্ণের জন্য নির্মিত হয়েছিল ('হরিস')। দীর্ঘ লিপিফলক-দুটির বাকি যে অংশ এখনও বর্তমান আছে,

তার থেকে হয়তো সেকালে এই অঞ্চলের অনেক কথা জানা যেতে পারে। কোথাও কোথাও এই মন্দিরটিকে আড়াইশ' বছরের প্রাচীন বলে উল্লেখ করা আছে।[২৫] মন্দিরটির সামনের অংশে পোড়ামাটির মূর্তির মধ্যে আছে, রাধাকৃষ্ণ, কালী ও অন্যান্য দেবদেবী। বামদিকের নিচের একটি অংশে মিথুন বা 'মণি' আছে। খিলানের ওপরের প্রস্থে কোন মূর্তি নেই, কিন্তু লতাপাতা ও বিচিত্র নকশার সূক্ষ্ম কাজ বর্তমান। পোড়ামাটির মূর্তিসমূহে রেখার সূক্ষ্মকাজ লক্ষ্য করা যায়। এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলক বা টালিতে উৎকীর্ণ। ভাস্কর্যের এইসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে মন্দিরটি সতের শতকের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। এই গ্রামের একটি স্থানে আরও একটি 'আটচালা' শিবমন্দির দেখা যায়। তবে সেটা একশ বছরের বেশি প্রাচীন হবে বলে মনে হয় না। কামালপুর গ্রামের আরও কিছু পূর্বে সরাবপুর গ্রামের একস্থানে ধ্বংসাবশিষ্ট একটি প্রাচীন মন্দিরের উল্লেখ 'নদীয়াকাহিনী'তে পাওয়া যায়। এই গ্রামের কাছেই 'খলসিয়ার বিল' নামে পরিচিত একটি প্রাচীন বিল আছে। উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বহুকাল আগে এক সন্ন্যাসীর দ্বারা দগ্ধ হয়ে 'পোড়ামহেশ্বর' নামে পরিচিত ছিলেন।

পালপাড়া (চাকদহ থানা) ঃ কৃষ্ণনগর থেকে প্রথমে চাকদহ স্টেশন পেরিয়ে পালপাড়া একটি ছোট্ট স্টেশন। এই স্টেশন থেকে পশ্চিমে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথের ব্যবধানে একটি উচ্চ প্রাচীন মন্দির আছে। এটি পালপাড়ার তথা সমগ্র নদীয়া জেলার একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মন্দির। মন্দিরটি বিশুদ্ধ 'চারচালা' রীতিতে নির্মিত। চালগুলি বাংলার খোড়ো চালের ন্যায় ঢালু ও প্রশস্ত। সম্পূর্ণরূপে ইষ্টকনির্মিত এই মন্দিরটির সঙ্গে পরবর্তীকালে নির্মিত নদীয়ার অন্যান্য চারচালা মন্দিরের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উচ্চতা, গাম্ভীর্য ও উৎকৃষ্ট অলঙ্করণের দিক থেকে নদীয়ার এই শৈলীর কোন মন্দিরের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। ইঁটগুলি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং দীর্ঘ হলেও চওড়ায় আনুপাতিকভাবে কম। বিভিন্ন আকারের বহু ইঁট এই মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছে। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি একটি উচ্চ পাদপীঠের ওপর অবস্থিত। সম্ভবত সামনের দিকের সব অংশেই— ডাইনে-বামে, ওপরে-নিচে সবস্থানেই পোড়ামাটির মূর্তি ছিল বলে মনে হয়। এখন শুধু প্রবেশদ্বারের খিলানের ওপরের প্রস্থে মূর্তিগুলি দেখা যায়। মন্দিরটির সংলগ্ন কোন আবৃত বারান্দা বা 'জগমোহন' নেই। প্রবেশদ্বারের দুপাশে দুটি ছোট ছোট থাম ও একটি খিলান আছে। খিলানটি '*দরুণ*'শ্রেণীর। এই খিলানের ঠিক ওপরে পরিবেষ্টিত মোট ১৪টি 'আটচালা' রীতির প্রতীক দেবালয় বা রথ, কিন্তু তন্মধ্যে শিবলিঙ্গের পরিবর্তে ছোট্ট ছোট্ট মূর্তি। এ ধরনের অলঙ্কার খুব কম মন্দিরেই দেখা যায়। এরপর রামায়ণীয় লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য— রামচন্দ্র বামদিকে তীরধনু ধারণ ক'রে তাঁর সম্মুখবর্তী ডান দিকে দশাননকে আক্রমণোদ্যত। রামচন্দ্রের পশ্চাতে তিনজন যোদ্ধা ও রাবণের পশ্চাতে ভীষণাকৃতি এক রাক্ষস একজন বীরযোদ্ধার সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত। সম্মুখযুদ্ধের দৃশ্য এখানে অনেকগুলি আছে। লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য ছাড়া আর কোন দৃশ্য এই অংশে চোখে পড়ে না। তোরণপথটির চারপাশে অভিনব ধরনের ৮টি দু'মুখো সাপ— বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের মন্দিরে (১৬৪৩ খ্রি.) এ ধরনের অনেকগুলি সাপ দেখা যায়। বাম ও ডান দিকের ওপরে-নীচে ও কার্ণিসের নীচে সবসুদ্ধ ৩৫টি পোড়ামাটির বড় ফুল মন্দিরটিকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। এছাড়া প্রচুর নকশা ও '*কল্পলতা*' সামনের দিককে অলঙ্কৃত করেছে। মন্দিরটির পশ্চাদভাগেও পোড়ামাটির কিছু কিছু বড় ফুল আছে। সামনের বাম ও ডান দিকের অলংকরণ অপসারিত করে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মেরামতির কাজ চলছিল। তাই এই সব স্থানে কি ছিল আজ আর জানার উপায় নেই। মনে হয়, এই সব

অংশে ইঁটের ওপর সুন্দর সুন্দর খোদাইকাজ বা নকশা ছিল। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'List of Ancient Monuments in Bengal' গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠায় মন্দিরটির তৎকালীন মালিকরূপে পালপাড়ার বাবু কালীকুমার চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সে-সময় এবং তার বহু আগে থেকেই মন্দিরে কোন বিগ্রহ ছিল না বলে জানা যায়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর নদীয়ার তদানীন্তন কালেকটর মন্দিরটি পরিদর্শন করে এটি সংরক্ষণের জন্যে ৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। তারপর এটি একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তিরূপে পরিগণিত হয়েছে।

এই মন্দিরের ভিতরের ছাদ গোলাকার এবং ছাদটি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র চারটি খিলানের উপর স্থাপিত হয়ে বহির্ভাগে চতুষ্কোণ প্রশস্ত চারচালের সৃষ্টি করেছে। ঠিক এই শ্রেণীর একটি ছোট্ট মন্দির মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরের প্রসিদ্ধ সিংহবাহিনীর মন্দির (১৪৯০ খ্রি.)। এই মন্দিরে দুটি শিলালিপি ছিল বলে জানা যায়। বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ মি. বেগলার এক সময় মন্দিরটির মাপ ও আলোকচিত্র নিয়েছিলেন। একসময় রানাঘাটের মহকুমা শাসক রায় রামশঙ্কর সেন শিলালিপি দুটি নিয়ে গিয়েছিলেন, পরে সেগুলি প্রত্যর্পিত হলেও আর পাওয়া যায়নি।[২৬] শিলালিপি দুটি যাঁরা সেই সময় পড়েছিলেন তাতে জানা যায়, মন্দিরটি সে সময় থেকে ৫০০ বৎসরের পূর্ববর্তী। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলা পুরাকীর্তির তালিকা' গ্রন্থে একথা বলা হয়েছে। তবে মন্দিরের গঠন ও 'টেরাকোটা'র ভঙ্গি লক্ষ্য করে এটি ষোল-সতের শতকের বলে অনুমান। সুলতানী আমলে এ ধরনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নয়।

পালপাড়ার এই মন্দিরটি জনৈক গন্ধর্ব রায়ের প্রতিষ্ঠিত বলে কেউ কেউ বলেন।[২৭] কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবির যে আত্মপরিচয় আছে তাতে বলা হয়েছে—

> গন্ধর্বরায় বসে গন্ধর্ব অবতার।
> রাজসভা পূজিত সে গৌরব অপার।।

এই গন্ধর্বরায় গৌড়রাজের কোন উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। কবি কৃত্তিবাস গৌড়রাজসভায় তাঁকে দেখেছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রচনাকাল রাজনারায়ণ বসু ও রামগতি ন্যায়রত্নের মতে ১৪৬০ শক বা ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ। অবশ্য, এ বিষয়ে মতান্তর বা মতানৈক্য আছে। সে যাই হক কেন, মন্দিরের গঠন ও কারুকার্য ভালোভাবে লক্ষ্য করে এটি খ্রি. ষোল শতকের শেষ বা সতের শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত বলে মনে করা যেতে পারে।

এই মন্দিরটির অল্প পশ্চিমে একটি মজাখাল দেখা যায়। এই খালটি চাকদহ থেকে পালপাড়া বরাবর এবং তার পরেও বিস্তৃত। এটিকে কেউ কেউ '*প্রদ্যুম্নসরোবর*' বলে থাকেন। চাকদহের প্রাচীন নাম ছিল '*প্রদ্যুম্ননগর*'। স্মার্ত রঘুনন্দন মুক্তবেণীর স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে প্রদ্যুম্ননগরের উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের নামের সঙ্গে প্রদ্যুম্ননগরের নাম জড়িয়ে থাকলেও এটি সত্যিই প্রদ্যুম্নপ্রতিষ্ঠিত কিনা ভেবে দেখার বিষয়। প্রদ্যুম্ন নামে কোন রাজাও এই নগর পত্তন করে থাকবেন। প্রদ্যুম্নসরোবরটি সম্ভবত কোন সরোবর নয়। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে এটি গঙ্গার প্রাচীন খাত বলেই মনে হয়। গঙ্গা বর্তমানে চাকদহ থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। পালপাড়ার এই মন্দিরের মধ্যে এক সন্ন্যাসী-প্রতিষ্ঠিত একটি মৃন্ময়ী দক্ষিণাকালী পূজিতা হন। অঙ্গনের পশ্চিমধারে একটি আশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পালপাড়া গ্রামে স্থানীয় জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত দুটি শিবমন্দির আছে। এগুলি 'আটচালা' শ্রেণীর। পোড়ামাটির কোন ভাস্কর্য এতে নেই। দুটি মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ও

প্রত্যহ পূজিত হন। একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠাকাল শকাব্দ ১৭৬০, বঙ্গাব্দ ১২৪৫ সনের উল্লেখ আছে (১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ)। একস্থানের একটু লিপি হল, 'শ্রীযুত রামমোহন সাবর্ণ চৌধুরীর,' বাকি অংশ অস্পষ্ট। এই জোড়া মন্দির 'কালীবাড়ি'র একটু দক্ষিণে ও প্রাচীন মন্দিরটির অল্প উত্তরে অবস্থিত।

জোড়া মন্দিরের অল্প উত্তরে এই অঞ্চলের প্রাচীন '*কাজীবাড়ি*' অবস্থিত। এটি একটি বৃহৎ অট্টালিকা অনেকগুলি 'মহলে' বিভক্ত। এই প্রাচীন অট্টালিকাটি চাকদহের 'কাজীপাড়া'য় ও রেলপথের অদূরবর্তী। এই কাজীপাড়ার প্রাচীন নাম 'পাজনৌর'। কাজীবংশীয় ব্যক্তিগণ বেশ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। এই বংশের মুন্সি এতেমুদ্দিন মহম্মদ মরহুম নামে এক ব্যক্তি ক্লাইভের মীর মুন্সিপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বর্তমানে *কাজীবাড়িতে* বাইরের কিছু কিছু লোক বাস করলেও অট্টালিকা ও মহলগুলি বেশ জরাজীর্ণ। এই মহলগুলিতে যাওয়ার নানা পথ ও উপপথ ছিল। এককালে এই বাড়ি যে জমজমাট ছিল এখানকার বহু কক্ষ, হলঘর, নাচঘর প্রভৃতি দেখলেই তা বোঝা যায়। '*কাজীবাড়ি*'র পাশেই এক ক্ষুদ্র মসজিদ।

জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট (চাকদহ) : চাকদহ স্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে যশোড়া গ্রামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ জগদীশ পণ্ডিতের '*পাটবাড়ি*' অবস্থিত। যশোড়া গ্রামের সঙ্গে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের স্মৃতি জড়িত। এই গ্রামে একদা মহাপ্রভু এসেছিলেন। কথিত আছে, জগদীশ পণ্ডিত পুরীধাম থেকে জগন্নাথের নবকলেবর ধারণের সময় তাঁর পরিত্যক্ত বিগ্রহটি এখানে স্থাপন করেন। এই গ্রামে জগন্নাথদেবের একটি মন্দির ও দোলমঞ্চ আছে।

মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট : জগদীশ পণ্ডিতের ভ্রাতা দ্বাদশগোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ, বেদি ও একটি মন্দির চাকদহ স্টেশন থেকে ৭৮ মিনিটের পথ কাঁঠালপুলি নামক গ্রামে স্থাপিত। মহেশ পণ্ডিতের সমাধি পালপাড়ার উক্ত প্রাচীন মন্দিরটির পাশে অবস্থিত বলে জানা যায়।

পালপাড়ার মন্দিরটির উত্তর-পূর্বদিকে ভগ্ন বেশ প্রাচীন একটি মন্দির আছে। মন্দিরটির পাশেই একটি প্রাচীন পুষ্করিণী। এর ভগ্ন ঘাট দেখা যায়। মন্দিরটিকে 'একরত্ন' শ্রেণীর বলা যেতে পারে, তবে শিখরটি ছত্রাকৃতি ও কোণযুক্ত। এই মন্দিরটি পালপাড়া স্টেশনের খুব কাছেই পশ্চিম দিকে অবস্থিত। কোন লিপি বা ভাস্কর্য নেই। চাকদহ, পালপাড়া ও শিমুরালি সন্নিহিত অঞ্চলে আরও অনেক প্রাচীন ইমারত যে ছিল, এখানকার বহু ভগ্ন গৃহ, দেবালয় প্রভৃতি দেখে তা অনুমান করা যায়। এ অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু প্রাচীন পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। খননকার্যের দ্বারা এসব স্থানে হয়তো অনেক দুর্লভ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

ঘোষপাড়া (কল্যাণী থানা) : চাকদহ থানার অন্তর্গত 'ঘোষপাড়া' গ্রামটি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের একটি পীঠস্থান। নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাঁচড়াপাড়া ও কল্যাণী। কাঁচড়াপাড়া স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই গ্রামটি বর্তমান। কল্যাণী স্টেশনে নেমেও বাসে ঘোষপাড়া গ্রামে যাওয়া যায়। ঘোষপাড়ায় 'সতীমায়ের' সমাধিস্থান আছে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদেব প্রধান ও প্রথম শিষ্য রামশরণ পালের বাস্তুভিটায় একটি প্রাচীন ডালিমগাছের তলায় রামশরণের পত্নী সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। পরে তিনি ভক্তদের কাছে 'সতীমা' নামে পরিচিতা হন। ডালিমতলায় এই স্থানটি শানবাঁধানো ও রেলিং দিয়ে ঘেরা। ঐ ডালিমগাছটি নাকি সতীমার সময় থেকে আছে। পরে ক্ষয় ও বৃদ্ধির মধ্যে বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আউলচাঁদের জন্ম ১৬১৬ শক বা ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। তখন তাঁর শিষ্যদের

মধ্যে রামশরণ পাল গুরুপদ লাভ করেন। কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য উচ্চ-নিচ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর তিরোভাবের বহুকাল পরে আউলচাঁদরূপে আবির্ভূত হন। উলা-বীরনগরের অধিবাসী মহাদেব নামে জনৈক বারুজীবী তাঁকে শিশু অবস্থায় পানের বোরোজে কুড়িয়ে পান এবং নাম রাখেন পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র ফুলিয়ায় এক গুরুর কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন এবং 'গুরু সত্য' এই মহামন্ত্র প্রচার করেন। সেই থেকেই এই নবধর্মের প্রচার হয়। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই এই ধর্মে দীক্ষিত হতে পারেন। সতীমার ভিটার পিছনে 'হিমসাগর' নামে একটি বড় দীঘি আছে। এই দীঘির জল পবিত্র বলে ভক্তদের ধারণা। ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমার সময় এই দীঘির তীরবর্তী আম্রকাননে এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট মেলা হয়।

কুলিয়াপাটের মন্দির ঃ কাঁচড়াপাড়া বা কল্যাণী স্টেশন থেকে শ্রীপাট কুলিয়া গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামটি কাঁচড়াপাড়া স্টেশন থেকে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখানে 'অপরাধভঞ্জন' বা কুলিয়ার পাট আছে। একটি সুন্দর মন্দিরে গৌর-নিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়। মন্দিরটি 'একরত্ন' শ্রেণীর— একটি 'চাঁদনি'র ওপর দেউল-শিখর স্থাপিত। কথিত আছে, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রামের বৈষ্ণবনিন্দক পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ ক্ষমা করেন। সেইজন্য কুলিয়ার এই পাট 'অপরাধভঞ্জনের পাট' নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার 'দ্বাদশবকুলকুঞ্জ' বৈষ্ণবগণের নিকট অতিপ্রিয়।

কাঞ্চনপল্লী ঃ কাঁচড়াপাড়া রেলস্টেশন থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে কাঞ্চনপল্লী গ্রাম। এখানে কৃষ্ণরায়ের একটি বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরটি 'আটচালা'শ্রেণীর। উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনেকটা শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ মন্দিরের অনুরূপ। তবে কৃষ্ণরায়ের এই মন্দির শ্যামচাঁদের অনেক পরবর্তী। লিপিফলকটি দক্ষিণমুখী মন্দিরের সামনের উচ্চভাগে স্থাপিত। সম্পূর্ণ অংশটি নিচু থেকে উদ্ধার করা কঠিন। ১৭০৮ শকাব্দ বা ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক নামে দুই ব্যক্তি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে লিপি থেকে জানা যায়। লিপিফলকের হরফগুলি কয়েকটি সারিতে বিভক্ত। এই মন্দিরের কৃষ্ণরায় বিগ্রহটি পূর্বে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শিবানন্দ সেনের ছিল। শ্রীচৈতন্য এই শিবানন্দের বাড়িতে এসেছিলেন। সেই সময়ে সম্ভবত এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। পরে সতের শতকের গোড়ার দিকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতপুত্র কচু রায় গঙ্গাতীরে কৃষ্ণরায়ের একটি মন্দির নির্মাণ করান। সেই প্রাচীন মন্দিরটি কালক্রমে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। তখন কলকাতার পূর্বোক্ত দুই ব্যক্তি ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করান।

পোড়ামাটির অনেকগুলি ফুল ছাড়া এই মন্দিরে কারুকার্য বা পোড়ামাটির মূর্তি কিছুই নেই। মন্দিরটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণযুক্ত একটি ঠাকুরবাড়ির অন্তর্ভুক্ত। বৃহৎ সিংদরজা ও নহবৎখানা পেরিয়ে মন্দিরাঙ্গনে প্রবেশ করতে হয়। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত। পূর্বদিকে প্রাচীরের বাইরে একটি আটচালা দোলমঞ্চ আছে।

একটি উচ্চ পাদপীঠের ওপর অবস্থিত এই মন্দিরটি অলিন্দযুক্ত। থামগুলি 'ইমারতি' ও খিলান 'দরুণ'শ্রেণীর।। গর্ভগৃহে কৃষ্ণরায়ের বিগ্রহ একটি সিংহাসনে আসীন। বিগ্রহের পদ্মাসনে উৎকীর্ণ একটি সংস্কৃত শ্লোক এই—

স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায় প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহায় দ্বিজঃ কিঞ্চিৎ শ্রিয়ঃ শ্রীনাথসংজ্ঞকঃ।

বর্তমান কাঞ্চনপল্লী গ্রামটির প্রাচীন নাম ছিল *নবহট্ট*।

বিরহী (হরিণঘাটা থানা) ঃ মদনপুর স্টেশনের নিকটবর্তী এই বিরহী গ্রাম। মদনপুর থেকে বিরহী পর্যন্ত বাসে যাওয়া যায়। এই গ্রামে মদনগোপালের একটি মন্দির আছে। মদনগোপাল বিগ্রহ বেশ প্রাচীন। বহুকাল আগে এক অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব এই মদনগোপালের উপাসনা করতেন। পরে কোন একসময় নদীয়ারাজ এই বিগ্রহের একটি মন্দির করে দেন। প্রথমে বিগ্রহ একাই ছিলেন, পরে স্থানীয় যমুনা খালের ধারে রাধিকার একটি মূর্তি পাওয়া গেলে, সেই মূর্তিটি মদনগোপালের সঙ্গে যুক্ত হন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন মদনগোপালের বিশেষ পূজা হয় এবং ঐদিন এখানে এক বিরাট মেলা হয়।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. *নদীয়াকাহিনী* (২য় সং ১৩১৯, পৃ: ২৯৩-২৯৪), কুমুদনাথ মল্লিক

২. *ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত* (৭ম পরিচ্ছেদ)

৩. 'বাঙলার মন্দির' (*'অমৃত'* ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ সংখ্যা), পঞ্চানন রায়। 'বাঙলার মন্দির-স্থাপত্যভাস্কর্যে অনুসৃত কয়েকটি রীতি' (বিশ্ববাণী', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৯), প্রণব রায়

৪. 'বাঙলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ' (*'পশ্চিমবঙ্গ'*, ৭ই জুলাই, ১৯৭২ সংখ্যা), ডেভিড ম্যাককাচ্চন

৫. *Heber's Journal*, vol.1, p.120

৬. *নদীয়াকাহিনী*, পৃ: ২৬১

৭. ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (১৩৫৭ সং) পৃ: ১৮-১৯

৮. *পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা*, ১৯৬৮ ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৬

৯. *District Census Handbook*, Nadia 1951, P.XLVIII.

১০. *নবদ্বীপমহিমা*, কান্তিচন্দ্র, রাঢ়ী, ১৩৪৪ সংস্করণ

১১. *ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত*, পৃ: ১৮০

১২. *নবদ্বীপমহিমা*, পৃ. ৩০১-৩০৩

১৩. *Statistical Account of Bengal, Nadia*, Hunter, P. 142-143

১৪. নবদ্বীপমহিমা, পৃ: ৮৩-৮৫

১৫. The Court of Raja Krishnachandra of Krishnagar (*Krishnagar College Centenary Volume*, P 149), Suniti Kumar Chatterjee

১৬. *বাংলায় ভ্রমণ*, ১ম খণ্ড, ১৯৪০, পৃ: ২৪৯-২৫০

১৭. *নদীয়াকাহিনী* (২য় সং, ১৩১৯) পৃ: ২৯৩-২৯৪, কুমুদনাথ মল্লিক

১৮. *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, পৃ: ৩৯৫

১৯. *District Handbook, Nadia 1951*, P. Li - Lii, A, Mitra

২০. *বাংলায় ভ্রমণ*, ১ম খণ্ড, ১৯৪০, পৃ: ৯৬

২১. *বাঙলার তীর্থ*, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

২২. *নদীয়াকাহিনী*, পৃ: ৩২০-৩২১, কুমুদনাথ মল্লিক

২৩. *List of Ancient Monuments in Bengal* (Published in 1896), P. 116-118

২৪. *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা* (১ম ভাগ, বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৩৫৮ সং), পৃ: ২৮৮-২৮৯, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

২৫. *পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা* (২য় খণ্ড), পৃ: ৩৩৫

২৬. *List of Ancient Monuments in Bengal* (1896), P. 116

২৭. 'বাঙলার মন্দির', 'অমৃত', ৫ই ফাল্গুন. ১৩৭৮ সংখ্যা, পঞ্চানন রায়

১৩

অম্বিকা-কালনা ও নবাবহাটের মন্দির

বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনা ও বর্ধমান শহরের প্রান্তবর্তী নবাবহাট। স্থাপত্য ও অলংকরণের জন্য এই দুটি স্থানের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকোণা, দাসপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানকে বাদ দিলে এই দুই স্থানে যে মন্দিরের সমারোহ ঘটেছে, তা বিস্ময়কর। বেশিরভাগ মন্দিরেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বর্ধমানের রাজপরিবার। কয়েকটি ছাড়া প্রায় সব মন্দিরই খ্রিস্টীয় আঠার শতকে নির্মিত হয়েছিল। কালনায় মাত্র দুয়েকটি মন্দির উনিশ শতকে নির্মিত হয়।

অম্বিকা-কালনাকে 'মন্দির-শহর' বলা যায়। অম্বিকানগর বা অম্বিকা-কালনা নামে পূর্বে পরিচিত হলেও বর্তমানে এর নাম অম্বিকা-কালনা বা কালনা। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত এই শহর একসময় বর্ধমান রাজাদের একটি অতিপ্রিয় স্থান ছিল, তা অনুমান করা যায়। কারণ, এখানের প্রায় সব মন্দিরই রাজা ও তাঁর পরিবারবর্গের কোন না কোন সদস্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। 'বাংলা'-রীতির প্রায় সব শৈলীর মন্দিরই এই কালনা শহরে দেখা যায়। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় মন্দিরগুলি হোল, রাজবাড়ি এলাকার লালজীউ ও কৃষ্ণচন্দ্রের দুটি উচ্চ পঁচিশচূড়ো মন্দির। পঁচিশচূড়ো বা 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির বাঙলায় খুব কমই দেখা যায়, বিশেষ করে, একই জায়গায় দুটি পঁচিশচূড়োর মন্দির বিরল। শুধুমাত্র 'রত্ন' বা চূড়ার সংখ্যা দিয়ে নয়, মন্দিরদুটির বলিষ্ঠ গঠন - কৌশল, গাম্ভীর্য ও অলংকরণ মন্দির গবেষক ও স্থাপত্যকলা বিশেষজ্ঞমাত্রেরই অভিনিবেশযোগ্য। দুটি মন্দিরই দুই রাজমহিষীর প্রতিষ্ঠিত এবং খ্রিস্টীয় আঠার শতকের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায় নির্মিত। এই সময়ে এত উচ্চ ও বিশালায়তন মন্দির বাংলার খুব কম স্থানেই নির্মিত হতে দেখা যায়। অতএব অনুমান করা যায়, বাঙলার 'রত্ন' মন্দিরের চূড়ার সংখ্যা বাড়িয়ে পঁচিশচূড়ো মন্দির পর্যন্ত যে 'রত্ন'-মন্দির তৈরি হয়েছিল, বর্ধমান রাজপরিবারই তার সর্বোৎকর্ষ সাধন করেন। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে লালজীউ ও ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই শৈলীর মন্দির চরম উৎকর্ষে উপনীত হয়, যার তুলনা পরবর্তীকালে নির্মিত এই শৈলীর মন্দিরে দেখা যায় না। আরও উল্লেখ্য, গাম্ভীর্যপূর্ণ 'পঞ্চবিংশতিরত্নের' সঙ্গে বাঙালির একান্ত আপন চালারও সংযুক্তি এই দুটি মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়, যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই দুটি মন্দিরকে নিয়ে এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ 'ঠাকুরবাড়ি' (টেম্পল কমপ্লেক্স) তৈরি হয়েছিল যা বর্ধমান রাজাদের এক নিজস্ব রুচির পরিচায়ক। এ ধরনের একটি ঠাকুরবাড়ি মেদিনীপুর জেলার শহর চন্দ্রকোণার অযোধ্যায় অবস্থিত। তার নাম 'রঘুনাথবাড়ি'। সেখানেও উচ্চ ও বিশালায়তন মন্দিরের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। প্রতিষ্ঠাতা সম্ভবত বর্ধমানরাজপরিবারের কোন রাজা, কীর্তিচন্দ্রও হতে পারেন। তবে এই ঠাকুরবাড়ি ও নিকটবর্তী মল্লেশ্বর ঠাকুরবাড়ির সংস্কার করিয়েছিলেন তেজশ্চন্দ্র ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। রঘুনাথবাড়ির লালজীউর বিশালায়তন 'আটচালা' ও রঘুনাথজীউর উচ্চ 'দেউল' ও (বর্তমানে (২০০২) ভেঙে পড়েছে) এই বংশেরই কীর্তি বলে অনুমান করা যায়, যদিও প্রতিষ্ঠাকালীন কোন লিপি এই স্থানের মন্দিরে নেই। তবে একটি বিশিষ্ট প্রস্তরলিপিতে চন্দ্রকোণার 'ভান'-রাজবংশের রানি লক্ষ্মণাবতীর ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে লালজীউর এক 'নবরত্ন' মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। সেটি নিকটবর্তী লালগড়ে ছিল বলে কেউ কেউ বলেন।

পরবর্তীকালে বাংলায় আরও কিছু কিছু 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির নির্মিত হতে দেখা যায়,

যেমন হুগলি জেলার সুখাড়িয়ায় আনন্দময়ীর মন্দির (১৮১৩ খ্রি.), সোনামুখীর (বাঁকুড়া) শ্রীধরজীউ (১৮৪৫ খ্রি.), নাড়াজোলের (দাসপুর, মেদিনীপুর) পঞ্চবিংশতি রত্ন রাসমঞ্চ, চন্দ্রকোণার জিরাট-মুণ্ডমালার রসিকরায়ের মন্দির। (এই মন্দিরটি আসলে 'নবরত্ন'-রীতির হলেও এর চারপাশের দেওয়ালে বহু 'রত্ন' উদ্‌গত হয়ে মোট পঁচিশটি চূড়ার সৃষ্টি করেছে।) অবশ্য চন্দ্রকোণায় সতের চূড়ার মন্দিরও আছে।

কিন্তু কালনা শহরের এই দুটি পঁচিশচূড়া মন্দির বাংলার শেষ-মধ্যযুগীয় মন্দিরস্থাপত্যের ইতিহাসে অনন্য, এটা অস্বীকার করা যায় না। যেমন মল্লরাজ পরিবার-প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের অনন্যসাধারণ 'টেরাকোটা'- মন্দিরগুলি শেষমধ্যযুগের বাংলার মন্দিরস্থাপত্যভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অতুলনীয় হয়ে আছে। অবশ্য, বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির প্রায় সবই নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় সতের শতকে।

তেমনি কালনা মহকুমা শহরে শুধুমাত্র মন্দিরের প্রাচুর্য নয়, তাদের বিচিত্র স্থাপত্য ও টেরাকোটা অলংকরণ যে কোন শিল্পরসিকের অনুসন্ধানের বিষয়। বর্ধমানের নবাবহাট ছাড়া একমাত্র কালনাতেই আছে একশ নয়টি শিবমন্দির, যা অন্যত্র বিরল। আরও উল্লেখ্য, প্রায় সব মন্দিরেই আছে প্রস্তর ও টেরাকোটা-ফলকে খোদিত লিপি। লিপিগুলি থেকে মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানা যায়। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই, কালনার সব মন্দিরই আশ্চর্যজনকভাবে অক্ষত ও সুরক্ষিত, শুধুমাত্র শ্যামগঞ্জ-জগন্নাথতলার জোড়া শিবমন্দির ছাড়া। এখানের 'আটচালা'-শৈলী শিবমন্দিরদুটির দৈন্যদশা দেখে হতাশ হতে হয়। খ্রিস্টীয় আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একেবারে গোড়ায় (১৭৫১ খ্রি.) নির্মিত এই দুটি মন্দির বর্ধমানরাজ চিত্রসেন রায়ের দুই রানির প্রতিষ্ঠিত এবং এবং টেরাকোটার সুন্দর অলংকরণে সজ্জিত। অথচ দুটি মন্দিরের সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই নেই। ভাগীরথী তীরবর্তী এই মন্দিরদুটি বিচিত্র টেরাকোটা ভাস্কর্যের জন্যে বিশেষ আকর্ষণীয়। কিন্তু গ্রন্থকারের পরিদর্শনকালে (৬ নভেম্বর ২০০১) লক্ষ্য করা গেল, অবহেলা ও অনাদরের ফলে এগুলির ধ্বংস অনিবার্য

বর্তমান কালনা সেকালে 'অম্বিকানগর' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের গোড়ায় (১৮০৯ খ্রি.) এখানে যে একশ নয়টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তার লিপিতে এখানের নাম যে তখনও 'অম্বিকানগর' ছিল, তা জানা যায়। ('প্রাকার্ষীদ মহদম্বিকাখ্যনগরে কৈলাশমেতং নবং')। এছাড়া, এই স্থানের খ্রিস্টীয় সতের শতকের শেষদিকের কবি প্রাণবল্লভ ঘোষ-রচিত 'জাহ্নবীমঙ্গল' পুঁথিতে (পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ কর্তৃক দাসপুর থানার চেতুয়া-বাসুদেবপুরে আবিষ্কৃত) এখানের নাম 'অম্বিকানগর' ছিল জানা যায়। ('অম্বিকানগরে স্থিতি কৃষ্ণপদে করি নতি বিরচিল শ্রী প্রাণবল্লভ')। অম্বিকানগর ছিল একটি প্রাচীন স্থান। প্রাণবল্লভ লিখেছেন, সেসময় (কাব্যরচনাকাল ১৬৯৭ খ্রি.) অম্বিকানগরে অম্বরীশ প্রভৃতি অনেক সাধক বাস করতেন। অম্বিকানগরের প্রসিদ্ধ দেবী সিদ্ধেশ্বরীর 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে। মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের পুত্র চিত্রসেন এটি প্রতিষ্ঠা করেন। কীর্তিচন্দ্র তখনও জীবিত। অম্বিকানগর 'আম্বুয়া মুলুক' নামেও পরিচিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রী 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' এই নামের উল্লেখ আছে। তবে এই স্থানে বর্ধমান রাজের অভ্যুদয়ের পূর্বে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার প্রমাণ এখানের কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ, যেগুলি ১৪৯০ খ্রি. থেকে ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তৈরি হয়েছিল। যেমন, মজলিস সাহেবের

মসজিদ (১৪৯০খ্রি.), উলুগমসনদ খানের প্রতিষ্ঠিত দাঁতন কবিতলার মসজিদ (১৫৩৩ খ্রি.), সরওয়ার খান মসজিদ (১৫৫৯ খ্রি.)।

পাঠান ও মুঘল আমলে এই স্থানে উপরি উক্ত মসজিদগুলি প্রতিষ্ঠিত হলেও খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের গোড়ায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে এখানে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটে। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়িতে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের শুভ পদার্পণে এখানে 'শ্রীপাট' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাধক ভগবানদাস বাবাজির আখড়া প্রভৃতি স্থাপিত হয়। শাক্ত ও বৈষ্ণব এই উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভক্তিভাব জনজীবনে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্ধমানবাজাদের প্রতিষ্ঠালাভের আগে এই স্থানে বা আসপাশে তেমন কোন মন্দির নির্মিত হয় নি। বৈষ্ণবভাবাপন্ন বর্ধমান রাজপরিবার অম্বিকা-কালনায় রাধাকৃষ্ণ ও রামসীতার মন্দিরই প্রতিষ্ঠা করেছেন বেশি। এর সঙ্গে অবশ্য শিবমন্দিরও তাঁরা অনেক প্রতিষ্ঠা করেন। আগেই বলা হয়েছে, প্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বরী কালীর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন কীর্তিচন্দ্রের পুত্র চিত্রসেন রায়। তাই সব ধর্মসম্প্রদায়ের মন্দির অম্বিকা-কালনায় লক্ষ্য করা যায়। তবে অম্বিকা-কালনার বিষ্ণু-মন্দিরগুলি স্থাপত্য-ভাস্কর্যে অতুলনীয় সন্দেহ নেই। এমনকি, পশ্চিমবাংলায় এ ধরনের মন্দির খুঁজে পাওয়া যায় না।

রাজপরিবার-প্রতিষ্ঠিত অম্বিকা-কালনার মন্দিরগুলির অনেকগুলিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজমহিষীরা। তার মধ্যে পূর্বোক্ত লালজীউর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন কীর্তিচন্দ্রের মাতা রাজকুমারী ব্রজকিশোরী। (১৭৩৯। এই বছরই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়) কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির ও তার পাশে বিজয়াদিবৈদ্যনাথের 'আটচালা'রীতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ত্রিলোকচন্দ্রের মাতা মিত্রসেন রায়ের মহিষী। আবার শ্যামগঞ্জ-জগন্নাথতলায় জোড়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন চিত্রসেনের দুই রানি। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই, বর্ধমান রাজ-পরিবারের একমাত্র চিত্রসেন ও ত্রিলোকচন্দ্রের পুত্র তেজশ্চন্দ্র ছাড়া কোন রাজা অম্বিকা-কালনায় মন্দির-প্রতিষ্ঠা করেন নি। প্রায় সবই করেছেন রানিরা। আমাদের আলোচ্য নবাবহাটের এক শ আট শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তেজশ্চন্দ্রের মাতা। সময় ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ। কীর্তিচন্দ্রের পিতা জগৎরাম, জগৎরামের দ্বিতীয় পুত্র মিত্রসেন এবং মিত্রসেনের পুত্র ত্রিলোকচন্দ্র, এমনকি কীর্তিচন্দ্র স্বয়ং এই অঞ্চলে কোন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নি। তাই অনুমেয়, মন্দির-প্রতিষ্ঠার ঐতিহ্যের ধারিকা ছিলেন রাজমহিষীরা। এমনকি, তেজশ্চন্দ্রের মৃত্যুর অনেককাল পরে তাঁর পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মহিষী প্যারীকুমারী ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে রাজবাড়ি এলাকায় প্রচুর 'টেরাকোটা'- অলংকরণযুক্ত প্রতাপেশ্বরের দেউল তৈরি করান। এই মন্দিরে স্থপতি-শিল্পী ছিলেন সোনামুখীর (বাঁকুড়া) রামহরি মিস্ত্রি।

অম্বিকা-কালনার মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা ব্রজকিশোরী পুত্রের মৃত্যুর অনেক পরেও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমন কি, ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দেও তিনি সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কাছাকাছি অনন্তবাসুদেবের বিশালায়তন 'আটচালা' মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তবাসুদেব মন্দিরের লিপিপাঠ যদি ঠিক হয়, ('জগদ্রামস্য মহিষী কৃত্তিচন্দ্রনৃপপ্রসূ। শ্রীত্রিলোকচন্দ্রস্য নৃপতে র্যা পিতামহী') (দ্রষ্টব্য, কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত, বিবেকানন্দ দাশ, ১৯৯৯, পৃ. ৬৬) তাহলে মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের মাতা যে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন তাতে সন্দেহ থাকে না। তবু প্রশ্ন জাগে, কীর্তিচন্দ্রের মাতা এতকাল জীবিত ছিলেন কিনা?

অম্বিকা-কালনার মন্দিরগুলির অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার আগে প্রসঙ্গত বলা যায়, একই

স্থানে সন্নিবদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের জন্য উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি আরও কয়েকটি স্থান পশ্চিমবাংলায় বর্তমান। যেমন, গুপ্তিপাড়া, বাঁশবেড়িয়া ও সুখুড়িয়া (হুগলি) সোনামুখী (বাঁকুড়া), বেগুনিয়া (বরাকর, বর্ধমান), শিবনিবাস (নদীয়া), বড়নগর (মুর্শিদাবাদ), নাড়াজোল (দাসপুর, মেদিনীপুর। এছাড়া আরও কয়েকটি স্থানের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। একই বা বিভিন্ন শৈলীর মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যগত উৎকর্ষের পরিচয় এসব স্থানে লক্ষ্য করা যায়।

অম্বিকা-কালনায় 'রত্ন', 'চালা', 'চাঁদনি', 'দেউল', 'জোড়বাংলা'-প্রায় সব শৈলীর 'বাংলা'-মন্দির বর্তমান। শেষ-মধ্যযুগের বাংলায় এই জনপ্রিয় শৈলীর মন্দির বর্ধমানরাজপরিবারের হাতে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল, যেমন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের হাতে 'টেরাকোটা'-শিল্প ও মন্দিরস্থাপত্য সমগ্র বাঙলায় এক অনন্য শিল্পরূপে খ্যাতিলাভ করেছিল।

অম্বিকাকালনায় 'জোড়বাংলা'-শৈলীর একমাত্র মন্দিরটি হোল সিদ্ধেশ্বরীর। মন্দিরটি ইঁটের তৈরি ও দক্ষিণমুখী। সামনে একটি লিপি থাকলেও তা রঙের প্রলেপে ভীষণ অস্পষ্ট। জনৈক লেখকের পূর্বে উদ্ধারীকৃত লিপিটির পাঠ এখানে দেওয়া হল ঃ '৮ শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৬১ দি/য়তাম শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবীং শ্রীযুতমহারাজ চিত্র/ সেন রায়স্য মিস্ত্রি শ্রীরামচন্দ্র। (দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ১১)। অতএব লিপি থেকে জানা যায়, এই মন্দির রাজা চিত্রসেন রায় ১৬৬১ শকাব্দ বা ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের মিস্ত্রী ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। মন্দিরে দু-চারটি পোড়ামাটির ফুল-ছাড়া অন্য কোন অলংকরণ নেই। কিন্তু অনেকবার সংস্কারের ফলে সামনের অলংকরণ অনেকটাই অপসারিত। দেবী সিদ্ধেশ্বরী বামা কালী, চতুর্ভুজা।

মন্দিরটি উচ্চ ভিত্তিবেদির ওপর অবস্থিত। এর পার্শ্ববর্তী পুবদিকে চারটি 'আটচালা' রীতির শিবমন্দির পাশাপাশি পশ্চিমমুখী অবস্থিত। একটি ভগ্ন। এদের মধ্যে দুটিতে লিপি আছে। একটির লিপি ঃ 'শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৬৬৮/৯/৩/৬/ শ্রী রামদেব নাগস্য' (তদেব, পৃ. ১২)। অর্থাৎ লিপি থেকে জানা যায়, ১৬৬৮ শকাব্দ বা ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে রামদেব নাগ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কেউ কেউ বলেন, এই রামদেব নাগ ছিলেন মহারাজ তিলকচাঁদের সচিব। তখন বর্ধমানের রাজা ছিলেন ত্রিলোকচন্দ্র বা তিলকচাঁদ। তিলকচাঁদ ১৭৪৪ থেকে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অপর একটি আটচালার লিপি থেকে জানা যায়, তিলকচাঁদের মাতা লক্ষ্মীদেবী ১৬৮৫ শকাব্দ বা ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্যামগঞ্জ-জগন্নাথবাটি ঃ এখানে 'আটচালা'-রীতির দুটি বৃহৎ শিবমন্দির পাশাপাশি বর্তমান। একই ভিত্তিবেদির ওপর অবস্থিত। ইঁটের এই দুটি মন্দিরই দক্ষিণমুখী। পাশেই গঙ্গার খাত। এই স্থান পূর্বে 'জগন্নাথঘাট' নামে পরিচিত ছিল। মন্দিরদুটি এখন খুবই শোচনীয় অবস্থায় বর্তমান। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকলেও নোংরা আবর্জনায় মন্দিরের ভাঙা খোলা বারান্দা ও ঢাকা বারান্দা পরিপূর্ণ।

কিন্তু দুটি মন্দিরেরই সামনের দেওয়ালে 'টেরাকোটা'-অলংকরণ প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। 'টেরাকোটা' মূর্তিফলক, ফুলকারি নকশা এখনও অনেকগুলি অক্ষত আছে। তবে যত্ন ও সংরক্ষণের অভাবে শীঘ্র ধ্বংসের পথে বলা যায়। এই ধরনের মন্দিরদুটি যে অবশ্যই সংরক্ষণযোগ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পশ্চিম দিকের 'আটচালা' মন্দিরটির দেওয়ালে যে লিপি আছে, তার যথাযথ পাঠোদ্ধার এই ঃ 'বাণাদ্রিমাতৃকামানে। শকে প্রাসাদমৈষ্টকং

চিত্রসেনস্য মহিষী মহেশায় ন্যবেদয়ৎ
শকাব্দা ১৬৭৫'

অর্থাৎ বাণ =৫ অদ্রি =৭, মাতৃকা =১৬ (ষোড়শমাতৃকা)। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই নিয়ম অনুসারে ১৬৭৫ শকাব্দ বা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইঁটের তৈরি এই মন্দির (প্রাসাদ) চিত্রসেনের মহিষী মহেশকে নিবেদন করলেন। এখানে মহিষীর নাম কি ছিল, তা বলা নেই। তবে কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম ছিল ছন্দকুমারী (তদেব, পৃ. ৬৪)। এই লিপিতে শিবের কোন নামেরও উল্লেখ নেই। মন্দিরের পূর্বদিকের 'আটচালা'য় কোন লিপি বর্তমানে নেই। তবে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লিপির কিছু অংশ ছিল বলে কেউ কেউ বলেছেন (তদেব পৃ. ৬৪) সেই অংশটুকু হোল, '.........শাকে রুদ্রায় মন্দিরং/রাজ্ঞী প্রাদাৎ কানীয়সী' অর্থাৎ কনিষ্ঠা মহিষী রুদ্রের (শিবের) উদ্দেশ্যে এই মন্দির দান করলেন। এই কনিষ্ঠা মহিষীর নাম ইন্দ্রকুমারী বলে কেউ কেউ অনুমান করেন।

অনন্তবাসুদেবের 'আটচালা' ঃ

ইঁটের এই বিরাট 'আটচালা' মন্দির পূর্বোক্ত সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়ির বিপরীত দিকে অবস্থিত। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। কার্নিশের নিচে কয়েক সারির লিপি আছে। সংস্কৃত ভাষায় লিপিটি এই ঃ

'রসাব্ধিরস চন্দ্রাঙ্কগণিত্যেব্দে শকাবধি।
চক্রে বৈকুণ্ঠনাথস্য মন্দিরং সুমনোহরম্
জগদ্রামস্য মহিষী কৃত্তিচন্দ্রনৃপ প্রসূ
শ্রী শ্রী ত্রিলোকচন্দ্রস্য নৃপতে র্যা পিতামহী'

অর্থাৎ রস = ৬ অব্ধি =৭ রস =৬ চন্দ্রাঙ্ক =১। ১৬৭৬ শকাব্দ বা ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে জগৎরাম রায়ের মহিষী এবং রাজা কীর্তিচন্দ্রের জননী রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের পিতামহী বৈকুণ্ঠনাথের অতিরমনীয় মন্দিরটি করলেন। অনন্তবাসুদেবের মূর্তিটি কালো পাথরের একটি ফলকে খোদিত অর্ধোত্থিত ভাস্কর্য। মন্দিরে এখন রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে (২০০১)। লিপি থেকে জানা যায়, সেসময় বর্ধমানের রাজা ছিলেন ত্রিলোকচন্দ্র বা তিলকচাঁদ। তাঁর পিতামহী তখনও জীবিত, যদিও তখন তাঁর পুত্র কীর্তিচন্দ্র ও তৎপুত্র চিত্রসেন উভয়েই মৃত। কীর্তিচন্দ্রজননী খুবই ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। প্রাণবল্লভের 'জাহ্নবীমঙ্গল' পুঁথিতেও কবি এই মহিষীর গুণগান করেছেন। মন্দিরে পোড়ামাটির কয়েকটি ফুল ছাড়া অন্য কোন মূর্তিভাস্কর্য নেই। তবে সংস্কারের আগে কি ছিল তা জানা যায় না।

অম্বিকা-কালনার রাজবাড়ি এলাকার বৃত্তে কালনার প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি অবস্থিত। এই বৃত্তের দক্ষিণদিকের প্রবেশদ্বারের বাইরে পাকা রাস্তার পাশে একশ নয়টি শিবমন্দির অবস্থিত। এর নাম 'নবকৈলাস মন্দির'। লিপিতেও একথা বলা হয়েছে। এটি মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের এক অসাধারণ কীর্তি।

দুটি বৃত্তের মধ্যে এই বিশাল মন্দিরপংক্তি অবস্থিত। বর্হিবৃত্তে চুয়াত্তরটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। উত্তরদিকে মূল প্রবেশদ্বার। ভেতরের বৃত্তে চৌত্রিশটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ বর্তমান। কিন্তু এই বৃত্তের পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি প্রবেশদ্বারও মন্দিরাকৃতি। ভেতরের বৃত্তে একটি গোলাকার প্রাঙ্গণ, যার চারপাশে মন্দিরগুলি বেষ্টন করে আছে। প্রবেশদ্বার, মন্দির সবই 'আটচালা' রীতির। কিন্তু কোন মন্দিরেই কোন 'টেরাকোটা'-অলংকরণ নেই। সব আটচালাই মধ্যমাকৃতি। বলা বাহুল্য, সবগুলিই ইঁটের তৈরি। পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের তত্ত্বাবধানে সব মন্দিরই সুরক্ষিত। উত্তরদিকে মূল

প্রবেশদ্বারের ওপরে পাথরের লিপিটি সারি অনুসারে যেমন যেমন আছে, ঠিক তেমনই উদ্ধার করা হল ঃ

'শাকে চন্দ্রশিবাক্ষিসপ্তি কুমিতে শ্রী
তেজচন্দ্রাভিধো রাজা সূর্য্য ইবাস্থি
রার্পিতচলচ্চণ্ডপ্রতাপানলঃ
শম্ভো র্ধাম পরং নবাধিকশতশ্রী
মন্দিরৈ র্মণ্ডলং প্রাকার্ষীম্মহদা
ম্বিকাখ্যনগরে কৈলাশমেতং নবং'

এর অর্থ হল, চন্দ্র =১, শিবাক্ষি = ৩ সপ্ত = ৭ কু = ১। অর্থাৎ ১৭৩১ শকাব্দে বা ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে অম্বিকানামক নগরে শ্রীতেজচন্দ্র নামে রাজা একশ নয়টি শ্রীমন্দিরমণ্ডল শিবালয় নবকৈলাসরূপে তৈরি করলেন। রাজা তেজশ্চন্দ্র যেন স্বয়ং সূর্য যার মধ্যে স্থির আছে ভয়ঙ্কর বহ্নি। রাজা তেজচন্দ্রের মধ্যেও প্রতাপানল প্রচণ্ড, কিন্তু সচল।

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে অম্বিকা-কালনায় একটি রাজবাটিও তৈরি করান। তার আগের রাজাদের আমলে বাসগৃহ থাকলেও রাজবাটির প্রবেশপথের ওপরে একটি লিপি থেকে এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৩১ শকাব্দ বা ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ বলে জানা যায়।

উত্তরদিকে লালজীউর ঠাকুরবাড়ির বাইরে প্রবেশদ্বারের পশ্চিম পাশে (বড়বাজার থেকে প্রবেশপথের পশ্চিমে) তেজশ্চন্দ্রের মাতা শিবের একটি সুদৃশ্য 'আটচালা'-রীতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সামনের লিপি থেকে জানা যায় যে, ১৭০৫ শকাব্দ বা ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের মাতা চন্দ্রের প্রভার ন্যায় প্রভাযুক্ত শ্রীকণ্ঠের (শিব) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে আগে শুভ্রলিঙ্গ শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংস্কৃতভাষায় রচিত লিপিটি এখানে উদ্ধৃত করা হোল। (সারি অনুসারে যেমন আছে) ঃ

'বাণব্যোমধরাধরেন্দুগণিতে শা
কে শশাঙ্কপ্রভশ্রীকণ্ঠস্যনিবা
স মন্দিরমিদং রাধাপতি প্রীতয়ে
শ্রীলশ্রীযুততেজচন্দ্র ধরণীধৌরেয়
চূড়ামণে র্মাতা সম্প্রতি নির্ম্মমে সুর
সরিৎক্ষেত্রেম্বিকাখ্যে পুরে।। ১৭০৫'

মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের মাতা এই মন্দির নির্মাণের পাঁচবছর পরে নবাবহাটের ১০৯টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, এই লিপিতে রাধাপতি বা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্যে তিনি শ্রীকণ্ঠের মন্দির নির্ম্মাণ করলেন। নবাবহাটের লিপিতেও একথার উল্লেখ আছে। এই মন্দিরের সামনের দিকে 'টেরাকোটা' ফলক কিছু ছিল। তার অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গেছে। কেউ কেউ এই শিবকে রামেশ্বর শিব বলেছেন। কিন্তু লিপিতে রামেশ্বর নাম পাওয়া যায় না।

উত্তরদিক থেকে বিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে প্রথমেই প্রাচীর-বেষ্টিত লালজীউ ঠাকুরবাড়ি। লালজীউর বিশাল পঁচিশচূড়া মন্দির আয়তন ও গাম্ভীর্যের দিক থেকে অসাধারণ। এই মন্দির ও পূর্বোক্ত সিদ্ধেশ্বরীর 'জোড়বাংলা' একই বছর প্রতিষ্ঠিত হয়। কীর্তিচন্দ্রের মাতা রাজকুমারী ব্রজকিশোরী এই বিশাল মন্দির ১৬৬১ শকাব্দ বা ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন।

লিপিটি এখানে দেওয়া হল ঃ

'যৎপুত্রা ঃ (ত্রঃ) পৃথিবীতলে সুবিদিতাঃ (তঃ) সৎ কৃর্ত্তিচন্দ্রঃ কৃতী
সা শ্রীরাজকুমারিকাঃ (কা) ব্রজকিশোরী কৃষ্ণভক্তয়র্থিনী
শাকে বৈকষড়র্ত্তুচন্দ্রগণিতে প্রাসাদমেতং দদৌ
রাধাকৃষ্ণযুগায় সৎ কবিসভামধ্যেষু তৎপ্রীতয়ে'

সংস্কৃত স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত এই লিপি থেকে জানা যায়, রাজকুমারী ব্রজকিশোরী ছিলেন মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের মাতা। প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ আছে ১৬৬১ শকাব্দ (১৭৩৯ খ্রি.)। দক্ষিণমুখী ইঁটের এই মন্দির এবং আলোচ্য কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সামনের দেওয়াল সংলগ্ন 'একচালা' মণ্ডপ, যা স্থাপত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ভূমিতল নিয়ে মন্দিরটির চারটি তল। সব চূড়াগুলিই দ্বিতল থেকে চারতলায় সন্নিবেশিত।

নিচের চালাটির দুটি পূর্ণ 'ইমারতি' ও দুটি অর্ধ 'ইমারতি' স্তম্ভ। চালার বক্রাকৃতি ঢালু চাল যেন একটি গ্রাম্য কুটির। থামের গায়ে ও চালার দেওয়ালে ও ভেতরে গর্ভগৃহের সামনের দেওয়ালে বহু 'টেরাকোটা'-মূর্তিফলক সন্নিবেশিত। 'টেরাকোটা-ফলকগুলিতে দেব-দেবীলীলাদৃশ্য ছাড়া বহু সামাজিক দৃশ্য রূপায়িত। এছাড়া বহু ফুলকারি নকশাও আছে।

লালজীউর এই মন্দিরের সামনের সব দিক খোলা বিশাল একটি 'বারদুয়ারী' নাটমন্দির বর্তমান। এটি খাঁটি 'চারচালা'-রীতির স্থাপত্য। ঢালু চাল ও চার চালের বাঁকানো কার্নিশের ছাঁচা গ্রামবাংলার সেকালের খোড়ো চালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চালাটি সুন্দর সুন্দর 'ইমারতি' থামের ওপর স্থাপিত এবং ওপরে ফুলকাটা খিলানগুলি সুন্দর। এই ঠাকুরবাড়িতেই আছে উত্তরমুখী 'গিরিগোবর্ধন' মন্দির। এটি এক নূতন স্থাপত্যকীর্তি। প্রচলিত 'চালা'-রীতিতে নির্মিত না হলেও এর ঢালু চালের মধ্যে চালার সাদৃশ্য আছে। তবে চাল বড় বড় শিলার আকারে তৈরি। যেন পর্বতের অনুকরণ। এর সামনে কোন ঢাকা বারান্দা নেই। ভেতরের দেওয়ালে রঙিন ফ্রেসকো চিত্র অঙ্কিত। এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস. বস্ত্রহরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চালে কিছু কিছু মূর্তি বর্তমান। গিরিগোবর্ধন নির্মিত হয় ১৬৮০ শকাব্দ বা ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এখানে যে লিপি আছে, তাতে বর্ধমান রাজপরিবারের সব রাজারই নাম আছে। সে সময় তিলকচাঁদের রাজত্বকাল। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যে রাসমঞ্চ আছে, তা অন্যান্য স্থানের মতো প্রচলিত রাসমঞ্চ আদৌ নয়। অন্য রাসমঞ্চ যেমন নয়চূড়া, সতেরো চূড়া প্রভৃতি হয়, সেক্ষেত্রে এই রাসমঞ্চের মাত্র একটি চূড়া। তাও গম্বুজাকৃতি। বৃত্তাকার রাসমঞ্চটির দুটি অংশ ঃ বাইরের বৃত্তে আছে উন্মুক্ত চব্বিশটি দ্বার এবং ভেতরের বৃত্তে আটটি দ্বার। উন্মুক্ত আটদ্বারযুক্ত গর্ভগৃহের ছাদের ওপর গম্বুজ স্থাপিত। এখানেই দেববিগ্রহ স্থাপিত হত রাসযাত্রার সময়।

রাসমঞ্চের অল্প উত্তর-পূর্বে রূপেশ্বর শিবের দক্ষিণমুখী 'চাঁদনি'-রীতির মন্দিরটি সুদৃশ্য। ইঁটের তৈরি এই মন্দিরের সামনে বা কোথাও কোন 'টেরাকোটা'-অলংকরণ নেই। সামনের 'ইমারতি' থাম ও ফুলকাটা 'দরুণ' খিলানগুলি স্থাপত্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। সমতল ছাদবিশিষ্ট 'চাঁদনি'-রীতির এই ধরনের মন্দির ভারতীয় মন্দিরস্থাপত্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক, গুপ্তযুগে যার সূচনা হয়েছিল। এই মন্দিরটির সাথে আমরা যদি সাঁচির ১৭ নং মন্দিরটি পাশাপাশি রাখি, তাহলে সেই মন্দিরটির সাথে এর কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়বে। সাঁচির বিখ্যাত স্তূপের অদূরবর্তী ঐ

মন্দিরটি (১৭ নং) একটি ক্ষুদ্রাকৃতি সমতল ছাদবিশিষ্ট দেবালয়, যার চারদিকে উন্মুক্ত বারান্দা কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভের ওপর ন্যস্ত। গুপ্তযুগের (আ. খ্রি. ৫ ম শতক) ঐ মন্দিরটি শক্ত পাথরে তৈরি। রূপেশ্বরের এই 'চাঁদনি' মন্দিরটির সম্মুখে ত্রিখিলান মুক্ত প্রবেশপথ, কিন্তু পার্শ্ববর্তী দুই দিক ঢাকা।

মন্দিরের সামনে কার্নিশের নিচে মার্বেল পাথরের লিপি ঃ (যেমন সারি আছে)

শ্রীরামপ্রতিমো মহাগুণময়স্ত্রৈলোক্যচন্দ্রোনৃপ
তস্যাস্তে নৃপশেখরস্য মহিষী জ্যেষ্ঠা ধরিত্রীসুতা।
সাকার্ষীত্রিপুরান্তকস্য ভবনং কৈলাসশৈলোপমং
শাকে তত্র রসাষ্টষণ্মহীমিতে চাপেয়মার্তণ্ডকে।।

রূপেশ্বর শিবের মন্দির নামে পরিচিত হলেও লিপিতে ত্রিপুরান্তক বা ত্রিপুরারির উল্লেখ আছে। লিপি থেকে জানা যাচ্ছে, রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা মহিষী 'রাসাষ্টষট্‌মহী' শকে অর্থাৎ ১৬৮৬ শকাব্দে বা ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মন্দিরের ঠিক পূর্বে পাঁচটি ছোট ছোট শিবমন্দির লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরগুলি সবই 'আটচালা'-রীতির। এগুলিতে আগে প্রতিষ্ঠালিপি ছিল। এর মধ্যে একটিতে লিপির যে অংশটুকু আছে, তা থেকে জানা যায়, কাশীনাথের ঐ মন্দিরটি ১৭৬৭ শকাব্দ বা ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন, এই মন্দির মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের পাটরানি কমলকুমারীর সহচরী দেবকী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাঙ্গণচত্বরের পূর্বদিকে কৃষ্ণচন্দ্রঠাকুর বাড়ি। কৃষ্ণচন্দ্রমন্দিরের পেছনে ঠিক উত্তরপাশে বিজয়াদিবৈদ্যনাথের বিশাল 'আটচালা'-রীতির মন্দির। ইঁটের তৈরি এই মন্দিরটি পূর্বমুখী। মন্দিরটির গর্ভগৃহের প্রবেশপথের ওপরে মারবেল পাথরে ক্ষোদিত লিপিটি সারি অনুসারে দেওয়া হল ঃ

কুমার শ্রীমিত্রসেন ধর্ম্মপত্নী শ্রিয়ান্বিতা।
লক্ষ্মীদেবী বৈদ্যনাথং সমারাধ্য সুতার্থিনী।১
ত্রিলোকচন্দ্রং তনয়ং লব্ধা দেবপ্রসাদতঃ।
নির্ম্মায় মন্দিরমিদং কারুকার্য্যসুশোভিতম্।।২
বিজয়াদিবৈদ্যনাথ নাম্নাত্র শিবলিঙ্গকম্।
মহেশ্বরস্য প্রীত্যর্থং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ।। ৩

এর অর্থ হল, কুমার শ্রীমিত্রসেনের ধর্মপত্নী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীদেবী পুত্রার্থী হয়ে বৈদ্যনাথশিবকে আরাধনা করে দেবানুগ্রহে ত্রিলোকচন্দ্র নামক পুত্র লাভ করেন। এরপর তিনি কারুকার্যমণ্ডিত এই মন্দির নির্মাণ করে বিজয়াদিবৈদ্যনাথ নামক শিবলিঙ্গ মহাদেবের প্রীতির জন্য ভক্তিপূর্বক স্থাপন করলেন।

লিপিটি থেকে জানা গেল না, মন্দিরটি কোন্ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? মারবেল পাথরের লিপি সম্ভবত সংস্কারকালের। কৃষ্ণচন্দ্রের পঁচিশচূড়া মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন ত্রিলোকচন্দ্রের মাতা ১৬৭৩ শকাব্দ বা ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে। লিপিফলকটি শক্ত কালো বা মুগনি পাথরের। কিন্তু বিজয়াদিবৈদ্যনাথের এই লিপি মারবেল পাথরের। আঠার শতকের মন্দিরের লিপিগুলোতে মারবেল পাথরের ব্যবহার প্রচলিত হয়নি। এর ব্যবহার আরও পরবর্তীকালের। তাই এটি মূল লিপি নয় বলে অনুমান করি। সংস্কারের সময় সেটি নষ্ট হয়ে যায়। তখন এই লিপি সন্নিবেশিত হয়। লিপিতে

প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ না থাকলেও এটি কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠার সমকালীন মনে করা যায়। কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের পেছনে একটি উচ্চ প্রাচীর দিয়ে এই শিবমন্দিরকে একটি পৃথক ঠাকুরবাড়িতে পরিণত করা হয়েছে এবং এই ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের দরজা দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসা যায়।

মন্দিরটির সামনের দেওয়ালের নিচের অংশে ও দুপাশের খোপে অজস্র টেরাকোটা ফলক সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের পৃথক্ তিন অংশে পোড়ামাটির অনেক ফুল ছাড়া কোন মূর্তি নেই। এদিক থেকে এই মন্দিরটির সঙ্গে পূর্বোক্ত তথাকথিত রামেশ্বর মন্দিরের অনেকটা মিল আছে। তাছাড়া এই দুটি মন্দিরের খিলানগুলিও এক। মন্দিরদুটিই 'আটচালা'-রীতির এবং দুটিরই স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য মোটামুটি এক, যদিও বিজয়াদিবৈদ্যনাথের মন্দিরটি আয়তনে বিশাল। অবশ্য, তথাকথিত রামেশ্বর মন্দির (১৭৮৩ খ্রি.) তেজশ্চন্দ্রের মাতা প্রতিষ্ঠা করেন। দুটি মন্দির একই মিস্ত্রীর হাতের হওয়া অসম্ভব নয়।

আলোচ্য এই মন্দিরের টেরাকোটামূর্তিফলকগুলি ভিত্তিবেদিসংলগ্ন দেওয়ালের প্যানেলগুলিতে ও তার ওপরের প্যানেলসমূহে সন্নিবদ্ধ। বিষয়বস্তু দেবদেবীর লীলাদৃশ্য ও সামাজিক দৃশ্য। একটি প্যানেলে দেবী জগদ্ধাত্রীর পুজোয় বলি দেওয়ার জন্য একটি ছাগলকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখা যায়। এছাড়া আছে সাহেবসুবোর কিছু মূর্তি ও শিকারদৃশ্য প্রভৃতি।

এই মন্দিরেরই পাশে কৃষ্ণচন্দ্রের সু-উচ্চ পঁচিশচূড়া মন্দির বর্তমান। ইঁটের তৈরি দক্ষিণমুখী এই সুদৃশ্য মন্দিরের সঙ্গেই সন্নিবদ্ধ রয়েছে একটি 'একচালা' মণ্ডপ। 'চালা'-মণ্ডপটির মাথায় লম্বা একটি মটকাবাঁধা যা গ্রামবাংলার সুপরিচিত খোড়ো 'চালার' কথা মনে করিয়ে দেয়। লালজীউর মন্দিরেও আমরা এইরূপ মটকাবাঁধা 'চালা' পেয়েছি। তাছাড়া, আমাদের আলোচ্য গোপালবাড়ির মন্দিরেও এ ধরনের মটকাবাঁধা 'চালা' আছে। সেটিও পঁচিশচূড়োর মন্দির। এগুলি থেকে সহজেই ধারণা করা যায়, এইরূপ মিশ্ররীতির মন্দির এক শ্রেণীর স্থপতি ও প্রতিষ্ঠাতার বেশ প্রিয় ছিল। এগুলোর মধ্যে 'চালা'র সৌন্দর্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। এইসব মন্দিরে সামনের 'চালা', পরিদর্শনকক্ষের কাজ করেছে। প্রায় প্রতিটি 'বাংলা'-শৈলীর মন্দিরে গর্ভগৃহসংলগ্ন যে ঢাকা বারান্দা দেখা যায়, সেগুলি এই পরিদর্শনকক্ষরূপে ব্যবহৃত হত। খোড়ো 'চালা' ঘরের অনুকরণে তৈরি 'চালা' মন্দির অম্বিকা-কালনায় একসময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এখানে 'চালা'র সব শ্রেণীই লক্ষ্য করা যায়।

মন্দিরটির গর্ভগৃহপ্রবেশপথের ওপরের দেওয়ালে প্রস্তরফলকে খোদিত একটি লিপি থেকে জানা যায়, তিলকচন্দ্রের মাতা ১৬৭৩ শকাব্দ বা ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরলিপিটি সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার আমরা করতে পারি নি। আংশিক পাঠোদ্ধার এখানে দেওয়া হলঃ

'বেদকোশ্ব (?)...
ষোড়শ সংখ্যকে শকাব্দে
মন্দিরমর্পিতমেতদ্রাজা শ্রী
তিলকচন্দ্র মাত্রা।। ১৬৭৩
সন ১১৫৯ সাল'

কেউ কেউ প্রথম সারির পাঠোদ্ধার করেছেন, 'শ্রীহরিচরণ সরোজগুণ মুনি'। অর্থাৎ গুণ

=৩ মুনি =৭ ষোড়শসংখ্যক =১৬, অর্থাৎ ১৬৭৩ শকাব্দ।

উচ্চ ভিত্তিবেদির ওপর মন্দিরটি অবস্থিত। ভূমিতল নিয়ে এর চারটি তল। দ্বিতলে বারোটি, ত্রিতলে আটটি ও চতুস্তলে পাঁচটি 'চূড়া' বা 'রত্ন' সন্নিবেশিত হয়েছে। সব তলের প্রবেশপথই 'ইমারতি' থামে গঠিত। থামের ওপরের ত্রিস্তরের 'ফুলকাটা' খিলানগুলি অর্ধচন্দ্রাকৃতি হলেও শীর্ষবিন্দুতে যেন ভাঁজ করার মতো মিলিত হয়েছে। 'চালা' বারান্দার ভেতরের ছাদ ও গর্ভগৃহের ভেতরের ছাদ সবই ভল্টে গঠিত।

চালাটির দেওয়ালের সর্বাংশেই রয়েছে অজস্র টেরাকোটামূর্তি ফুলকারি নক্শা। মূল মন্দিরের কার্নিশের নিচে খোপে খোপেও মূর্তিফলক বসানো। পাশের দেওয়াল বহু 'টেরাকোটা'-ফলকে সজ্জিত। শুধুমাত্র 'টেরাকোটা'র প্রাচুর্য নয়, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, সুন্দর সুন্দর ফুলের নক্শা উচ্চমানেরই বলা যায়। তাই স্থাপত্য ও অলংকরণ প্রাচুর্যের জন্য এই মন্দির সমগ্র বাংলার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ মন্দির বলা যায়। লালজীউর মন্দিরও এই পর্যায়ে পড়ে, তবে কৃষ্ণচন্দ্রের মতো এত অলংকরণ নেই। কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের নীচের প্যানেলগুলিতে অনেক চিত্তাকর্ষক দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে একটি দৃশ্য হরিনামসংকীর্তন। এই দৃশ্যে নৃত্যরত স্ফীতোদর বাবাজি এবং দুপাশে শ্রীখোলবাদন ও নৃত্যরত দুই বৈষ্ণবভক্ত এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রসহ ভক্তবৃন্দের দৃশ্য উল্লেখযোগ্য। এরই ঠিক ওপর রথের মধ্যে কৃষ্ণবলরামের যাত্রা ও গোপীদের বিলাপদৃশ্য সুন্দর। এখানে নানা ধরনের ফুলের নকশাও আছে। অন্যান্য মূর্তির মধ্যে সপরিবার দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর একটি প্যানেলও আছে। তবে গতানুগতিক দেবদেবীলীলাদৃশ্যের থেকেও সামাজিক দৃশ্যের ফলকগুলি বেশি আকর্ষণীয়। যেমন, শিকারদৃশ্য। হাতির ওপর রাজা বা জমিদারের গমন, সামনে মাহুত ও পেছনে দেহরক্ষী, ঝাম্পানে রানির গমন, নিচে পরিচারিকা, অশ্বারোহীর যুদ্ধ, অন্তঃপুরে বা সভায় রাজা বা জমিদারের কীর্তন বা 'মঙ্গলগান'-শ্রবণ, সমুদ্রবক্ষে দুর্দান্ত জলদস্যুদের জাহাজ ও তার ভেতর বন্দী, কোন কোন 'টেরাকোটা'ফলকে ভয়ংকর সিংহের ওপর কোন দেব বা দেবীর দণ্ডায়মান অবস্থায় যুদ্ধ প্রভৃতি বহু দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। কিছু কিছু মিথুনভাস্কর্যও এই মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, য়ুরোপীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে এদেশীয় কোন স্ত্রীলোকের মিথুনদৃশ্য। কৃষ্ণচন্দ্রমন্দির একটি অনন্য শিল্পকীর্তি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ 'টেরাকোটা'-মন্দিরগুলির থেকে এই মন্দিরের গুরুত্ব অপরিসীম। চারপাশে প্রাচীরবেষ্টিত এটি একটি লালজীউর মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ ঠাকুরবাড়ি, রন্ধনশালা প্রভৃতিও আছে।

রাজবাড়ি এলাকার প্রাঙ্গণচত্বরে পূর্বোক্ত রাসমঞ্চের দক্ষিণপাশে এই এলাকার একমাত্র সুদৃশ্য ও কারুকার্যমণ্ডিত 'দেউল'-মন্দির প্রতাপেশ্বরের। কেউ কেউ এটিকে জলেশ্বরের মন্দিরও বলেন। এর সমান্তরাল খাঁজকাটা গম্বুজাকৃতি শিখরটি দর্শনীয়। নিচের দালানের চারপাশের বাইরের দেওয়ালের প্রতিটি স্থানে ছোট ছোট অসংখ্য 'টেরাকোটা'-ফলক শিল্পীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই মন্দিরের স্থপতি শিল্পী ছিলেন সোনামুখীর (বাঁকুড়া) মন্দির-সূত্রধর রামহরি মিস্ত্রি। তিনি সোনামুখীর প্রসিদ্ধ শ্রীধরজিউর পঁচিশচূড়া মন্দির, কালনার প্রতাপেশ্বর দেউলের মতো একটি দেউল (যদিও এটি কারুকার্যমণ্ডিত নয়) নির্মাণ করেন। প্রতাপেশ্বর দেউল ১৭৭১ শকাব্দ ও ১২৫৬ বঙ্গাব্দে বা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে রাজকুমার প্রতাপচন্দ্রের মহিষী প্যারীকুমারী প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের দুটি লিপি এখানে উদ্ধার রা হল ঃ

'সংসারার্ণবতারণৈকতটিনীতীরে মুরারের্মুদে

শাকে ভেশনগা গঙেশ বিমিতে তারেশকায়াদদৎ।
শ্রীরাধেশ সুবেশ রাসরসিকানন্দস্য দাসী
মহারাজাধীশ প্রতাপচন্দ্র মহিষী প্যারীকুমারী মঠম্।।'

এর নিচে বাংলা লিপিটি হল ঃ

শাকে সপ্তদশ একাত্তপ্রমাণে অম্বিকায় অমরাহিনী সন্নিধানে
শ্রীরাধাবল্লভরাসরসিকসুন্দর শ্যামাঙ্গ ত্রিভঙ্গ অঙ্গ বিশ্বমনোহর
তাঁহার কিঙ্করী প্যারীকুমারী প্রধানা মহেন্দ্র প্রতাপচন্দ্রনরেন্দ্র অঙ্গনা
মহাস্থানে করি মহামন্দিরনির্ম্মাণ হরিপ্রীতে হরসিতে হরে দিলা দান।
শকাব্দা ১৭৭১ সন ১২৫৬ সাল
এই দেয়ুল সোনামুখীনিবাসী শ্রীরামহরি মিস্ত্রির নির্ম্মিত।

ইঁটের তৈরি পুবমুখী এই দেউলটি কলারসিকের কাছে এক বিস্ময়। 'টেরাকোটা'-মূর্তিফলকগুলি ও ফুলকারি নকশাকাজ খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের অবক্ষয়ী রূপটিকে প্রতিফলিত করলেও এর বেশির ভাগ ফলকের মধ্যে রয়েছে এক আশ্চর্য জীবনধর্মী সজীবতার প্রকাশ। শিল্পের কাজগুলোকে কত সহজ সুন্দর করে প্রকাশ করা যায়, টেরাকোটা ফলকগুলের মধ্যে তার আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে। মূর্তি ও নকশাগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম কারুনৈপুণ্যের পরিচয় না মিললেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, মূর্তিগুলোর সাজপোষাক ও অঙ্গভঙ্গিমা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গম্বুজাকৃতি শিখরের কার্নিশের ঠিক নিচে আছে দণ্ডায়মান বহু কৃষ্ণ রাধামূর্তি ও বিভিন্ন দেবদেবীর লীলাদৃশ্যও আছে। তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলাদৃশ্য প্রধান। এছাড়া আছে রামসীতার রাজ্যাভিষেক। মালাজপরত বৈষ্ণব সাধু, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গমহাপ্রভু, গণেশ, কালী, উত্তর দিকে বাইরের দেওয়ালে দশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গা ও তার দুপাশে দশানন রাবণ ও রামের যুদ্ধদৃশ্য ও তাঁদের অনুচরের প্যানেলটি খুবই আকর্ষণীয়। এছাড়া রয়েছে অজস্র সামাজিক দৃশ্যের 'টেরাকোটা'-ফলক। এই মন্দিরে বিদেশিনী মহিলার অনেক ফলক আছে। এমনকি, এদেশীয় মহিলাদের সাজপোশাকের মধ্যে ঘাগরার ব্যবহার বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে মহিলাদের সাজপোশাকের মধ্যে য়ুরোপীয় শৈলীর প্রভাবই বেশি। কিছু কিছু রাজস্থানী পোশাকেরও দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। উপবিষ্ট এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, গলায় মুক্তার মালা, দুই কাঁধে উত্তরীয় বর্তমান, তাঁর ঠিক বামপাশে অপর একটি ফলকে দণ্ডায়মানা এক বিদেশিনী মহিলা, ব্যক্তিটির হাতে গড়গড়া ও নল, তার ডানপাশের দুটি খোপে দুজন পরিচারক। সম্ভবত বর্ধমানের কোন রাজার। এছাড়া প্রাসাদ, জানালার ধারে উপবিষ্ট, মাতৃক্রোড়ে ক্রন্দনরত শিশু, দেবদেবীর পূজা অর্চনা প্রভৃতি অজস্র দৃশ্যফলক সন্নিবেশিত আছে।

এই সুদৃশ্য মন্দিরের টেরাকোটা-ফলকগুলির একটি যথাযথ পরিচয় লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বর্ধমানরাজপরিবারের প্রতিষ্ঠিত এটিই সর্বশেষ মন্দির বলে মনে করা যায়।

অম্বিকা-কালনায় পূর্বোক্ত সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের মোড়ের কাছাকাছি গোপালজিউর সুদৃশ্য বৃহৎ পঁচিশ চূড়া মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁটের তৈরি পুবমুখী এই মন্দিরটির সংলগ্ন সামনে পূর্বপ্রথামত একটি 'একচালা' মণ্ডপ বা 'জগমোহন' (audience hall)। 'চালা'র মাথায় ছোট্ট মটকাবাঁধা। মণ্ডপ অতিক্রম করে ভেতরে গর্ভগৃহের দেওয়ালের ওপরে পাথরের ফলকে সাত সারির একটি সংস্কৃত লিপি বর্তমান। লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হল ঃ

'শুভমস্তু শকাব্দাং ১৬৮৮
শাকাব্দে শরভাক্তি-রাত্রিপকলা
কোটীরমৃক্তজভূসংখ্যে বাহুজ (?)
বংশ ভূকোমলধীঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঃ
সুধীঃ। প্রাসাদ প্রদদৌ বিধায় পর
যা ভক্ত্যা পরব্রহ্মণে গোপালায় সমস্ত
বাঙময়পথা জাগায় বিশ্বাত্মনে।'

সংস্কৃত শার্দূলবিক্রীড়িতছন্দে রচিত এই লিপিটির ওপর রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে লেখকের পরিক্রমাকালে (২০০১)। তাতে লিপিটির পাঠ অনেকটা সহজসাধ্য হলেও অক্ষরের ছাঁদ ভিন্ন ধরনের হওয়ায় সম্পূর্ণ শুদ্ধপাঠ করা সম্ভবপর হয় নি।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এই গোপালজিউর মন্দির এক বিশিষ্ট পুরাকীর্তি। এর সুচারু খাঁজকাটা রত্নগুলির মধ্যে এক অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। বিশালতা ও আয়তনের দিক থেকে পূর্বোক্ত লালজীউ ও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু সেগুলির চূড়া এত সুন্দর নয়। চালার সামনের দিক ও থামগুলি সংস্কার করার ফলে এখানের পূর্ব অলংকরণ সবই নষ্ট হয়ে গেছে। তবে দুপাশের খোপে খোপে এবং ভেতরে এখন অজস্র টেরাকোটা মূর্তি লক্ষ্য করা যায়।

মন্দিরের উক্ত লিপি থেকে জানা যায়, ১৬৮৮ শকাব্দ বা ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে সুধী কৃষ্ণচন্দ্র পরব্রহ্মস্বরূপ গোপালকে এই প্রাসাদ দান করেন। তখন মহারাজ তিলকচাঁদের রাজত্বকালের শেষভাগ। কিন্তু এই কৃষ্ণচন্দ্র কে ছিলেন? লিপির এক অংশ থেকে জানা যায়, তিনি বাহুজবংশে জন্মগ্রহণ করেন ('বাহুজবংশভূঃ')। মন্দিরের দেওয়ালে যেসব 'টেরাকোটা' ফলক আছে, তা খুবই আকর্ষণীয়। দেবদেবীলীলা তো আছেই। কিন্তু সমকালীন সামাজিক দৃশ্যের যে প্যানেল আমরা পাই, তার মধ্যে যুদ্ধদৃশ্য, য়ুরোপীয়দের শ্বাপদশিকার, অশ্বারোহী, ঢোলবাদক, ঢাকবাদক, গোরুর গাড়িতে ফরসিসেবী কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গমন, উটের ওপর আরোহী, একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে দুজন সাহেব, কেদারায় উপবিষ্ট সাহেব ও এদেশীয় স্ত্রীলোক, দণ্ডায়মান অবস্থায় সাহেব ও এদেশীয় স্ত্রীলোকের মিথুনদৃশ্য, দাঁতালো হাতির ওপর মিথুনদৃশ্য, দেশি নৌকোর ওপর মাথায় দধিভাণ্ড নিয়ে গোপীদের গমন, অশ্বাকৃতি সিংহের ওপর দণ্ডায়মান কোন দেবীর যুদ্ধদৃশ্য, সাহেব ও তার উপপত্নী, প্রভৃতি দৃশ্য খুবই উল্লেখযোগ্য।

গোপালজীউর ঠাকুরবাড়ির চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। স্থাপত্য ও অলংকরণের ক্ষেত্রে এটি পশ্চিমবাংলার এক অমূল্য প্রত্নসম্পদ।

নবাবহাটের মন্দির

মহাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের *'আট হাট সোরগোল বত্রিশ বাজার'*-এর অন্যতম বর্ধমানের নবাবহাট বর্ধমান শহরের প্রান্তভাগে পশ্চিমে অবস্থিত। মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের মাতা বিষণকুমারী ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধে জয়ী হয়ে জপমালার মতো নবাবহাটের ১০৯টি শিবমন্দির ১৭১০ শকাব্দ ও ১১৯৫ বঙ্গাব্দে (১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দিরগুলির প্রায় সবই 'আটচালা'-রীতির। কিন্তু চারকোণে (ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ু) চারটি মন্দির 'আটচালা' রূপে গঠিত হলেও ছত্রাকৃতি। প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে মন্দিরাঙ্গনে

এলে ডানদিকে প্রথম মন্দিরেই প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে। লিপিটি আয়তক্ষেত্রাকার মারবেল পাথরে খোদিত। সারি অনুসারে লিপিটির যথাযথ পাঠোদ্ধার এখানে দেওয়া হল :

শ্রী শ্রী হরিঃ শকাব্দা ১৭১০ সন ১১৯৫। —
শাকে শূন্য শশাঙ্কশৈল কুমিতে নির্ম্মায় রাধা-
হরিপ্রীত্যৈপুণ্যবতী নবাধিকশতংশ্রীমন্দি
রাণি স্বয়ং ধীর শ্রীযুততেজচন্দ্র ধরণী ধৌরেয়
চূড়ামণের্ম্মাতা তৎসবিধে বিধায় সসরস্তৌলে সমস্থাপয়ৎ

লিপি থেকে জানা যাচ্ছে, মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের পুণ্যবতী মাতা ১৭১০ শকাব্দ ও ১১৯৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে একশ নয়টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অম্বিকা-কালনার মতো এখানের মন্দিরগুলি ভেতর ও বাইরের দুটি বৃত্তে অবস্থিত নয়। সমকোণযুক্ত বর্গক্ষেত্রাকারে এগুলি সংস্থিত। একই লম্বা বেদিতে মন্দিরগুলি পর পর অবস্থিত। প্রতিকোণে পূর্বোক্ত ছত্রাকৃতি মন্দির স্থাপিত। মন্দিরগুলির সম্মুখসংলগ্ন উদ্‌গত 'একচালা' মণ্ডপগুলি মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেছে। এই ধরনের 'চালা'র ব্যবহার আমরা আগে অম্বিকাকালনার 'রত্ন'-মন্দিরগুলিতে লক্ষ্য করেছি। নবাবহাটের এইসব মন্দিরে এই রীতিই অনুসৃত। তবে এই 'চালা'মণ্ডপগুলি এখানে শুধুমাত্র অলংকরণরূপে ব্যবহৃত, এর ব্যবহারিক কোন উদ্দেশ্য নেই।

এই ঠাকুরবাড়ির প্রশস্ত অঙ্গনে বাগান ও পুকুর বর্তমান। প্রতিমন্দিরেই শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। মন্দিরের কোথাও কোন অলংকরণ নেই। মন্দিরগুলি দীর্ঘকাল বিনা সংস্কারে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ায় ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট এগুলির সংস্কার করেন।

১৪
মুর্শিদাবাদের মন্দির

মুর্শিদাবাদ নাম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের নামে খ্রিস্টীয় আঠার শতক থেকে (১৭০৪ খ্রি.) চলিত হলেও তার আগে এই স্থান মুকসুদাবাদ বা মুকসুসাবাদ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু প্রাচীনকালে এই অঞ্চল কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এটা হল রাঢ়দেশ বা উত্তরাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে (৬৩৮ খ্রি.) পরিব্রাজক সুয়ান সাঙের (হিউয়েন সাঙ) বিবরণীতে যে কয়েকটি জনপদের নাম পাওয়া যায়, সেগুলি হল রাজমহলের পার্শ্ববর্তী কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধন (উত্তর বাংলা), কর্ণসুবর্ণ (মধ্যবাংলা), সমতট (দক্ষিণপূর্ব বাংলা) এবং তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণপশ্চিমবাংলা)। গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের (খ্রি. ৬০১-৬২৫) সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল পুন্ড্রবর্ধন ও কর্ণসুবর্ণ। সে-সময় এই দুটি স্থান খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। বিশেষ করে, কর্ণসুবর্ণ পরিদর্শন করে সুয়ান সাঙ বলেছেন, ওই স্থান তখন ছিল ফলপুষ্পে সমৃদ্ধ, বেশ স্বাস্থ্যকর, অধিবাসীরা সাধুভাবাপন্ন। তারা বিদ্যার সমাদর করত। বহু দেবমন্দির, বিহার, সঙ্ঘারাম ও স্তূপ ছিল এই রাজ্যে। এখানকার অধিবাসীরা ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মাবলম্বী। এই রাজ্যে দশটি সঙ্ঘারাম ও দু-হাজার আচার্য ছিল। সুয়ান সাঙ এখানে পঞ্চাশটি দেবমন্দির দেখেছিলেন। পূর্বোক্ত দশটি সঙ্ঘারাম ছাড়া তিনি আরও তিনটি সঙ্ঘারামের উল্লেখ করেছেন। রক্তমৃত্তিকা বিহার ছিল সকলের শ্রেষ্ঠ। এখানে অশোকের প্রাচীন স্তূপও ছিল। রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি থেকে পাথরের তৈরি দেবদেবীর অনেক ভাঙা মূর্তি ও মন্দিরের পাথরের ফলক পাওয়া গেছে। রাঙামাটি থেকে গুপ্তযুগের অনেক মুদ্রাও পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, গুপ্তবংশের এক শাখা এখানে বহুকাল বাজত্ব করেছেন। পরে এই স্থান মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজধানী হয়।

কর্ণসুবর্ণ ঃ কর্ণসুবর্ণ স্টেশন থেকে প্রায় দু কিলোমিটার পুবে 'রাজবাড়িডাঙা'র একটি উঁচু ঢিবিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে যে উৎখনন কার্য হয়, (যার প্রধান ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক স্বর্গত ড. সুধীররঞ্জন দাশ) তার ফলে খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আয়তক্ষেত্রাকার এক বিশাল 'পঞ্চায়তন' মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মন্দিরের ভিত্তিভূমি ও দেওয়ালের কিছু অংশ লক্ষ্য করা গেছে। জানা যায়, মূল মন্দিরটি ছিল 'ত্রিরথ' (স্বাভাবিকভাবেই এটি 'দেউল'-রীতির)। এর উত্তরমুখী প্রবেশদ্বারের সামনে একটি মণ্ডপ ছিল। মূলমন্দির-প্রাঙ্গণের চারকোণে চারটি ছোট মন্দির ছিল। এই 'পঞ্চায়তন'-মন্দিরের সীমানা নির্দেশক একটি প্রাচীরও ছিল। মন্দিরের দেওয়ালে কয়েকটি কুলুঙ্গি দেখা যায়। সেখানে সম্ভবত মূর্তি বসানো ছিল। এই 'পঞ্চায়তন' মন্দির প্রাচীনকালে বাংলায় বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই শৈলীর মন্দির ভুবনেশ্বরে এখনও বর্তমান। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার পাঁচথুপি গ্রামে জমিদার ঘোষ-হাজরাদের প্রতিষ্ঠিত একটি পঞ্চায়তন মন্দির এই রীতির মন্দিরের একটি নিদর্শন এখনও বর্তমান। তবে এই মন্দির খ্রিস্টীয় আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়। কালক্রমে প্রাচীনকালের এই 'পঞ্চায়তন' মন্দির অপ্রচলিত হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যোত্তরকালে এর বদলে 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরের উদ্ভব হয়। আর একটি এই ধরনের মন্দির আছে বর্ধমান জেলার বৈকুণ্ঠপুরে।

মুর্শিদাবাদ জেলার যে ভৌগোলিক সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়, তাতে গঙ্গা-ভাগীরথীর দ্বারা বিভাজিত দুটি অংশ পাওয়া যায়। পুবদিকের পলিমাটি-গঠিত ব-দ্বীপ গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চলটি 'বাগড়ি' নামে এবং ভাগীরথীর পশ্চিমদিকের বিস্তীর্ণ স্থানটি প্রাচীন রাঢ়-ভূমি নামে পরিচিত। পালসম্রাট ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন-অনুসারে যে ব্যাঘ্রতটিমণ্ডল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল, আলেকজাণ্ডার কানিংহাম মুর্শিদাবাদের এই বাগড়ি অঞ্চল এবং নদীয়া ও চব্বিশ পরগনাকে সেই ব্যাঘ্রতটি-মণ্ডল বলে মনে করেন। সম্রাট ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ৮১০ খ্রিস্টাব্দে যখন সিংহাসন অরোহণ করেন, সে-সময় তাঁর নালন্দা তাম্রশাসনে ব্যাঘ্রতটিমণ্ডলের অধিপতিরূপে জনৈক বলবর্মনের নাম পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিতে' উল্লেখ আছে বরেন্দ্রী বা উত্তর বাংলা পালেদের স্বভূমি ছিল এবং ধর্মপালের সময় ও তৎপরবর্তী রাজগণের শাসনাধিকারে মুর্শিদাবাদের 'বাগড়ি' অঞ্চল যুক্ত ছিল।

কিন্তু ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী রাঢ় ভূমির তুলনায় বাগড়ি অঞ্চলে পুরাকীর্তি বা প্রাচীন মন্দিরাদির চিহ্ন খুব কমই পাওয়া যায়। সে-তুলনায় পশ্চিমাংশে অসংখ্য পুরাকীর্তিস্থল লক্ষ করা গেছে। প্রাচীন এই রাঢ়ভূমির শক্ত লালমাটির ভেতরে প্রচ্ছন্ন আছে বহু প্রাচীন নগর ও মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। পূর্বোক্ত কর্ণসুবর্ণ, কিরীটেশ্বরী, ভট্টবাটি, মহীপাল, সাগরদীঘি, বড়নগর, গোকর্ণ, পাঁচখুপী প্রভৃতি স্থানে পুরাকীর্তি ও মন্দিরাদির অজস্র নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দু আমলের কোন মন্দির এখন আর নেই। কর্ণসুবর্ণের পূর্বোক্ত 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয়, এই অঞ্চলে সে-সময় হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির অনেক তৈরি হয়েছিল। সেগুলির বেশির ভাগই 'দেউল' রীতির ছিল, তা অনুমান করা যায়। বহু প্রাচীন মন্দির মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। পরবর্তীকালে প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যপরবর্তীকালে মন্দিরস্থাপত্যের যে পুনর্জাগরণ হয়, তাতে নানা রীতির মন্দিরের উদ্ভব হল। 'চালা'-রীতির মন্দিরের মধ্যে এই জেলায় 'চারচালা'র সংখ্যাই বেশি, যা অন্য কোন জেলায় ততটা দেখা যায় না। তবে 'দেউল', 'জোড়বাংলা', 'আটচালা' ও 'রত্ন'-মন্দির 'চারচালা'র তুলনায় অনেক কম। 'একরত্ন'-রীতির মন্দির নেই বললেই চলে। চৈতন্যোত্তরপর্বে সারা বাংলায় এইসব শৈলীর মন্দির মধ্য ও দক্ষিণ বাংলায় অজস্র তৈরি হয়েছিল। তার বহু নিদর্শন আমরা লক্ষ্য করেছি।

এই জেলায় আটকোণা চালের ওপর ওল্টানো পদ্মের ওপর বিরাট চুড়া বা গম্বুজ যুক্ত মন্দির দেখা যায়। এটি মুর্শিদাবাদের এক ধরনের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। এই শ্রেণীর মন্দির রানি ভবানীর বিশেষ প্রিয় ছিল। জঙ্গীপুর, লালবাগ ও বহরমপুর মহকুমায় এই ধরনের মন্দির অনেক দেখা যায়। বড়নগর ও বাংলাদেশের রাজশাহির অনেক স্থানে এখনও এই শ্রেণীর মন্দির কিছু আছে। খ্রিস্টীয় আঠার ও উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ ধরনের মন্দির তৈরি হয়েছিল। এই জেলায় 'পঞ্চরত্ন' ও 'নবরত্নে'র মধ্যেও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুর, হুগলির মতো এই 'রত্ন'-মন্দিরগুলির কার্নিশ বাঁকানো না হয়ে সমতল হয়েছে। মাঝখানের কেন্দ্রীয় 'রত্ন' বা চূড়াটি চার কোণের চারটি চূড়ার থেকে অনেক বড়ো দেখা যায়। এছাড়া আছে 'দেউল'-রীতির কিছু মন্দির, কিন্তু সংখ্যায় কম।

কিরীটেশ্বরী : মুর্শিদাবাদ জেলার কিরীটেশ্বরী খুবই প্রাচীন স্থান। নবগ্রাম থানার অন্তর্গত এই স্থান রাজধানী মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি থাকায় এখানে বহুকাল ধরে অনেক মন্দির তৈরি

হয়েছিল। এর আগের নাম ছিল 'কিরীটকণা'। এটি একটি তীর্থস্থানও বটে। এখানের বহুমন্দির বর্তমানে ধ্বংস হয়ে গেলেও নানা স্থাপত্যশৈলীর ষোলটি মন্দির এখনও আছে। নিখিলনাথ রায়ের বিবরণ অনুসারে বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত কিরীটেশ্বরীর মন্দিরটি ১৪৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবাব মুর্শিদকুলি খানের প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ রায়। আরও কয়েকটি মন্দির রাজা রাজবল্লভ আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় প্রতিষ্ঠা করেন। দর্পনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটির পাঁচটি খিলানপ্রবেশপথ ও তিনদিকে ঢাকা বারান্দা আছে। কিন্তু চূড়াটি গোল গম্বুজাকৃতি। গর্ভগৃহে কোন বিগ্রহ না থাকলেও কারুকার্যখচিত একটি পীঠের ওপর দেবীর কিরীট প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার ওপরে একটি মণ্ডপ বাঁকানো কার্নিশযুক্ত 'চালা' আকারের। বর্তমানে লুপ্ত প্রবেশদ্বারের দু-পাশে দুটি ভগ্নজীর্ণ শিবমন্দির বর্তমান। কাছাকাছি রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমিত চতুষ্কোণে ও খাড়া চালযুক্ত পিরামিডাকৃতি একটি মন্দির বর্তমান।

কিরীটেশ্বরী মন্দিরের দক্ষিণপূর্বে রাজা দর্পনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত বিরাট এক দীঘির নাম 'কালীসাগর'। এই দীঘির ঘাটের চাতালের পশ্চিমে একটি শিবমন্দিরের এখন ভিত্তিটি শুধুমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই মন্দিরটি লিপিসাক্ষ্যে বেশ প্রাচীন, যদিও ওই লিপি পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কাছে সমর্পণ করা হয়েছে বলে জনৈক লেখকের অভিমত। তাঁর উদ্ধারীকৃত লিপির পাঠ নিচে দেওয়া হল ঃ

'সাকে সপ্তাষ্টকালেন্দুসংখ্যে শম্ভুপ্রিয়ে পুরে
সভারামসুতোহকার্ষীদ্রঘুনাথ মঠং শুভং।।'[১]

অর্থাৎ 'সপ্ত =৭ অষ্ট =৮ কাল = ৩ ইন্দু =১। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই নিয়মানুসারে ১৩৮৭ শকাব্দে বা ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দে সভারামের পুত্র রঘুনাথ এই মঠটি (মন্দির) করলেন।' কাছাকাছি একটি 'চারচালা'-শৈলীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ভগ্ন জীর্ণ একটি 'চারচালা' ভৈরব মন্দিরও দর্পনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। এখানের 'চারচালা' মন্দিরগুলি আনুমানিক খ্রিস্টীয় সতের শতকে নির্মিত।

এই গ্রামের 'গুপ্তমঠে' (এটি একটি 'দালান' মন্দির) কিরীটেশ্বরীর কিরীট রক্ষিত আছে বলে জানা যায়। এর আসপাশে বহু ভগ্নজীর্ণ শিবমন্দির বর্তমান। এর মধ্যে ছোট একটি 'পঞ্চরতন' মন্দিরও আছে। এই মঠের চারদিকে একসময় বহু মন্দির ছিল। তাদের কিছু কিছু চিহ্নও আছে। গ্রামে দু-একটি ভগ্ন মন্দিরও আছে। এখানের একটি বড়ো 'চারচালা'-মন্দির রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত বলে জানা যায়।

ভট্টবাটি ঃ নবগ্রাম থানার অন্তর্গত অপর একটি গ্রাম ভট্টবাটি বা ভট্টমাটি। সুলতান হোসেন শাহের সময় এখানে বারশ ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। এঁদের পদবী ছিল 'ভট্ট'। তাই গ্রামের নাম ভট্টবাটি। এখানে একসময় অনেক মন্দির ছিল। একটি জীর্ণ 'টেরাকোটা'-অলঙ্কৃত ছোট্ট 'পঞ্চরত্ন' মন্দির আজও বর্তমান। দক্ষিণমুখী ইঁটের এই মন্দিরটি রত্নেশ্বর শিবের। এর চারপাশের দেওয়ালে ও চূড়াগুলোর গায়েও উচ্চমানের অনেক টেরাকোটা আছে। রাসমণ্ডলচক্র, কৃষ্ণলীলা, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, দশাবতার, দশভুজা দুর্গার সুপরিচিত মূর্তিগুলি ছাড়াও যুদ্ধদৃশ্য, সৈন্যসামন্ত, মালাজপরত মোহান্ত প্রভৃতির মূর্তি আছে। মন্দিরে কোন লিপি নেই। তবে খ্রি. আঠার শতকের বলে অনুমান করা যায়।

এই জেলার ভাগীরথীর পশ্চিম ভূভাগে পুরাকীর্তি ও মন্দিরবহুল স্থান পূর্বভাগের তুলনায় অনেক বেশি, একথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে পূর্বোক্তগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় পুরাকীর্তিস্থলের বিবরণী দেওয়া হচ্ছে।

পাঁচথুপী ঃ বড়ঞা থানার অন্তর্গত এই স্থান বেশ প্রাচীন। 'এখানে পাঁচটি বৌদ্ধ স্তূপ থাকার জন্য 'পঞ্চস্তূপ' থেকে পাঁচথুপী নাম হয়েছে বলে জনশ্রুতি।

বর্তমানে এইস্থানে বৌদ্ধ স্তূপের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এখানে পূর্বকথিত 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরটি অভিনব পুরাকীর্তি। এধরনের স্থাপত্য শুধুমাত্র পূর্বোক্ত বৈকুণ্ঠপুর (বর্ধমান) ছাড়া পশ্চিম বাংলায় আর আছে কিনা সন্দেহ। একই ভিত্তিবেদির চারকোণে চারটি দেউল এবং কেন্দ্রস্থলে সকলের চেয়ে একটি বড় দেউল অধিষ্ঠিত। প্রতিটির শিখর সমান্তরাল, খাঁজকাটা। এ ধরনের মন্দিরের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন যার নিদর্শন পাওয়া গেছে পূর্বকথিত 'রক্তমৃত্তিকা' বিহারের (কর্ণসুবর্ণ) উৎখননের ফলে।

এই গ্রামে সতেরো শতকে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের 'জোড়বাংলা' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁটের তৈরি এই মন্দিরটি ভগ্ন ও জীর্ণ। সামনের অংশ বিধ্বস্ত। গর্ভগৃহও জীর্ণ। তবে দেওয়ালে কিছু ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশায় সূক্ষ্ম কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। কাছাকাছি চাটুজ্যেদের আর একটি 'জোড়বাংলা' মন্দির আছে। তবে এর টেরাকোটা অলংকরণ নিম্নমানের। কাছাকাছি আরও দুটি 'চারচালা' মন্দির আছে। কিন্তু সেগুলি বেশি পুরানো নয়।

গোকর্ণ ঃ কান্দী থানার অন্তর্গত গোকর্ণ একটি খুবই প্রাচীন গ্রাম। বহু ভগ্ন, জীর্ণ ও অক্ষত মন্দির এই গ্রামে আছে। প্রাচীন কালের ইঁটের রাস্তা, পাকা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন বাস্তু গ্রামের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। গ্রামটি কর্ণসুবর্ণ থেকে পশ্চিমে সাত-আট কিলোমিটার। এখানের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির নৃসিংহদেবের 'চারচালা' ১৫০২ শকাব্দ বা ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সংস্কারিত হয় বলে পাথরের লিপিটি থেকে জানা যায়। সংস্কর্তা ছিলেন রামচন্দ্র। সংস্কৃত ভাষায় রচিত লিপিটি প্রাচীন বাংলা হরফে ক্ষোদিত। কিন্তু অপ্রচলিত অক্ষরের জন্য লিপিটির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা কঠিন। আংশিক পাঠোদ্ধার,

পক্ষবিন্দুযুতে (যুতে ?) শাকে বাণচন্দ্র.....
মার্গশীর্ষপৌষে (?).....রামচন্দ্র সং.....
..........দত্তো ....।'

অর্থাৎ পক্ষ =২ বিন্দু =০ বাণ =৫ চন্দ্র =১ । অথাৎ ১৫০২ শকাব্দ বা ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রি.) পরে খ্রিস্টীয় ষোল শতকের শেষভাগে নির্মিত এই 'চারচালা' ও তার টেরাকোটা-অলংকরণ অন্তমধ্যযুগীয় বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এর অল্প কয়েকটি টেরাকোটা মূর্তি ও ফুলকারি নকশা মন্দির টেরাকোটা-সজ্জার প্রথম যুগের অমূল্য নিদর্শন। ইঁটের মন্দিরে সে-সময় খুব কমই 'টেরাকোটা'-মূর্তি অলংকরণ থাকত। মসজিদের মতো নকাশি কাজেরই তখন প্রাধান্য ছিল।

গোকর্ণে নৃসিংহদেবের এই মন্দিরের দেওয়ালে খুব অল্পকয়েকটি 'টেরাকোটা'-মূর্তির মধ্যে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিটি সেযুগের টেরাকোটা মূর্তির একটি সুন্দর নিদর্শন। এ থেকে খ্রিস্টীয় ষোল শতকের টেরাকোটা অলংকরণের শৈলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়।

এই মন্দিরের গর্ভগৃহে কষ্টিপাথরের এক সুন্দর নৃসিংহ মূর্তি বর্তমান। বিকশিত পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান মূর্তিটি ষড়ভুজ। বাম উরুর ওপর স্থাপিত হিরণ্যকশিপুর উদরবিদারণরত নৃসিংহদেব। পাদপীঠের নিচে প্রহ্লাদ ও অন্যান্য মূর্তি। নৃসিংহমন্দিরের চত্বরে ও আশপাশে আরও অনেক মন্দির বর্তমান। কয়েকটি 'চারচালা' শিবমন্দিরও আছে।

গোবরহাটি : কান্দি থানার অন্তর্গত গোবরহাটি গ্রামে একটি দর্শনীয় 'পঞ্চরত্ন' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বক্র কার্নিশযুক্ত এই মন্দিরের পাঁচটি 'রত্ন' (চূড়া) সমান্তরাল খাঁজকাটা এবং বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুরের এই ধরনের মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়। একটি ভিত্তিবেদির ওপর অবস্থিত মন্দিরের ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থে ও দুপাশের কুলুঙ্গিতে কিছু কিছু টেরাকোটা ফুল ছাড়া আর কোন অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় না। প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।[৫] এই গ্রামের পশ্চিম দিকে রাজরাজেশ্বরের পুরানো ভগ্ন 'দালান'-রীতির মন্দির ও এর পেছনে একটি 'চারচালা' শিবমন্দির বর্তমান। জানা যায়, এই গ্রামের উত্তরে পাতেণ্ডা গ্রামে একটি প্রাচীন সূর্যমন্দির ছিল। কিন্তু এখন তার ভিত্তি ও পাথরের খণ্ড ছাড়া কিছুই নাই।[৪] সূর্যমন্দির প্রাক- মুসলিম যুগের হিন্দু আমলের। এর থেকে এই স্থান কত প্রাচীন, তা অনুমান করা যায়।

নসীপুর : মুর্শিদাবাদ নগরীর এক কিলোমিটার উত্তরে প্রসিদ্ধ নসীপুর রাজবাটির কাছে একটি ঠাকুরবাড়িতে রামচন্দ্রের পঁচিশচূড়া মন্দির উল্লেখযোগ্য। তবে সব চূড়াই ছাদের ওপর সন্নিবেশিত যা প্রথাগত শৈলীর নয়। এক্ষেত্রে স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

বড়নগর : জিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড়নগর আজিমগঞ্জ স্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। রানি ভবানী এই জেলায় যে কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মধ্যে বড়নগরের মন্দিরগুলি স্থাপত্য ও অলংকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদাবাদের উৎকৃষ্ট মন্দিরগুলি এখানেই অবস্থিত। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ ভবানীশ্বরের মন্দিরটি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের নিম্নভাগ আটকোণা ছাতার মতো ঢালু বাঁকানো চাল নিয়ে গঠিত এবং এর ওপরের অংশে বিশাল একটি পদ্মের আটটি পাপড়ি নিয়ে গঠিত। পদ্মের ওপরের অংশে আটকোণা একটি ওল্টানো কাপ বা ঘণ্টা।

মন্দিরটি বেশ উঁচু। নিচের অংশে ঢাকা বারান্দাযুক্ত আটটি দ্বার। প্রবেশপথগুলির ওপরের দেওয়ালে চুনবালির নকশাকাজ ও দেবমূর্তি খোদিত আছে।

ভবানীশ্বর মন্দিরের এই বিশেষ ধরনের স্থাপত্যে মুর্শিদাবাদ জেলার আরও কয়েকটি স্থান ছাড়া অন্য কোন জেলায় দেখা যায় না। এই ধরনের মন্দির জেলার নানা স্থানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং এই শৈলী রানি ভবানীর বেশ প্রিয় ছিল। মন্দিরটি আনুমানিক ১৭৫৩ বা ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।[৫]

এরপর রানি ভবানীর প্রতিষ্ঠিত 'চারবাংলা' মন্দিরগুলি স্থাপত্য ও অলংকরণের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট। একটি বর্গক্ষেত্রাকার প্রাঙ্গণের চারকোণে চারটি 'একবাংলা' বা 'দোচালা' রীতির মন্দির সুদৃশ্য ও টেরাকোটা-অলংকরণ সমৃদ্ধ। উত্তরদিকের মন্দিরে প্রচুর টেরাকোটা-অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। সেখানের একটি লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। 'টেরাকোটা'-মূর্তিগুলি উচ্চমানের। বিষয়বস্তু, রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলার নানা দৃশ্য ও সমকালীন সমাজচিত্রে অনেক 'টেরাকোটা' মূর্তিফলক লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরগুলি

একত্রে 'চারবাংলা' মন্দির নামে পরিচিত। 'একবাংলা' বা 'দোচালা' মন্দিরগুলির চাল ঢালু ও সুঠাম এবং কার্নিশ বাঁকানো। এই ঠাকুরবাড়ির প্রবেশপথের দুপাশে দুটি পূর্বোক্ত ভবানীশ্বর মন্দিরের মতো আটকোণা ছোট দুটি মন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

বাইরে গোপালমন্দিরের কাছাকাছি রাজরাজেশ্বরীর 'দালান'। এই মন্দিরের কাছাকাছি রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদ থেকে বেশ কিছুটা দূরে মঠবাড়ির সামনে 'জোড়বাংলা'-রীতির গঙ্গেশ্বর শিবমন্দির সুদৃশ্য এবং 'টেরাকোটা'-অলংকরণে সমৃদ্ধ। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে ও থামে অসংখ্য 'টেরাকোটা'-মূর্তি স্থাপিত। এর মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য চিত্তাকর্ষক।

বড়নগরের সবচেয়ে পুরানো মন্দির হল রামনাথেশ্বরের 'চারচালা'। এর ভেতরে বিরাট শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে যেসব টেরাকোটা মূর্তিফলক আছে, তাতে দেবদেবীলীলাদৃশ্য ছাড়া প্রচলিত সামাজিক দৃশ্য ও ফুলকারি নকশা উচ্চমানের। প্রবেশপথের ওপর লিপিটি থেকে জানা যায়, মন্দির ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়।[৬]

বড়নগর গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী। উচ্চমানের টেরাকোটা অলংকরণের জন্য অসাধারণ শিল্পকীর্তির নিদর্শন স্থল। বাংলাদেশের নাটোরের রানি ভবানীর পৃষ্ঠপোষকতায় ওইসব মন্দির নির্মিত হয়।

মহীপাল ঃ সাগরদীঘি থানার মহীপাল একটি প্রাচীন গ্রাম। 'পাল'-বংশের রাজা প্রথম মহীপালদেবের (৯৮৮ খ্রি.-১০৩৮ খ্রি.) নামাঙ্কিত এই গ্রাম বলে কেউ কেউ মনে করেন। কারও কারও মতে এখানেই ছিল মহীপালদেবের রাজধানী। অনেক পুরাতাত্ত্বিকনিদর্শন এই গ্রাম ও তার আশপাশ থেকে পাওয়া গেছে। এর চারদিকে রয়েছে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, নানা দেবমূর্তি, প্রস্তরস্তম্ভ, প্রাচীন দীঘি ও পুকুর। মাটির ভেতর থেকে পাওয়া গেছে অসংখ্য ভাঙা ইঁট ও পাথর। এখানে মহীপালদেবের যে নগর ছিল, তার বিস্তৃতি ছিল 'পুবে ভাগীরথীতীরবর্তী গিয়াসাবাদ থেকে পশ্চিমে বাড়ালাসাহাপুর পর্যন্ত'। এই 'বিশাল অঞ্চল জুড়ে একদা ছিল সেই মহীপালনগর'।[৭]

এখানে বর্তমানে ঢিবি ও ভগ্নাবশেষ ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই। তবে পাল ও তৎপূর্ববর্তী আমলের প্রাচীন মন্দির যে এখানে ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় তাঁর একটি নিবন্ধে লিখেছেন, 'আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় সার্দ্ধ দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গয়সাবাদ নামে একটি গ্রাম আছে। উহা একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে উহা মহীপালনগরের একাংশ ছিল; পরে আবার নবগঠিত হয়। গয়সাবাদ গৌড়ের সুলতান গয়সউদ্দীনের নামানুসারে হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।'[৮] এই সুলতান প্রথম গয়সউদ্দীন।

এই জেলার 'রত্ন' ও 'দেউল' মন্দিরের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে নতুন কিছু কিছু শৈলীর সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শৈলীগুলি শেষ মধ্যযুগে উদ্ভাসিত প্রথাগত শৈলীর নয়। পূর্বোক্ত গোবরহাটির 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরটি যেমন প্রথাগত শৈলীতে নির্মিত, কান্দিব অন্তর্গত জেমো-বাঘডাঙার কালীশ্বর শিবমন্দির সেরূপ নয়। কিন্তু এই ঠাকুরবাড়িতে যে আরও অনেক মন্দির আছে সেগুলি খাঁটি 'চারচালা'-রীতিতে নির্মিত। এদের চালগুলি খুব একটা ঢালু না হলেও কার্নিশ বক্রাকৃতি। কিন্তু কালীশ্বর 'রত্ন-মন্দির', হলেও স্থাপত্যশৈলী ঠিক প্রচলিত রত্নমন্দিরের মতো নয়। এর নিচের দালানের কার্নিশ কিছুটা বাঁকানো, দ্বিতলের দালানের কার্নিশ সোজা, রত্নগুলি খুবই ছোট। শীর্ষদেশের 'রত্ন' খুবই বড়ো এবং গম্বুজাকৃতি। ছোট ছোট রত্নগুলি

কতকটা মসজিদের মিনারের মতো। এরূপ শৈলীতে কোন সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়নি, বরং সৌন্দর্যহানিই ঘটিয়েছে বেশি।

জজান ঃ ভরতপুর থানার অন্তর্গত জজান গ্রামে সোমেশ্বরের দেউল মন্দিরও প্রথাগত শৈলীর নয়। এর অষ্টকোণ 'শিখরে'র মধ্যে গম্বুজের ভাবটিই বেশি প্রকট। কারও কারও মতে এটি মুর্শিদাবাদ জেলার এ জাতীয় স্থাপত্যের একমাত্র দৃষ্টান্ত।[৯] কিছু কিছু টেরাকোটার কাজও আছে। স্থাপত্যদৃষ্টে এই মন্দিরকে যতটা প্রাচীন মনে করা হয়, ততটা নয় (খ্রিস্টীয় সতের শতক বলে কেউ কেউ বলেন)। মন্দিরে পরবর্তী সংস্কার থাকলেও এটিকে খ্রি. সতের শতকের বলে মনে করা যায় না। পার্শ্ববর্তী সর্বমঙ্গলা মন্দির (বিগত বিংশ শতকের গোড়া, ১৯১৫ খ্রি.) 'রত্ন'মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হলেও দেউলের ভাবটাই বেশি, মূল দেউলের চারপাশে নিচের থামের ওপর বারান্দা তৈরি করে ছোট্ট ছোট্ট চালা রীতির দেউল বসানো হয়েছে।

কাগ্রাম ঃ ভরতপুর থানার অন্তর্গত কাগ্রাম একটি প্রাচীন স্থান। কেউ কেউ এই গ্রামকে প্রাচীন 'কঙ্কগ্রাম' বলে থাকেন। এখানে শিবের পাশাপাশি দুটি দেউল মন্দির খুবই উল্লেখযোগ্য। মন্দিরদুটির বৈশিষ্ট্য, নিচের 'চাঁদনি'র চেয়ে 'শিখর'-এর প্রাধান্য। শিখরদুটিও সমান্তরাল খাঁজযুক্ত। 'শিখরে' ' সপ্তরথ'-বিন্যাস আছে, যদিও তা নিচে 'চাঁদনি' অংশে প্রলম্বিত নয়। আরও উল্লেখ্য, এ ধরনের আরও অল্পকিছু মন্দির অন্যান্য দু-একটি জেলায় পাওয়া গেলেও সেগুলিতে গম্বুজাকৃতি না হয়ে দুপাশ থেকে বক্রভাবে প্রসারিত হয়ে ক্রমে ওপরে শীর্ষবিন্দুতে মিলিত হয়েছে। মন্দিরদুটি খ্রিস্টীয় আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেসময় নবাব সরকারের এক কর্মচারী প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়।[১০] মন্দিরদুটিতে টেরাকোটা অলংকরণ কিছু পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু পৌরাণিক দেবদেবী, লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য, বিশেষ প্রতীক দেউল প্রভৃতি।

এই জোড়া দেউলের পার্শ্ববর্তী দুটি 'চারচালা'-রীতির ক্ষুদ্রাকৃতি শিবমন্দির বর্তমান। এই মন্দিরদুটির চাল কতকটা খাড়া, তবে কার্নিশ বাঁকানো। এই ঠাকুরবাড়িরই উত্তরপুবে 'আটচালা'-রীতির একটি মন্দির লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় আরো দুটি 'চারচালা' শিবমন্দির আছে। এই পাড়ায় আরো একটি বড়ো 'চারচালা' মন্দির বর্তমান।

ব্যাসপুর ঃ বহরমপুর থানার অন্তর্গত ব্যাসপুরের শিবের মন্দির পূর্ব আলোচিত বড়নগরের ভবানীশ্বর শিবমন্দিরের মতো হলেও এটির স্থাপত্যে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটির অষ্টকোণ ছত্রাকৃতি চালার ওপর পদ্মশিখর। কিন্তু ব্যাসপুরের এই মন্দিরের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য, বাঁকানো কার্নিশযুক্ত একটি 'চাঁদনি'র ওপর ওল্টানো অষ্টদশ পদ্মের পাপড়ির ওপর একটি গম্বুজ। 'চাঁদনি'র সংলগ্ন একটি সুন্দর 'দোচালা' 'মুখশালা' বা মণ্ডপ। 'দোচালা' মুখশালার দেওয়ালে বহু সুন্দর সুন্দর 'টেরাকোটা' ফলক সন্নিবেশিত। বিষয়, লঙ্কাযুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক দেবদেবী এবং অনেক ফুলকারি নকশা। এছাড়া আছে সপরিবার দুর্গা, কালী ইত্যাদি।

দয়ানগর ঃ বহরমপুর থানার অন্তর্গত দয়ানগরে একটি মন্দির, স্থাপত্যের ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনটি বাঁকানো কার্নিশযুক্ত 'চাঁদনি'র কেন্দ্রস্থলে একটি 'চারচালা' 'রত্ন' স্থাপিত হওয়ায় এই স্থাপত্যের এক নতুন সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছিল, প্রতিটি চাঁদনির একটি মাত্র প্রবেশদ্বার। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। সামনের দেওয়ালসমূহে টেরাকোটা অলংকরণ কিছু আছে। কোন লিপি নেই। কিন্তু এই বিশেষ স্থাপত্যকীর্তি অবহেলা-অনাদরে ধ্বংসপ্রায়।

জিতারপুর ঃ বহরমপুর থানার অন্তর্গত জিতারামপুর গ্রামে চারটি মন্দিরের একটি

'চারচালা'-রীতির। এগুলি সবই জীর্ণ, ভগ্ন ও পরিত্যক্ত। বাকি তিনটি বড়নগরের ভবানীশ্বর মন্দিরের সমগোত্রীয়। তবে বেশ ছোট। শীর্ষে আটকোণা গম্বুজ। এর নিচে বিকশিত পদ্ম। এর নিচের 'দালান' বাঁকানো কার্নিশযুক্ত। এই তিনটি মন্দিরে চুনবালির কিছু নকশা ছাড়া অন্য কোন অলংকরণ নেই। কেউ কেউ মনে করেন, এগুলির প্রতিষ্ঠাকাল খ্রিস্টীয় আঠার শতকের শেষের দিকে। স্থানীয় জমিদার নস্কর-পরিবার এগুলি প্রতিষ্ঠা করেন।

গিয়াসাবাদ ঃ সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত ভাগীরথী-তীরবর্তী পূর্বোক্ত গয়াসাবাদ গ্রামে বিশাল আয়তন 'তুলসীবিহার' মন্দিরটি এই জেলার এক উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য। এই মন্দিরটি খুবই জীর্ণ ও ভগ্ন। মূলমন্দির ছাড়া বাকী সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত। নিচে চারদিকে খোলা একটি দালানের ওপর আর একটি 'দালান'। তার ওপর আটকোণা গম্বুজ স্থাপিত। ক্ষুদ্রাকৃতি একটি চূড়া তার পাশে সন্নিবেশিত, তবে অন্যান্য চূড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই বিশাল মন্দিরটি কারও কারও মতে নসীপুরের রাজা উদবন্ত সিংহ খ্রিস্টীয় আঠার শতকের শেষ বা উনিশ শতকের গোড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন।[১২]

সাহানগর ঃ মুর্শিদাবাদ থানার অন্তর্গত সাহানগর ভাগীরথী তীরবর্তী গ্রাম। এখানে বর্ধনপরিবারের একটি বিশেষ রীতির 'পঞ্চরত্ন' বর্তমান। 'রত্ন' 'দালান' কোনটিই প্রথাগত শৈলীর নয়। নিচে একচাল-যুক্ত একটি দালানের ওপর 'পঞ্চরত্ন'টি স্থাপিত। রত্নগুলি পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির মতো ছোট্ট ও তুলসীমঞ্চের মতো। কিন্তু কেন্দ্রীয় 'রত্ন'টি নিমীলিত পাপড়িসহ পদ্মকোরকের ন্যায়। মন্দিরটি খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১৩] তবে কিছুকাল আগে 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট' এটির সংস্কার করেছেন। গ্রামের নদীঘাটে পূর্বোক্ত সোজা কার্নিশযুক্ত 'দালানের' ওপর পদ্ম আকৃতির চূড়াযুক্ত দুটি শিবমন্দির লক্ষণীয়। 'এখানকার রক্ষাকালীর মন্দিরটি বৃত্তাকার ছুঁচালো চূড়ার জন্য লক্ষণীয়। এই ধরনের মন্দির মুর্শিদাবাদে আর নেই।'[১৪]

মুর্শিদাবাদের নিজস্ব শৈলী 'পদ্মরত্ন' মন্দিরের অপর এক নিদর্শন আছে কাশিমবাজার অঞ্চলের মণীন্দ্রনগরের কাছে নিমতলার দিকে পাকারাস্তায়। এই মন্দিরের বেশ উঁচু শিখর। এটি আটকোণা ওলটানো পদ্মের মতো নিম্নের দালানের কার্নিশ বাঁকানো। তাছাড়া 'জেটি' থেকে কিছুদূরে কয়েকটি 'চারচালা' ও একটি 'আটচালা' শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। এখানেই 'মহাজনটুলি'তে প্রসিদ্ধ নেমিনাথের মন্দিরের শুধুমাত্র ভিত ও দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। আজিমগঞ্জে জৈনমন্দির বর্তমান। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবালয়ের চব্বিশ তীর্থঙ্করের মূর্তি এখন আজিমগঞ্জে রক্ষিত।

বহরমপুরের পার্শ্ববর্তী খাগড়ায় চন্দ্রশেখর মুখার্জি রোডে একই ভিত্তির ওপর পাশাপাশি তিনটি বুড়ো শিবের মন্দির পূর্বোক্ত ওল্টানো পদ্মের মতো চূড়াযুক্ত যা মুর্শিদাবাদের নিজস্ব শৈলী। এগুলি আঠার শতকের শেষ বা উনিশ শতকের গোড়ায় নির্মিত বলে অনুমিত।[১৫] এরই কাছাকাছি কিছুটা পশ্চিমে একটি ছোট্ট 'চারচালা' মন্দির বর্তমান। এই মন্দিরে টেরাকোটার কাজ আছে। মন্দিরটি উনিশ শতকে নির্মিত বলে অনুমিত। দেওয়ানগঞ্জে মুর্শিদাবাদের-শৈলীর একজোড়া 'পঞ্চরত্ন' শিবমন্দির দেখা যায়।[১৬]

ওপরের আলোচনায় মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধিস্থানীয় মন্দিরগুলির কিছুটা পরিচয় দেওয়া হল। এই জেলায় জনপ্রিয় শৈলীটির কথা পূর্বে বলা হয়েছে। বিকশিত পদ্মের ওপর গম্বুজ শিখর 'দেউল' বা 'রত্ন' মন্দির এই অঞ্চলে যতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, শেষমধ্যযুগে উদভাবিত

প্রথাগত শৈলী এই জেলায় ততটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তবে 'চালা' শৈলী বেশ প্রচলিত হয়েছিল। 'দোচালা' বা 'বাংলা' এবং 'চারচালা'-রীতির বহু মন্দির এই জেলায় অনেক নির্মিত হয়। 'চারচালা'র দুটি শ্রেণী দেখা যায়, খাড়া চাল ও বাঁকানো কার্ণিশযক্ত ঢালু চাল। তবে শেষোক্ত রীতির মন্দিরই বেশি দেখা যায়।

এই জেলায় লিপিযুক্ত প্রাচীনতম মন্দির গোকর্ণের নৃসিংহ (খ্রি. ১৫৮০), যা থেকে অন্তমধ্যযুগীয় 'টেরাকোটা'র প্রথম পর্বের শৈলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। রানি ভবানীর সময়ে 'টেরাকোটা' অলংকরণের প্রাচুর্য ও উৎকর্ষ উভয়ই লক্ষ্য করা যায় এবং পূর্বোক্ত নূতন শৈলীটির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। 'পাল' ও 'সেন'-যুগের বা তৎপূর্ববর্তী কোন প্রাচীন মন্দির এই জেলায় বর্তমানে অবশিষ্ট না থাকলেও ওই সময়ে নির্মিত মন্দিরের অনেক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই জেলায় অনেক প্রত্নস্থল আছে যেখানে প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান-শাসনে বহু প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পালসম্রাট মহীপালদেব প্রতিষ্ঠিত মহীপালনগরে ও কর্ণসুবর্ণে প্রাচীন বেশ কিছু মন্দির ছিল। মহীপালনগর ধ্বংস করেন গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীন উজ বা গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরশাহ। ঐ স্থানের নাম হয় গয়সাবাদ। এইভাবে বহু প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। মধ্যযুগের শেষভাগে পনের-ষোল শতক থেকে আঠার শতকে নির্মিত মন্দিরের অনেকগুলিই এখনও বর্তমান আছে।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ ঃ মুর্শিদাবাদ, ১৯৮২, পৃ. ৬৫
২. তদেব, পৃ ৭৭
৩. তদেব, পৃ. ৮২-৮৩
৪ তদেব, পৃ. ৮৩
৫ তদেব, পৃ. ৫৯
৬. তদেব, পৃ. ৬১
৭. তদেব, পৃ. ৩৫-৩৬
৮. নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদের প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্য, গণকণ্ঠ বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৩৪
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়. তদেব, পৃ. ৮৮
১০. তদেব, পৃ. ৯৩
১১. তদেব, পৃ. ১১২
১২. তদেব, পৃ. ৩৮
১৩. তদেব, পৃ. ৪৯
১৪. তদেব, পৃ. ১০২
১৫. তদেব, পৃ ১০২

এই নিবন্ধরচনায় বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ মুর্শিদাবাদ' গ্রন্থ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। লেখক

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স*, মুর্শিদাবাদ, মার্চ ১৯৭৯ প্রাণরঞ্জন চৌধুরী (সম্পাদিত), স্রষ্টা ও সৃষ্টি মুর্শিদাবাদ, গণকণ্ঠ, ১৯৮৬

১৫

উত্তরবঙ্গের মন্দির

পশ্চিমবাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে উত্তরবঙ্গ, যা এক সময় সুপ্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোট ছ টি জেলা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। আবার এর কোন কোন অঞ্চল প্রাচীন গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল। বিশেষ করে, মালদহ জেলার সমস্তটাই ছিল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। গঙ্গা, কালিন্দ্রী, মহানন্দা প্রভৃতি নদনদীগুলি এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বহু স্থান নদীর পলিমাটিতে গড়া হলেও কোন কোন স্থান সমতল ভূমি অপেক্ষা কিছুটা উঁচু এবং শক্ত মাটিতে গঠিত।

মালদহ ও দিনাজপুরের নানা স্থান থেকে অনেক পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। অসংখ্য মূর্তিভাস্কর্য তো বটেই, প্রাচীন সৌধ, ইমারত, বিহার ও মন্দিরের অজস্র ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। সেসব পুরাবস্তু এই দিকের অনেক সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। পাল আমলের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তাম্রশাসন এই অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। বিহার ও প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে অনেক ধ্বংসাবশেষ থেকে। এর থেকে অনুমান হয়, হিন্দু আমলে অজস্র মন্দির-দেবালয় এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেগুলোর একটিও আজ অবশিষ্ট নেই। অথচ দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, এমন কি মধ্য ও নিম্নবঙ্গের যথাক্রমে বর্ধমানের সাত দেউলিয়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জটায় পাল-সেনযুগের মন্দিরগুলি এখনও বর্তমান।

কি করে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন মন্দিরগুলোর একটাও অক্ষত অবস্থায় নেই, তার কারণ জানা যায় না। বিশেষ করে, গৌড়রাজ্যে পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকালে বহু উচ্চ 'শিখর' দেউল মন্দির নির্মিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গৌড়ের এক সময় রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ, যা ছিল গৌড়াধিপ শশাঙ্কের রাজধানী।

উত্তরবঙ্গে অবস্থিত প্রাচীন গৌড় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল খ্রিস্টীয় তের শতকের শুরুতে মুসলমান আক্রমণে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। রাজধানী লক্ষ্মণাবতী মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের ধ্বংসলীলায় একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। উচ্চ দেউল ও রাজপ্রাসাদ প্রায় সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই ধ্বংসলীলা বখতিয়ারের অল্পকালের শাসনাধিকার ছাড়া পরবর্তী মুসলমান সুলতানদের দ্বারাও দীর্ঘকাল চলে। এইভাবে প্রাচীন কীর্তিগুলির সবই প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। হিন্দু দেবমন্দিরের অনেক ভগ্নাবশেষ ও দেবমূর্তিভাস্কর্য গৌড়, পাণ্ডুয়া ও অন্যান্য স্থানের মসজিদ মাজারগুলিতে লক্ষ্য করা যায়।

মালদহ

উত্তরবঙ্গের মন্দিরপ্রসঙ্গ আলোচনায় সর্বপ্রথমে মালদহ জেলার কথা বিবেচ্য। ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষায় এই জেলার ভূমিভাগ তিনটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত। বরিন্দ, দিয়ারা ও টাল। বরিন্দ অঞ্চল মহানন্দার পুবদিকে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই জায়গা অনেকটা উঁচু। এই বরিন্দ অঞ্চল বাংলা দেশের রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়াজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। মালদহের মধ্যে চারটি থানা পুরানো মালদহ, গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর অবস্থিত।[১] এই অঞ্চলে লাল মাটির ভাগই বেশি। চুন ও লোহার ভাগ বেশি থাকায় শীতকালে এই অঞ্চল খুবই শক্ত হয়।[২] সুলতানী আমালের

এক সময়ের রাজধানী পাণ্ডুয়া এই অঞ্চলে অবস্থিত। বিখ্যাত মুসলিম সৌধ ও মসজিদগুলি এই পাণ্ডুয়াতেই বর্তমান। দিয়ারা অঞ্চলের বেশির ভাগই গঙ্গার পলিমাটিতে গঠিত। গঙ্গার পুব দিকে ও মহানন্দার পশ্চিমে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিয়ারা। সুপ্রাচীন রাজধানী গৌড় এই অঞ্চলেই অবস্থিত। এখানে বহু মসজিদ, মাজার ও অন্যান্য পুরাকীর্তি বর্তমান। এরই নিকটবর্তী ছিল পাল সম্রাট রামপালদেবের রাজধানী রামাবতী ও লক্ষ্মণসেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী বা লখনৌতি। মুসলমান বিজয়ে এই দুটি রাজধানী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গৌড় নগরী গড়ে ওঠে এবং সেখানে সুলতানদের রাজধানী স্থাপিত হয়। কিছুকাল পরে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। পরে আবার গৌড়ে রাজধানী উঠে আসে।

দিয়ারা অঞ্চলে অবস্থিত বর্তমান থানাগুলি হল, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর ও মাণিকচক।

এই জেলার টাল অঞ্চল মহানন্দার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। কালিন্দ্রী এই অঞ্চলকে বেষ্টন করেছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে ঢালু এই অঞ্চল দিয়ারা অঞ্চলে মিশেছে। দুই নদীর জলে এই অঞ্চল বেশ প্লাবিত হয়। এই অঞ্চলে রতুয়া, চাঁচল এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থানাগুলি বর্তমান।

মালদহ জেলার এই তিনটি ভূসংস্থানের মধ্যে দিয়ারা অঞ্চলই বেশি সমৃদ্ধ ছিল। পাল-সেন আমলে এখানেই ছিল রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী নগরী। মুসলমান আমলে এখানেই গৌড়নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। বরিন্দ অঞ্চলে ছিল সুলতানদের দ্বিতীয় রাজধানী পাণ্ডুয়া।

এইসব কারণে বর্তমান মালদহ জেলা প্রাচীন বাংলায় উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলরূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকেই মুসলমান আক্রমণ ও তাদের বিজয়ের ফলে এই অঞ্চলে এক অন্ধকার যবনিকা নেমে আসে। সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় হিন্দু মন্দির দেবালয় ও সেন রাজাদের সৌধ-ইমারত।

পাল-সেন আমলে মালদহের নানা স্থানে উচ্চ শিখর মন্দির যে নির্মিত হয়েছিল, তার প্রমাণ, পাথরের মন্দিরের ভগ্নাংশ, যেমন পত্রলতা প্রভৃতির দ্বারা অলংকৃত দ্বারপার্শ্ব, কৃত্তিমুখ, গণেশ মূর্তি খোদিত দ্বারশীর্ষ, অঙ্গশিখর ইত্যাদি অনেক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্ন অংশ জেলার অনেক স্থানে পাওয়া গেছে। ওইসব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত নানান দেবদেবীর মূর্তি, শিবলিঙ্গ প্রভৃতি এই জেলার বহু স্থান থেকে পাওয়া গেছে। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা ও অন্যান্য মসজিদের দেওয়ালে হিন্দু মন্দিরগাত্রে অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত বহু মূর্তিফলক লক্ষ্য করা যায়। ওইসব মূর্তিফলক ও ভগ্ন মন্দিরের অংশ প্রমাণ করে, একসময় এই অঞ্চলে বহু মন্দির ছিল।[৩] 'কিন্তু নদীর গতিপরিবর্তন বা তটক্ষয়ের ফলে নদীতীরবর্তী সব প্রাচীন মন্দির বর্তমানে লুপ্ত। তাছাড়া, বিধ্বংসী জলবায়ু ও অবশেষে বিধর্মীদের আক্রমণজনিত ধ্বংসলীলায় প্রধানত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এ অঞ্চলের প্রায় সব কটি মন্দির।'[৪]

সেই সব মন্দির কোন্ শৈলীর ছিল, তা আজ নির্ণয় করা দুরূহ হলেও মূলত পাথরের মন্দিরাংশের অবয়ব লক্ষ্য করে এগুলির বেশির ভাগই প্রাচীন 'নাগর' রীতির শিখরশৈলীর ছিল অনুমান করা যায়। জনৈক গবেষক গৌড়ের চিকা মসজিদের পশ্চিম দিকের বিশাল দরজার ভেতরের দিকে দুপাশে দুটি 'উড়িষ্যা শৈলী'র রেখ দেউলের 'রিলিফ' চৌকাঠের বাজুতে লক্ষ্য করেছেন। তবে প্রদ্যোত ঘোষ 'মালদহ জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে এর যে নকশা দিয়েছেন, তাতে এটিকে 'ভদ্র' রীতির দেউল বলে মনে করা যায়।[৫] অবশ্য, চৌকাঠের বাজুতে এ ধরনের 'রিলিফে'

খোদিত মন্দির প্রাচীন নাগররীতির 'শিখর' বা 'ভদ্র' দেউল হওয়া সম্ভব, যা বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার এবং অন্যত্র এখনও দেখা যায়। প্রাচীন বাংলায়, বিশেষ করে, উত্তর বাংলার মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে এরূপ তুঙ্গ শিখর মন্দির অনেক নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের একটিও আজ অবশিষ্ট নেই। কিন্তু ভাঙা অংশগুলোতে খোদিত রিলিফের ওইসব দেউল প্রাচীন বাংলার 'শিখর' বা 'ভদ্র' শৈলীর মন্দিরের রূপটি প্রকটিত করে। এটা পাল সেন যুগের মন্দির ধারারই এক বিবর্তিত রূপ। এধরনের মন্দিরকে উড়িষ্যারীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। তাই ডেভিড ম্যাককাচ্চন মনে করেন, বাংলার প্রাক মুসলিম যুগের রেখ দেউলগুলো পালসাম্রাজ্যের অন্তর্গত মাগধী শৈলীর ঐতিহ্য অনুসরণে তৈরি হয়েছিল। এই শৈলীর অবসান হয় মুসলমান আক্রমণের ফলে এবং তার পর থেকে ওড়িশী মন্দিরশৈলীর প্রভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।[৬]

এই জেলায় সেযুগে 'চালা'-রীতিও প্রচলিত ছিল, তার কিছু কিছু নমুনা আজও পাওয়া যায়। গৌড়ে ফৎ খানের 'দোচালা' রীতির সমাধি এই রীতির এক প্রাচীন নিদর্শন। কারও কারও মতে রাজা গণেশ (যিনি কান্‌স বা কংস অথবা দনুজর্মদনদেব নামেও পরিচিত ছিলেন) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতানী আমলে তিনিই একমাত্র হিন্দুরাজা ছিলেন (১৪১০-১৪১২ খ্রি.)। মন্দিরে হিন্দু দেববিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিল। এর ভেতরের ছাদে একটি লোহার আংটা থেকে সে সময় ঘন্টা ঝুলন্ত বাতি থাকত। আবিদ আলি খান সে কারণে এটিকে হিন্দু মন্দির মনে করেন।[৭] পরবর্তীকালে এটি ঔরঙ্গজেবের কর্মচারী দিলির খানের পুত্র ফৎ খানের সমাধিরূপে পরিগণিত হয়। ফৎ খানের সমাধি এতে স্থাপিত হয় ১৬৫৭-১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। কেউ কেউ আবার বলেন, 'পলস্তারাযুক্ত মন্দির প্রাক্-মুঘলযুগে নেই'। কবরেও দোচালাজাতীয় স্থাপত্য লক্ষ্য করা যায়।[৮] কিন্তু প্রাক-মুঘলযুগে সুলতানী আমলের শেষের দিকেও এই ধরনের 'চালা' মন্দির ছিল। কোন্নগরের (ঘাটাল) সিংহবাহিনীর মন্দির (১৪৯০ খ্রি.) এর এক নিদর্শন। 'চালা' রীতি এত প্রচলিত ছিল যে, গৌড়ের ফিরুজপুরে ছোট সোনা মসজিদের ছাদে গম্বুজগুলোর সঙ্গে একটি 'চারচালা'ও স্থাপিত হয়েছিল। 'দোচালা' সৌধের আদিস্থান গৌড়, একথা কেউ কেউ মনে করেন। বার্জেস সাহেব বলেছেন, বাংলা থেকে এই রীতির মন্দির পৃথিবীর সর্বত্র অনুকরণ করা হয়েছে।[৯]

এই জেলায় প্রাচীন মন্দিরের দেওয়ালে উৎকৃষ্টমানের টেরাকোটা ফলক সন্নিবেশিত হত। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আলমপুরের নিকটে পারুল গ্রামের মাটির ভেতর থেকে কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের একশ পঁচিশটি উচ্চমানের কারুকার্যযুক্ত ফলক পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া আরও অনেক ফলক গৌড়, পাণ্ডুয়া, আদিনা, একলাখি প্রভৃতি স্থান থেকেও পাওয়া যায়।[১০]

মালদহ জেলায় এখন খুব প্রাচীন মন্দির বিশেষ নেই। যা আছে তা তিন চারশ বছরের বেশি পুরানো নয়। তবে দুএকটি ভগ্ন মন্দিরকে হিন্দু আমলের বলে অনুমান করা হয়। যেমন, বামনগোলা থানার মদনাবতীর হরিহর শিব মন্দির। মন্দিরটির গঠনশৈলী প্রভৃতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ বলেন, সেটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় এগার শতকের শেষ দিকে নির্মিত হয়।[১১] মন্দিরের শিখর ভগ্ন। দক্ষিণে ও পুবে দুটি দরজা। ইঁটের এই মন্দিরের ইঁটগুলোর গঠন পালযুগের বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১২] মন্দিরের ভেতর বিশাল আকৃতির যে শিবলিঙ্গ আছে, তার উচ্চতা আগে আট-ন ফুট ছিল। এখন মাত্র দেড় ফুটের মতো।

বামনগোলা থানার জগদলা গ্রামে একটি শিবমন্দির পুরানো পাতলা ইঁটে তৈরি। এটিকে কেউ কেউ 'একরত্ন' রীতির বলে থাকেন। মন্দিরটি আনুমানিক দেড় শ-দুশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত

বলে মনে করা হয়। মন্দিরটিতে কিছু কিছু নকশা করা ফলকের ব্যবহার আছে। জগদলা ও তার আশপাশে ইঁটের অজস্র টুকরো, পাকা রাস্তার চিহ্ন, অনেক পুকুর প্রভৃতি আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এখানেই ছিল জগদ্দলের মহাবিহার।[১৩]

ইংরেজবাজার-শহরের একটি প্রাচীন মন্দির মকদুমপুরের শিবমন্দির। এটি আনুমানিক খ্রিস্টিয় সতের শতকের মাঝামাঝি রাজা রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া মালদহ থানার আইহো নামক স্থানে একচুড়ো জাতীয় পুরানো দুটি মন্দির আছে। মালদহ শহরের উত্তরপশ্চিমে প্রসিদ্ধ মনস্কামনা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ঠিক জানা না গেলেও এটি স্বর্ণাম গিরির প্রতিষ্ঠিত কিনা তা বলা যায় না। জানা যায়, তিনি ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে (১২৪৫ বঙ্গাব্দ) এখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বম্ভর গিরি নামে একজন সাধক এখানে সাধনা করেন। গথিকস্থাপত্যশৈলীতে মন্দিরটি নির্মিত হলেও এটিতে রত্ন মন্দিরের সাদৃশ্য আছে। মন্দিরের বেদিটি বেশ প্রাচীন হলেও মন্দির আনুমানিক আঠার শতকে তৈরি হয়।[১৪] মহানন্দা নদীর তীরবর্তী সাহাপুরে একটি পুরানো মন্দিরের লিপি থেকে জানা যায় সেটি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক হরিপ্রসাদের পুত্র রামচন্দ্র দেব নির্মাণ করেন।[১৬] এটি সাহাপুরের মালোপাড়ায় বাণিজ্য বাড়ির শিবমন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী 'চারচালা' রীতির। কিছু 'স্টাকো'র মূর্তি দেওয়ালে আছে। অল্প কিছু টেরাকোটার কাজ থাকলেও তা উন্নতমানের নয়। শহর ইংরেজবাজারের মাঝামাঝি জায়গায় কালীতলায় গোস্বামীদের একটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। সামনে ঢাকা বারান্দা। বারান্দার ভেতরের ছাদ ভলটে গঠিত। বারান্দার ত্রিখিলান প্রবেশপথ। গোস্বামীদের আর একটি বৃহদাকৃতি পঞ্চরত্ন মন্দির শহরের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। এটি অনেকটা কালীতলার শিবমন্দিরের মতো।

গৌড়ের রামকেলি একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানেই রূপ-সনাতনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। আনুমানিক ১৫১০-১২ খ্রিস্টাব্দ। সনাতন প্রতিষ্ঠিত মদনমোহনের বর্তমান পঞ্চরত্ন মন্দির পুরানো মন্দিরের সংস্কার করে নতুন করে নির্মিত হয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। সনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন ও রাধারানি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় আনুমানিক ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে।

কালিয়াচক থানার অন্তর্গত শেরশাহী গ্রামের রানিবাড়িতে একটি চারচালা শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও এটি আনুমানিক দেড়শ বছরের পুরানো। গৌড় এলাকার সাদুল্লাপুরের শ্মশানের বিপরীত দিকে একটি ভগ্ন শিবমন্দির দেউলরীতির। পাথরের লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে (১২৫৫ বঙ্গাব্দ) জনৈক রঘুনাথ দাস প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭]

বাজে ধূলদা মৌজার অন্তর্গত শিবডাঙিতে ঢিবির ওপর বটবৃক্ষ সমাচ্ছন্ন একটি মন্দির বেশ প্রাচীন। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি একরত্ন রীতির ছিল বলে অনুমান। শীর্ষে একটি বিকশিত পদ্ম আছে জানা যায়।[১৮] স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যদৃষ্টে এটি আঠার শতকে প্রতিষ্ঠিত মনে করা যায়। ইংরেজবাজার থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার উত্তরপুবে অবস্থিত কলিগ্রামের শিবমন্দিরের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য একটু ভিন্ন ধরনের। একরত্ন রীতির হলেও নিচে চতুষ্কোণ দালানের ওপর ছত্রাকৃতি আটকোণা চালা স্থাপিত। নিচের দালানের চারপাশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান যুক্ত। ভেতরের ছাদ গোলাকার ভলটে গঠিত। এই মন্দির রানি দীঘির পাশে অবস্থিত। জানা যায়, বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় সাউরিয়ার রানি ইন্দ্রাবতী ব্রত উদযাপন শেষ করে যে বারোটি দীঘি খনন করেন, রানি দীঘি তার একটি। এই মন্দিরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়।[১৯] অবশ্য প্রতিষ্ঠালিপি কিছু

নেই।

১৯৮৭ সালে জনৈক জগদীশ গায়েনকর্তৃক জগজ্জীবনপুরে অবস্থিত (হবিবপুর থানা, ভারত-বাঙলাদেশ সীমান্তবর্তী) পালরাজা মহেন্দ্রপালদেবের তাম্রশাসন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারকর্তৃক ১৯৯২ সাল থেকে উৎখননের ফলে নন্দদীর্ঘিক উদ্রঙ্গ মহাবিহারের যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে বিহার, মন্দির ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা গেছে। উল্লেখযোগ্য যে, তুলাভিটা অঞ্চলের উৎখননকার্যের ফলে অনেকগুলি টেরাকোটামূর্তি-ফলক পাওয়া গেছে, যেগুলি মন্দিরের গাত্র অলংকরণের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে আছে, বোধিসত্ত্ব, শিব, সূর্য, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর-কিন্নরী, গরুড়, বরাহ, সিংহ, হরিণ, মহিষ, ময়ূর, হংস, বানর, যোদ্ধা, ভারবাহক, পূজক প্রভৃতি। মূর্তিগুলির কারুকার্য পাহাড়পুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধবিহারের (আঃ খ্রি. নবম শতক) তুলনায় উন্নতমানের। মূর্তিগুলির সবই ছাঁচে তৈরি না করে কাঁচা মাটি নিয়ে হাতে তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়া নকশাযুক্ত অনেক ইঁটও পাওয়া গেছে। তাতে আছে পদ্ম ও তার পাপড়ি, লতাপাতা এবং অন্যান্য জ্যামিতিক নকশা। শেষ-মধ্যযুগে বাংলার মন্দির-টেরাকোটার পূর্বসূরি হিসেবে এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। পাল আমলে প্রাচীন এই বৌদ্ধ বিহারের পাশ দিয়ে বয়ে চলত টাঙ্গিল নদী, যার শুকনো খাত তুলাভিটার প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পুবে বারোগুিফলে লক্ষ্য করা যাবে। অনুমান, এই খালই তাম্রশাসনে উল্লেখিত নন্দদীর্ঘিক মহাবিহারের পার্শ্ববর্তী টাঙ্গিল নদী।[২০]

এছাড়া জেলার উত্তরপশ্চিমে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত একেবারে বিহার সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত গ্রাম ওয়ারিতে রত্নগড়ের যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, সেখানে খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতকে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল অনুমান করা যায়। এখানে নটি কক্ষযুক্ত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মাঝের কক্ষটি ছিল সরস্বতীর এবং ঈশান কোণের কক্ষটি ছিল শিবের। এই স্থান থেকে পাওয়া একটি শিলালেখ থেকে জানা যায়, ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে (১৪৬৭ শকাব্দ) জনৈক শ্রীমহেন্দ্র একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই কক্ষগুলির ঈশান কোণে এখনও একটি শিবলিঙ্গ গৌরীপট্টে অধিষ্ঠিত। কারও কারও মতে, এখানে পূর্বকথিত সময়ে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল, পরে এই স্থান হিন্দুমন্দির রূপে ব্যবহৃত হয়।[২১] ডেভিড ম্যাককাচ্চন এই মন্দিরকে 'পঞ্চোপাসনা মন্দির' বলে উল্লেখ করেছেন।[২২]

মালদহ জেলার নানা স্থানে বহু পুরাকীর্তিরস্থল বর্তমান। অজস্র মূর্তি, প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, টেরাকোটাফলক প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয়, প্রাক-মুসলিম যুগে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির এই অঞ্চলে তৈরি হয়েছিল। কালক্রমে সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। ক্রমে তাদের অস্তিত্ব লোপ পেতে থাকে। শিলালিপি, তাম্রশাসন অথবা প্রাচীন সাহিত্যে সেগুলোর কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। রামাবতী ও লক্ষ্মণাবতী ছিল হিন্দু আমলের সমৃদ্ধিশালী নগর। পালরাজা রামপালদেবের সময়ে সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতে' রামাবতীর ঐশ্বর্যের বর্ণনা আছে। উচ্চ মন্দিরেরও উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায়।

বর্তমান মন্দিরগুলি প্রায় সবই অর্বাচীন। দক্ষিণবঙ্গে শেষ-মধ্যযুগের মন্দিরে যেমন স্থাপত্যবৈচিত্র্য ও অলংকরণপ্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়, মালদহে সেধরনের মন্দির বিরল।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. ঘোষ প্রদ্যোত, *মালদহ জেলার পুরাকীর্তি*, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭, পৃ. ২

২. ঐ, পৃ. ২

৩. দাস, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত), *উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি*, ১৯৮৫ কমল বসাকের 'মালদহ' প্রবন্ধ, পৃ. ৫

৪. *তদেব*, পৃ. ৫

৫. *তদেব*, পৃ. ৬, ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৬. ম্যাককাচ্চন ডেভিড জে., *লেট মেডিঈভল টেম্পলস* অভ *বেঙ্গল*, *অরিজিনস অ্যাণ্ড ক্লাসিফিকেশন*, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কোলকাতা, ১৯৭২, পৃ.৩

৭. এম.আবিদ আলি খান, খান সাহেব, *মেমোয়ার্স অভ গৌড় অ্যাণ্ড পাণ্ডুয়া*, রিপ্রিন্ট, পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৬, পৃ. ৫১

৮. ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৯. সেন, দীনেশচন্দ্র, *বৃহৎবঙ্গ*, পৃ. ৪৩২, মধুপর্ণী, মালদহ জেলা সংখ্যা ১৩৯২ সংখ্যায় শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরীর 'গৌড়বঙ্গের উপেক্ষিত ঐতিহাসিক অঞ্চল ও পুরাতত্ত্ব' প্রবন্ধ, পৃ. ৪১

১০. রায়চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০

১১. নাগ, শতদলবিহারী, মালদহে পালযুগের ঐতিহাসিক বিশাল শিবলিঙ্গ, *উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬

১২. *তদেব*, পৃ. ৭

১৩. ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১, ঐতিহাসিক ডি.ডি. কোশাম্বি তাই মনে করেন।

১৪. *তদেব*, পৃ. ২৭-২৮

১৫. দাস বিশ্বনাথ, পৃ. ৭-৮

১৬. ঘোষ, পৃ. ৩০

১৭. ঘোষ, ৫৬

১৮. ঘোষ, ১০২-১০৩

১৯. ঘোষ পৃ. ১০৪

২০. ঘোষ পৃ. ১৩৬

২১. ঘোষ পৃ ১৩৮-১৪০ অরিন্দম বসুর প্রবন্ধ

২২. ম্যাককাচ্চন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২

পশ্চিম ও দক্ষিণ দিনাজপুর

পশ্চিম ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থানরূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাল-সেন বা তৎপূর্ববর্তী যুগের অজস্র পুরাবস্তু এই দুই জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। পুরাবস্তুগুলির মধ্যে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব বা চিহ্ন লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাক-মুসলিম যুগের বা হিন্দু আমলের সেই সব উচ্চ দেউলের একটিও আজ অবশিষ্ট নেই। সেই মন্দিরগুলোতে যেসব দেববিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিল, সেগুলি আজ বিভিন্ন সংগ্রহশালায় লক্ষ্য করা যাবে। প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষগুলি পর্যবেক্ষণ করে তার বেশির ভাগই 'নাগর' শৈলীর 'শিখর' দেউল ছিল অনুমান করা যায়।

এই অঞ্চল প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। ছোটনাগপুর প্রভৃতি যেমন সুপ্রাচীন পুরাভূমির (ওলড অ্যালুভিয়ম) অন্তর্গত এই বরেন্দ্রভূমিও সেই পুরাভূমিতে গঠিত। একমাত্র নদীতীরবর্তী অংশগুলো পলিমাটি সঞ্চয়ে গঠিত হলেও বেশির ভাগ মাটিই শক্ত এবং পুরাভূমি। সুপ্রাচীনকালে এই অঞ্চল ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অধীনে দুটি 'বিষয়' (জেলা) ছিল-কোটিবর্ষ ও পঞ্চনগরী। গোটা এই দিনাজপুর পরিচিত ছিল কোটিবর্ষ নামে। এখনকার বাণগড়ই সেই প্রাচীন কোটিবর্ষ। এখানে একজন শাসক থাকত। বৈগ্রাম ও দামোদরপুর লিপি থেকে জানা যায়, পুণ্ড্রবর্ধন শাসিত হত উপারিক চিরদত্তের দ্বারা এবং কোটিবর্ষ ছিল ভেএ বর্মনের অধীনে।[১]

গুপ্তযুগে পুণ্ড্রবর্ধন অথবা পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিরূপে গঠিত হয়। বহুরাজবংশ এখানে রাজত্ব করতেন।[২] হিলি থেকে পাওয়া বৈগ্রাম তাম্রশাসনে জানা যায়, প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে সমগ্র পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি শাসন করার জন্য প্রাদেশিক শাসক নিযুক্ত করা হত। এর দ্বারা পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে গুপ্তাধিকার প্রতিষ্ঠাবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু তারও বহু আগে এখানে মৌর্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাণগড়ে উৎখননের ফলে নিচের পঞ্চম স্তরে মৌর্যযুগের পুরাবস্তু পাওয়া গেছে।

গুপ্ত অধিকারের পর শশাঙ্ক যখন গৌড়াধিপতি হন (৬০১-৬২৫ খ্রি.), তখন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিকে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এর পর দীর্ঘকাল মাৎস্যন্যায় চলার পর পালরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোপালের নির্বাচনের পর। পাল রাজারা গড়ে তুলেন নতুন বাংলাদেশ। অনুমান বাণগড়ই (কোটিবর্ষ) ছিল তাঁদের রাজধানী। দীর্ঘকাল পাল রাজারা এখানে রাজত্ব করেন। পরে পালসম্রাট রামপালদেবের (১০৭২-১১২৬ খ্রি.) নামানুসারে করতোয়ার সন্নিকটাবর্তী স্থানে রামাবতী নগরী স্থাপিত হয়। এই সময় খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের শেষ দিকে যে কৈবর্ত বিদ্রোহ ঘটে, তা অবলম্বন করে রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কাব্য রামচরিত। এতে রামপালকে কৈবর্তদের দ্বারা হৃত পিতৃরাজ্য উদ্ধারকারী বলা হয়েছে।[৩] এরপর পাল-রাজবংশকে উৎখাত করে সেন-রাজত্ব কায়েম হয়। সমস্ত বরেন্দ্রী তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। গৌড়ে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নামাঙ্কিত লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু মুসলমান আক্রমণে লক্ষ্মণাবতী বা লখ্‌নৌতি বিধ্বস্ত হয়। সেন বংশের পতন হয়। দেবকোট বা দেওকোট মুসলমানদের প্রথম রাজধানী হয়।

এইভাবে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিনাজপুরে সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। তাদের শাসনকালের বহু নিদর্শন এই জেলার নানা স্থানে পাওয়া গেছে। মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন ও মুসলমান যুগের অনেক নিদর্শন এই অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

পশ্চিম ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, করতোয়া প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদী। এই নদীগুলির ধারে ধারেই গড়ে উঠেছিল সেকালের অনেক শহর ও রাজধানী। প্রাচীন বাংলার অনেক নিদর্শন ও তার ধ্বংসাবশেষ এইসব নদীর ধার থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। যেমন পুনর্ভবা নদীর ধারে বিখ্যাত বাণগড়ের কিছু অংশ উৎখনন করে অনেক পুরাবস্তু, মূর্তি ও মন্দিরের অংশ লক্ষ্য করা গেছে। পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ গঙ্গারামপুরও এর কাছাকাছি।

দিনাজপুর জেলায় এককালে অজস্র মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন মন্দিরগুলোর একটিও আজ অবশিষ্ট নেই। যেসব মন্দির এখন লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি খুবই আধুনিক। তবুও এই জেলার যেসব পুরাকীর্তিস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ধ্বংসাবশেষ থেকে গুপ্ত ও তৎপরবর্তী পাল-সেন আমলের মন্দিরসম্পর্কে ধারণা করা যায়। এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন মন্দির ও আধুনিক কিছু কিছু মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল।[৪]

আমাতি ঃ আমাতি প্রাচীন রামাবতীরই নামান্তর বলে অনেকে মনে করেন। এখান থেকে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে এক নগরীর অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। পাথরের তৈরি বিশাল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, বহু ভগ্ন 'আমলক'শিলা এবং বেলে পাথরের তৈরি স্তম্ভ, বুদ্ধমূর্তিসহ প্রায় পাঁচশ মূর্তি, খোদাই-করা থাম এই গ্রামের গম্ভীরাতলায় পাওয়া গেছে। এইসব মূর্তি একসময় মন্দির দেওয়ালে সন্নিবেশিত ছিল। অনেক মূল্যবান মূর্তি পাওয়া গেছে, যেগুলি পাল-আমলের, যেমন, সদাশিব, গণেশ, মহাসরস্বতী, অবলোকিতেশ্বর, বিষ্ণু। এগুলি অনেক মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল বলে অনুমান করা যায়।

আদ্যখণ্ড ঃ এখানে রয়েছে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। কারুকার্যমণ্ডিত পাথরের ভগ্নাংশ, অনেক পুরানো পুকুর ও তার পাশে ইঁটের ভগ্নস্তূপ, আনুমানিক খ্রি. নবম শতকের বিষ্ণুর ক্ষুদ্র মূর্তি, তাছাড়া ভগ্ন বহু মূর্তি, কালো পাথরের বেদি প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয়, অতীতে এই স্থান জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিল। মন্দিরও অনেক ছিল। চিরুমতী নদীর ধারে এই স্থান প্রসিদ্ধ একাডালা দুর্গের নিকটবর্তী।

ইটাহার ঃ ইঁটের সমাহার বলে কেউ কেউ এই স্থানকে ইটাহার বলে মনে করেন। এখানে বিরাট বিরাট দীঘি, সব জায়গায় প্রচুর ইঁটের সমারোহ, অনেক ঢিবি, বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তি এই অঞ্চলের প্রাচীন সমৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। মন্দিরাদির অস্তিত্বও সূচিত করে।

একডালা ঃ এখানে একসময় দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। হিন্দু ও মুসলমান আমলে এখানে ছিল শহর। চিরামতী (পুরানো শ্রীমতী) এবং বালিয়া নদীর মাঝামাঝি এই স্থানে প্রাচীন স্থাপত্যের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। ভগ্নস্তূপের মধ্যে রয়েছে অনেক মূর্তি। এখান থেকে যে বিষ্ণুমূর্তিটি পাওয়া গেছে, সেটি ধর্মপালের রাজত্বকালে ছাব্বিশ বর্ষে নির্মিত। আনুমানিক ৮০০ খ্রিস্টাব্দ। পাথরের যেসব খণ্ড খণ্ড অংশ পাওয়া গেছে, সেগুলি আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত বলে অনুমান। নিকটবর্তী ব্রজবল্লভপুর গ্রামেও অনেক প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বিষ্ণু নারায়ণের মূর্তিটির পাদদেশে একটি লিপি খোদিত। এসব থেকে এই প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

করদহ ঃ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রতিষ্ঠিত তর্পণদীঘির কাছেই এই করদহ। এ স্থানও বেশ প্রাচীন। এখানে আঠার শতকে তৈরি একটি ইঁটের মন্দির বর্তমান। দিনাজপুরের রাজা এটি প্রতিষ্ঠা করেন। করদহ তপন থানার অন্তর্গত।

দুই জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই রয়েছে অসংখ্য পুরাবস্তু। প্রায় সবগুলিই প্রাক-মুসলিম যুগের, বিশেষ করে, পালসেন আমলের। মুসলমান শাসনকালে এই অঞ্চলের সব মন্দিরই ভেঙে চূর্ণ করে দেওয়া হয়। রায়গঞ্জ শহরের কাছাকাছি হেমতাবাদ থানার অধীনে কসবা মাহাসো গ্রামে একটি দশ গম্বুজযুক্ত মন্দির (আঃ খ্রি. ১৫-১৬ শতক) হিন্দুমন্দিরের রূপান্তর বলে কেউ কেউ মনে করেন। অনেকের ধারণা, এই অঞ্চল রাজা গণেশের শাসনাধীন ছিল (১৪১০-১৮ খ্রি.) তাঁর পুত্র যদু বা জালালুদ্দিন এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এখানকার কমলবাড়িতে আঠার শতকে নির্মিত এক শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়া বালুরঘাট শহরের উত্তরপূর্ব দিকে খাঁপুরে ইঁটের তৈরি কোন কোন প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করা গেছে। আনুমানিক ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের একটি লিপি থেকে জানা যায়, এখানে সে সময় একটি গোপীনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি প্রাচীন সিংহবাহিনী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও লক্ষ করা যায়।

গঙ্গারামপুর সেকালে ছিল এক বন্দর শহর। বালুরঘাট শহর থেকে প্রায় ৪২ কিলোমিটার দূরবর্তী। প্রাচীন কোটিবর্ষ বাণগড় বা দেবীকোট এরই নিকটবর্তী। এটি একটি ঐতিহাসিক স্থান। পুনর্ভবা নদী এর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের সমাধি এই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানে একটি উচ্চ সড়কের চারপাশে ধ্বংসস্তূপ। প্রাচীন দেবকোট শহর এই নদীর পশ্চিম পারেও বিস্তৃত ছিল। গঙ্গারামপুরের একটি পুকুরের উত্তর পাশে প্রাচীন দেউল রীতির একটি শিবমন্দির কারও কারও মতে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে নির্মিত।[৫]

বালুরঘাট থেকে প্রায় ষোল কিলোমিটার উত্তরে কুমারগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেবগ্রাম আত্রেয়ী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে অন্নপূর্ণা ও শিবের মন্দির ও দোলমঞ্চ আছে। একসময় এই স্থান ঘন বসতিপূর্ণ ছিল। ইটাহারের পশ্চিম দিকে চামুর ও কুলিকনদীর মাঝামাঝি জায়গায় ধুলোহার গ্রামে বহু উঁচু নিচু ঢিবি, ইঁট ও পাথরের অজস্র টুকরো লক্ষ্য করা যায়। এখানে রাজপ্রাসাদ ও সুন্দর সুন্দর মন্দির ছিল। ইটাহার থানার পোর্ষায় বহু মূর্তিভাস্কর্য পাওয়া গেছে। এখানে পালযুগের একটি দ্বিতল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে বলে জানা যায়। এখানের পাথরের থামগুলো সুন্দর ভাস্কর্যের নিদর্শন। এর বেশির ভাগই খ্রি. ৮ম-৯ম শতকের।

বাণগড় ঃ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত প্রাচীন কোটিবর্ষ ছিল 'বিষয়' বা জেলা। তার রাজধানী ছিল দেবকোট বা দেবীকোট। সেই রাজধানীর বিশাল ধ্বংসস্তূপ আছে বালুরঘাট শহরের প্রায় তিরিশ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে পুনর্ভবা নদীর পুবতীরে। সেই স্থান গঙ্গারামপুরের এক কিলোমিটার উত্তরে বাণগড় নামে পরিচিত। এখানে বহু বছর আগে (১৯৩৮-১৯৪১) অধ্যাপক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে যে উৎখনন হয় তার ফলে মৌর্য যুগ থেকে মুসলমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখান থেকে মদনপালের দুটি তাম্রলিপিও আবিষ্কৃত হয়েছিল।

'বাণগড়ের চারদিকে আট কিলোমিটার স্থান পর্যন্ত এই সুপ্রাচীন সভ্যতার নানা চিহ্ন পাওয়া যায়। বালুরঘাট কলেজ সংগ্রহশালায় রক্ষিত একাদশ শতকের পালরাজ নরপালের রাজত্বকালীন বাণগড়ে প্রাপ্ত মূর্তিশিবের প্রশস্তিলিপি থেকে জানা যায়, রাজা মহীপাল তাঁর গুরু ইন্দ্রশিবকে 'মেরু' নামে একটি প্রাসাদ দান করেন।.......'বৃহৎসংহিতা'র মতে (৫৬,১৭,২০) 'মেরু' নামক প্রাসাদ ষটকোণ, দ্বাদশভৌম (অর্থাৎ বারতলা), বিচিত্রকুহর (নানা কারুকর্মখচিত প্রকোষ্ঠ),

চতুর্দ্বার এবং বত্রিশ হাত দীর্ঘ। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন, 'মঠমন্দিরের বর্ণনায় এই বাণগড়প্রশস্তি বাংলাদেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উপর কিছু আলোকপাত করে। 'মেরু' শ্রেণীর অট্টালিকা, মূর্তিশিবের মূর্তি, চিলেকোঠায় জীবন্তের ন্যায় সিংহমূর্তি প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। মেরু ছিল বৃহদাকার প্রাসাদ। এতে দশতলা থাকত, এক এক তলা সাড়ে চার বা সাড়ে তিন হাত উঁচু। অট্টালিকার প্রস্থ হত ৩২ হাত এবং চারদিকে চারটি তোরণদ্বার। ব্যক্তিবিশেষের মূর্তিনির্মাণের উল্লেখ বাংলাদেশের লেখাবলীতে আর দেখা যায় না।

......'মহীপাল ইন্দ্রশিবকে যে মঠ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, তা ছাড়া মূর্তিশিবও দীর্ঘিকাবলীসহ এক বিশাল মন্দিরসমষ্টি নির্মাণ করেন। মূর্তিশিব নির্মিত প্রধান মন্দিরটি এখনকার বিধ্বস্ত শিববাটি প্রশস্তিতে এটিকে শিবসহ ভবানীর মন্দির বলা হয়েছে।'[৭]

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকারের এই উদ্ধৃতি থেকে প্রাচীন দেবীকোট বা বাণগড়ে যে সে-সময় সু-উচ্চ সৌধ ও দেব মন্দির ছিল, তা জানা যায়। দুঃখের বিষয়, তার কোনটিই আজ আর নেই। কিন্তু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পে এই স্থান কত সমৃদ্ধ ছিল, তা বোঝা যায়। শিববাটি গ্রামে একটি বৃহৎ মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের লাল গ্রানাইট পাথরের চারটি সুন্দর থাম এখনও আছে। এটি একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। এর প্রধান প্রবেশ পথে ছিল একটি কালো পাথরের দ্বার। তাতে পাল রাজাদের প্রশস্তি খোদিত আছে। প্রাচীন প্রাসাদের কিছু ইঁটের প্রাচীর পুনর্ভবা নদীগর্ভে লক্ষ্য করা যায়। বাণগড়ের দুটি বিশাল দীঘি কালদীঘি ও ধলদীঘি। ধলদীঘির পাড়ে যে আতাশা ফকিরের কবর আছে, তার আশপাশে বিলুপ্ত প্রাচীন মন্দির বা প্রাসাদের চিহ্ন দেখা যায়।

তপন বা তর্পণদীঘি বালুরঘাট শহব থেকে বত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে তপন থানার অন্তর্ভুক্ত। এখান থেকে ১১৮১ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের তাম্রপট্ট পাওয়া গেছে। দীঘির পশ্চিম পাড়ে এবং আরও কিছু দূরে পাথরের বিশাল ধ্বংসস্তূপ লক্ষ্য করা যায়। ওই ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি পুকুরের পাড়ে বিশাল 'আমলক' শিলা দেখা যায়। এর থেকে বোঝা যায়, পাথরের মন্দিরটি ছিল 'নাগর' শৈলীর 'শিখর' দেউল। তার শীর্ষদেশে ওই 'আমলক' শিলাটি ছিল।

রায়গঞ্জ থানার কাছাকাছি বিন্দোলে আনুমানিক খ্রিস্টিয় ষোল শতকে নির্মিত মার্তণ্ডভৈরবের (সূর্য ও ভৈরবের সমন্বয়) একটি মন্দির আছে। মূর্তিটি বহুকাল আগে কাঙ্গন নদী থেকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

তপন থানার অন্তর্গত ভিখাহার পূর্বোক্ত করদহের চারপাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে পুরানো একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও পাথরে তৈরি জীবজন্তুর ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে। এখানের কালীমন্দির আঠার শতকের গোড়ার দিকে তৈরি অনুমান করা যায়। দেওয়ালে পোড়ামাটির কিছু কাজ আছে।

গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত মাসুর কিসমত গ্রামে একটি 'পঞ্চরত্ন' ইঁটের মন্দিরে বেশ কিছু টেরাকোটার কাজ আছে, যেমন রামরাবণের যুদ্ধ, দেবী দুর্গা, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি। এছাড়া রায়গঞ্জ মহকুমার বংশীহারী থানার পশ্চিমে টাঙ্গন নদীর পশ্চিম তীরে কয়েকটি পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা গেছে। ধ্বংসাবশেষের ছোট বড় অনেক পাথর আশপাশে পড়ে আছে। থানার কাছে টাঙ্গন নদীর গর্ভ থেকে বহু বছর আগে মাটিতে বসে যাওয়া এক বিশাল প্রাচীন মন্দিরের ওপরের কিছু অংশ জেগে ওঠে।

পশ্চিম ও দক্ষিণ দিনাজপুর-এই দুই জেলাতেই রয়েছে অজস্র প্রত্নস্থল। এরূপ পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ জেলা পশ্চিম বাংলায় বিরল। পাল সম্রাটদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই জেলারই বাণগড়ে। মৌর্যযুগ থেকে মুসলমান আমল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজা এই অঞ্চলে রাজত্ব করে গেছেন। এই জেলার অধিকাংশ গ্রামেই সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার অসংখ্য পুরানিদর্শন লক্ষ্য করা গেছে। নানা শৈলীর হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে অসংখ্য নির্মিত হয়েছিল। ধ্বংসস্তূপগুলিই তার সাক্ষ্য দেয়। এত বিচিত্র ধরনের পাথরের মূর্তি খুব কম জেলা থেকেই পাওয়া গেছে। কোন কোন স্থানে আবার মূর্তিনির্মাণের কর্মশালাও ছিল। তারও প্রমাণ আছে। সুন্দর কারুকার্যযুক্ত ওইসব মূর্তি বহু দেব মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরগুলো ধ্বংস হয়ে গেলেও মূর্তিগুলি বহুকাল লোকচক্ষুর অগোচরে মাটির ভেতর বা বড় বড় দীঘিতে নিক্ষিপ্ত বা বিসর্জিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল পরে পরে সেগুলি উদ্ধার করা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া উচ্চ দেবদেউল গুলি মুসলমান আক্রমণে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। যেহেতু মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় মুসলমান আধিপত্য বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেকারণে এই অঞ্চলের অসংখ্য হিন্দুমন্দির তাদের রোষানলের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের হাতে সেনরাজবংশ উৎখাত হওয়ার পর তাদের একচ্ছত্র শাসনে দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য মন্দির চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ভগ্নাবশেষগুলি দিয়ে নির্মিত হয় মসজিদ ও দরগা। তার বহু সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে, দক্ষিণবঙ্গের মতো শেষ-মধ্যযুগে নির্মিত ইঁটের টেরাকোটা অলংকৃত মন্দির এই দিকে খুব বেশি নির্মিত হয়নি। সেদিক থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা মন্দিরশিল্পে অধিক সমৃদ্ধ, একথা বলা চলে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তী পর্বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে 'বাংলা' রীতির মন্দিরের যে অভুতপূর্ব বিকাশ ঘটে, উত্তরবঙ্গে তা খুব কমই লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. দাস বিশ্বনাথ (সম্পাদিত), *উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি*, ১৯৮৫, কমলেশ দাসের প্রবন্ধ, পশ্চিম দিনাজপুর, পৃ.২০

২. ভট্টাচার্য অমিতাভ, *হিস্টরিক্যাল জিওগ্রাফি অভ এইনসেন্ট অ্যাণ্ড আরলি মেডিঈভল বেঙ্গল*. ১৯৭৭, পৃ. ৪৩

৩. আলী মেহরাব, পশ্চিম দিনাজপুরের আদি ইতিহাসের ঐতিহাসিক পটভূমি, *মধুপর্ণী*, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা ১৩৯৯, পৃ. ৩৯২

৪. এই অংশ কমলেশ দাসের পশ্চিম দিনাজপুর প্রবন্ধের ২২-৩৯ পৃষ্ঠা অবলম্বনে রচিত, বিশ্বনাথ দাস সম্পাদিত '*উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি*', ১৯৮৫ গ্রন্থে প্রকাশিত।

৫. চক্রবর্তী অতুলচন্দ্র, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রধান প্রধান পুরাকীর্তির পরিচয়, *মধুপর্ণী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫

৬. দাস বিশ্বনাথ, *পূর্বোক্ত*, দ্রষ্টব্য কমলেশ দাস, পৃ. ৩০

৭. চক্রবর্তী অতুলকৃষ্ণ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩ এই গ্রন্থে উল্লেখিত দ্রষ্টব্য দীনেশচন্দ্র সরকার, *শিলালেখ ও তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ*, পৃষ্ঠা ৮৮-৩৮৭

জলপাইগুড়ি

বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোটিবর্ষ 'বিষয়ে'র অধীন ছিল বলে অনুমান। এই অঞ্চল বরেন্দ্রভূমি বা বরেন্দ্রমণ্ডলেরও অন্তর্গত। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার করতোয়ার ধারে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন নগর। বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী ছিল গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল। মৌর্যযুগ থেকে প্রথমে পুণ্ড্রনগর বাণিজ্যিক ও পরে গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক কেন্দ্ররূপে পরিচিতি লাভ করে।[১] উত্তরবঙ্গের প্রধান নদীগুলি গঙ্গা, করতোয়া ও পুনর্ভবা নদীর তীরে তীরে বরেন্দ্রভূমির রাজনীতিক কেন্দ্রগুলি অবস্থিত ছিল। গুপ্ত, গুপ্তোত্তর, পাল ও সেনযুগের শিলালিপিগুলি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] জলপাইগুড়ি প্রাচীন রাজনীতির কেন্দ্রগুলির একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। তবে এই প্রান্তভূমিতে নানা উপজাতির বাস, বিশেষ করে, পালযুগে এই অঞ্চলে কাম্বোজদের আধিপত্য ও গৌড়সিংহাসন দখল এবং প্রাচীন প্রাকজ্যোতিষ বা কামরূপের সঙ্গে এই অঞ্চলের সংযোগ জলপাইগুড়ি জেলার রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।[৩] কাম্বোজেরা ছিল বর্তমান কোচজাতির পূর্বসূরি। এই কোচদের নিয়েই বর্তমান কোচবিহার জেলার নামকরণ। জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস কোচবিহারের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৪]

জলপাইগুড়ি জেলার যে তিনটি অঞ্চলে এখানকার পুরাবস্তুগুলি কেন্দ্রীভূত, সেগুলি হল জল্পরি তালমা (ভিতরগড়) এলাকা, ময়নাগুড়ি অঞ্চল এবং চিলাপাতা অরণ্য।[৫] জল্পরি তালমা অঞ্চলে 'পৃথুরাজার গড়' থেকে পাল-সেন যুগের অনেকগুলি ধাতুর ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলি হল গণেশ, ব্রহ্মা, সূর্য, উমামহেশ্বর, অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধমূর্তি প্রভৃতি। এগুলি কোন না কোন মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল বলে অনুমান।

ময়নাগুড়ি অঞ্চল থেকে বহু মূর্তি পাওয়া গেলেও এই অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে বহু মন্দির। এখানেই বিখ্যাত জল্পেশ মন্দির অবস্থিত। এটি সমগ্র উত্তরবঙ্গের এক প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থস্থান। মন্দির যদিও প্রাচীন, তবুও এর প্রাচীন রূপটি আর নেই · বহুবার সংস্কার করার ফলে এর প্রাচীন রূপটি কি ছিল, তা আর জানা যাবে না। বর্তমান মন্দিরটির প্রথম ও দ্বিতীয় তলে চারটি করে আটটি এবং ওপরের তলের চুড়োটি ঠিক দেউলও নয়, ঠিক চালাও নয়, কতকটা ছত্রাকৃতি চালা। মোট নটি চুড়ো নিয়ে মন্দিরটি গঠিত। কিন্তু প্রথাগত শৈলীর এটি 'নবরত্ন' নয়। উপরন্তু, চুড়োগুলি গম্বুজের মতো। জানা যায়, কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ এই মন্দির মুসলমান স্থপতিদের দিয়ে নির্মাণ করান।

প্রত্নতত্ত্ববিদ ভাটসেব মতে মূল মন্দির খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। জল্পেশ্বর নামে কোন রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই জল্পেশ্বর কে ছিলেন, তা নির্ণয় করা কঠিন। অসমীয় ঐতিহাসিকগণের ধারণা, ভিতরগড়ের পৃথুরাজারই অপর নাম জল্পেশ্বর। মন্দির তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।[৬] উত্তরবঙ্গে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যেমন অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করে ফেলা হয়, সেইরূপ জল্পেশ্বর প্রাচীন মন্দিরও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এর পর কোচবিহারের পূর্বোক্ত মহারাজা প্রাণনারায়ণ (১৬৩২-১৬৬৫ খ্রি.) জল্পেশ্বর মন্দির পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রাণনারায়ণের পৌত্র তা শেষ করেন। অনেক পরে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দির দারুন ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার আবার সংস্কার করা

হয়।[৭] জল্পেশ শিবলিঙ্গ সাধারণ পাথরের নির্মিত নয় বলে জানা যায়। এই লিঙ্গমূর্তি পরীক্ষা করে জানা যায়, এটি আকাশ থেকে পতিত একটি উল্কাপিণ্ড।[৮] আকাশ থেকে পতিত 'এই উল্কাপিণ্ডকে মাটিতে নেমে আসতে দেখে উত্তরবঙ্গের কোচ ও মেচ জাতীয় আদিম অধিবাসীগণ এটিকে অদৃশ্য দেবতা বলে মনে করে এবং এটির পূজা করতে শুরু করে।'[৯] মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজা পৃথু বা জল্পেশ্বর, কান্তেশ্বর, প্রাণনারায়ণ প্রভৃতি রাজা নানা সময়ে মন্দির সংস্কার করেন।[১০] জল্পেশ মন্দিরের স্থাপত্যে ইসলামীয় স্থাপত্যের প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

এই মন্দিরের পশ্চিম পাশে কুবের ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বাসুদেবের মন্দির আছে। ওই মন্দিরগুলিও পুরানো।

জল্পেশ মন্দির যাওয়ার পথে জল্পেশ মোড়ের আগে জড়দা নদীর পশ্চিম পাড়ে মাধবডাঙায় একটি ভগ্ন মন্দির দেখা যায়। এটি জল্পেশ্বর মন্দিরের থেকেও প্রাচীন। থামের কারুকার্যের মধ্যে গুপ্তযুগের শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এটি বটেশ্বরের মন্দির নামে পরিচিত। পালসেন পর্বে সম্ভবত মন্দিরটির সংস্কার করা হয়।[১১] পরবর্তীকালে আরও সংস্কার হয়। এই মন্দিরটি সম্পর্কে জনৈক গবেষক বলেছেন, 'মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও উল্লেখযোগ্য হলো 'অন্তমঞ্জরী'। অন্তমঞ্জরীর গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করে কোনো কোনো শিল্পসমালোচক মন্তব্য করেছেন যে, বটেশ্বর মন্দির অসমের গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরের স্থাপত্যশৈলীর অনুরূপ। যাই হোক, বটেশ্বর মন্দিরের মধ্যে অহোম স্থাপত্যরীতির কিছু প্রভাব যে পড়েছিল, তা মেনে নিতেই হয়।'[১২]

সোদরখই বা সদর খৈ নামক স্থানে আর একটি মন্দিরও বেশ প্রাচীন। এটি নিউ ময়নাগুড়ি রেল স্টেশনের প্রায় চার কিলোমিটার দূরে ময়নাগুড়িথানার নিকটবর্তী। ছোট্ট এই মন্দিরটি পাথরে তৈরি। এর তিনটি দেওয়াল এখনও অক্ষত। পরিকল্পনায় বটেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে মিল আছে। মন্দিরটির তিনটি অংশ— মুখমণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহে কুলুঙ্গী বর্তমান। মন্দিরের গঠন ও ভিত্তিপরিকল্পনা আদি মধ্যযুগীয় স্থাপত্যবিবর্তনের সাক্ষ্য দেয়।[১৩] মন্দিরটি ধ্বংস প্রাপ্ত এবং বর্তমানে সংলগ্ন এলাকাটি জঙ্গলে ঢাকা।

জল্পেশ মন্দিরের পর ময়নাগুড়ির একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হল পূর্বদহের জটিলেশ্বর মন্দির। পূর্বদহের আর এক নাম পূর্বডহর। মন্দিরটি একটি উঁচু ঢিবির ওপর অবস্থিত। কেউ কেউ মনে করেন জল্পেশ মন্দিরের নির্মাতাই এই মন্দির নির্মাণ করেন।

মন্দিরটির স্থাপত্য দর্শনীয়। এর বাইরের দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর মূর্তি বর্তমান। এদের মধ্যে নানা ভঙ্গিমার নারীমূর্তি, নৃত্যরত গণেশ, ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি উল্লেখযোগ্য। আগে এখানে একটি কুবের মূর্তি ও একটি বিষ্ণুপট্ট ছিল। এই মন্দিরের সংলগ্ন দীঘি থেকে শিব, চণ্ডী, গণেশ প্রভৃতির মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় সংগৃহীত বলে জানা গেছে। মূর্তিগুলি বেশ প্রাচীন। খ্রি. দ্বাদশ শতকের একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তিও এখান থেকে পাওয়া গেছে। এর থেকে মন্দিরেরও প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। মূল মন্দিরের পাশে জটিলেশ্বরের ছোট মন্দিরটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটি সিদ্ধেশ্বরী মন্দির নামে পরিচিত। জটিলেশ্বর মন্দিরের সামনে দ্বারপালের এক বিশাল মূর্তি খুবই দর্শনীয়।

দোমহনির ধূমবাবার মন্দিরটি ময়নাগুড়ি শহরের প্রায় আট কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। ধূমবাবা মহাকাল শিব। নিউ দোমহনি রেলস্টেশনের কাছে ভদেশ্বর বা ভদ্রেশ্বরের পাথরের

একটি ভগ্ন মন্দির লক্ষ্য করা যায়। বেশ কয়েক বছর আগে তিস্তার বন্যায় মন্দিরের পাথরের থামগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। ময়নাগুড়ি থানার বেঙকান্দিতে পেটকাটি নামে পরিচিত চামুণ্ডাদেবী একটি সাধারণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা। পেটকাটি দেবী মূর্তি বেশ প্রাচীন।

মন্দিরবহুল ময়নাগুড়ি থানার পর সদর জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি এলাকায় বৈকুণ্ঠনাথ ও কালীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। কারও কারও মতে চতুর্দশ রায়কত সর্বদেব এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যু ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে পুরানো মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। তার পর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়। পাণ্ডাপাড়ার কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজা রূপনারায়ণ। তাঁর শাসনকাল ১৬৯৩-১৭১৪ খ্রিস্টাব্দ। মাষকলাইবাড়ির শ্মশানকালীর মন্দির কামরূপ শাসনকালে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) আগেই নির্মিত হয়েছিল বলে কেউ কেউ বলেন। হোসেন শাহ যখন বৈকুণ্ঠপুর (জলপাইগুড়ি) আক্রমণ করেন, সে সময় ওই প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[১৪] বর্তমানের ছোট মন্দিরটি বিগত ১৯৫৫ সালে নির্মিত হয়।

ভবানী পাঠক বা সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্দির

এই মন্দির শিকারপুর চা-বাগানের অন্তর্গত সন্ন্যাসীকাটা বা সন্ন্যাসীর হাটে অবস্থিত। মন্দিরের ভিত পাকা হলেও আসলে মন্দিরটি কাঠের এবং কতকটা প্যাগোডা আকারের। এটি স্থানীয়ভাবে ভবানী পাঠক বা সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্দির নামে পরিচিত। প্রতিষ্ঠাতা জনৈক স্কট সাহেব বলে জানা যায়। কিন্তু তার আগেও মন্দির ছিল জানা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দেবী চৌধুরানীর কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত এই মন্দির খুবই প্রসিদ্ধ। বর্তমান মন্দিরটি একশ বছরের কিছু বেশি আগে নির্মিত বলে কেউ কেউ মনে করেন।

এই অঞ্চলে বেশির ভাগ মন্দিরেই প্যাগোডার ছাপ আছে। জনৈক গবেষক বলেছেন, '.......এ অঞ্চলের অধিকাংশ মন্দিরই প্যাগোডার ধাঁচে তৈরি। তার কারণ হলো এ অঞ্চলের মানুষ একসময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েছিলেন। তাই এ অঞ্চলের মন্দিরকারিকরদের অবচেতন মনে বৌদ্ধ প্যাগোডার প্রভাব রয়েছে.....'।[১৫]

বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলা শ্রুতি, পুরাণ ও স্মৃতি অনুসারে প্রাচীন কিরাত দেশের একটি জনপদ ছিল। এখানে কিরাত জনগোষ্ঠীই ছিল প্রধান অধিবাসী, মহাভারতে এই কিরাতজনদের কথা সর্বপ্রথম জানা যায়। এই ভূখণ্ডের একটি সর্বভারতীয় নাম ছিল, প্রাগজ্যোতিষপুর এবং পরে কামরূপ।

জলপাইগুড়ি জেলায় জল্পেশ্বর রাজার নাম খুবই পরিচিত। এখানকার অধিবাসীরা এই অঞ্চলকে জল্পেশ্বরের রাজ্য বা মহাকালের রাজ্য বলে মনে করেন। 'মহাকাল উত্তরবঙ্গ, সিকিম, ভুটান ও নেপালে জাতীয় দেবতারূপে মর্যাদা পেয়ে থাকেন'। শিবের এক নাম মহাকাল। জলপাইগুড়িতে একটি প্রবাদ চলিত, এটি তিন ঈশ্বরের দেশ— জল্পেশ্বর, জটিলেশ্বর এবং বটেশ্বর।[১৬]

জলপাইগুড়ি জেলায় মন্দিরাদি পুরাবস্তু অন্যান্য জেলার মতো খুব বেশি নেই। এর কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে দূর পাল-শাসনের প্রভাব এখানে খুব কমই পড়েছিল। এখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ক্ষীণধারার সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতি মিশে গিয়ে নতুন নতুন দেবদেবীর সৃষ্টি করেছিল। যেমন, ভাণ্ডারী দেবী, পেটকাটি বা তিস্তাবুড়ি।[১৭] অবশ্য,

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দুর্গা, কালী, শিবও এখানে কম পুজো পাননি। তাঁদের মন্দিরও তৈরি হয়েছে। এই অঞ্চলের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলোর পুরানো রূপটি কেমন ছিল, তা অনুমান করা কঠিন। প্রাচীন জটিলেশ্বরের মন্দিরটি শিখরশৈলীর ছিল বলে অনুমান। তবে দক্ষিণবঙ্গে ইঁট ও পাথরের যেমন বিচিত্র শৈলীর মন্দিরের উদ্ভব হয়েছিল শ্রীচৈতন্যোত্তর পর্বে, এই জেলায় তা লক্ষ্য করা যায় না।

তথ্যসূত্র

১. ভট্টাচার্য, মন্দিরা, জলপাইগুড়ি জেলার পুরাকীর্তি (প্রবন্ধ), *মধুপর্ণী*, বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃষ্ঠা ৭৮

২. *তদেব*, পৃ. ৭৮

৩. *তদেব*, পৃ. ৭৯

৪. *তদেব*, পৃ. ৭৯

৫. *তদেব*, পৃ. ৭৯

৬. ঘোষ, আনন্দগোপাল, জলপাইগুড়ি জেলার পুরাকীর্তি (প্রবন্ধ), *পশ্চিমবঙ্গ*, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ২০০১, পৃ. ১৩-১৪

৭. তদেব,

৮. ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪

৯. '*জার্নাল অভ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল*', ভলিয়ুম ২৬, নং ২, পৃ. ২৬৫-২৭৯

১০ ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫

১১. তদেব, পৃ. ৮০

১২. ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

১৩. চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র, জলপাইগুড়ির মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, *মধুপর্ণী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

১৪. সান্যাল, চারুচন্দ্র, *দ্যা রাজবংশীজ অভ নর্থ বেঙ্গল*, দ্রষ্টব্য *পশ্চিমবঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫

১৫. ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫

১৬. ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

১৭. ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২

কোচবিহার

কোচবিহার শুধুমাত্র অন্যান্য জেলার মতো একটি বিচ্ছিন্ন জেলা নয়, প্রাচীনকালের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কামরূপ এবং পরবর্তীকালের কামতা বা কামতাপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই জেলা। প্রাচীনকালে কামরূপ দেশের চারটি অংশ-সৌমার পীঠ, কামপীঠ, রত্নপীঠ ও স্বর্ণপীঠের মধ্যে বর্তমান কোচবিহার জেলা ছিল রত্নপীঠের অন্তর্ভুক্ত। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং দেশকে 'পাণ্ডববর্জিত দেশ' বলা হত সেকালে। কারণ, এসব অঞ্চলের বেশির ভাগ অংশই ছিল জনবসতিশূন্য, বনজঙ্গল পাহাড়পর্বতে ঘেরা।

পরবর্তীকালে কোচবিহার এক স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। পালযুগে কাম্বোজেরা উত্তরবঙ্গের এই সব অঞ্চল অধিকার করার পর এখানে বেশ কিছুকাল তাদের শাসনাধিকার প্রবর্তিত হয়। তাদের উত্তরসূরিরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। কোচ, মেচ প্রভৃতি জাতি বেশির ভাগই এই অঞ্চলের বাসিন্দা হয়। বর্তমান কোচবিহার জেলার জন্ম ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। 'কিন্তু এর প্রাচীন অধিবাসীদের ইতিহাস এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়—কোচ, মেচ, রাজবংশী প্রভৃতি আদি অধিবাসীগণ সেই বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী।'[১]

কোচবিহারের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। এই জেলার সারা অঞ্চল জুড়েই মাটির টিলা ও ঢিবি বর্তমান। উৎখননের দ্বারা এগুলি থেকে ইতিহাসের অনেক অনাবিষ্কৃত সূত্র পাওয়া যেতে পারে। পালযুগের কিছু কিছু মূর্তিভাস্কর্যও নানা স্থান থেকে পাওয়া গেছে। পালরাজারা একসময় কামরূপে তাঁদের রাজ্যপাট স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের কয়েকজন রাজার নামও জানা যায় অসমীয়া বুরুঞ্জী থেকে।

তবে প্রাচীন মন্দির কোচবিহার অঞ্চলের কোথাও তেমন লক্ষ্য করা যায়নি। বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব এই অঞ্চলে তেমন পড়েনি। কিন্তু কামরূপে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করে গেছেন। খেন রাজবংশও অনেককাল কামরূপে রাজত্ব করেন। সেই রাজবংশের পতনের পর এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তখন গৌড়ে মুসলিম শাসন অব্যাহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সুলতানরাও এই দিকে তাদের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতি তাদের পৃথক পৃথক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন। এঁদের মধ্যে কোচ দলপতি বিশ্বসিংহ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তিনি কোচজাতিকে শক্তিশালী করে অন্যান্য দলপতিদের পরাজিত করতে সমর্থ হন এবং পশ্চিমে করতোয়া থেকে পুবে বরনদী পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন। এভাবে তাঁর নেতৃত্বে খ্রিস্টীয় ষোল শতকের শুরুতে কোচ রাজত্বের সূচনা হয়। বিশ্বসিংহ রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার সময় তাঁর ভাই শিষ্যসিংহ তাঁর মাথায় ছত্র ধারণ করেছিলেন বলে তাঁকে 'রায়কত' বা দুর্গাধিপতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[২] 'শিষ্যসিংহ তিস্তার পশ্চিম দিকে বৈকুণ্ঠপুর পরগণায় বসতি স্থাপন করেন। এই সময় থেকে বৈকুণ্ঠপুরে 'রায়কত' বংশের সূচনা হয়। পূর্বদিকে অহোম রাজ্য এবং দক্ষিণে গৌড়ের সুলতানের সঙ্গে বিশ্বসিংহের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।'[৩]

বিশ্বসিংহের সময় থেকে কোচবিহার রাজবংশের সূত্রপাত হয়। এই বংশের শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় ১৯৫০ সালে পৃথক কোচবিহার জেলা গঠিত হওয়া পর্যন্ত।

এই জেলার পাল-সেন পর্ব বা হিন্দু আমলের কোন মন্দিরের অস্তিত্ব জানা যায়নি। বর্তমান মন্দিরগুলোর বেশির ভাগই রয়েছে কোচবিহার শহর ও তার আশপাশে এবং অল্প কিছু আছে

তুফানগঞ্জ ও দিনহাটা মহকুমায়। তবে প্রায় সব মন্দিরেরই স্থাপত্য ও অলংকরণে তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা অলংকৃত মন্দিরগুলোর তুলনায় কোচবিহারের মন্দিরকে নেহাতই ধর্মীয় সৌধমাত্র বলা যায়। শহর কোচবিহার ও তার আশপাশের বেশির ভাগ মন্দিরই প্রতিষ্ঠা করেন রাজবংশের বিভিন্ন রাজারা। জনৈক লেখকের মতে, 'প্রায় চারশ বছর ধরে যে ধর্মীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল, এই নিদর্শনগুলি তারই স্মৃতি বহন করছে। মন্দিরের মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব মন্দিরের প্রাধান্য বেশী, যথা মদনমোহন মন্দির, অনাথনাথ শিবমন্দির, দেবীবাড়ি (দুর্গামন্দির), হিরণ্য-গর্ভ শিবমন্দির, রাজামাতা ঠাকুরবাড়ি, ভাঙ্গর আয়ী মন্দির, বাণেশ্বর শিবমন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, সিদ্ধনাথ মন্দির.......'।[৪] আরো বলা হয়েছে, 'পাশাপাশি অবস্থিত বিভিন্ন ধর্মীয় আদর্শ রাজ্যের (পূর্বতন) শাসকদের ধর্মীয় উদারতার মনোভাবের পরিচায়ক। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সহিষ্ণুতা বুদ্ধিতে সাহায্য করেছে। শঙ্করদেবের মন্দির সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনায় এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব এই জেলাতেও পড়েছিল। জেলা সদরে অবস্থিত দুটি ব্রাহ্ম মন্দির এর সাক্ষ্য বহন করছে। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৮৮ সালে দঃপূঃ এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ ব্রাহ্মমন্দির তৈরি করেন।'[৫]

কোচবিহার জেলার বিভিন্ন মন্দিরে যেসব মূর্তি রাখা আছে, সেগুলি আনুমানিক খ্রিস্টীয় এগার-বার শতকের। এগুলিতে পালযুগের শিল্পকলার সাদৃশ্য স্পষ্ট। এদের মধ্যে গঙ্গা বিষণ ঠাকুরবাড়ির লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে রক্ষিত সূর্যমূর্তি ও বিষ্ণুমূর্তি এবং গোসানীমারীর কামতেশ্বর মন্দিরের সূর্যমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব মূর্তি সম্ভবত নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে সংগৃহীত। অতএব অনুমান করা যায়, হিন্দু আমলের কোন কোন মন্দির এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কোচবিহারে দক্ষিণবঙ্গের মতো ইঁট-পাথরের অজস্র সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরি হয় নি। এর কারণ সম্ভবত এখানকার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রায় সারা উত্তরবঙ্গেই প্রকৃতিগত কারণে ভূমিকম্প ও মাত্রাধিক বৃষ্টির ফলে এখানে বন্যার প্রকোপ বেশি দেখা যায়। সেটাই ইঁট ও পাথরের সুবিশাল স্থাপত্যশিল্প গড়ে ওঠার পক্ষে প্রধান বাধা। কোচবিহারের ক্ষেত্রে এটা বেশি প্রযোজ্য। তবুও কোচবিহার রাজপৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত যে সব মন্দির আজও আছে, তার বিবরণ দেওয়া হল। নিম্নে উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি কোচবিহার শহর ও সদর মহকুমায় অবস্থিত।

মদনমোহন মন্দির ঃ এটি সমগ্র জেলার এক অতি প্রসিদ্ধ মন্দির। কোচবিহার রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহন। মন্দির তেমন পুরানো নয়। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এই মন্দিরটি নির্মাণ করান ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে। এটি একটি ঠাকুরবাড়ি, চারপাশ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মন্দিরপ্রাঙ্গণে আছে আরও দুটি মন্দির আনন্দময়ী কালী ভবানীর।

পাশাপাশি চার কক্ষযুক্ত এক বিশাল দালানের ছাদে গম্বুজাকৃতি একটি চূড়া মন্দিরের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের চুমকি থামের তেরটি সুন্দর খিলান প্রবেশপথ বর্তমান। এধরনের খিলান প্রবেশপথ থাকায় স্থাপত্যসৌন্দর্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চারটি কক্ষের প্রতিটিতেই দেববিগ্রহ অধিষ্ঠিত। কেন্দ্রীয় সব চেয়ে বড়ো কক্ষটিতে কুলদেবতা মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। মূল এই কক্ষটির ওপরে গম্বুজটি স্থাপিত। এর শীর্ষে আমলক, কলস ও পদ্ম আছে।

জানা যায়, কোচবিহার রাজবংশের তৃতীয়রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে (১৫৫৪-

১৫৮৮খ্রি.) মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। অসমের বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মগুরু শঙ্করদেব নরনারায়ণের সান্নিধ্যে তাঁর তিরোধানকাল পর্যন্ত কোচবিহারে অবস্থান করেন এবং শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবের কাছে নরনারায়ণ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এরপর তিনি একটি বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার নাম রাখেন লক্ষ্মীনারায়ণ। মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীকালে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তৎকালীন সুবেদার মীরজুমলা কামরূপ বিজয়ের পথে কমতাপুর আক্রমণ করে বিহারদুর্গ অবরোধ করেন এবং অনেক মন্দির ধ্বংস করেন। সে-সময় মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহও নষ্ট হয়। পরে মহারাজ রূপনারায়ণ মদনমোহনের সুন্দর মূর্তি তৈরি করে দেন। মদনমোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা কে, সে বিষয়ে নানা মত আছে। কেউ কেউ পরবর্তী মহারাজা প্রাণনারায়ণকে এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন। কিন্তু নানা সাক্ষ্যপ্রমাণে মহারাজা রূপনারায়ণই (১৬৯৪-১৭১৪ খ্রি.) প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ (১৮৬৩-১৯১১ খ্রি.) বৈরাগী দীঘির উত্তরপাড়ে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করান।

মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভবানী দেবীর মন্দিরটি একটি দালানের ওপর গম্বুজযুক্ত। দেবীর মূর্তি দশভূজা। একই সঙ্গে বামে সিংহ ও দক্ষিণে ব্যাঘ্রের ওপর দণ্ডায়মান দেবীমূর্তি অসুর নিধনে উদ্যত। এছাড়া কামতেশ্বরী মূর্তিও আছে। রাসযাত্রা মদনমোহন মন্দিরের প্রধান উৎসব। এটা কোচবিহারের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব।

অনাথনাথ মন্দির ঃ এটি একটি শিবমন্দির। এটিও বাঁকানো কার্নিশযুক্ত চালা বা দালানের ওপর গম্বুজ রত্নযুক্ত। নিচের দালান বা চালাটির উপরিভাগের প্রায় সর্বাংশ জুড়ে রয়েছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি গম্বুজ। মন্দিরটি অনেকটা সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের মতো। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের (১৮৪৭-১৮৬৩ খ্রি.) মহিষী নিশিময়ী দেবী সম্ভবত এটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি ইঁটের তৈরি এবং দক্ষিণমুখী। কিন্তু দক্ষিণদিকের দেওয়ালে অনেকগুলো খোপ থাকলেও কোনও টেরাকোটা বসানো নেই। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে এখানে উৎসব হয়।

দেবীবাড়ি বা বড়দেবী মন্দির ঃ এটি একটি মণ্ডপ বা দুর্গাদালান, কোন স্থায়ী বিগ্রহ নেই। দুর্গাপূজার সময় দুর্গা মূর্তি তৈরি করে পুজো হয়। এখানে দুর্গাকে বড়দেবী বলা হয়। দেবী দশভুজা, সিংহ ও ব্যাঘ্রবাহনা এবং অসুরের সঙ্গে যুদ্ধরতা। এই মণ্ডপটিতে য়ুরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মণ্ডপের সামনের দিকে রয়েছে আটটি 'করিন্থিয়ান' স্তম্ভ এবং ছাদের ওপর একটি গম্বুজ স্থাপিত। ছাদের কার্নিশের নিচে ত্রিকোণ 'পেডিমেন্ট'। এই মণ্ডপে কোন লিপি নেই। তবে য়ুরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ করে এটি উনিশ শতকে নির্মিত বলে মনে করা যায়।

কোচবিহারে দুর্গাপুজো চলিত হয় মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালে। এই পূজা প্রবর্তন নিয়ে একটি কিংবদন্তী এখনও চালু আছে। নরনারায়ণ স্বপ্নে দেবীকে দর্শন করে সেই স্বপ্নদৃষ্ট দেবী মূর্তির পূজা প্রবর্তন করেন।

হিরণ্যগর্ভ শিবমন্দির ঃ এটি হিরণ্যগর্ভ শিবের মন্দির নামে পরিচিত। এটি চারচালার ওপর অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজযুক্ত এক স্থাপত্য। গম্বুজের মাথায় পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল। প্রবেশদ্বার পুবদিকে। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পশ্চিমে একটি দরজা এবং উত্তর দক্ষিণে দুটি নকল দরজা বর্তমান। উল্লেখযোগ্য, এ মন্দিরে মার্বেল পাথরের একটি লিপি আছে। লিপিটি থেকে জানা যায়, ১২২৯ শকাব্দে (? ১৩০৭ খ্রি.;) শিববংশজাত বিহার রাজ্যাধিপতি

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটি নিশ্চিত এত পুরানো নয়। তাই এটি ১২২৯ শকাব্দ না হয়ে হওয়া উচিত ১৭২৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ। আবার ১২২৯ বঙ্গাব্দও হতে পারে অর্থাৎ ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ। হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালও ১৮০১-১৮৩৯ খ্রি.। তাই প্রতিষ্ঠাকাল ১২২৯ বঙ্গাব্দ হওয়ার সম্ভবপর অর্থাৎ ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ। এখানে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজার্চনা হয়। লিপিটি উদ্ধার করা হল ঃ

গ্রহাক্ষিমৈত্র প্রমিতে.....শকাব্দে,
বিহার রাজ্যাধিপতির্নরেন্দ্রঃ।
শ্রীশ্রীহরেন্দ্রশিববংশ জাতো,
বিনির্ম্মমে মন্দিরমেনমেশং।
১২২৯ শকাব্দে
মহারাজ শ্রীলশ্রী হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের
অনুজ্ঞায় নির্মিত।[৬]

রাজমাতা ঠাকুরবাড়ি ঃ এই মন্দিরটি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের মায়ের প্রতিষ্ঠিত। খুব সম্ভব খ্রি. উনিশ শতকের শেষ দিকে এটি নির্মিত হয়। বড় রানি কামেশ্বরী দেবী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটিও দালানের ওপর গম্বুজযুক্ত। গর্ভগৃহে রাধারমণ বা রাধাবিনোদ মূর্তি অধিষ্ঠিত।

ডাঙ্গর আয়ী মন্দির ঃ ডাঙ্গর আয়ী বা বড় রানি কামেশ্বরী দেবী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের (১৮৩৯-১৮৪৭ খ্রি.) বড় রানি। এটি একটি চারকক্ষযুক্ত দালান মন্দির। এখানের প্রধান বিগ্রহ দুর্গা। কিন্তু অন্যান্য কক্ষে দুর্গা, শিব, কালী বিগ্রহও আছে। প্রবেশপথের ওপর সংস্কৃত ভাষায় লিপিটি এই ঃ

প্রাসাদং শরশূন্য হস্তিধবলৌ সকা অন্তিকে।
সংনির্মায় শিবেন্দ্রভূপমহিষী শ্রীশ্রীলকামেশ্বরী।।
দুর্গাভক্তিযুতোত্তরায়ণ সমাখ্যানে রবে সংক্রমে।
পৌষে ত্রিংশমিতে দিনে স্ম কুরুতে তস্য প্রতিষ্ঠাবিধিঃ
১২৯০ সাল।।[৭]

১২৯০ সাল (বঙ্গাব্দ) অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বড় রানি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঠাকুরবাড়ি মদনমোহনের মাসীর বাড়ি বা 'গুঞ্জবাড়ি' নামে পরিচিত।

বাণেশ্বর মন্দির ঃ কোচবিহার শহর থেকে পায় দশ কিলোমিটার উত্তরে বাণেশ্বর রেল স্টেশনের পুব দিকে এই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটি প্রাচীন। গম্বুজযুক্ত দালান মন্দিরটি কোচবিহারের অন্যান্য মন্দিরের মতো একই স্থাপত্যের একটি নিদর্শন। গম্বুজশীর্ষে প্রথামত পদ্ম, আমলক ও ত্রিশূল স্থাপিত। মন্দিরের গর্ভগৃহ বাইরের সমতল মাটি থেকে অনেকটা নিচুতে। প্রবেশপথ থেকে প্রায় দশফুট সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গৌরীপট্টের ওপর শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত।[৮] এই মন্দিরচত্বরে আরও দেবদেবী মূর্তি আছে। দেবী চণ্ডী ও ভুবনেশ্বরীর থানও আছে। এই মন্দিরের সঙ্গে পার্বত্য ত্রিপুরার মন্দিরের কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। 'দরজার উপর থেকে কিছুটা খাড়াভাবে দেওয়ালের গাঁথনি, উপরের দিকে আটকোণার আকৃতি নিয়ে খিলান পর্যন্ত গেছে। আটকোণাকৃতি অংশগুলোর ওপর তৈরি হয়েছে খিলান, তার উপর সৃষ্টি করা

হয়েছে 'লহরা'র। বৃত্তের মতো লহরার উপর দিকে স্থাপন করা হয়েছে গ্রীবা বা বেকি।'[৯]

বাণেশ্বরের মূর্তিটি অর্ধনারীশ্বরের। এটি শিবদুর্গার মিলিত রূপ। এখানের মন্দিরে আরও কয়েকটি দেববিগ্রহ আছে।

বাণেশ্বরের আদিমন্দির ছিল পাথরের। বেশ প্রাচীন। পরবর্তীকালে মহারাজা প্রাণনারায়ণ ইঁটের প্রাচীর দিয়ে পাথরের মন্দিরটি ঢেকে দেন। কেউ কেউ মহারাজা নরনারায়ণকে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন।[১০] আবার শরৎচন্দ্র ঘোষালের সম্পাদিত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাবলীতে (৫ম খণ্ড) মহারাজা প্রাণনারায়ণকে (১৬২৫-১৬৬৫ খ্রি.) বাণেশ্বর ও ষণ্ডেশ্বর এই দুটি শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দাস তাঁর সম্পাদিত '*উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তির (১৯৮৫) কোচবিহার*' নিবন্ধে বলেছেন,

'উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি শহরে এবং গ্রামগ্রামান্তরে বিখ্যাত ও অল্পখ্যাত শিবের সংখ্যা অনেক। তবে খ্যাতির শীর্ষে রয়েছে দুটি শিব মন্দির। একটি কোচবিহার জেলার বাণেশ্বরের শিবমন্দির ও অন্যটি জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ্বর শিবমন্দির।'[১১]

মন্দিরের গঠন, সমতল ভূমি থেকে অনেক নিচে গর্ভগৃহ প্রভৃতি লক্ষ্য করে এটিকে একটি বেশ প্রাচীন মন্দির বলেই মনে হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা এই মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। শিবরাত্রির সময় মানতপূরণের জন্য ভক্তেরা শিবের কাছে পশুপক্ষী বলি দেন।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ঃ বাণেশ্বর মন্দির থেকে দক্ষিণপূর্ব কোণে আড়াই কিলোমিটার দূরত্বে বা নিউ বাণেশ্বর রেলস্টেশন থেকে উত্তরপশ্চিম কোণে এক কিলোমিটার দূরত্বে মন্দিরটি সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে অবস্থিত। মন্দিরের গঠন আটকোণযুক্ত একটি চাঁদনি বা দালানের ওপর অর্ধচন্দ্রাকৃত গম্বুজ। গম্বুজশীর্ষে প্রথামাফিক পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল স্থাপিত। সিদ্ধেশ্বরী চতুর্ভুজা কালী উবুড় হয়ে থাকা পদ্মের ওপর উপবিষ্টা। দেবীর ওপরের দুহাতের আঙুলে কর্তরী ও খড়্গ এবং নিচের দুহাতে যথাক্রমে কপাল ও অভয়মুদ্রা।[১৩] কাজেই এটি একটি ভৈরবী মূর্তি। গর্ভগৃহের মেঝেতে খোদিত শিবলিঙ্গবিশেষ সিদ্ধেশ্বর। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রি.) এই মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরটির গর্ভগৃহের দুটি কোণের মাঝখানের দূরত্ব প্রায় আটফুট। প্রতিটি কোণে নকল দরজা। তার দুপাশে একটি করে মোট দুটি করে গোল থাম আছে। দরজার অর্ধবৃত্তাকার খিলান প্রবেশপথের ওপর 'পঙ্কে'র কিছু জ্যামিতিক অলংকরণ ও পদ্ম অঙ্কিত ছিল। কিন্তু সেগুলি সংস্কারের সময় লুপ্ত। এই মন্দিরে য়ুরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।[১৪]

বোকালীর মঠ ঃ কোচবিহার থেকে উত্তরে প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কোচবিহার আলিপুরদুয়ার সড়ক পথের ধারেই এই ঠাকুরবাড়ি অবস্থিত। এখানে মাটির তলায় এক বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা গেছে। চারশ বর্গফুটের এই মন্দিরের ইঁটের তৈরি দেওয়ালটি বেশ চওড়া ছিল। গর্ভগৃহও ছিল বড়ো। এছাড়া বেশ উঁচু ও চওড়া এক প্রাচীরও লক্ষ করা গেছে।

এই প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পালযুগের বলে অনুমান। খ্রিস্টীয় নবম শতকে পালসম্রাট দেবপাল অসমসহ এই দিকের অঞ্চলও জয় করেন। সেসময় এই স্থান কামতাপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কোনসময় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকেরা এই মঠকে তন্ত্রক্রিয়া প্রভৃতির সাধনপীঠরূপে ব্যবহার করত। সে যাই হোক, এটি যে বেশ প্রাচীন মন্দির ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সিদ্ধনাথ মন্দির : এটি সিদ্ধনাথ শিবের মন্দির। ধলুয়াবাড়ি বা ধলিয়াবাড়ি গ্রামে মন্দিরটি অবস্থিত। শহর কোচবিহার থেকে কোচবিহার দিনহাটা পথে প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

মন্দিরটি ইঁটের 'পঞ্চরত্ন' রীতির মন্দির ছিল। কিন্তু সকলের চেয়ে বড়ো কেন্দ্রীয় রত্নটি দীর্ঘকাল নেই। বাঁকানো কার্নিশযুক্ত একটি চাঁদনির চার কোণে চারটি চালা আদলের দেউলরত্ন লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র কোচবিহার জেলার মধ্যে টেরাকোটা অলংকরণ যুক্ত এমন মন্দির খুব অল্পই পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় রত্নটি থাকলে এটি আরও দেখতে সুন্দর হত। বুকানন হ্যামিলটন ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দেও কেন্দ্রীয় রত্নটি দেখতে পাননি বলে লিখেছেন। অতএব অনুমান করা যায়, চূড়াটি তার আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে অনেক টেরাকোটামূর্তি সন্নিবেশিত আছে। দশাবতার ও পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া বন্দুকধারী সৈন্য, নৃত্যরতা রমণী এবং ফুল, লতা-পাতার নকশা লক্ষ্য করা যায়।

মন্দিরের পশ্চিমদিকের প্রবেশপথের সামনে টিনের ফলকে লেখা থেকে জানা যায়, এই মন্দির হরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ ১৭৯৯-১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অপর এক মতে, মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণ ১৭১৪-১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

মধুপুর ধাম : বিখ্যাত অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক ও কবি শঙ্করদেবের স্মৃতিধন্য পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে এই স্থান সুপরিচিত। বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান প্রচারকরূপে শঙ্করদেব ও দামোদরদেব বিখ্যাত। তাঁরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। শঙ্করদেব সমগ্র অসম এবং মণিপুরের নানা স্থানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। ষোল শতকের গোড়ার দিকে তিনি কোচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জানা যায়, রাজার সেনাপতি চিলা রায় বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হন এবং পরে শঙ্করদেবকে ধর্মীয় গুরুরূপে স্বীকার করে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এখানে শঙ্কর মন্দিরটি খুবই আধুনিক। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে জানা যায়, মন্দিরটির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি মন্দিরটি নির্মিত হয়। আবার কেউ কেউ নরনারায়ণকেও (১৫৩৩-৮৭) এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন।

পুবমুখী এই মন্দিরটির সামনে আছে একটি দালান নাটমণ্ডপ। তবে ঠিক প্রথামত দালান নয়। নিচের চালগুলো ঢালু ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান প্রবেশপথযুক্ত। মূল মন্দির ছত্রাকৃতি খাড়া 'চালা'শৈলীর। চারপাশের কার্নিশগুলো বাঁকানো ও চালগুলো ঢালু। গর্ভগৃহে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের চিত্র অধিষ্ঠিত। শঙ্করদেবের ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র, ভাগবতের দশম স্কন্ধের একটি পুঁথিও এখানে আছে। মহারাজা নরনারায়ণ শঙ্করদেবের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে যে রূপোর হারটি দিয়েছিলেন, সেটিও আছে। মূলমন্দিরের কাছে টিনের চারচালায় কীর্তনঘরটি শঙ্করদেব, মাধবদেব ও দামোদরদেবের পুণ্য স্মৃতিধন্য। শঙ্করপন্থী ভক্তদের এখানে দীক্ষা দেওয়া হয়। অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে ভাজঘর ও দোলমন্দির আছে।[১৫] এই তীর্থস্থানের জন্য মহারাজা বীরনারায়ণ এবং তাঁর পুত্র প্রাণনারায়ণ (খ্রি. ১৭ শতকের মধ্যভাগ) বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। এটি অসমীয়া বৈষ্ণবদের প্রধান তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত। 'এই ধামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত অসমীয়া বৈষ্ণবচার্য গোবিন্দ আঁতৈর তিরোভাব তিথিতে এখানে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।' রাসযাত্রা,

দোলযাত্রা, শঙ্করদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি উপলক্ষ্যে এখানে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়।

হরিহর শিবমন্দির, হরিপুর ঃ মধুপুরধামের দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে তোর্ষানদীর বাঁধের পাশে হরিপুর গ্রাম। সেখানের হরিহর শিবের মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরটি পশ্চিমমুখী, ইঁটের তৈরি। মন্দিরটির চুড়ো চারচালা রীতির।[১৬] মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠাকালীন লিপি না থাকলেও খ্রিস্টীয় আঠার শতকের প্রথমভাগে মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণ এটি প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যলাভ) আঠার শতকের শেষদিকে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের ওপরে ও দুপাশের জায়গায় ফুল লতাপাতার অলঙ্করণযুক্ত বেলেপাথর দিয়ে বাঁধানো। এখানে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা আর্চা হয়।[১৭]

বৈকুণ্ঠনাথ মন্দির ঃ মন্দিরটি কোচবিহার শহর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে অবস্থিত। এটি পাকা মন্দির নয়। মাটি, টিন ও বাঁশের তৈরি। মন্দিরের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ (খ্রি. ষোল শতকের শেষ) বৈকুণ্ঠনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। গ্রামটি সেসময় খুবই সমৃদ্ধ ছিল। রাজাদের প্রধান মন্ত্রীরা এখানে বাস করতেন। দোলযাত্রা, রথযাত্রা ও রাসযাত্রা এখানের প্রধান উৎসব। তাছাড়া শঙ্করদেবের শিষ্য দামোদরদেবের তিরোভাব তিথিতেও এখানে উৎসব হয়।

কোচবিহারের দিনহাটা ও তুফানগঞ্জ মহকুমায় কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য মন্দির আছে। প্রথমে দিনহাটা মহকুমার কয়েকটি মন্দিরের বিবরণী এখানে দেওয়া হল ঃ

মদনমোহন বা বলরামঠাকুরের মন্দির ঃ দিনহাটা মহকুমা অফিসের দক্ষিণদিকে এটি অবস্থিত। মন্দিরটি এই জেলার চিরাচরিত সমতল ছাদযুক্ত দালানের ওপর গম্বুজযুক্ত। এর আরেকটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল 'গম্বুজের দুপাশে দুটি থাম ও তার সামনের দিকে চারটি থাম আছে। পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের থামদুটির উপরে কলস স্থাপিত। উপরে ও সামনের থামদুটির মাথায় ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর মূর্তি দেখা যায়।'[১৮] মূর্তিগুলি 'স্টাকো'র (চুন ও বালি) তৈরি। মন্দিরগর্ভগৃহে কৃষ্ণ ও বলরামের বিগ্রহ অধিষ্ঠিত। মন্দির তেমন পুরানো নয়। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (খ্রি. ১৯০৭) মন্দিরটি নির্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাফলক থেকে তা জানা গেছে।

দিনহাটা শহরে যে দু-একটি মন্দির আছে, তার মধ্যে একটি হল শঙ্করমন্দির। এই মন্দিরে একটি প্রাচীন কালীমূর্তি এবং পালসেন যুগের উমা-মহেশ্বরের একটি মূর্তি আছে।[১৯]

কামতেশ্বরী মন্দির ঃ এই মন্দিরটি দিনহাটা রেল স্টেশন থেকে আট কিলোমিটার পশ্চিমে গোঁসানীমারী গ্রামে অবস্থিত। শহর কোচবিহার থেকে গ্রামের দূরত্ব বাইশ কিলোমিটার।

এটি কোচবিহার জেলা তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির। এখানে বহু আগে একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। সেটির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন, জানা যায় না। বর্তমান এই মন্দিরটি মহারাজা প্রাণনারায়ণ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করেন। মন্দিরের আকার ও আয়তন বিশাল ও দর্শনীয়।

একটি উচ্চ ভিত্তিবেদির ওপর মন্দিরটি অবস্থিত। 'গঠনশৈলীর দিক থেকে একে আলগোছটুঙি-শ্রেণীর মন্দির বলা যায়।'[২০] মন্দিরের চারদিকে বাঁকানো কার্নিশ ছাদের ওপর একটি অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ স্থাপিত। সামনে এক প্রশস্ত নাটমন্দির। মন্দিরপ্রাঙ্গণে রয়েছে আরও তিনটি ছোট মন্দির। এগুলোতে আছে বিষ্ণু ও শিবলিঙ্গ, মহাদেব ও ভৈরবী এবং তারকেশ্বর।

মন্দিরটির পশ্চিমদিকে প্রধান প্রবেশপথের ওপর সংস্কৃত ভাষায় রচিত লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হল ঃ

'ওঁ নমো গণেশায়
সম্মত্যাদ্বিষদেকজিত্বরভুজদণ্ডপ্রতাপায্যস্য
ক্রীড়াকন্দুক বেগবর্দ্ধিতদিশঃ শ্রীপ্রাণভূমিপতেঃ
শাকাব্দে নগনাগমার্গণ হিমজ্যোতির্ম্মিতে নির্ম্মিতঃ
শ্রীভাজা কবিমণ্ডলেন ভজতা ভব্যে ভবানীমঠ ঃ।[২১]

অর্থাৎ ১৫৮৭ শকাব্দ বা ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি রাজা শ্রীপ্রাণের (প্রাণনারায়ণ) দ্বারা নির্মিত হয়। মন্দিরটি ভবানীমন্দির নামেও পরিচিত। লিপিতে 'ভবানীমঠ' একথা বলা আছে।

মন্দিরচত্বরে তোষাখানা, হোমঘর প্রভৃতি আছে। সবই ভগ্নদশায় উপনীত। এখানে ভগবতী দেবীর বিগ্রহ পাথরে তৈরি। মাঘমাসে দেবীর স্নান উৎসব খুবই উল্লেখযোগ্য সমারোহ।

খলিসা গোঁসানীমারী গ্রামে কামতাপুর দুর্গ অবস্থিত। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখানে আছে ছোট-বড় অনেক ঢিবি, ইঁটের অজস্র টুকরো ইত্যাদি। এটি বর্তমানে 'গোঁসানীমারীর গড়' বা 'রাজপাট' নামে পরিচিত। এই রাজপাটের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক ঘিরে প্রায় বাইশ কিলোমিটার দীর্ঘ উঁচু মাটির দেওয়াল বর্তমান। দুর্গটির বাইরে গভীর গড়খাই এর চিহ্ন আছে।

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বারকোদালি গ্রামে দামেশ্বর শিবমন্দির একটি টিনের চারচালা। শিবলিঙ্গ বড় মহাদেব নামে পরিচিত। বারকোদালি তুফানগঞ্জ মহকুমা শহর থেকে প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। মহারাজা নরনারায়ণের ভাই চিলা রায় (শুক্লধ্বজ) এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। আগে এখানে একটি প্রাচীন মন্দির ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু তার এখন আর কোন চিহ্ন নাই।

মদনমোহন বা গিরিধারীলালজীউর মন্দির তুফানগঞ্জ বাজারের কাছে একটি উঁচু ঢিবির ওপর অবস্থিত। এই বিগ্রহের আদি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ (খ্রি. ষোল শতকের শেষদিক)। মন্দির বেশি দিনের পুরানো নয়। অবশ্য, লক্ষ্মীনারায়ণকর্তৃক স্থাপিত একটি আদি মন্দির ছিল। তার কোন চিহ্ন এখন নেই। এখানে দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, রথযাত্রা, উল্লেখযোগ্য পার্বণ।

ওপরের আলোচনায় কোচবিহার জেলার মন্দিরস্থাপত্যসম্পর্কে মোটামুটি যে ধারণা হয়, তা হল, মন্দিরগুলোর গঠনে প্রায় সব ক্ষেত্রেই মুসলিম ও য়ুরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব পড়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অসংখ্য মন্দিররাজির সঙ্গে এদের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ মন্দিরই আধুনিক। দু-চারটি ছাড়া পুরানো মন্দির একান্তই বিরল। পালসেন যুগে এই দিকে যে সে-সময়ে কোন কোন মন্দির ছিল, তারও প্রমাণ রয়েছে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যেই তা ধরা পড়ে। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কোচ রাজাদের ওপর বেশি করে পড়ায় সব মন্দিরেই হয় শিবলিঙ্গ অথবা বৈষ্ণবদেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব, পূজাপার্বণ মন্দিরকে যথেষ্ট প্রাণময়তা দান করেছে। দক্ষিণবঙ্গে চৈতন্যোত্তর যুগের মন্দিরে যেমন খাঁটি বাঙালি 'ঘরানা' স্থান পেয়েছে, যার ফলে চালা, জোড়বাংলা, চাঁদনি, রত্ন দেউলরীতির মন্দিরগুলির অভাবনীয় বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, এই অঞ্চলে দুএকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তার লেশমাত্র চোখে পড়ে না। পক্ষান্তরে, ইঁট বা পাথরের মন্দিরে অলংকরণপ্রাচুর্য তেমন কিছু চোখে পড়ে না। পাকার মন্দিরগুলি

সবই প্রায় গম্বুজশীর্ষ (আমরা মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে এই গম্বুজশীর্ষ মন্দির কিছু লক্ষ্য করেছি)। কিন্তু সে- তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের মতো এখানে দেউল বা চালারত্ন একেবারেই অনুপস্থিত।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. রায়, সান্যাল রত্না, কোচরাজবংশের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস, *মধুপর্ণী,* বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৩৯৬, পৃ. ৫৫

২. রায়, সান্যাল, *তদেব,* পৃ. ৫৫

৩. *তদেব,* পৃ. ৫৫

৪. *দাস,* কমলেশচন্দ্র, জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, *মধুপর্ণী,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

৫. *তদেব,* পৃ. ৬৭

৬. *দাস,* বিশ্বনাথ (সম্পাদিত), *উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি,* ১৯৮৫, বিশ্বনাথ দাসের কোচবিহার *প্রবন্ধ,* পৃ. ৮৪ লিপিটি উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

৭. *তদেব,* পৃ. ৮৫

৮. *তদেব,* পৃ. ৮৬

৯. *তদেব,* পৃ. ৮৭

১০. *রিপুঞ্জয় দাসের বংশাবলী,* দাস বিশ্বনাথ, পৃ. ৮৮

১১. *তদেব,* পৃ. ৮৯, *হরেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাবলী* (৫ম খণ্ড), পৃ. ১২৬

১২. *তদেব,* পৃ. ৮৯

১৩. দাস, কোচবিহার, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৯১

১৪. দাস, পৃ. ৯৩-৯৪

১৫. দাস, পৃ. ৯৯-১০০

১৬. *তদেব,* পৃ. ১০০

১৭. *তদেব,* পৃ. ১০০

১৮. *তদেব,* পৃ. ১০৯

১৯. *তদেব,* পৃ. ১০৯

২০. *তদেব,* পৃ. ১১৪

২১. *তদেব,* পৃ. ১১৫

দার্জিলিং

দার্জিলিং জেলার প্রকৃতিগতকারণে অন্যান্য জেলার মতো পুরাকীর্তি মঠমন্দির মসজিদের সংখ্যা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। এই জেলার ভৌগোলিক দুটি বিভাগ পার্বত্য উচ্চভূমি এবং সমতলভূমি। পার্বত্য অঞ্চলেও যেমন উল্লেখযোগ্য কোন পুরাকীর্তি নেই, তেমনি নেই সমতলভূমিতেও। দার্জিলিংকেও উত্তরবঙ্গের 'পাণ্ডববর্জিত দেশ' বলা হয়। উচ্চ পার্বত্যভূমিতে যোগাযোগব্যবস্থার অসুবিধা এবং অন্যান্য কারণে যেমন জনবসতি গড়ে ওঠে প্রাচীনকালে, তেমনি সমতলভূমির বেশির ভাগই জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় এখানে দীর্ঘকাল স্থায়ী কোন জনবসতি ছিল না বা কোন শক্তিশালী রাজা বা সামন্ত জমিদারের আবির্ভাব ঘটেনি। এর ফলে যে জমিদারগণ আগে মঠমন্দির মসজিদ, গড় দীঘি প্রভৃতি স্থাপন করতেন, তাদের অভাবে ওইসব প্রাচীন কীর্তির কিছুই তেমন এই অঞ্চলে গড়ে ওঠেনি। এর ফলে প্রতিবেশী জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে যেমন অনেক মঠমন্দির আমরা লক্ষ্য করি, এই জেলায় সেরকম দেখা যায় না। অতএব প্রকৃতিগত কারণ ও সুসংহত রাজশক্তি এই অঞ্চলে না থাকায় পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলার মতো এই জেলায় পুরাকীর্তি মঠ মন্দির প্রভৃতি গড়ে উঠতে পারেনি।[১]

১৯৩৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে দার্জিলিং জেলার প্রায় সব পুরাকীর্তিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া ভেজা আবহাওয়ার ফলে এদিকে অনেক পুরাকীর্তিই নষ্ট হয়ে গেছে।

দার্জিলিং জেলার সৃষ্টি ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে হলেও কালিম্পং, শিলিগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চল এর সঙ্গে পরে পরে যুক্ত হয়। জেলার পরিসীমা বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। দার্জিলিঙের শিলিগুড়ি মহকুমা সমতলভূমিতে অবস্থিত এবং 'তরাই অঞ্চল' নামে পরিচিত। এই অঞ্চল পাল সেন ও সুলতানী আমলে গৌড়ের রাজশাসনাধিকারে ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে এই স্থান অবহেলিত থেকে যায়। সাংস্কৃতিক বিকাশ এই অঞ্চলে হয়নি বললেই চলে।[২]

খ্রিস্টীয় ষোল শতকের প্রথমভাগে এই অঞ্চলে কামতা কোচ রাজবংশের অধিকার বিস্তৃত হয়। কিন্তু আঠারো শতকের প্রথম দিকে সিকিম এই অঞ্চল দখল করে নেয়। এর পর সিকিমের অধীনে থাকে প্রায় একশ বছর। কিন্তু তখনও এই অঞ্চলের কোন উন্নয়ন হয় নি। আঠার শতকের শেষ দিকে এই তরাই অঞ্চল প্রতিবেশী পার্বত্য রাজ্য নেপাল দখল করে নেয়। এই অঞ্চল নেপালেরও প্রত্যন্ত স্থান থাকায় এখানের কোন উন্নয়ন হয় নি, কোনও মঠমন্দিরও স্থাপিত হয় নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় এই অঞ্চল ইংরেজদের অধিকারে আসে।[৩]

দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলের ইতিহাস-সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, সিকিমের অধিকারে আসার আগে এই অঞ্চল ভূটানেরও অধিকারে ছিল।

দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে বহুকাল ধরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। এর ফলে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়ে ওঠে। তার ফলে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ মঠমন্দির বেশি লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, সমতল অঞ্চলে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বেশি হলেও হিন্দু মন্দির গড়ে নি। এর ফলে উল্লেখ করার মতো কোন মঠ-মন্দির এখানে নেই। ইংরেজ আগমনের ফলে উনিশ শতকে কিছু কিছু স্থানে খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটে।

দার্জিলিং জেলার পুরাকীর্তি মঠমন্দির আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। দুটি বৌদ্ধমন্দির উল্লেখযোগ্য ঃ তামাং বৌদ্ধ বিহার ও ঘুম বৌদ্ধবিহার। কার্সিয়াং থেকে গুপ্তোত্তর যুগের

কালিপাথরের বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের দামোদরপুর তাম্রফলকের মধ্যে যে দুটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে, তাদের 'হিমবৎশিখর' বলা হয়েছে। এর থেকে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলকে অনুমান করা হয়। দার্জিলিং শহরের মাঝখানে যে উঁচু টিলামত জায়গা আছে, সেটি দুর্জয়লিঙ্গ নামে শিবের বাসস্থান ছিল বলে কথিত। আবার এও বলা হয়, এখানে আগে তিব্বতীয় একটি বৌদ্ধমঠ ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নেপালীরা এই অঞ্চল জয় করে সেই মঠটিকে ভেঙে ফেলে। ওই একই জায়গায় হিন্দু নেপালী একটি মঠ স্থাপন করে। এই মঠের ভেতর মহাকালের মন্দির নামে একটি ছোট মন্দির আছে। এখানে শ্বেত পাথরের শিবলিঙ্গ মহাকাল শিব নামে পরিচিত।

পুরানো আর একটি মন্দির বড়ী ঠাকুর মন্দির। এটি সেসময় পূর্ব পঞ্জাবের জনৈক রামপ্রসাদ সিং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে রাধাকৃষ্ণমূর্তি (পাথরের), পেতলের গোপাল ও দুর্গা এবং শিবলিঙ্গ আছে।

শ্রীমন্দির স্থাপিত হয় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরের ভেতর কারুকার্যযুক্ত কাঠের বেদির ওপর কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তি স্থাপিত। এখানে পেতলের কালীমূর্তি, মাটির গৌর-নিতাই-এর মূর্তি ও শিবলিঙ্গ বর্তমান। এছাড়া আধুনিক বীরধামমন্দির উল্লেখযোগ্য। নেপালের পশুপতি মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে।

সমতলক্ষেত্র তরাই অঞ্চলে তেমন কোন মন্দির দেখা যায় না। শিলিগুড়ি থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অধিকারী গ্রামে বাবার মন্দির বর্তমান। মন্দিরটি পুরানো না হলেও পার্শ্ববর্তী দীঘিটি প্রাচীন। এছাড়া শিলিগুড়ি নকশালবাড়ির পথে ঘোষপুকুর নামে একটা জায়গায় দুটি প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিদুটি পালযুগের — একটি খ্রিস্টীয় দশম ও অপরটি দ্বাদশ শতকের। দুটিই দুর্গা মূর্তি। মূর্তিদুটি প্রমাণ করে, সেই সময় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে এখানে মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

দার্জিলিং-এ আর কোন মন্দির লক্ষ্য করা যায় না।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. দাস বিশ্বনাথ (সম্পাদিত), *উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি*, ১৯৮৫, এখানে দ্রষ্টব্য, আনন্দগোপাল ঘোষের প্রবন্ধ 'দার্জিলিং', পৃ. ৪৩

২. *তদেব*, পৃ. ৪৫

৩. *তদেব*, পৃ. ৪৫

১৬

অন্যান্য জেলার মন্দির ঃ সমীক্ষা

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি ও পলিমাটি অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় হুগলি, হাওড়া, উত্তরচব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় শেষমধ্যযুগে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এগুলির কিছু কিছু 'টেরাকোটা'-অলংকরণেও সমৃদ্ধ। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এদের বেশির ভাগ বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের অনুরূপ। ইঁটের মন্দিরই বেশি। পাথরের মন্দির প্রায় নেই বললেই চলে। গাঙ্গেয় উপত্যকার সহজলভ্য পলিমাটিতে গড়া এই মন্দিরগুলিতে কোমলতা ও সৌকুমার্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। গাঙ্গেয় উপত্যকার এই অঞ্চলকে বাংলার মন্দিরের 'হৃদয়ভূমি' বলা যায়। উত্তরবঙ্গের মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের তুলনায় খাঁটি বাংলা-রীতির মন্দির এইদিকেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে বেশি। 'চালা', 'চাঁদনি', 'দেউল', 'রত্ন' সব রীতির মন্দিরই এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়। অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভেদও ক্বচিৎ লক্ষ্য করা যায়, যেমন, মহানাদের (হুগলি) লালজীউর মন্দির (১৮৫১), নদীয়ার 'শিবনিবাস' ও 'গঙ্গাবাসে'র মন্দির। হুগলির সুখাড়িয়ায় (বলাগড়) এবং বর্ধমানের কালনায় আকর্ষণীয় কয়েকটি 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির আমরা লক্ষ্য করেছি যেগুলির তুলনা পশ্চিমবাংলায় বিরল। পক্ষান্তরে, সুবিখ্যাত নবদ্বীপে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কোন মন্দিরের অভাব আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈষ্ণব ভক্তিবাদ-আন্দোলনের ফলে বাংলার মন্দিরস্থাপত্য ও অলংকরণের যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল, শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান সেই নবদ্বীপে তার কোন নিদর্শনই প্রায় নেই। এখানের প্রায় সব মন্দিরই আধুনিক ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত। পক্ষান্তরে, হুগলি ও বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে যে সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা মন্দির তৈরি হয়েছিল, তা বাংলার মন্দিরশিল্পেব ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম ও উত্তর চব্বিশ পরগনায় বেশ কিছু মন্দির খ্রিস্টীয় সতের থেকে উনিশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়। দশঘরার (হুগলি) বিশ্বাসদের গোপীনাথের পঞ্চরত্নটি (১৭২৯) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। মন্দিরটির সামনে টেরাকোটামূর্তি-অলংকরণ উল্লেখযোগ্য। যদিও ১৯৩৭ সালে সংস্কারের সময় কয়েকটি নতুন মূর্তিফলক বসানো হয়। বাঁশবেড়িয়ায় (হুগলি) অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (১৬৭৯ খ্রি.) টেরাকোটা-অলংকরণে সমৃদ্ধ জেলার একটি প্রসিদ্ধ মন্দির। এরই পাশে বিখ্যাত হংসেশ্বরীর 'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দিরটি (পাথরে তৈরি, ১৮১৪ খ্রি.) স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অভিনব। এর 'রত্ন'-শিখরগুলি পদ্মকোরকাকৃতি। বালি-দেওয়ানগঞ্জের 'নবরত্ন'-দুর্গামন্দিরের স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এটি একটি 'জোড়বাংলা' মন্দিরের ওপরে স্থাপিত 'নবরত্ন' (আ. ১৯ শতক)। ক্ষীরকুণ্ডির (হুগলি) নারায়ণের 'রত্ন'-মন্দিরটি (১৭৭০ খ্রি.) উচ্চ দীর্ঘাকৃতি, কিন্তু আয়তনে অপ্রশস্ত। এর 'রত্ন'-শিখরগুলি 'পিঢ়'-রীতির। জয়দেব-কেন্দুলীর (বীরভূম) প্রসিদ্ধ রাধামাধবের 'নবরত্ন' (আ. ১৬৮৩-১৬৯২ খ্রি.) 'নবরত্ন'-মন্দিরের এক উল্লেখ্য নিদর্শন। এরও 'রত্ন'-শিখর 'খাঁজকাটা' পিঢ়া এবং নিচের দালানের কার্নিশ ধনুকের মতো বাঁকা। ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থে 'টেরাকোটা'-মূর্তির সমারোহ বর্তমান। আসণ্ডার (হাওড়া) শ্রীধরের 'নবরত্ন' (১৭৮৯ খ্রি.) খর্বাকৃতি, কিন্তু বৃহদায়তন। এরও 'রত্ন'- শিখর খাঁজকাটা 'পিঢ়া'। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে 'টেরাকোটা'-মূর্তি ও অন্যান্য অলংকরণের সমারোহ। কার্নিশ ধনুকের মতো

বাঁকানো ও সুদৃশ্য। ঘুড়িষায় (বীরভূম) লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন'-মন্দিরটিতে (১৮৩৯ খ্রি.) উনিশ শতকের অবক্ষয়ী শৈলীর প্রভাব স্পষ্ট। নিচের দালানটির ওপরের ছাদের চারপাশে পাকা রেলিং দেওয়া বারান্দা, কার্নিশ সোজা। 'রত্ন'-শিখর খাঁজকাটা 'পিঢ়া'। কিন্তু ইলামবাজারের (বীরভূম) লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন'-মন্দির (১৮৪৬ খ্রি.) এক বলিষ্ঠ 'রত্ন'-শৈলীর উদাহরণ। ধনুকের মতো বাঁকানো কার্নিশ এবং পিঢ়-শৈলীর রত্ন-শিখরগুলি কিছুটা ভারী ও গম্বুজাকৃতি।

পশ্চিমবাংলায় পূর্বোক্ত 'দেউল'- রীতির মন্দিরের আঞ্চলিক বিশেষরূপ ধরা পড়েছে। এগুলির 'শিখর' (গণ্ডী) অংশ অনেকগুলি সমান্তরাল 'পিঢ়ার' সমষ্টি। শ্রীরামপুরের (হুগলি) বিখ্যাত মাহেশের জগন্নাথের দেউল মন্দির এবং চৌধুরীপাড়ায় মহাপ্রভুপার্ষদ কাশীশ্বরপণ্ডিত-প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মন্দির এই ধরনের। মাহেশের মন্দিরটির নতুন করে নির্মাণ ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে হলেও 'চৌধুরীপাড়া'র মন্দির ষোল শতকের প্রথমার্ধে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের অব্যবহিত পরে বলে সংস্কারকালীন লিপিতে উল্লেখিত আছে। কুলীনগ্রামের (বর্ধমান) মদনগোপালের 'দেউল'-মন্দিরও ঐরূপ এবং ষোল শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত বলে মনে করা হয়। বক্রেশ্বরে (বীরভূম) 'বক্রনাথ শিবের মন্দিরও (১৭৬৩ খ্রি.) কতকটা ঐরূপ। তবে এতে ওড়িশী 'রেখ'-দেউলের ভাব স্পষ্ট। উনিশ শতকে 'দেউল' মন্দিরের অপর এক সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্ন রূপ পশ্চিমবাংলার কোন কোন অঞ্চলে লক্ষ্য করা গেছে। এর বৈশিষ্ট্য হল, দেউলের 'শিখর' কতকটা গম্বুজাকৃতি, খাঁজগুলি সমান্তরাল সরলরেখায় বিন্যস্ত। খাঁজগুলি শীর্ষদেশ থেকে নিচের দালানের ছাদের ওপর পর্যন্ত ঈষৎ বক্র রেখার দ্বারা বিভাজিত হওয়ায় স্থাপত্য-সৌন্দর্য স্পষ্ট হয়েছে। এর কয়েকটি নিদর্শন হল, সোনামুখীর (বাঁকুড়া) চন্দ্রপাড়ায় 'চন্দ্র'-পরিবারের শিবের দেউল, কালনার (বর্ধমান) প্রতাপেশ্বরের দেউল (১৮৪৯ খ্রি.), চেতুয়া-বাসুদেবপুরের (দাসপুর, মেদিনীপুর) 'বারোয়ারিতলা'য় শিবের দেউল, শ্রীবাটীর (কাটোয়া, বর্ধমান) দেউল, দেবীপুরের (বর্ধমান) লক্ষ্মীজনার্দনের দেউল (১৮৪০-১৮৪৪ খ্রি.) প্রভৃতি। শেষোক্তটিতে একটি সুদৃশ্য 'একচালা' মণ্ডপ যুক্ত হওয়ায় মন্দিরের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মেদিনীপুর, হুগলি. বাঁকুড়া ও বর্ধমান অঞ্চলে এই শৈলীর অপর একটি আঞ্চলিক রূপ বীরভূমের কোন কোন স্থানে লক্ষ্য করা গেছে। এটি কবিলাসপুরের 'ধর্মরাজের মন্দির' নামে পরিচিত (১৬৪৩ খ্রি.)। এই ধরনের মন্দিরের নিচে (বাঢ়) ও ওপরের (গণ্ডী) অংশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 'মন্দিরটির গঠনপ্রণালী একটু বিচিত্র ধরনের। মন্দিরের 'পা-ভাগ' অর্থাৎ ভিত্তিবেদি হইতে শিখরটি কৌণিকভাবে উদ্‌গত হইয়া 'মস্তকে' উপনীত, মধ্যের 'বাঢ়' ও 'গণ্ডী'র মধ্যে কোন ব্যবধান দেখা যায় না'। এই ধরনের অপর এক দেউল সিউড়ি থানার অন্তর্গত ভাণ্ডীরবনের বিভাণ্ডীশ্বর শিবের ইঁটের তৈরি 'রেখ'-দেউল (১৭৫৪ খ্রি.)। মন্দিরটি কবিলাসপুরের তুলনায় অধিক উচ্চ এবং দেওয়ালের রেখাগুলি সোজা ওপরের দিকে উঠে পরে ঈষৎ বক্রাকার হয়ে শীর্ষে মিলিত হয়েছে। অপর আর একটি এ-ধরনের মন্দির হল মহুলার মউলেশ্বর শিবের। কবিলাসপুর মন্দিরের সঙ্গে এর সাদৃশ্য স্পষ্ট। মন্দিরটি পাথরে তৈরি।

মুর্শিদাবাদের বড়নগরে পূর্বোক্ত 'চারবাংলা' নামে পরিচিত মন্দির (১৭৬০ খ্রি.) 'চালা'-শৈলীরই নামান্তর। বড়নগরে 'চালা'র অপর একটি উল্লেখ্য নিদর্শন ভুবনেশ্বরের মন্দির। মন্দিরটির ছাদ ঢালু আটটি চালের সমষ্টি এবং এর শীর্ষভাগে স্থাপিত রয়েছে ওল্টানো পদ্ম (ইনভারটেড লোটাস) এবং তার ওপরে সম্ভবত চারদিকে ধারযুক্ত ঘন্টা। দক্ষিণ বাংলার নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনায় পূর্বোক্ত শৈলীর প্রায় সব মন্দিরই লক্ষ্য করা গেছে। নদীয়া জেলার কিছু মন্দিরের

উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। 'শিবনিবাসে' (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বুড়ো-শিবের (রাজরাজেশ্বর) মন্দিরটি (১৭৫৪ খ্রি.) এক অভিনব স্থাপত্যের পরিচায়ক। সু-উচ্চ এই মন্দিরটির চাল 'চালা'-আকারের হলেও এটি কতকটা গির্জার চূড়ার ন্যায় এবং নিচের অংশেও গির্জার অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়। নবদ্বীপের মন্দিরগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নেই। উত্তর চব্বিশপরগনার দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর 'নবরত্ন' মন্দির (১৮৫৫ খ্রি.) বিশ্বখ্যাত। এর সঙ্গে শিবের বারটি আটচালাও উল্লেখ্য। এই 'নবরত্নটির সঙ্গে চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে তালপুকুরের (ব্যারাকপুর) অন্নপূর্ণার 'নবরত্নের'। ভবতারিণীর মন্দিরের প্রায় সমসময়িক এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাত্রী হলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রতিষ্ঠাত্রী রানি রাসমণিরই এক কন্যা। এখানে ছয়টি 'আটচালা' শিবমন্দিরও বর্তমান। হালিশহরের (উত্তর চব্বিশপরগনা) 'বারেন্দ্রগলি'তে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি কয়েকটি 'আটচালা' রীতির মন্দির টেরাকোটা-অলংকরণে সমৃদ্ধ।

উপরি উক্ত শৈলীর মন্দির ছাড়া পশ্চিম বাংলায় আরও যে চারটি শৈলী পরিচিত হয়ে উঠেছিল, সেগুলি হল, 'চাঁদনি', 'দালান' 'দোল' ও 'রাসমঞ্চ'। 'চাঁদনি' ও 'দালান' দুটিই সমতল ছাদযুক্ত সৌধ। কার্নিশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমরেখ, অল্পক্ষেত্রে বক্রাকৃতি। কিন্তু 'চাঁদনি'-রীতি 'দালান' অপেক্ষা অপ্রশস্ত ও ক্ষুদ্রাকৃতি। সম্মুখস্থ আবৃতমণ্ডপে দুই বা তিনের বেশি 'খিলান'-প্রবেশপথ থাকে না, পক্ষান্তরে, 'দালান' বৃহদাকৃতি। এই রীতির স্থাপত্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আঠার-উনিশ শতকে উদ্ভূত এবং এতে যুরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব স্পষ্ট। অনেক দালানে 'গথিক' স্তম্ভ লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, 'চাঁদনি' শৈলীটি বহু প্রাচীন। গুপ্তযুগে এ ধরনের মন্দির নির্মিত হত। বাংলায় এই রীতি নূতনভাবে উদ্ভূত হল, কিন্তু আকৃতির তেমন কোন পরিবর্তন হল না। এই রীতির অসংখ্য মন্দির গ্রাম-গ্রামান্তরে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন লিপিসাক্ষ্যে 'চাঁদনি ও 'দালান' যে দুটি পৃথক শৈলী তাও প্রমাণিত। বহু সুদৃশ্য দুর্গা ও কালীদালান তৈরি হয়েছিল আঠার-উনিশ শতকে যেগুলিকে 'পঙ্কের অলংকরণে' সজ্জিত করা হয়েছিল। 'রাসমঞ্চ'-শৈলীর স্থাপত্যকে 'রত্ন' শৈলীও বলা যায়। কেননা, গোলাকার বা বর্গক্ষেত্রাকার উচ্চ মঞ্চের ওপর অবস্থিত সবদিক উন্মুক্ত সৌধটির ছাদের চারপাশে যে চূড়াগুলি স্থাপন করা হত, সেগুলি বেশির ভাগই ছিল বেহারি রসুনের মতো। তাই দাসপুরের (মেদিনীপুর) সূত্রধরেরা একে 'বেহারিরসুন চূড়া' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই ধরনের চূড়ার সন্নিবেশ একরূপ প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়। সারা পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের চূড়া রাসমঞ্চে লক্ষ্য করা যায়। ম্যাককাচ্চন একে 'European boroque art' বলেছেন। রাসমঞ্চের চূড়াগুলিও সংখ্যায় পঁচিশটি পর্যন্ত নির্মিত হত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাসমঞ্চে 'রেখ'-দেউল বা 'পিঢ়া' রত্নও স্থাপিত হতে দেখা গেছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গির্জার কোণাকৃতি 'টাওয়ারের' মতো করেও এর রত্নগুলি তৈরি হত। দৃষ্টান্ত, মহিষাদলের (মেদিনীপুর) অধুনালুপ্ত রাসমঞ্চ (১৮২৭ খ্রি.)। 'দোলমঞ্চ' একটি উচ্চ পীঠিকা বা বেদির ওপর অবস্থিত চারদিক খোলা একটি দেউল বা পিঢ়াশৈলীর 'রত্ন', কোন কোন ক্ষেত্রে উন্মুক্ত 'চারচালা'ও স্থাপিত হত।

উক্ত প্রথাগত শৈলীর মন্দিরস্থাপত্যের অঞ্চলবিশেষে আরও কিছু পরিবর্তন হয় উনিশশতকে। কোন কোন মন্দিরের চূড়া গির্জার আকারে তৈরি হতে থাকে, যেমন মহানাদের (হুগলি) লালজীউ (১৮৫১ খ্রি.)। বর্তমান বাংলাদেশে আরও কিছু বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় যার দৃষ্টান্ত রাজশাহি ও অন্যান্য জেলায় আছে।

উপরি উক্ত আলোচনায় দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলসমূহে মন্দির সমাবেশের আধিক্যের কথা বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, ঐ মন্দিরগুলির বেশির ভাগই ইঁটের তৈরি এবং সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, পাথর এই অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য আর ইঁটের মন্দিরগুলি শতকরা দশ থেকে পনের ভাগ টেরাকোটা-অলংকরণে সজ্জিত। বহু প্রাচীন মন্দির কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গেলেও অবশিষ্ট যা বর্তমান, তাও অসংখ্য। মধ্যযুগের শেষভাগে মন্দির-নির্মাণেওর বন্যা নেমে এসেছিল। উনিশ শতকের মধ্যেই তা স্তিমিত হয়ে পড়ে, যদিও বিশ শতকে মন্দিরনির্মাণ-ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু তা খুবই ক্ষীণ এবং বিশেষত্ববর্জিত।

দক্ষিণ বাংলায় মন্দিরগুলির প্রচুর সমাবেশ ও অলংকরণ-বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে আমরা যদি উত্তর বাংলার দিকে তাকাই, তাহলে তা যে হতাশাব্যঞ্জক হবে, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার নিজস্ব 'চালা', 'চাঁদনি', 'দালান', 'রত্ন' ও 'দেউল' রীতির মন্দির উত্তর বাংলার কোন কোন জেলায় থাকলেও তা সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও অলংকরণের দিক থেকে খুবই সাধারণ মানের বলা যায়। যদিও বহু প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ উত্তরবাংলায় নানা স্থান থেকে উদ্ধার হওয়ায় অনুমান করা যেতে পারে এই দিকে পাল-সেন আমলের উচ্চ 'শিখর'-মন্দির বেশ কিছু তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তা আজ আর অবশিষ্ট নেই। পাল-সেন আমলের বলে অনুমিত মালদহ জেলার বামনগোলা থানার হরিহর শিবমন্দির। গৌড়ের 'দোচালা' মন্দিরের কথা আগেই বলা হয়েছে। জগদলা গ্রামের (বামনগোলা, মালদহ) শিবের 'একরত্ন' এবং মালদহ থানার আইহোতে শিবের দুটি 'একরত্ন' উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুরে পুরাতাত্ত্বিক অজস্র নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিভাস্কর্য উল্লেখযোগ্য। অপরূপ শিল্পের নিদর্শন ঐ মূর্তিগুলি এই অঞ্চলের নানা স্থানের প্রাচীন মন্দিরে যে অবস্থিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ ছাড়া সেসব মন্দিরের কোন অস্তিত্ব নেই। তর্পণদীঘির কাছাকাছি করদহে (তপন থানা) আঠার শতকে তৈরি একটি ইঁটের মন্দির বর্তমান। দেবগ্রামে শিবমন্দির, দোলমঞ্চ ও অন্নপূর্ণার মন্দির আছে। ইটাহার থানার অন্তর্গত পোর্ষায় 'পালযুগের' একটি দ্বিতল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বিন্দোলেও (রায়গঞ্জ) একটি প্রাচীন মন্দির আছে। অনুমান, এটি ষোল শতকে নির্মিত। সোনাপুরের একটি প্রাচীন মন্দিরে নবদুর্গা মূর্তি স্থাপিত। উত্তরবাংলার জলপাইগুড়ির সব চেয়ে প্রসিদ্ধ মন্দির জল্পেশ বা জল্পেশ্বরের (ময়নাগুড়ি থানা) মন্দিরটির স্থাপত্য-শৈলী তেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়, একটি দালানের ওপর গম্বুজশীর্ষ 'দেউলরত্ন' স্থাপিত, বর্তমান মন্দির বিশেষ পুরানো নয়। প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই মন্দির নতুন করে তৈরি করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় সব মন্দিরই ময়নাগুড়ি থানা ও সদর জলপাইগুড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ময়নাগুড়ি থানার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হল, পূর্বডহর, জটিলেশ্বর, বটেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, ধুমবাবা, সদরখৈ, পেটকাটি। সদর জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির বৈকুণ্ঠনাথ ও কালীমন্দির উল্লেখযোগ্য। কোচবিহার জেলার অধিকাংশ মন্দির কোচবিহার শহরের নানা স্থানে অবস্থিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মন্দির কোচবিহার রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহনের। মন্দিরটির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য প্রথাগত শৈলীর 'একরত্ন' না হলেও বহুদ্বারযুক্ত একটি বৃহদায়তন দালানের ওপর একটি গম্বুজাকৃতি 'রত্ন' স্থাপিত। জনশ্রুতি অনুসারে কোচবিহার রাজবংশের তৃতীয় রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে (১৫৫৪-১৫৮৮ খ্রি.) এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এ বিষয়ে মতানৈক্যও আছে। কোচবিহারের অপরাপর মন্দির হোল, অনাথনাথ শিবমন্দির ও সিদ্ধেশ্বরী

কালীমন্দির। অনাথনাথ শিব মন্দিরটি 'ইঁটের তৈরি ...২ ফুট উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠত ....কোচবিহারের অন্যান্য মন্দিরের মত এই মন্দিরটিও চারকোণা এবং বাঁকানো চালের উপর গম্বুজবিশিষ্ট। গম্বুজের উপর পদ্ম-আমলক-কলস ও ত্রিশূল ইত্যাদি পরপর স্থাপিত। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা কে, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। জনশ্রুতি অনুসারে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের (১৮৪৭-১৮৬৩ খ্রি.) রানি নিশিময়ী দেবী সম্ভবত মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া কোচবিহারের কামতেশ্বরী মন্দির ও মধুপুরধামের মন্দিরও পরিচিত। কোচবিহারের একটি প্রাচীন মন্দির বাণেশ্বর শিবের। মন্দিরটি চতুষ্কোণাকৃতি ও পশ্চিমমুখী। মন্দিরের উপরি ভাগে স্থাপিত আছে একটি গম্বুজ। অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজটির উপর যথারীতি পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল স্থাপিত আছে। পূর্বোক্ত সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির সম্পর্কে বলা হয়েছে, আটকোণাযুক্ত দেওয়ালের উপর গম্বুজ-শোভিত মন্দির কোচবিহার জেলার অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। এক্ষেত্রে মন্দিরটির প্রস্থচ্ছেদ আটকোণা অর্থাৎ প্রায় বৃত্তাকার হওয়ায় এর ওপর কোন গ্রীবা নির্মাণ করা হয়নি। খিলানযুক্ত দেওয়ালের ওপর 'লহরা' থেকে সৃষ্ট বৃত্তের উপরেই গম্বুজটি স্থাপন করা হয়েছে।' কোচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের আমলের শেষ দিকে (১৭৮৩-১৮৩৯) মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল অনুমান করা যায়। জেলার ধলুয়াবাড়ির সিদ্ধনাথ শিবমন্দির 'পঞ্চরত্ন'-রীতির হলেও কেন্দ্রীয় বৃহত্তম রত্নটি নেই। পোড়ামাটির ফলকযুক্ত এরকম সুদৃশ্য শিবমন্দির কোচবিহার জেলায় আর নেই। এমনকি, একমাত্র পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাড়া উত্তরবঙ্গের অন্য স্থানে এরূপ পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত মন্দির বিরল। মন্দিরটির আনুমানিক প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৯৯-১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়।

উত্তরবাংলার উপরি উক্ত মন্দিরগুলি ছাড়া আরও অনেক মন্দির আছে। কিন্তু দক্ষিণবাংলা, বিশেষ করে,গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের পূর্বোক্ত জেলাগুলিতে মধ্যযুগে মন্দির-শিল্পের যে অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছিল, তার সেরূপ প্রভাব উত্তরবাংলায় পড়েনি। মন্দিরের স্বল্পতা ও বৈচিত্র্যহীনতা এটাই প্রমাণ করে। পশ্চিমবাংলার মন্দিরস্থাপত্যের আলোচনায় তাই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাই মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। এ প্রসঙ্গে মহানগর কলকাতার দু একটি মন্দিরের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। কলকাতায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'আটচালা' মন্দিরই লক্ষ্য করা গেছে। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে মণ্ডলদের 'নবরত্ন' মন্দিরটি (উনিশ শতকের গোড়ার দিক) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 'রত্ন'-মন্দির অবশ্য আরও আছে। বৌবাজার এলাকায় মহেশ্বরের তিনটি 'নবরত্ন'-ও (১৭৮৫-কেনডারডাইন লেন) উল্লেখযোগ্য। বৈচিত্র্যপূর্ণ বড়ো কোন মন্দির কলকাতায় এখন আর নেই।

মধ্যযুগে বাংলার মন্দিরশিল্পে টেরাকোটা-অলংকরণের প্রাচুর্য আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের দেবদেবী- লীলা এবং সমকালীন সামাজিক ঘটনা ও ইতিহাসকে মন্দির -টেরাকোটাভাস্কর্যে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া পোড়ামাটির অদ্ভুত অদ্ভুত ফুলকারি নকশা, চুনের নানাবিধ অলংকরণ (স্টাকো) মন্দিরগাত্রে 'পঙ্কচুনে' রঙিন চিত্র ও নকশা অসংখ্য মন্দিরে স্থান পেয়েছিল। মন্দিরের সম্মুখভাগে ছোট ছোট ফলকে মূর্তি ও নকশা-সন্নিবেশ করা হত। অবশ্য, 'টেরাকোটা'অলংকৃত মন্দির যে সংখ্যায় কম, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে বেশিরভাগ মন্দিরের অবস্থা খুবই শোচনীয়। অবহেলা অনাদরে বাংলার এই প্রাচীন শিল্প ধ্বংসের পথে। কিছু কিছু প্রসিদ্ধ মন্দির সংরক্ষিত করা হলেও বেশির ভাগই

ভগ্নজীর্ণ অবস্থায় ধ্বংসের পথে। সুন্দর কারুকার্যযুক্ত বহু 'টেরাকোটা' অলংকরণযুক্ত মন্দিরগুলিও ধ্বংসপ্রায়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই মন্দির-টেরাকোটার বৈচিত্র্য ও প্রস্তরভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার ঃ *বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্তবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭১

চক্রবর্তী, দেবকুমার ঃ *বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্তবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার ও দাশ, সুধীররঞ্জন (সম্পাদিত) ঃ *নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্ত (পুরাতত্ত্ববিভাগ) ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার (সম্পাদিত) ঃ *হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্ত (পুরাতত্ত্ববিভাগ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৬

রায়, প্রণব ঃ *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ*, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতিবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা দেবলা মিত্র) ঃ *হুগলি জেলার পুরাকীর্তি*, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৩

দাস, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত) ঃ *উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি* (মালদহ, কমল বসাক; কোচবিহার, বিশ্বনাথ দাস) ১৯৮৫

Mccutchion, David : *The Temples of Bankura District*, Writers Workshop, Calcutta, 1972

Do :*The Temples of Birbhum*, The Viswa Bharati Quarterly, Vol 31, No.4

Mccutchion, David. *The Temples of Calcutta* Bengal Past and Present, January-June, 1968

Do : *Late Mediaeval Temples of Bengal, Origins and Classifications*, The Asiatic Society, 1972

Michell, George (ed.) : *Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983

রায়, প্রণব ঃ *(নদীয়ার) পুরাকীর্তি* - স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত *'নদীয়া'* গ্রন্থে দীর্ঘ প্রবন্ধ। নদীয়ার পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশকাল ২৬ জানুয়ারী, ১৯৭৩

১৭

বাংলাদেশের মন্দির

পশ্চিমবাংলার মতো পূর্ববাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশে একসময় অজস্র মন্দির নির্মিত হয়েছিল। বহু মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও এখনও অনেক মন্দির বর্তমান। এই মন্দিরগুলোর প্রায় সবই শেষ-মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় পনের শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে তৈরি হয়। এগুলোর বেশির ভাগই ইঁটের তৈরি এবং কিছু কিছু পোড়ামাটি মূর্তি-অলংকৃত। বাংলাদেশের মতো নদনদী খাল-নালায় ভরা অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে যেসব মন্দির তৈরি হয়েছিল, সেগুলির সঙ্গে পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলার মন্দিরগুলোর সাদৃশ্য থাকলেও কিছু কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। উভয় বাংলার মন্দিরশৈলী মূলত একচালা, রত্ন ও শিখর। মুখ্যত এই তিন শ্রেণীর শৈলীর উদ্ভব হয়েছিল শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে সারা বাংলায় আনুমানিক খ্রিস্টীয় পনের শতক থেকে। তখন মুসলমান আমল প্রাক-মুঘলযুগ। বাংলাদেশের নানা স্থানে অজস্র মসজিদ তৈরি হয়েছিল সেসময়। যেমন, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজযুক্ত মসজিদ খ্রিস্টীয় পনের শতকে তৈরি হয়। এই মসজিদের ছাদের মাঝখানের গম্বুজগুলি কতকটা দীর্ঘায়ত 'চারচালা' আকারের। এর নিচের অংশ বাঁকানো। খোড়ো 'চালা'ঘরের চালের নিচে বাঁশের বাখারির অনুকরণে এর গম্বুজগুলোর ভেতর ইঁটের ওপর এ ধরনের কাজ দেখা যায়।

চালা ঃ

বাংলাদেশে এইসময় (খ্রি. পনের শতক থেকে উনিশ শতক) নবপর্যায়ের মন্দিরচর্চায় 'চালা'শৈলীর অভাবনীয় উদ্ভব ও বিকাশ লক্ষ্য করার মতো। বিশেষ করে 'দোচালা' বা 'একবাংলা' শৈলীটি বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই শৈলীর বহু মন্দির বিভিন্ন জেলায় তৈরি হয়। পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলায় এই 'একবাংলা' বা 'দোচালা' এবং 'জোড়বাংলা' শৈলীর মন্দির খুব কমই দেখা যায়। মন্দির-গবেষক ডেভিড ম্যাককাচ্চনের মতে, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও পাবনা জেলায় কুড়িটিরও বেশি বাংলা 'দোচালা' রীতির মন্দির ছিল। অন্য জেলাতেও এই রীতির মন্দির দেখা গেছে। যেমন রংপুরের বর্ধনকুঠি এবং বরিশালের মাধবপাশার 'দোচালা' বা 'একবাংলা' মন্দির।[১] 'একচালা' বা একচালবিশিষ্ট মন্দিরও বাংলাদেশে দেখা যায়। তার সংখ্যাও খুব কম নয়।

সাধারণ বাঙালির বাসগৃহ খড়-বাঁশের তৈরি বাঁকানো কার্নিশযুক্ত 'একচালা', 'দোচালা' বা 'একবাংলা', 'চারচালা', 'আটচালা' বাংলাদেশের মন্দিরস্থাপত্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল প্রাক-মোঘলযুগে। সে সময় পাল-সেন আমলের উচ্চ 'শিখর'-রীতির মন্দিরনির্মাণধারা প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সময় এক বা বহু গম্বুজযুক্ত মসজিদ নির্মাণ চলিত হয়। কিন্তু মন্দির-নির্মাণে সাদামাটা 'চালা' তৈরি হতে থাকে। মুসলমান-শাসনের প্রারম্ভে বহু 'শিখর'-মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বাঙালি তার উপাস্য জনপ্রিয় দেবতাদের পূজা-আচ্চার জন্যে খড়ের চালা তৈরি করতে থাকে। ক্রমে তা পাকার 'চালা'মন্দিরে রূপান্তরিত হয়।[২] যা ছিল বাঙালির একান্তই নিজস্ব।

বাংলাদেশে 'চালা'রীতির মন্দিরের, বিশেষ করে 'একচালা' 'দোচালা' মন্দিরের বিপুল সমাবেশ লক্ষ্য করে এই কথাই মনে হয়। 'এসব মন্দিরের নির্মাণকৌশল, শিল্প ও অলংকরণে গ্রাম

বাংলার সাধারণ রূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। কুঁড়েঘরের অনুকরণে মন্দিব-নির্মাণের উদাহরণ বাংলাদেশেই বেশি। বাঁশ, দর্মা ইত্যাদি স্থানীয় উপকরণ দিয়ে গৃহনির্মাণরীতি, যা ইঁট ও পাথরের মন্দিরগাত্রে নকশা হিসেবে অনুকৃত হয়েছে, তা বাংলাদেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমবাংলায় মাটির মসৃণ দেওয়াল দিয়ে গৃহনির্মাণরীতির প্রাধান্য থাকায় বাংলারীতির মন্দির সেখানে অনেক কম।[৩]

দোচালা ঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 'দোচালা' মন্দির হল, পাবনা জেলার হাণ্ডিয়ালে 'টেরাকোটা'-সমৃদ্ধ একটি 'দোচালা', যা ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। খ্রিস্টীয় আঠার শতকে তৈরি ফরিদপুরের ভাঙার কাছাকাছি কইচল গ্রামের জীর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি 'দোচালা' মন্দির উচ্চমানের 'টেরাকোটা' অলংকরণে সমৃদ্ধ ছিল। মন্দিরটির প্রবেশপথের ফলকগুলি হল, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মহাভারতের সমাজজীবনের দৃশ্য। এছাড়া আছে, মিথুনদৃশ্য, জীবজন্তুর ছবি, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা। এই জেলারই খলিয়া ও রাজশাহি জেলার পুটিয়ায় একটি 'দোচালা' মন্দিরকে দু'টি 'চারচালা'র সঙ্গে যুক্ত করে একটি ত্রিমন্দির তৈরি করার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অন্য কোথাও এ ধরনের মন্দির আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ, এই 'দোচালা' বাংলাদেশে এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, 'দালান' বা 'চারচালা'র ছাদে 'রত্ন' বা চূড়ারূপেও এটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়! 'কুমিল্লার জগন্নাথ বা কিশোরগঞ্জের অধুনালুপ্ত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে এর উদাহরণ আছে।'[৪]

'দোচালা'র জনপ্রিয়তার আর এক উদাহরণ, গ্রাম্য পীরের পাকা দরগায় এর ব্যবহার। 'দিনাজপুরের সেনোরা, মির্জাপুর, হরগোবিন্দপুর ও খণ্ডখুই গ্রামে এবং রাজশাহিতে টেরাকোটা অলঙ্করণে সমৃদ্ধ দোচালা দরগা লক্ষ্য করা যায়।'[৫] পশ্চিমবাংলার গৌড়েও কোন কোন মসজিদের ছাদে এই 'দোচালা' স্থাপিত হতে দেখা যায়। গৌড়ের 'কদমরসুলে'র পার্শ্ববর্তী ফৎ খাঁনের সমাধিও (১৬৫৭ খ্রি.) 'দোচালা' শৈলীর। যদিও এটি রাজা গণেশের সময় (১৪১০-১৪১২ খ্রি.) হিন্দুমন্দির ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিদ আলি খান মনে করেন। বাংলাদেশের রংপুর জেলার পূর্বোক্ত বর্ধনকুঠিতে সর্বমঙ্গলার 'দোচালা' মন্দির নির্মাণ করান রাজা ভগবান ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে। এই স্থানে জীর্ণ যে ছয়টি দেবালয় আছে, তার মধ্যে তিনটি 'দোচালা' মন্দির বর্তমান। এর মধ্যে একটির সামনে আছে ছাদযুক্ত বারান্দা, যা সচরাচর দেখা যায় না। এই 'দোচালা'র একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, এর গর্ভগৃহের দুপাশে দুটি একদ্বারযুক্ত দুটি কক্ষ। এর ফলে গর্ভগৃহটি আয়তক্ষেত্রাকার না হয়ে প্রায় বর্গাকার হয়ে গেছে। আয়তন সাড়ে সাত ফুট এবং নয় ফুট।[৬] অন্য এ ধরনের মন্দিরেও এইরূপ কক্ষ ছিল বলে অনুমান করা যায়। এগুলি প্রায় সবই খ্রিস্টীয় সতের শতকের গোড়ার দিকে তৈরি হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। মাধবপাশার (বরিশাল) দুটি অবশিষ্ট মন্দির আরও প্রাচীন বলে অধ্যাপক ডেভিড ম্যাককাচ্চন মনে করেন। কারণ কাত্যায়নীর সংস্কারিত মন্দিরের সঙ্গে এই দুটি মন্দির যুক্ত ছিল। যশোহর-খুলনার ইতিহাস লেখক সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে, কাত্যায়নীর পূজা খ্রিস্টীয় পনের শতকে চলিত ছিল। মন্দিরগুলি সুদৃঢ় এবং বড় মন্দিরগুলিতে ত্রিখিলান প্রবেশদ্বার ছিল। দীর্ঘকাল এগুলি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। যশোহর জেলার নলডাঙায় গোপাল মন্দিরও কতকটা এরকম। পূর্বোক্ত হাণ্ডিয়ালের (পাবনা) 'শেঠের বাংলা' ও রাজশাহির গোবিন্দ

মন্দির দুটি 'একবাংলা' বা 'দোচালা'রীতির সুন্দর নিদর্শন। এদের চালগুলো বেশ ঢালু ও ছাঁচা দেওয়াল থেকে কিছুটা নিচে প্রসারিত, যার সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামবাংলার খোড়ো দোচালা ঘরের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। অনেকক্ষেত্রে 'চারচালা'য় চালের বাঁকানো কার্নিশ আজকাল আর তেমন লক্ষ্য করা না গেলেও 'দোচালা'য় এইভাবটি এখনও রক্ষা করা হয়।[৭]

জোড়বাংলা ঃ

'দোচালা'র পরে 'বাংলা'-শৈলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'জোড়বাংলা'। দুটি 'দোচালা'কে সামনা-সামনি (সামনে-পেছনে) জুড়ে দিলে হবে 'জোড়বাংলা'। এই শৈলীটিও একসময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশে। পশ্চিমবাংলায় যেখানে 'জোড়বাংলা' মন্দিরগুলো মাত্র হাতে গোনা যায়, সেখানে বাংলাদেশে 'জোড়বাংলা' মন্দিরের সংখ্যা অনেক বেশি। ম্যাককাচ্চনের মতে, নাটোরের ছত্রিশ মাইল উত্তর-পুবে ভবানীপুর গ্রামের যে মন্দিরটি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, সেটিই ছিল বাংলার সকলের থেকে পুরানো 'জোড়বাংলা' মন্দির।[৮] মনোমোহন চক্রবর্তীর মতে, মন্দিরটি খ্রিস্টীয় ষোল শতকের গোড়ায় এবং সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে, সেটি ওই শতকের শেষপাদে নির্মিত হয়।[৯] পশ্চিমবাংলায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে অনুমিত হুগলির গুপ্তিপাড়ায় মহাপ্রভুর 'জোড়বাংলা'। মন্দিরটি দেখলেই বোঝা যায়, এই শৈলীটি প্রচলিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এটি তৈরি হয়। 'টেরাকোটা' অলংকরণের মধ্যে শুধুমাত্র ফুল ও নকশা-কাজ বর্তমান। কিন্তু কোন মূর্তি নেই। এই মন্দিরটি খুবই পুরানো। আকবরের সময়ে জনৈক বিশ্বেশ্বর রায় এটি প্রতিষ্ঠা করেন বলে ১৯৬১র 'হুগলি ডিস্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক' গ্রন্থে বলা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় এটি ছাড়া সতের শতকে তৈরি কয়েকটি 'জোড়বাংলা' খুবই উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হ'ল বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫ খ্রি.)। নদীয়া জেলার তেহট্ট গ্রামের 'জোড়বাংলা' (১৬৭৮ খ্রি.) এবং উলা-বীরনগরের 'জোড়বাংলা' (১৬৯৪ খ্রি.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুটির চেয়ে আরও একটি পুরানো 'জোড়বাংলা' মন্দির ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের শহর চন্দ্রকোণায়। দুঃখেব বিষয়, সেটি কয়েকবছর আগে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। 'জোড়বাংলা'শৈলীটি 'একচালা', 'দোচালা'র থেকে কিছু বেশি তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবাংলায়।

আবার, 'দোচালা'শৈলীর মন্দির বাংলাদেশের চেয়ে পশ্চিমবাংলায় কম থাকলেও উৎকৃষ্টমানের কয়েকটি মন্দির আছে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগর ও তার আশপাশে। ম্যাককাচ্চনের মতে, বড়নগরের 'চারবাংলা' মন্দিরগুলোর সঙ্গে পুঠিয়ার (রাজশাহি) 'একবাংলা' মন্দিরের সাদৃশ্য আছে। মন্দিরগুলোর সবই নাটোরের রানি ভবানীর প্রতিষ্ঠিত। সে কারণে বাংলাদেশের জনপ্রিয় এই শৈলীটি বড়নগরে রানির উদ্যোগে বেশি সংখ্যায় নির্মিত হয় এবং উৎকর্ষবৃদ্ধিও হয়।

বাংলাদেশে 'জোড়বাংলা' মন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল, পাবনা শহরের গোপীনাথ বা রাধাগোবিন্দ মন্দির। এটি পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। যশোহর জেলার লোহাগড়ায় টেরাকোটা অলংকৃত কয়েকটি 'জোড়বাংলা' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি আঠার শতকে নির্মিত। এর মধ্যে তিনটিতে প্রায় একই রকম অলংকরণ আছে। প্রথমে খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার, তাব ওপর উল্লম্ফনরত সিংহ। সামনে নিচের অংশে একমাত্র প্রস্থে কৃষ্ণলীলা ও সামাজিক দৃশ্য, দুপাশের খোপে দশাবতার প্রভৃতি দেবমূর্তি সন্নিবেশিত। সব 'জোড়বাংলা'রই ত্রিখিলান প্রবেশপথযুক্ত ঢাকা বারান্দা। লোহাগড়ার রায়গ্রামের 'জোড়বাংলা'য় প্রচুর টেরাকোটামূর্তি আছে। যেমন,

কৃষ্ণলীলা, মল্লযোদ্ধা ও বাজিকর, তরবারি নিয়ে যুদ্ধ ফরসিবিলাসী রাজা বা জমিদারের ঝাম্পানে গমন— সঙ্গে পতাকাবাহক, বাদক ও সৈন্যসামন্ত, শিকারদৃশ্য-হরিণের পশ্চাদ্ধাবন, শিকার করা হরিণকে একটি দণ্ডে ঝুলন্ত অবস্থায় আনয়ন। এই মন্দিরের থাম ও সম্মুখভাগও টেরাকোটা অলংকৃত। মন্দিরগুলি সবই পরিত্যক্ত ভগ্ন, জঙ্গলাবৃত ও ধ্বংসপ্রায়। কাছাকাছি একটি ভগ্ন 'দালান' ও 'চারচালা' শিবমন্দির আছে। বাংলা ১১৩১ সাল বা ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়।

লোহাগড়ার উত্তরপুবে প্রায় পনের-ষোল কিলোমিটার দূরে সালনগরে চাকলানবিশ পরিবারের কয়েকটি আকর্ষণীয় মন্দির আছে। তার মধ্যে গোবিন্দের 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। এখানেও পূর্বোক্ত রায়গ্রামের মতো কৃষ্ণলীলা এবং পালকি বা ঝাম্পানে রাজা বা জমিদারের গমনদৃশ্য প্রভৃতি টেরাকোটামূর্তি লক্ষ্য করা যায়। থামের নিচু অংশে দ্রুতগামী নৌকার সারি— একটি নৌকার চাঁদোয়ার নিচে বিশ্রামরত রাজা এবং এসবের ওপরের প্যানেলে রাজহংসের সারি দর্শনীয়। লোহাগড় থানার মন্দিরগুলোর মধ্যে কোটাকল গ্রামের একমাত্র তারিখযুক্ত 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি ১৬৫৪ শকাব্দ বা ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়। এর সঙ্গে একটি 'পঞ্চরত্ন' দোলমঞ্চও আছে।

যশোহর জেলায় যেসব স্থানে 'জোড়বাংলা' মন্দির আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সত্রজিৎপুরের কৃষ্ণের মন্দির, চাঁচড়ার শ্যামরায়, মুহম্মদপুরের কৃষ্ণ এবং কানাইনগরের বলরাম। সতীশচন্দ্র মিত্র উল্লেখিত ধুলজুড়ির ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণমন্দিরটি সম্ভবত 'জোড়বাংলা' শৈলীর ছিল। কিন্তু সেটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মিত্রের উল্লেখিত খুলনা জেলার মূলঘরের ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দের 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি এখন বিধ্বস্ত। এই গ্রামে ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত গোপীনাথ মন্দিরও ওই রীতির, যদিও তা খুবই জীর্ণ ও ভগ্ন। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে জানা যায়।

ফরিদপুর জেলার জামালপুর স্টেশন থেকে দুমাইল দূরে নলিয়ায় চারটি মন্দির ও একটি দোলমঞ্চের মধ্যে দু'টি 'জোড়বাংলা' শৈলীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সব মন্দিরই নাটোরের রানি ভবানীর পৃষ্ঠপোষকতায় জনৈক কৃষ্ণরাম চক্রবর্তী নির্মাণ করান। সেগুলি সবই পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। অধ্যাপক ডেভিড ম্যাককাচ্চনের মতে, পাবনা, ফরিদপুর, যশোহর ও খুলনা ছাড়া বাংলাদেশের অন্য আর কোথাও 'জোড়বাংলা' মন্দির দেখা যায় না।[১০]

চারচালা ঃ

বর্গক্ষেত্রাকার বা চৌকো কক্ষের ওপর চারপাশে ঢালু বাঁকানো কার্নিশযুক্ত চারটি চাল নিয়ে গঠিত 'চারচালা' শৈলীর মন্দির বাংলাদেশে একসময় বেশ কিছু তৈরি হয়েছিল। তবে এখানে চারচালার প্রতিটি চাল খাড়া ত্রিভুজাকৃতি হয়ে ওপরে 'মটকা' বা শীর্ষবিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে দেখা যায়। পশ্চিমবাংলাতেও এ ধরনের খাড়া ত্রিভুজাকৃতি চালযুক্ত 'চারচালা' মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় দেখা যায়। নদীয়া বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় এখানে এই ধরনের শৈলীর অনুপ্রবেশ ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে বেশির ভাগ 'চারচালা'ই এরকম। যেমন, মাটিয়ারির জলেশ্বর ও শান্তিপুরের জলেশ্বর শিবের চারচালা, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'শিবনিবাসে'র রাজরাজেশ্বরের চারচালা, দিগনগরের রাঘবেশ্বরের চারচালাও (১৬৬৯ খ্রি.) কতকটা এই ধরনের। তবে নদীয়া জেলায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাঁকানো কার্নিশযুক্ত ঢালু চালের 'চারচালা'ও বিরল নয়। যেমন, চাকদহ-পালপাড়ার বৃহদাকার 'চারচালা'। এর সঙ্গে পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষ্য করা

যায়। মুর্শিদাবাদের গোকর্ণের (১৫৮০ খ্রি.) নৃসিংহের 'চারচালা'র চালগুলি কিছুটা খাড়া হলেও ঢালু ও বক্রভাব বেশি। পশ্চিমবাংলায়, বিশেষ করে, মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম), হুগলি, হাওড়া ও বর্ধমানের বাঁকানো কার্নিশযুক্ত ঢালু চালের সহজ সুন্দর চারচালা ও আটচালা মন্দিরগুলি খুবই দর্শনীয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল-কোন্নগরের কামারদের সিংহবাহিনীর চারচালা ও তৎসংলগ্ন চারচালা 'জগমোহন' (audience hall) শুধুমাত্র প্রাচীনত্বের দিক থেকে নয় (প্রতিষ্ঠাকাল ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ), চালগুলির সহজ সুন্দর ঢালু ও বক্রভাব প্রাচীন এই ধরনের খড়ের চালা কুটিরগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। গ্রামবাংলায় একচালা, দোচালার মতো চারচালা কুটিরও অনেক তৈরি হত প্রাচীনকাল থেকে। এখনও এই ধরনের বহু কুটির দেখা যায়।

বাংলাদেশেও চারচালা-শৈলীর বহু মন্দির তৈরি হয়েছিল এককালে। পাবনা জেলার তারাসে এইরকম পুরানো একটি মন্দির হল ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি কপিলেশ্বর শিবমন্দির। মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা অলংকরণ লক্ষ্য করার মতো। খিলান-প্রবেশপথের ওপরে আছে উল্লম্ফনরত সিংহ, দুপাশে দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, লতাপাতার নকশা প্রভৃতি। এই শৈলীর অনেকগুলি মন্দির আছে এই পাবনা জেলারই হাটিকুমরুলে, রাজশাহি জেলার পুঠিয়ায়, যশোহরের সত্রজিৎপুর, নন্দুয়ালি, সালনগর ও রায়গ্রামে এবং ফরিদপুর জেলার নলিয়ায়। পুঠিয়ায় গোবিন্দজীউর যে একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির আছে, তার 'রত্ন'গুলো এই পুঠিয়ারই অপর এক গোবিন্দজীউর অবিকল চারচালার মতো।[১১] ফরিদপুর জেলার উজানীতে চারচালা মন্দিরের আর একটি মন্দির আছে খ্রিস্টীয় সতের শতকে মুকুন্দরাম রায়ের স্ত্রীর পোষ্যপুত্র এই মন্দির নির্মাণ করান। মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা-ফলকে পাখি, সিংহ, লতা, পদ্মফুল, পুষ্পগুচ্ছ, নবমাতৃকা, রাক্ষস প্রভৃতি মূর্তি দেখা যায়। যশোহর জেলার মাগুরার রায়নগরের চারচালা মন্দির খ্রিস্টীয় ষোল শতকে নির্মিত বলে জানা যায়। এটি কৃষ্ণমন্দির এবং সেকারণে কৃষ্ণলীলার অনেক টেরাকোটাফলক এই মন্দিরে সন্নিবেশিত। বরিশালের মাধবপাশা ও ফরিদপুরের বাটিকামারীতে উনিশ শতকের প্রায় গির্জার চূড়ার মতো যে খাড়া চালের মন্দিরগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যে গির্জার যে অনেকটা প্রভাব পড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।[১২]

বাংলাদেশে কিছু কিছু বিশালাকৃতি চারচালা তৈরি হয়েছিল। এগুলোর উচ্চতা ত্রিশ-চল্লিশ ফুটের বেশি। এ ধরনের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পূর্বোক্ত উজানীর মন্দির, নানিকশিরের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এই ধরনের আর একটি ছোট আকারের মন্দির ভূষণা-গোপালপুরেব। ভেঙে গেলেও এটিও চারচালা ছিল বলে অনুমান। কারণ, বাংলাদেশে আটচালা মন্দিরের সামনে যেমন ঢাকা বারান্দা থাকে, এখানে তা নেই। তাই ম্যাককাচ্চন এটিকে চারচালা বলেই মনে করেন।[১৩] উজানী ও এখানকার মন্দিরের দেওয়াল বেশ মোটা।

আটচালা ঃ

চারচালার ওপর আরও একটি ছোট চারচালা তুলে দিয়ে আটচালা শৈলীর মন্দিরও বাংলাদেশে কিছু কিছু তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে খুলনা জেলার ছাইঘড়িয়ার শিবমন্দির (খ্রি. ১৮১৮), ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দির শিবমন্দির, যশোহর জেলার অভয়নগরের শিবমন্দিব, যশোরের শিবমন্দির (খ্রি. ১৭৮২), মুবালীর শিবমন্দির (খ্রি. ১৭৮২), ঝিনাইদহের রামেশ্বরীর মন্দির (খ্রি. ১৭৯৮), তেলকুপীর গঙ্গানাথ শিবমন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবাংলায় এই আটচালা শৈলীর মন্দির অসংখ্য লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন জেলায়। আকার ও আয়তনে এই

'আটচালা'র বৈচিত্র্য পশ্চিমবাংলায় বেশি। আটচালার ওপর আরও একটি ক্ষুদ্রাকৃতি চাল যুক্ত করে 'বারচালা' শৈলীও পশ্চিমবাংলায় দেখা যায়।

রত্ন ঃ

পশ্চিমবাংলার মতো বাংলাদেশেও 'রত্ন'-মন্দির অনেক তৈরি হয় শেষ-মধ্যযুগে। তবে 'নবরত্ন' ও 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরের সংখ্যাই বেশি। কোন কোন 'রত্ন'মন্দির বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দিররূপে পরিগণিত। যেমন যশোহর জেলার নলডাঙার মহাদেবের 'পঞ্চরত্ন' (আ. খ্রি. সতের শতকের শেষ) যদিও বহুকাল ধরে এর একটিমাত্র 'রত্ন' অবশিষ্ট। অপরটি হল পূর্ব দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীউর 'নবরত্ন'। এটিরও সব রত্নই ধ্বংসপ্রাপ্ত। জেমস ফার্গুসনের 'হিস্টরি অভ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার' গ্রন্থে ৩৫৪ নং প্লেটে ওই মন্দিরের সব কটি 'রত্ন' দেখানো হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় সর্বোৎকৃষ্ট রত্নমন্দিরটি হ'ল বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন'। এর প্রায় প্রতিটি অংশে উচ্চমানের 'টেরাকোটা'-ফলক সন্নিবেশিত আছে। এছাড়া পশ্চিমবাংলায় আরও কয়েকটি উচ্চমানের 'রত্ন'মন্দির হ'ল, বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) মদনমোহনের 'একরত্ন' (১৬৯৪ খ্রি.), বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (১৬৭৯ খ্রি.) ও গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (আ. খ্রি. সতের শতকের শেষ) এবং কালনায় (বর্ধমান) বর্ধমানরাজ প্রতিষ্ঠিত লালজীউ ও কৃষ্ণচন্দ্রের পঁচিশচূড়া মন্দির। দুটিই খ্রিস্টীয় আঠার শতকের মাঝামাঝিকালে প্রতিষ্ঠিত। অজস্র সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা-ফলক মন্দিরগুলিতে দেখা যায়।

বাংলাদেশেও বেশ কিছু 'রত্ন'মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে পূর্বোক্ত দুটি ছাড়া পাবনা জেলার হাটিকুমরুলের মন্দির উল্লেখযোগ্য। এর কোন চূড়া এখন আর না থাকলেও এটি পূর্বোক্ত কান্তনগরের মন্দিরের মতো ছিল কারও কারও অনুমান।[১৪] এটি ছাপ্পান্ন বর্গফুট এবং চূড়া ছাড়াই উচ্চতা এখনও সাড়ে তেচল্লিশ ফুট। কান্তনগরের মন্দিরের চেয়েও এই মন্দির আয়তনে বড়। তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়ি এবং নিচের দালানের প্রতিদিকে চারটি থামের ওপর পাঁচটি করে খিলানপথ। ভেতরে গর্ভগৃহকে বেষ্টন করে আছে তিনদিকের ঢাকা বারান্দা। ওপরের পর পর দুটি তলের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণপথ বর্তমান। এই মন্দিরেরও কান্তনগরের মতো অলংকরণ ছিল, তবে কিছুটা কম। মন্দিরের দক্ষিণ ও পুবদিকের অংশ ভগ্ন। এদিকে প্রচুর টেরাকোটা-ফলক ছিল বলে অনুমান। জানা যায়, মন্দিরটি নবাব মুরশিদকুলি খাঁয়ের সময় নায়েব-দেওয়ান রামনাথ ভাদুড়ির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই কান্তনগর মন্দিরের মতো এটিও খ্রিস্টীয় আঠার শতকের বলে অনুমান। পাবনা জেলার অপর 'নবরত্ন' মন্দির ছিল শাজাদপুরের কাছে পোতাজিয়া গ্রামে। মন্দিরটি বিধ্বস্ত হলেও ডেভিড ম্যাককাচ্চনের মতে, এটি উপরি উক্ত হাটিকামরুলের মন্দির থেকে আলাদা ছিল। কেউ কেউ মনে করেন, জনৈক গোবিন্দরাম রায় ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা থানার গোপালপুরে একসময় চারটি 'রত্ন'মন্দির ছিল বলে জানা যায়। একটি ভগ্নপ্রায় বিধ্বস্ত মন্দির ছাড়া অবশিষ্টগুলি লুপ্ত। এই প্রায়-বিধ্বস্ত মন্দিরটির দেওয়ালে কিছু কিছু 'টেরাকোটা'-অলংকরণ লক্ষ্য করা গেছে, যেগুলি খুবই উচ্চমানের। কারও কারও মতে, রাজা প্রতাপাদিত্য ওড়িশা থেকে যে গোবিন্দমূর্তি আনেন, তার উদ্দেশ্যে রাজা বসন্ত রায় এটি নির্মাণ করান।[১৫] খুলনা জেলার সাতক্ষীরা থানার সোনাবাড়িয়ায় শ্যামসুন্দরের বিশাল 'নবরত্ন' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর ত্রিতলের 'রত্ন'গুলি 'চারচালা', কিন্তু দ্বিতলের 'রত্ন'

সমান্তরাল খাঁজকাটা 'পিঢ়া'র মতো, যা সচরাচর মন্দিরের 'রত্নে' লক্ষ্য করা যায়, মন্দিরটি ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এই মন্দিরের টেরাকোটা অলংকরণ দর্শনীয়। মন্দিরটির ওপর ও নিচের তলে গর্ভগৃহকে বেষ্টন করে রয়েছে প্রদক্ষিণপথ। এই থানারই গোপালপুরের গোবিন্দমন্দির ও দামরেলির 'নবরত্ন' মন্দির এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ফরিদপুর জেলার ভাঙা থানার নানিকশিরের মন্দির 'নবরত্ন' মন্দির হিসেবে পরিচিত। মন্দিরগাত্রের মূর্তি অলংকরণে আছে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য, তাতে বানরসেনা যুদ্ধরত। এছাড়া আছে কৃষ্ণলীলাদৃশ্য ও দশাবতারমূর্তি। খুলনা জেলার সাতক্ষীরায় অন্নপূর্ণার 'নবরত্ন' মন্দিরের (খ্রি. ১৯ শতক) কোণের 'রত্ন'গুলি ক্ষীণাকৃতি। কিন্তু ত্রিতলের কেন্দ্রীয় রত্নটি বেশ ভারী। প্রতিটি রত্নেরই শিখর সমান্তরাল খাঁজকাটা। পূর্বোক্ত নলডাঙায় সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরটিও পঞ্চরত্ন। আনুমানিক খ্রিস্টীয় সতের শতকে নির্মিত এই মন্দিরের দেওয়ালে বেশ কিছু টেরাকোটা বর্তমান। যেমন, লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য, অসুরদের সঙ্গে কালী ও সিংহবাহিনীর যুদ্ধদৃশ্য অলংকরণে প্রধান স্থান লাভ করেছে। এটি জনৈক ইন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে জানা যায়।

বিশালাকার 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরের অপর এক নিদর্শন আছে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার গোপালগঞ্জে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বেঙ্গল সার্কেল রিপোর্টে' বলা হয়েছে, রাজা রামনাথ রায় ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের সব রত্নই 'রেখ' দেউল আকৃতির। এরই নিকটবর্তী ওই একই সালে তৈরি (১৭৪৫ খ্রি.) একটি পঁচিশচূড়া রাসমঞ্চ, যা পশ্চিমবাংলায় কয়েকটি দেখা যায়। যেমন, পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার নিজনাড়াজোলে নাড়াজোল রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি পঁচিশচূড়া রাসমঞ্চ খুবই দর্শনীয়। যশোহর জেলার সালনগর ও কোটাকোলে 'পঞ্চরত্ন' দোলমঞ্চ আছে। ওই একই ধরনের মঞ্চ দেখা যায়, ফরিদপুর জেলার ধোপাডাঙা, হাটঘাটা, বাটিকামারি ও চাওলায়। এই দোলমঞ্চগুলি বেশ বড় ও উঁচু (প্রায় ৩০ ফুট) ও আয়তনে কুড়ি থেকে তিরিশ ফুট। ভূষণার রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুরের কাছে নদীর অপর পারে কানাইনগরের বিখ্যাত হরেকৃষ্ণ মন্দিরটি 'পঞ্চরত্ন'শৈলীর ছিল। ঘন জঙ্গলাবৃত ওই মন্দিরের রত্নটি ছিল 'চারচালা'। জানা যায়, মন্দিরটির সামনের দিকে ছিল কৃষ্ণলীলার দৃশ্য ও উল্লম্ফনরত সিংহ। কিন্তু সেসব বহুকাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত। বহুচূড় মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মন্দির ছিল, ঢাকা জেলার রাজনগরের 'একবিংশতিরত্ন' ও ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের লক্ষ্মীজনার্দনের 'একবিংশতিরত্ন' মন্দির। কুমিল্লার জগন্নাথের আটকোণা 'সপ্তদশরত্ন' মন্দিরটিও একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

'আটকোণা' বা অষ্টকোণ ঃ

বাংলাদেশে অষ্টকোণ বা আটকোণা রীতির মন্দির বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সেকালে। একে আটকোণা 'দেউল'-রীতিই বলা যেতে পারে। পশ্চিমবাংলায় এই রীতির কয়েকটি মন্দির থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি একচুড়ো মন্দিরের 'রত্ন'-রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া ও গুপ্তিপাড়ায় যথাক্রমে অনন্তবাসুদেব (১৬৭৯ খ্রি.) ও রামচন্দ্র মন্দির (আ. খ্রি. ১৭ শতকের শেষদিক), পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের বলিহারপুরে রায়েদের ব্রজরাজকিশোরের 'একরত্ন' (খ্রি. ১৭৭২) ইত্যাদি। নদীয়া জেলার 'শিবনিবাসে' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরের (১৭৫৪ খ্রি.) একটি বিশাল আটকোণা দেউল খুবই উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে তারিখযুক্ত এ ধরনের একটি দেউল ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত

যশোহর জেলার মহম্মদপুরের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। মন্দিরটি দুটি তলযুক্ত, উচ্চতা প্রায় ২৩ ফুট। জানা যায়, বিগ্রহকে রাতে এই দ্বিতলে রাখা হত। অধ্যাপক ডেভিড ম্যাককাচ্চন যখন মন্দিরটি দেখেন, তখন সেটি বৃক্ষসমাচ্ছন্ন ছিল। বর্তমানে মন্দিরের কি অবস্থা বলা যায় না। 'অষ্টকোণ' মন্দিরের অন্যান্য নিদর্শন আছে, ঢাকা জেলার মুনসিগঞ্জে, দিনাজপুর জেলার চাপড়ায় (দোলমঞ্চ) এবং দিনাজপুরের মহিষমর্দিনী মন্দিরে (১৭৪৬ খ্রি.)। পাবনা জেলার উল্লাপাড়ায় শিব ও তাড়াশের শিব, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের 'মঠ' (বাংলাদেশে 'দেউল'কে মঠও বলা হয়) ও বালিয়াকান্দির মন্দিরও এই রীতির। বরিশালের গৌরনদীর 'মঠ'ও এই রীতির। ময়মনসিংহ জেলার কালীপুর, যশোরের ঝিনাইদহের গণেশ (১৬৮০ খ্রি.) ও শিব (১৭৪৫ খ্রি.) এবং তারানাথ শিব, রঙপুর জেলার ডিমলার কালী, রাজশাহি জেলার নওগাঁ এবং নাটোরের শিব (১৮২৩ খ্রি.) এবং পাবার শিব এই অষ্টকোণ-রীতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।[১৬]

উপরি উল্লিখিত নিদর্শনগুলি থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে অষ্টকোণ-রীতির মন্দির বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই রীতির বড় আকারের মন্দির খ্রি. ১৯ শতকেও যে জনপ্রিয় ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ময়মনসিংহ জেলার কাশীপুর রাজবাড়ির দুটি দেউলের ভগ্নাবশেষ থেকে।[১৭] রঙপুরের কাছে ডিমলার রাজার প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত কালীমন্দিরও ওইরূপ, যদিও পরবর্তীকালের, আনুমানিক বিগত বিশ শতকে নির্মিত।

দেউল ঃ

বাংলাদেশে 'দেউল'-শৈলীর রূপটির সঙ্গে পশ্চিমবাংলার দেউলগুলির স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। অধ্যাপক ডেভিড ম্যাককাচ্চন বাংলাদেশের যে কয়েকটি দেউল আলোকচিত্র সহযোগে উল্লেখ করেছেন,[১৮] তা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের দেউলগুলি পশ্চিমবাংলার মতো প্রথাগত শৈলীতে তৈরি হয়নি। অর্থাৎ সুপ্রাচীন উত্তর ভারতীয় 'নাগর'শৈলী থেকে আগত এক ধরনের দেউল যেমন আমরা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানের কোন কোন স্থানে লক্ষ্য করি অথবা ওড়িশী শৈলীর যে অনেক দেউল আমরা বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় পাই এবং তার সরলীকৃত সুঠাম ও সুদৃশ্য দেউলগুলি যেমন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাংলাদেশের ওই দেউলগুলিতে তার আদৌ পরিচয় পাওয়া যায় না। ওই দেউলগুলি প্রথাগত প্রচলিত কোন্ 'দেউল'শৈলীতে পড়ে, তা নির্ণয় করা দুরূহ। এগুলিতে (দু-একটি ছাড়া) গির্জা ও মসজিদ শৈলীর ছাপ অনেকটা পড়েছে। হুগলি জেলার মহানাদের লালজীউর পরিত্যক্ত মন্দিরের সঙ্গে (যেটির শিখর অনেকটা গির্জার চূড়ার মতো। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫১ খ্রি.) ফরিদপুরের খালিয়ার কালীচরণ রায়ের 'মঠে'র (খ্রি. ১৯ শতক) কতকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও শেষোক্তটির চূড়া অনেকটা ছত্রাকৃতি, তবে খাড়া। বরিশালের গোবিন্দগঞ্জের 'মঠ'টির শিখরের বাঁকানো কার্নিশগুলি ধাপে ধাপে ক্রমশ খাড়া হয়ে ওপরে শীর্ষে মিলিত হয়েছে। ওই জেলারই সুতালরির মঠটিরও ওই ধরনের শিখর দেখা যায়। নিচের অংশটি আটকোণা।

'দেউল' নামে পরিচিত বাংলাদেশের আর যে কয়েকটি দেউল উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে খুলনা জেলার কোদলার অযোধ্যা 'মঠ' খ্রিস্টীয় সতের শতকে তৈরি হয়েছিল মনে করা যায়। মঠটির নিচের ও ওপরের অংশের আয়তন ও পরিসর প্রায় সমান এবং দেওয়াল খাঁজকাটা অবস্থায় ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। এটিকে ঠিক প্রচলিত 'রেখ'-শৈলীর বলা যায় না, যদিও

কেউ কেউ এটিকে 'রেখ'দেউল বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯] কিন্তু একে কোনমতেই 'রেখ' দেউল বলা যায় না। এর সঙ্গে ফরিদপুরের মথুরাপুর দেউলের সাদৃশ্য আছে। বর্ধমানের বৈদ্যপুরের দেউল 'জগমোহন'যুক্ত কৃষ্ণমন্দিরও (১৫৯৮ খ্রি.) এই শৈলীর, বাংলাদেশের ওই মন্দিরগুলির এ ধরনের কোন 'জগমোহন' নেই। পাবনা জেলার হাণ্ডিয়ালের জগন্নাথ মন্দিরের 'শিখর' দেউলাকৃতি। নিচের সমতল কার্নিশযুক্ত দালানের ওপর শিখর 'রথ'-বিন্যাসযুক্ত। দালানটির দেওয়াল খাঁজকাটা। এটিকে খ্রিস্টীয় ষোল শতকের মন্দির বলে কেউ কেউ মনে করেন। ঢাকার জয়দেবপুরে কালীনারায়ণ রায়ের শ্মশানমন্দিরটি একটু অদ্ভুত আকারের। কতকটা গির্জা ও মসজিদশৈলীর মিশ্রণে নির্মিত। কেন্দ্রীয় চূড়াটি গির্জার টাওয়ারের মতো ওপরে উঠে গেলেও কতগুলি ঘট বা মাটির হাঁড়ির মতো বস্তু পর পর ওপরে বসানো হয়েছে। সর্বোচ্চ শিখরটি গির্জার চূড়ার মতো। কোণের চূড়াগুলিও ওই একই আকৃতির এবং ক্ষুদ্রাকার। নিচের দালানের কয়েকটি খিলান-প্রবেশপথ আছে। বাংলাদেশে এটি একটি নতুন স্থাপত্য। ঢাকার সোনারঙে কালী (১৮৩৮-৪৩ খ্রি.) এবং শিবের (১৮৭৭-৮২ খ্রি.) যে দুটি মন্দির লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি আটকোণা 'শিখর'যুক্ত। শিখরের চাল ধাপে ধাপে ওপরে উঠে শীর্ষবিন্দুতে মিলিত হয়েছে। এগুলিতে স্পষ্টত য়ুরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব পড়েছে।

দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ ঃ

দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চের দু-একটির কথা আগে বলা হলেও বাংলাদেশে রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চগুলির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কোন কোন ক্ষেত্রে দোলমঞ্চ বা রাসমঞ্চ একটি বড়ো অট্টালিকার আকারে নির্মিত হয়েছিল। রাজশাহির পুঠিয়ার রাজবাড়ির বিশাল দোলমঞ্চটি এই ধরনের। চারটি তলযুক্ত এই দোলমঞ্চের নিচের প্রশস্ত দালানের সাতটি খিলান প্রবেশপথ। দ্বিতলের দালানের এইরূপ পাঁচটি প্রবেশপথ, ত্রিতলে এই ধরনের তিনটি এবং চতুর্থ তলের চারদিকে একটি করে খিলান প্রবেশপথ। লক্ষণীয়, এখানে তিনটি দালান ওপরে ওপরে সাজিয়ে শীর্ষে একটি ছোট চালাকৃতি চূড়া বসানো হয়েছে। এই চূড়াটিও একটি 'চাঁদনি'। ছাদ সমতল না হয়ে ঢালু চালাকৃতি। এই দোলমঞ্চটি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য।[২০] পশ্চিমবাংলায় প্রায় সব রাসমঞ্চ বা দোলমঞ্চে 'রত্ন' সন্নিবেশিত হয়েছে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পশ্চিম মেদিনীপুরের নিজনাড়াজোলের (দাসপুর) নাড়াজোল রাজপরিবারের পঁচিশচূড়া বিশাল রাসমঞ্চটির উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমবাংলায় দোলমঞ্চগুলি প্রায় সবই ছোট আকারের। অনেক সময় একটি মাত্র 'রত্ন' থাকে। পুঠিয়ার রাজবাড়ির এই দোলমঞ্চ বারান্দাযুক্ত দোলমঞ্চ, যা খুবই বিরল। ম্যাককাচ্চন একে 'টেরাসড' দোলমঞ্চ বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের আর একটি দোলমঞ্চ যশোরের মহম্মদপুরে সীতারাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত (আ. খ্রি. ১৮ শতকের গোড়া বলে জানা গেছে)। একটি পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ ছিল যশোর জেলার সালনগরে। এটি গোবিন্দজীউর দোলমঞ্চ। চারকোণের চারটি 'রত্ন' দীর্ঘকাল আগে ভেঙে গিয়েছিল। সেগুলি কেন্দ্রীয় রত্নটির মতো 'চারচালা' রীতির ছিল বলে অনুমান। উল্লেখ্য, এই চারচালার চাল ঢালু হলেও অনেকটা খাড়া। চালের কার্নিশ বাঁকানো। খুবই জীর্ণ ও বৃক্ষসমাকীর্ণ (হয়তো এখন আর নেই) এই দোলমঞ্চের (খ্রি. ১৮ শতকের গোড়া) নিচের চালার ত্রিখিলান প্রবেশপথে 'ইমারতি' (বত্রিশ থাক ইঁটের) থামগুলি পশ্চিমবাংলায় এ ধরনের অজস্র থামের কথা মনে করিয়ে দেয়। পুঠিয়ায় (রাজশাহি) পঞ্চানন এস্টেটে 'রথমন্দির' নামে পরিচিত একটি 'একরত্ন' রাসমঞ্চ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর নিচের

দালানের চাল ঢালু হলেও কার্নিশ বক্রাকার না হয়ে সরল। চালের ওপরের চূড়া ক্ষুদ্রাকার হলেও নিচেরটির মতো। দুটিরই আটদিকে উন্মুক্ত খিলান দ্বারপথ।[২১] এর পেছনদিকে শিবের যে একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির আছে, সেটি উত্তরভারতীয় 'রত্ন'-শৈলীর। প্রতিটি শিখর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'অঙ্গশিখরে'র সমাহার, যা বারাণসী বা অন্যান্য স্থানের মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা শহরের ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনার কালীবাড়িতে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকৌশল লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে মন্দিরের সংখ্যা অজস্র। বহু আগে ষোলটি জেলার একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, সেখানে মোট কুড়ি হাজার তিনশ সাতাশটি মন্দির লক্ষ্য করা গেছে। যদিও ওই সমীক্ষা সম্পূর্ণ নয় বলে জানা যায়। এই সমীক্ষা থেকে জানা যায় (১৯৮৭ সালের আগের), কুমিল্লায় ৯১৮, কুষ্ঠিয়ায় ২৭৫, খুলনায় ১৩৭৮, পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ চট্টগ্রামে ১৯১৫, ঢাকায় ১৩৪৪, দিনাজপুরে ১২১০, নোয়াখালিতে ৫৬৭, পাবনায় ৭২১, ফরিদপুরে ১৯৯৮, বগুড়ায় ৪২২, বরিশালে ২৭১০, ময়মনসিংহে ১৭২২, যশোরে ১০৯৭, রংপুরে ১৮৫৮, রাজশাহিতে ১০২১ এবং শ্রীহট্টে আছে ১১৭২ টি মন্দির।[২২]

উল্লেখযোগ্য মন্দিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক কিছু কিছু মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে দেওয়া হ'ল ঃ [২৩]

কুমিল্লা ঃ

১. ***জগন্নাথপুর ঃ*** কুমিল্লা শহরের প্রায় তিন কিলোমিটার পুবে জগন্নাথপুরের জগন্নাথের সতের চূড়ার মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পশ্চিমবাংলার 'সপ্তদশরত্ন' বা সতের চূড়ার মতো এই মন্দির নয়। মন্দিরের চূড়াগুলি প্রচলিত 'রথ'-বিন্যাসযুক্ত দেউল বা খাঁজকাটা দেউল-রীতির নয়। এর চূড়াগুলো অষ্টকোণ ছত্রাকৃতি। মন্দিরটি ত্রিতল। মন্দিরের দ্বিতল ও ত্রিতলে মোট আটটি করে ষোলটি এবং ত্রিতলের সর্বাপেক্ষা বড় কেন্দ্রীয় রত্নটি নিয়ে মোট সপ্তদশরত্ন। জানা যায়, এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ত্রিপুরার রাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ১৬৮৫ থেকে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। কিন্তু মন্দিরের নির্মাণকাজ শেষ করান মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালে 'পঙ্কে'র রঙিন কাজ বর্তমান। জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি মন্দিরে অধিষ্ঠিত।

২. ***গুঞ্জর ঃ*** জগন্নাথ মন্দির। প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না। ভেতরে জগন্নাথ মূর্তি অধিষ্ঠিত।

৩. ***বিটেশ্বর ঃ*** কালীমন্দির। প্রায় তিনশ বছর আগে নির্মিত বলে জানা যায়।

৪. ***মেহরান ঃ*** এখানের জগন্নাথ মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না। গর্ভগৃহে বিগ্রহের মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সারথি ও নারায়ণ উল্লেখযোগ্য।

৫. ***সরাইল ঃ*** সরাইল থানার এই শহরতলীতে কালীমন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত আছেন চতুর্ভুজা কালীমূর্তি। সাধু অচিন্ত্যরাম এটি প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়।

৬. ***হায়দারগঞ্জ ঃ*** এটি মুরাদনগর থানায় অবস্থিত। এখানের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। গর্ভগৃহে বিশাল আকৃতির সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি অধিষ্ঠিত।

৭. ***চণ্ডীমুড়া ঃ*** চণ্ডীমুড়া পাহাড়ে ইঁটের দু'টি মন্দির পাশাপাশি দেখা যায়। এই মন্দিরদুটি

একই রকমের 'চারচালা'-রীতির। আনুমানিক খ্রিস্টীয় সতের শতকে তৈরি। আগে মন্দিরদুটির একটিতে শিব ও অন্যটিতে চণ্ডীর পুজো হত বলে জানা যায়। কাছাকাছি একটি পুকুর থেকে আনুমানিক পালযুগের দুটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। তার মধ্যে একটি ছিল সূর্যমূর্তি।

কুষ্টিয়া ঃ

এই জেলায় বল্লভপুর (মেহেরপুর), খোরশেদপুর গোপীনাথপুর, গোস্বামী-দুর্গাপুর, বলরাম হাড়ির আখড়া, ফুলবাড়ি মঠ, বারাদী মঠ ও মেহেরপুরের মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। এখানে মন্দিরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হ'ল।

১. *বল্লভপুর ঃ* জানা যায়, বহু আগে এখানে একত্র সাতটি ইঁটের মন্দির ছিল। সেগুলি ছিল 'টেরাকোটা' অলংকৃত। মনুষ্য ও দেব-দেবীমূর্তি ও জীবজন্তুর অনেক ফলক এখানে ছিল। অনুমান, এগুলো নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় ষোল শতকের শেষ বা সতের শতকের গোড়ায়। কারও কারও মতে, এগুলো ছিল বৌদ্ধমন্দির, আবার কারও কারও মতে, 'নাথ'-সম্প্রদায়ের মন্দির। মন্দিরগুলি প্রায় সবই নিশ্চিহ্ন।

২. *গোপীনাথপুর ঃ* এখানের গোপীনাথ মন্দির বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ কুঠিবাড়ির কাছাকাছি অবস্থিত। মন্দিরের দেওয়ালে টেরাকোটা লিপিফলক থেকে জানা যায়, এটি খ্রি. ১৯ শতকের প্রথমার্ধে নাটোরের এক রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবেশপথের ওপরে টেরাকোটা দেব-দেবী মূর্তি ও ফুল-লতাপাতার নকশা দেখা যায়। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকবাহিনীর হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরে এই মন্দিরে নূতন বিগ্রহ স্থাপন করা হয়।

৩. *গোস্বামী-দুর্গাপুর ঃ* এই জেলার সদর থানায় এটি একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানের প্রসিদ্ধ রাধারমণের মন্দির ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরে যে লিপিফলক দেখা গিয়েছিল, তা হল ঃ

> কালাঙ্ক বাণেন্দুমিতে শকাব্দে
> জ্যৈষ্ঠে শুভে মাসি সুনির্মলায়।
> শ্রীকৃষ্ণরায়ঃ শুভসৌধমন্দিরং
> শ্রীযুক্তরাধারমণায় শন্দদৌ।।

উদ্ধৃত লিপি অনুসারে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণরায় উপরি উক্ত সময়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জয়দিয়ার বাজা মুকুট রায়ের পুত্র ছিলেন। মন্দিরটি টেরাকোটার প্রশংসনীয় কাজের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ছিল। খ্রি. ১৯০৫-এ মন্দিরটির সংস্কার করা হয়।

৪. *বলরাম হাড়ির আখড়া ঃ* এই প্রসিদ্ধ আখড়াটি মেহেরপুরের পশ্চিমে অবস্থিত। বেশ চওড়া দেওয়ালযুক্ত ২২৫ বর্গফুটের একটি মন্দিরের ভেতর ৬৪ বর্গফুটের গর্ভগৃহ নিয়ে এই আখড়া। বলরাম ছিলেন হাড়ি জাতির গুরু, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সগোত্র।

৫. *ফুলবাড়ি মঠ ঃ* এই জেলার খোকসা থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি। এখানের মঠ ও মন্দির

আনুমানিক পাঠান আমলের শেষদিকে নির্মিত হয়। মন্দিরে রাধারমণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরের দেওয়ালে বহু টেরাকোটা ফলক বসানো হয়।

৬. ***বারাদী মঠ ঃ*** কুষ্টিয়া শহরের সংলগ্ন বারাদী হাটের কিছু দক্ষিণে এই 'মঠ' অবস্থিত। এটিকে 'টেরাকোটা' মঠও বলা হয়। এর প্রবেশপথ, দেওয়াল টেরাকোটার অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত। এর মধ্যে আছে রাধাকৃষ্ণ, যুদ্ধদৃশ্য প্রভৃতি।

৭. ***মেহেরপুর ঃ*** মেহেরপুরের জমিদার চৌধুরী এখানের শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। নবাব আলিবর্দি খানের সময় মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

খুলনা ঃ

১. ***ডামরেলি ঃ*** পূর্বোক্ত ডামরেলির মোস্তফাপুরে ইছামতী ও কালিন্দী নদীর পুবতীরে অবস্থিত একটি 'নবরত্ন' মন্দির। গর্ভগৃহের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত লিপিটি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল ঃ

শাকে বেদসমাযুক্তে বিন্দুবাণেন্দুসম্মিতে।
মঠোয়ং স্বর্গসোপানং শ্রীকৃষ্ণেণ কৃতঃ স্বয়ম্।।
১৫০৪

অর্থাৎ বেদ = ৪ বিন্দু = ০ বাণ = ৫, ইন্দু = ১। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ', এই নিয়মানুসারে ১৫০৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই মন্দিরটি নির্মাণ করলেন। মন্দিরের স্থাপত্য নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

২. ***কোদলা ঃ*** কোদলা গ্রামের প্রসিদ্ধ 'মঠ' (উচ্চ দেউলকে 'মঠ' বলা হয়) নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে এই উচ্চ দেউলটিতে একটি লিপি ছিল। অবশিষ্ট একটু যে লিপি আছে, তা হল,

'উদ্দিশ্য তারকং (ব্রহ্ম) (প্রাসা) দোয়ং বিনির্মিতঃ'।

এই মন্দিরটির নির্মাণকাল আকার ও গঠনপদ্ধতি অনুসারে খ্রিস্টীয় ষোল শতকের শেষভাগ বা সতের শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত বলে অনুমান।

এই জেলার উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি মন্দির হল, যশোরেশ্বরী (বহুবার সংস্কারের ফলে মন্দিরের আসল রূপ পরিবর্তিত), চণ্ডমন্দির (যশোরেশ্বর মন্দিরের নিকটবর্তী, মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়), সোনাবাড়িয়ার শ্যামসুন্দর (হরিরাম সেন ১৭৬৭ খ্রি. নির্মাণ করেন বলে জানা যায়, মন্দির 'টোরাকোটা'য় অলংকৃত ছিল), গোপালপুরের গোবিন্দ, সেনহাটির কালী (১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা শ্রীকান্ত রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত), মূলঘরের 'জোড়বাংলা' (এখানে লিপি অনুসারে ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়), শিবসার কালী (সুন্দরবনের ভীষণ জঙ্গলে প্রতাপাদিত্যের দুর্গের কাছে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির-দেওয়ালে প্রচুর টেরাকোটা ছিল), মহেশ্বর পাশার 'জোড়বাংলা' (আ. খ্রি. ১৮ শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত। গোপীনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করেন), নলতার কৃষ্ণ (প্রতাপাদিত্যের রাজস্ব মন্ত্রী যাদবেন্দ্র এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন), পীলজঙ্গের শিব (রাজা কল্যাণনারায়ণ কর্তৃক ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) এবং বনগ্রামের কালীর 'পঞ্চরত্ন' (স্থাপত্য ও অলংকরণের জন্য উল্লেখযোগ্য)।

চট্টগ্রাম ঃ

১. চট্টগ্রামে দেবী চট্টেশ্বরীর মন্দির এক প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে পরিগণিত। কেউ কেউ মনে করেন, আগে এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির এবং বিগ্রহটিও ছিল এক বৌদ্ধদেবী। কালক্রমে এটি হিন্দুমন্দিরে পরিণত হয়।

২. ***চকবাজার, চট্টগ্রাম ঃ*** চকবাজারের কাছে লালচান সড়কে মনোহর শিবের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন লালচান চৌধুরী। তিনি সেকালে ওই অঞ্চলে বাঙালি হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

৩. ***সীতাকুণ্ড ঃ*** এই তীর্থস্থান চন্দ্রনাথ পর্বতমালায় অবস্থিত। এটি একটি পীঠস্থান বলে অনেকে মনে করেন। পীঠের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ভবানী এবং ভৈরব চন্দ্রনাথ বা চন্দ্রশেখর। অনেকের ধারণা, ত্রিপুরেশ্বরীর প্রকৃত মূর্তি এখানেই ছিল। সেই মূর্তি পরে ত্রিপুরার রাজা ধর্মমাণিক্য তাঁর রাজ্যে নিয়ে যান। চট্টগ্রামে অনেক হিন্দুমন্দির ছাড়াও কৃষ্ণানন্দ মঠ, করুণাময়ী কালীবাড়ি, ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ি, রাজরাজেশ্বরী কালীবাড়ি, আনন্দময়ী কালীবাড়ি, দশভুজা কালীবাড়ি, ফিরিঙ্গিবাজারের শিবমন্দির প্রভৃতি অনেক ঠাকুরবাড়ি ও মন্দির আছে।

৪. ***মৈনাক পাহাড় ঃ*** এখানে আদিনাথ শিবের মন্দির উল্লেখযোগ্য। মহেশখালি নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনার কাছে একটি দ্বীপে মৈনাক পাহাড়। সমভূমি থেকে উনসত্তরটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে মৈনাক পাহাড়ের একেবারে মাথায় আদিনাথ মন্দির। মন্দিরে আদিনাথ শিব ও আটহাত দুর্গা অধিষ্ঠিত। মন্দির প্রায় দুশ বছরের পুরানো বলে কেউ কেউ মনে করেন। জানা যায় যে, মহেশখালির জমিদার প্রভাবতী ঠাকুরানি আদিনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

শহর চট্টগ্রামে পূর্বোক্ত ঠাকুরবাড়ি সহ তেত্রিশটি ঠাকুরবাড়ি এবং বহু মন্দির প্রমাণ করে এই শহরে একসময় কত দেবালয় তৈরি হয়েছিল। ধর্মচর্চার এক প্রধানকেন্দ্র ছিল এই স্থান। এই সব ঠাকুরবাড়ির যেমন একদিকে বহু কালীবাড়ি আছে, তেমনি অন্যদিকে বৈষ্ণব আখড়া ও ঠাকুরবাড়িও বর্তমান।

ঢাকা ঃ

ঢাকা শহর ঃ

১. ***রমনা কালীবাড়ি ঃ***

ঢাকা শহরের রমনার এই কালীমন্দির ছিল 'শিখর'-রীতির। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিচরণ গিরি। মন্দিরটি খ্রিস্টীয় সতের বা আঠার শতকে তৈরি হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী সেই পুরানো মন্দিরটি ধ্বংস করে দেয়। কালীবাড়িটি একটি ঐতিহাসিক স্থান ছিল। খ্রি. আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ হয় তখন ঢাকার সন্ন্যাসীরা এখানেই আত্মগোপন করেছিলেন। মন্দিরের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য হল, মূলমন্দিরের চূড়া পুরোপুরি গির্জার চূড়ার মতো উচ্চ ও ক্রমসূক্ষ্ম আটকোণা। এই মন্দিরটির সঙ্গে খালিয়ার (ফরিদপুর) কালীচরণ রায় মঠের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এটির আকারও অনেকটা গির্জার আকারের। চূড়াও আটকোণা ছত্রাকৃতি।

২. ***ঢাকেশ্বরী মন্দির ঃ*** এটি ঢাকার এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির। কিংবদন্তী, এখানে সতীর কিরীটের 'ঢাক' বা মুকুটের উজ্জ্বল অংশ পড়ে, সেজন্যে এটি পীঠস্থান। কিন্তু কিরীটের ঢাক সতীর দেহের অংশ না হওয়ায় একে পীঠ বা উপপীঠ বলা যায় না।

কারও কারও মতে, মহারাজা বল্লাল সেন এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও এটি একটি প্রাচীন মন্দির, তবুও গঠনকৌশলে এটিকে এত প্রাচীন মনে করা যায় না। মন্দিরের বহুবার সংস্কারকার্য হওয়ায় এর আসল রূপ নির্ধারণ করা শক্ত। সামনাসামনি পর পর চারটি চারচালা মন্দির যুক্ত করে এই ঠাকুরবাড়ি বা 'টেম্পল-কমপ্লেক্স' তৈরি হয়েছিল। তবে এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, চারচালার ওপর ওপর আরও কয়েকটি চারচাল ধাপে ধাপে ক্রমশ ছোট হয়ে ওপরে উঠে গেছে। স্থাপত্যের নিরিখে মূল ঢাকেশ্বরীর মন্দিরটি হল 'ষোল চালা'র। অন্যান্য যে 'চালা'গুলি সামনাসামনি পর পর সংলগ্ন, সেগুলি ওড়িশী স্থাপত্য পরিভাষায় 'জগমোহন' (দর্শককক্ষ - মূল মন্দিরটির ঠিক সামনে যেটি যুক্ত), 'নাটমন্দির' ও 'ভোগমণ্ডপ' বলা যেতে পারে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও অন্যান্য আরও অনেক স্থানে এই ধরনের স্থাপত্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সেখানে 'রেখ' ও পিঢ়া' দেউলের সমাবেশ দেখা যায়। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে 'চালা'শৈলীর প্রয়োগ লক্ষণীয়।

আগে এই মন্দিরগর্ভগৃহে এক ফুট উচ্চ দশভুজা দুর্গার মূর্তি ছিল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে মূর্তিটি চুরি যায়। মূর্তিটি উদ্ধার করা না যাওয়ায় ১৯৮২ সালে পুনরায় একটি মূর্তি-প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার মন্দিরের সংস্কার করান। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার কিরীটেশ্বরী (মুর্শিদাবাদ) মন্দিরের বেশ মিল আছে।

৩. ***সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি ঃ*** ঢাকার মালিবাগে সিদ্ধেশ্বরী কালীর 'শিখর'যুক্ত মন্দিরটি প্রসিদ্ধ। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিক্রমপুরের রাজা চাঁদ রায়।

৪. ঢাকায় আরও কয়েকটি ঠাকুরবাড়ি ও মন্দিরের মধ্যে জয়কালী ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির উল্লেখযোগ্য। জয়কালী মন্দির ঢাকার 'ঠাটারী বাজার' এলাকায় অবস্থিত। মন্দিরগুলি খুবই জীর্ণ দশায় ছিল। দেওয়াল-ঘেরা স্থানে এখানে দুটি মন্দির ছিল। দুটি মন্দিরের একটি ছিল পূর্ব ভিটিতে। সেটি ছিল 'একরত্ন'। মন্দির-দেওয়ালে অনেক মূর্তি লক্ষ্য করা যেত। উত্তর ভিটির মন্দিরটি ছিল 'পঞ্চরত্ন'। এর গর্ভগৃহে কালীমূর্তি ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির আনুমানিক খ্রি. আঠার শতকে নির্মিত। এর বারটি দুয়ারযুক্ত 'বারদুয়ারী' দর্শনীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'বুড়োশিবধাম' নামে এক শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এখানে যে শিবলিঙ্গটি পান, সেখানে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল মন্দিরটিকে পরে 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়।

এছাড়া, ঢাকার কিছু দূরে 'লস্করদীঘি' নামে একস্থানে দীঘির পুবদিকে একটি শিবমন্দির বর্তমান। জানা যায়, বাংলা ১১১২ সালে (১৭০৫ খ্রি.) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের চারদিকের দেওয়ালে দেব-দেবীর লীলাদৃশ্য— যেমন মহিষমর্দিনী, কালী, কৃষ্ণলীলা ও কোন কোন সামাজিক দৃশ্য আছে।

৫. ঢাকা জেলার বাজাসন, নান্না, বিক্রমপুর, সাভার, ধামরাই প্রভৃতি স্থানে অনেক মন্দিরাদি লক্ষ্য করা যায়।

দিনাজপুর ঃ

১. *কান্তনগর ঃ* দিনাজপুর জেলার কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরটি বাংলাদেশের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দেবালয়। মন্দিরটি বহু আগে 'নবরত্ন'-শৈলীর ছিল। কিন্তু পরে এর রত্ন বা চূড়াগুলি পড়ে যায়। বর্তমানে চূড়াবিহীন ত্রিতল দালান দণ্ডায়মান। মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এর দেওয়ালগুলোর প্রায় সব স্থানেই অজস্র টেরাকোটা মূর্তি ও নকশাফলক সন্নিবেশিত। এরকম 'টেরাকোটা' অলংকরণের ঐশ্বর্য পশ্চিমবাংলার বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) বিখ্যাত শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩ খ্রি.) এবং কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা'য় (১৬৫৫ খ্রি.) দেখা যায়। কান্তজীর এই ভগ্ন দেবালয়টি সেদিক থেকে বাংলাদেশে প্রায় অনন্য বলা যায়। কোন কোন আলোচক লিখেছেন ঃ

'আঠারো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত পোড়ামাটির চিত্রফলক শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীর নবরত্ন মন্দির উপমহাদেশের স্থাপত্য ও পোড়ামাটির শিল্পের এক অনবদ্য সৃষ্টি।'[২৪]

কিন্তু বিষ্ণুপুরের প্রাগুক্ত অপূর্ব 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলি যে এর থেকে কোন অংশে কম নয়, বরং প্রাচীনত্ব এবং এগুলির অন্তহীন উৎকৃষ্টমানের টেরাকোটা অলংকরণপ্রাচুর্য ভারত উপমহাদেশের যে অনবদ্য ও অতুলনীয় নিদর্শন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপূর্ব সুন্দর সুন্দর নকশা, মূর্তিগুলির ত্রিমাত্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টি, দৃশ্যগুলির বৈচিত্র্যের জন্য উক্ত মন্দিরদ্বয় চিরকাল ভাস্বর হয়ে আছে বা থাকবে। ওই দুটি মন্দিরেরই স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ (শাসনকাল খ্রি. ১৬২২ - খ্রি. ১৬৫৬)। মল্লভূম-বিষ্ণুপুরের অপর একটি উৎকৃষ্ট মন্দির হল মল্লরাজ দুর্জন সিংহ প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত মদনমোহনের 'একরত্ন'। প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ। অতি সুন্দর সুন্দর নকশা করা টেরাকোটা-ফলক এই মন্দিরগাত্রে সন্নিবেশিত। হুগলি জেলার আঁটপুরের রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (১৭৮৬ খ্রি.), বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (১৬৭৯ খ্রি.) এবং গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (আ. খ্রি. সতের শতকের শেষ) মন্দিরগুলি উৎকৃষ্টমানের প্রচুর টেরাকোটা-মূর্তিফলকে সজ্জিত। দুই মেদিনীপুর জেলাতেও এ ধরনের উচ্চমানের অজস্র টেরাকোটাফলক সজ্জিত অনেক মন্দির আছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ও ঘাটাল থানার অনেক মন্দিরে সুন্দর সুন্দর 'টেরাকোটা' সমন্বিত মন্দির আছে।

কান্তনগরের কান্তজীর এই মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন দিনাজপুরের জমিদার মহারাজ প্রাণনাথ রায়। কিন্তু তাঁর পুত্র রামনাথ রায় সেই কাজ শেষ করেন। মন্দিরের শিলালিপি থেকে এই তথ্য জানা যায়। শিলালিপি এখানে উদ্ধার করা হ'ল ঃ

ঃ

৭ শাকে বেদাব্ধিকালক্ষিতিপরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ
প্রাসাদঞ্চাতিরম্যসুরচিতনবরত্নাখ্যমস্মিন্নকার্ষীৎ।
রুক্মিণ্যাঃ কান্তুতুষ্ট্যৈ সমুদিতমনসা রামনাথেন রাজ্ঞা
দত্তঃ কান্তায় কান্তস্য তু নিজনগরে তাতসংকল্পসিদ্ধৌ।

এই প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, দিনাজপুরের জমিদার প্রাণনাথ খ্রিস্টীয় আঠার শতকের

গোড়ার দিকে তাঁর রাজধানী কান্তনগরে যে 'নবরত্ন' মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু করেন, সেটি তাঁর পুত্র রামনাথ ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন। স্থাপত্য ও 'টেরাকোটা' সমাবেশের ক্ষেত্রে এটিকে বিষ্ণুপুরের পূর্বোক্ত কোন কোন মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অবশ্য, বহুকাল আগে এই কান্তজীউর মন্দিরের সকলের ওপরের কেন্দ্রীয় রত্নটি ছাড়া অন্য রত্নগুলি ভেঙে গেছে। জে. ফার্গুসনের 'হিস্টরি অভ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার' গ্রন্থে নয়টি 'রত্ন' সহ এই মন্দিরের একটি ছবি দেওয়া আছে।

'ভূমিপরিকল্পনার দিক হতে কান্তজীর মন্দিরের আকৃতি চতুষ্কোণিক। সৌধগাত্রে কোন অভিক্ষেপ বা দেবালয়ের দেয়ালে কোন আঙ্কিক সংযোজন নেই। একটা সুবৃহৎ রথের মতই মন্দিরে মূল পরিকল্পনাটি লক্ষণীয়। চতুষ্কোণিক আকৃতি ঠিক রেখে স্টেপ পিরামিডের মত মন্দিরটি ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। মন্দিরসৌধটি অষ্টকোণবিশিষ্ট। কান্তজীর মন্দিরে নবরত্ন ছিল. কিন্তু ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই মন্দিরের 'নবরত্নাখ্য' অলঙ্করণ বিনষ্ট হয়েছে।'[২৫]

কান্তজীর এই মন্দিরের সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা-ফলক ও নকশা-কাজ মন্দিরের শোভা খুবই বৃদ্ধি করেছে। মন্দিরটির উত্তরদিকের দেওয়ালে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য এবং পশ্চিমদিকের দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলাভ, রাসমণ্ডল, কংসবধ ও অন্যান্য লীলাদৃশ্য রূপায়িত। দক্ষিণদিকের দেওয়ালে চণ্ডীকাহিনী এবং পুবদিকের দেওয়ালে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। ভিত্তিভূমিসংলগ্ন প্যানেলসমূহে বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্যের মধ্যে নৌবিহার, শিকারদৃশ্য, যুদ্ধজয়ে হাতি, ঘোড়া ও উট। অন্যান্য টেরাকোটা-ফলকে নানা ভঙ্গিতে স্ত্রী-পুরুষ দৃশ্যমান, বিভিন্ন দেবী, বাদক, নৃত্যপরা নারী, লতাপাতা, গাছপালা ফুল প্রভৃতির নকশা ও মূর্তি। দৈনন্দিন জীবনগাথা ও সামাজিক দৃশ্যচিত্র এই মন্দিরে এত বেশি পাওয়া যায়, যা বাংলাদেশের অন্য কোন মন্দিরে বিরল। সেদিক থেকে এটিকে বাংলাদেশের একটি শ্রেষ্ঠ মন্দির বলা যায়।

দিনাজপুর জেলার অন্যান্য আরও কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দেবীগঞ্জে কোচবিহার মহারাজার প্রতিষ্ঠিত বোদেশ্বরীর মন্দির একটি 'সতীপীঠ' বলে পরিচিত। এছাড়া গোরকুই নামে একটি প্রাচীন স্থানে গম্বুজ ও ত্রিশূলযুক্ত পাঁচটি মন্দির নাথ-সম্প্রদায়ের সমাধিমন্দির বলে কেউ কেউ মনে করেন। দেওয়ালে কিছু কিছু মূর্তি থাকলেও সেগুলি নিম্নমানের। এছাড়া দিনাজপুরে ঠাকুরগাঁওয়ের টাঙ্গন নদীর কাছে যে প্রায়-বিধ্বস্ত দুর্গ আছে, তার মাঝখানে গোবিন্দনগরের গোবিন্দজীউর মন্দির উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক খ্রিস্টীয় আঠার শতকের তৃতীয় দশকে রাজা রামনাথ এটি তৈরি করিয়েছিলেন। এখানে আগে একটি শিলালিপি ছিল। লিপিটি অন্যত্র স্থানান্তরিত। তার পাঠ এখানে দেওয়া হ'ল ঃ

> শাক্যেগ্নি পক্ষশ্চ চন্দ্রো
> গণিতে প্রীতয়ে হরেঃ।
> শ্রীমদ্‌গোবিন্দ রায়স্য
> মাত্রা দত্তং বিষ্ণুমন্দিরং।। ১৬২৩

লিপি থেকে জানা যায়, ১৬২৩ শকাব্দ বা ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রায়ের মাতা হরির সন্তোষের জন্য এই বিষ্ণুমন্দির দান করলেন। লক্ষণীয়, লিপি-উক্ত সেরকম কোন মন্দির এখানে নেই। 'খুব সম্ভবত পুরানো মন্দিরটির উপরই বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৯৬০ সালের দিকে জঙ্গল পরিষ্কার করে স্থানীয় জনগণ বসতি স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে

একটি ছোট মন্দিরের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। সে মন্দিরের ইঁট ও গঠনকৌশল হতে মনে হয় যে মন্দিরটি মোগল আমলে নির্মিত। আবুল কালাম মোহম্মদ যাকারিয়া মনে করেন যে, সম্ভবত এখানে ছিল গোবিন্দ রায়ের রাজবাড়ি।'[২৬]

নোয়াখালি ঃ

১. ***ভুলুয়া ঃ*** এই জেলার ভুলুয়ার (উপজেলা বেগমগঞ্জ) বারাহীদেবীর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জানা যায়, রাজা আদিশূরের পুত্র বিশ্বম্ভর শূর এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে বারাহী দেবীর একটি মন্দির নির্মাণ করান। সে সময় মন্দিরটি ছিল ভুলুয়ার নিকটবর্তী কল্যাণপুরে। পরে রাজা রুদ্রমাণিক্যের রানি স্বর্ণমুখী আমিশাপাড়ায় মন্দির তৈরি করে সেখানে দেবী বারাহীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

পাবনা ঃ

১. ***পাবনা ঃ*** এখানে রাধাগোবিন্দের 'জোড়বাংলা'-শৈলীর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের আয়তন খুব বড় না হলেও দেওয়ালে টেরাকোটা-ফলকগুলি আকর্ষণীয়। টেরাকোটা মূর্তিগুলোর মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য ও অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে বিভিন্ন জীবজন্তুর চিত্র। সামাজিক চিত্রগুলির মধ্যে নর্তক-নর্তকী, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যভাণ্ড নিয়ে বাদ্যকর, শোভাযাত্রা, শিকারদৃশ্য, মৃত ঝুলন্ত শিকারকে নিয়ে শিকারীর গমন ইত্যাদি দৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২. ***হাণ্ডিয়াল ঃ*** হাণ্ডিয়াল বা হাড়িয়ালের (চাটমোহর থানা) জগন্নাথের মন্দিরের প্রসঙ্গ আগে বলা হয়েছে। মন্দিরটি যে বেশ প্রাচীন, তা লিপি থেকে জানা যায়। লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হল ঃ

> শাকে পক্ষেন্দু বাণার্কগণিতে
> শ্রীজগৎপতেঃ শ্রীমৎভবানী
> প্রসাদেন ভগ্ন প্রসাদঃ উদ্ধৃতঃ।

অর্থাৎ পক্ষ = ২, ইন্দু = ১, বাণ = ৫, অর্ক = ১ বা ১৫১২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে এই ভগ্ন প্রাসাদ সংস্কার করালেন। মন্দিরে বিশেষ কোন অলংকরণ নেই। সম্ভবত সংস্কারকালে তার অনেকগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৩. ***তাড়াশ ঃ*** এখানের কপিলেশ্বর শিবমন্দির বেশ প্রাচীন ও অলংকরণযুক্ত। এই মন্দিরের দুটি লিপি এখানে উদ্ধার করা হল ঃ

> শাকে বাজিশরাঃ শুভেন্দুগণিতে শ্রীরামদেবাৎ পরঃ
> শ্রীনারায়ণদেব এব সুকৃতিঃ স্বর্লোক লোকোত্তরঃ।
> প্রাসাদাৎ শ্রুতিদৃষ্টতো নিরুপমং ভক্ত্যা দদৌ শম্ভবে
> মাতুঃ স্বর্গসুখপ্রয়াণকরণে সোপানমেকং ভুবি।।

ইতি শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৫৭ শ্রীগৌরাঙ্গ জয়তি। অর্থাৎ ১৫৫৭ শকাব্দ বা ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণদেব এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় লিপিটি সংস্কারকালীন। এখানে সেটি উদ্ধার করা হ'ল ঃ

> কালাগ্নিঃ তর্কেন্দুমিতে শকাব্দে
> বরং শিবস্যালয়মিষ্টকাদ্যৈঃ।
> জীর্ণ ...... ধ্বোদ্বরং তেস্ম ভক্ত্যা
> তস্মিন্ প্রবীণ বলরামদাসঃ।

অর্থাৎ ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে বলরাম রায় (সম্ভবত তিনি বয়স্ক ছিলেন) শিবমন্দিরটির সংস্কার করেন।

৪. ***পোতাজিয়া ঃ*** শাহজাদপুর থানার পোতাজিয়া গ্রামের রাধাবল্লভের এই 'নবরত্ন' মন্দিরের উল্লেখ আগে করা হয়েছে। বহু আগে এই মন্দিরের গায়ে অনেক অলংকরণ ছিল। 'পাবনা জেলার ইতিহাস' লেখক রাধারমণ সাহা এই মন্দির-সম্পর্কে বলেছেন, তিনটি তলযুক্ত এই মন্দিরের 'প্রথম তলে পুজোপকরণ সামগ্রী রক্ষিত হইত, দ্বিতীয় তলে পূজক ও পরিচালকবৃন্দ বাস করিতেন এবং তৃতীয় বা সর্বোচ্চ তলে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল... ইহার উচ্চতা এত অধিক ছিল যে, বহু দূরবর্তী প্রদেশ হইতে তাহা দৃষ্টিগোচর হইত।' (৪র্থ খণ্ড, পাবনা, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪, দ্রষ্টব্য, চক্রবর্তী পৃ. ৭৯)।

৫. ***হাণ্ডিয়াল ঃ*** এটি পাবনা জেলার হাণ্ডিয়াল। এখানের পূর্বোক্ত শেঠের বাংলা 'দোচালা' মন্দিরটি টেরাকোটা অলংকরণে সমৃদ্ধ। এর সামনের দিকে একটিমাত্র প্রবেশপথ প্রাচীন খিলানযুক্ত, দেওয়ালের গায়ে টেরাকোটার মধ্যে অনেক দেব-দেবী মূর্তি ও নকশা বর্তমান। প্রবেশপথের ওপরে যে লিপি আছে, তা থেকে জানা যায়, জনৈক ব্রজরাম দাসের পুত্র ১৭০১ শকাব্দ ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে দেবতার জন্যে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. ***হাটিকুমরুল ঃ*** এখানে কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে বিশাল 'নবরত্ন' দোলমঞ্চটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ মনে করেন, দিনাজপুরের কান্তজীউর মন্দিরের অনুকরণে এটি তৈরি হয়। কান্তজীর মন্দিরের মতো এরও চূড়াগুলি প্রায়-বিধ্বস্ত, দেওয়ালে অজস্র টেরাকোটাফলক ছিল। বিশালাকার থামের দেওয়ালে ছিল বহু টেরাকোটাফলক।

এরই কাছাকাছি আছে জগন্নাথের পূর্ব আলোচিত দেউল মন্দির, যার চূড়াটি ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে ওপরে উঠে গেছে। কেউ কেউ এটিকে শিবমন্দিরও বলেন। এই মন্দিরটি পূর্বোক্ত দোলমঞ্চের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষোল-সতের শতক। জানা যায়, দেবেন্দ্র ভাদুড়ি নামে এক ব্রাহ্মণ মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে দেখাশোনার অভাবে সেগুলি ধ্বংস হতে থাকে।

ফরিদপুর ঃ

১. ***খালিয়া ঃ*** ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরের রাজৈর থানার অন্তর্গত এই গ্রামে 'রাজারামের মন্দির' নামে পরিচিত একটি ভগ্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি সমতল ছাদযুক্ত 'দালানে'র ছাদের ওপর তিনটি 'চালা'মন্দির পাশাপাশি যুক্ত অবস্থায় সন্নিবেশিত। একটি বড় 'একবাংলা' বা 'দোচালা'র দু'পাশে প্রথমে (দর্শকের বাঁদিকে) 'চারচালা' ও ডানপাশে (দর্শকের) অপর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি 'দোচালা' যুক্ত আছে দেখা যায়। নিচের দালানের মোট পাঁচটি প্রবেশদ্বার। ওপরের বৃহৎ 'দোচালা'টির তিনটি প্রবেশপথ এবং পার্শ্ববর্তী দুটির একটিমাত্র প্রবেশপথ বর্তমান।[২৭] এটিকে কেউ কেউ জোড়বাংলা বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮] কিন্তু তা ঠিক নয়। মন্দিরগাত্রে কিছু কিছু টেরাকোটা কাজের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কিছু কিছু দৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। জানা গেছে, মন্দিরটি পুরাতত্ত্ব দপ্তর সংরক্ষিত করে রাখলেও তা খুবই জীর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত। আনুমানিক খ্রিস্টীয় আঠার শতকে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় জমিদার রাজারাম।

২. ***মথুরাপুর ঃ*** এই জেলার কালিয়াকান্দি থানার মথুরাপুরের দেউল বা 'মঠ' এক সুন্দর স্থাপত্যকীর্তি। এটির কথা আগে কিছু বলা হয়েছে। মন্দিরটি বারকোণা ঈষৎ গোলাকৃতি। দেউলটির চারদিক খাঁজকাটা এবং বাংলাদেশে প্রচলিত এ ধরনের প্রথাগত দেউলের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। খুলনার কোদলায় 'অযোধ্যা মঠ'টিও অনেকটা এইরূপ। সেটি খ্রি. সতের শতকে তৈরি। মথুরাপুরের এই দেউলের কিছু অংশ মাটিতে বসে গেছে। কিন্তু তবুও বেশ উঁচু। এই মন্দিরটির একটিমাত্র প্রবেশপথ। ভেতরে দীর্ঘকাল বিগ্রহ নেই। কোদলার 'অযোধ্যামঠ'ও ওই একদ্বারযুক্ত। জনপ্রবাদ অনুযায়ী এটিকে মহারাজা মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার পর একটি বিজয়স্তম্ভ বলে অনেকে মনে করেন। অবশ্য, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের কোন যুদ্ধ হয়নি। এটাই ইতিহাস সমর্থিত। কিন্তু এটি যে একটি মন্দির ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অনেকটা এই ধরনের কৃষ্ণের একটি জোড়া দেউল বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুরে আছে। প্রতিষ্ঠাকাল ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ। মথুরাপুরের এই দেউলও গঠন অনুসারে ওই একই সময়ের বলে অনুমান।

৩. ***বেলগাছি ঃ*** এই স্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন বলে এটিকে মনে করা হয়। কাষ্ঠনির্মিত মহাপ্রভুমূর্তি মন্দিরগর্ভগৃহে বিরাজমান, মন্দির-দেওয়ালে বেশ কিছু 'টেরাকোটা' অলংকরণ আছে।

এগুলি ছাড়া ফরিদপুর জেলার বেলগেছিয়া স্টেশনের কাছে হারোয়ার মন্দির নাটোরের কোন রাজার প্রতিষ্ঠিত বলে কেউ কেউ মনে করেন। গোপালগঞ্জ মহকুমার মকসুদপুর থানার ননিক্ষীর নামে এক প্রাচীন গ্রামে একটি ধ্বংসপ্রায় মন্দির ছিল। এটি প্রায় পাঁচশ বছরের পুরানো বলে অনেকের ধারণা। এই মন্দিরে আগে অনেক দেববিগ্রহ ছিল। আর একটি পুরানো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করা গিয়েছিল বোয়ালমারী থানার মধুখালি গ্রামে। এই মন্দিরে প্রচুর টেরাকোটা-ফলক ছিল। অনেক সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা প্যানেল লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

বগুড়া ঃ

বগুড়া শহরের কাছে বিশাল এলাকাজুড়ে 'যোগীর ভবন' নামে প্রত্নস্থল আছে। সেখানে প্রাচীন স্থাপত্যের বহু ভগ্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। যোগীর বা যুগীর ভবনে বেশ কয়েকটি মন্দির ও মূর্তি আছে। এই স্থানে গোরক্ষনাথের মন্দির ও সংলগ্ন অন্যান্য স্থাপত্যনিদর্শন 'নাথ'-পন্থীদের বলে জানা যায়। যুগীর ভবনে হিন্দু, মুসলিম প্রায় সব যুগেরই স্থাপত্যনিদর্শন আছে। এখানে যেসব মূর্তি দেখা গেছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, হরগৌরী, মহিষমর্দিনী, অষ্টমাতৃকামূর্তির অংশ, ত্রিমুখবিশিষ্ট স্ত্রীমূর্তি, বীণাবাদনরতা চতুর্ভুজা সরস্বতী মূর্তি প্রভৃতি আছে। দুর্গার মন্দিরে চামুণ্ডা মূর্তি ও কালভৈরবের মন্দিরে শিবলিঙ্গও আছে।

বরিশাল ঃ

১. ***মহিলারা ঃ*** এই জেলার গৌরনদীর মাহিলারায় একটি 'শিখর' দেউল নবাব আলিবর্দি খানের সময় (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) নির্মিত হয় বলে জানা যায়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সরকার রূপরাম দাসগুপ্ত। এই দেউলের স্থাপত্য ও কারুকার্য দর্শনীয়।

২. ***শিকারপুর ঃ*** সুগন্ধা নদীর তীরে তারা মন্দির। এটি একটি পীঠস্থান।

৩. ***রায়ের কাঠী ঃ*** পিরোজপুরের রায়ের কাঠিতে বেশ পুরানো একটি কালীমন্দির বর্তমান। এর দেওয়ালে যে লিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, রুদ্রনারায়ণ রায় নামে এক জমিদার ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে কালীমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে মূর্তিটি স্থানান্তরিত করা হয়।

এছাড়া ঝালকাঠির পোনাবালিয়া গ্রামের শিববাড়ি একটি তীর্থস্থান। ঝালকাঠির সুতালড়ি গ্রামে বেশ পুরানো একটি মঠ ভাগ্যবন্ত রায় নামে এক বণিক প্রতিষ্ঠা করেন আজ থেকে চার-পাঁচশ বছর আগে। জানা যায়, তাঁর মায়ের সমাধির ওপরে এই মঠটি প্রতিষ্ঠা করে তিনি এতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন।

ময়মনসিংহ ঃ

১. ***বোকাইনগর ঃ*** এখানে নিজাম শাহের মাজারের কাছে একটি মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরে যে টেরাকোটা লিপিফলক আছে, তা থেকে জানা যায় যে, এই মন্দির ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে জনৈক হিন্দুজমিদার প্রতিষ্ঠা করেন।

২. ***কিশোরগঞ্জ ঃ*** এই গ্রামে খ্রিস্টীয় আঠার শতকে তৈরি লক্ষ্মীজনার্দনের 'একবিংশতিরত্ন' মন্দিরটি স্থাপত্যশৈলী ও অলংকরণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই 'একবিংশতিরত্ন' মন্দিরের অপর একটি নিদর্শন ছিল ঢাকা জেলার রাজনগরে। পশ্চিমবাংলায় একুশরত্ন আমাদের চোখে না পড়লেও 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির অনেকগুলি আছে, যেমন বর্ধমানের কালনায়, পশ্চিম মেদিনীপুরের নিজনাড়াজোল (দাসপুর) ও আরও দু-চারটি স্থানে।

৩. ***পাতোয়াই ঃ*** ফুলেশ্বরী নদীতীরবর্তী এই গ্রাম। এই গ্রামে অষ্টকোণাকৃতি একটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দির-দেওয়ালে একসময় অনেক টেরাকোটা অলংকরণ ছিল। কারও

কারও মতে, 'মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা তথা বাংলার প্রথম মহিলাকবি চন্দ্রাবতী এই মঠ বা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।' এর পক্ষে তেমন কোন যুক্তি নেই। মন্দিরটি খ্রিস্টীয় সতের শতকের বলে মনে করা যায়।

যশোর ঃ

১. ***যশোর ঃ*** এখানে একটি লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ছিল। রাজা সীতারাম রায় ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। মন্দিরটি আটকোণা আকৃতির ছিল। সেটি এখন বিধ্বস্ত। যশোরে সীতারামের প্রাসাদের কাছে দশভুজার মন্দির ও শ্রীকৃষ্ণের 'জোড়বাংলা' মন্দির-দুটি ছিল উল্লেখযোগ্য। দশভুজা মন্দিরের লিপি থেকে জানা যায়, ১৬৯৯-১৭০০ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি বেশ আকর্ষণীয় ছিল।

যশোরের কৃষ্ণসাগর দীঘির পাড়ে রাজা সীতারামের প্রতিষ্ঠিত একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির ছিল। মন্দিরটি ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত সব মন্দিরের চেয়ে উঁচু। দেওয়ালে টেরাকোটামূর্তি ছিল। বর্তমানে বিধ্বস্ত।

২. ***মোহাম্মদপুর ঃ*** রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত একটি বিশাল দোলমঞ্চ তাঁর দুর্গনগরীর কাছে ছিল। এখানে দোলের সময় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ রাখা হত। এটি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

৩. ***রায়গ্রাম ঃ*** নবগঙ্গা নদীর তীরে রায়গ্রামে একটি 'জোড়বাংলা' মন্দির ছিল। মন্দিরের লিপি অনুযায়ী জনৈক রামশঙ্কর এই মন্দির ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। জানা যায়, রামশঙ্কর রাজা সীতারামের সেনাপতি 'মেনাহাতি'র ছোট ভাই ছিলেন। মন্দিরটি বহুকাল ধ্বংস্তূপে পরিণত।

৪. ***নলডাঙা ঃ*** এ সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখানকার 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরটি রাজা ইন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে। ইন্দ্রনারায়ণের নামে এখানে প্রতিষ্ঠিত দেবী ইন্দ্রেশ্বরী। নলডাঙায় বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন গুঞ্জানাথ নামে এক শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি বহুকাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

৫. ***লোহাগড়া ঃ*** এখানে একটি 'জোড়বাংলা' মন্দির ছিল। এতে নানা কারুকার্য ছিল। ইংরেজ আমলে এটি নির্মিত হয় বলে জানা যায়।

৬. ***চাঁচড়া ঃ*** এই স্থানেব রাজবাড়িতে বেশ কয়েকটি মন্দির উল্লেখযোগ্য। শিব ও দশমহাবিদ্যার মন্দির একটি 'দোচালা' মন্দির এখানের আকর্ষণীয় পুরাকীর্তি। 'দোচালা' মন্দিরে শ্যামরায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। দশমহাবিদ্যা মন্দির খ্রি. আঠার শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। ওই মন্দিরে গণেশ, সরস্বতী, কমলা, অন্নপূর্ণা, ভুবনেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, ষোড়শী, মহাদেব, কালী, তারা ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী, ভৈরব ও ধূমাবতী প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তি অধিষ্ঠিত ছিল।

রঙপুর ঃ

বর্ধনকুঠি ঃ আগে এখানের মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধনকুঠির জমিদার রাজা ভগবান দাস সর্বমঙ্গলা ও শ্যামসুন্দরের দুটি মন্দির নির্মাণ

করান। ভগ্ন ও প্রায়-বিধ্বস্ত মন্দিরের লিপি থেকে তা জানা যায়। 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থের লেখক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া লিখেছেন : 'সর্বমঙ্গলা ও শ্যামসুন্দরের মন্দির নামে পরিচিত মন্দির দুটি এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, এগুলির বর্ণনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।' (পৃ. ১৬৪)

রঙপুরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মন্দির হল, ডিমলার রাজার প্রতিষ্ঠিত কালী, মীরগঞ্জ তামপাটের জগন্নাথ, রথবাড়ির শিব ও রামসীতা, মাহিগঞ্জের মন্দির, শনিঠাকুরের মন্দির, গোপালের আখড়া, দয়াল দাসের আখড়া, জগন্নাথের আখড়া, সিদ্ধেশ্বরী, জোড়াশিব প্রভৃতির মন্দির।

রাজশাহি ঃ

১. ***পুঠিয়া ঃ*** এখানের মন্দির সম্পর্কে পূর্বে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। পুঠিয়ার পাঁচ আনির জমিদারবাড়িতে গোবিন্দজীউর 'পঞ্চরত্ন' মন্দির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য। কেউ কেউ বলেন, 'সাধারণভাবে মন্দিরটি আড়াইশত বছরের নির্মাণ হিসেবে জানা গেলেও পোড়ামাটির চিত্রফলক দেখে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, মন্দিরটি উনিশ শতকে নির্মিত।'[২৯]

পুঠিয়ার অপর এক উল্লেখযোগ্য মন্দির হল শিবের। এখানে দেওয়ালে অনেক পৌরাণিক দেব-দেবীর কাহিনীচিত্র ছিল। রাজশাহির পাঁচ আনি জমিদারবাড়ির রানি ভুবনময়ী ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ভুবনেশ্বরী মন্দির নামেও পরিচিত।

২. ***মঙ্গলবাড়ি ঃ*** ধামরই হাট থানার মঙ্গলবাড়িতে শিবমন্দির একটি বেশ প্রাচীন দেবালয়। এখানে হরগৌরীর আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্তিটি পাথরে তৈরি, চারফুট উঁচু ও কিছুটা ভগ্ন। মন্দিরটি 'পালযুগে'র বলে কেউ কেউ মনে করেন।

এখানে গোপাল-মন্দিরটি আনুমানিক খ্রি. উনিশ শতকের। কিছু কিছু দেবদেবী-লীলা বিষয়ক টেরাকোটা-ফলক এতে আছে।

'ভীমের পাঠি' নামে পরিচিত মণ্ডপটি বেশ প্রাচীন। একটি থাম ও হরগৌরী মন্দির নিয়ে এই 'ভীমের পাঠি'। থামের গায়ে উৎকীর্ণ শ্লোক থেকে জানা যায় যে, পালরাজা নারায়ণ পালের রাজত্বকালে মন্ত্রী ভট্টগুরু মিশ্র এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীহট্ট (সিলেট) ঃ

১. ***জয়ন্তীয়াপুর ঃ*** এখানে একটি প্রাচীন রাজবংশ রাজত্ব করত। এখানের কালীবাড়িটি খুবই পুরানো বলে জানা যায়। কিন্তু মন্দিরে কোন কালীমূর্তি লক্ষ্য করা যায়নি। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত বলে জানা গেছে।

২. ***ঢুপী ঃ*** এখানে রামেশ্বর শিবের একটি উচ্চ দেউল বা 'মঠ' ছিল। জানা যায়, জনৈক রামসিংহ ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে গর্ভগৃহে রামেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। পাথরের একটি ষাঁড়ও ছিল। ১৮৯৭ সালের ভূকম্পে এই মন্দিরের চূড়াটি ভেঙে যায়। মন্দিরগাত্রে প্রচুর কারুকার্য আকর্ষণীয়।

এছাড়া, শ্রীহট্টের সতীপীঠটি বাউরভাগ গ্রামে অবস্থিত ছিল। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি ভেঙে পড়ে। বানিয়াচঙের কালীমন্দির এবং হবিগঞ্জের বগলামাতার মন্দির বেশ প্রাচীন

বলে জানা যায়।

শ্রীহট্ট শহরেই এখন বিয়াল্লিশটি মন্দিরের অস্তিত্ব আছে। সেগুলো প্রায় সবই খ্রি. আঠার-উনিশ শতকে নির্মিত।

বাংলাদেশের মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা যায়, এখানে একমাত্র 'চালা'-শৈলীর (এর মধ্যে 'একবাংলা' বা 'দোচালা' 'জোড়বাংলা' 'চারচালা', 'আটচালা') মন্দির ছাড়া বাকি শৈলীর মন্দিরগুলিতে (রত্ন, দেউল) এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া (যেমন দিনাজপুরের কান্তনাথ) পশ্চিমবাংলার 'রত্ন' ও 'দেউল' মন্দিরের সঙ্গে যে পার্থক্যটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা হল, বাঁকানো কার্নিশ বা সরল কার্নিশযুক্ত একটি 'চালা' বা 'দালানের ওপর যে সুন্দর সুন্দর 'দেউল' বা 'পিঢ় '-রত্নগুলি মন্দিরটির এক সামগ্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, বাংলাদেশের 'রত্ন' মন্দিরগুলোর মধ্যে তেমনটা পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে, স্পষ্ট 'রথ'-বিন্যাসযুক্ত অসংখ্য ছোট বড় দেউল পশ্চিমবাংলার জেলাগুলিতে যত্রতত্র দেখা যায়। এগুলির স্থাপত্যসৌন্দর্যও দৃষ্টিবিনোদনকারী। ওড়িশী 'রেখ' ও 'ভদ্র'-শৈলীর খাঁটি 'শিখর' দেউলও পশ্চিমবাংলায় নেহাত কম নয়, বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় যার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে 'রেখ'দেউল নামে পরিচিত দেউলগুলি আদৌ 'রেখ'শৈলীর কিনা বিচার্য। যেমন, কোদলামঠ বা মথুরাপুরের দেউল যেগুলির সঙ্গে পশ্চিমবাংলার ওই ধরনের কোন কোন দেউলের মিল আছে, যেমন বর্ধমানের বৈদ্যপুর (খ্রি. ১৫৯৮) ও বনপাশ (খ্রি. ১৮২৬) প্রভৃতি। এগুলিকে একটি পৃথক শ্রেণীতে ফেলা যায়। চারপাশে খাঁজকাটা গোলাকার বা বর্গক্ষেত্রাকার দেউল আকৃতির এই ধরনের মন্দির পশ্চিমবাংলাতেও দেখা যায়। বাংলাদেশে এই ধরনের দেউল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এখানের 'রত্ন' মন্দিরে চালা, বিশেষ করে 'চারচালা'ই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, যেমন পুঠিয়া। আবার এই 'চারচালা'র চালগুলো অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঢালু চালের মতো না হয়ে কতকটা খাড়া সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকৃতি হয়ে ওপরে উঠে গেছে দেখা যায়। পুঠিয়ার গোবিন্দজীউর 'চালা' রত্ন মন্দিরটি দেখলেই এটা স্পষ্ট হবে। পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ খাড়াচালযুক্ত 'চারচালা' লক্ষ্য করা যায়। যেমন, নদীয়া জেলার মাটিয়ারি ও শান্তিপুরের জলেশ্বর ও দিগনগরের রাঘবেশ্বর (খ্রি. ১৬৬৯), 'মুর্শিদাবাদের বড়নগরের শিবের চারচালা (খ্রি. ১৮ শতকের শেষ)।

বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যশৈলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই, এখানের বেশির ভাগ মন্দিরে য়ুরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। হিন্দু, মুসলিম ও য়ুরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর মিশ্রণে এক ধরনের স্থাপত্যশৈলীর উদ্ভব হয়েছিল খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের দিকে। এগুলোর মধ্যে স্থাপত্যসৌন্দর্য কতটা সৃষ্ট হয়েছিল, তা বিচার্য। উদাহরণ, খালিয়াব (ফরিদপুর) কালীচরণ রায়ের 'মঠ' বা জয়দেবপুরের (ঢাকা) কালীনারায়ণ রায়ের মন্দির। বাংলাদেশে, বিশেষ করে, দেউল মন্দিরের চূড়া বহু ক্ষেত্রে গির্জার চূড়ার মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। তবে সেখানে ছত্রাকৃতি আটকোণা শিখরই তৈরি করা হয়েছে বেশি। গির্জার আকারে সরুমুখওলা লম্বা ছয়কোণা চূড়া লক্ষ্য করা গেছে হুগলি জেলার মহানাদের লালজীউর মন্দিরে (১৮৫১ খ্রি. পরিত্যক্ত)। মহানাদের এক শ্রেণীর সরল কার্নিশযুক্ত দালানের ওপর খাঁজকাটা বা পিঢ় দেউলরত্ন লক্ষ্য করা যায় (ব্রহ্মময়ীর 'নবরত্ন', খ্রি. ১৯ শতক), বাংলাদেশে সরল কার্নিশযুক্ত দালানের ওপর রত্নসন্নিবেশ দেখা গেছে।

উপরি আলোচিত সব মন্দিরগুলিই শেষ-মধ্যযুগের (খ্রি. ১৬ শতক থেকে খ্রি. ১৮ শতক)। পশ্চিমবাংলার মতো বাংলাদেশেও অজস্র মন্দির নির্মিত হয়েছিল এই সময়ে। মধ্যযুগের এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে এবং তৎপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব ও প্রেরণায় রাধাকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবদেবীর লীলাদৃশ্যচিত্র মন্দিরভাস্কর্যে এই সময় বেশি করে স্থান পেয়েছিল। প্রাচীন মন্দিরশৈলীর পরিবর্তন হয়ে নতুন নতুন শৈলীর উদ্ভব এই সময় হয়। হিন্দুযুগে, বিশেষ করে, পাল-সেন আমলের গগনচুম্বী 'শিখর' মন্দিরের পরিবর্তে 'চালা', 'রত্ন' এবং 'শিখর'-মন্দিরের পরিবর্তিত রূপের সৃষ্টি হয় বাংলায় সুলতানী আমলের শেষ দিক থেকে। পশ্চিমবাংলায় পাল-সেন আমলের 'শিখর' মন্দিরের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায়। যেমন বহুলাড়া ও সোনাতপল (বাঁকুড়া), দেউলিয়া (বর্ধমান) ও পশ্চিম জটা (দ. চব্বিশ পরগনা)। এ সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের গোড়ায় আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশেও এ ধরনের কিছু দেউল ছিল, অনুমান করা যায়। রাজশাহি জেলার পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড় এবং কুমিল্লার ময়নামতিতে হিন্দু আমলের বেশ কিছু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। রাজশাহির পাহাড়পুরে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পালসম্রাট ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বৌদ্ধমন্দির নির্মিত হয়। ধ্বংসাবশেষ থেকে মন্দিরটি উৎখননের পর দেখা যায়, এখানে তারও আগে একটি ব্রাহ্মণ্যমন্দির ছিল।[৬০] সেই ব্রাহ্মণ্যমন্দিরের কিছু কিছু টেরাকোটা মূর্তিফলক পরবর্তী বৌদ্ধমন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৬১] পাথরের অনেক মূর্তিফলকও এখান থেকে পাওয়া গেছে। ওই বৌদ্ধমন্দির বা বিহারে পাথরের ও পোড়ামাটির অনেক মূর্তিফলক লক্ষ্য করা যায়। পোড়ামাটির মূর্তিফলকগুলির মধ্যে লোকায়ত ভাব অনেকটা পরিস্ফুটিত দেখা যায়। তৎকালীন সামাজিক দৃশ্যফলকও এগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। তবে হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের স্থাপত্য একটু বিচিত্র ধরনের ছিল বলে জানা যায়।

এই ধরনের প্রাচীন নিদর্শন বগুড়া জেলার মহাস্থান ও কুমিল্লার ময়নামতিতেও পাওয়া গেছে। এসব অঞ্চল প্রাচীন পুণ্ড্রবধনের অন্তর্গত ছিল। সেই সব প্রাচীন মন্দির ও তাদের অলংকরণবৈচিত্র্য বাংলাদেশের সে সময়ের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের পরিচয় দেয়। উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অনেকটা অভাব থাকলেও অনুমান করা যায়, উত্তর-ভারতের 'নাগর'স্থাপত্যশৈলী এখানে অনুসৃত হয়ে থাকবে— অন্তত ভূমিনকশা থেকে একথা বলা যেতে পারে। এসব নিদর্শন থেকে বাংলাদেশে নির্মিত প্রাচীন মন্দিরস্থাপত্যশৈলী সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। পশ্চিমবাংলার মতো এখানেও পাল-সেন পর্বের শৈলীর মন্দিরও নির্মিত হয়। মুসলমান আক্রমণে এই সু-উচ্চ 'শিখর' দেউল নির্মাণ বন্ধ হয়ে গেলেও বাংলায় সুলতানী আমলের শেষদিকে আবার নতুন করে মন্দিরশৈলীর উদ্ভব হয়। এইভাবে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শেষ-মধ্যযুগীয় 'চালা', 'রত্ন' ও দেউল বা 'মঠ' শৈলীগুলির বিকাশ ঘটতে থাকে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. ম্যাককাচ্চন ডেভিড, বাংলাদেশের মন্দির, *ইতিহাস*, ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৫

২. মিশেল জর্জ (সম্পাদিত), *ব্রিক টেম্পলস অভ বেঙ্গল ফ্রম দ্যা আর্কাইভস অভ ডেভিড ম্যাককাচ্চন*, প্রিন্স্টন য়ুনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সটন, নিউ জার্সি, ১৯৮৩, পৃ. ১০

৩. চক্রবর্তী, রতনলাল, *বাংলাদেশের মন্দির*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৮
৪. *তদেব*, পৃ. ৩৯
৫. *তদেব*, পৃ. ৩৯
৬. ম্যাককাচ্চন, *পূর্বোক্ত*, দ্রষ্টব্য, *ডেভিড ম্যাককাচ্চন কয়েকটি প্রবন্ধ*, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ১২ অগস্ট, ২০০২, পৃ. ৪৩
৭. *তদেব*, পৃ. ৪৪
৮. *তদেব*, পৃ. ৪৪
৯. চক্রবর্তী, মনোমোহন, 'বেঙ্গলি *টেম্পল্স* অ্যাণ্ড দেয়ার ক্যারাকটারিসটিক্স', *জর্নাল* অভ *দ্যা এশিয়াটিক সোসাইটি* অভ *বেঙ্গল*, নিউ সিরিজ, ভলিয়ুম ৫, ১৯০৯ এবং মিত্র সতীশচন্দ্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯২
১০. ম্যাককাচ্চন, *পূর্বোক্ত*
১১. মিশেল জর্জ, *পূর্বোক্ত*, আলোকচিত্র নং ৬৮৫ ও ৬৯১ দ্রষ্টব্য
১২. চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২
১৩. ম্যাককাচ্চন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫
১৪. *তদেব*
১৫. মিত্র, সতীশচন্দ্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২-৬৩
১৬. চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৯
১৭. ম্যাককাচ্চন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮
১৮. ম্যাককাচ্চন, *লেট মেডিঈভ্ল টেম্পল্স অভ বেঙ্গল*, দ্যা এসিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭২, আলোকচিত্র নং ৪৯- ৫০, ৯৭-১০০ দ্রষ্টব্য।
১৯. চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩
২০. ম্যাককাচ্চন, *পূর্বোক্ত*, চিত্র ১৪৫
২১. ম্যাককাচ্চন, *পূর্বোক্ত*, চিত্র ১৪৬
২২. চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬
২৩. চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, এই অংশের বেশির ভাগ তথ্যই শ্রী চক্রবর্তীর '*বাংলাদেশের মন্দির*' (১৯৮৭) গ্রন্থের পৃ. ৫৮-৯৩ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত। এর জন্য উক্ত গ্রন্থের ঋণ স্বীকার করি।
২৪. চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩
২৫ চক্রবর্তী, *তদেব*, পৃ. ৭৪
২৬. *তদেব*, পৃ. ৭৬
২৭. ম্যাককাচ্চন, প্লেট নং ২৯ দ্রষ্টব্য
২৮. চক্রবর্তী, পৃ. ৮১
২৯. *তদেব*, পৃ. ৮৯
৩০. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৫০
৩১. *তদেব*

তৃতীয় ভাগ ঃ অন্বীক্ষা

১৮

মন্দির- 'টেরাকোটা'য় রামায়ণ

উত্তর ভারতের মতো পূর্ব ভারতে রাম-উপাসনা তেমন জনপ্রিয় না হলেও রামায়ণের কাহিনী সাধারণ মানুষের কাছে খুবই পরিচিত ছিল। তার সাক্ষ্য মেলে বাংলার 'নবপর্যায়ে'র অসংখ্য ইঁটের মন্দিরে। 'নবপর্যায়ে'র মন্দির বলতে আমরা এখানে শ্রীচৈতন্যোত্তরযুগের নির্দিষ্ট বিভিন্ন শৈলীর মন্দিরের কথাই বলতে চাইছি। এই শৈলীগুলি হল ঃ 'চালা' (একচালা, দোচালা, জোড়বাংলা, চারচালা, আটচালা, বারোচালা), 'রত্ন' (একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, এয়োদশরত্ন, একবিংশতিরত্ন, পঞ্চবিংশতিরত্ন), 'দালান', 'চাঁদনি' এবং 'দেউল'। এই শৈলীর মন্দির বাংলার গ্রাম ও শহরে অজস্র তৈরি হয় খ্রিস্টীয় পনের শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত। এমনকি, বর্তমান বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মন্দির নির্মাণের ধারা কিছুটা অব্যাহত থাকে, যদিও সংখ্যা ও মানের দিক থেকে উৎকর্ষ নিম্নমুখী হয়ে পড়ে। ইঁট ও পাথর— এই দুই প্রকার উপাদানে মন্দিরগুলি তৈরি হলেও ইঁটের মন্দিরই বেশি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে, পশ্চিমবাংলা ও বর্তমান বাংলাদেশের নদীনালার পলিমাটিতে গড়া সমভূমি এলাকায় ইঁটের মন্দিরের সংখ্যা যেন অন্যান্য অংশের চেয়ে অনেক বেশি। পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, পূর্ব দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় ইঁটের সুন্দর সুন্দর মন্দির কমবেশি লক্ষ্য করা গেছে, যার অনেকগুলির আয়ুষ্কাল সতের শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে বলে জানা যায়। ইঁটেরএই মন্দিরগুলিতে ছোটবড় পোড়ামাটির মূর্তি ও নকশা-ফলক সন্নিবেশিত হতে দেখা যায় ষোল শতক থেকে, যদিও সেসময় এর ব্যবহার খুবই অল্প বা সীমিত ছিল। নানা শৈলীর মন্দিরনির্মাণের পর বাইরের দেওয়ালে, বিশেষত সামনের দেওয়ালে 'টেরাকোটা'-ফলক (মূর্তি ও নকশা)- সংস্থাপন মন্দিরের অলংকরণ বা শোভাবৃদ্ধির জন্যে করা হোত। কোন কোন মন্দিরের শুধুমাত্র সামনের দেওয়াল, আবার কোন কোনটির দুদিক, তিনদিক বা চারদিক 'টেরাকোটা' ফলকে সাজানো হোত। অতি অল্প ক্ষেত্রে, যেমন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩ খ্রি.) ও কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' মন্দিরের (১৬৫৫খ্রি.) ভেতর ও বাইরের দেওয়াল, এমনকি, ওপরের দ্বিতলও অসংখ্য 'টেরাকোটা'-ফলকে সাজানো হয়। পূর্ব দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তনাথের মন্দিরও (১৭৫২ খ্রি.) এইরূপ 'টেরাকোটা'-সজ্জিত বলে জানা যায়। কোন কোন স্থানে 'নবরত্ন' বা 'আটচালা' শৈলীর মন্দিরের দ্বিতল কক্ষের দেওয়ালেও 'টেরাকোটা'-অলংকরণ লক্ষ্য করা গেছে। শ্রীচৈতন্যোত্তরযুগে পূর্বোক্ত শৈলীর মন্দিরগুলিতে বাঙালির নিজস্ব স্থাপত্যশিল্পভাবনা ধরা পড়েছে। কিন্তু প্রাক-মুসলিম হিন্দুযুগে মগধ এবং গৌড়বঙ্গে উচ্চ ' শিখর' যুক্ত যেসব দেউল মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার খুব কমই এখন অবশিষ্ট থাকলেও তাতে মূর্তিসন্নিবেশের থেকে স্থাপত্যালংকারের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। পাল-সেন আমলে তৈরি বর্তমান ইঁটের মন্দিরগুলির মধ্যে বাঁকুড়ার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর এবং সোনাতপলের তথাকথিত ভগ্ন সূর্যমন্দির, বর্ধমানের সাতদেউলিয়ার জীর্ণ দেউল, দক্ষিণ চব্বিশপরগনার জটার দেউল মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইঁটের মন্দিরের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে রাজশাহির পাহাড়পুরের সোমপুরবিহারে, উত্তর

চব্বিশপরগনার চন্দ্রকেতুগড়ে এবং মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে। উল্লেখ্য, এই সব স্থানের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে বেশ কিছু মন্দির-টেরাকোটা ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালকে এই সব ফলক দিয়ে সাজানো হোত। পাহাড়পুরের প্রসিদ্ধ সোমপুরবিহারের 'টেরাকোটা'ফলকগুলির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আমাদের আকৃষ্ট করে। বিহারটি খ্রিষ্টীয় নবম শতকে পালসম্রাট ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত বলে জানা যায়। ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা বিহারও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এগুলিও নানা শ্রেণীর 'টেরাকোটা'ফলকে সজ্জিত ছিল। সেগুলির সঙ্গে পাহাড়পুর-ফলকের সাদৃশ্য কিছুটা স্পষ্ট হলেও বৈসাদৃশ্যও আছে, পাহাড়পুরের ফলকগুলিতে রামায়ণীয় ও পৌরাণিক দৃশ্যাবলী ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্যপটও উৎকীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ঐ ধরনের টেরাকোটাফলক পাল-সেন যুগের পরবর্তীকালের মন্দিরগুলিতে আর পাওয়া যায় না। কার কারও ধারণা, 'টেরাকোটা'-শিল্পের এই ধারা বা শৈলী (যাকে 'লোকায়ত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে) পরবর্তীকালে কোন কারণে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই শৈলীর নির্দশন পাহাড়পুর ছাড়াও প্রায় সমসাময়িক কালে মহাস্থানগড় (বগুড়া, বাংলাদেশ) এবং ময়নামতীতেও (কুমিল্লা, বাংলাদেশে) পাওয়া গেছে।[১]

উপরি উক্ত স্থানসমূহের মন্দিরগুলি খ্রি. অষ্টম-নবম শতকে নির্মিত বলে অনুমিত। এগুলিতে যেসব 'টেরাকোটা'ফলক পাওয়া গেছে, তার মধ্যে রামায়ণের কোন কোন কাহিনী রূপায়িত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণকথার নানা গল্প, পঞ্চতন্ত্র ও বৃহৎকথার নানা কাহিনী এই ফলকগুলিতে দেখা যায়। কিন্তু সেই সব গল্পের আবেদন লোকায়ত সমাজজীবনে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।[২] ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় ফলকগুলিতে মার্জিত স্পর্শের, সূক্ষ্ম রুচির বা গভীর ব্যঞ্জনার স্পর্শ সামান্যই, কিন্তু লক্ষণীয়, ইহাদের সাবলীল গতিচ্ছন্দ, ইহাদের স্বচ্ছন্দ প্রাণময়তা, জীব ও মানবদেহের গঠন, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতন দৃষ্টি, জড়জগতের এবং দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ বোধ। .....এই শিল্প একান্তই লৌকিক। শিল্প প্রথাবদ্ধ প্রতিমাশিল্পের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ নাই। ....জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সৃজনক্রিয়ার এই সব নিদর্শন উচ্চকোটি ও সংস্কৃত শিল্পসাধনার নিপুণতর নির্দশনেব পাশে কোথাও দাঁড়াইবার সুযোগ পায় নাই, সে স্পর্ধাও ছিল না'।[৩]

বাংলার একান্ত নিজস্ব শৈলীতে নির্মিত এই ধরনের মন্দিরটেরাকোটা -ফলকে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী কয়েকশতক পরে খ্রিষ্টীয় ষোল-সতের শতক থেকে মন্দিরদেওয়ালের অলঙ্করণ রূপে আবার ব্যবহৃত হতে থাকে। এ সম্পর্কে আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মাঝখানে এই ছ-সাতশ বছরের মধ্যে পাল ও সেন রাজাদের শাসনাধিকার, মুসলমানবিজয়, সুলতানী আমলে দেশজ স্থাপত্য-শিল্পের বিকাশের পথে বাধা মন্দির টেরাকোটা শিল্পের নব রূপায়ণে কোনরূপ উৎসাহ সঞ্চার করেনি। কারণ, সেসময় মন্দিরনির্মাণে কোন উচ্চ পরিকল্পনা রাজকীয় শাসনে নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য, তার আগে খ্রি. দশ শতক থেকে এগার-বার শতক পর্যন্ত ইঁটের উচ্চ শিখরযুক্ত বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সব মন্দিরগাত্রে পৌরাণিক দেবদেবীলীলাদৃশ্য একান্তভাবেই অনুপস্থিত ছিল। এই সময়কালের বহু মন্দিরই ছিল বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির। হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিফলক স্বাভাবিকভাবেই তাতে সন্নিবেশিত হয়নি। ষোল শতকের প্রারম্ভে সুলতানী আমলের অবসান ও মুঘল শাসনকালে সাধারণ মানুষের ভাব ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ বাংলাসাহিত্যের যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায় রামকথা ও ভারতকথা কাব্যে, মঙ্গলকাব্যসৃষ্টিতে,

বিভিন্ন পাঁচালি ও গীতিগাথায় এবং বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে, তাতে বাঙালি-সংস্কৃতির এক নবজাগরণ লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতকথার অসাধারণ জনপ্রিয়তা সাধারণ গ্রাম্য সহজ সরল মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। এই সময় থেকেই রামকথা ও পৌরাণিক কাহিনীগুলির দৃশ্যচিত্র 'টেরাকোটা'-মন্দিরগাত্রে স্থান পেতে থাকে। এই শিল্পের অভ্যুদয় ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল সম্পূর্ণ দেশীয় শিল্পীদের দ্বারা, যা ছিল 'রাজপ্রাসাদ, অভিজাতচক্র এবং পুরোহিতবর্গের শাস্ত্রানুগ শিল্পের স্পর্শবিমুক্ত'।[৪] মন্দিরস্থাপত্যেও দেখা গেল বাঙালির নিজস্বতা- 'চালা', 'রত্ন', সহজ সরল 'দেউল'-শৈলীর সৃষ্টির মধ্যে। এই নবপর্যায়ের স্থাপত্য ও অলঙ্করণের সঙ্গে প্রাক-মুসলিম যুগের স্থাপত্য ও অলঙ্করণের সাদৃশ্য তেমন ছিল না। মুঘল আমলে, বিশেষ করে, সতের শতকের শুরু থেকে ইঁটের মন্দিরকে যে সুন্দরভাবে মূর্তি ও নানা ধরনের নকশাফলকে সজ্জিত করার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময় থেকে অন্যান্য অলঙ্করণের মধ্যে রামকথা বা রামায়ণের বিশেষ বিশেষ কাহিনী অলঙ্করণের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। কেউ কেউ মনে করেন মন্দির-অলঙ্করণে রামকথা সেন-রাজাদের আমল থেকে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু রাম বা রামসীতার মূর্তিপূজা সে সময় অজ্ঞাত ছিল।[৫] পূর্বভারতে, বিশেষ করে, বাংলা ও অসমে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে রাম-উপাসনা চলিত হলেও রামকে বিষ্ণুর অবতারভাবে পূজা করা খুব একটা ছিল না। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সহচররূপে কেউ কেউ রামভক্ত ছিলেন, যেমন, মুরারিগুপ্ত। চৈতন্যদেব তাঁকে কৃষ্ণভজনার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু মুরারির রামনিষ্ঠা লক্ষ্য করে চৈতন্যদেব নিরস্ত হন।[৬] পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মের প্লাবনে কৃষ্ণ-আরাধনা বাঙালি-সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হলেও রাম-উপাসনাও ভক্তিধর্মের প্রভাবে এক নতুন মাত্রা লাভ করে। বাংলার নবপর্যায়ের ইঁটের মন্দিরে 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণের যে প্রাচুর্য সতের শতক থেকে লক্ষ্য করা যায়, সেখানে কৃষ্ণলীলাদৃশ্যচিত্র প্রধান স্থান অধিকার করলেও রামায়ণকাহিনীও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। চৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণভক্তির প্রচারক হলেও রামকথা মন্দির-অলঙ্করণের জন্যে অসংখ্য 'টেরাকোটা'-মন্দিরে আবশ্যিকরূপে স্থান পেয়েছিল। এর মূলে ছিল রামের অবতাররূপে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণ যখন রচিত হয়, সেসময় থেকে রাম অবতারভাবে স্বীকৃত হন। যদিও আরও আগে তিনি পূজিত হতেন, কিন্তু জনমনে তিনি ভক্তির স্থান লাভ করেন নি। রামকে ভক্তিভাবে আরাধনা করার প্রথা শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্মপ্রভাবিত হলেও তাঁরও অনেক আগে সারা ভারতে রামানন্দের (১২৯৯ খ্রি.) অনুগামীরা রামভক্তিধর্ম প্রচার করেন।[৭] মুঘল আমলে বাংলায় বহু রামায়েৎ সাধু এসে রাম পূজা প্রবর্তন করেন। এঁদের পৃষ্ঠপোষক বেশির ভাগ ছিলেন পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রী রাজপুত ও ব্যবসায়ী। এঁরা যুদ্ধ ও ব্যবসা উপলক্ষে এখানে এসে বসতি করেন। পশ্চিমভারতে এই রামভক্তিধর্ম পূর্বভারতের তুলনায় বেশি জনপ্রিয় ছিল।[৮] মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা এবং অন্যান্য স্থানে রামায়েৎ-সাধুদের দ্বারা অনেক 'অস্থল' বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রামায়েৎ সাধুদের দ্বারা বাংলায় রামভক্তি বা রাম- উপাসনা প্রচারিত হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৯] বাংলার গ্রাম-শহরে রাম বা রামসীতার কিছু কিছু মন্দিরও তৈরি হয়। রাম-উপাসক কোন কোন রাজা-জমিদার ঐ মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন, চন্দ্রকোণার অযোধ্যাপল্লীতে রঘুনাথবাড়ির রঘুনাথের দেউল-মন্দির ও ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমানের রাজা, একথা জানা যায়। রামায়েৎ-সাধুদের প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রকোণার রামানুজ ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের 'অস্থল' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং অন্যান্য জেলায় রামচন্দ্র

বা রঘুনাথের নামে কিছু কিছু মন্দিরও তৈরি হয় এবং সেখানে রাম-সীতা বিগ্রহ স্থাপিত হয়। গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রমন্দির ও ভদ্রকালীর 'রামবাড়ি' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। রামায়েৎ সাধুদের কিছু কিছু 'আখড়া'ও প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্টগোমারি মার্টিন দিনাজপুরে রামায়েৎ-সাধুদের একটি আখড়া মঠ দেখেছিলেন যেখানে এক মোহন্তের অধীনে সাধুরা ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করতেন।[১০] সতের থেকে উনিশ শতকের মধ্যে ইঁট ও পাথরের যে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়, তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে বহু রাম বা রঘুনাথ মন্দিরও ছিল। এগুলি 'বিষ্ণুমন্দির' নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। রামায়েৎ-সাধুদের দ্বারা রামের উপাসনা প্রচারিত হয় বলে কেউ কেউ মনে করলেও এর কারণ ছিল অন্য।

শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের কিছু আগে থেকেই বাঙালির মধ্যে বিষ্ণুভক্তির উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়। বিষ্ণুর অবতাররূপে রাম ও কৃষ্ণ জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। রামকথা-অবলম্বনে মহাকবি কৃত্তিবাস রচনা করেন তাঁর ভক্তিরসাশ্রিত মহাকাব্য রামায়ণ। এই কাব্যের সঠিক রচনাকাল আজও নির্ণীত হয়নি। তবে সুকুমার সেনের মতে এই কাব্য শ্রীচৈতন্যের পরবর্তীকালে রচিত। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালে ষোল শতকের প্রথমভাগে রামায়ণরচয়িতা কৃত্তিবাসের নাম অজ্ঞাত ছিল।[১১] তবে শ্রীচৈতন্যের সমকালে 'রামচরিত নাটগানের যথেষ্ট প্রচলন ছিল।' আবার, ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মালাধর বসুরচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে 'রামকথা প্রথম পাওয়া যায়' [১২] কিন্তু কৃত্তিবাস সতেরো শতকের আগে তাঁর জনপ্রিয় রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন নি বলে সুকুমার সেন মনে করেন। [১৩] এই সময়ে বা কিছু আগে পরে শঙ্কর 'কবিচন্দ্রে'র লেখা রামায়ণ বেশ জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া রামানন্দ ঘোষ নামে এক কবি ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ে বর্ধমান থেকে 'রামলীলা' নামে এক কাব্য রচনা করেন।[১৪] এছাড়া আরও অনেক রামকথা বা রামপাঁচালী এই সময় রচিত হয়।

উল্লিখিত রামায়ণকাব্যগুলির উপজীব্য বাল্মীকি-রামায়ণ হলেও কবিরা তাঁদের কাব্যে কিছু কিছু নতুন কাহিনী সন্নিবেশিত ক'রে তাকে ভক্তিরসাত্মক করে তুলেছিলেন। ষোল শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণভক্তির প্রভাব এঁদের ওপর অবশ্যই পড়েছিল। তাই এযুগের রামায়ণকাব্য হয়ে উঠেছিল ভক্তিরসে আপ্লুত। বিষ্ণুর অবতার রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। সর্বোপরি শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের ফলে এঁরা আপামর মানুষের কাছে অসাধারণ ভক্তির পাত্র হয়ে উঠলেন। ভক্তিরসাশ্রিত রামকথাকাব্যগুলি কথকতা ও গানের মাধ্যমে সমাজে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রামাবতারের বিভিন্ন লীলা সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে নাড়া দিতে থাকে। কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে রামভক্তি মন্দিরস্থপতি ও টেরাকোটাশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করল মন্দিরগাত্রে রামলীলাদৃশ্যফলক সৃষ্টির জন্য।

শ্রীচৈতন্যোত্তর পর্বে অসংখ্য ইঁটের মন্দিরে রামায়ণকথার 'টেরাকোটা'-ফলক এই কারণেই বেশিমাত্রায় সন্নিবেশিত হতে থাকে। একদিকে মন্দিরগর্ভগৃহে রামসীতালক্ষ্মণের বিগ্রহস্থাপন (বহু মন্দিরে শালগ্রাম শিলায় রঘুনাথ রামচন্দ্রের পূজাও অনুষ্ঠিত হতে আমরা দেখেছি), অন্যদিকে, ইঁটের মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে টেরাকোটাফলকে রামায়ণের বিশেষ বিশেষ কাহিনীকে রূপায়িত করা হয়েছিল। এমনকি, অল্পসংখ্যক পাথরের মন্দিরেও রামায়ণের কোন কোন কাহিনীচিত্র লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু যেহেতু ইঁটের মন্দিরের সংখ্যা বাংলায় সর্বাপেক্ষা বেশি, তাই এখানে 'টেরাকোটা'-মন্দিরই আলোচ্য। কারণ, ইঁটের মন্দিরের 'টেরাকোটা'-ফলকে রামকথার দৃশ্যটি এত সজীব,

স্বতঃস্ফূর্ত ও নমনীয় হয়ে উঠেছে যে পাথরের মন্দিরে প্রস্তরখোদিত ভাস্কর্যে তা বিরল। বাংলার নানাস্থানে পোড়ামাটিমূর্তিসজ্জিত যে মন্দিরগুলি দেখা যায়, তার মধ্যে এমন কোন মন্দির নেই যেখানে রামায়ণকাহিনী পাওয়া যায় নি। এর থেকে বোঝা যায়, রামায়ণকথা সেযুগে মন্দিরশিল্পীদের কাছে কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের বাংলায় রামায়ণের কবিরা ভক্তিরসাশ্রিত যেসব চরিত্র ও কাহিনী কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন সেগুলি সাধারণ মানুষের অতিপ্রিয় ও পরিচিত হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র টেরাকোটায় নয়, পুঁথির কাঠের পাটায় এবং পটচিত্র বা কালীঘাটপটেও রামলীলাদৃশ্য পটুয়ারা অঙ্কন করেন।[১৫]

মন্দির-'টেরাকোটা' সজ্জায় রামায়ণের যে বিশেষ কাহিনীগুলির আমরা চিত্ররূপ পাই, সেগুলি হল ঃ অদিকাণ্ডে উল্লিখিত মর্ত্যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, দশরথের পুত্রলাভের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকর্তৃক যজ্ঞ আরম্ভ, রামের জন্ম, রামের হরধনুভঙ্গ, সীতার বিবাহ, অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত কুব্জার সঙ্গে কৈকেয়ীর মন্ত্রণা, পিতৃসত্যপালনের জন্য রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনগমন। অরণ্যকাণ্ডে সূর্পণখার লক্ষ্মণের প্রতি প্রণয়ভিক্ষা ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, মারীচের মায়ামৃগরূপ ধারণ, রামের মারীচবধ, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাবণের সীতার নিকট ভিক্ষা,রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ ও যুদ্ধ। সুন্দরাকান্ডের অন্তর্গত অশোকবনে সীতা এবং হনুমানের সীতাদর্শন, হনুমানকর্তৃক লঙ্কাদাহন, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের ভক্তি, সাগরে সেতুবন্ধন, লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, রামের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু, লঙ্কাযুদ্ধে বিশাল বানরসেনাবাহিনী, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং লক্ষ্মণের জীবনরক্ষার জন্য ঔষধ আনতে হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, রাবণবধের জন্য অকালবোধন, রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক এবং রামসীতার সিংহাসনারোহণ। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বিশেষ কোন দৃশ্য 'টেরাকোটায়' তেমন চিত্রায়িত হতে দেখা যায় না।

রামায়ণকাব্যে এইরূপ আরও বহু কাহিনী পাওয়া গেলেও উপরি উল্লিখিত বিষয়গুলি ও আরও কয়েকটি বিষয় মন্দির 'টেরাকোটা'-শিল্পীদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই দৃশ্যগুলি কমবেশি বাংলার প্রায় সব 'টেরাকোটা'-অলঙ্কৃত মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে কাহিনীসমূহের মধ্যে লঙ্কাযুদ্ধ অত্যধিক জনপ্রিয় হওয়ায় টেরাকোটায় এর দৃশ্যচিত্র প্রায় প্রতিটি মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে প্রবেশপথের খিলানের ওপরের প্রস্থে (সাধারণতঃ কেন্দ্রীয়প্রস্থে) রাম ও রাবণের সম্মুখসমর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে উৎকীর্ণ হয়েছিল। 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণের একটি প্রধান আদর্শরূপে (motif) রামায়ণের এই কাহিনীটি গৃহীত হয়। কোন কোন মন্দিরে প্রবেশপথের ওপরের সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রস্থটির বাঁদিকে রথারূঢ় শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এবং পশ্চাতে বহু বানরসেনা এবং ডানদিকে দশমুখ ও দশহস্তযুক্ত রাবণ বিশাল একটি রথে আরূঢ় এবং তাঁর পশ্চাতে রাক্ষসসেনা। উভয়ে পরস্পরের প্রতি বাণনিক্ষেপরত। বানরসেনা ও রাক্ষসদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধদৃশ্য বহু মন্দিরে দেখা যায়। আর একটি যে বিষয় মন্দির 'টেরাকোটা'য় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, সেটি হোল, রাম-রাবণের মাঝখানে দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাব। সম্ভবত দেবী দুর্গা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কৃপাবশত তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছেন। এটি 'অকালবোধন'-কাহিনীর স্মারক। রাবণের সীতাহরণ ও জটায়ুকর্তৃক রাবণের রথ-আক্রমণের দৃশ্যও আমরা বহু 'টেরাকোটা'-মন্দিরে লক্ষ্য করেছি। এটিও একটি প্রিয় 'বিষয়' (মোটিফ)

ছিল 'টেরাকোটা'-শিল্পীদের কাছে। মারীচের মায়ামৃগরূপ ধারণ ও মারীচবধদৃশ্যও মন্দিরটেরাকোটায় একটি প্রিয় বিষয়। এছাড়া, রাম -লক্ষ্মণ-সীতার বনগমন এবং সর্বোপরি রাম-সীতার রাজ্যভিষেকদৃশ্যও অনেক মন্দিরে পাওয়া গেছে। সরেজমিন অনুসন্ধানে ও প্রকাশিত তথ্য থেকে আমরা পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের মন্দিরে রামায়ণ বা রামকথাকাব্যের যেসব দৃশ্যফলক পাই, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে উপস্থিত করছি। উল্লেখ্য, রামায়ণকাহিনীর অসংখ্য টেরাকোটা-ফলকের মধ্যে এ তালিকা নেহাতই নগণ্য। তবুও উল্লেখযোগ্য কিছু 'বিষয়' এখানে দেওয়া গেল।

মন্দির (স্থান ও জেলা)	প্রতিষ্ঠাকাল	বিষয় (টেরাকোটা)
বাসুদেবের 'নবরত্ন', রাজগ্রাম (বাঁকুড়া)	আ. ১৯শতক	রামচন্দ্রের সভাগৃহ
লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন', ইলামবাজার (বীরভূম)	১৯শতক	রামের সভা ও যজ্ঞদৃশ্য
শিবের 'আটচালা', লাভপুর (বীরভূম)	খ্রি. ১৮৫২	সিংহাসনে রামসীতা
লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন', সুরুল (বীরভূম)	আ. ১৮শতক	রামরাবণের যুদ্ধ, রাবণের সভা, রামের সভা, রাম-সীতার অভিষেক।
শিবের 'পঞ্চরত্ন', বনকাটি (বর্ধমান)	খ্রি. ১৮৩২	রামের সভাগৃহ।
জোড়াশিবের দেউল, কালিকাপুর (বর্ধমান)	খ্রি. ১৮৩৯	রামের সভাগৃহ।
কান্তজীউর 'নবরত্ন', কান্তনগর (পূর্বদিনাজপুর, বাংলাদেশ)	খ্রি. ১৭৫২	রামজন্মের পূর্ববর্তীঘটনা, দশরথের ঋষ্যশৃঙ্গমুনির দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, রাম সীতার বিবাহ ইত্যাদি।
মথুরাপুরের অষ্টকোণ 'রেখ' দেউল (ফরিদপুর বাংলাদেশ)	খ্রি. ১৭শতক	রাম-সীতার বিবাহ।
রামচন্দ্রের 'একরত্ন', গুপ্তিপাড়া (হুগলি)	খ্রি. সতের শতক	লঙ্কাযুদ্ধ
'চারবাংলা' মন্দির, বড়নগর (মুর্শিদাবাদ)	খ্রি. ১৭৬০	ঋষ্যশৃঙ্গকর্তৃক দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, শ্রীরামের হরধনুভঙ্গ, জনকের সীতাসম্প্রদান, রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণের করজোড়ে প্রার্থনা।
কালী-মন্দির, বড়নগর (ঐ)	খ্রি. ১৮ শতকের মধ্যভাগ সম্ভবত	লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন।

পুঠিয়ার তিনটি 'একবাংলা' মন্দির (রাজশাহি, বাংলাদেশ)	খ্রি. ১৮ শতকের শেষদিক	সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, বনবাসে থাকাকালীন সীতার রন্ধন।
পদ্মাকৃতি গম্বুজযুক্ত শিবমন্দির, বলিহার (রাজশাহী, বাংলাদেশ)	খ্রি. ১৯ শতকের প্রথমদিক	রাম-রাবণের যুদ্ধকালে রাবণের করজোড়ে প্রার্থনা।
কান্তনাথের 'নবরত্ন', কান্তনগর (পূর্বোক্ত)	খ্রি. ১৭৫২	পূর্বোক্তগুলি ছাড়া রামচন্দ্র ও হনুমান

ওপরে উল্লিখিত মন্দিরগুলির 'টেরাকোটা'-ফলকে রামকথার পূর্বোক্ত দৃশ্যচিত্র ছাড়া আরও অসংখ্য মন্দিরে রামলীলাদৃশ্যের বহু 'টেরাকোটা'-ফলক লক্ষ্য করা গেছে। এখানে আদিকাণ্ড থেকে রামায়ণের অন্যান্য 'কাণ্ডে'র বিশেষ বিশেষ কাহিনীর টেরাকোটা-ভাস্কর্যের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হোল। যদিও মন্দির'টেরাকোটা'-অলঙ্করণে রামায়ণের আদি বা বালকাণ্ডের কাহিনীর চিত্ররূপ আমরা খুব কমই পাই।

মন্দির (স্থান ও জেলা)	প্রতিষ্ঠাকাল	বিষয় (টেরাকোটা)
অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (বাঁশবেড়িয়া, হুগলি)	খ্রি. ১৬৭৯	শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম ও অযোধ্যায় আনন্দ-উৎসব, শ্রীরামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ এবং জনকরাজকর্তৃক সীতাসম্প্রদান। এখানে আদিকাণ্ডের আরও বহু ফলক ছিল। বর্তমানে সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে।
কালাচাঁদের 'সপ্তদশ রত্ন', রামগড় বিনপুর (মেদিনীপুর)	খ্রি. ১৮৫৫	শ্রীরামচন্দ্রের হরধনু-উত্তোলন, সীতা এবং তাঁর সহচরীদের দর্শন। দণ্ডায়মান নারদ
মথুরাপুরের দেউল (পূর্বোক্ত)	পূর্বোক্ত	বিবাহের পূর্বে সীতার সাজসজ্জা

সীতার বিবাহ-অনুষ্ঠানদৃশ্যে রাম ও সীতা পূজার ঘটের ওপর পরস্পর হস্তধারণ করে আছেন। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সীতার অন্যান্য ভগিনীদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। এর পর সকলের অযোধ্যা-প্রত্যাবর্তন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে পরশুরামকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে যুদ্ধের

জন্য আহ্বান। এই দৃশ্যটি বড়নগরের (মুর্শিদাবাদ) 'জোড়বাংলা' মন্দিরে দেখা যায়। উল্লেখ্য, বালকাণ্ডের এই ফলকগুলি প্রায় সবই পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির নীচের দিকে ভিত্তিবেদির কিছু ওপরে দেওয়ালে সন্নিবেশিত দেখা যায়। বালকাণ্ডের বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাক্ষসনিধনের জন্যে রাম-লক্ষ্মণের যাত্রা, পাষাণময়ী-অহল্যার উদ্ধার, তাড়কারাক্ষসীবধ প্রভৃতি দৃশ্যও আমরা কোন কোন মন্দিরে পাই।

অরণ্যকাণ্ডের কাহিনীর মধ্যে রামসীতা ও লক্ষ্মণের বনগমনদৃশ্য, আশ্রমে অবস্থান, যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদের নিধন, লক্ষ্মণকর্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন উল্লেখযোগ্য। বহু মন্দিরে এই দৃশ্য পাওয়া যায়। অরণ্যকাণ্ডের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় 'সীতাহরণ'। প্রথমে সীতার জন্য শ্রীরামের স্বর্ণমৃগের অনুসরণ, স্বর্ণমৃগ মারীচের দেহটি হরিণের আকার, কিন্তু উর্ধ্বভাগ পুরুষ মনুষ্যমূর্তি। এই মূর্তিটি বহু মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের ওপর লক্ষ্য করা গেছে। এটি আঠার-উনিশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতেই বেশি পাওয়া যায়। এরপর রামের মারীচের প্রতি বাণনিঃক্ষেপ। রামের অনুপস্থিতিতে সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী রাবণের সীতার আশ্রমকুটিরে আগমন। এই দৃশ্যগুলি দাসপুরের লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (খ্রি. ১৭৯১), গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (১৮ শতক) এবং লোয়াদার পরিত্যক্ত রাধাকৃষ্ণের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (খ্রি.১৮০৫ মেদিনীপুর) লক্ষ্য করা গেছে। এই মন্দিরে জটায়ুর রাবণের রথ-আক্রমণ দৃশ্যটি সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে। উড়ন্ত 'পঞ্চরত্ন' শৈলীর রথে অসহায় অবস্থায় সীতা এবং সারথিরূপী রাবণ এবং জটায়ু পক্ষীর বিশাল মুখবিস্তার-দৃশ্যটি আঠার-উনিশ শতকের মন্দিরটেরাকোটা-অলঙ্করণের একটি প্রধান বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। জয়দেব-কেঁদুলির রাধাগোবিন্দের 'নবরত্ন' মন্দিরের দেওয়ালে জটায়ুর দেহকে বিশালভাবে বর্ধিত করা হয়েছে দেখা যায়। উনিশ শতকের বহু মন্দিরে জটায়ুর শুধুমাত্র পক্ষ ও চঞ্চু উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সুরৎপুরের শীতলার 'পঞ্চরত্নে' (দাসপুর, মেদিনীপুর, ১৮৫৯ খ্রি.) এইরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে জটায়ু যেন রাবণের রথকে গলাধঃকরণ করার চেষ্টা করছে। এখানে রাবণের মূর্তিও সুন্দরভাবে খোদিত হয়েছে। আর একটি নতুন দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করি পারুলের রঘুনাথের 'আটচালায়' (আরামবাগ, হুগলি, খ্রি.১৭৬৮)। এখানে জটায়ু সীতাহরণ-সম্পর্কে রামচন্দ্রকে অবগত করাচ্ছেন।

অশোকবনে বন্দিনী সীতা— এই বিষয়টিও মন্দির 'টেরাকোটা'য় গৃহীত হয়েছে। দৃশ্যটি হোল, সীতা একটি রাজকীয় মণ্ডপে কয়েকজন দাসীর দ্বারা পরিবৃত। সতের এবং আঠার শতকের কোন কোন মন্দিরে দেখা যায় হনুমান একটি লতাকুঞ্জে আসীন হয়ে সীতার সামনে দেখা দিচ্ছে। এ দৃশ্যগুলি আছে অমরাগড়ির দধিমাধবের 'আটচালা' (খ্রি.১৭৬৪), দশঘরার গোপীনাথের পঞ্চরত্ন (খ্রি.১৭২৯), ঝিকিরার দামোদরের 'আটচালা' মন্দিরে (খ্রি.১৭৬৯)। বিষ্ণুপুরের কালাচাঁদের 'একরত্ন' মন্দিরে (খ্রি.১৬৫৬) দেখা যায়, হনুমান গাছের ওপর থেকে সীতাকে রামচন্দ্রের বার্তা জানাচ্ছে এবং রাবণের প্রহরীরা পলায়নরত হনুমানকে তাড়া করছে।

রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য একটি উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু বা 'মোটিফ'রূপে মন্দির টেরাকোটায় গৃহীত হয়। লঙ্কাযুদ্ধের আগে যুদ্ধের প্রস্তুতিবিষয়েও কিছু কিছু টেরাকোটাফলক আমরা পাই। যুদ্ধের প্রারম্ভে বানরযোদ্ধা ও সেনাদের সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণের পরামর্শ, লঙ্কাযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে লঙ্কায় যাওয়ার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন দৃশ্যটি বহু মন্দিরে পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত পারুলের রঘুনাথের 'আটচালা' মন্দিরে সেতুটি সিঁড়ির মতো করে দেখানো হয়েছে।

সুপ্রসিদ্ধ লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যের প্রাচীনতম রূপায়ণ বৈদ্যপুরের(বর্ধমান) কৃষ্ণের 'দেউল'মন্দিরে (খ্রি.১৫৯৮) লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথেব ওপর এই ফলকগুলি সজ্জিত। দুদিকে বানর অনুচর ও মাঝখানে ধনুর্ধারী যোদ্ধারা রথারূঢ় হয়ে শরনিঃক্ষেপরত। খ্রি. সতের শতকে নির্মিত কোন কোন মন্দিরে রাম-রাবণ সম্মুখসমরে লিপ্ত। উভয়ে অদ্ভুত ধরনের মকরমুখ রথে আরূঢ়। বিষ্ণুপুরে এই শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে যুদ্ধদৃশ্য মন্দিরের বহু স্থানেই লক্ষ্য করা যেতে থাকে। বানর ও ধনুর্ধরদের যুদ্ধে তা প্রতিফলিত হয়। বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্তবাসুদেবের পূর্বোক্ত 'একরত্ন' মন্দিরে (১৬৭৯ খ্রি.) রথারোহী প্রধান যোদ্ধাদের চারপাশে অনুচর এবং বানর সেনারাও আছে। ঘুরিষার (বীরভূম) রঘুনাথের 'চারচালা' মন্দিরেও (খ্রি.১৬৩৩) এ দৃশ্য উপস্থিত হয়েছে। গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রের 'একরত্ন' মন্দিরে প্রবেশদ্বারের খিলানের উপরিভাগের সমগ্র প্রস্থে অসংখ্য বানর ও রাক্ষসসেনার সমাবেশে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যটি জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। এখানে রথারোহী দশাননের দৃপ্তভঙ্গীটিও আকর্ষণীয়। চাঁইপাটের (দাসপুর) 'নায়েকপাড়া'য় রাধাগোবিন্দের 'আটচালা'মন্দিরের (১৭৫৯ খ্রি.) ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থের সর্বাংশে অসংখ্য বানর ও রাক্ষসসেনার সম্মুখ সমর লঙ্কাযুদ্ধেব এক জ্বলন্ত চিত্ররূপে উপস্থাপিত হয়েছে। হাঙরমুখ রথে আরূঢ় রাম ও রাবণ পরস্পর যুদ্ধরত।

আঠার শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে বিশেষভাবে হাওড়া ও হুগলিতে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য একটি নির্দিষ্ট রূপ পায়। রাম-রাবণের সম্মুখসমরে রামের পশ্চাতে লক্ষ্মণ এবং রাবণের সঙ্গে কুম্ভকর্ণকে দেখানো হয়েছে। এরা সকলেই রথে সমাসীন এবং দৃপ্তভঙ্গিতে পরস্পবের দিকে শরবর্ষণ-রত। মূর্তিগুলি আনুভূমিক (horizontal) রেখার দ্বারা বিভাজিত। কালনার (বর্ধমান) লালজীউর 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দিরে (১৮ শতকের মধ্যভাগ) এই দৃশ্যরূপের প্যানেল লক্ষ্য করা যায়। এই ফলকগুলি মন্দিরের সামনের প্রবেশদ্বারের কেন্দ্রীয় প্রস্থের সবটাতেই সন্নিবেশিত হয়েছিল। উনিশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে এই লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য কম প্রাধান্য পেতে থাকে, বিশেষ করে, মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রস্থে (facade), যেখানে পূর্ববর্তী শতকে এইদৃশ্য আবশ্যিকভাবে স্থান পেয়েছিল, সেখানে এই শতকে রাম-রাবণের দৃপ্তভঙ্গী এবং যুদ্ধের সামগ্রিক বিভীষিকার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে শুধুমাত্র ধনু উত্তোলন করতে দেখা যায়। অসংখ্য হস্ত ও মস্তকে শোভিত রাবণকে হাতে তরোয়াল ঘোরাতে দেখা যায় বা কখনও দণ্ড আস্ফালনে নিযুক্ত দেখা যায়। মূর্তিগুলি ক্বচিৎ রথারূঢ় অথবা রথের শুধুমাত্র মকরমুখটি পরিস্ফুট হয়। খুব কমক্ষেত্রেই রথটি ঢাকা বা সম্পূর্ণ অবস্থায় লক্ষ্য করা গেছে। মেদিনীপুরের আলঙ্গিরিতে রঘুনাথের 'নবরত্ন' মন্দিরগাত্রে (খ্রি. ১৮১০) লঙ্কাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ের একটি দৃশ্য হল, রামের হাতে রাবণের কর্তিত মুণ্ড ও মস্তকবিহীন ধরাশায়ী রাবণ। এর নিচের প্যানেলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ দৃশ্যটি রূপায়িত। তার নিচের প্যানেলে সভাসদসহ রাবণ দণ্ডায়মান। এইরূপ দৃশ্য মন্দির 'টেরাকোটা'য় সহজলভ্য নয়। এছাড়া, এই মন্দিরে রামায়ণের অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে জটায়ুর রাবণের রথ গলাধঃকরণের চেষ্টা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বাঁকুড়া জেলার হদলনারায়ণপুরে 'মেজ তরফে'র রাধাদামোদরের যে 'নবরত্ন' মন্দির আছে, তাতে লঙ্কাযুদ্ধের একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় হোল, রাম-রাবণের সম্মুখযুদ্ধের মধ্যবর্তী মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা দুর্গার আবির্ভাব এবং রামের অনুমতিক্রমে দেবীর রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ জ্বলন্তরূপে অঙ্কিত হয়েছে। এই সময়ে মেদিনীপুরের কোন কোন মন্দিরে, যেমন দাসপুরে চক্রবর্তীপরিবারের দধিবামনের পরিত্যক্ত 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৬ খ্রি.) এবং লোয়াদার (ডেবরা থানা)

রাধাকৃষ্ণের পরিত্যক্ত 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (১৮০৫ খ্রি.) কুম্ভকর্ণকে লম্ফ-ঝম্ফ ও বানরভক্ষণে নিযুক্ত দেখা গেছে। দাসপুরের মন্দিরে (দধিবামনের 'পঞ্চরত্ন') কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গদৃশ্যটি আকর্ষণীয়।

প্রায় সব রামায়ণীয় দৃশ্যে নিচের ভিত্তিবেদিসংলগ্ন মন্দিরগাত্রে অথবা প্রবেশদ্বার-খিলানের ওপরের প্রধান প্রস্থগুলিতে বানর-যোদ্ধাদের রাম ও লক্ষ্মণকে সাহায্য করতে দেখা যায়। বানরসেনা ঊর্ধ্বে লাফ দিয়ে রাবণের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে, প্রায়ই রাক্ষস যোদ্ধাদের জড়িয়ে ধরে বা চুল টেনে নাজেহাল করে এবং প্রধান প্রধান রাক্ষস-যোদ্ধাদের চারপাশ ঘিরে ধরে। আবার ক্রীড়াচ্ছলে এককভাবে পরস্পরযুদ্ধে লিপ্ত হয়। বিষ্ণুপুরমন্দির ও পূর্বোক্ত ঝিখিরার দামোদরের 'আটচালা' মন্দিরে এরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন সময় হনূমানকে রাম-রাবণের মাঝখানে মধ্যবর্তী যোদ্ধারূপে দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলার জিবটার (কোতুলপুর থানা) দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরের (১৮৩৩ খ্রি.) একটি প্যানেলে এরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

রামায়ণ-কাহিনীর মধ্যে সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞ বিষয়দুটি বেশ কিছু টেরাকোটা-ফলকে লক্ষ্য করা যায়। আঠার এবং উনিশ শতকের মন্দিরে এই দৃশ্যদুটি সবিস্তারে প্রদর্শিত হয়েছে। পূর্বোক্ত আলঙ্গিরির (মেদিনীপুর) রঘুনাথের 'নবরত্নে'র একটি ফলকে দেখানো হয়েছে, রাম সীতাকে একটি ধর্মীয় অগ্নিকুণ্ডের কাছে নিয়ে এসেছেন। দাসপুরের পূর্বোক্ত মন্দিরে সীতা অগ্নিকুণ্ডের কাছে উপস্থিত হয়েছেন স্পর্শ করার জন্যে। রামচন্দ্র তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান। রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞের একটি চিত্রফলক পূর্বোক্ত সুরুলের লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (১৮৩১ খ্রি.) দেখা যায়। এই মন্দিরের প্রবেশপথের ওপরের খিলানে রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে অশোকবনে 'চেড়ী'গণ-পরিবৃতা সীতা, হনূমানকর্তৃক সীতাকে কিছু দান, অসীম বীরত্বের সঙ্গে হনূমানের রাক্ষসবাহিনীকে আক্রমণ, যুদ্ধের জন্য রাবণের সেনাপতিদের সঙ্গে আলোচনা, রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতা, জাম্বুবান ও অন্যান্য বানরাধিপতির রামসীতার প্রতি আনুগত্যপ্রদর্শনদৃশ্যও বর্তমান। এই সঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকির উপস্থিতিতে মুনিদের দ্বারা অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে রামসীতার রাজ্যাভিষেক বা সিংহাসনারোহণদৃশ্য উনিশ শতকের মন্দির 'টেরাকোটায়' বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, সতের এবং আঠার শতকের মন্দিরেও এই 'মোটিফ'টি অনেক মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়। অনুচর বানর ও যোদ্ধা-পরিবৃত সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতাফলক নিচে ভিত্তিসংলগ্ন মন্দিরগাত্রে এই সময় স্থান পেতে থাকে। বিষ্ণুপুরে শ্যামরায় (১৬৪৩ খ্রি.) ও মদনমোহন মন্দিরে (১৬৯৪ খ্রি.) এগুলি এইভাবে স্থাপিত হয়।

কিন্তু উনিশ শতকে নির্মিত মন্দিরে এই 'বিষয়'টি (motif) এমনকি, লঙ্কাযুদ্ধের চেয়ে অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রবেশখিলানপথের ওপরের প্রধান প্রস্থে এটি গুরুত্বের সঙ্গে সংস্থাপিত হয়। এটি 'রামরাজা' নামে পরিচিতও হয়ে ওঠে। রাধাকৃষ্ণের ছোট ছোট প্রতীক ফলকের মতো রামসীতার রাজ্যাভিষেক ফলকও প্রধান প্যানেলগুলিতে স্থান পায় এ-সময়ে। সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত কালনার (বর্ধমান) প্রতাপেশ্বর দেউলে (১৮৪৯ খ্রি.) এই ধরনের ফলক আমরা লক্ষ্য করেছি। এতে দেখা যায়, রাম-সীতা সিংহাসনে উপবিষ্ট, এঁদের এক পা নিচে দোদুল্যমান বা প্রসারিত, রামচন্দ্রের হস্তে ধনু স্থাপিত। সম্ভবত এই সময়ে হরপার্বতীর যে ফলক প্রচলিত হয়, তার সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্যে এই 'চিহ্ন' স্থাপন করা হয়। এছাড়া মাথার ওপর রাজছত্র স্থাপিত।

বানরেরা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। বালি-দেওয়ানগঞ্জের দামোদরের 'আটচালা' মন্দিরে (১৮২২ খ্রি.) এরূপ ফলক দেখা যায়। কখনও কখনও হনুমানকে সিংহাসনের নিচে নতজানু হয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। শ্রীবাটীর (কাটোয়া, বর্ধমান) ভোলানাথ শিবের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে এরূপ ফলক আছে।

ওপরের আলোচনায় বাংলার মন্দির-'টেরাকোটা'সজ্জায় রামায়ণ-কাহিনী বা রামকথার যে চিত্ররূপ আমরা পাই, তাতে এর জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেকালে অবিভক্ত বাংলায় ও গৌড়ে যে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়, তার সবই টেরাকোটা-অলঙ্করণে সজ্জিত ছিল না। বেশ কিছু মন্দির ছিল নেহাতই সাদামাটা। এই সাদামাটা মন্দিরেও যে দুচারটি অল্প টেরাকোটাফলক সংস্থাপিত হয়, তার মধ্যে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য ও 'রামরাজা'-ফলকই স্থান পায়। অবশ্য, রাধাকৃষ্ণ-ফলকও বহু লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা চৈতন্যোত্তরকালে বাঙালিমনকে ভক্তিরসে গভীরভাবে আপ্লুত করায় টেরাকোটাসজ্জায় এই দুটি 'বস্তু' আদর্শরূপে গৃহীত হয়। এমন কি, গ্রাম-গ্রামান্তরের তুলসীমঞ্চ বা সমাধিমন্দিরে রামলীলা বা কৃষ্ণলীলার ফলক সন্নিবেশিত করা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়। এখানে আমরা জেলাভিত্তিক প্রতিনিধিস্থানীয় আরও কিছু মন্দিরের উল্লেখ করছি যেগুলিতে রামলীলাফলক কমবেশি স্থান পেয়েছিল ঃ

স্থান	মন্দির ও প্রতিষ্ঠাকাল	টেরাকোটা
বাঁকুড়া		
আকুই (থানা ইঁদাস)	রাধাকান্তের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৬১-৬৪)	রামলীলা
কোতুলপুর (কোতুলপুর)	শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৩)	রামকাহিনী
পাত্রসায়ের (পাত্রসায়ের)	রামরঘুবীরের 'দালান' (পাথর)	টেরাকোটা 'রামরাজা'
বামিরা (পাত্রসায়ের)	শিবের 'নবরত্ন' (আ. ১৮ শতকের শেষ)	লঙ্কাযুদ্ধ
বিষ্ণুপুর	শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩)	রামায়ণের বহু কাহিনী
	বসুপাড়ায় শ্রীধরের 'নবরত্ন' (আ. ১৯ শতকের প্রথম ভাগ)	রামায়ণকাহিনী
	কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫)	রামায়ণকাহিনী
	রাধাবিনোদের 'আটচালা' (১৬৫৯)	লঙ্কাযুদ্ধ
মেট্যালা (গঙ্গাজলঘাটী)	লক্ষ্মীনারায়ণের 'পঞ্চরত্ন' (১৭১৮)	লঙ্কাযু
সোনামুখী (সোনামুখী)	শ্রীধরের 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' (১৮৪৫)	রামায়ণকাহিনী
মেদিনীপুর		
আজুড়িয়া (দাসপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (১৮৭১)	রাম-রাবণের যুদ্ধ
আনন্দপুর (কেশপুর)	রঘুনাথবিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৯৩)	ঐ
উত্তরগোবিন্দনগর (দাসপুর)	ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' (১৮৫০)	লক্ষ্মণের শক্তিশেল,

		রামক্রোড়ে লক্ষ্মণ, হনুমানের গন্ধমাদনপর্বত আনয়ন, রাবণের সীতাহরণ ইত্যাদি
কাটান (ঘাটাল)	শ্রীধরের দ্বিতল 'চাঁদনি'	রামরাবণের যুদ্ধ
কানাশোল (কেশপুর)	ঝাড়েশ্বরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৪)	ঐ
কুশপাতা-গোবিন্দপুর(ঘাটাল)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (বিধ্বস্ত, ১৮ শতকের শেষ)	রাক্ষস ও বানরদের মুখোমুখি লড়াইদৃশ্য
কোন্নগর-ঘাটাল	বৃন্দাবনচন্দ্রের 'নবরত্ন' (১৭৯১)	বানরসেনার সেতুবন্ধন আশোকবনে সীতা ও হনুমান; রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ
ক্ষীরপাই (চন্দ্রকোণা)	রাধাদামোদর ও শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (১৮১৭)	রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য বানরসেনা ও রাক্ষসের যুদ্ধ
খোরদা-বিষ্ণুপুর (দাসপুর)	রঘুনাথের (পরিত্যক্ত) 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৮-৪৯)	কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, রামরাবণের যুদ্ধ
চেঁচুয়া-গোবিন্দনগর (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১)	রামরাবণের যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতাহরণ
গোবিন্দপুর (পাঁশকুড়া)	তারকনাথের 'আটচালা' (১৮৮১)	রামরাবণের যুদ্ধ
গোঁসাইবেড় (পাঁশকুড়া)	রাধাবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (আঃ ১৮ শতকের প্রথমার্ধ)	রামরাবণের-যুদ্ধদৃশ্য. বানর ও রাক্ষসসেনার যুদ্ধ, মারীচবধদৃশ্য
গৌরা (দাসপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন'(১৮২৪)	সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, রামরাবণের যুদ্ধ, রামসীতার রাজ্যাভিষেক
ঘোষপুর (কেশপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯ শতক)	রামরাবণের যুদ্ধ
চাউলি (ঘাটাল)	শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮)	রাবণের সীতাহরণ, জটায়ুকর্তৃক রাবণের রথ-আক্রমণ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল

জলচক (পিংলা)	রামচন্দ্রের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১৭)	অশোকবনে সীতা, বানর-সেনা, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, লঙ্কাযুদ্ধ, রামসীতার রাজ্যপ্রাপ্তি
তিলন্তপাড়া (সবং)	জানকীবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১১)	রামায়ণ দৃশ্য
দ্বন্দ্বীপুর (ঘাটাল)	রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ. ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	মায়ামৃগবধ , রামরাবণের যুদ্ধ
দাসপুর	গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬)	রামরাবণের যুদ্ধ
নবগ্রাম (ঘাটাল)	সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (১৭০৯)	রামরাবণের যুদ্ধদৃশ্য
বাগরুই (কেশপুর)	লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' (পরিত্যক্ত, আঃ ১৯ শতকের গোড়ার দিক)	রাম-রাবণের যুদ্ধ
বাদাড় (কেশপুর)	জগন্নাথের 'নবরত্ন' (আ. ১৯ শতকের প্রথমভাগ)	ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন, রামরাবণের যুদ্ধদৃশ্য
ব্রাহ্মণবসান (দাসপুর)	শ্রীধরের 'আটচালা' (১৮ শতকের শেষ)	রামরাবণের যুদ্ধ, রামসীতার অভিষেক
মালঞ্চ (খড়গপুর)	দক্ষিণাকালীর 'আটচালা' (১৭১২)	রামরাবণের যুদ্ধ,
রাধাকান্তপুর (দাসপুর)	গোপীনাথের 'একরত্ন' (আ. ১৮ শতক)	রামের রাজ্যাভিষেক
শ্রীধরপুর (দাসপুর)	রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ. ১৯ শতকের শেষ)	হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ
সৌলান (দাসপুর)	শ্যামসুন্দরের 'পঞ্চরত্ন' (আ. ১৯ শতক)	রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাম-সীতার রাজ্যাভিষেক
হরেকৃষ্ণপুর (পাঁশকুড়া)	দধিবামনের 'নবরত্ন' (আ ১৯ শতক)	রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাম-সীতার রাজ্যাভিষেক
হাওড়া		
অমরাগড়ি (আমতা)	দধিবামনের আটচালা (১৭৬৪)	অশোকবনে সীতা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়ন হরধনুভঙ্গ, সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন, বানরসেনার সেতুবন্ধন

আসণ্ডা (উদয়নারায়ণপুর)	শ্রীধরনাথের 'নবরত্ন' (১৭৮৯)	লঙ্কাযুদ্ধ
কল্যাণপুর (বাগনান)	দামোদরের 'নবরত্ন' (১৭৮৬)	রাম-রাবণের যুদ্ধ
দক্ষিণ মাজু (জগৎবল্লভপুর)	দামোদরের 'আটচালা' (আ. ১৮ শতকের মধ্যভাগ)	রাবণের মূর্তি, কুম্ভকর্ণের বানরভক্ষণ
হুগলি		
আঁটপুর (জাঙ্গীপাড়া)	রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (১৭৮৬)	রামরাবণের যুদ্ধ
ইদলবাটি (গোঘাট)	(পরিত্যক্ত) 'আটচালা' (১৭২৭)	রামায়ণীয় কাহিনী
কামারপুকুর (গোঘাট)	শিবের 'আটচালা' (আঃ ১৮ শতক)	ঐ
দশঘরা (ধনিয়াখালি)	গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৭২৯)	রামায়ণ-কাহিনী, বানর ও রাবণসেনার যুদ্ধ, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ।
বাখরপুর (পুরশুড়া)	'আটচালা' মন্দির	রামায়ণীয় দৃশ্য
বৈকুণ্ঠপুর (ঐ)	শ্রীধরের 'নবরত্ন' ও একটি 'পঞ্চরত্ন'	ঐ
হাটবসন্তপুর (আরামবাগ)	জয়চণ্ডীর 'আটচালা' (১৭৩৪)	ঐ

হুগলি জেলার বহু মন্দিরে টেরাকোটার যে কাজ আছে, তার প্রায় প্রতিটিতেই লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, সীতাহরণ, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ প্রভৃতি দৃশ্যও আছে।

বীরভূম		
ইলামবাজার (ইলামবাজার)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৬)	রাম-রাবণের যুদ্ধ, সিংহাসনে আসীন রামসীতা
গণপুর (মহম্মদবাজার)	বিষ্ণুর 'আটচালা' (১৭৬৯)	ফুলপাথরের ফলকে রাম-রাবণের যুদ্ধ
জয়দেব-কেন্দুলী (ইলামবাজার)	রাধাবিনোদের 'নবরত্ন' (১৬৮৩ বা ১৬৯২)	রামায়ণের বহু ঘটনা— জটায়ুকর্তৃক সীতা-উদ্ধারের চেষ্টা
সুরুল (বোলপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৮শতক)	ত্রিখিলান-প্রবেশপথের ওপরের সব প্রস্থে রামায়ণকাহিনী (পূর্বে আলোচিত
	(পশ্চিমপাড়ায়) শিবের দেউল (১৮৬১)	ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন

উপসংহারে এই কথা বলা যায়, রামায়ণ-'টেরাকোটা' বাংলার মন্দিরের কেবলমাত্র অলঙ্করণ

ছিল না, এগুলি ছিল বাঙালির ভক্তিসিক্ত প্রাণের প্রকাশ। কৃষ্ণভক্তি ও রামভক্তি বাঙালির হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল একসময়। 'টেরাকোটা'-মূর্তির মধ্যে সেটাই বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। 'টেরাকোটা'-মূর্তিগুলির ভাব-ভঙ্গি, আকার, বেশভূষার মধ্যে দেবলীলা কতটা প্রকটিত হয়েছে, তা বিচার্য। কিন্তু মূর্তিগুলি যে সাধারণ শিল্পীদের নিজস্ব কল্পনার এক বিচিত্র সৃষ্টি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. ম্যাককাচ্চন, ডেভিড ঃ বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ, '*পশ্চিমবঙ্গ*', ৭ই জুলাই, ১৯৭২, পৃ. ৬৮২ ('সাহিত্যপত্রে' ১৩৭৭ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত এবং সংক্ষেপে পুনর্মুদ্রিত)

২. রায় নীহাররঞ্জন ঃ *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং, ১৪০২ পৃ. ৬৫২-৬৫৩

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৪

৫. সেন, সুকুমার ঃ *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫ পৃ. ১১২

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

৭. পূর্বোক্ত, পৃ.১১২

৮. হক, জুলেখা ঃ *টেরাকোটা ডেকোরেশন্‌স অভ লেট মিডিভ্যাল বেঙ্গল পোরট্রেয়েল অফ অ্যা সোসাইটি, এসিয়াটিক সোসাইটি* অভ *বাংলাদেশ,* ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৪৯

৯. সেন সুকুমার ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২, হক, জুলেখা ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫১

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

১১. হক, জুলেখা ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

১২. সেন, সুকুমার ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

১৫. সেন, দীনেশচন্দ্র ঃ *বৃহৎবঙ্গ,* ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৯৮০

১৬. হক, জুলেখা ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০; মুখার্জি, অজিতকুমার ঃ *ফোক আর্ট অভ বেঙ্গল,* কলিকাতা ১৯৩৯, চিত্র ২০ ও ২৩

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

১. George, Michell (ed). *Brick Temples of Bengal From The Archives of David Mccutchion,* Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983.

২. Haque, Julekha, *Terracotta Decorations of Late Mediaeval Bangal Por-*

trayal of a Society, Asiatic Society of *Bangla Desh*, Dacca, 1980

৩. কৃত্তিবাস ঃ *রামায়ণ* (সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত), ১৯৭৭

৪. *বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্তবিভাগ, পঃবঃ সরকার, ১৯৭১

৫. *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ*, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পঃবঃ সরকার, ১৯৮৬

৬. *হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ পঃ বঃ সরকার ১৯৭৬

৭. *হুগলী জেলার পুরাকীর্তি*, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পঃবঃ সরকার, ১৯৯৩

৮. *বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্ত বিভাগ, পঃবঃ সরকার, ১৯৭২

৯. *নদীয়ার পুরাকীর্তি* ঃ প্রণব রায় (স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত '*নদীয়া*' গ্রন্থে দীর্ঘ প্রবন্ধ, প্রকাশকাল ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৩)

১৯

মহাভারত-কথা,
কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী

মন্দির-'টেরাকোটা'য় রামায়ণের রামলীলাকাহিনী যতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, মহাভারতের কাহিনী ততটা হয় নি। এই কাহিনীব দৃশ্যচিত্রের স্বল্পতাই তা প্রমাণ করে। কিন্তু কৃষ্ণলীলাদৃশ্য প্রায় প্রতিটি টেরাকোটা-অলংকৃত মন্দিরে দেখা যায়। মহাভারতের মুখ্য চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ জনপ্রিয়তাই এর কারণ। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিবাদ আপামর জনসাধারণের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব ও তাঁর অলৌকিক লীলা সেকালে সকলের মনকে ভক্তিরসসিক্ত করে তোলে। শ্রীচৈতন্যদেব রাধা-কৃষ্ণের অবতাররূপে স্বীকৃত হন। বাংলার ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা এবং অবতার শ্রীচৈতন্যের পূজা প্রবর্তিত হয়। সেযুগের শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশে এই ঘটনা বিশেষ প্রেরণার সৃষ্টি করে। মন্দির 'টেরাকোটা' শিল্পে বৈষ্ণবভক্তিবাদের মূল উৎস রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাদৃশ্য প্রাধান্য বিস্তার করে। এই বিষয়টিকে নিয়ে অসংখ্য টেরাকোটা-ফলক নির্মিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে ভক্তিরসপ্রধান শ্রীমদ্‌ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কৃষ্ণলীলাকাহিনীই বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত থেকে বাল্যলীলার বিভিন্ন উপাখ্যান 'টেরাকোটা'র বিষয়রূপেও গৃহীত হয়। কাশীরাম দাসের মহাভারত-কথাও সেযুগে প্রায় প্রতিগৃহে পঠিত হোত এবং নানা পূজাপার্বণ অনুষ্ঠানে কথকতার মাধ্যমে মহাভারত তথা কৃষ্ণকাহিনী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এসব কারণে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব যুদ্ধকাহিনী এবং মহাভারতের কৃষ্ণমন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পীদের কাছে তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি, যতটা রামায়ণের লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবুও, বেশ কিছু টেরাকোটা-মন্দিরে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সুদৃশ্য ফলক লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে বাংলা দেশের অন্তর্গত দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীউ মন্দিরের (১৭৫২) কুরুক্ষেত্রযুদ্ধদৃশ্য ও ভীষ্মের শরশয্যা জ্বলন্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই মন্দিরে সমান্তরাল খাঁজকাটা শিখরযুক্ত রথে প্রতিস্পর্ধী যোদ্ধৃবৃন্দ পরস্পর যুধ্যমান। চারপাশে পরিবৃত রয়েছে অশ্বারোহী, গজারোহী, ধনুর্ধারী সৈনিকবৃন্দ। (দ্রষ্টব্য, জর্জ মিশেল সম্পাদিত ব্রিক টেম্পলস্ অভ বেঙ্গল, ১৯৮৩, পৃ.১৪৬) বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরেও (১৬৯৪) এই যুদ্ধদৃশ্য রূপায়িত হয়েছে, সেখানে অর্জুনের সারথিরূপী শ্রীকৃষ্ণ এবং ভীষ্মের শরশয্যাদৃশ্য অপূর্ব। শরশয্যাদৃশ্যে ভীষ্মের আদেশে অর্জুন শরের দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করে পবিত্র গঙ্গাজলের ফোয়ারা পিতামহ ভীষ্মের মুখে দিচ্ছেন। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' মন্দিরেও(১৬৫৫) এই দৃশ্য উপস্থিত। এছাড়া, শরশয্যাদৃশ্য আছে ভালিয়ার (হুগলি) রঘুনাথের 'আটচালা' মন্দিরে (১৭৭২)। হদলনারায়ণপুরের (বাঁকুড়া) রাধাদামোদর মন্দিরে (ছোটতরফ) অর্জুনের লক্ষ্যভেদদৃশ্য উপস্থিত। এই মন্দিরেরই সংলগ্ন একটি প্যানেলে শরশয্যা ছাড়াই ভীষ্মকে একটি জলপাত্র দিতে দেখা যায়। ভীষ্মের শরশয্যা-দৃশ্যের একটি আকর্ষণীয় প্যানেল মেদিনীপুর জেলার বাদাড়ের (কেশপুর থানা) জগন্নাথের 'নবরত্ন' মন্দিরে (আ ১৯ শতকের প্রথম ভাগ) এবং আঁটপুরের (হুগলি) রাধাগোবিন্দমন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। এই শরশয্যাদৃশ্যটি আরও বহু মন্দিরে আমরা লক্ষ্য করেছি। অতএব মহাভারতীয় কাহিনীর মধ্যে এই দৃশ্যটি একটি 'মোটিফ'রূপে গৃহীত হয়েছিল টেরাকোটা শিল্পীদের মধ্যে, এটা অনুমান

করা যায়।

ভীষ্মের শরশয্যা বা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের দৃশ্য ছাড়া মহাভারতের অন্যান্য কিছু কিছু ঘটনা মন্দির'টেরাকোটা'য় রূপায়িত হতে দেখা যায়- যেমন, বীরভূম জেলার গণপুরের (মহম্মদবাজার) 'চারচালা' মন্দিরে কৃষ্ণের জন্ম, দুঃশাসনকর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণকর্তৃক দ্রৌপদীকে রক্ষা, সমুদ্রমন্থন প্রভৃতি ঘটনাবলী 'ফুলপাথরে'র ফলকে দেখানো হয়েছে। (দ্রষ্টব্য, দেবকুমার চক্রবর্তী, *বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্তবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭২,পৃ. ৩০)। মেদিনীপুর জেলার বেশ কিছু টেরাকোটা-মন্দিরেও মহাভারতীয় কোন কোন জনপ্রিয় কাহিনীর রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন আনন্দপুরের (কেশপুর) বাগেদের রাধাকৃষ্ণ ও দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (১৮৬৮) টেরাকোটা-সমারোহের মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণদৃশ্যটি রূপায়িত। এছাড়া মহাভারতের কোন কোন কাহিনী অবলম্বনে 'টেরাকোটা'- ফলক দাসপুরে পালেদের লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন (১৭৯১) এবং রাসবিহারী চক্রবর্তী-প্রতিষ্ঠিত দধিবামনের 'পঞ্চরত্নে' (১৮৪৬) লক্ষ্য করা যায়।

মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে চন্দ্রকোণা শহরের মিত্রসেনপুর মহল্লায় শান্তিনাথ শিবের নবরত্নে (১৮২৮) 'টেরাকোটা'-সমারোহের মধ্যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন ও গোপীদের বিলাপদৃশ্যচিত্র পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণপুরে (পাঁশকুড়া) জানাদের দধিবামনের 'নবরত্ন' মন্দিরে (আ. ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, সমুদ্রমন্থন-দৃশ্য রূপায়িত। নদীয়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ মন্দির দিগনগরে রাঘবেশ্বর শিবের 'চারচালা'র বহু টেরাকোটার মধ্যে কৃষ্ণলীলার বহু দৃশ্য উপস্থিত, যেমন কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি।

শেষ-মধ্যযুগের মন্দির'টেরাকোটা'য় মহাভারতের প্রিয় 'বিষয়'রূপে আমরা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণদৃশ্যই বেশি করে লক্ষ্য করি। স্বল্পসংখ্যায় যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের পাশাখেলাও যে 'টেরাকোটা' ফলকে উপস্থিত হয় নি, তা নয়, তবে এরূপ দৃশ্য খুবই বিরল। পক্ষান্তরে, মহাভারতের মুখ্যচরিত্র শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র জীবনলীলা মন্দির 'টেরাকোটা' শিল্পীদের যে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, তার সাক্ষ্য কৃষ্ণলীলাবিষয়ক অজস্র 'টেরাকোটা'ফলক। তবে এই কৃষ্ণলীলার বিচিত্র কাহিনী শ্রীমদ্‌ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই বেশি পাওয়া যায়।

প্রায় প্রতিটি টেরাকোটা-অলংকৃত মন্দিরে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যের সন্নিবেশ যেমন সেকালে প্রথাগত হয়ে দাঁড়ায়, তেমন অসংখ্য কৃষ্ণলীলাকাহিনীর মধ্যে অন্তত দুএকটি কাহিনীদৃশ্য 'টেরাকোটা'-ফলকে আবশ্যিকভাবে স্থান পায়; শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কোন কোন কাহিনী অবলম্বনে বহু টেরাকোটাফলক নির্মিত হয় মন্দির অলংকরণের জন্য। রাধাকৃষ্ণলীলা, রাসলীলা, গোপীবিলাস প্রভৃতির অসংখ্য টেরাকোটাফলক মন্দিরের বহিরঙ্গসজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছিল, বাংলায় 'টেরাকোটা'মন্দিরগুলি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। এমনকি. পাথরের মন্দিরগুলিতেও রাধাকৃষ্ণলীলা-ভাস্কর্য অজস্র পরিমাণে স্থান পায়।

প্রথমত, বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার বহু ফলক আমরা লক্ষ্য করি। এগুলি সামনের দিকে কখনও কার্নিশের নিচে, কখনও বা থামের গায়ে, নিচের দিকের দেওয়ালে অথবা দুপাশের খোপে সাজানো থাকে। বংশীবাদনরত দ্বিভুজ কৃষ্ণকে কখনও এককভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণযুগলকে লক্ষ্য কবা যায়। খ্রি. ষোল শতকের শেষ থেকে সতের শতকে কৃষ্ণপ্যানেল-মন্দির অলংকরণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে কৃষ্ণকে কদম্ববৃক্ষতলে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মণ্ডপে বা মন্দিরে রাধা ও

গোপীদের সঙ্গে বিলাস করতে দেখা যায়। উদাহরণ, গোকর্ণের (মুর্শিদাবাদ) নরসিংহের চারচালা (১৫৮০), বিষ্ণুপুরের মদনমোহন, জোড়বাংলা এবং শ্যামরায়, বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্তবাসুদেব মন্দির (১৬৭৯) এবং জৌগ্রামের (বর্ধমান) রাধাকান্তের মন্দির। আঠার শতকের অনেক মন্দিরে এই দৃশ্য মন্দিরের সামনের কোণের দিকের প্যানেলে, নীচের প্রস্থসমূহে লক্ষ্য করা যায়, আবার কখনও খিলানের ওপরের অংশেও দেখা যায়। কালনার (বর্ধমান) গোপালবাড়ি (১৮ শতকের মধ্যভাগ) এবং কান্তনগরের (পূর্ব দিনাজপুর, বাংলাদেশ) মন্দিরে এ ধরনের টেরাকোটা অনেক দেখা গেছে। উনিশ শতকের অনেক মন্দিরে আবার দেখা যায়, কৃষ্ণ উচ্চ সিংহাসনে আসীন এবং বংশীবাদনরত, গোপীগণ ছত্রধারণ করে তাকিয়ে আছেন। অথবা কৃষ্ণ বংশীবাদনরত অবস্থায় গোপীদের সঙ্গে নৃত্যরত, যাকে 'রাসমণ্ডলচক্র' বলা যায়। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরে (১৬৪৩) এই 'রাসমণ্ডলচক্রে'র সুন্দর দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালের অনেক মন্দিরে এই 'মোটিফ'টি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, যেমন, অনন্তবাসুদেব (বাঁশবেড়িয়া, হুগলি ১৬৭৯) এবং মালঞ্চের (খড়গপুর) শ্যামাঠাকুরাণী বা দক্ষিণাকালীর 'আটচালা' (১৭১২)। কালনার (বর্ধমান) প্রতাপেশ্বর দেউলে (১৮৪৯) বংশীবাদনরত কৃষ্ণকেতাঁর ভক্ত ও সাঙ্গোপাঙ্গ সহ সমান্তরাল প্যানেলে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় লক্ষ্য করা গেছে। সোনামুখীর (বাঁকুড়া) শ্রীধরের— পঞ্চবিংশতিরত্ন মন্দিরেও (১৮৪৫) এরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকেই এ ধরনের প্যানেল দেখা যায় বেশি। কখনও কখনও টেরাকোটা-ফলকে রাধাকৃষ্ণকে একই বাঁশী বাজাতে দেখা যায়। যেমন, আঁটপুরের (হুগলি) রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (১৭৮৬) এবং বড়নগরের (মুর্শিদাবাদ) গঙ্গেশ্বর-মন্দির এবং পূর্বোক্ত সোনামুখীর (বাঁকুড়া) শ্রীধরমন্দির। শ্রীধরমন্দিরের প্যানেলে উল্লেখযোগ্য হল, গাছের কাণ্ডের দুপাশে রাধা ও কৃষ্ণ এবং অন্য একজন গোপীসহ নৃত্যরত। এখানে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীর মোট পাঁচটি ফলকের মধ্যে কেন্দ্রীয় ফলকটিতে বৃক্ষের দুদিকে কৃষ্ণ ও রাধা একই বংশীবাদনরত।

বহু মন্দিরে কৃষ্ণের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান ষড়ভুজমূর্তিকে কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণ বলে মনে করেন (দ্রষ্টব্য, মিশেল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৮)। কিন্তু এটি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এক দিব্যরূপ। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ-রূপে প্রসিদ্ধ। এই দিব্যরূপের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্বাণ, সন্ন্যাসগ্রহণকারী গৌরাঙ্গের দণ্ড ও কমণ্ডলু এবং বংশীবাদনরত কৃষ্ণের সমন্বয় ঘটেছে দেখা যায়। এই ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্তি সেকালে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে, যে দিব্য রূপটি চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত অনুযায়ী শ্রীবাস নবদ্বীপে এবং বাসুদেব সার্বভৌম নীলাচলে দর্শন করেন। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের বেশ বড়ো ফলক বিষ্ণুপুরের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫) এবং শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (১৬৪৩) দেখা যায়। হদলনারায়ণপুরে রাধাদামোদরের 'নবরত্ন' মন্দিরের (মেজতরফ) খিলানের ওপর বিদ্যমান, একদিকে সংকীর্তনদৃশ্য, অন্যদিকে এক মুসলমান কর্মচারীকে গৌরাঙ্গের ষড়ভুজরূপে দর্শনদান খুবই আকর্ষণীয়। বদনগঞ্জের (হুগলি) দামোদরমন্দির এবং আরও বহু মন্দিরে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। মেদিনীপুর জেলার বহু 'টেরাকোটা' মন্দিরে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ অলংকরণের এক অন্যতম 'মোটিফ'রূপে গৃহীত হয়েছিল। যেমন, চন্দ্রকোণার ইলামবাজারে চাবড়ীদের রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৭০), চাউলির (ঘাটাল) শীতলানন্দের 'আটচালা' (১৮০৯), ডিহি বলিহারপুরের (দাসপুর) গোস্বামীদের রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮) তমলুকে বর্গভীমার দেউল, চন্দ্রকোণার দক্ষিণবাজারে বিধ্বস্ত 'জোড়বাংলা' (আঃ ১৭ শতক, পাথরে খোদাই

ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে জানা যায়), পূর্বগোপালপুরে (পাঁশকুড়া) অধিকারীদের রাধাবিনোদের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৭৪) প্রভৃতি। ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের আরও অনেক টেরাকোটা-মূর্তি পশ্চিমবাংলার বহু মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণলীলার মধ্যে টেরাকোটা-অলংকরণে রাধা, কৃষ্ণ ও গোপীদের লীলাবিলাসদৃশ্য প্রায় প্রতিটি টেরাকোটা-মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণলীলার অপরাপর জনপ্রিয় দৃশ্যগুলি হোল, 'নৌকাবিলাস', 'কালীয়দমন', গোপীদের 'বস্ত্রহরণ', 'রাসমণ্ডল' এবং 'নবনারীকুঞ্জর'। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বালকৃষ্ণের ননিভক্ষণ, গোচারণভূমিতে বংশীবাদনরত কৃষ্ণ, পূতনাবধ, যমলার্জুন, প্রভৃতি দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বসুদেবের যমুনাতরণ-দৃশ্যও পাওয়া যায়। আবার অনেক মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন ও গোপীদের বিলাপদৃশ্য অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণলীলাদৃশ্যের ফলকগুলি খিলানের ওপরের প্রস্থে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে, মূর্তিগুলি হয় দণ্ডায়মান, নয় আসীন এবং নৃত্যভঙ্গিমায়। নিদর্শন, দাসপুরের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির (১৭৯১) এবং রাধাকান্তপুরের (দাসপুর) দাসেদের গোপীনাথমন্দির (সংস্কার ১৮৪৪)। কোন কোন প্যানেলে বহু গোপী ও বাদকদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ সিংহাসনারূঢ় অবস্থায় বর্তমান। যেমন, মাংলই- শ্যামবল্লভপুরের (পাঁশকুড়া) রাসমঞ্চ (১৮৫৯), রাধাকান্তপুরের পূর্বোক্ত মন্দির এবং রামগড়ের (বিনপুর, মেদিনীপুর) কালাচাঁদের 'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দির (১৮৫৬)। রাধা ও কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রার দৃশ্যফলকও কোন কোন মন্দিরে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত, বড়নগরের গঙ্গেশ্বরমন্দির। ক্বচিৎ লক্ষ্য করা যায়, রাধা সখীদের সঙ্গে একাকী আসীনা। নিদর্শন, হেতমপুরের গোপাললক্ষ্মী মন্দির, পূর্বোক্ত রামগড়ের মন্দির এবং সুরৎপুরের (দাসপুর) শীতলামন্দির (১৮৪৯)। কখনও বা উপবিষ্টা রাধার সম্মুখে কৃষ্ণ নতজানু-এরূপ দৃশ্যও পাওয়া যায়, যেমন আলঙ্গিরির (এগরা) রঘুনাথমন্দির। রাসলীলাদৃশ্যে একটি কেন্দ্রীয় চক্রে রাধা, কৃষ্ণ ও একজন গোপীর চারপাশে একটি বৃহত্তর চক্র ও তার চারপাশে বৃহত্তম চক্র। শ্যামরায়ের মন্দিরের রাসমণ্ডলচক্রগুলি সেসময় অন্যান্য মন্দিরের ক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছিল, যেমন বাঁশবেড়িয়ায় অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' এবং কান্তনগরের কান্তজীউর 'নবরত্ন'। কানাশোলে (কেশপুর) ঝাড়েশ্বরের 'পঞ্চরত্ন' ইত্যাদি। 'নবনারীকুঞ্জর'দৃশ্যে গোপীগণ নিজেদের হাতির মতো আকার করে থাকে যাতে প্রিয় কৃষ্ণ তাদের ওপর উপবেশন করতে পারে। এটি একটি আকর্ষণীয় 'মোটিফ'রূপে টেরাকোটা-শিল্পীদের কাছে গৃহীত হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রে 'নরনারীকুঞ্জর' কৃষ্ণবিহীন অবস্থায় দেখা গেলেও দুএকটি ক্ষেত্রে এইরূপে হস্তীর ওপর হাওদায় উপবিষ্ট কৃষ্ণকে দেখা গেছে। (আলঙ্গিরির মন্দির, মেদিনীপুর)। অলংকরণের এই 'মোটিফ' বহু মন্দিরে রূপায়িত হয়েছে, যেমন, ঘুড়িষার রঘুনাথ, বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়, মদনমোহন এবং আরও বহু খ্যাত-অখ্যাত মন্দিরে।

কৃষ্ণকাহিনীর বহু দৃশ্যফলক যেমন, কৃষ্ণের জন্ম ও কংসের কারাগার থেকে পলায়ন, যশোদার শিশুবহন, কংসের বহু শিশুহত্যা, গোকুলের বধূদের দ্বারা যমুনার জলে কৃষ্ণের স্নান, পূতনাবধ, তৃণবর্তাসুরবধ, ননিচুরি, শকটাসুরবধ, গোচারণভূমির দৃশ্য, কালীয়দমন, বকাসুরবধ, গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন, দাবাগ্নিভক্ষণ, কৃষ্ণের কদম্ববৃক্ষে আরোহণ ও গোপীদের বস্ত্রহরণ, গোপীগণকর্তৃক দধিভাণ্ডবহন ও কৃষ্ণকে দধিদান, কৃষ্ণের যমুনাতরণ, মথুরা প্রত্যাবর্তন, ষণ্ডাসুর, ঘোটকাসুর ও গজাসুরবধ, মথুরা আগমন, রুক্মিণীর সঙ্গে বিবাহ, কৃষ্ণ-বলরামের মল্লযুদ্ধ, কংসের মৃত্যু, সমুদ্রমন্থন প্রভৃতি অসংখ্য মন্দিরে সজ্জিত হয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর

ও যৌবনের অজস্র কাহিনীচিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। কৃষ্ণের জন্মদৃশ্যের ফলক কোন কোন মন্দিরে খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে, যেমন, সোনামুখীর (বাঁকুড়া) শ্রীধর মন্দির (১৮৪৫), হদলনারায়ণপুরের রাধাদামোদরমন্দির (ছোট তরফ) এখানে দেবকী ও বসুদেব চতুর্ভুজ শিশুকে তুলছেন। প্রহরীদের ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুকে নিয়ে বসুদেবের বহির্গমনদৃশ্যফলক বিষ্ণুপুরের মদনমোহন, আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ, হালিশহরের নন্দকিশোরের আটচালা (আঠার শতক), বড়নগরের গঙ্গেশ্বর মন্দির প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। কালনায় (বর্ধমান) কৃষ্ণচন্দ্রের 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দিরে একটি দৃশ্যফলকে পাওয়া যাচ্ছে, বসুদেব শিশুকৃষ্ণকে যমুনার জল স্পর্শ করাচ্ছেন এবং একটি শৃগাল তাঁকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। আঠার শতকের অনেক মন্দিরের নিচের দিকের প্রস্থে বসুদেব ও কৃষ্ণের মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রমন্দির। হাটসেরান্দির (বীরভূম) বিষ্ণুমন্দিরে খিলানের ওপরের প্যানেলে একটি দৃশ্য বসুদেব শিশুকে যমুনার জল ছোঁয়াচ্ছেন এবং এইসঙ্গে যমুনাতরণে নাগ ফণাবিস্তার করে আছে যা প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীরই দৃশ্যরূপ। এই মন্দিরেই যশোদাকর্তৃক শিশুবদলদৃশ্য এবং ক্রোড়ে স্থাপিত শিশুর যশোদার পরিচর্যা রূপায়িত। কংস বা কংসের সৈনিকদের অন্যান্য শিশুবধদৃশ্যও অনেক ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে, যেমন, দশঘরার (হুগলি) গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৭২৯), ভালিয়ার (আরামবাগ) রঘুনাথের 'আটচালা' (১৭৭২), ওড়গ্রাম ও শ্রীরামপুর এবং বিষ্ণুপুরের বিষ্ণুমন্দিরগুলিতে পাওয়া যায়। শিশু কৃষ্ণকে যমুনার পবিত্র জলপূর্ণ ঘটের দ্বারা স্নান করানো এবং তাকে স্বর্ণপিণ্ডের দ্বারা ওজন- এই দৃশ্যগুলি বদনগঞ্জের (হুগলি) দামোদরের 'নবরত্ন' ও আকুই (বাঁকুড়া) এর রাধাকান্তের 'পঞ্চরত্নে' (১৭৬১-৬৮) লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণকর্তৃক পূতনা ও তৃণবর্তাসুরবধের দৃশ্যফলক মন্দিরগাত্রে লক্ষ্য করা যায়। অনেকসময় পূতনার শয়ান অবস্থায় দীর্ঘাকার দেহ এবং কৃষ্ণকর্তৃক তার স্তনদুগ্ধপানে মৃতা রাক্ষসীর চিত্র কোন কোন মন্দিরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেমন, হদলনারায়ণপুর ছোট তরফের মন্দিরে খিলানের ওপরের অংশের প্যানেলে এই দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। ঝিকিরার (হাওড়া) দামোদরের 'আটচালা' মন্দিরে (১৭৬৯) তৃণবর্তাসুরকে একটি চক্রাকারে দেখানো হয়েছে এবং বালকৃষ্ণ সেই চক্রের মধ্যে থেকে সেই অসুরকে সংহার করছেন। সতের-আঠার শতকের অনেক মন্দিরে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। ননিচুরি, শকটাসুরবধ ও যমলার্জুনভঙ্গদৃশ্যগুলিও বেশ কিছু মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। তার মধ্যে ননিভক্ষণ কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অসংখ্য মন্দিরে এই দৃশ্যফলক লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, বিষ্ণুপুর ও গুপ্তিপাড়ার পূর্বোক্ত 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলিতে। যশোদার ননিমন্থনকালে বালক কৃষ্ণের ননিপাত্রে হস্তপ্রবেশ, কোন কোন সময় দেখা যায় যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ননি গ্রহণ করতে সাহায্য করছেন। এমনকি তাকে ননি খাওয়াচ্ছেন। এ দৃশ্য ক্ষীরপাই এর (চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর) খড়কেশ্বর শিবের 'আটচালা' (১৮৬১) এবং আরও অনেক উনিশ শতকের মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের রাখালবেশ বা গোচারণভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ দৃশ্যে গোরুর পাল ও রাখালদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায়। অনেক রাখালকে শিঙ্গাবাদনরত দেখা যায়, কখনও বা রাখালেরা তাদের খাবারের ভাঁড় একটি লাঠিতে বেঁধে কাঁধে ফেলে নিয়ে যাচ্ছে দেখা যায়। এই রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের টেরাকোটা-ফলক কৃষ্ণলীলার এক জনপ্রিয় 'মোটিফ'-রূপে গৃহীত হয়। তাই কৃষ্ণলীলার মধ্যে এই মোটিফটি বহু স্থানেই পাওয়া যায়। যেমন, বিষ্ণুপুর, বাঁশবেড়িয়া, গুপ্তিপাড়া, আঁটপুরের পূর্বোক্ত মন্দিরসমূহে এবং দাসপুরের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে এই দৃশ্য পাওয়া

যায়। এই সঙ্গে কৃষ্ণের গরুচরানো ও গোদোহনদৃশ্যও দাসপুরের পূর্বোক্ত মন্দিরে এবং ইলামবাজারের (বীরভূম) লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দিরে (১৮৪৬) লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরে গোষ্ঠলীলা, গিরিগোবর্ধনধারণ ও রাসলীলাদৃশ্যও পাওয়া যায়।

কালীয়দমন, বকাসুর ও অঘাসুরবধদৃশ্যও অনেক মন্দিরে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কালীয়দমন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কারণ, এই 'মোটিফ'টি কৃষ্ণলীলাদৃশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ছিল। বিশেষ করে, আঠার-উনিশ শতকের বহু মন্দিরে দেখা যায়, কৃষ্ণ কালীয় অসুরের ফণার ওপর নৃত্যরত অবস্থায় তাকে সংহার করছেন। ঐ অসুরের স্ত্রীগণ কৃষ্ণের চারপাশ বেষ্টন করে আছে। নাগিনীদের স্ত্রীদেহ সুস্পষ্ট। এই দৃশ্য সুরৎপুরের (দাসপুর) শীতলার 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (১৮৪৯) লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরে কৃষ্ণলীলার অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে গোষ্ঠলীলা, গোপীদের বস্ত্রহরণ এবং নৌকাবিলাসদৃশ্যও আকর্ষণীয়। এখানে অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে কমলেকামিনী বা গণেশজননী, রামায়ণকাহিনীর মধ্যে দশানন, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ-দৃশ্যগুলিও খুবই আকর্ষণীয়। মন্দিরটি দাসপুর থানার একটি গণ্ডগ্রামে অবস্থিত হলেও টেরাকোটার উৎকর্ষ ও প্রাচুর্যের জন্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বকাসুর ও অঘাসুরের বধদৃশ্যের কিছু টেরাকোটা-ফলক কোন কোন মন্দিরে দেখা গেছে, যেমন পূর্বোক্ত আকুই এর মন্দির। কৃষ্ণের নিকট চতুর্মুখ ব্রহ্মার নতিস্বীকারের দৃশ্যফলকও কোন কোন মন্দিরে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা রাখালবালক ও গাভীগুলিকে একটি গুহায় লুকিয়ে রাখায় কৃষ্ণ বংশীবাদনের দ্বারা তাঁকে মোহিত করেন। ব্রহ্মা সেগুলিকে মুক্ত করে দেন। এই দৃশ্য বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়, মদনমোহন ও বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। আঁটপুর, ভালিয়া, দশঘরা, কালনার কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বোক্ত মন্দিরগুলিতে রাখাল ও গোরুগুলিকে একটি বাক্সের মতো পাত্রে আটকে রাখতে দেখা যায় তাদের মাথাগুলি শুধু বেরিয়ে থাকায়।

কৃষ্ণলীলার অপর একটি জনপ্রিয় 'মোটিফ' শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন-উত্তোলন। গোবর্ধন পর্বতকে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে রক্ষা করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের হাতে পর্বতটিকে তুলে ধরেন যাতে পর্বতের অধিবাসী বিভিন্ন প্রাণী, রাখাল ও গোপীগণ রক্ষা পান। কখনও কখনও শিব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা আবির্ভূত হয়েছেন, যেমন, জিবটার(বাঁকুড়া) দামোদরের পঞ্চরত্ন (বাঁকুড়া)। আরও বহু স্থানে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণলীলাদৃশ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হোল, গোপীদের বস্ত্রহরণ। এ দৃশ্য প্রায় সব 'টেরাকোটা' মন্দিরেই উপস্থিত। টেরাকোটা-শিল্পীদের কাছে এই 'মোটিফ'টি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই দৃশ্যে কৃষ্ণকে কদম্ববৃক্ষে আরূঢ় হয়ে বংশীবাদনরত দেখা যায় এবং স্নানরতা গোপীদের বস্ত্রগুলি কদম্বের ডালে ঝুলন্ত দেখা যায়। কোন কোন টেরাকোটা প্যানেলে লক্ষ্য করা গেছে যে, গোপীরা জলে নগ্না অবস্থায় দণ্ডায়মান, এমনকি, তারা বস্ত্র উদ্ধারের জন্য গাছে উঠতেও উদ্যত। দাসপুর থানার কোটালপুরে শ্রীধরের 'পঞ্চরত্নে' (১৮১৫) এই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। অপর একটি জনপ্রিয় 'মোটিফ' গোপীদের দধিভাণ্ডবহন ও কৃষ্ণকে দধিপ্রদান। বহু 'টেরাকোটা'-মন্দিরে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-প্রত্যাবর্তন, মথুরায় প্রবেশ ও রুক্মিণীর বিবাহদৃশ্যগুলি কমবেশি দেখা যায়। তবে সর্বপ্রথমটি জনপ্রিয় মোটিফরূপে গৃহীত হয় এবং অজস্র মন্দিরে এই দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করি। নৌকাবিলাসদৃশ্যের প্যানেলে কৃষ্ণ, রাধা এবং গোপীগণকে একটি দীর্ঘাকার বক্র নৌকায়

আসীন দেখা যায়। নৌচালক বা নাবিককেও দাঁড়হাতে দেখা যায়। কোন কোন সময় কৃষ্ণও স্বয়ং নাবিকরূপে অবস্থান করেন। আনন্দপুরের হেটেলাপাড়ার (কেশপুর) সরকারদের রঘুনাথবিষ্ণুর 'পঞ্চরত্নে' (১৮৯৩) কান্তনগরের (বাংলাদেশ) পূর্বোক্ত কান্তজীউর মন্দিরে এবং আরও অসংখ্য মন্দিরে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মথুরাগমনদৃশ্যে দেখা যায়, কৃষ্ণ ও বলরাম রথে সমাসীন, রথের ঘোড়াগুলি পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান, অক্রূরকে সারথিরূপে দেখা যাচ্ছে, গোপীরা ক্রন্দনরতা, মূর্ছিতা এবং এমনকি, রথ আটকাবার জন্যে রথের সামনে নিজেদের নিঃক্ষিপ্ত করছে, তাদের মাথা পিছনের দিকে এমনভাবে নোয়ানো যে চুল মাটি স্পর্শ করছে, গোপীগণ কাতর ক্রন্দনে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। কোন সময় কৃষ্ণবিরহে গভীর শোকে তাদের সাথীদের হস্তযুগলে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। এইরূপ করুণদৃশ্য উনিশ শতকের মন্দিরে বেশি পাওয়া যায়।

টেরাকোটা-ফলকে কৃষ্ণের অরিষ্টবধ, কেশিবধ ও কুবলয়পীড়বধ দৃশ্যগুলিও কোন কোন মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। কংস অরিষ্ট নামক ষাঁড়, কেশী নামক ঘোড়া ও কুবলয়পীড় নামক হস্তীকে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রাপথে তাঁকে বধ করার জন্য পাঠায়। কৃষ্ণ অরিষ্টের শিং ধরে তাকে সংহার করেন। পক্ষান্তরে, কেশী পিছনের পায়ে ভর দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলে কৃষ্ণ তাকেও বধ করেন এবং কুবলয়পীড় নামক হস্তীর শুঁড় ধরে তাকেও হত্যা করেন। জোড়বাংলা (বিষ্ণুপুর) মন্দিরের একটি প্যানেলে এবং গুপ্তিপাড়ার পূর্বোক্ত মন্দিরে, ঝিখিরার (হাওড়া) দামোদরের 'আটচালা' (১৭৬৯) এবং কালনার কৃষ্ণচন্দ্রের 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দিরে এই দৃশ্যগুলি লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া, আরও বহু স্থানে এগুলি পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমনদৃশ্যে মথুরার পুরনারীগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান মালা দিয়ে বা কপালে টীকা দিয়ে। হদলনারায়ণপুরে মেজ তরফের মন্দিরে দেখা যায় মথুরা পৌঁছে কৃষ্ণ তাঁর পায়ের নূপুর ঠিক করছেন। বাদকবৃন্দ উপস্থিত। কখনও কখনও কোন টেরাকোটা-প্যানেলে রুক্মিণীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহদৃশ্যও লক্ষ্য করার মতো।

এর পর কৃষ্ণের কংসের প্রাসাদ দখলের অভিযানদৃশ্যে কংসের প্রহরীদের সঙ্গে কৃষ্ণবলরামের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দশঘরা (হুগলি) ও কান্তনগরের মন্দিরে বহু জনসমাগমের সম্মুখে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর চরম আকর্ষণীয় দৃশ্য কংসবধ। আঠার শতকের মন্দিরে ভিত্তিভূমিসংলগ্ন দেওয়ালের প্যানেলে কংসবধদৃশ্য এবং কখনও কখনও খিলানের উপরিভাগের প্রস্থে এই দৃশ্য পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত, আকুই ও সোনামুখীর মন্দির এবং বড়নগরের 'চারবাংলা'-গ্রুপের উত্তরদিকের 'বাংলা'। এই দৃশ্যে কৃষ্ণ কংসকে তার সিংহাসন থেকে চুল ধরে টেনে নামাচ্ছেন। এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় দৃপ্তভাবটি পরিস্ফুটিত, উনিশ শতকের মন্দিরে শুধুমাত্র কেশাকর্ষণের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত, পূর্বোক্ত সোনামুখীর (বাঁকুড়া) শ্রীধরমন্দির।

কৃষ্ণকাহিনীর মধ্যে 'সমুদ্রমন্থন' দৃশ্য খুবই কৌতূহলোদ্দীপক এবং এটি বহু মন্দিরে অন্যতম 'মোটিফ' রূপে গৃহীত হয়। এই দৃশ্যে একটি মহানাগকে মেরুপর্বতগাত্রে বেষ্টন করে দেব ও দানবেরা সমুদ্রকে মন্থন করছে দেখা যায়। 'টেরাকোটা'-ফলকে মহাসমুদ্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে তরঙ্গের মতো কতগুলি আঁকাবাঁকা রেখায়। সমুদ্রমন্থনের সময় কৃষ্ণের আবির্ভাব, কখনও বা উলম্ব মেরুদণ্ডের উপরিভাগে চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখা যায়, যেমন, বাগরুইএ (কেশপুর) লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' (আ. ১৯ শতক), কানাশোলে (কেশপুর) ঝাড়েশ্বরের 'পঞ্চরত্ন', জিবটার (বাঁকুড়া)

দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৩)। জিবটা, মাংলই (পাঁশকুড়া) এবং রামগড়ের (বিনপুর) মন্দিরে সমুদ্রমন্থনের সময় ব্রহ্মা ও ইন্দ্রকে সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যাতে অসুরদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য বোঝা যায়। যেমন, ইন্দ্র তাঁর বাহন ঐরাবতের ওপর আসীন।

মন্দির 'টেরাকোটা'-অলংকরণে কৃষ্ণলীলাদৃশ্যের বিশাল ব্যাপ্তির সঙ্গে অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তিও স্থান পেয়েছিল, যেমন, বিষ্ণু, বিষ্ণুর দশাবতার, শিব, দুর্গা, কালী, চণ্ডী এবং অপরাপর দেবদেবী। যদিও মন্দির'টেরাকোটা'য় রাম ও কৃষ্ণের প্রাধান্য, তথাপি বিষ্ণুর দশাবতার ও শিবকাহিনীর বহু টেরাকোটাফলক অসংখ্য মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। তবে রামায়ণ, মহাভারতের কিছু দৃশ্য এবং মহাভারতের এবং বিভিন্ন পুরাণের কৃষ্ণকাহিনীদৃশ্যরূপই টেরাকোটা-সজ্জায় মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল। শিবকাহিনীর মধ্যে হরপার্বতীর বিবাহ জনপ্রিয় 'মোটিফ'রূপে গৃহীত হয়। কোন কোন সময় এককভাবে বৃষভারূঢ় শিব ও নন্দী-ভৃঙ্গীর মূর্তি স্থান পেয়েছে। আবার, দুর্গা ও কালীর মূর্তি এককভাবে প্রায় প্রতিটি 'টেরাকোটা' মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে, দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি এবং অনেক ক্ষেত্রে কার্তিকগণেশাদিসহ দশভুজা মূর্তি মন্দিরসজ্জায় একটি জনপ্রিয় 'মোটিফ' রূপে গৃহীত হয়। কোন কোন মন্দিরে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীকাহিনীর বহু উপাখ্যান রূপায়িত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিলন্তপাড়ার (সবং, মেদিনীপুর) মাইতিদের জানকীবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরের (১৮১১) উল্লেখ করা যেতে পারে। কালীর একটি অপূর্ব মূর্তিফলক আঁটপুরে (হুগলি) রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে।

বিষ্ণু ও দশাবতার-মূর্তিতে প্রথমে চতুর্ভুজ বিষ্ণু তাঁর বাহন উড্ডীয়মান গরুড়ের পৃষ্ঠে আসীন, যেমন, বিষ্ণুপুরের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫), গোকর্ণের (মুর্শিদাবাদ) নরসিংহের 'চারচালা' (১৫৯০), গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (আঠার শতকের শেষ), বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্তবাসুদেব (১৬৭৯), বড়নগরের (মুর্শিদাবাদ) 'চারবাংলা'-গ্রূপের উত্তরদিকের মন্দির। পূর্বোক্ত সোনামুখীর মন্দিরে গরুড় বিষ্ণুর পদদ্বয় ধারণ করে আছে দেখা যায়। বিষ্ণুর চারটি বাহুতে প্রথাগতভাবে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম স্থাপিত। বিষ্ণুর অপর একটি প্রসিদ্ধ রূপ অনন্তশায়ী। এই দৃশ্যে বিষ্ণু কুণ্ডলীপাকানো বহু ফণাযুক্ত অনন্তনাগের ওপর শয়ান, লক্ষ্মী পদসেবারতা। মহাসমুদ্র চিহ্নিত হয়েছে মৎস্য, কচ্ছপ এবং জলের তরঙ্গ রেখার দ্বারা। উদাহরণ, আঁটপুর, ঘুড়িষা, সোনামুখী প্রভৃতি আরও অনেক স্থানের মন্দির।

বিষ্ণুর দশাবতারের মূর্তিফলকগুলি বহু মন্দিরের সামনের দুপাশে উল্লম্ব খোপগুলিতে সাজানো হোত, অনেক সময় কার্নিশের নিচে ধনুকাকৃতি অংশেও বসানো থাকত। সতের শতক থেকে দশাবতার ফলকগুলি দেওয়াল-প্যানেলে বসানো হতে থাকে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি— বিষ্ণুর এই দশ অবতারের মধ্যে 'বুদ্ধ'-অবতারের বদলে জগন্নাথমূর্তি স্থাপিত হয়েছে দেখা যায় এবং এই প্রথাই প্রায় সারা বাংলার মন্দিরে প্রচলিত হয়। মৎস্য ও কূর্মমূর্তিতে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর অর্ধমূর্তিও দেখা যায়। বিষ্ণুর বরাহমূর্তি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল একসময়। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়-মন্দিরে (জোড়বাংলা) জলমগ্না পৃথ্বীদেবীকে বরাহাবতার বিষ্ণুর উদ্ধারদৃশ্যটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিষ্ণুর নৃসিংহমূর্তিও বেশ জনপ্রিয়। আঠার-উনিশ শতকের মন্দিরে বামনমূর্তিগুলিকে পরিব্রাজকবেশী ছত্রধারীরূপে দেখানো হয়েছিল। হলধারী বলরাম এবং পরশুধৃত পরশুরাম, ধনুর্বাণের দ্বারা রামচন্দ্র ও অশ্বারূঢ় অবস্থায় কল্কি অবতারকে দেখা যায়। প্রায়শই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার টেরাকোটাফলক লক্ষ্য করা যায়।

একক শিবমূর্তি, হরপার্বতীর বিবাহ, হরপার্বতীমূর্তি টেরাকোটাসজ্জারূপে বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়-মন্দিরে চতুর্ভুজ শিবমূর্তির হাতে ডুগডুগি, মস্তকে জটাজাল ও সর্পসঙ্কুল, অন্যান্য হস্তে বিভিন্ন অস্ত্র। পরবর্তীকালের অনেক মন্দিরে শিব দ্বিভুজ, শিঙ্গাবাদনরত, সঙ্গে একটি ডুগডুগি, ত্রিশূল ও মড়ার মাথার খুলি। বাঁশবেড়িয়া, ঘুড়িষা (রঘুনাথ মন্দির), গুপ্তিপাড়া এবং বড়নগরে পশ্চিম দিকের 'চারবাংলা'য় শিব ও পার্বতী উভয়ে বৃষারূঢ়। লাওদার (দাসপুর) বাঁকারায়ের 'নবরত্নে' (১৮০১), বালির দামোদরমন্দিরে এবং চন্দ্রকোণার গাজিপুরের শিবমন্দিরে পার্বতীর সঙ্গে শিব সিংহাসনে আসীন। নন্দীও উপস্থিত। সুরুলের (বীরভূম) একটি দেউলমন্দিরে (শিখর খাঁজকাটা) শিবের হাতে বাদ্যযন্ত্র এবং তিনি পার্বতীর সঙ্গে সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁর সান্নিধ্যে আছেন বরাহরূপী বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কালী, গঙ্গা এবং নন্দী। বিষ্ণুপুরের শ্রীধরমন্দিরে নৃত্যরত শিবের একটি অপূর্ব নটরাজ মূর্তি এবং শিব-পার্বতীর বিবাহদৃশ্য আকর্ষণীয়।

'মন্দির' টেরাকোটা'য় চণ্ডী, দুর্গা ও কালীমূর্তি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তার সাক্ষ্য রয়েছে অজস্র ফলকে। প্রাচীন একটি দুর্গামূর্তির ফলক লক্ষ্য করা যায় ষোল শতকের শেষ দিকে নির্মিত গোকর্ণের নৃসিংহ-মন্দিরে (১৫৯০)। এখানে একটি ফলকে চতুর্ভুজা দুর্গার হাতে বর্শা, দেবী অসুরের কেশ আকর্ষণ করছেন, দেবীর বাহন সিংহের দ্বারা অসুর আক্রান্ত। সতের শতকে নির্মিত যেসব দুর্গামূর্তিফলক লক্ষ্য করা যায়, তাতে দেখা যায় দেবী দশভুজা সিংহের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা, বিভিন্ন হাতে বহু অস্ত্র-শস্ত্র ঢাল, বর্শা, খড়গ প্রভৃতি। নিদর্শন, বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা, ঘুড়িষার রঘুনাথ, হরিপালের রাধাগোবিন্দ প্রভৃতি। আঠার শতকের মন্দিরে, বিশেষ করে, হাওড়া ও হুগলি জেলায় যেসব মন্দির নির্মিত হয়, তার দুর্গা-'টেরাকোটা'ফলকে একটি বিশালাকার সিংহের ওপর দেবী অধিষ্ঠিতা. দেবী বর্শার সাহায্যে অসুরের বক্ষ বিদারণরতা এবং অসুর সিংহের দ্বারা আক্রান্ত। উনিশ শতকের কোন কোন মন্দিরে দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাকে রাম ও রাবণের সম্মুখসমরে উভয়ের মধ্যস্থলে আবির্ভূতা হতে দেখা যায়। এটি লঙ্কাযুদ্ধের প্রাককালে অকালবোধনে রামচন্দ্রের সম্মুখে দেবীর আবির্ভাবের দ্যোতক। এরূপ অতুলনীয় 'টেরাকোটা'-প্যানেল কালনার প্রতাপেশ্বরদেউলে (১৮৪৯) লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের কোন কোন মন্দিরে অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গার টেরাকোটা-ফলক পাওয়া যায়, যেমন মাংলইএ (পাঁশকুড়া) মাইতিদের রাধাদামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (আ. ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)।

শ্যামরায় ও কেষ্টরায়ের মন্দিরে এবং ঘুড়িষায় মুণ্ডমালাবিভূষিতা চতুর্ভুজা কালীমূর্তির টেরাকোটাফলক পাওয়া যায়। দেবীর হস্তে খড়গ এবং নৃমুণ্ড এবং তিনি শিবের ওপর দণ্ডায়মানা। আঁটপুরের পূর্বোক্ত কালী ছাড়া দশঘরার গোপীনাথ এবং কান্তনগরের মন্দিরে এবং আরও বহু স্থানে 'টেরাকোটা' কালী মন্দিরসজ্জার জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল।

চণ্ডীকে দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে কাল্পনিক কিছু কিছু টেরাকোটাফলক নির্মিত হলেও লৌকিক চণ্ডীর 'কমলেকামিনী' রূপটি টেরাকোটা-শিল্পীদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যার অজস্র নিদর্শন মন্দিরগুলিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সমগ্র বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রাপথে সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় পদ্মের ওপর উপবিষ্টা 'কমলে-কামিনী' মূর্তিই চণ্ডীরূপে উভয়কে রক্ষা করেছিলেন। সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় ধনপতি ও শ্রীমন্ত উভয়েই তাঁদের সিংহলযাত্রাকালে যে দেবী চণ্ডীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি একটি হস্তীকে একদিকে উদ্গীরণ ও নিগীরণ করছিলেন। এরূপ অলৌকিক

দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে উভয়ে বিস্ময়বিমূঢ় হন। কালক্রমে এই কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলগানের মাধ্যমে বাঙালিচিত্তে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। টেরাকোটাশিল্পীরা এটিকে 'মোটিফ'রূপে গ্রহণ করেন। সতের শতকের শেষ থেকে আঠার-উনিশ শতকের অজস্র 'টেরাকোটা'-মন্দিরে 'কমলেকামিনী' 'মোটিফ'টি খিলানের ওপরের প্রস্থে, কখনও বা, স্তম্ভগাত্রে বা নিচের দেওয়ালে স্থান পেয়েছিল। কমলে-কামিনীর অসংখ্য 'টেরাকোটা'-ফলক লৌকিক চণ্ডীর জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। তবে বেশির ভাগ টেরাকোটায় দেবীকে গণেশজননীরূপে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিভুজা এক দেবী পদ্মের ওপর উপবিষ্টা এবং তাঁর ক্রোড়ে গণেশমূর্তি। জরতী-বেশী দেবী চণ্ডীকে আবার শ্রীলঙ্কার রাজা শালবাহনকর্তৃক প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত শ্রীমন্তকে মশানে জহল্লাদের হাত থেকে রক্ষা করতে দেখা গেছে। এরূপ টেরাকোটাও কোন কোন মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছিল, যেমন, সুরৎপুরের (দাসপুর) শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৯)।

চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনীতে যে গোধিকারূপিণী চণ্ডীর কথা আছে, তার অল্পকিছু 'টেরাকোটা'ফলকও লক্ষ্য করা গেছে কোন কোন মন্দিরে। যদিও তা সংখ্যায় নগণ্য। লৌকিক অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে মনসা, শীতলা, পঞ্চানন্দ, ষষ্ঠী প্রভৃতির টেরাকোটাফলক নেই বললেই চলে। শীতলা ও ষষ্ঠীর টেরাকোটাফলক ক্বচিৎ লক্ষ্য করা যায়, যেমন, বালীদেওয়ানগঞ্জের দামোদরের 'আটচালা'য় (১৮২২) ষষ্ঠীর টেরাকোটা-প্যানেল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে দেবী বিড়ালবাহনা এবং শিশুদের দ্বারা পরিবেষ্টিতা। মকরবাহনা গঙ্গার কিছু কিছু টেরাকোটা লক্ষ্য করা গেছে অনেক মন্দিরে, যেমন, আঁটপুর, বড়নগরের 'চারবাংলা'র উত্তরদিকের মন্দির এবং আরও আনেক মন্দিরে।

সহায়ক গ্রন্থ

Michell, George (ed.) : *Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983.

২০
সমাজচিত্র

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও পৌরাণিক দেবদেবীর লীলা অবলম্বনে অসংখ্য টেরাকোটা-ফলক বা প্রস্তরভাস্কর্যের সমাবেশ ছাড়াও মন্দির-অলংকরণে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে আছে শুধু মানুষ ও তার জীবনধারার বিচিত্র অভিব্যক্তি। দেবদেবী ও তাঁদের লীলামাহাত্ম্য এখানে অনুপস্থিত। মধ্যযুগের মন্দিরটেরাকোটা-শিল্পে দেবতার লীলা ও মানুষের জীবনধারা দুটিরই পাশাপাশি সহাবস্থান, বিশেষ করে, দেবস্থান মন্দিরে, এমন ঘটনা অন্যত্র কোথাও বিরল। একদিকে যেমন নানা ধর্মসম্প্রদায়ের দেবদেবীর পাশাপাশি অবস্থান সেকালের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচায়ক, (বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, তান্ত্রিক সব দেবদেবীরই মূর্তিফলক মন্দির অলংকরণে পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী আলোচনায় তা পরিস্ফুট।), অন্যদিকে বাস্তব জীবনের বহুমুখী চিত্রও মন্দিরের দেওয়ালে খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে আছে দৈনন্দিন জীবন, আমোদপ্রমোদ— যেমন শিকার, ভ্রমণ, নৌযাত্রা, দরবারগৃহ বা সভাগৃহ, নাচগানবাজনা, অপরাধীর শাস্তিবিধান, বন্যজীবজন্তু, গৃহপালিত প্রাণী, পাখী, সাধুসন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, বিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালা, লতাপাতাফুল এবং সর্বোপরি 'মিথুনদৃশ্য'। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক সরল সহজ জীবনের প্রতিচ্ছবি বহু টেরাকোটাফলকে লক্ষ্য করা যায়। এগুলিতে শুধুমাত্র সমকালীন সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়নি, এতে চিরন্তন মানবজীবনের এক স্পর্শকাতর চিত্রও পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বাংলার মন্দির-টেরাকোটায় তাই বিষয়বস্তু ও তার চরিত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে দেখা যায়। প্রাক-মুসলিম যুগে প্রাচীন বাংলায় কিছু কিছু স্থানের যেসব 'টেরাকোটা'-ফলক পাওয়া গেছে, যেমন পাহাড়পুর, মহাস্থান ও ময়নামতীতে (বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবাংলার চন্দ্রকেতুগড় (উত্তর চব্বিশপরগনা) ও কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) প্রভৃতি স্থানে, সেগুলির সঙ্গে একালের টেরাকোটা-ফলকগুলির তুলনা করলে এই চরিত্র বোঝা যাবে। একথা সত্য, ময়নামতী ও পাহাড়পুরের বৃহদাকাব কিছু কিছু টেরাকোটা-ফলকে সেকালের সমাজের কিছু চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, যেমন যষ্ঠিধৃত দণ্ডায়মান দ্বারী, কুস্তিক-সরত ও নানা শরীরক্রিয়ারত মল্লবীর, গৃহপ্রবেশরতা নারী, কূপে জল আহরণরতা ও জলপাত্রবাহিনী নারী, স্ত্রী ও পুরুষযোদ্ধা, রথারোহী ধনুর্ধর, দীর্ঘশ্মশ্রু ও ঈষৎ নতপৃষ্ঠ ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক, লাঙ্গলধারী কৃষক, মৎস্যবাহিনী বা মৎস্যকর্তনরতা নারী, নৃত্য ও সঙ্গীতরতা নারী, শিকারবাহী ব্যাধ, গীতবাদ্যরত পুরুষ, ধর্মাচরণরত ব্রাহ্মণ, অস্থিচর্মসার, ন্যাঙ্গটপরিহিত ও স্কন্ধদেশে প্রলম্বিত যষ্ঠির দুইপ্রান্তে পুটুলি ঝুলানো পথিক সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক, মোরগ ও ষাঁড়ের লড়াই, নানা কৌতুককর ঘটনা প্রভৃতি। দেবদেবীমূর্তিও বেশ কিছু ফলকে পাওয়া যায় যেমন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ এবং বেশিসংখ্যায় শিবের মূর্তি। এইসব ফলকে 'বৌদ্ধ দেবদেবী, বিশেষভাবে মহাযান-বজ্রযানবর্গের কয়েকটি দেবদেবীও আছেন, যেমন বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা। কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যাত দেবদেবীর সংখ্যা প্রায় নগণ্য বলিলেও চলে'। (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, 'দেজ', ২য় সংস্করণ, ১৪০২, পৃ ৬৫৩।)

পাহাড়পুর (রাজশাহি) ও ময়নামতীর (কুমিল্লা) ফলকগুলি সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন ঃ 'এই ফলকগুলির গড়নে মার্জিত স্পর্শের, সূক্ষ্ম রুচির বা গভীর ব্যঞ্জনার পরিচয় সামান্যই, কিন্তু লক্ষণীয়, ইহাদের সাবলীল গতিচ্ছন্দ, ইহাদের স্বচ্ছন্দপ্রাণময়তা, জীব ও মানবদেহের

গঠন, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতন দৃষ্টি, জড়জগতের ও দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিসম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষবোধ।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ,পৃ ৬৫৩)। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর এই টেরাকোটাশিল্প খ্রিস্টীয় অষ্টম- নবম শতকের বলে ঐতিহাসিকদের মত। এ শিল্প সুপ্রাচীন কাল থেকেই ছিল। বাংলায় সমগ্র গাঙ্গেয় ভূমি জুড়েই ছিল এবং 'গ্রামে গ্রাম্য জনসাধারণের লোকায়ত জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।' নীহাররঞ্জন রায়ের মতে 'সমসাময়িক বাঙলার লোকায়ত সামাজিক জীবনের যথার্থ বস্তুময় স্পন্দিত পরিচয় এই ফলকগুলিতে যতটা পাওয়া যায়, প্রস্তর প্রতিমাশিল্পে ততটা কিছুতেই নয়। রাজপ্রাসাদ ও অভিজাতচক্রের পরিধি হইতে দূরে সাধারণ মানুষের নিত্যকোলাহলময় জীবনধারা কিভাবে প্রবাহিত হইত, সমসাময়িক ব্যক্তি ও সামাজিক মানসের কী ছিল প্রকৃতি তাহার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞান এই মৃৎফলকগুলি।' (রায়, পৃ ৬৫৩)।

খ্রি. অষ্টম-নবম শতকের এই টেরাকোটাগুলির পর বহু শতাব্দী পরে টেরাকোটা-শিল্পের অভ্যুদয় ঘটল ষোল শতকের শেষ ও সতের শতক থেকে। বাংলার নদনদীর পলিমাটিতে গড়া ইঁট দিয়ে তৈরি মন্দিরগুলিতে 'টেরাকোটা' ফুল, লতাপাতা, দেবদেবীর মূর্তি ও সামাজিক বিষয় নিয়ে দৃশ্যফলকমন্দিরসজ্জায় ক্রমে বিপুলপরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকল। কিন্তু এগুলির মধ্যে 'লোকায়ত' ভাবটাই পরিস্ফুট হোল বেশি, কি দেবদেবীমূর্তিতে, কি সামাজিক দৃশ্যফলকে। অনুমান করা যায়, খ্রি: পনের শতক থেকে এই টেরাকোটা শিল্পের নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু প্রারম্ভিক পর্বে মূর্তির বদলে ছিল ফুল-লতাপাতার কাজ বা নকশা, জ্যামিতিক রেখাবিন্যাস প্রভৃতি। মসজিদের মূর্তিবিহীন অলংকরণের অনুকরণে বা সেকালের রাজশক্তির কঠোর অনুশাসনের দ্বারা কতকটা বাধ্য হয়েই মন্দিরসজ্জায় মূর্তিবিন্যাস ততটা হয়নি। পরে এই নিয়ম যখন অনেকটা শিথিল হোল, তখন মূর্তির সন্নিবেশ দেখা দিতে লাগল মন্দিরগাত্রে। এর মূলে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তি-আন্দোলন অনেকটা কাজ করেছিল, সেকথা আগে বলা হয়েছে।

'টেরাকোটা' শিল্পের এই পুনরভ্যুদয়ে যে নতুন মাত্রা যুক্ত হোল, তার ফলে সবরকম গোঁড়ামিমুক্ত এক নতুন শিল্প জন্মলাভ করল। সামাজিক জীবনদর্পণের মধ্যে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন চরিত্র ছাড়াও প্যানেলে এক সম্পূর্ণ দৃশ্যচিত্রের সন্নিবেশ করা হতে থাকল। সামাজিক জীবনচিত্রগুলির ফলক সাধারণত প্রায় সব 'টেরাকোটা'-মন্দিরের নিচের ভিত্তিপ্রস্থে, কখনও বা থামের গায়ে সন্নিবেশিতহল। খিলান-প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থগুলিতে বা কার্নিশের নিচে বা সামনের দেওয়ালের দুপাশে দেবদেবীর মূর্তি ও লীলাদৃশ্য স্থাপিত হল। প্যানেলের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের এক একটি ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, যেমন শিকারদৃশ্য। এখানে শিকারী সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তি বা রাজাজমিদারের পালকি বা ঘোড়ায় করে বনের দিকে যাত্রা, সঙ্গে লোকলস্কর এবং হাতি-ঘোড়া, পালকি বা ঝাম্পানের নিচে শিকারী কুকুর। শিকারীর ঘোড়ার বা হাতির ওপর থেকে বাঘ বা অন্য কোন বন্য জন্তুকে বা হরিণকে বন্দুক বা বর্শার দ্বারা আক্রমণ, শিকারী কুকুরেরও আক্রমণ, কখনও বা ব্যাঘ্র বা হিংস্র পশুর কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ, ব্যাঘ্র বা হরিণ শিকারশেষে লাঠিতে ঝুলিয়ে নিয়ে প্রত্যাবর্তন-দৃশ্যগুলি প্যানেলে পর পর সন্নিবেশিত দেখা যায়। যুদ্ধযাত্রারও এইরূপ দৃশ্য ফলকগুলিতেপ্রত্যক্ষ করা যায়। পূর্ব আলোচিত দেবদেবীলীলাদৃশ্যও এরূপে 'প্যানেলে' দেখানো হয়েছে যাতে কোন বিশেষ ঘটনা সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়, যদিও তা করতে হয় অনেকটা সংক্ষেপে। কিন্তু মূল ভাবটি বোঝার ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় না। মধ্যযুগের এই 'টেরাকোটা'-শিল্পকে অনেকে লোকশিল্পরূপে আখ্যাত করেছেন। মূর্তিগুলির অঙ্গবিন্যাস, মুখের ভাব, পোষাক-

আসাক, চলার গতি, দেহসৌষ্ঠব সবই সাধারণ লোকজীবনের প্রতিচ্ছবি। এর মধ্যে যত্নপূর্বক পরিশীলন বা শাস্ত্রীয় নিয়মের ধরাবাঁধা সীমাবদ্ধতা নেই। একারণে, প্রাচীন বাংলার পূর্বোক্ত লোকায়ত 'টেরাকোটা' শিল্পের সঙ্গে এগুলির কিছুটা তুলনা করা যায়। তবে আকার-আয়তনে, রেখাবিন্যাসে এবং নব পরিকল্পনায় এগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

শ্রীচৈতন্যপরবর্তী যুগে বাংলায় যে অসংখ্য 'টেরাকোটা'-মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে বহু মন্দিরে উপরিউক্ত সামাজিক চিত্রের অনেক ফলক লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের 'টেরাকোটা'-মন্দিরগুলির মধ্যে মদনমোহন, কেষ্টরায় ও শ্যামরায়ের মন্দির উল্লেখযোগ্য। মদনমোহন মন্দিরের নীচের প্যানেলে পশুপাখির মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ড্রাগনের মতো একটি প্রাণীর মূর্তিও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া আছে সংকীর্তনদল ও বাদ্যকরের 'টেরাকোটা' ফলক। শ্যামরায়ের মন্দিরে হাতির ওপর হাওদায় উপবিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পালকিবাহকের পালকিবহন ও ভিতরে রমণী প্রভৃতি দৃশ্য। কেষ্টরায়ের মন্দিরে বাদ্যকর, নর্তকীর মূর্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। শ্যামরায় ও কেষ্টরায়মন্দিরে শিকারদৃশ্যের পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়- যেমন, রাজা বা জমিদারের শিকারযাত্রায় তাঁর পতাকাবাহক, তরবারীহস্তে পদযাত্রীর দল, তীরধনুক নিয়ে শিকারীগণ, কখনও বা তারা হাতি, ঘোড়া এবং উটের ওপর আরূঢ়, শিকার অর্থাৎ বাঘ, সিংহ, ষাঁড় বা অন্য কোন বন্য জন্তুকে লাঠি দিয়ে আক্রমণ, নিহত জন্তুকে দণ্ডে ঝুলন্ত অবস্থায় নিয়ে গমন। এর মধ্যে আছে বন্য হরিণ, কৃষ্ণসার, সিংহ, বন্যশূকর, এমনকি হাতিও আছে।

সতের-আঠার শতকের মন্দিরেই শিকারদৃশ্য বেশি দেখা যায়। এই দৃশ্যে প্রায়ই দেখা যায়, হাতি এবং ঘোড়ার পিঠে থেকে শিকারী বন্যজন্তুকে বর্শা বিদ্ধ করছে। অশ্বারোহী শিকারী, ধনুর্ধারী, কুকুর ও যোদ্ধা ঢাল ও তরোয়াল নিয়ে শিকারকে আক্রমণোদ্যত। ষোল এবং সতের শতকের মন্দিরের তলার দেওয়ালে (বেস ফ্রিজ) এই ধরনের দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে, যেমন বৈদ্যপুরের (বর্ধমান) কৃষ্ণমন্দির, মেল্লকের (হাওড়া) মদনগোপালের আটচালা (১৬৫১), হরিপুরগড়ের রসিকরায়ের মন্দির।

বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেবের (১৬৭৯) মন্দিরে বিষ্ণুপুর মন্দিরের পূর্বোক্ত দৃশ্যগুলির সঙ্গে আর একটি দৃশ্য যুক্ত হয়েছে যেখানে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়োনো অশ্বের উপর আরোহী বন্যজন্তুকে আক্রমণ করছে, কখনও বা পদাতি ঘোড়াগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সতের শতকের অপরাপর মন্দিরেও এইরূপ শিকারদৃশ্য দেখা যায়, কোন কোন দৃশ্যে আবার খালিহাতে সিংহ বা অন্য কোন পশুর সঙ্গে যুদ্ধ-রত দেখা যায়, যেমন, গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রমন্দির, কোথাও বা কৃষ্ণসার হরিণ বা বন্যশূকরকে ছুরিকাবিদ্ধ করতে দেখা যায় অথবা শিকারকে ফাঁদে আটকাতে দেখা যায়, যেমন, জৌগ্রামের রাধাকান্ত মন্দির। শিকার ধরার সময় ধামসা বাজানোরও সেসময় নিয়ম ছিল।

আঠার শতকের মন্দিরে শিকারদৃশ্যে হাতি-ঘোড়ার সঙ্গে উটও উপস্থিত। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে ঘোড়া ও তার আরোহী শিকারকে আক্রমণোদ্যত। শিকারীরা উট ও হাতির পিঠ থেকে শিঙ্গা বাজায় এবং নীচে পদাতিরা ঢাল ও তরোয়াল নিয়ে আক্রমণোদ্যত। অমরাগড়ির (হাওড়া) রাধামাধবের 'আটচালা'য় (১৭৬৪) এই দৃশ্য ও বাদ্যভাণ্ডসহ পদাতিকেও দেখা যায়। এদের পরনে সাহেবী পোষাক। বড়নগরের (মুর্শিদাবাদ) 'চারবাংলা'র উত্তরদিকের মন্দিরে বাঘ ও সিংহ মানুষকে আক্রমণ করছে। মালঞ্চের দক্ষিণাকালীর 'আটচালা' মন্দিরে (১৭১২) দেখা যায়, নিহত

শিকারকে দণ্ডে ঝোলানো হয়েছে। উনিশ শতকের মন্দিরেও এইরূপ দৃশ্য দেখা গেলেও শিকারীর সঙ্গে কুকুর প্রায়ই দেখা যায়। ধনুর্ধারী, অশ্বারোহীদের পশুর প্রতি বর্শা নিঃক্ষেপ করতে দেখা যায়। বন্দুকধারী শিকারীর দল এবং হাতীর ওপর আরোহীকেও দেখা যায়। দশঘরার (হুগলি) গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৭২৯) এবং কেন্দুলির (বীরভূম) রাধাবিনোদের 'নবরত্ন' মন্দিরে (১৬৮৩) প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থে শিকারদৃশ্যের মধ্যে দেখা যায়, শিকারীরা হাতি বা ঘোড়ার ওপর বসে ঢাল ও খাঁড়া নিয়ে, আর পশুরা লড়াই করছে। আঠার শতকের কিছু মন্দিরের দুই কোণ থেকে লম্বায়মান উদ্‌গত 'টেরাকোটা'-গুলিতে আরোহীরা ওপরে ওপরে সমাসীন হয়ে সিংহ বা অন্য কোন অদ্ভুত বন্যপশু বা প্রাণীকে বর্শার দ্বারা আক্রমণোদ্যত। দৃষ্টান্ত, আসগুার শ্রীধর, আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ, গুড়াপের নন্দদুলাল, কেঁদুলির রাধামাধব, কালনার কৃষ্ণচন্দ্র ও লালজীউর মন্দিরগুলি।

শিকারদৃশ্য ছাড়া নৌদৃশ্যের (বোটিং সীন) বহু টেরাকোটাফলক লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে হার্মাদ রণতরী বা পর্তুগীজ জলদস্যুদের জলযুদ্ধ, নৌকোভ্রমণ ও শ্রীকৃষ্ণের নৌকোবিলাসদৃশ্যগুলি উল্লেখযোগ্য। সেকালে বিচিত্র ধরনের নৌকোয় কৃৎকৌশলের বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিও পূর্বোক্ত শিকারদৃশ্যের মতো নিচের দিকে সন্নিবেশিত হত। ষোল শতকের প্রথমার্ধে পর্তুগীজরা এদেশে আসে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে। পরে তাদের মধ্যে অনেকে জলদস্যুরূপে উপকূলবর্তী এলাকায় লুটপাট করত। এ নিয়ে বহু টেরাকোটাফলক তৈরি হয়েছিল। এছাড়া সেকালে বাঙালি সদাগরেরাও বিচিত্র ধরনের নৌকো নিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করত, যেমন ধনপতি সদাগর, চাঁদসদাগর। সেকালের নৌকোর আকার- বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। যুরোপীয় যুদ্ধজাহাজগুলি ছিল বিশালাকার, দ্বিতল, বন্দুকধারী ফিরিঙ্গি সৈনিকে ও নানা অস্ত্রসম্ভারে পূর্ণ, ওপরে উড্ডীয়মান পতাকা, জাহাজকক্ষের জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকা মানুষেব মুখগুলো দেখা যায়। দেশজ বক্রাকৃতি সুন্দব ময়ূরপঙ্খী নৌকোর প্রতিচ্ছবিও 'টেরাকোটা'ফলকে রূপায়িত হয়েছে। কান্তনগরের মন্দিরে দীর্ঘ বক্রাকৃতি নৌকোর ওপর একটি কক্ষে হুঁকাপানরত এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং পাশের কক্ষে মহিলা ও কয়েকজন পরিচারক, সেকালে অভিজাতদের নৌকোভ্রমণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উনিশ শতকের 'টেরাকোটা'-মন্দিরে উপরি উক্ত দুই শ্রেণীর নৌকো লক্ষ্য করা গেলেও আগের তুলনায় সেগুলি অনেকটা সাধারণ, আড়ম্বরবর্জিত, যেমন আমরা নদীনালায় এখন নৌকো দেখে থাকি। দৃষ্টান্ত, শ্রীবাটীর (কাটোয়া, বর্ধমান) দেউল মন্দিব। এরূপ সহজ সরল নৌকো বহু মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। সতের শতক থেকে উনিশ-শতকের মধ্যে নির্মিত অসংখ্য মন্দিরে নৌদৃশ্য খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

উপরি উক্ত দৃশ্যফলকগুলি ছাড়া সমকালীন সমাজের বিভিন্ন মানুষের প্রতিচ্ছবি ও অন্যান্য ঘটনার দৃশ্যাবলীও আমরা পাই। সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষ, যেমন যোদ্ধা, অশ্বারোহী, নর্তক, বাদ্যকার, পরিচারিকা, সাধুসন্ন্যাসী, মোহান্ত, লিঙ্গপূজা। যুদ্ধদৃশ্যের অনেক 'টেরাকোটা'-ফলক সতের শতকের 'টেরাকোটা' শিল্পে স্থান পেয়েছিল। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় ও কেষ্টরায়ের মন্দিরে এই দৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। যোদ্ধাদের বক্রাকৃতি খড়গ ও ঢাল, তীর-ধনু, দণ্ড ও বর্শা, কেউ কেউ শিঙ্গাবাদনরত, এমন কি, কেউ কেউ পতাকা বহন করে চলেছে।

বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব, দিগনগরের (নদীয়া) রাঘবেশ্বর এবং ধুড়িখার (বীরভূম) রঘুনাথমন্দিরে এই দৃশ্য দেখা গেছে। এছাড়া, মেদিনীপুরের অনেক মন্দিরে, যেমন দাসপুরের

সিংহদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬), রাধাকান্তপুরের দাসেদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (আ ১৮ শতক) মন্দিরে এই দৃশ্য আছে। মিথুনদৃশ্যের প্রচুর 'টেরাকোটা' ফলকও লক্ষ্য করা গেছে। যুদ্ধদৃশ্যে কখনও কখনও পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত, মকরমুখ রথে ধনুর্ধারীরা আরূঢ়, সেই রথ সজোরে বিশালকায় অশ্ব টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেমন, বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরে দেখা যায়। কিছু কিছু যোদ্ধাদের পরনে অদ্ভুত ধরনের আলখাল্লা দেখা যায়, যেমন বাঁশবেড়িয়া ও আরও বহু স্থানের মন্দিরে। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায় (জোড়বাংলা) এবং দশঘরার গোপীনাথ মন্দিরের প্রবেশপথ-খিলানের ওপরে এবং কার্নিশের নিচে বক্রাকৃতি প্যানেলে যোদ্ধাদের মূর্তি বসানো আছে। আঠার-উনিশ শতকের টেরাকোটায় এইরূপ যোদ্ধৃমূর্তি ও যুদ্ধদৃশ্য পাওয়া যায়, তাদের হাতে বন্দুক এবং কখনও কখনও তাদের পরনে সাহেবী পোশাক। যেমন, আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ, রামগড়ের (মেদিনীপুর) কালাচাঁদ, শ্রীবাটীর (বর্ধমান) ভোলানাথ শিব এবং শঙ্করশিবের মন্দির। অথবা কখনও বা তাদের পরনে মুসলমানদের মতো আঁটোসাঁটো পোযাক ও মাথায় টুপি বা ফেজ। যেমন, বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের মন্দির। কোনসময় য়ুরোপীয় কামান দাগার দৃশ্য যা সচরাচর দেখা যায় না যেমন, আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ ও শ্রীরামপুরের বিষ্ণুর আটচালা মন্দির। ক্বচিৎ ফিরিঙ্গির হাতে বন্দী কোন ভারতীয়কে দেখা যায়। নিদর্শন সোনামুখীর (বাঁকুড়া) শ্রীধরমন্দির (১৮৪৫)।

প্রায়ই দেখা যায়, যোদ্ধারা ঘোড়ায় বা হাতিতে চড়ে তীরধনুক নিয়ে অবস্থান করে। দৃষ্টান্ত, বৈদ্যপুরের কৃষ্ণমন্দির। গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রমন্দিরে ও বিষ্ণুপুরের মন্দিরে দেখা যায়, যোদ্ধারা হাতি ও ঘোড়া ছাড়াও অদ্ভুত আকারের সিংহের ওপর আসীন। আঠার শতকের অনেক মন্দিরে যুদ্ধের বাহনরূপে হাতি ও ঘোড়ার সঙ্গে উটও উপস্থিত হয়েছে, যেমন, দাঁইহাটের (বর্ধমান) শিবমন্দির, বড়নগরের 'চারবাংলা'-গ্রূপের মন্দির প্রভৃতি। মেদিনীপুরেরও বহু মন্দিরে এই উট দেখা যায়, যেমন, রাধাকান্তপুরের (দাসপুর) দাসেদের গোপীনাথমন্দির, চেঁচুয়া-গোবিন্দনগরের (দাসপুব) রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১) এবং আরও অনেক মন্দির। কখনও বা যোদ্ধারা তেজী ঘোড়াকে বাগে আনতে ব্যস্ত। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়-মন্দির। কোন কোন মন্দিরে যোদ্ধৃবাহিনীর যুদ্ধযাত্রার পূর্ণদৃশ্য উপস্থিত হয়েছে দেখা যায়। মেদিনীপুরেব সতের-আঠাব শতকের অনেক মন্দিরে নিচের দিকে ভিত্তিবেদির সংলগ্ন দেওয়ালে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আঁটোসাঁটোভাবে পোশাক পরা যোদ্ধৃবৃন্দ, সামনে পতাকাবাহী যোদ্ধা, পিছনে হস্তী ও অশ্বারোহী সৈনিক অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত এবং হাতি বা ঘোড়ার ওপর উপবিষ্ট রাজা বা জমিদার। দৃষ্টান্ত, রাধাকান্তপুরের দাসেদের গোপীনাথ মন্দির (আ আঠার শতকের প্রথম দিক, সংস্কারকাল ১৮৪৪)। এই মন্দিরের 'ভিত্তিবেদিসংলগ্ন প্যানেলের এক স্থানে সেকালের এক প্রবল প্রতাপশালী রাজার যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য অভিনব। অনুমান হয়, সতের শতকের শেষদিকে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে শোভা সিংহের সেই ঐতিহাসিক অভিযান এতে রূপায়িত।' (মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ, প্রণব রায়, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ. ২০১-২০২)। এই মন্দিরে নদী বা সমুদ্রবক্ষে রণতরী ও নৌযুদ্ধ এবং শিকারদৃশ্যও বর্তমান। দাসপুর অঞ্চলের বহু 'টেরাকোটা'-মন্দিরে এইসব দৃশ্য উপস্থিত।

যুদ্ধাভিযান ও যুদ্ধদৃশ্য ছাড়া নর্তক ও বাদ্যকরদেরও অনেক 'টেরাকোটা'ফলক লক্ষ্য করা গেছে। সতের শতকের বহু মন্দিরের সামনের দিকের অনেকটা এদের মূর্তিফলক দিয়ে সাজানো হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়-মন্দিরের সামনের দিকে নিচের অংশে, থামের গায়ে এবং দেওয়ালে এই মূর্তিগুলি লক্ষ্য করা যায়, এমনকি আবৃত বারান্দার দেওয়াল, গর্ভগৃহ এবং ভেতরের ছাদেও

এগুলি লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরে বেশির ভাগই নর্তকী, পদযুগল সমেত ও দুইবাহু মস্তকের ওপর বিস্তৃত। বাদ্যকরদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই আছে। তারা ঢোল, করতাল ও অন্যান্য যন্ত্রসহ বর্তমান। এই ধরনের নর্তক ও বাদ্যকরদের দল সারিবদ্ধভাবে সতের শতকের অনেক মন্দিরে দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের পূর্বোক্ত 'টেরাকোটা'মন্দিরগুলিতে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। মালঞ্চের (খড়গপুর) দক্ষিণাকালীর 'আটচালা' মন্দিরে (১৭১২) বাদ্যকরদের লম্বা 'রামশিঙ্গা' বাজাতে দেখা যায়। আবার, উনিশ শতকের কোন কোন মন্দিরে তাদের হাতে বেহালা দেখা যায়। এ-সময়ের মন্দিরের কোন কোনটিতে সাহেবী পোষাকে য়ুরোপীয় বাদ্যভাণ্ড ('ড্রাম') বাজাতে দেখা যায়। সুপুরের (বীরভূম, বোলপুর) কোন কোন মন্দিরে বাদ্যভাণ্ড-বাদক ও অন্যান্য বাদকদের বহু মূর্তিফলক খিলান-প্রবেশপথের ওপরে বর্তমান।

সাধুসন্ন্যাসী ও বৃদ্ধব্যক্তিদের বহু মূর্তিফলক মন্দিরগাত্রে লক্ষ্য করা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিচের দিকে, দেওয়ালে ও স্তম্ভগাত্রে এদের মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। আঠার শতকের অনেক মন্দিরে শ্মশ্রুধারী 'নাঙ্গা' সাধুদের ভিক্ষার জন্য হস্তপ্রসারিত (উদাহরণ, বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব, কখনও প্রণামরত, কখনও বা মালাজপরত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁরা অনেক সময় একটি লাঠির ওপর ভর দিয়ে অথবা একপায়ে দণ্ডায়মান। তাদের দেহ থেকে অনেক সময় ছুঁচালো মুখ লম্বা গোঁজের মতো বস্তু প্রসারিত হয়েছে-সম্ভবত তা বিভূতি বা জ্যোতির স্ফুরণ। কোন কোন সময় তাঁরা লিঙ্গপূজারত। আঠার শতকের অনেক মন্দিরে সাধু-সন্ন্যাসীর 'মোটিফ' বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোন সময় তাঁদের দেখা যায় আহার প্রস্তুত করতে, কোনসময় তাঁরা বাদ্যভাণ্ড বাদনরত অথবা বীণা বাদনরত। হুগলির আঁটপুর ও দশঘরার মন্দিরে এই দৃশ্য দেখা যায়, অথবা তাঁরা পরস্পর আলিঙ্গনরত বা একপায়ে দণ্ডায়মান, কোন সময় ভাঙ্ বা সিদ্ধি প্রস্তুতে ব্যস্ত। উদাহরণ, মালঞ্চের পূর্বোক্ত মন্দির। দাসপুরে দধিবামনের 'পঞ্চরত্নে' (পরিত্যক্ত, ১৮৪৬) ঋষিগণ একটি আশ্রমে অগ্নিকুণ্ডের চারপাশ পরিবেষ্টন ক'রে আছেন। এটি যজ্ঞের দৃশ্য।

'টেরাকোটা'য় পরিচারিকাদের দৃশ্যও আকর্ষণীয়। তারা কোন সময় খাদ্যপ্রস্তুত, কোন সময় মাথায় খাদ্যভাণ্ডবহন অথবা কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার পরিচর্যারত। হুগলির প্রসিদ্ধ বিশালাক্ষী মন্দিরে মৎস্যকর্তনরত এক পরিচারিকার মূর্তি খুবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আঁটপুরের পূর্বোক্ত মন্দিরে মহিলাদের পাশাখেলায় লিপ্ত দেখা যায়, কখনও বা তারা সুতোকাটায় লিপ্ত। কোন কোন 'টেরাকোটা'ফলকের প্যানেলে জানালার ধারে বসা ('বাতায়নবর্তিনী') বা উন্মুক্ত জানালার বাইরে মাথা বাড়িয়ে বসে থাকতে মহিলাদের দেখা যায়। (কালনার প্রতাপেশ্বর দেউল, ১৮৪৯), আনন্দপুরের (কেশপুর, মেদিনীপুর) রঘুনাথবিষ্ণুর মন্দির, চন্দ্রকোণা-গাজিপুরের শিবমন্দির। নদীয়ার দিগনগরের রাঘবেশ্বরমন্দিরে (১৬৬৯) ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা নগ্না স্ত্রীমূর্তি ও তার পাশে একটি হরিণকে একটি গাছের তলে দেখা যায়। এটিকে কেউ কেউ প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত 'শালভঞ্জিকা' মূর্তি মনে করেন। এই 'মোটিফ'টি পরবর্তীকালের আরও অনেক মন্দিরে দেখা যায়, যেমন পূর্বোক্ত হদলনারায়ণপুরে 'মেজ তরফে'র রাধাদামোদর মন্দির, কল্যাণপুরের (বাগনান, হাওড়া) দামোদরের 'নবরত্ন' মন্দির (১৭৮৬)। অবশ্য, শেষোক্তটিতে স্ত্রীমূর্তি বস্ত্রালংকাবসজ্জিতা। বহু 'টেরাকোটা'ফলকে মহিলাদের চুল আঁছড়ানো, চুলবাঁধা, চন্দন ও সিন্দূর দ্বারা অলংকরণ জনপ্রিয় বস্তুরূপে গৃহীত হয়।

'মিথুনদৃশ্য' মন্দির-'টেরাকোটা'য় এক আবশ্যকীয় 'মোটিফ'রূপে গৃহীত হয়েছিল। প্রায়

প্রতিটি 'টেরাকোটা'-অলংকৃত মন্দিরে এই দৃশ্য কোন-না-কোনভাবে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে, আঠার ও উনিশ শতকের মন্দিরগুলিতে এই দৃশ্য বেশি লক্ষ্য করা যায়। আসণ্ডার (হাওড়া) শ্রীধরের নবরত্ন (১৭৮৯), আঁটপুরের রাধাগোবিন্দের আটচালা (১৭৮৬), দশঘরার বিশ্বাসদের গোপীনাথের পঞ্চরত্ন (১৭২৯), কল্যাণপুরের (হাওড়া) দামোদরের 'নবরত্ন' (১৭৮৬), লাওদার (দাসপুর) বাঁকারায়ের নবরত্ন (১৮০১), লোয়াদার (ডেবরা, মেদিনীপুর) গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৮০৫) প্রভৃতি মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। 'মিথুনদৃশ্যে'র মধ্যে তপস্বীলীলাদৃশ্যও পাওয়া যায়, যেমন, আঁটপুরের রাধাগোবিন্দমন্দিরে দেখা যায় যে, একজন নৃত্যরত নগ্ন তপস্বীকে একটি স্ত্রীলোক আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। আবার, দিগনগরের (নদীয়া) রাঘবেশ্বরের 'চারচালা' মন্দিরে (১৬৬৯) লক্ষ্য করা যায়, এক সুন্দরী স্ত্রীকে একজন তপস্বী জপমালা প্রদান করছে। পূর্বোক্ত লাওদার (দাসপুর) মন্দিরে পশুমৈথুনদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী-পুরুষের আলিঙ্গনদৃশ্য প্রায় মন্দিরেই পাওয়া যায়। তপস্বীলীলার মধ্যে নারীপুরুষের মিলনদৃশ্য বা ভৈরবভৈরবীর যৌন মিলন অনেক মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়। সেকালে মঠের মোহান্ত বা কোন কোন তপস্বীর সঙ্গে কোন নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে যে যৌনসম্পর্ক গড়ে উঠত, 'টেরাকোটা'ফলকে যেন তারই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

মন্দিরে 'মিথুনদৃশ্যে'র উপস্থিতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। স্ত্রী-পুরুষের যৌনমিলনদৃশ্যের সন্নিবেশ ওড়িশার মন্দিরগুলিতে, বিশেষ করে, জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর এবং কোণার্কের মন্দিরে সর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ঐ মন্দিরগুলি খ্রিস্টীয় একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়। ওড়িশার আরও বহু মন্দিরে ঐ মিথুনদৃশ্য আছে। বাংলার মধ্যযুগের 'টেরাকোটা' মন্দিরগুলিতে এর প্রভাব খুব বেশি করে পড়ে, বিশেষ করে, চৈতন্যোত্তর যুগের ইট ও পাথরের মন্দিরগুলিতে যার অজস্র নিদর্শন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, দুই চব্বিশপরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বীরভূমের মন্দিরগুলিতে পাওয়া যায়। 'মিথুনদৃশ্য'কে পারিভাষিক শব্দে 'মণি' বলা হয়। মন্দিরের বহিরঙ্গে এর সন্নিবেশের ফলে বজ্রপাত প্রভৃতির ভয় থাকে না। এই শাস্ত্রীয় নির্দেশের ফলে 'মণি'র সন্নিবেশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতে থাকে 'টেরাকোটা'-অলংকরণে বা প্রস্তরভাস্কর্যে।

'টেরাকোটা'শিল্পে আঠার শতক থেকে য়ুরোপীয়দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, সতেরো শতকের কোন কোন মন্দিরে পোর্তুগীজ জলদস্যুদের নৌযুদ্ধ টেরাকোটা-অলংকরণে প্রতিফলিত হতে থাকে। আঠার শতকে য়ুরোপীয়দের মধ্যে, বিশেষ করে, ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ, ডেনীয় ও পোর্তুগীজরা এদেশের নানা স্থানে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য কুঠি তৈরি ক'রে বসবাস করতে থাকে। নদীতীরবর্তী এলাকায় বহু কুঠি সেকালে তৈরি হয়েছিল। সেখানে তারা রেশম ও নীলকুঠি তৈরি করে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে থাকে। এদেশের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে কিছু কিছু দেশীয় আচার-আচরণ তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আবার ইংরেজশাসনে বহু ফিরিঙ্গি সৈন্য মোতায়েন থাকত নানা স্থানে। বহু টেরাকোটা-ফলকে আমরা লক্ষ্য করেছি হুঁকোপানরত অনেক সাহেবকে, যাদের আরামকেদারার নিচে থাকত পোষা কুকুর। তারা এদেশীয় নারীদের সঙ্গে যৌনসংসর্গ করত। এরও বহু ফলক আমরা পেয়েছি। বন্দুকধারী গোরাসৈন্যের দল কুচকাওয়াজরত, তাদের পরণে বিলেতি পোশাক ও জুতো। কোন কোন 'টেরাকোটা'ফলকের প্যানেলে দেখা গেছে, সাহেব রেল ইঞ্জিন চালাচ্ছে, যেমন আনন্দপুরের (কেশপুর, মেদিনীপুর), হেটলাপাড়ায় সরকারদের রঘুনাথ বিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৯৩)। হেতমপুরের (দুবরাজপুর, বীরভূম)

চন্দ্রনাথ শিবমন্দিরে সপরিবারে সাহেবদের মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। শ্রীবাটীর (কাটোয়া, বর্ধমান) ভোলানাথশিবের 'পঞ্চরত্নে' টুপিমাথায় সাহেবদের মূর্তি ও আবক্ষমূর্তি সন্নিবেশিত হয়েছে দেখা যায়।

সাহেব-সুবোর দৃশ্য ছাড়াও আরও বহু দৃশ্য 'টেরাকোটা'-অলংকরণে স্থান পেয়েছিল- যেমন, দানবাকৃতি মানুষ (বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়, দিগনগরের রাঘবেশ্বর, ঘুড়িষার রঘুনাথ, শ্রীবাটীর শঙ্করশিব মন্দির। গ্রীকপুরাণের 'সেন্টর'জাতীয় প্রাণী (নিচের অংশ হরিণের ন্যায় এবং ওপরের অর্ধাংশ মনুষ্যাকৃতি) হাতে ঢাল ও তরোয়ালসহ মন্দিরখিলানের ওপর প্রায়ই লক্ষ্য করা গেছে। কখনও বা একে তীরধনুক নিয়ে বধ করার দৃশ্যও দেখা যায়। লক্ষ্মণকর্তৃক মারীচবধদৃশ্য এখানে স্পষ্টতই 'টেরাকোটা' শিল্পীদের মনে স্থান পেয়েছিল। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায়ের জোড়বাংলা ও শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্নে' অদ্ভুত ধরনের কয়েকটি প্রাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। যেমন, শ্যামরায়ের মন্দিরে পক্ষযুক্ত মৎস্যদেহ মনুষ্যমূর্তি ও দুই হাতে ধনুর্বাণ, বাগরুই-এ (কেশপুর, মেদিনীপুর) লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' (আ উনিশ শতকের প্রথম দিক) এক প্রাণী যার দেহের নিম্নভাগ মনুষ্যদেহ ও সিংহের লেজসমন্বিত এবং ঊর্ধ্বভাগ হাতি ও সিংহের মস্তকসমন্বিত অবস্থায় দেখা যায়।

ফুল-লতাপাতার বাস্তব চিত্র, নকশা ও কাল্পনিক কিছু কিছু ফুলের সমারোহ অসংখ্য মন্দিরে পাওয়া যায়। যেসব মন্দিরে মূর্তিসমাবেশ করা যায় নি, সেখানে ফুল লতাপাতা দিয়ে কোনভাবে অলংকরণ করা হয়েছে। তাই ফুল-লতাপাতা মূর্তির বিকল্প হিসেবে অনেক মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে টেরাকোটা মূর্তিসন্নিবেশের একেবারে আদিপর্বে খ্রি. পনের-যোল শতকের মন্দিরে ফুললতাপাতার নকশাই অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত হত। মূর্তিসন্নিবেশের পরও এগুলি অনেকসময় মূর্তিফলকের চারপাশে নকশার জন্য অথবা এককভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল। সর্পিলগতি লতার বহু চিত্রও আমরা পাই। এছাড়া, জ্যামিতিক নকশাও লক্ষ্য করা গেছে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা 'টেরাকোটা'-অলংকরণে একদিকে দেবদেবীলীলাদৃশ্য, অন্যদিকে সামাজিক চিত্রপটের বিপুল সমারোহের বিষয় জানতে পারি। পরবর্তী অধ্যায়ে দেবলীলার কিছু কিছু জনপ্রিয় 'মোটিফ' এবং সামাজিক চিত্রপটের জনপ্রিয় দৃশ্যগুলির একটি তালিকা উপস্থিত করা হচ্ছে।

সহায়ক গ্রন্থ

Michell, George (ed)· *Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983.

২১

মন্দিরলিপি ঃ ইতিহাস ও সমাজচিত্র

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যায় অসংখ্য মন্দিরে। এই মন্দিরগুলির প্রায় সবই নির্মিত হয়েছিল চৈতন্যোত্তরকালে বাংলার বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টীয় ষোল শতকের শেষ দিক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে। এই প্রায় তিনশ বছর ধরে ইঁট আর পাথরের (প্রধানত ইঁটের মন্দিরের সংখ্যাই বেশি) যে অসংখ্য মন্দির সারা বাংলায় নির্মিত হয়েছিল, তার বেশ কিছু আজ লুপ্ত হয়ে গেলেও এখনও যা অবশিষ্ট আছে, সেগুলির সংখ্যাও কম নয়। চৈতন্যোত্তর-কালে বাংলার এক নিজস্ব সংস্কৃতির উদ্ভব হল তার ধর্ম, সাহিত্য এবং শিল্পবিকাশের মধ্য দিয়ে। পাল-সেন যুগের বঙ্গসংস্কৃতির উত্তরাধিকার তুর্কিবিজয়ের পরও কিছুকাল টিকেছিল, বিশেষ করে মন্দির নির্মাণধারা এবং বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণের কাজ। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, এমনকি চতুর্দশ শতকেও বেশ কিছু মূর্তিশিল্পের নিদর্শন আমরা পাই, যেগুলি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এসব মূর্তির মধ্যে বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, অষ্টলোকপাল, গণেশমূর্তি প্রভৃতি বেশ কিছু লক্ষ্য করা গেছে। এগুলির মধ্যে পাল-সেন-যুগের মূর্তিশিল্পের এক অবক্ষয়ী উত্তরাধিকার স্পষ্টভাবে রূপায়িত হয়েছে, যেমন বর্ধমান জেলার বেগুনিয়া মন্দির এলাকার অনেকগুলি মূর্তিতে। তেমনি মন্দিরস্থাপত্যের ক্ষেত্রেও ইন্দো-আর্য বা উত্তরভারতীয় 'নাগর'শৈলীর ক্রমবিবর্তমান দেউলমন্দির কিছু কিছু নির্মিত হয়েছে, অন্তত পনের শতক পর্যন্ত, যেমন, বেগুনিয়া 'টেম্পল-কমপ্লেক্সে'র দুটি 'দেউল'মন্দির যা পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে সুলতানী আমলে নির্মিত হয়েছিল। খ্রি. তের শতকের শেষ থেকে পনের শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলায় ইসলামী সুফীমত প্রচার ও মুসলমান দরবেশদের প্রভাবে সুলতান আর তাঁদের অধীন স্থানীয় রাজারা তাঁদের শাসনাধীন এলাকায় বহু প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করে ফেলেন। মসজিদ, মাজার ও কবরের সৌধ-ইমারতগুলি তৈরি হতে থাকে বাংলার গ্রামাঞ্চলের বাঁশখড়ের তৈরি 'চালা'ঘরের অনুকরণে। ইসলামী ধর্মীয় ইমারতগুলিতে ইঁটের ব্যবহারের আধিক্য এবং পোড়ামাটির বিমূর্ত অলংকরণ স্থাপত্যশিল্পে নবযুগের সূচনা করল সারা বাংলায়।

এরই কিছু পরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং তার প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যুগান্তকারী প্লাবন বাংলার সাহিত্য আর শিল্পকে নতুন আলোকে আলোকিত করল। উচ্চমানের বৈষ্ণবসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি যেমন হল, তেমনি মন্দিরস্থাপত্য ও তার শিল্পকলায় প্রবর্তিত হল এক নতুন শৈলী, যার সঙ্গে পূর্বতন শাস্ত্রীয় 'নাগর'শৈলীর এক সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল। প্রধানত চৈতন্যোত্তর যুগেই বাংলার মন্দিরস্থাপত্য এবং তার অলংকরণ শিল্প এক নবতর পর্যায়ে এবং স্বতন্ত্র আঙ্গিকে উপনীত হল— 'চালা', 'চাঁদনি', 'রত্ন' আর পরিবর্তিত 'দেউল' — এই চারটি নির্দিষ্ট শৈলীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল চৈতন্যোত্তর তিন শতকেরও বেশি সময় ধরে নানা স্থানে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, নদীয়া, ২৪ পরগনা আর মেদিনীপুরের বহু স্থানে এই চারপ্রকার শৈলীর অনেক মন্দির হয়েছিল ঐ সময়ের মধ্যে।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য মন্দিরলিপিতে প্রতিফলিত ইতিহাস এবং সমাজচিত্র চৈতন্যোত্তর যুগে নির্মিত মন্দিরগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য। ইঁট আর পাথর— এই দুই প্রকার উপাদানে গঠিত মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটি আর পাথরের লিপিফলক সন্নিবেশিত হয়েছিল। অবশ্য, কোনো কোনো

ইঁটের মন্দিরে পাথরের লিপিও সন্নিবেশিত দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের ইঁটের মন্দিরগুলিতে শিলালেখও স্থাপিত হয়েছিল। তবে বাংলার অধিকাংশ ইটের মন্দিরের লিপি পোড়ামাটির ফলকে বসানো হত। উপরি উল্লেখিত সময়ের মধ্যে যে সব মন্দির অধিক সংখ্যায় নির্মিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে লিপিযুক্ত মন্দিরের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু লিপিহীন মন্দিরও গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এত ছড়িয়ে আছে যে, সেগুলির সংখ্যা যে কোন মন্দিরগবেষকের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যেমন, মেদিনীপুর জেলার 'মন্দিরশহর' চন্দ্রকোণায় বহু মন্দিরের সমাবেশ হলেও মাত্র পাঁচটি মন্দিরে বর্তমান গ্রন্থকার লিপি দেখতে পেয়েছেন। অপরগুলিতে প্রতিষ্ঠাকালীন লিপি আদৌ সন্নিবেশিত হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অপরপক্ষে, মল্লরাজপ্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে প্রতিষ্ঠাকালীন লিপিফলক সন্নিবেশিত আছে। নদীয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত নদীয়া জেলার নানা স্থানে যেসব মন্দির আছে, সেগুলিতে লিপিফলক লক্ষ্য করা যায়।

গ্রন্থকার পশ্চিমবাংলার নানা স্থান পরিক্রমা করে যে অসংখ্য লিপিযুক্ত মন্দির লক্ষ্য করেছেন এবং যেগুলির যথাযথ পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে, তা থেকে বাংলার আঞ্চলিক ও সামাজিক ইতিহাসের কয়েকটি অনাবিষ্কৃত দিক উন্মোচিত হতে পারে। মন্দিরলিপির সযত্ন পাঠোদ্ধার ও পাঠবিশ্লেষণ এবং স্থানীয় অনুসন্ধান, যেমন মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কোনো বংশধরের নিকট রক্ষিত প্রাচীন নথিপত্রের পর্যালোচনার দ্বারা শেষ-মধ্যযুগীয় বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস এবং সমসাময়িক সমাজের কয়েকটি চিত্র আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। বাংলার আঞ্চলিব ইতিহাস গবেষণায় শেষ-মধ্যযুগের এই মন্দিরলিপিগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, স্থানীয় ভূস্বামী, রাজা আর জমিদার যাঁরা বহু মন্দির ঐ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান বিবরণ মন্দিরলিপি থেকে আমরা উদ্ধার করতে পারি। ভূস্বামী, রাজা আর জমিদার ছাড়াও সমাজেব বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিও বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেমন বণিকসম্প্রদায় ও তথাকথিত 'অজলচল' কোনো কোনো অন্ত্যজশ্রেণীব বিত্তশালী ব্যক্তি। এঁদের কিছু পরিচয়ও মন্দিরলিপি থেকে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়ত, মন্দিরস্থপতি সূত্রধর-সম্প্রদায় যাদের হাতে এইসব মন্দির তৈরি হয়েছিল, তাদের পরিচয় আর ঠিকানা এই প্রথম লিপির মধ্যে উৎকীর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে। মন্দিবস্থপতিরা তাদের নানা পদবীর মধ্যে তাঁদের জাতিপরিচয়ও লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। তাদের দেওয়া ঠিকানা থেকে কোন্ কোন্ স্থানে তাদের বসতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায়। তৃতীয়ত, মন্দিরলিপির মধ্যে ঐ সময় থেকে শকাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দের প্রচলন তাৎপর্যপূর্ণ। স্থানবিশেষে মল্লাব্দের উল্লেখও পাওয়া যায়, কিন্তু তা প্রচলিত ছিল মল্লরাজাদের এক্তিয়ারভুক্ত রাজ্যের মধ্যে। উনিশ শতকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো কোনো মন্দিরে ইংরেজি সালেরও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেখা ষোল শতকে অনুলিখিত কোন পুঁথিতে বঙ্গাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে ষোল শতকে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেও বঙ্গাব্দের কোনো উল্লেখ নেই বললেই চলে। চতুর্থত, কোনো মন্দিরলিপিতে সমসাময়িক কোনো ঘটনা বা মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। সেকালের সতীদাহ প্রথার উল্লেখ বা সতের শতকের শেষ দিকের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব শোভাসিংহের উল্লেখ ইত্যাদি সমসাময়িক ঘটনাবলীও মন্দিরলিপিতে স্থান পেয়েছে।

উল্লিখিত সূত্রগুলি অবলম্বন করে আমরা আঞ্চলিক ইতিহাসেব এক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে পারি। মন্দিরলিপিগুলির গুরুত্ব তথা প্রামাণিকতা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। আঞ্চলিক ইতিহাসের

কাঠামো নির্মাণে প্রাচীন নথিপত্র দলিল-দস্তাবেজ এবং স্থানীয় সাহিত্যের মতো অক্ষত মন্দিরলিপিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, প্রামাণিক। উল্লিখিত প্রথম সূত্রটি অবলম্বনে আমরা এখানে কোনো কোনো স্থানীয় রাজা বা ভূস্বামীর ইতিহাস উদ্ধার করতে পারি। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যে শিলালিপিটির কথা আমাদের মনে আসে সেটি বেশ কিছুকাল আগে অবিষ্কৃত হয়েছে মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থেকে। মুগনি পাথরে ৪৮ সেমি x ৬১ সেমি আয়তনের একটি বড়ো ফলকে সুস্পষ্টভাবে বঙ্গাক্ষরে খোদিত এই লিপিটি সতের শতকে 'ভান'-বংশীয় রাজাদের সম্পর্কে এক মূল্যবান দলিল। শিলালেখটি আগে চন্দ্রকোণার রঘুনাথবাড়িতে রক্ষিত ছিল। বর্তমানে সেখানে 'রামানুজ - অস্থলে' রক্ষিত আছে বলে জানা যায়। 'ভান'বংশীয় রাজাদের দ্বারা 'ভান'রাজ্য নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই রাজ্যের এলাকা ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কংসাবতী আর শিলাবতীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড। মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন বকদ্বীপ বা বগড়ি পরগনার পুর্বদিকে এই রাজ্যের পশ্চিম সীমা এবং মণ্ডলঘাট পরগনার পশ্চিমে তার পূর্বসীমা নির্দিষ্ট ছিল। রাজ্যের মোট আয়তন ছিল ত্রয়োদশ যোজন। 'ভান' রাজ্যের রাজধানী ছিল সেকালের পরগনা 'মানা' বা 'চন্দ্রকোণা'য়। যোল শতকের শেষভাগ থেকে চন্দ্রকোণা 'ভান' রাজ্যের এক সমৃদ্ধিশালী রাজধানী হয়ে উঠেছিল। অবশ্য, তার আগেও এখানে এক রাজবংশ রাজত্ব করতেন। কিন্তু তার ইতিহাস সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। চন্দ্রকোণার এই শিলালেখটি গিরিধারীলাল জীউর বিধ্বস্ত, বর্তমানে বিলুপ্ত একটি 'নবরত্ন' মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরটি চন্দ্রকোণা শহরের অদূরে 'লালগড়ে' অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। সংস্কৃতভাষায় মোট চারটি শ্লোকে রচিত এই লেখটির প্রথম দুটি ও চতুর্থ শ্লোকটি সংস্কৃত অনুষ্টুপছন্দে এবং তৃতীয়টি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। শেষের সারিতে পৌরাণিক 'শ্রীমোহন চক্রবর্ত্তী', 'শ্রীগোকুল দাস' নামে দুই ব্যক্তির উল্লেখ আছে। লেখটি থেকে জানা যায়, 'ভান' বংশীয় রাজা হরিনারায়ণের পত্নী রানি লক্ষ্মণাবতী ১৫৭৭ শকাব্দ বা ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে গিরিধারীলালের জন্য 'নবরত্ন'মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। লেখটিতে তাঁর যে বংশপরিচয় দেওয়া আছে তা থেকে জানা যায়, লক্ষ্মণাবতী ছিলেন রাজা বীরভানির পুত্রবধূ (শ্রীবীরভানের্বধূঃ) শ্রীহোলরায়ের কন্যা, রাজা শ্রীযুত মিত্রসেনের মাতা এবং মল্লরাজা নারায়ণ মল্লের ভগিনী। ঐ শকাব্দের বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে শুক্রবারে মন্দিরের শুভকার্য আরম্ভ হয়েছিল।

এই লেখ থেকে 'ভান'বংশের পর পর তিন রাজা এবং লক্ষ্মণাবতীর পিতৃবংশের এক পরিচয় জানা যাচ্ছে। 'ভান' বংশের পর পর এই তিন রাজা বীরভানি, তাঁর পুত্র হরিনারায়ণ বা হরিভান এবং তার পুত্র মিত্রসেন চন্দ্রকোণার রাজা ছিলেন। চন্দ্রকোণার রাজারূপে বীরভানের নামের উল্লেখ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে রচিত (সতেরো শতকের প্রথম পাদে) 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী' গ্রন্থেও পাওয়া যায়। বীরভানির পুত্রবধূ লক্ষ্মণাবতী চন্দ্রকোণার অনতিদূরবর্তী মল্লভূমবিষ্ণুপুর রাজবংশের হোল রায়ের কন্যা এবং রাজা নারায়ণ মল্লের ভগিনী। এ থেকে জানা যায়, মল্লরাজবংশের সঙ্গে 'ভান' বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। হরিনারায়ণের পর রাজা হন তাঁর পুত্র মিত্রসেন। এই মিত্রসেনের নামে চন্দ্রকোণার এক মহল্লার নাম 'মিত্রসেনপুর'। ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মিত্রসেন যে চন্দ্রকোণার রাজা ছিলেন, সেকথা জানা যাচ্ছে, এই শিলালেখের একটি অংশ 'মাতা শ্রীযুত মিত্রসেননৃপতেঃ' থেকে। তিনি সতের শতকের শেষ পর্যন্ত যে চন্দ্রকোণাব রাজা ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রাচীন তুলট কাগজে লেখা ১০৯৬ বঙ্গাব্দ বা ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের একটি 'জলদান' পাট্টায়। পাট্টাটি দেবনাগরী হরফে হিন্দী ভাষায়

লেখা হয়েছিল। এই দুষ্প্রাপ্য দলিলটি চন্দ্রকোণা গোঁসাইবাজারের স্বর্গত রাধারমণ সিংহ মহাশয়ের কাছে রক্ষিত ছিল। লালজীউমন্দিরের ঐতিহাসিক শিলালেখটি যথাযথভাবে উদ্ধার করা হল ঃ

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৭৭। শাক্যেশ্বমুনিবাণেন্দৌ
বৈশাখে শুক্লপক্ষকে। তৃতীয়ায়াং ভৃগুদিনে
আরম্ভোস্য বভূব হ। হরিনারায়ণভূপস্য পত্নী
শ্রীলক্ষ্মণাবতী। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যৈ নবরত্নমি
দং দদৌ। রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দরসিকা শ্রীবীরভানের্বধূখ্যা
ত শ্রীহরিভূপতেশ্চ বনিতা শ্রীহোলরায়াত্মজা। মাতা
শ্রীযুতমিত্রসেননৃপতের্বিখ্যাতকীর্তেঃ ক্ষিতৌ
শ্রীনারায়ণমল্লভূপভগিনী রম্যং দদৌ
মংদিরং। গিরিধারিপদাম্ভোজে নবরত্নমি
দং শুভং। নির্মায় বহুযত্নেন সমর্পিতবতী মুদা।।
পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী শ্রীগোকুল দাস

চন্দ্রকোণার দুটি প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ি — 'অযোধ্যা'পল্লীর রঘুনাথবাড়ি ও মল্লেশ্বরপুরের মল্লেশ্বর ঠাকুরবাড়ির মন্দিরগুলির সংস্কার করিয়েছিলেন বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। একমাত্র রঘুনাথবাড়ি এলাকায় শিবের 'পঞ্চরত্ন'মন্দিরটি ছাড়া মূল মন্দিরগুলির কোনোটিতেই লিপি নেই। তবে ১২৩৮ বঙ্গাব্দ বা ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তেজশ্চন্দ্রকর্তৃক সংস্কারকালীন লিপি থেকে জানা যায়, এগুলি নবনির্মিত মন্দিরের মতো সংস্কার করা হয়েছিল। সম্ভবত সংস্কারকালে মন্দিরগুলির মূল লিপিও নষ্ট হয়। মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাকাল বা প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় নেই। তবে অনুমান করা যায়, চন্দ্রকোণায় 'ভান'-রাজবংশের অবসানে বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদের সময়ে আঠার শতকের গোড়ার দিকে মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আঠার শতকের গোড়া থেকেই চন্দ্রকোণা ও সমগ্র 'ভান'রাজ্য বর্ধমানাধিপতিব শাসনাধীন হয়েছিল, নানা সূত্র থেকে তা জানা যায়। তেজশ্চন্দ্র মন্দিরগুলির সংস্কার এবং দ্বারদেশে লিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। তখন এই অঞ্চল বর্ধমানরাজের সম্পূর্ণ শাসনাধীন হয়েছিল।

অবশ্য চন্দ্রকোণার পশ্চিমে বগড়ি অঞ্চল একসময় বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের অধীন ছিল। 'ভান'-বংশীয় রাজাদের সঙ্গে মল্লরাজাদের যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। ভান রাজ্য, বগড়ি রাজ্য বা মল্লভূম — এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাজ্য ছিল। বগড়ি রাজাদের প্রতিষ্ঠিত কোনো মন্দির গড়বেতো বা পার্শ্ববর্তী স্থানে ছিল কিনা জানা যায়নি। কিন্তু এই ক্ষুদ্ররাজ্যে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজার যে শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রমাণ মিলছে দুটি মন্দিরলিপি থেকে। গড়বেতার রাধাবল্লভের 'আটচালা' রীতির মন্দির মল্লরাজ দুর্জন সিংহদেব ৯৯২ মল্লাব্দ বা ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরটির পুবদিকের দেওয়ালে 'মুগনি'-পাথরে খোদিত যে লিপিটি আছে, সেটি উদ্ধার করা হ'ল ঃ

শ্রী শ্রীকৃষ্ণঃ
শ্রীরাধিকাব্রজপুরন্দরয়ো পদাব্জে

মল্লস্য পক্ষনবশেবধিসংখ্যকাব্দে
শ্রীমল্লভুরমণদুর্জনসিংহদেব
সৌধং ন্যবেদয়দিদং গৃহমাদরেণ ৯৯২ ।।

উদ্ধৃত লিপিটির অর্থ এই, শ্রীরাধিকা এবং ব্রজের পুরন্দর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে ৯৯২ মল্লাব্দে মল্লভূরমণ দুর্জনসিংহদেব সাগ্রহে এই সৌধগৃহ নিবেদন করলেন। দুর্জন সিংহদেব (মল্লরাজ বীরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র) ১৬৮২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭০২ পর্যন্ত মল্লভুম বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। তাঁর সময়ে বগড়ি রাজ্য (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত) মল্লরাজের অধীন হয়েছিল। দূর্জনসিংহদেব গড়বেতার রাধাবল্লভমন্দির প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া গড়বেতা থেকে প্রায় পনেরো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে উড়িয়াশাই গ্রামে এর কয়েক বছর পরে রাধাকৃষ্ণের আর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৯৯৬ মল্লাব্দ বা ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরটির ওপরের অংশ ভেঙে গেলেও সেটি 'আটচালা' রীতির ছিল বলে মনে হয়। পূর্বদিকে গর্ভগৃহপ্রবেশপথের ওপরে মুগনি পাথরে খোদিত সংস্কৃত লিপিটি হল এই ঃ

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণপদারবিন্দে
শ্রীমান্ মুদা দুর্জনসিংহভূপঃ
রসগ্রহাঙ্কে মিতে মল্লবর্ষে
ন্যবেদয়ৎ সৌধমিদং সুচারু
৯৯৬

অর্থাৎ, রস, গ্রহ ও অঙ্কপরিমিত (= ৯৯৬) মল্লবৎসরে শ্রীমান্ দুর্জনসিংহ রাজা এই সুন্দর সৌধটি শ্রীরাধিকাকৃষ্ণের পাদপদ্মে সানন্দে নিবেদন করলেন। প্রাচীন বগড়ি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এলাকার মধ্যে মল্লরাজ-প্রতিষ্ঠিত এই দুটি মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বগড়ি রাজ্যের উত্তরে মল্লভূম রাজ্যে প্রাচীনকাল থেকে মল্লরাজাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন মল্লরাজাদের পরিচয় জানা যাচ্ছে, খ্রিস্টীয় সতের শতকের গোড়ার দিক থেকে। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরলিপিগুলি বিশেষ প্রামাণিক। রাজধানী বিষ্ণুপুরে সতের শতক থেকে আরম্ভ করে আঠারো শতক পর্যন্ত মল্লরাজারা যে সব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা থেকে কয়েকজন রাজার নাম জানা যায়। আনুমানিক সতের শতকের প্রারম্ভে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাসমঞ্চটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বীরহাম্বির, যদিও বর্তমানে কোনো লিপি এখানে নেই। এর পরে ৯২৮ মল্লাব্দে বা ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে বীরসিংহ নামে এক রাজা মল্লেশ্বরের দেউল মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের গড় এলাকায় শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' মন্দির ৯৪৯ মল্লাব্দ বা ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে বীরহাম্বিরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ নির্মাণ করান। মন্দিরলিপিতে মল্লাব্দের সঙ্গে রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহের উল্লেখ আছে। মন্দিরটির পেছনের দেওয়ালে 'শ্রী শ্রী শ্যামরায়সরণ বিষ্ণুদাস' নামে এক ব্যক্তির যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে অনুমান করা যায়। টেরাকোটার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন এই মন্দিরটির শিল্পী ছিলেন বিষ্ণুদাস। সতের শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত এই মন্দিরটি বাংলার মন্দিরশিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। লিপিটি এইরূপ ঃ

'শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শক্যেঙ্ক বেদাঙ্কযুক্তে

নবরত্নরত্ন। শ্রীবীরহাম্বিরনরেশসূনু র্দদৌ নৃপঃ শ্রী রঘুনাথসিংহঃ
মল্লশকে ৯৪৯ শ্রীরাজাবীরসিংহঃ।

শ্যামরায়মন্দির নির্মাণের বারো বছর পরে রঘুনাথ সিংহ আর একটি অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি করেছিলেন কেষ্ট রায়ের 'জোড়বাংলা' মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। ৯৬১ মল্লাব্দ বা ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে এই অপূর্ব সৌধটি নির্মিত হয়। এটিও 'টেরাকোটা' শিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বলা বাহুল্য, এই মন্দিরগুলি সবই ইঁটের তৈরি। রঘুনাথ সিংহ লালবাঁধের ধারে কালাচাঁদমন্দির ৯৬২ মল্লাব্দ বা ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করিয়েছিলেন। মাকড়া পাথরের এই মন্দিরে 'বাস রিলিফে'র ভাস্কর্যগুলি খুব সুন্দর। এর পর রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহ লালজীউর পাথরের 'একরত্ন'মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ৯৬৪ মল্লাব্দ বা ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে। বীরসিংহের মহিষী চূড়ামণি ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুরলীমোহনের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 'খড়বাংলাপাড়া'য় রাধাবিনোদের 'আটচালা' মন্দিরটি রঘুনাথ সিংহের মহিষী ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহমল্ল ১০০০ মল্লাব্দ বা ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে গড় এলাকার বাইরে মদনমোহনের সুদৃশ্য 'একরত্ন' মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইটের এই মন্দিরে সুন্দর কারুকার্যযুক্ত 'টেরাকোটা' ফলক সন্নিবেশিত। দুর্জন সিংহের পর দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ রাজা হলেও বিষ্ণুপুরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোনো মন্দির বা লিপিযুক্ত কোনো মন্দির পাওয়া যায় না। তাঁর পরবর্তী মল্লরাজ গোপাল সিংহ লালবাঁধ এলাকায় জোড়া 'একরত্ন'মন্দির নির্মাণ করেন ১০৩২ মল্লাব্দ বা ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পুত্র কৃষ্ণসিংহের মহিষী চূড়ামণি লালবাঁধ এলাকায় ১০৪৩ মল্লাব্দ বা ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাধামাধবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল সিংহের পরবর্তী রাজা চৈতন্য সিংহ ১০৬৪ মল্লাব্দ বা ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে গড় এলাকায় পূর্বোক্ত লালজীউমন্দিরের পার্শ্ববর্তী রাধাশ্যামের 'একরত্ন'মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মাকড়া পাথরে তৈরি এই মন্দিরে বাস-রিলিফের ভাস্কর্যগুলি সুদৃশ্য। মন্দিরের লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হল ঃ

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণঃ।।
শ্রীরাধাশ্যামচন্দ্রাঙ্ঘ্রিসরসিজতলে দিব্যমেতং সুশোভম্
মল্লাব্দে বেদকালাম্বরবিধুগণিতে বাহুলে পৌর্ণমাস্যাম্।
গেহং নানাবিচিত্রব্রিমিতমতিদৃঢ়ং পূজিতঞ্চাপি ভক্তেঃ।
শ্রীচৈতন্যো নৃপেন্দ্রঃ শুভমতিনিপুণো সম্প্রাযচ্ছৎ সভায়াম্।

শকাব্দাঃ ১৬৮০ অর্থাৎ ১০৬৪ মল্লাব্দের (= ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দ) কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সভাস্থলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও নিপুণ, নৃপশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য (সিংহ) শ্রীরাধাশ্যামচন্দ্রের পাদাঙ্গুলিরূপপদ্মে এই সুদৃশ্য নানাচিত্রমণ্ডিত সুগঠিত এই সুন্দর দেবগৃহটি দান করলেন। শকাব্দ ১৬৮০। উল্লেখ্য, মল্লরাজাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির মধ্যে শুধুমাত্র এই মন্দিরেই শকাব্দের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, যদিও সংস্কৃতলিপিতে প্রহেলিকার মাধ্যমে মল্লাব্দেরও উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরের এই মন্দিরলিপিগুলি থেকে মল্লরাজবংশ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় এবং এ থেকে তাঁদের ধর্মপ্রচার ও গতিপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। ষোল শতকের শেষদিক থেকেই মল্লরাজারা বৈষ্ণবমতাবলম্বী হয়ে পড়েছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাসের দ্বারা বীরহাম্বিরের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনা অনেকেরই জানা। তারই ফলে ষোলো শতকের শেষাশেষি বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত রাসমঞ্চটি নির্মিত হয়েছিল। সতেরো শতক থেকে শুরু করে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত

মল্লরাজারা একের পর এক রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা আর পাথরের মন্দির নির্মাণ করে এসেছেন। সেগুলিতে রাধাকৃষ্ণলীলাচিত্রের প্রাচুর্য ভাস্কর্যশিল্পকে এক নতুন আলোকে আলোকিত করেছিল। মাঝখানে ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে জনৈক বীরসিংহ রাজা - কর্তৃক মল্লেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা সাময়িক বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণবন্যায় চঞ্চল সমগ্র মল্লরাজ্যের নানা স্থানে রাধাকৃষ্ণের অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের আশপাশে জয়কৃষ্ণপুর, ধরাপাট প্রভৃতি গ্রামে এবং সতের শতকের দিকেও বেশ কিছু রাধাকৃষ্ণমন্দির তৈরি হয়েছিল বলে মনে করা যায়। জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে সতের শতকের শেষদিকে তৈরি ইঁটের একটি ছোট্ট 'চারচালা' মন্দির আজও লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরে পোড়ামাটির লিপিটি এখন বেশ জীর্ণ হয়ে গেছে, তবু এ থেকে রাধাকৃষ্ণের প্রীতিকামনায় মন্দির প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লিপিটি আংশিক উদ্ধার করা গেল। "বিন্দুপক্ষরসেন্দুমে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যৈ / শ্রীকিশোর ...'। অর্থাৎ বিন্দু (= ০), পক্ষ (= ২) রস (= ৬), ইন্দু (= ১) শকে 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই নিয়ম অনুসারে ১৬২০ শকাব্দে বা ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের প্রীতির জন্য.... (এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল)। এর পরে আর এক সারি লিপি ঃ 'মল্লশকে ৯৪৯ শ্রীরাধাকৃষ্ণপরিচারক শ্রীজুৎ কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনদাস'। এই লিপি থেকে মল্ল শক ৯৪৯ বা ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচারক কৃষ্ণদাস ও বৃন্দাবন দাসের নাম পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত এই সময়ে উক্ত মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মল্লশাসনের স্বর্ণযুগের অবসানে রাঢ় বাংলায় বর্ধমানরাজের প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যুদয়কালে প্রবল প্রতাপশালী কীর্তিচন্দ্রের পরবর্তী কয়েকজন রাজা আর রাজমহিষী প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দিরের যে লিপি আছে সেগুলিতে বর্ধমানরাজবংশের কিছু কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়। কালনায় বর্ধমানরাজ প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ি এলাকার একটি 'আটচালা'রীতির শিবমন্দির থেকে জানা যাচ্ছে, কুমার মিত্রসেনের ধর্মপত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্রের মতো পুত্রকামনায় বৈদ্যনাথের আরাধনা করে দেবানুগ্রহে ত্রিলোকচন্দ্র নামে পুত্রলাভ করেন। পরে মহেশ্বরের প্রীতির জন্য সুন্দর কারুকার্যযুক্ত এই মন্দির নির্মাণ করে ভক্তিপূর্বক সেখানে বিজয়াদিবৈদ্যনাথ নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিলোকচন্দ্রের মাতা লক্ষ্মীদেবী নিকটবর্তী কৃষ্ণচন্দ্রের বিশাল পঁচিশচূড়া মন্দিরটিও ১৬৭৩ শকাব্দ বা ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের লিপিটি এই— ষোড়শসংখ্যকে শকাব্দে মন্দিরমর্পিতমেতদ্রাজা শ্রীতিলকচন্দ্রমাতা। ১৬৭৩ সন ১১৫৯ সাল। ত্রিলোকচন্দ্রের পুত্র মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা ও প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার করিয়েছিলেন। কালনা রাজবাটি এলাকায় ১৭০৫ শকাব্দ বা ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কারুকার্যযুক্ত একটি 'আটচালা' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া কালনার প্রসিদ্ধ ১০৯টি শিবমন্দিরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৭৩১ শকাব্দ বা ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরের সামনে প্রবেশপথের ওপরের লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হলঃ'শাকে চন্দ্রশিবাব্ধিসপ্তিকুমিতে শ্রীতেজচন্দ্রাভিধো/রাজা সূর্য ইব স্থিরার্পিতচলচ্চণ্ডপ্রতপানলঃ।/ শম্ভোর্ধাম পরং নবাধিকশতং শ্রীমন্দিরৈর্মণ্ডলম্ / প্রাকার্ষীদেতদম্বিকাখ্যনগরে কৈলাসমেতং নবম্।' লিপিটি থেকে জানা যাচ্ছে, বর্তমান কালনা তখন 'অম্বিকা' নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন পুঁথিপত্রেও এই নাম পাওয়া যায়। বর্ধমান শহরের কিছু উত্তর-পশ্চিম নবাবহাটে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের মাতা ১১৯৫ সালে ১০৮টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কালনায় প্রতাপেশ্বরের সুন্দর অলংকরণযুক্ত মন্দিরটি তেজশ্চন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মহিষী প্যারীকুমারী ১৭৭১ শকাব্দ বা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে

প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী নিবাসী রামহরি মিস্ত্রি নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরে সংস্কৃত আর বাংলা দু'টি লিপিই উৎকীর্ণ আছে। বাংলা লিপিটি এই—

'শাকে সপ্তদশ শত একাত্র প্রমাণে / অম্বিকায় অমরবাহিনী সন্নিধানে / শ্রীরাধাবল্লভরাসরসিকসুন্দর শ্যামাঙ্গত্রিভঙ্গ অঙ্গ / বিশ্বমনোহর তাঁহার কুমারী প্যারীকুমারী তাঁহার/ প্রধানা মহেন্দ্র প্রতাপচন্দ্রনরেন্দ্র অঙ্গনা মহাস্থানে করি / মহামন্দির নির্মাণ হরিপ্রীতি হরষিতে হরে দিলা দান। / শকাব্দা ১৭৭১ সন ১২৫৬ এই দেযুল সোনামুখী / নিবাসী শ্রীরামহরি মিস্ত্রির নির্মিত।'

তেজশ্চন্দ্রের পুত্র কুমার প্রতাপচন্দ্রের অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পরে তাঁর মহিষী প্যারীকুমারী কর্তৃক এই সুদৃশ্য দেউল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতাপচন্দ্রের নামানুসারে শিবলিঙ্গের নাম প্রতাপেশ্বর রাখা হয়।

বর্ধমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কিছুকাল আগে থেকে নদীয়া রাজবংশের অভ্যুদয় বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নদীয়া জেলার মাটিয়ারিতে এই বংশের প্রথম সূত্রপাত হয়। পরে রেউই-এ (বর্তমান কৃষ্ণনগর) এই বংশের রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর এই বংশের রাজারা নানা স্থানে অনেক দেববিগ্রহ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা রাঘব ১৫৯১ শকাব্দ বা ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপুর আর কৃষ্ণনগরের মধ্যবর্তী দিগ্‌নগর গ্রামে এক বিশাল দীঘি খনন করে তার তীরে রাঘবেশ্বর শিবের একটি চালারীতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁটের তৈরি এই মন্দিরটি 'টেরাকোটা' অলংকরণের এক সুন্দর নিদর্শন। মন্দিরের প্রবেশপথের ঠিক উপরে মুগনি (ক্লোরাইট) পাথরের একটি ফলকে উৎকীর্ণ লিপিটি এখানে যথাযথভাবে উদ্ধার করা হ'ল ঃ

১৫৯১।।শাকে সোমনবেষুচন্দ্রগণিতে পুণ্যৈক / রত্নাকরো ধীর শ্রীযুতরাঘবো দ্বিজমণি - র্ভূমীভুজামগ্রণীঃ।। / নির্মায় স্ফুরদূর্মিনির্মল;/ জলপ্রদ্যোতিনীর্দ্দীর্ঘিকান্তত্তীরে / কৃতরম্যবেশ্মনি শিবন্দেবং সমস্থাপয়ৎ। অর্থাৎ, '১৫৯১ শকাব্দ বা ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণশিরোমণি রাজশ্রেষ্ঠ রাঘব তরঙ্গমালাযুক্ত নির্মল স্বচ্ছজলে পরিপূর্ণ দীঘি খনন করে তার তীরে সুন্দর দেবালয়ে মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের লিপিগুলি থেকে অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। শিবমন্দিরটি তাঁর দ্বিতীয়া মহিষী লক্ষ্মীদেবীর প্রতিষ্ঠিত। রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির ১৬৭৬ শকাব্দ বা ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে ও শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরটি ১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে এবং রাজ্ঞীশ্বর মন্দিরটি ১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজ্ঞীশ্বরের লিপিটি এই — 'যঃ সাক্ষাৎকৃতশৈবমূর্তিবসুধেশানাংশকে সম্ভবাত্/সংখ্যাতঃ ক্ষিতিদেবরাজপদভাক্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ প্রভুঃ; তস্য ক্ষৌণিপতে র্দ্বিতীয় মহিষী মূর্তেব লক্ষ্মীঃ স্বয়ং / প্রাসাদপ্রবরে প্রসাদসুমুখং শম্ভুং সমস্থাপয়ত্।। অর্থাৎ যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীপতি এবং রাজপদভাক্ হয়ে শৈবমূর্তিকে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাঁর স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা দ্বিতীয়া মহিষী এই উৎকৃষ্ট প্রাসাদে শম্ভুকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। খাড়া 'চারচালা'রীতির এই মন্দিরের গর্ভগৃহের বেদিতে রাজ্ঞীশ্বর বৃহৎ শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। বেদিতে দুই দীর্ঘ সারির অপর একটি লিপি ঃ

যঃ শ্রীমানধিগত্য রাজতি মহারাজাধিরাজেন্দ্রতাং
লক্ষ্মীস্তন্মহিষী হরেরিব মহারাজ্ঞীতি সংকীর্তিতা।
তৎসংস্থাপিত এব দীব্যতি মহারাজ্ঞীশ্বরোৎয়ং শিবঃ
খ্যাতঃ স্যাদ্‌গিরিশস্তদীশ্বরতয়া ভক্ত্যা শ্রিয়ৈ স্থাপত্যে।।

লিপিটির অর্থ — 'যিনি শ্রীযুক্ত এবং 'মহারাজাধিরাজেন্দ্র' উপাধি লাভ করে শোভা পান, তাঁর মহিষী মহারাজ্ঞী লক্ষ্মী নামে পরিচিতা, যেমন হরির পত্নী লক্ষ্মী, সেই মহারাজ্ঞীশ্বর নামক এই শিবকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর ঈশ্বরত্বহেতু তিনি গিরিশ নামে খ্যাত। ভক্তিপূর্বক শ্রীরজন্য তিনি এখানে স্থাপিত হলেন।'

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের প্রায় তিন মাইল পূর্বে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে 'গঙ্গাবাস' নামক স্থানে ১৬৯৮ শকাব্দ বা ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে হরিহরের একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। হরি ও হরের অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদনের জন্যই তিনি এই অদ্বৈত মূর্তি মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। মন্দিরে এক দীর্ঘ সংস্কৃত লিপিতে বলা হয়েছে, যে মূর্খেরা শিব আর বিষ্ণুকে পৃথক জ্ঞান করে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সব নরকগামী ব্যক্তিদের ভ্রান্তিনিরসনের জন্য ভুবনবিদিত বাজপেয়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই মন্দির ও তার মধ্যে হরিহরের অদ্বৈত মূর্তি লক্ষ্মী ও উমার সঙ্গে স্থাপন করলেন।

উল্লিখিত প্রধান প্রধান রাজা ছাড়া জমিদার বা ভূস্বামী, বণিকসম্প্রদায় এবং 'অজলচল' বিত্তশালী ব্যক্তিরাও চৈতন্যপরবর্তী কালে বাংলার নানা স্থানে অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বেশ কিছু মন্দিরলিপি থেকে এঁদের পরিচয় জানা যাচ্ছে। মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়িতে বিখ্যাত সর্বমঙ্গলামন্দিরে যে ওড়িয়া লিপি আছে, তা থেকে জানা যায়, রঘুনাথ ভূঞ্যা নামে এক ভূস্বামীর পুত্র চক্রধর ভূঞ্যা ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে দেবী সর্বমঙ্গলার মূল মন্দির ও জগমোহন নির্মাণ করান। ওই ভূস্বামীর কর্মচারী হরিদাসের তত্ত্বাবধানে এই মন্দির নির্মিত হয়। মিস্ত্রি ছিলেন রঘুনাথ কামিলা আর বাসুরাম কারিগর। এই সময় ছিল মহারাজ মানসিংহের রাজ্যকালের তিন অঙ্ক। এই মন্দিরের সামনের বারদুয়ারী নাটমন্দিরটি ১৫৩২ শকাব্দ বা ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। এর প্রবেশপথের ওপর ওড়িয়ালিপিটি থেকে জানা যাচ্ছে, মহারাজ মানসিংহের রাজত্বকালে শাহ সুলতান নামে এক ব্যক্তি কেশিয়াড়িতে রাজস্ব কেন্দ্রের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর এক কর্মচারী সুন্দর দাস এবং অর্জুন মহাপাত্র নামে এক দেওয়ান বা সেরেস্তাদার বনমালী দাস নামে এক রাজমিস্ত্রিকে দিয়ে ঐ নাটমন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। কাঁথি শহরের প্রায় চার মাইল উত্তর-পূর্বে দেউলবাড় গ্রামে জগন্নাথের একটি পরিত্যক্ত দেউল মন্দিরে ওড়িয়া অক্ষরে খোদিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত তিনটি শিলালেখ থেকে জানা যায়, কাশীদাসের বংশে পদ্মনাভের পুত্র শ্রীমান বিভীষণ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জগন্নাথের এই উচ্চ প্রাসাদটি তৈরি করিয়েছিলেন। সৎব্রাহ্মণকর্তৃক গোপাল এবং বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথমূর্তিও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৫০৬ শকাব্দ বা ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ বুধবার শুক্লপক্ষের তৃতীয় তিথিতে যুগাদ্যদিনে গদাধর নামক তাঁর গুরুকে মন্দির দেবতাগণের সেবার জন্য দেউলবাড় নামক সুন্দর গ্রামটি তিনি দান করেছিলেন। ব্রাহ্মণবংশে জাত আচার্য চূড়ামণি অর্জুন মিশ্রের পৌত্র ভগবান নামে এক ব্যক্তির পুত্র শ্রীধরণীধর সূত এবং উক্ত আচার্য চূড়ামণির অপর এক পুত্র চক্রধর কবীন্দ্র যথাবিধি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পরলোকগমন করেন। এই দেউলমন্দির ও তৎসংলগ্ন জগমোহন ইটের তৈরি হলেও জগমোহন আর মূলমন্দিরে পাথরের ফলকে ওড়িয়া অক্ষরে লিপিগুলি উৎকীর্ণ আছে। পূর্বে তিনিটি লিপি ছিল। বর্তমানে দু'টি লিপি এই মন্দিরে আছে। বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক তার একটির সাম্প্রতিক পাঠোদ্ধার নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. কাশীদাসকুলে বিভীষণ ইতি শ্রী পদ্মনাভাত্মজঃ
শ্রীমানাবিরভূদচীকরদসৌ প্রাসাদমুচ্চৈরিমম্।

গোপাল প্রতিমাং চ সম্যগনয়ো সদ্ভিঃ প্রতিষ্ঠা দ্বিজঃ
রামং চেহ সুভদ্রয়া সহ জগন্নাথং ন্যধাসীদপি।

২. শকাব্দে রসশূন্যবাণধরণীমানে তৃতীয়া তিথৌ।
বৈশাখে বুধবাসরে সুনিমিতে পক্ষে যুগাদৌ সিতে।
শ্রীযুক্তায় গদাধরায় গুরবে তদ্দেবতানাং মুদে
দত্তং গ্রামবরোচিতং প্রতিদিনং তদ্দেউলবাড়াখ্যকম্।

(প্রথম লিপিটি যেটি গর্ভগৃহের প্রবেশপথের ওপরে একটি লম্বা সাড়ে পাঁচ ফুট পাথরের লিন্টেলে দুটি সারিতে খোদিত, দেউলবাড় গ্রামের শ্রীনিখিলরঞ্জন মিশ্রের মাধ্যমে ওড়িয়া হরফ থেকে লেখক-কর্তৃক সেটির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। দ্বিতীয় লিপিটি আছে জগমোহনের প্রবেশপথের ওপরে। এটি নিকটবর্তী পাইকবাড় পল্লীর শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থরচিত 'হিজলিবাহিরিপ্রত্নতত্ত্বম্' নামে এটি দীর্ঘ সংস্কৃত নিবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। উক্ত নিবন্ধটি 'সূর্যদেশ' পত্রিকার ১৩৮০ বঙ্গাব্দের ৪র্থ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠমাসে প্রকাশিত হয়েছিল।)

জানা যায়, বিভীষণ দাস ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে হিজলি মণ্ডলের অধিকারী বলভদ্র দাসের খুল্লতাত ছিলেন। গোপীজনবল্লভদাসরচিত 'রসিকমঙ্গল' কাব্যে উল্লিখিত বিভীষণ দাস মহাপাত্র ও এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতা বিভীষণ একই ব্যক্তি বলে মনে হয়।

রাজা, বনেদী জমিদার ও ভূস্বামী ছাড়া আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর যেসব ব্যক্তি ইংরেজানুগৃহপুষ্ট হয়ে স্থানীয় শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। নানা স্থানে বহু মন্দির দেবালয়, মঠ, ঠাকুরবাড়ি প্রভৃতি এঁরাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নদীয়া জেলার উলা-বীরনগরে মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে বাংলার 'নায়েবকানুনগো' বা মুস্তোফী রামেশ্বর মিত্র ১৬৬১ শকাব্দ বা ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে একটি টেরাকোটা অলংকৃত 'জোড়বাংলা' মন্দির নির্মাণ করেন। পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ লিপিটি উদ্ধার করা হ'ল ঃ

'অঙ্গৈককালন্দুমিতে শকাব্দে ১৬১৬ কায়স্থ কায়স্থ হবেষ ধর্মঃ। যো নির্মমে
শ্রীহরিযুগ্মধাম শ্রীযুতরামেশ্বর মিত্র দাসঃ'

— অর্থাৎ ১৬৬১ শকাব্দ বা ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীরামেশ্বর মিত্র শ্রীহরির এই 'যুগ্মগৃহ' (জোড়বাংলা) নির্মাণ করলেন। আঠার শতকের শেষ দিকে সে সময় মেদিনীপুরের 'সদরকানুনগো' ছিলেন রাজনারায়ণ ঘোষ। খড়্গপুর থানার অন্তর্গত চকগণেশ গ্রামে তাঁর বিশাল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। এরই মধ্যে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বারোটি শিবমন্দির আর দুর্গাদালান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি মন্দিরে সংস্কৃতে রচিত পোড়ামাটির একটি লিপিফলক থেকে জানা যায়, ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে শম্ভুর দ্বাদশ মন্দির তিনি নির্মাণ করেছিলেন। রাজনারায়ণ শিবভক্ত ছিলেন। লিপিটি এই ঃ

শকাব্দ ১৬৯৯

শাকেৎঙ্কাঙ্ককলামানে / শম্ভোর্দ্বাদশমন্দিরঃ / নির্মমে শ্রীরাজনারা/য়নঃ ঘোষঃ শিবপ্রভূঃ।

— অর্থাৎ 'অঙ্ক' (= ৯) এবং চন্দ্রকলাপরিমিত (= ১৬) শকাব্দে বা ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে শিব যাঁর প্রভু সেই রাজনারায়ণ ঘোষ শম্ভুর দ্বাদশ মন্দির নির্মাণ করলেন।

রাজনারায়ণ ঘোষ তদানীন্তন সম্মানসূচক 'রায়মহাশয়' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কোম্পানির আমলের গোড়ার দিকে এই ধরনের বিত্তশালী ব্যক্তি বহু মন্দিরদেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রায় প্রতিটি বিত্তশালী ব্যক্তির গৃহে দুর্গোৎসব আর কালীপূজার জন্য দুর্গাদালান আর কালীদালান নির্মিত হয়েছিল। মন্দির-দেবালয়, পুকুর, দীঘি এবং বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা সেযুগে শুধুমাত্র ধর্মচর্চার জন্যেই নয়, সামাজিক মর্যাদা অর্জন এবং প্রতিষ্ঠালাভেরও মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তথাকথিত 'অজলচল' বা নিম্নজাতীয় ব্যক্তিরা প্রভূত বিত্তের অধিকারী হয়ে সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্যও বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন আঠার উনিশ শতকের মধ্যে। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুবর্ণবণিক, তেলি, তন্তুবায় জেলে, কৈবর্ত, গোয়ালা প্রভৃতি। জলচল 'নবশাখ' জাতিদের মধ্যে তাম্বুলি, শাঁখারী, গন্ধবণিক, কামার, কুমোর, মালাকার, নাপিত ঐ সময়ের মধ্যে অজস্র মন্দির নির্মাণ করেছেন। 'তথাকথিত' উচ্চবর্ণ, যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতিগণ এঁদের তুলনায় মন্দির নির্মাণ করেছেন অনেক কম। কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিত্ত অর্জনে এঁরা বরাবরই পূর্বোক্তদের চেয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন। কয়েকটি জেলার মন্দির সমীক্ষা থেকে একথা বলা যেতে পারে। বেশ কিছু মন্দিরলিপিতে প্রতিষ্ঠাতার নাম আর তাঁদের জাতিপরিচয়ও লিপিবদ্ধ আছে। মেদিনীপুর জেলায় এ ধরনের লিপিযুক্ত মন্দির বেশ কিছু লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে লিপিতে জাতিপরিচয় জানা গেছে।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী সেকালে খুবই সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্পকর্মের দ্বারা সম্পন্ন বহু ধনী ব্যক্তি এখানে বাস করতেন। তন্তুবায়জাতীয় ব্যক্তিরা এখানে খুবই বৈভবশালী ছিলেন। সোনামুখীর প্রসিদ্ধ পঁচিশচূড়া শ্রীধরমন্দিরটি এখানকার কানাই রুদ্রদাস তন্তুবায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ঐ গ্রামেরই হরি সূত্রধর সেটি তৈরি করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গ্রামে বহু মন্দিরস্থপতিসূত্রধরও সে সময় বাস করতেন। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা ১২৫২ সাল বা ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত লিপিটি যথাযথভাবে উদ্ধার করা হল ঃ

> শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ / জয়তিতরাং। শকাব্দা ১৭৬৭ বাং ১২৫২ সাল।।
> শাকে মুনিরসাব্ধীন্দুগণ্যে শ্রীধরম / ন্দিরং।। অভবত্তত্র
> সম্পূর্ন্নং পঞ্চবিং /শতিচূড়কং।। কানাঞিরুদ্রদাসেন / তন্তুবায়েন
> যত্নতঃ।। নির্ম্মায়িতং বরং সৌধং নানাচিত্রসমন্বিতং।;
> পক্ষবানার্কগণ্যে বেশানে ম্লেচ্ছাবনীপতেঃ ; হরিসূত্রধরেণ
> বনির্ম্মিতং তদাং

অর্থাৎ ১৭৬৭ শকাব্দে বাং ১২৫২ সালে পঞ্চবিংশতিচূড়াযুক্ত শ্রীধরমন্দির সম্পূর্ণ হল। তন্তুবায় কানাঞি রুদ্রদাস যত্নপূর্বক এই সুন্দর সৌধটি নানাচিত্রযুক্ত করে নির্মাণ করালেন। ম্লেচ্ছাবনীপতি বা মল্লাধিপতির ১১৫২ অব্দে (মল্লাব্দে) হরিসূত্রধর সেসময় এটি তৈরি করেছিলেন। এই মন্দিরে বেশ কিছু নিচু মানের 'টেরাকোটা' কাজ আছে। 'মাজি' পদবীধারী জেলে-কৈবর্তজাতীয় বিত্তশালী এক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত তেরচূড়ার একটি মন্দির মেদিনীপুর জেলার খড়ার শহরে লক্ষ্য করা যায়। সীতারামের এই মন্দিরটি ১৭৮৬ শকাব্দ বাংলা ১২৭১ সালে অর্থাৎ ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বরদাপরগণার (ঘাটাল) উদয়গঞ্জের অধিবাসী শ্রীব্রজলাল মাজি। পাশাপাশি আরও দুটি শিবমন্দির এই মাজিপরিবারেরই পরবর্তী বংশধরদের নির্মিত। জাহানাবাদ পরগনার সেনহাটের দু'জন মিস্ত্রি এই মন্দিরটির নির্মাতা ছিলেন। তাঁদের নাম কার্ত্তিক চন্দ্র মিস্ত্রি ও মাহিন্দনাথ মিস্ত্রি। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, ঘাটাল প্রভৃতি

সেকালের সমৃদ্ধিশালী শহরাঞ্চলে সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ও তন্তুবায়জাতীয় ব্যক্তিদের তৈরি বহু মন্দির লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রকোণা আঠার শতকে তন্তুবায়দের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানে অনেকগুলি মন্দির এঁদেরই প্রতিষ্ঠিত। সে সময় এখানের সর্বাপেক্ষা ধনী মিত্রসেনপুরের 'দাসদত্ত' পরিবার ছিলেন। এঁদেরই এক বংশধর নিমাইচরণ দাসদত্ত ১৭০২ শকাব্দ বাংলা ১১৮৭ সালে বা ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের একটি সুন্দর 'চাঁদনি' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের যথাযথ লিপিটি এখানে উদ্ধৃত হলঃ

'শ্রীরাধাকৃষ্ণ জিউ / চরণ স্বরণং / শুভমস্তু / সকাব্দাঃ ১৭০২। ১। ৩০/
শ্রীনিমাইঞ্চিচরণ দাস / দত্ত সন ১১৮৭ সাল / তারিখ ৩০ মাঘঃ'

মিত্রসেনপুরে তাম্বুলীজাতীয় ব্যক্তিগণ সমবেত কলকলী দেবীর একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা ১২৯৭ সাল বা ১৮৯০ - ৯১ খ্রিস্টাব্দে। কাছাকাছি শান্তিনাথ শিবের 'নবরত্ন' মন্দিরও সম্ভবত তাম্বুলী ভক্তগণ ১২৩৫ বঙ্গাব্দ বা ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। কিছু দূরে গোবিন্দপুর পল্লীতে খল্‌সা শিবের 'আটচালা' মন্দিরও তাম্বুলীদের প্রতিষ্ঠিত।

ক্ষীরপাইয়ে দে, দত্ত, হালদার প্রভৃতি পদবীযুক্ত গন্ধবণিকসম্প্রদায় বহু মন্দির নির্মাণ করেছেন আঠার-উনিশ শতকের মধ্যে। রামজীবনপুরে এককালে সুবর্ণবণিক এবং তাম্বুলীরা সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী ছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দির এখানে আছে। এখানকার সুবর্ণবণিক আর তাম্বুলীদের পদবী ছিল যথাক্রমে সিংহ, দে, দত্ত, পাল, বর্ধন, হালদার এবং পিরি। 'প্রামাণিক' পদবীধারী কর্মকারজাতিও এখানে কিছু কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। এঁরা সকলেই এখানে পেতল - কাঁসা, লোহা ও কাপড়ের কারবারে ধনী হয়েছিলেন। শঙ্খবণিক বা শাঁখারিদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরও এখানে দেখা যায়। এঁদের পদবী ছিল 'নন্দী'। এছাড়া নরসুন্দর বা নাপিত ও তন্তুবায়জাতীয় ব্যক্তির তৈরি মন্দির এখানে আছে। রামজীবনপুরের 'পুরাতনহাট' এলাকায় কর্মকারজাতীয় প্রামাণিকদের দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরটির লিপি এখানে যথাযথ উদ্ধার করা হ'লঃ

৭ শ্রী শ্রী দামোদরঠাকুর জিউ / ৭ শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ সকাব্দা
১৭৬২ / সন ১২৪৭ সাল তারিখ ২৩ জাস্ট / শ্রী বংসীধর দাস
প্রামাণিক মিস্ত্রী শ্রী পেলারাম সুত্রধর সাং রা/ম জীবনপুর।

উদ্ধৃত লিপিটি থেকে জানা যাচ্ছে, রামজীবনপুরে একদা মন্দিরনির্মাতা সূত্রধর সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। এইসব স্থান ছাড়া মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুর গ্রামও আঠার-উনিশ শতকে কাঁসা-পেতল, তাঁত, তসর ও রেশমশিল্পে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। তন্তুবায় ও বণিক-সম্প্রদায় এই ব্যবসায়ে খুবই ধনী হয়ে ওঠেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দির এখানে আছে। আনন্দপুরে তন্তুবায়জাতীয় 'বাগ' পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ এবং দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' মন্দির ১৭৯০ শকাব্দ বা ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরে পোড়া মাটির দু'টি লিপিফলক থেকে জানা যায়, পরীক্ষিৎ বাগ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং চন্দ্রকোণা ইলামবাজারের মিস্ত্রি ভক্তরাম দাস এটি নির্মাণ করেন। মেদিনীপুর শহরে জগন্নাথমন্দিরচকে তাম্বুলীজাতীয় ব্যক্তিগণ জগন্নাথের একটি উচ্চ দেউল মন্দির নির্মাণ করান ১৭৭৩ শকাব্দ বা ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরে সংস্কৃতে রচিত লিপিটি এই —

'জগন্নাথনিবাসার্থং শ্রীজগন্নাথমন্দিরং / জগন্নাথপদাব্জাস্তৈঃ তাম্বুলি

নিকরৈঃ কৃতং। / শুভমস্তু সকাব্দা ১৭৭৩'।

— অর্থাৎ, 'জগন্নাথের নিবাসের জন্য শ্রীজগন্নাথের মন্দির জগন্নাথের পাদপদ্মোজীবী তাম্বুলীগণ কর্তৃক নির্মিত হল। শুভ হোক, শকাব্দ ১৭৭৩'। মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা শঙ্খবণিকের পরিচয়ও মন্দিরলিপিতে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। দাসপুর থানার কাদিরপুর গ্রামের রঘুনাথ ও গোপালের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরটি শঙ্খবণিক শান্তিরাম দত্ত কর্তৃক বাংলা ১২০৬ সালে অর্থাৎ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। লিপিটি উদ্ধার করা হলঃ

সকাব্দা ১৭২২ / সন ১২০৬ সাল / তারিখ ৭ বৈশাখ /
মন্দির আরম্ভকর্তা / শ্রীশান্তিরাম দত্ত শঙ্খবণিক / সাফল মিস্ত্রী শ্রীবলরাম।

উচ্চবর্ণের বিত্তশালী 'জলচল' ও 'অজলচল' — এই দুই প্রকার ব্যক্তি বেশি সংখ্যায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেও সাধারণ সম্পন্ন গৃহস্থও গ্রামাঞ্চলের নানাস্থানে বেশ কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে মাত্র ৩৫০ টাকা খরচে দাসপুর থানার ডিহি চেতুয়া গ্রামের শীতলার 'চাঁদনি' মন্দিরটি নির্মাণ করেন ঐ গ্রামেরই মাধবী দাসী। মন্দিরলিপিটি এখানে উদ্ধার করা হ'লঃ

শ্রী শ্রী শীতলা ঠাকুরানি / সকাব্দ ১৮০৫ সন ১২৯০ সাল/
প্রঃ শ্রীমত্যা মাধবি দাসি। তস্ব পুত্র শ্রী নবীনচন্দ্র বেরা/শাঃ
ডিহি চেত্তয়া পঃ চেত্তয়া/ শ্রীউদয়চন্দ্র মিস্ত্রি / এই মণ্ডপে ৩৫০ টাকা খরচ।

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে (২০০২) লিপিটি নেই। কয়েক বছর আগে সংস্কার করার সময় এটি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

এই থানারই জোতমুরি গ্রামের সন্ন্যাসী জানা এবং হরিচরণ জানা দাসপুরের হরহরিচন্দ্র মিস্ত্রিকে দিয়ে ১৭৫০ শকাব্দ বা ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাধর শিবের একটি 'আটচালা' মন্দির নির্মাণ করান। বলা বাহুল্য, এঁরা সবই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের সংখ্যা উচ্চবিত্ত ব্যক্তিদের তুলনায় নেহাত নগণ্য নয়। মধ্যবিত্তের মধ্যে সাধারণ সংগতিসম্পন্ন কিছু কিছু সভ্রান্ত ব্যক্তিও মন্দির নির্মাণ করেছেন। এঁদের মধ্যে উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ও আছেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার নৈহাটি কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃদেব যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'যাদবেশ' শিবের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঐ মন্দিরে মার্বেল পাথরে খোদিত লিপিটি উদ্ধার করা হল ঃ

বেদবস্বশ্বভূমানে —
শাকে সংস্থাপিতঃ
শিবঃ॥ সমন্দিরো যাদবেশ
নাম্না যাদবশর্মণা।
১৭৮৪

অর্থাৎ বেদ (=৪) বসু (=৮) অশ্ব (=৭) এবং ভূ (=১) পরিমিত শকাব্দে (অঙ্কস্য বামা গতিঃ) অর্থাৎ ১৭৮৪ শকাব্দ বা ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরযুক্ত যাদবেশনামক শিবকে যাদব শর্মা সংস্থাপিত করলেন। যাদবচন্দ্রের এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ছিল চব্বিশ এবং যাদবচন্দ্রের সাতষট্টি। মন্দিরটি বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানাঘরের পার্শ্ববর্তী।

উদ্ধৃত মন্দিরলিপিগুলি এবং তাদের আলোচনা থেকে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাদের সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া মন্দিরলিপিগুলি থেকে স্থপতিদের সম্পর্কে বহু তথ্য জানতে পারা যায়। দুঃখের বিষয়, বেশিরভাগ মন্দিরে আজ আর কোন লিপি দেখতে পাওয়া যায় না। আবার, যেসব মন্দিরে লিপি আছে, অনেক ক্ষেত্রেই সেখানে স্থপতিদের উল্লেখ নেই। তবুও যে সব লিপিতে স্থপতিদের নাম ঠিকানার উল্লেখ আছে, তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। বহু জীর্ণ মন্দির লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় স্থপতিনামের উল্লেখযুক্ত অনেক লিপিও নষ্ট হয়ে গেছে। বহু তথ্য আমরা হারিয়েছি। কিন্তু তবুও আমাদের অল্প জ্ঞান এবং অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সেকালের মন্দিরস্থপতিদের সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি।

মন্দির নির্মাতা স্থপতিরা প্রধানত সূত্রধরসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। একসময় তাঁদের উপজীবিকাই ছিল মন্দিরশিল্প আর তার অলংকরণ। সূক্ষ্ম সূত্রের সাহায্যে ঠিক ঠিক মাপ নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন শৈলীর মন্দির নির্মাণে অশেষ দক্ষ ছিলেন। পাথর আর ইঁটের অসংখ্য মন্দির তাঁরা নির্মাণ করেছেন এবং সেগুলির দেওয়াল অলংকৃতও করেছেন বহু ক্ষেত্রে। টেরাকোটা এবং প্রস্তর ভাস্কর্য, এই দুইপ্রকার শিল্পকার্যেই তাঁরা সমান দক্ষ ছিলেন। এই সূত্রধরসম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী শুধুমাত্র কাষ্ঠতক্ষণে এবং অপর এক গোষ্ঠী চিত্র-অঙ্কনে নিযুক্ত থাকতেন। সূত্রধরদের বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল বাংলার কয়েকটি জেলাকে কেন্দ্র করে। এই গোষ্ঠী বা 'থাকে'র নামগুলি হল ঃ ১. 'বর্ধমান থাক'— বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে, ২. 'অষ্টকুল থাক'— মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং নদীয়ার কিছু অংশ নিয়ে। ৩. 'ব্রহ্মযজ্ঞীয় থাক'— যশোর, খুলনা এবং নদীয়ার অংশ নিয়ে এবং ৪. 'পূর্ববঙ্গ থাক'— উত্তর ও পূর্ববাংলা এবং অসম নিয়ে। (দ্রষ্টব্য ঃ বেঙ্গল টেম্পলস / বিমলকুমার দত্ত, পৃ. ৭৬, মুনসীরাম মনোহরলাল ১৯৭৫)। মন্দিরসূত্রধরদের এই বিভিন্ন 'থাক' বা গোষ্ঠী সারা বাংলায় অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছেন। প্রধানত 'চালা' 'চাঁদনি' 'দালান' 'রত্ন' এবং পরিবর্তিত 'দেউল' মন্দির এঁদের হাতে বিপুল সংখ্যায় নির্মিত হলেও অঞ্চলভেদে এই সব শৈলীর রূপান্তর সহজেই চোখে পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন সূত্রধরগোষ্ঠীর হাতে বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে এইসব মন্দিরে।

বেশ কিছু মন্দিরলিপিতে মন্দিরনির্মাতা সূত্রধরদের নাম-ঠিকানা থেকে আমরা আঠার-উনিশ শতকের বিভিন্ন সূত্রধরকেন্দ্রগুলির পরিচয় পাই। বর্তমান গ্রন্থকার মেদিনীপুর, হুগলি, নদীয়া আর বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানের মন্দির সরেজমিন অনুসন্ধান করে সূত্রধরবসতিকেন্দ্রের একটা ধারণা করতে পেরেছেন। সবচেয়ে বেশি প্রমাণ মিলছে মেদিনীপুর জেলার মন্দিরলিপি থেকে। এই জেলার পূর্বাংশের বহু মন্দিরলিপিতে সূত্রধরদের সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশে রূপনারায়ণ উপত্যকা এবং কাঁসাই-শিলাই -এর সন্নিহিত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আঠারো শতক থেকে বিশ শতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত ইঁটের বহু মন্দির নানা স্থানে মিস্ত্রিরা তৈরি করেছিলেন। মন্দিরলিপি থেকে এঁদের বসতি-স্থানের যে প্রধান প্রধান নামগুলি পাই সেগুলি হল ঃ দাসপুর, কলমিজোড়, ক্ষীরপাই, কাশীগঞ্জ, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, রাজহাটি, পাথরা (মেদিনীপুর), সেনহাটি (হুগলি), ময়ালবন্দিপুর (হাওড়া)। মেদিনীপুর ছাড়া বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, সোনামুখী এবং বালসি এবং হাওড়া জেলার থলিয়া-রসপুর গ্রামে একসময় মন্দিরসূত্রধরদের বসতি কেন্দ্রীভূত ছিল। এসব স্থানের সূত্রধরদের নাম আর ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন স্থানের মন্দিরলিপিতে। বর্ধমান জেলার কালনায় পূর্বোক্ত প্রতাপেশ্বর 'দেউল' মন্দিরের

স্থপতি ছিলেন বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর হরি সূত্রধর। তিনি তাঁর স্বগ্রাম সোনামুখীতে শ্রীধরমন্দির ছাড়া আরও কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। হরি সূত্রধরের পুরো নাম ছিল রামহরি সূত্রধর। তাঁর জামাতা রামগোপাল মিস্ত্রি সোনামুখীর শ্যামবাজার পল্লীর সিদ্ধেশ্বরের 'পঞ্চরত্ন'মন্দিরটি তৈরি করেন বাংলা ১২৭৪ সালে। মন্দিরের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়— একটি প্রশস্ত 'দালান' মন্দিরের ওপর একটি 'পঞ্চরত্নে'র সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল। বাইরের দেওয়ালে বাংলা লিপিটি এই ঃ

স্বর্ণমুখী গ্রামাস্থিতি / সূত্রধরবংশোৎপত্তি / কারিকর শ্রীরামগোপাল / সিদ্ধেশ্বর শিবালয় মরুতে সমাপ্ত হয়। স্বগ্রামের লইয়া সাহায্য / গন্ধবণিককুলধর শ্রীব্রজমোহন ঘর / সম্পাদন করিলেন কার্য / শকাব্দা সতের শ উননব্বই পরিমিত / বার শত চুয়াত্তর সাল।

সম্ভবত রামগোপালের নাতি মানিক মিস্ত্রি সোনামুখীতলার 'দালান'মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন বাংলা ১৩৫৬ সালে। সংস্কারকালীন লিপিটি উদ্ধৃত হল ঃ

পীতাম্বর হালদারের পুত্র শ্রীকিঙ্করচন্দ্র হালদারের দ্বারা এই মন্দির পুনর্গঠিত হইল সন ১৩৫৬ সাল ১৪ অগ্রহায়ণ দোয়াসি পূর্ণচন্দ্র দাস কারিগর শ্রীমানিকলাল সূত্রধর। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের উদ্ধৃত লিপিটি থেকে জানা যাচ্ছে, রামগোপাল 'সূত্রধর' জাতীয় ছিলেন। সোনামুখীর দেওয়ান-বাজারে মন্দিরনির্মাতা সূত্রধরদের বহু ঘর বসতি ছিল। তাঁদের মধ্যে গদাই মিস্ত্রি, ঋষি মিস্ত্রি এবং ভোলা মিস্ত্রির কারিগর হিসাবে যথেষ্ট সুনাম ছিল। এই সোনামুখীর মিস্ত্রিরা বাঁকুড়া আর বর্ধমানের কোন কোন স্থানে আরও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

সূত্রধরসম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠেছিল মেদিনীপুর জেলার দাসপুরে। দাসপুর আর পার্শ্ববর্তী বহু স্থানে তাঁদের হাতের তৈরি বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির আজও রয়েছে। অনেক মন্দিরলিপিতে তাঁদের নাম-ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, দাসপুর গ্রামটির অবস্থান ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্বাংশে। রূপনারায়ণ নদের কয়েকমাইল পশ্চিমে এই গ্রাম আঠার শতকের শুরু থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্যে আর শিল্পে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে এক বিরাট এলাকা জুড়ে সূত্রধরসম্প্রদায়ের বহু পরিবার বসবাস করতেন। এঁদের পদবি ছিল শীল, দে, চন্দ, দাস, সাঁই। এইসব পদবির পাশে এঁরা কখনও কখনও নিজেদের পরিচয়জ্ঞাপক 'মিস্ত্রি' পদটিও যুক্ত করতে ভালোবাসতেন। এই গ্রামে এবং দূরবর্তী স্থানের বেশ কিছু মন্দিরের লিপিতে দাসপুরের বেশ কয়েকজন মিস্ত্রির নাম জানা যাচ্ছে। এঁদের পর পর কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা গেল ঃ ১. সাফলরামচন্দ্র মিস্ত্রি (১৭৮১ খ্রি.) ২. সাফল মিস্ত্রি শ্রীবলরাম (১৭৯৯ খ্রি.) ৩. গোপাল চন্দ (১৭৯২) ৪. শত্রুঘ্ন মিস্ত্রি (১৮০৫) ৫. লোচন চন্দ ও বৃন্দাবন চন্দ (১৮২০ - ১৮৪৫) ৬. হরহরি চন্দ (১৮২১ - ১৮২৮) ৭. জটিলস্বরূপ মিস্ত্রি (১৮৩২) ৮. আনন্দ মিস্ত্রি (১৮৪৫ - ১৮৫৫) ৯. ঠাকুরদাস শীল (১৮৪৬ - ১৮৬৬) ১০. হরিদাস মিস্ত্রি (১৮৫৪ - ১৮৬৬) ১১. লোধন সাই (১৮৫৯) ১২. বৈষ্ণবদাস মিস্ত্রি (১৮৬২) ১৩. মাধবচন্দ্র মিস্ত্রি (১৮৬৪ - ১৮৭৪) ১৪. হরিচরণ দাস (১৮৬৭) ১৫. যদুরথ শীল ১৬. শীতলপ্রসাদ চন্দ্র (১৮৭০) ১৭. কালাচাঁদ মিস্ত্রি (১৮৯৫) ১৮. রামপদ দে মিস্ত্রি ১৯. নবচন্দ্র মিস্ত্রি (১৯০৫) ২০. শশিভূষণ শীল ও শিবনারায়ণ চন্দ (১৯০৭ ও ১৯০৯) ২১. মিহিরচন্দ্র মিস্ত্রি ২২. গোষ্ঠ চন্দ্র মিস্ত্রি (১৯১০)। এঁরা ছাড়াও আরও অনেক মিস্ত্রির নাম বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় আজও অজানা রয়ে গেছে।

দাসপুরের এই মিস্ত্রিরা সুন্দর সুন্দর যেসব মন্দির আঠার-উনিশ শতকের মধ্যে তৈরি করেছিলেন, স্থাপত্যসৌকর্য ও পোড়ামাটির অলংকরণে সেগুলি অন্যান্য স্থানের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। 'রত্ন'মন্দিরের ক্ষেত্রে 'চালা'র সুন্দর বক্রাকৃতি কার্নিশ ও 'রত্ন'গুলির সুচারু গঠন যে কোন শিল্পরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দেউলমন্দিরগুলি অলংকরণবাহুল্যবর্জিত হলেও নিম্নাংশ ('বাঢ়') ও শীর্ষের ভারসাম্য সুন্দরভাবে রক্ষিত এবং বক্রাকার 'রথপগ'বিন্যাসের মধ্যে আলোছায়ার প্রতিফলন হওয়ায় স্থাপত্যসৌন্দর্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। পোড়ামাটি অলংকরণের এক নিজস্ব আঞ্চলিক রীতি এখানকার শিল্পীদের হাতে বিকাশ লাভ করেছিল। ছোট্ট ছোট্ট টালিতে উৎকীর্ণ নাতিস্থূল ও নাতিসূক্ষ্ম আকৃতির নয়নাভিরাম মূর্তিগুলি এবং মূর্তিগুলির সাজপোশাক ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবের মধ্যে এক ধরনের রেখার বিন্যাস মূর্তিফলকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দাসপুর মিস্ত্রিদের তৈরি এইসব মন্দির আর পোড়ামাটি অলংকরণ অন্যান্য স্থানের চেয়ে যে স্বতন্ত্র, তা ভালভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায়। দাসপুরের এই মন্দিরস্থপতিদের মধ্যে ঠাকুরদাস শীলের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করা ছাড়াও পদ্যরচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ডেবরা থানার বলরামপুর গ্রামে মল্লিকদের সীতারামের দেউল ও জগমোহন নির্মাণে তাঁর নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেও মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে স্বরচিত একটি পদ্য তিনি উৎকীর্ণ করে রেখে গেছেন। পদ্যটির যেমন যেমন সারি ও বানান আছে ঠিক সেইরূপ অবিকল এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

শ্রীশ্রীসীতারামচন্দ্র জিউ / সুন সর্ব্বজনঃ করি নিবেদনঃ মন্দীর নির্ম্মাণ কথাঃ। দাসপূরে বাষঃ মিস্ত্রী ঠাকুরদাসঃ শিল পদবিতে গাঁথাঃ / মিস্ত্রীর সঙ্গে অশ্টজনঃ করিল শুগঠনঃ শকলে ক্ষেমতাপর্ণ। আরম্ভ সাতশষ্টী সালেঃ গেল দিন হরিবলেঃ আসশটীর আসাড়ে সংপূর্ণঃ। ইতি।

* * * * *

এই লিপিটি থেকে জানা যাচ্ছে, মন্দিরটি বাংলা ১২৬৭ সালে আরম্ভ হয়ে ১২৬৮ সালের আষাঢ়ে শেষ হয়েছিল। প্রধান কারিকর ঠাকুরদাসের সঙ্গে আরও আটজন দক্ষ কারিকর এই মন্দির নির্মাণের কাজ করেছিলেন এই মন্দিরটির সঙ্গে দাসপুর থানার জোতকেশব গ্রামের চক্রবর্তীদের দেউলমন্দিরটির বেশ মিল আছে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এই মন্দিরের মিস্ত্রি যদুরথ শীলও ঠাকুরদাস শীলের উপরি উদ্ধৃত পদ্যের অনুকরণে একটি পদ্য লিখেছিলেন। মন্দিরটি বাংলা ১৩০৯ সালে তৈরি হয়েছিল। লিপিটির কিছু অংশ যেমন বানান আছে, সেইভাবে এখানে উদ্ধার করা হল ঃ

শ্রীশ্রী মনসা মাতা শ্রীশ্রী শীতলামাতা/যুনহ সর্ব্বজন মোন্দিরনির্ম্মণকথা দাসপুরে বাস / মিস্ত্রী যদুরথ সিল পদবীতে গাথা। মিস্ত্রি সঙ্গে ১২ জন কোরে মন্দির গঠন/সকলে ক্ষেমতাপর্ণ...

দাসপুরের মতো নিকটবর্তী গ্রাম কলমিজোড়েও সূত্রধরবসতি ছিল। এই গ্রামের রাজা রামচন্দ্র, বদনচন্দ্র, হরি মিস্ত্রি, রূপচাঁদ কুণ্ডু প্রভৃতি মিস্ত্রিরা উনিশ শতকের শেষ দিকে কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে সূত্রধরদের বেশ কয়েক ঘর বসতি গড়ে উঠেছিল। চন্দ্রকোণার ইলামবাজার আর রঘুনাথবাড়ি মহল্লার মিস্ত্রিরা দূরবর্তী কেশপুর থানার আনন্দপুরে বাগেদের মন্দির নির্মাণ করেছেন।

হুগলি জেলার জাহানাবাদ পরগনার (বর্তমান আরামবাগ) সেনহাটি গ্রামে বহু সূত্রধর-পরিবারের বসতি ছিল। ঘাটাল অঞ্চলের কিছু কিছু মন্দির এঁরা নির্মাণ করেছেন। ঘাটাল অঞ্চল

সে সময় হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য, সেনহাটির মিস্ত্রি দাসপুরের কোনো কোনো স্থানে এবং তমলুকেও যে মন্দির নির্মাণ করেছেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘাটাল থানার অন্তর্গত আলুই গ্রামে ভূএগ্রাদের শিবের 'আটচালা' মন্দিরটি ১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খ্রি.) তৈরি করেন সেনহাটির গণেশচন্দ্র কুণ্ডু। সারি অনুসারে লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হল ঃ

শ্রী শ্রীমহাদে
ব সন ১২৭৪ সন
শ্রীরূপচাঁদ ভুয়ে
তাহার কিত্তি বরদা
পরগণে জেলা হুগ্লি সাকি
ম আলোয়ে
শ্রীগণেশ চ
ন্দ্র কুণ্ড শ্রী মহিন্দ্র
নাথ কুণ্ড সাকি
ম সেনহাটি ইতি।

এই থানারই কৃষ্ণপুর গ্রামে রায়েদের সিংহবাহিনীর 'নবরত্ন'মন্দিরটি ১২৮৪ সালে (১৮৭৭ খ্রি.) তৈরি করেন এই মাহিন্দি মিস্ত্রি। পার্শ্ববর্তী খড়ার গ্রামে মাজিদের বিশাল তেরো চূড়ার সীতারামমন্দিরের গঠনকার ছিলেন সেনহাটির কাত্তিকচন্দ্র মিস্ত্রি ও মাহিন্দ্রনাথ মিস্ত্রি। বাংলা ১২৭১ সালে ১৮৬৪ খ্রি.) মন্দিরটি নির্মিত হয়। যথাযথ লিপিটি এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

শ্রীশ্রী শ্রীতা / রাম জিউ শকাব্দা ১৭৮৬ । ১১ । ২৪ শ্রীব্রজলাল মাজি সাং / উদয়গঞ্জ পং বরদা গঠনকার শ্রী / কার্ত্তিকচন্দ্র মিস্ত্রী ও শ্রী মাহিন্দনাথ / মিস্ত্রী সাং সেনহাট পং জাহানা / বাদ সন ১২৭১ সাল তাং ২৪ চৈত্রী।'

সেনহাটিতে এই শতকের গোড়ার দিকেও মিস্ত্রিদের বসবাস ছিল। এই সীতারাম মন্দিরের পার্শ্ববর্তী মৃত্যুঞ্জয় শিবের 'আটচালা' মন্দিরের অন্যতম নির্মাতা ছিলেন সেনহাটের তিনকড়ি মিস্ত্রি। অপরজন ছিলেন দাসপুরের শশিভূষণ মিস্ত্রি। মন্দিরটির কাঠের দরজাটি তৈরি করেন এই খড়ারেরই বাসিন্দা শ্রীপতিচরণ মিস্ত্রি। সন ১৩১২ সাল। পার্শ্ববর্তী শশিশেখর শিবের 'আটচালা' মন্দিরের কাঠের দরজা তৈরি করেন এই গ্রামেরই বনমালী মিস্ত্রি। অতএব বোঝা যাচ্ছে, খড়ার গ্রামে কাঠের মিস্ত্রির বসতি থাকলেও দূরবর্তী সেনহাটি ও দাসপুর থেকে মন্দিরমিস্ত্রিদের আনা হয়েছিল। সেনহাটির এক মিস্ত্রি শশিভূষণ কুণ্ডু দাসপুর থানার লক্ষ্যাকুণ্ডু গ্রামে দেশ ষোল আনার রামেশ্বব শিবের 'আটচালা' মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সন ১৩০২ সালে। ১৩২৭ সালে সেনহাটির অশ্বিনীকুমার মিস্ত্রি তমলুক হরিরবাজারের জগন্নাথের 'আটচালা' ও জিষ্ণুহরির 'দেউলমন্দিরে'র সামনের 'চাঁদনি' নির্মাণ করেন। জিষ্ণুহরির 'চাঁদনি'র লিপিটি এই ঃ 'শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিস্ত্রী / পঃ বন্দর রাঝাটি সাকিম্ / সেংহাট জেলা হুগ্নী।'

জগন্নাথমন্দিরের লিপিতে 'চাঁদনি' শব্দের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

মন্দিরনির্মাণ ছাড়াও মিস্ত্রিরা সেকালে অনেক বড়ো বড়ো বসতবাটি নির্মাণেও দক্ষ ছিলেন। দাসপুরের মাধবচন্দ্র মিস্ত্রি সুদূর ময়না থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোড়াই-এর একটি বিরাট দালান বাংলা ১২৭১ সালে আরম্ভ করে ১২৮১ সালে শেষ করেন। এই দালানের প্রবেশপথের

এক লিপিতে আরও জানা যায়, এটি তৈরি করতে তখন খরচ পড়েছিল নগদ সাড়ে দশ হাজার টাকা। জানা যায়, এই লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোড়াই প্রতিষ্ঠিত দালানের অদূরবর্তী উচ্চ 'নবরত্ন'মন্দিরটিও তৈরি করেন এই মাধব মিস্ত্রি। কিন্তু লিপির অভাবে তা প্রমাণ করা কঠিন। মাধব মিস্ত্রি প্রায় পঁচিশটি স্থানে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি 'চন্দ'-পদবীধারী সূত্রধর জাতীয় ছিলেন।

সূত্রধরজাতীয় এইসব মন্দিরশিল্পী সেকালের সমাজে নিম্নজাতিরূপে পরিগণিত হলেও কারিগর বা শিল্পী হিসাবে সমাজে তাঁরা আদৌ অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন না, তা মন্দিরলিপিগুলি থেকেই প্রমাণিত হয়। লিপিগুলিতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠার নামের পাশে তাঁরা সসম্মানে স্থান পেয়েছেন। এমনকি, অনেকক্ষেত্রে লিপিতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতার নামটি অনুল্লিখিত থেকে গেলেও মিস্ত্রি বা কারিকরের নামটি উল্লিখিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাতার পরামর্শমতোই যে কাজ হয়েছিল, তাতে সন্দেহ করা চলে না। এর ভূরি ভূরি উদাহরণ আমরা মন্দিরলিপিগুলিতে পাই। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মন্দিরশিল্পীরা সে সময়েই কতখানি উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উনিশ শতকে তৈরি মেদিনীপুর জেলার বহু মন্দিরে আমরা মিস্ত্রির নাম সসম্মানে উল্লেখিত হতে দেখেছি, সেখানে প্রতিষ্ঠাতার নামের কোন উল্লেখই নেই। দাসপুর থানার হোসেনপুর গ্রামে গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন'টি নির্মাণ করেন কলমিজোড়ের রাজরাম মিস্ত্রি বাংলা ১২৯২ সালে। লিপিটি এই ঃ

'শ্রীশ্রী ৺গোপীনাথ জীউ মন্দির / সকাব্দা ১৮০৭ সন ১২৯২ সাল / শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু সিবপ্রসাদ চৌধুরি কোত্তিক / প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাজরাম মিস্ত্রী।'

আবার ঐ থানারই চাঁদপুর গ্রামে শীতলার একটি বড়ো 'চাঁদনি'মন্দির বাসুদেবপুর গ্রামের এক ব্যক্তি ললিতমোহন ঘোষ নিজ ব্যয়ে তৈরি করে দিলেও ঐ মন্দিরের মিস্ত্রি রাজারাম চন্দ্রের নামটিই শুধু লিপিতে মর্যাদার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়েছে। লিপিটি এই ঃ

শ্রীযুত রাজা রামচন্দ মিস্ত্রী / মন্দির / সাং কল্মীজোড় / সন ১৩২২ সাল।

এই রাজারাম চন্দ কলমিজোড়ের একটি 'পঞ্চরত্ন' এবং পূর্বোক্ত হোসেনপুরে গোপীনাথের 'নবরত্ন' রাসমঞ্চও তৈরি করেছিলেন। আরও বহু আগে মন্দিরলিপিতে মিস্ত্রির নাম উল্লেখিত হতে দেখা গেছে, যেমন কেশিয়াড়ির সর্বমঙ্গলামন্দির। এটির ওড়িয়া লিপিতে রঘুনাথ কামিলা আর বাসুরাম কারিকর মিস্ত্রির নাম পাওয়া যায়। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে। নিজ নামের পাশে এঁরা এঁদের পরিচয়বাহী পদবীগুলি মিস্ত্রি, ছুতার, কারিকর, সূত্রধর স্বেচ্ছায় উল্লেখ করে গেছেন লিপিসমূহের মধ্যে। এ থেকে প্রতিপন্ন হয় না যে এঁরা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন বা সমাজ এঁদের 'অবজ্ঞাভরে' এই নামগুলিই দিয়েছিল। নিম্নজাতিভুক্ত হলেও বিত্তবান মন্দির প্রতিষ্ঠাতারা এঁদের যে শিল্পীর মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেননি, তা বহু মন্দিরলিপিই প্রমাণ করেছে। খড়্গপুর থানার বেড়জনার্দনপুর গ্রামে 'আটচালা' মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা ঐ গ্রামেরই জমিদার মুক্তারাম মজুমদারের নামের সঙ্গে পাথরার 'নারায়ণ ছুতারের' নাম উল্লেখিত হয়েছে। মন্দিরগুলি ১৭৮৪ থেকে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিল্পী তাঁর বহুপ্রচলিত পদবীটিই উল্লেখ করেছেন। আবার পার্শ্ববর্তী সীতারামের লিপিতে 'নারায়ণ কারিকর' নামে তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে। পাঁশকুড়া থানার দেউলিয়া গ্রামে সিদ্ধেশ্বরের 'চারচালা' মন্দিরলিপিতে প্রতিষ্ঠাতা জমিদার শুকদেব ঘোষের নামের সঙ্গে মিস্ত্রি ছকু পালের উল্লেখ আছে। মন্দিরটি ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। আবার ঘাটালের কোন্নগরে বৃন্দাবন চন্দ্রের 'নবরত্নে'র লিপিতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতার নামের উল্লেখ

নেই, পরন্তু চৈতন্যচরণ দাস মিস্ত্রি ও শিল্পকার শ্যামাচরণ দাস মিস্ত্রির নাম পাওয়া যায়।

এসব থেকেই প্রমাণিত হয়, শেষ মধ্যযুগে বাংলার মন্দিরগুলি যখন পূর্ণতার পথে উত্তীর্ণ হচ্ছিল, সে সময় থেকেই মন্দিরনির্মাতা সূত্রধরদের নামগুলি লিপিফলকে উল্লেখিত হতে থাকে। অবশ্য, প্রবলপ্রতাপশালী রাজা বা ভূস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের লিপিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের নাম অনুল্লেখিত থাকলেও গ্রামবাংলার আনাচে- কানাচে যেসব জমিদার, উচ্চবিত্ত ভক্ত, বণিক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষ অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁরা সসম্মানে এঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, এমনকি নিজেদের নাম উল্লেখ না করেও। দুঃখের বিষয়, তথাকথিত কোনো কোনো 'গবেষক' এইসব সম্মানিত মন্দির-সূত্রধরদের অবমূল্যায়ন করে এঁদের সমাজের 'পতিত' অংশ ও সমাজ এঁদের যথাযোগ্য মূল্য দেয়নি বলে অভিযোগ করে আসল তথ্য বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন এবং নিজেকে এঁদের প্রতি যথার্থ দরদী ও সহানুভূতিশীল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে বরং উপহাস্যাস্পদই হয়েছেন। আরও হাস্যকর এই যে, সূত্রধরদের কারও পদবি 'পতি' এই শব্দটিকে অকারণে 'পতিত' এই স্বকল্পিত ভ্রান্ত পাঠ করে এঁরা সমাজে যে 'পতিত' ছিলেন তা প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছেন। যেমন, মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার গোবিন্দপুর গ্রামে তারকনাথের 'আটচালা'র লিপিতে মিস্ত্রি উদয়চন্দ্র পতি' এই নামেই 'পতি' পদবিকে অকারণে 'পতিত' বলে উল্লেখ করে প্রকৃত তথ্যকে তিনি জ্ঞাতসারে গোপন ও বিকৃত করেছেন। (দ্রষ্টব্য, 'বাংলার মন্দির ঃ মন্দিরগড়া স্থপতিদের ঠিকানা', তারাপদ সাঁতরা 'চতুষ্কোণ', ফাল্গুন, ১৩৭৬ পৃষ্ঠা ১০৪৭) এ ধরনের প্রচেষ্টা যে কিরূপ বিভ্রান্তিকর, তা এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত। সরেজমিন অনুসন্ধান আর পর্যবেক্ষণে বরং এটাই প্রতীত হয় যে, মন্দিরস্থপতি ও শিল্পী সূত্রধরসম্প্রদায় যথাযোগ্য শিল্পীর মর্যাদাই লাভ করেছিলেন সেকালে। মন্দিরলিপিগুলিই তাঁর প্রমাণ। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের দ্বারা তা প্রমাণ করা সহজসাধ্য।

শেষমধ্যযুগীয় বাংলার মন্দিরলিপিসমূহে প্রতিষ্ঠাকালজ্ঞাপক শকাব্দ ও বঙ্গাব্দ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। শকাব্দের আবশ্যিক উল্লেখ পূর্বতন ঐতিহ্যকে মুখ্যত অনুসরণ করলেও বঙ্গাব্দের প্রচলন মোটামুটিভাবে সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে চলিত হতে শুরু হয়। তার আগে সালগণনার ব্যাপারে শকাব্দ বা বিরল ক্ষেত্রে সংবৎ অব্দ ছিল সর্বভারতীয় পদ্ধতি। প্রাচীন পুঁথিপত্রেও এই নিয়ম অনুসৃত হতে দেখা যায়। আমাদের দেখা সতেরো শতকের বহু পুঁথিতে শকাব্দের উল্লেখই বেশি পাওয়া গেছে। যদিও সেগুলি বঙ্গাক্ষরে লিখিত মন্দির লিপিতেও এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে না। প্রধানত সতেরো শতকের শেষ দিক থেকে মন্দিরলিপিতে বঙ্গাব্দের উল্লেখ লক্ষ্য করা গেছে। তবে মল্লভূম রাজ্যের স্বর্ণযুগে অর্থাৎ সতেরো শতকের প্রধমার্ধ থেকে আঠারো শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত মল্লরাজাদের শাসনাধীন এলাকায় মল্লাব্দ সুপ্রচলিত ছিল। এঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরলিপিতে মল্লাব্দের উল্লেখ ছাড়া শকাব্দের উল্লেখ নেই বললেই চলে। পূর্ব আলোচনায় উদ্ধৃত লিপি থেকে এটা প্রমাণিত হয়। শুধুমাত্র মল্লশাসিত এলাকা ছাড়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তথা সারা বাংলায় শকাব্দের প্রচলন হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। তবে শকাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দের উল্লেখ যে চৈতন্যপরবর্তীকালের, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সময় থেকে, বিশেষ করে, সতেরো শতক থেকেই বঙ্গাব্দ পুথিগত ও মন্দির দালানের লিপিতে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত হতে থাকে। চৈতন্যপরবর্তীকালে বাংলার নিজস্ব শৈলীর মন্দির 'চালা', 'চাদনি' ও 'রত্ন'শৈলীর মতো বঙ্গাব্দের প্রচলনও বাংলার স্বকীয়তার পরিচায়ক এবং স্থাপত্য অলংকরণ ও নিজস্ব সংস্কৃতির

বিকাশক্ষেত্রে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় বেশিরভাগ লিপির গোড়াতেই মন্দির-অধিষ্ঠাতা দেবতার নাম এবং তার ঠিক পরেই 'শুভমস্তু শকাব্দা' এই মাঙ্গলিক বাক্যটি আবশ্যিকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। আবার কোন কোন লিপিতে শকাব্দ ও মল্লাব্দের সঙ্গে ইংরেজি সনের উল্লেখ কৌতূহল উদ্রেক করে। এই ধরনের একটি লিপি পাঁশকুড়া থানার মাংলই-শ্যামবল্লভপুর গ্রামের মাইতিদের সতেরো চূড়া রাসমঞ্চে লক্ষ্য করা যায় ঃ

শ্রীশ্রীরাধাদামুদর জীউ / শুভমস্তু শকাব্দাঃ -১৭৮০ সক ১২ / ৬৬ সাল ইঙ্গরাজী / সন ১৮৫৯ সাল / শ্রী ঠাকুরদাস মাইতি।

অপর আরও দুটি লিপি দাসপুর থানার চেতুয়া-রাজনগর গ্রামে ঘোষেদের পরিত্যক্ত 'আটচালা'য় ও হোসেনপুর গ্রামে গোপীনাথের 'নবরত্ন' রাসমঞ্চে লক্ষ্য করা যায়। এই দুটি লিপিতেও শকাব্দ ও বঙ্গাব্দের সঙ্গে খ্রিস্টাব্দেরও উল্লেখ আছে। প্রথমটির যথাযথ লিপিটি এই ঃ

শ্রী শ্রী হরি / শ্রী শ্রী*উমাপতি শিবঠাকুর / * শকাব্দা ১৮১৬* /সন* সন ১৩০১॥ সাল॥ / * ইংরাজী ১৮৯৪ / শ্রী গোপালচন্দ্র ঘোষ।

দ্বিতীয়টির লিপি ঃ

শকাব্দা ১৮১৮।। শ্রী শ্রী৺ গোপীনাথ জিউর শ্রীরাসমণ্ডপ ।। ইং ১৮৯৬ সাল / সন ১৩০৩ সাল তাং ১৬ বৈশাখ/ শ্রীমাধবচন্দ্র পলমাল কর্ত্তিক প্রকাশিত/শ্রীরাজারামচন্দ্র মিস্ত্রী / By printed

সাং কলমিজোড়।।'

এই রাজারাম মিস্ত্রিই কলমিজোড়ের মন্দিরস্থপতি সূত্রধরসম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ মন্দিরনির্মাতা ছিলেন। এই রাসমঞ্চে 'পঙ্কে'র অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্যান্য বহু মন্দিরের মতো এটিও জঙ্গলাকীর্ণ এবং অবহেলিত।

উপরি উল্লিখিত লিপিগুলি থেকে শকাব্দ আর বঙ্গাব্দের সঙ্গে খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মেদিনীপুর জেলার এই কয়েকটি মন্দিরের ইংরেজি সনের উল্লেখ দেখা যায়। এগুলি সবই উনিশ শতকের, কিন্তু গ্রাম বাংলার অখ্যাত স্থানের এই মন্দিরগুলিতে ইংরেজি সন বা খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ ঐসব অঞ্চলে ইউরোপীয়দের অবস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়। সেকালে বাংলার বহু গ্রামাঞ্চলে ইউরোপীয়দের বেশ কিছু রেশমকুঠি আর নীলকুঠি ছিল। কুঠির সাহেব সুবো আর কর্মচারীদের সঙ্গে স্থানীয় বিত্তশালী আর মধ্যবিত্তদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। ইউরোপীয়দের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের আকর্ষণ ছিল অত্যধিক। মন্দিরস্থাপত্য ও টেরাকোটায় য়ুরোপীয়দের স্থাপত্য ও শিল্পকলার কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের অনেক মন্দিরে। অবশ্য টেরাকোটা শিল্পে সাহেবসুবোর মূর্তি ও আচার-আচরণের ছাপ যতখানি পড়েছে সে-তুলনায় লিপিতে খ্রিষ্টাব্দের উল্লেখ খুবই কম। খ্রিষ্টাব্দের উল্লেখ ছাড়া সাহেবপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ মন্দিরগাত্রে প্রতিষ্ঠাতার নাম ইংরেজিতে খোদিত করার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আমাদের দেখা এরূপ একটি মন্দির আছে খড়গপুর থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামে ধর্মের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি 'চারচালা'। প্রতিষ্ঠাকাল সন ১২৭৫ সালের উল্লেখ ছাড়াও দেওয়ালে 'Titaram Dwtt, Date 12 March'-ও খোদিত আছে। বাংলার আর কোন্ কোন্ মন্দিরে এ ধরনের ইংরেজি লিপি আছে, তা লেখকের জানা নেই। অবশ্য, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত দে-পাড়ার নৃসিংহদেবের যে মন্দিরটি নদীয়াবাজ ক্ষিতীশচন্দ্র ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্কার করিয়েছিলেন সেটিতেও 'Repaired in 1896' কথাটি উৎকীর্ণ আছে।

মন্দিরলিপিতে কিছু কিছু সমসাময়িক ঘটনা বা ইতিহাস এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার ইতিহাসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেগুলির গুরুত্ব অবহেলার যোগ্য নয়। সেকালের সতীদাহপ্রথার এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তরূপে মেদিনীপুর জেলার হরিনারায়ণপুর গ্রামে (ডেবরা থানা) 'আগুনখাকীর মাড়ো' নামে পরিচিত একটি স্থানে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি আটচালামন্দির আজও লক্ষ্য করা যায়। 'আগুনখাকী' নামে পরিচিত মন্দিরটির লিপি থেকে সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথাযথ লিপি উদ্ধার করা হল ঃ 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তি / সন ১১৭২ সাল তাং ছয়াই আষাঢ় / শ্রী বলরাম বেরার মাতা সহমৃতা হইয়াছে/ সন ১৩৫১ সাল মাহ আষাঢ় জ্ঞাতিসহ মেরামত করা হইল।' আরও কোনো কোনো স্থানে 'সতীদাহে'র স্মারক এই মন্দির আছে, তবে লিপি পাওয়া কঠিন। অপরপক্ষে, মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কিছু ইতিহাস কোন কোন মন্দিরে লিপিবদ্ধ আছে। দাসপুর থানার রাধাকান্তপুর গ্রামে কাশীশ্বর শিবের 'পঞ্চরথ' দেউলমন্দিরে বাংলা পদ্যে রচিত কয়েক সারির একটি লিপি থেকে জানা যায়, কমললোচন দত্তের গয়াধামে পিতৃকৃত্য সমাপন করে কাশী যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তাঁর ভাইদের নিষেধক্রমে কাশী গমন থেকে নিবৃত্ত হলেন। ফিরে এসে তিনি কাশীশ্বর শিবেব দেউল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরটি বাংলা ১২৫২ সাল বা ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করে তিনি কাশীগমনের ফললাভের আশা চরিতার্থ করেন।

সতেরো শতকের শেষে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে সরকার মন্দারণের অন্তর্গত চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভাসিংহ ছিলেন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বর্ধমানরাজের বিরুদ্ধাচারণ করা ছাড়াও তাঁর স্বরাজ্যের নিরীহ প্রজাদের তিনি কতখানি উৎপীড়ন করেছিলেন, এক দীর্ঘ মন্দিরলিপিতে তার বিবরণ পাওয়া যায়। মন্দিরটি দাসপুর থানার রাধাকান্তপুর গ্রামে দাসেদের গোপীনাথের 'একরত্ন'। শোভাসিংহের বিদ্রোহের কিছু পূর্বে আনুমানিক সতের শতকের শেষ দিকে এটি তৈরি হয়েছিল। বাংলা ১২৫১ সালে (১৮৪৪ খ্রি.) সংস্কারের সময় মন্দিরসংস্কর্তা যজ্ঞেশ্বব দাসের রচিত ত্রিপদী ছন্দের একটি দীর্ঘ পদ্য কয়েক সারি পোড়ামাটির লিপিতে মন্দিরের সামনের দিকে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। তা থেকে জানা যায়, জনানন্দ দাস নামে এক ব্যক্তির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যাম দাস বর্ধমান থেকে গোপীনাথ বিগ্রহ আনিয়ে ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। চারপাশে পরিখাবেষ্ঠিত একটি গড় নির্মাণ করে এক বিশাল পুষ্করিণী খনন করার সময় তাঁর বহু লোকের দরকার হয়। সেসময় শোভাসিংহের কোনো কাজে বহু লোকের দরকার হওয়ায় যখন তিনি বেশি লোক পেলেন না, তখন জানতে পারলেন, পুষ্করিণী খননেব জন্য শ্যামদাস তাঁর সব লোকেদের নিযুক্ত করেছেন। একথা জানতে পেরে তিনি তাঁর এক পদাতিককে শ্যামদাসের শিরশ্ছেদ করার আদেশ দিলেন। বিপক্ষের যোগসাজসে অতর্কিতে শ্যামদাসের মুণ্ডচ্ছেদন করা হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য! সেই কর্তিত মুণ্ড 'দুর্গা দুর্গা' উচ্চারণ করল। এতে শোভাসিংহ অবাক হয়েছিলেন। এই ঘটনার ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দুশ বছর পরে ঐ বংশের যজ্ঞেশ্বর দাস ১২৫১ সালে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শমত জীর্ণ মন্দিরটির সংস্কার করেছিলেন হীরু মিস্ত্রিকে দিয়ে। অতএব এই সংস্কারকালীন লিপি অনুযায়ী মন্দিরটি ১০৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য ও পোড়ামাটির মূর্তিগুলি লক্ষ্য করে এটি অত প্রাচীন মনে করা যায় না। তাছাড়া শোভাসিংহের ঐতিহাসিক বিদ্রোহের ঘটনা ১৬৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তি এর কিছুকাল আগে সম্ভবপর। মন্দিরটিরও সম্ভবত ঐ সময়ের অর্থাৎ বিদ্রোহের কিছুকাল আগে ১৬৮০ থেকে ১৬৯০ এর মধ্যে

নির্মিত বলে মনে করা যেতে পারে। দীর্ঘ লিপিটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা হল :

রাধাকান্তপুরে বাস / নাম জনানন্দ দাস / স্বর্গে বাস এই সে কারণে ঃ
মহামহাপুণ্যবলে / সপ্তপুত্র ক্ষিতিতলে / জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামদাস নামে ঃ
যিনি দাতা পুণ্যোদয় / প্রকাশিত মহাশয় / মধ্যম তৃতীয় সহোদরে ঃ
বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া / গোপীনাথে আনাইয়া / স্থাপন করিলা এই ঘরে ঃ
নবাব পৃথিবীপতি / তার ভয়ে ব্যস্ত অতি / সীমানা ঘেরিয়া খুলিলা গড় ঃ
দামামা দরজা পরে / জয়চণ্ডীর কৃপাবরে / পুষ্করিণী খুলিলা তারপর ঃ
সন্ধান পাইল যদি / সভা সিংহ নরপতি / এই হেতু কড়া না আইসে ঃ
কম্পবান ক্রোধভরে / আজ্ঞা দিল অনুচরে / হান শির পদাতিক রোষে ঃ
বিপক্ষ হইল কাল / কাল হইল পরকাল / কিছু না জানিল মহাশয় ঃ
তাহাতে ছেদিল মুণ্ড / দুর্গা দুর্গা ডাকে তুণ্ড / শুনি রাজা মানিল বিস্ময় ঃ
কবিতা করিতে তার / এই স্থানে আঁটা ভার / হইল দুই শতেক বৎসর ঃ
সন ১২৫১ সালে / গোষ্ঠীর সহিত মিলে / নানা যুক্তি করে জনে জনে ঃ
কেহ বলে নয়া কর / কেহ বলে একেই সার / যজ্ঞেশ্বর কিছুই না লয় মনে ঃ
সন ১২৫১ সালে / গোপীনাথের কৃপাবলে / মন্দির করিল মেরামতি ঃ
হিসাব করহ সবে / ইহাতে নিকাশ পাবে / কবিতা সমাপ্ত হইল ইতি ঃ

(* দ্রষ্টব্য, 'ঘাটালের কথা'/পঞ্চানন রায় ও প্রণব রায়, পৃষ্ঠা ২৫০ - ২৫১, ১৯৭৭ সং)

যথাযথ বানান ও সারির জন্য গ্রন্থকারের ' মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ' (১৯৮৬) দ্রষ্টব্য। পৃ. ২০১

এই লিপিটিকে শোভাসিংহ সম্পর্কে এক মূল্যবান দলিল বলে মনে করা যায়। ১৬৯৫ - ৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বাংলার তদানীন্তন রাজস্বসংগ্রাহক বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে শোভাসিংহের বিদ্রোহ ও তার পরিণতি এক ঐতিহাসিক ঘটনায় পর্যবসিত। কিন্তু তারই কিছুকাল আগে এই সাধারণ ঘটনাটি থেকে শোভাসিংহের চরিত্রের অন্য একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ঐ অঞ্চলের বরদা-যদুপুরের কবি রামেশ্বর চক্রবর্তী শোভাসিংহের ভাই হেমৎ সিংহের অত্যাচারে স্বগ্রাম থেকে পালিয়ে দূরবর্তী কর্ণগড় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রামেশ্বর রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মন্দিরলিপিতে এইসব ছোটখাটো স্থানীয় ঘটনার উল্লেখ আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বহু মন্দির আজ কালকবলিত। অজস্র মন্দির লিপিহীন। তবুও যা আছে, তার সবগুলির অনুসন্ধান করা আজও সম্ভবপর হয়নি। বিভিন্ন জেলায় লিপিযুক্ত মন্দিরের সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি হয়েছে বলে জানা নেই। একাজ খুবই পরিশ্রমসাধ্য, তা বলা বাহুল্য। একক প্রচেষ্টায় তো নয়ই, বহু নিষ্ঠ গবেষকের কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত একাজ সম্পূর্ণ করা দুঃসাধ্য। বর্তমান গ্রন্থকারের এই আলোচনায় এর সামান্য একটু আলোকপাত করা গেল। যদি ভবিষ্যতে এই বিরাট কাজ কোনদিন সম্পূর্ণ হয়, তাহলে শেষমধ্যযুগীয় বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হবে।

২২
মহাভারতকথা, কৃষ্ণলীলাদৃশ্য, পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর জেলাভিত্তিক তালিকা

স্থান	মন্দির ও প্রতিষ্ঠাকাল	দৃশ্যফলক
বাঁকুড়া		
কাদাসোল (বড়জোড়া)	ঘড়ুইদের বিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (উনিশ শতকের প্রথমদিক)	রাসমণ্ডল, কৃষ্ণলীলা ও দশাবতার
কোতুলপুর	শ্রীধরজীউর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৩)	কৃষ্ণলীলা,
	'গিরিগোবর্ধন' মন্দির	ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণকালী
	হালদারদের 'দালান'	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার
জিবটা (কোতুলপুর)	রায়েদের দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৩)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার
পাত্রসায়ের	রামরঘুবীরের 'আটচালা'	কৃষ্ণলীলা
পাহাড়পুর (ইঁদাস)	নন্দীদের শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (আ. উনিশ শতকের মধ্যভাগ)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, অন্যান্য পৌরাণিকদৃশ্য
বাঁকাদহ (বিষ্ণুপুর)	রাধাদামোদরের 'আটচালা' (১৮৪৫)	কৃষ্ণ ও গোপীগণ, শিববিবাহ
শহর বাঁকুড়া	পাঠক পাড়ায় রাধাবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (আ আঠার শতক)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী
বালসি (পাত্রসায়ের)	'আটচালা' শিবমন্দির	গোষ্ঠলীলা, রাধাকৃষ্ণ ও গোপীগণ মানভঞ্জনদৃশ্য
	চন্দদের 'পঞ্চরত্ন'	ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ,

		রাধাকৃষ্ণ ও গোপী
বিষ্ণুপুর	রাসমঞ্চ (আ ১৬০০)	সংকীর্তনদৃশ্য
	কালাচাঁদের 'একরত্ন' (১৬৫৬) (পাথর)	পৌরাণিক দেবদেবী, কৃষ্ণলীলা
	রাধামাধবের 'একরত্ন' (১৭৩৭)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার
	রাধাশ্যামের 'একরত্ন' (১৭৫৮) (পাথর)	বিষ্ণুর অনন্তশয্যা, রাধাকৃষ্ণ
	মদনমোহনের 'একরত্ন' (১৬৯৪)	মহাভারতের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং ভীষ্মের শরশয্যা ও অন্যান্য কাহিনী
	শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩)	অজস্র কৃষ্ণলীলাদৃশ্য ও পৌরাণিক কাহিনী
	বসুপাড়ায় শ্রীধরের 'নবরত্ন'	কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক দৃশ্য
	কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫)	ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী
মেটাল্যা (গঙ্গাজলঘাটি)	বাবুপাড়ায় লক্ষ্মীনারায়ণের 'পঞ্চরত্ন' (১৭১৮)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার ও পৌরাণিক-কাহিনী
রাউতখণ্ড (জয়পুর)	'দে'-দের' পঞ্চরত্ন' (নাপিতপাড়া)	পৌরাণিক ও কৃষ্ণলীলা
রাজগ্রাম (বাঁকুড়া)	শ্রীধরের 'নবরত্ন' (আ উনিশ শতকের মধ্যভাগ)	বিভিন্ন দেবলীলাদৃশ্য, গজকচ্ছপবাহী গরুড়, বনদুর্গা
	কুণ্ডুদের শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (আ উনিশ শতকের মাঝামাঝি)	কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক বিষয়

সোনামুখী	বাজারপাড়ায় তন্তুবায়পরিবারের শ্রীধরের 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' (১৮৪৫)	কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক কাহিনী
হৃদলনারায়ণপুর (পাত্রসায়ের)	মণ্ডলদের 'ছোট তরফের' নবরত্ন (আ আঠার শতক)	কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক দৃশ্য
	দামোদরের 'নবরত্ন' (ছোটতরফ) (আ ১৮ শতক)	ভীষ্মের শরশয্যা, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ
	'মেজতরফের' রাধাদামোদরের 'নবরত্ন'	মহাভারতকথা, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, লৌকিকদেবদেবী, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ
	'বড়তরফের' সতেরো চূড়া রাসমঞ্চ	অনন্তশায়ী বিষ্ণু, গজলক্ষ্মী রাধাকৃষ্ণ, মহিষমর্দিনী দুর্গা শিববিবাহ, গোষ্ঠিলীলা
	'বড়তরফের' রাধাদামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮০৬)	দশাবতার, পৌরাণিকদৃশ্য

মেদিনীপুর

অযোধ্যা, রঘুনাথবাড়ি (চন্দ্রকোণা)	লালজীউর 'আটচালা' (পাথর, আ ১৮ শতক)	কৃষ্ণ-বলরাম, কৃষ্ণ ও দুপাশে গোপী, দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধ-অবতারে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ
আজুড়িয়া (দাসপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (১৮৭১)	শ্রীকৃষ্ণলীলা, গোপীদের বস্ত্রহরণ, রাসমণ্ডলচক্র, পুতনাবধ, কমলেকামিনী, 'স্টাকো'র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর
	মনসার 'চারচালা' (আ ১৯ শতক)	দশাবতার, যশোদার দধিমন্থন, গঙ্গা, শিব ও শ্রীচৈতন্য, পঞ্চানন শিব

	শীতলার দেউল (আ ১৯ শতক)	দশাবতার, রাধাকৃষ্ণ, যশোদার দধিমন্থন, বকাসুরবধ
আনন্দপুর (কেশপুর)	রাধাকৃষ্ণ ও দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৬৯)	নৌকাবিলাস, গোষ্ঠবিহার, গৌরনিতাইয়ের সংকীর্তন, গণেশ
	রঘুনাথবিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৯৩)	নৌকাবিলাস, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,
	রায়েদের শিবের 'চাঁদনি' (পাথরে তৈরি)	সিদ্ধার্থ ও হংস, বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথ, গণেশ
আলুই (ঘাটাল)	দামোদরের 'নবরত্ন' (১৮৬০)	দশাবতার, দশভুজা মহিষমর্দিনী
ইলামবাজার (চন্দ্রকোণা)	রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৭০)	বিভিন্ন টেরাকোটা
	শান্তিনাথ শিবের 'পঞ্চরত্ন'	জগদ্ধাত্রী, কালী, কৃষ্ণবলরাম, ষড়ভুজগৌরাঙ্গ
ঈশ্বরপুর (ঘাটাল)	শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন'	দশাবতার, নারায়ণ, কৃষ্ণবলরাম, কার্ত্তিক- গণেশাদিসহ দশভুজা
উত্তর গোবিন্দনগর (দাসপুর)	ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' (১৮৫০)	কৃষ্ণ-অদর্শনে শ্রীমতীর অচৈতন্যাবস্থা, রাধাকৃষ্ণ, ললিতা. গোপীগণের বস্ত্রহরণ
কানাশোল (কেশপুর)	ঝাড়েশ্বরের পঞ্চরত্ন (১৮৩৪)	কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নিদ্রামগ্ন প্রহরী, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা,

		নৌকোবিলাস, সমুদ্রমন্থন
কুশপাতা-গোবিন্দপুর (ঘাটাল)	পালিতদের লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (আ ১৮ শতকের শেষ, বর্তমানে লুপ্ত)	দশাবতার, নারদের ঢেঁকিতে গমন
ঘাটাল-কোন্নগর (ঘাটাল শহর)	সিংহবাহিনীর 'চারচালা' (১৪৯০)	ক্ষুদ্রাকৃতি কৃষ্ণমূর্তি
ক্ষীরপাই (চন্দ্রকোণা)	রাধাদামোদর ও শীতলার পঞ্চরত্ন (১৮১৭)	কৃষ্ণ ও যশোদা, শ্রীকৃষ্ণের ননীভক্ষণ, গোষ্ঠবিহার, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণবলরামের দ্বারকাযাত্রা, ঢেঁকিতে নারদ, কালী, দশভুজা মহিষমর্দিনী, শিবদুর্গা, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের নামসংকীর্তন
নবেড়িয়া (গোয়ালতোড়)	দুটি 'আটচালা'	দশাবতার, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণবলরাম, বুদ্ধাবতারে জগন্নাথ
খোরদা -বিষ্ণুপুর (দাসপুর)	পরিত্যক্ত 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৮-৪৯)	দশভুজা দুর্গা, কমলেকামিনী, দশাবতার
গম্ভীরনগর (শহর ঘাটাল)	'দে'দের 'পঞ্চরত্ন' তুলসীমঞ্চ (১৮১২)	কৃষ্ণলীলা, বৈষ্ণবলীলা, রাধাকৃষ্ণ
গড়ময়না (ময়না)	লোকেশ্বর শিবের 'আটচালা'	গোষ্ঠবিহার, নৌকাবিলাস
গোবিন্দনগর, চেঁচুয়া (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
গোবিন্দপুর (পাঁশকুড়া)	তারকনাথের 'আটচালা' (১৮৮১)	কার্ত্তিকগণেশাদিসহ দশভুজা মহিষমর্দিনী, শিবদুর্গা, কমলেকামিনী, দশাবতার গোপীদের বস্ত্রহরণ, গৌরনিতাই

গোঁসাইবাজার (শহর চন্দ্রকোণা)	শান্তিনাথ শিবের 'আটচালা' (আ ১৯ শতক)	গরুড়বাহন বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ, ব্রহ্মা
	'দে'পরিবারের বিষ্ণুর পরিত্যক্ত 'চাঁদনি' (আ ১৮ শতক)	যশোদার দধিমন্থন, গোষ্ঠলীলা, নৌকাবিলাস, হিরণ্যকশিপুবধ
গোঁসাইবেড় (পাঁশকুড়া)	রাধাবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৮ শতকেরপ্রথমার্ধ)	রাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণলীলাসম্পর্কিত
গৌরা (দাসপুর)	হাঁড়াদের লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৮২৪)	শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন
ঘোষপুর (কেশপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯শতকের প্রথমার্ধ)	নৌকাবিলাস, অনন্তনাগশয্যা, সমুদ্রমন্থন, মহিষমর্দিনীদুর্গা কার্ত্তিকেয়াদিসহ
চাউলি (ঘাটাল)	জানাদের শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮)	কার্ত্তিকেয়াদিসহ মহিষমর্দিনী, কৃষ্ণলীলা, রাসমণ্ডলচক্র
	শীতলানন্দশিবের 'আটচালা' (১৮০৯)	দশাবতার, ষড়ভুজগৌরাঙ্গ
চাঁইপাট (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (নায়েকপাড়া, ১৭৫৯)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
	রাজরাজেশ্বরের 'নবরত্ন' (১৮২৮)	কৃষ্ণলীলা
জনার্দনপুর (দাসপুর)	সীতারামের 'দেউল' (১৮১৪)	সংকীর্তনরত ভক্ত, রাধাকৃষ্ণজপরত ভক্ত
জলচক (পিংলা)	রামচন্দ্রের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১৭)	গৌরনিতাই ও পার্যদগণ
	রাধাকৃষ্ণের 'পঞ্চরত্ন'	দশাবতার মূর্তি

জয়ন্তীপুর (চন্দ্রকোণা)	শ্যামচাঁদের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৫)	মানভঞ্জন,কৃষ্ণকে স্বর্ণপিণ্ড দিয়ে ওজন, কৃষ্ণের দ্বারকাগমনে গোপীদের শোক, দ্বারকায় রাজ্যাভিষেক, দ্বাদশ গোপীর রাসলীলা
জোতমুরি (দাসপুর) ঃ	গঙ্গাধরশিবের 'আটচালা' (১৮২৮)	কার্ত্তিকগণেশাদিসহ শিবদুর্গা, গঙ্গা
ডিহি বলিহারপুর (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮)	কৃষ্ণবলরাম, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, দশাবতার, নৌকাবিলাস, কদম্ববনে কৃষ্ণের বিহার, গৌর-নিতাই
তমলুক	বর্গভীমার দেউল (আ ১৭ শতক)	ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, মূষিকবাহন গণেশ, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী, কার্ত্তিক, সরস্বতী, শিবদুর্গা, বকাসুরবধ, মকরবাহন গঙ্গা, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন
তিলন্তপাড়া (সবং)	জানকীবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১১)	মহাভারত ও কৃষ্ণলীলা-কাহিনী, চণ্ডীকাহিনী — মহিষাসুর, রক্তবীজ, শুম্ভনিশুম্ভবধ ইত্যাদি দৃশ্য, কমলেকামিনী, সমুদ্রমন্থন। কৃষ্ণকথা— দেবকীর প্রসববেদনা, কংসকর্তৃক মহামায়াকে হত্যার চেষ্টা, উগ্রসেনের নিষেধ, বসুদেবের যমুনাতরণ, কৃষ্ণকর্তৃক তৃণবর্তাসুর ও

		ঘোটকাসুরবধ
দলপতিপুর (ঘাটাল)	সঙ্কর্ষণ-রাধাদামোদরের 'নবরত্ন' (১৮০৩)	দশাবতার, রাধাকৃষ্ণ, যশোদার দধিমন্থন, গোপীদের বস্ত্রহরণ
দক্ষিণবাজার (শহর চন্দ্রকোণা)	বিধ্বস্ত জোড়বাংলা (আ ১৭ শতক)	কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, দুইভক্ত
দ্বন্দ্বীপুর (ঘাটাল)	রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	গোপীদের বস্ত্রহরণ, দশভুজা, কৃষ্ণবলরাম, সমুদ্রমন্থন
দাসপুর	সিংহদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬)	গোপীগণের বস্ত্রহরণ, শ্রীকৃষ্ণের ননিচুরি, কালীয়দমন, বকাসুরবধ
	পালেদের লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯১)	মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী, মহিষমর্দিনী, কালী
	দধিবামনের 'পঞ্চরত্ন' (পরিত্যক্ত, ১৮৪৬)	মহাভারত ও পুরাণের নানা কাহিনী
নবগ্রাম (ঘাটাল)	সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (১৭০৯)	রাধাকৃষ্ণ, পূতনাবধ, ধেনুকাসুরবধ
পাইকপাড়ি (ডেবরা)	সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (বর্তমানে 'একরত্নে' পরিণত) (১৭৭০)	হংসবাহনা বেদমাতা গায়ত্রী, কালী, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা
পুরুষোত্তমপুর (ডাক বলিহারপুর)	ব্রজরাজকিশোরের 'একরত্ন' (১৭৭২)	রাধাকৃষ্ণ, গোপীবিলাস, কীর্তনীয়া
পূর্বগোপালপুর (পাঁশকুড়া)	রাধাবিনোদের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৭৪)	গোপীদের বস্ত্রহরণ, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ

বাগরুই (কেশপুর)	লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' (আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	বিষ্ণুর অনন্তনাগশয্যা, কার্ত্তিকগণেশাদি সহ চতুর্ভুজা মহিষমর্দিনী, কৃষ্ণলীলা, জটিলা-কুটিলা, শ্রীচৈতন্যের সপারিষদ সংকীর্তন, কংসচানূরমর্দন, বৃষকেতুবধ
বাদাড় (কেশপুর)	জগন্নাথের 'নবরত্ন' (আ ১৮ শতকের প্রথম দিক)	ভীষ্মের শরশয্যা, নারায়ণ ও গজকচ্ছপের যুদ্ধ, সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর উদ্ধার, রথারূঢ় সূর্যদেবের আবির্ভাব এবং কৃতাঞ্জলি ভক্তবৃন্দের স্তুতি, সূর্য-মণ্ডলস্থিত গায়ত্রীমূর্তি
বালিতোড়া (দাসপুর)	শ্রীধরজীউর 'নবরত্ন' রাসমঞ্চ (১৮৫২)	গৌর-নিতাইয়ের নাম-সংকীর্তন, রাসলীলা
বৃন্দাবনপুর (দাসপুর)	মহাপ্রভুর 'পঞ্চরত্ন' (১৮২৭)	দ্বাদশ গোপালের বড়ো মূর্তি
বৈষ্ণবচক (খড়্গপুর লোক্যাল)	শ্রীধরজীউর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৬১)	কৃষ্ণলীলা, যমলার্জুন
ব্রাহ্মণবসান (দাসপুর)	শ্রীধরের 'আটচালা' (আ ১৯ শতক)	দশভুজা মহিষমর্দিনী কার্ত্তিকগণেশাদিসহ, কৃষ্ণলীলা, যশোদার দধিমন্থন, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা, গোপীদের বিলাপ
ভট্টগ্রাম (গোয়ালতোড়)	দামোদরের 'আটচালা' (১৮৬৭)	রাধাকৃষ্ণ, গোপীদের বস্ত্র-হরণ, দশভুজা মহিষমর্দিনী, জগদ্ধাত্রী
মালঞ্চ (খড়্গপুর লোক্যাল)	শ্যামাঠাকুরাণীর আটচালা (১৭১২)	রাসমণ্ডলচক্র
মাংলই	রাধাদামোদরের 'পঞ্চরত্ন'	অষ্টাদশভুজা

(পাঁশকুড়া)	(আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	মহিষমর্দিনী, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ
	সতেরচুড়া রাসমঞ্চ (১৮৫৯)	কৃষ্ণলীলা- গোপীদের বস্ত্রহরণ, বালকৃষ্ণের ননিচুরি, সমুদ্রমন্থন, মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর কয়েকটি দৃশ্যফলক, ঋষিগণের মহামায়ার স্তব ও দেবীর আবির্ভাব
মিত্রসেনপুর (শহর চন্দ্রকোণা)	রাধাকৃষ্ণের চাঁদনি (১৭৮০) শান্তিনাথশিবের 'নবরত্ন' (১৮২৮)	রাধাকৃষ্ণ, সংকীর্তনদৃশ্য, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা, কৃষ্ণের দ্বারকা গমন ও গোপীদের বিলাপ, গৌর-নিতাই ও অদ্বৈতাচার্যের সংকীর্তন দৃশ্য, 'স্টাকো'র হরপার্বতী ও কার্তিক গণেশ
রঘুনাথবাড়ি (গড়বেতা)	রঘুনাথের নবরত্ন (পাথরের, আ ১৭ শতক)	কৃষ্ণলীলা, দশাবতার (ভাস্কর্য)
রাজহাটি (পাঁশকুড়া)	যুগলকিশোরের 'দেউল' (পরিত্যক্ত আ ১৯ শতক)	নৃসিংহ, রামসীতা, বলরাম, রাধাকৃষ্ণ
রাণাপুর (দাসপুর)	রঘুনাথের 'নবরত্ন' (১৮০১)	কৃষ্ণলীলা
রাধাকান্তপুর (দাসপুর)	গোপীনাথের 'একরত্ন' (আ ১৮ শতক, সং১৮৪৪)	শিববিবাহ ও অন্যান্য
	দত্তদের রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (পরিত্যক্ত, ১৮৪৬)	রাসলীলা ও কৃষ্ণলীলার দৃশ্য, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি
রাধানগর (ঘাটাল)	গোপীনাথের পঞ্চরত্ন (পাথরের) (পরিত্যক্ত, ১৭১৮)	কীর্তনীয়াদল এবং গৌরনিতাইয়ের সংকীর্তনদৃশ্য, গোপী-মণ্ডল ও কৃষ্ণ
রামগড় (বিনপুর)	কালাচাঁদের 'সপ্তদশরত্ন' (১৮৫৬)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য

রামচন্দ্রপুর (ময়না)	একটি পরিত্যক্ত 'নবরত্ন' (আ ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
রামজীবনপুর	(দত্তপাড়া) লক্ষ্মীজনার্দনের 'চাঁদনি' (১৮১৪)	পৌরাণিক ও কৃষ্ণলীলা, গৌরনিতাই ও অদ্বৈতা-চার্যের মূর্তি
লস্করদীঘি (পাঁশকুড়া)	রঘুনাথের 'নবরত্ন' (১৭৯৬)	রাধাকৃষ্ণ
লাওদা (দাসপুর)	বাঁকারায়ের 'নবরত্ন' (১৮০১)	হরিনামসংকীর্তনদৃশ্য, দশাবতার(বুদ্ধাবতারে শ্রীচৈতন্য)
লালগড় (বিনপুর)	রাধামোহনের 'জোড়বাংলা' (আ ১৯ শতক)	চতুর্ভুজা কালী, মহাদেব, মৃদঙ্গবাদনরত সংকীর্তক
	রাধামোহনের দ্বিতল 'চাঁদনি'	দশাবতার, রাধাকৃষ্ণ, ছিন্নমস্তা, দশভুজা মহিষমর্দিনী (স্টাকো)
লোয়াদা (ডেবরা)	রাধাকৃষ্ণের পঞ্চরত্ন (১৮০৫)	দশাবতার
শ্যামসুন্দরপুর (শহর চন্দ্রকোণা)	অধিকারীদের রাধাকৃষ্ণের 'পঞ্চরত্ন'	দ্বাদশ গোপী ও রাধাকৃষ্ণ
শ্যামসুন্দরপুর (পাঁশকুড়া)	বিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (পরিত্যক্ত) (১৮১৩)	গোপীদের বস্ত্রহরণ, শ্রীকৃষ্ণের ননিচুরি
শ্রীধরপুর (দাসপুর)	সামন্তদের রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯ শতকের শেষ)	নারায়ণের অনন্তনাগশয্যা, পূতনাবধ। কৃষ্ণলীলা— নবনারীকুঞ্জর, গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন, রাসমণ্ডলচক্র
	বেরাদের সীতারামের 'পঞ্চরত্ন' (পরিত্যক্ত, আ ১৯ শতক)	দশাবতার, কৃষ্ণ ও গোপী

সত্যপুর (ডেবরা)	শীতলানন্দ রাধাকৃষ্ণের 'নবরত্ন' (আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	টেরাকোটা ফুল
	'নবরত্ন' রাসমঞ্চ	গোপীমূর্তি, রাধাকৃষ্ণ, দশাবতার, ষড়্ভূজ গৌরাঙ্গ
সুরৎপুর (দাসপুর)	শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৯)	কৃষ্ণলীলা, অর্ধোন্মুক্ত ভিনিসীয় দরজায় 'স্টাকো'র নারীমূর্তি
সোনাখালি (দাসপুর)	পঞ্চাননের 'আটচালা'	স্টাকোর নন্দীভৃঙ্গী
সৌলান (দাসপুর)	অধিকারীদের শ্যামসুন্দরের 'পঞ্চবত্ন' (আ ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)	গোপীদের বস্ত্রহরণ, অষ্টগোপাল
	'নবরত্ন' রাসমঞ্চ (১৮১৭)	কার্ত্তিকগণেশাদি সহ দশভুজা মহিষমর্দিনী
হবিবপুর (শহর মেদিনীপুর)	শিবের 'আটচালা'	কৃষ্ণবলরাম, রাধাকৃষ্ণ
হরিনাগেড়িয়া (ঘাটাল)	বিশ্বেশ্বরের 'দেউল'	শিবদুর্গা, কার্ত্তিকগণেশাদি মূর্তি
হরেকৃষ্ণপুর (পাঁশকুড়া)	দধিবামনের 'নবরত্ন'	শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, সমুদ্রমন্থন
	দধিবামনের 'নবরত্ন' রাসমঞ্চ (১৮৫৬)	গৌরনিতাইয়ের নামসংকীর্তন, মৃদঙ্গবাদনরত সংকীর্তনদল

হাওড়া

অমরাগড়ি (আমতা)	গজলক্ষ্মীর 'আটচালা' (১৭২৯)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
	দধিমাধবের 'আটচালা' (১৭৬৪)	কার্ত্তিকগণেশা সহ দুর্গা

আসণ্ডা (উদয়নারায়ণপুর)	শ্রীধরনাথজীউর 'নবরত্ন' (১৭৮৯)	কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য, পৌরাণিক কাহিনী
ইছানগরী (জগৎবল্লভপুর)	গড়চণ্ডীর আটচালা (ভগ্ন, আ ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
ইছাপুর (জগৎবল্লভপুর)	রাসমঞ্চ (পরিত্যক্ত)	গোপীদের বস্ত্রহরণ, রাধাকৃষ্ণ, বলরাম
কল্যাণপুর (বাগনান)	দামোদরের 'নবরত্ন' (১৭৮৬)	কৃষ্ণলীলা
কুমারপুর (জগৎবল্লভপুর)	রাসমঞ্চ (আ ১৯ শতকের মধ্যভাগ)	গৌর-নিতাই, রাধাকৃষ্ণ, শিব
খালনা (আমতা)	দামোদরজীউর 'চাঁদনি'	দশাবতার, কৃষ্ণলীলার নানা দৃশ্য
গণেশপুর (শ্যামপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (১৮২০)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য, বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবী, দশাবতার
জগৎবল্লভপুর	শিবের 'আটচালা' (১৭৬৩)	কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য
জয়পুর (আমতা)	শ্রীধরজীউর 'আটচালা' (১৭৮৪)	কৃষ্ণলীলা, কীর্তনীয়ার দল, দশাবতার ও অন্যান্য, পৌরাণিক দেবদেবী
ঝিখিরা (আমতা)	দামোদরজীউর 'আটচালা' (১৭৬৯)	দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবী
	(পশ্চিমপাড়ায়) দামোদরের 'আটচালা' (১৭৭৬)	কৃষ্ণলীলা
রাউতাড়া (আমতা)	সীতারামের 'আটচালা' (১৭০০)	কৃষ্ণলীলা ও নানা পৌরাণিক দেবদেবী, কার্তিকগণেশাদি সহ দুর্গা
	দামোদরের 'আটচালা' (১৭৬২)	দশাবতার, পৌরাণিক দেবদেবী
সীতাপুর	শ্রীধরনাথজীউর 'পঞ্চরত্ন' রাসমঞ্চ	দশাবতার, কৃষ্ণ,

(উদয়নারায়ণপুর)	(আ ১৮ শতকের মধ্যভাগ)	ব্রহ্মা, কৃষ্ণলীলা

হুগলি

আঁটপুর (জাঙ্গীপাড়া)	রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (১৭৮৬)	ভীষ্মের শরশয্যা, রাসলীলা, রাধাকৃষ্ণের ভোজনদৃশ্য, পূতনাবধ, শ্রীকৃষ্ণের ননিচুরি, কালী, ফুল লতাপাতার নক্‌শা
ইদলবাটি (গোঘাট)	(পরিত্যক্ত) 'আটচালা' (১৭২৭)	বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি পশুপক্ষী, ফুল-লতাপাতার নকশা
ইলছোবা (পাণ্ডুয়া)	শিবের 'বারোচালা'	পৌরাণিক দেবদেবীমূর্তি
উত্তরপাড়া	'তারামন্দির' এলাকায় শিবের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৪)	কৃষ্ণ ও রামলীলা
কলিস্ব (খানাকুল)	শিবের দুটি 'আটচালা' (১৭৭৩ ও ১৭৯৮)	পৌরাণিক দেবদেবী,
কৃষ্ণপুর (পোলবা)	ঘোষেদের 'আটচালা' (১৭৬২)	রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার প্রচলিত দৃশ্য
খানাকুল-কৃষ্ণনগর (খানাকুল)	রাধাবল্লভের 'একরত্ন' (১৮১২)	ফুল ও লতাপাতা
গুপ্তিপাড়া (বলাগড়)	রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (আঃ ১৮ শতকের গোড়া)	গরুড়বাহন বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ, গোপীগণ, কৃষ্ণলীলা
	বৃন্দাবনচন্দ্রের 'আটচালা' (১৮১০)	ফুল লতাপাতা
জঙ্গলপাড়া (পুরশুড়া)	পরিত্যক্ত 'আটচালা' ও মঙ্গলচণ্ডীর 'আটচালা' (আ ১৮ শতক)	বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবী রামায়ণকাহিনী, পশুপক্ষী ও ফুল লতাপাতা

তারকেশ্বর	তারকেশ্বরের 'আটচালা' (১৭২১?)	লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য, মহাভারত কাহিনী
দশঘরা (ধনিয়াখালি)	বিশ্বাসদের গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৭২৯)	সংস্কারকালীন কয়েকটি ফলক — দশভুজা মহিষমর্দিনী, রাম-রাবণের যুদ্ধ ইত্যাদি রাক্ষস ও রামলক্ষ্মণের যুদ্ধ
পারুল (আরামবাগ)	বিশালাক্ষীর 'আটচালা' (১৮৫৯)	বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি
বদনগঞ্জ (গোঘাট)	শ্রীধরলালজীউর দ্বিতল 'চাঁদনি' (১৮০৬)	বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি,
	দামোদরের 'নবরত্ন' (১৮১০)	ঐ
বালি-দেওয়ানগঞ্জ (গোঘাট)	দুর্গার 'জোড়বাংলা-নবরত্ন'	কার্ত্তিকগণেশাদিসহ দুর্গা
বাঁশবেড়িয়া	অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (১৬৭৯)	নৌকাবিলাস, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, রাসমণ্ডলচক্র অনন্তশায়ী বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, শিব
বৈঁচিগ্রাম	(বারোয়ারীতলায়) শিবের 'আটচালা'	রাসমণ্ডলচক্র ও মহিষ-মর্দিনীদুর্গা
ভালিয়া (আরামবাগ)	রঘুনাথের আটচালা (১৭৭২)	রাধাকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবদেবীমূর্তি
সুখাড়িয়া (বলাগড়)	আনন্দময়ীর 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' (১৮১৩)	কালী, কৃষ্ণকালী, অষ্টভুজা সিংহবাহিনী, পঞ্চমুখ গণেশ, দশভুজা মহিষমর্দিনী, অন্নপূর্ণা,জগদ্ধাত্রী, বকাসুরবধ, পূতনাবধ, কালীয়দমন, দুটি সিংহোপরি গণেশজননী

বীরভূম

ইলামবাজার	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৬)	রাসমণ্ডল, গিরিগোবর্ধন-ধারণ, গোষ্ঠলীলা, মহিষাসুরমর্দিনী, শিবদুর্গা, মথুরায় গমনোদ্যত কৃষ্ণ-বলরাম, সংকীর্তনদৃশ্য
	একটি 'দেউল'	রামসীতা, গোষ্ঠলীলা, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, মহিষা-সুরমর্দিনী, যুগ্ম সিংহের উপর উপবিষ্টা জগদ্ধাত্রী
উচকরণ (নানুর)	চারটি 'চারচালা' (১৭৬৮)	দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, গোপীগণসহ কৃষ্ণ, মহিষাসুরমর্দিনী, বৃষারূঢ় শিবপার্বতী
গণপুর (মহম্মদবাজার) (কালীতলা)	শিবের চারচালা (১৪ টি ১৭৬৭-১৭৭৯)	দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী, বিষ্ণুর অনন্তনাগশয্যা, রাসমণ্ডল, কার্ত্তিক-গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, দশাবতার, কৃষ্ণ-লীলার বিভিন্ন দৃশ্য, পৌরাণিক দেবদেবী
	অপর পাঁচটি 'চারচালা'	কৃষ্ণের জন্ম, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কৃষ্ণের দ্রৌপদীকে রক্ষা, সমুদ্র-মন্থনের ঘটনাসমূহ, মোহিনীকর্তৃক দেবাসুরের মধ্যে অমৃত বন্টন এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী, ফুল লতাপাতা ও পশুপক্ষী
	একটি 'আটচালা' বিষ্ণুমন্দির (১৭৬৯)	মহিষাসুরমর্দিনী, গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ
ঘুরিষা (ইলামবাজার)	(বড় মঠের) রঘুনাথজীর 'চারচালা' (১৬৩৩)	বৃষারূঢ় শিব, কালী, ছিন্ন-মস্তা এবং অন্যান্য দশ-

		মহাবিদ্যা, রাবণ, রাম, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, ত্রিবিক্রম, বলরাম, মনসা, বৃষপৃষ্ঠে হরপার্বতী, মহালক্ষ্মী, দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী, গোপীদের বস্ত্রহরণ, নবনারীকুঞ্জর, রাসমণ্ডল, গজেন্দ্রমোক্ষ, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, বলরাম, কালীয়দমন, গোষ্ঠলীলা
	গোপাল ও লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' (১৭৩৮)	সংকীর্তনরত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ, সিংহাসনারূঢ় রামসীতা, দুর্গা, দশাবতার, দশমহাবিদ্যা
চন্দনপুর (বোলপুর)	একটি দেউল (১৮৬৪)	দশাবতার, দশমহাবিদ্যা, রামসীতা, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনপরিত্যাগের দৃশ্য
জয়দেব-কেন্দুলী (ইলামবাজার)	রাধাবিনোদের 'নবরত্ন (১৬৮৩)	দশাবতার, দশদিকপাল, কৃষ্ণলীলার দৃশ্য
তারাপুর (তারাপীঠ)	তারামায়ের 'আটচালা (১৮১৮)	সপরিবারে মহিষাসুরমর্দিনী, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের দৃশ্য, ভীষ্মের শরশয্যা, 'অশ্বত্থামাহত' কাহিনীদৃশ্য, রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য, কৃষ্ণলীলা, গজ-লক্ষ্মী, মনসাদেবী
দুবরাজপুর, ময়রাপাড়া	'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দির	দশাবতার, কৃষ্ণলীলাদৃশ্য, রামসীতা, শিব, অন্নপূর্ণা, শিববিবাহ
	ওঝাঁপাড়ার শিবের ত্রয়োদশরত্ন	রামায়ণকাহিনী, নৃসিংহ, নারদ

	'নামোপাড়া'য় 'নবরত্ন'	মহিষাসুরমর্দিনী, কালী, শিববিবাহ
সেরাণ্ডী (বোলপুর)	নারায়ণের 'ত্রয়োদশরত্ন'	রাধাকৃষ্ণ, শিব
সিউড়ি	রাধাদামোদরের 'আটচালা' (আ ১৮ শতকের প্রথমদিক)	কালীয়দমন, নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ, রাসমণ্ডল, গোপীদের বস্ত্রহরণ, রাধাকৃষ্ণ, সংকীর্তন, অনন্তশয্যায় বিষ্ণু, বাহন-পৃষ্ঠে ব্রহ্মা, বায়ু, ইন্দ্র, চ, গণেশ
সুরুল (বোলপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন'	রামায়ণকাহিনী, লঙ্কাযুদ্ধ, কৃষ্ণলীলার দৃশ্যাবলী, ক্ষুদ্রাকার পদ্মফুল, পত্রলতা
	দুটি 'দেউল' (১৮৩১)	রামসীতা, দশাবতার, কার্তিকাদিসহ মহিষমর্দিনী দুর্গা
	পশ্চিমপাড়ার 'দেউল' (১৮৬১)	সিংহাসনে উপবিষ্টা রামসীতা, বীণাহস্তে শিব, পার্বতীকর্তৃক গণেশকে আদর, কার্ত্তিক, যম ও দশাবতার
হেতমপুর (দুবরাজপুর)	চন্দ্রনাথ অষ্টকোণা শিবমন্দির (১৮৪৭)	গণেশজননী, জগদ্ধাত্রী,
নদীয়া		
কামালপুর (চাকদহ)	জীর্ণ 'আটচালা' (আ ১৮ শতক)	কালী, রাধাকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবদেবী
তেহট্ট (তেহট্ট)	কৃষ্ণরায়ের জোড়বাংলা (১৬৭৮)	চতুর্ভুজ নারায়ণ, 'আটচালা' প্রতিকৃতি শিব-মন্দির, হংসপংক্তি

দিগনগর (কোতোয়ালী)	রাঘবেশ্বরের 'চারচালা' (১৬৬৯)	দশাবতার, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, কৃষ্ণরাধিকা, গোপীদের বস্ত্রহরণ, কালীয়দমন, রাম, বলরাম, বৃষভপৃষ্ঠে শিব,
দোগাছি (কোতোয়ালী)	ভগ্ন (চারচালা?) মন্দির	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
বীরনগর (উলা) (রাণাঘাট)	রাধাকৃষ্ণের 'জোড়বাংলা' (১৬৯৪)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য, পৌরাণিক দেবদেবী, কার্ত্তিক-গণেশাদি সহ মহিষমর্দিনী দশভুজা
মাটিয়ারী (কৃষ্ণগঞ্জ)	রুদ্রেশ্বর শিবের 'চারচালা' (১৬৬৫?)	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য, গোপীদের বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাস
রাণাঘাট (রাণাঘাট)	(পালচৌধুরী বাড়ির) শিবের আটচালা (দুটি)	কালী, দশভুজা, বিভিন্ন দেবদেবীমূর্তি
শান্তিপুর (শান্তিপুর)	জলেশ্বর শিবের 'চারচালা' (আ. ১৮ শতকের গোড়া)	ভীষ্মের শরশয্যা, রামায়ণ কাহিনী, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, গরুড়বাহন বিষ্ণু, হরপার্বতী, নারদ, কালী, সরস্বতী, গণেশ
	অদ্বৈতপ্রভুর 'আটচালা' (হাটখোলাপাড়া, আ ১৮ শতকের প্রথমার্ধ)	পৌরাণিক দেবদেবী — কার্ত্তিকগণেশাদি সহ দশভুজা মহিষমর্দিনী, দশাবতার, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, নারদ, কালী, যম

সহায়ক গ্রন্থ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশিত পুরাতত্ত্ববিষয়ক পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ

Michell, George (ed) *Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion,* Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983

রায় প্রণব (নদীয়ার) পুরাকীর্তি-স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত **'নদীয়া'** গ্রন্থে দীর্ঘ প্রবন্ধ ও আলোকচিত্র। প্রকাশকাল ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৩)

সমাজচিত্র ঃ জেলাভিত্তিক তালিকা

বাঁকুড়া

স্থান	মন্দির ও প্রতিষ্ঠাকাল	দৃশ্যপ্যানেল
পাত্রসায়ের	রাম রঘুবীরের 'আটচালা'	বিভিন্ন সামাজিকদৃশ্য
পাহাড়পুর (ইঁদাস)	নন্দীদের শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (আ. উনিশশতকের মধ্যভাগ)	সামাজিকদৃশ্য
শহর বাঁকুড়া	পাঠকপাড়ায় রাধাবল্লভের 'পুচরত্ন' (আ. আঠার শতক)	বিভিন্ন সামাজিকদৃশ্য
বিষ্ণুপুর	মদনমোহনের 'একরত্ন'(১৬৯৪)	কীর্তনদল, ড্রাগনের মতো পৌরাণিক জীব ওঅন্যান্য সামাজিক দৃশ্য, পশুপক্ষী
	শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩) 'বসুপাড়া'য় শ্রীধরের 'নবরত্ন' কেষ্ট রায়ের জোড়বাংলা (১৬৫৫)	বিভিন্ন সামাজিকদৃশ্য, বন্দুকধারী ফিরিঙ্গিসৈন্য, শিকারদৃশ্য, বন্যজীবজন্তু, স্থল ও নৌযুদ্ধদৃশ্য হংসপংক্তি, গৃহপালিতপশু
মেটাল্যা (গঙ্গাজলঘাটি)	বসুপাড়ায় লক্ষ্মীনারায়ণের পঞ্চরত্ন (১৭১৮)	সামাজিকদৃশ্য
রাজগ্রাম (বাঁকুড়া)	শ্রীধরের 'নবরত্ন' (আ. উনিশ শতকের মধ্যভাগ)	গণ্ডারপৃষ্ঠে আরোহী, বাঘের পিঠে ভৈরব
সোনামুখী	শ্রীধরের 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' (১৮৪৫)	পশুপক্ষী ও সামাজিকদৃশ্য, ফুলকারি নক্শা
হদলনারায়ণপুর (পাত্রসায়ের)	মণ্ডলদের ছোট তরফের 'নবরত্ন' (আ. আঠার শতক)	সামাজিকদৃশ্য, ফুলকারি নক্শা
	মেজতরফের রাধাদামোদরের 'নবরত্ন'	সামাজিক দৃশ্য
	বড়তরফের রাধাদামোদরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮০৬)	বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য

মেদিনীপুর

স্থান	মন্দির ও প্রতিষ্ঠাকাল	দৃশ্যপ্যানেল
আজুড়িয়া (দাসপুর)	'মনসার চারচালা' (আ. ১৯ শতক)	নগ্নপুংমূর্তি, মিথুনদৃশ্য
আনন্দপুর (কেশপুর)	রঘুনাথবিষ্ণুর পঞ্চরত্ন (১৮৯৩)	রেলওয়ের ওপর সাহেবের স্টীম এঞ্জিনচালনা, বন্দুকধারী সৈন্য,

ব্যাঘ্রশিকার,		বাঈজীনাচ
আমনপুর (কেশপুর)	ঘোষেদের শিবের 'চাঁদনি' (১৮৪০)	মিথুনদৃশ্য
	রায়েদের শ্রীধরের 'চাঁদনি'	য়ুরোপীয়দের প্রতিকৃতি
আমলাট (সুতাহাটা)	শিবের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯১৭)	নারীপুরুষ, মৃদঙ্গ ওকরতাল স্টাকোর বাদনরত মূর্তি
আমোদপুর (খড়গপুর)	রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন'	গৌর-নিতাই
উত্তর গোবিন্দনগর (দাসপুর)	ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' (১৮৫০)	ধনপতি-শ্রীপতির সিংহল-যাত্রা ও কমলেকামিনী
উত্তরধানখাল (দাসপুর)	শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (১৮৮৯)	মিথুনমূর্তি
কাটান (ঘাটাল)	প্রামাণিকদের শ্রীধরের দ্বিতল চাঁদনি	মিথুনদৃশ্য
কাণাশোল (কেশপুর)	ঝাড়েশ্বরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৪)	বাবাজী বা মোহন্তের পদ-সেবারতা রমণী, গোরা সৈন্যদল, কেদারায় উপবিষ্ট য়ুরোপীয় সেনানায়ক, জমিদার ও বাঈজী, মিথুন-দৃশ্য
	'আটচালা' ভোগমন্দির (১৮৫১)	মিথুনদৃশ্য
কুশপাতা-গোবিন্দপুর	পালিতদের লক্ষীজনার্দনের 'নবরত্ন' (আ আঠার শতকের শেষ, বর্তমানে লুপ্ত)	যুবতির কেশপরিচর্যা
কৃষ্ণপুর (ঘাটাল)	দামোদর ও সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (১৮২৭)	মিথুনদৃশ্য
	সিংহবাহিনীর 'নবরত্ন' (১৮৭৭)	সাহেব-মেম মিথুন, প্যান্ট ও জ্যাকেট পরিহিত বন্দুক-ধারী দুই দ্বারী
কোন্নগর (ঘাটালশহর)	সিংহবাহিনীর 'চারচালা' (১৪৯০)	বৃহদাকার দ্বারীমূর্তি পোড়া-মাটির ফুল ও নক্শা
ক্ষীরপাই (চন্দ্রকোণা)	রাধাদামোদর ও শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (দয়ালবাজার, ১৮১৭)	রমণীর কেশপরিচর্যা, নারীর শিবলিঙ্গপূজা
খুনবেড়িয়া (গোয়ালতোড়)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'আটচালা' (আ আঠার শতক)	মিথুনদৃশ্য
গঙ্গাদাসপুর (চন্দ্রকোণা)	উমাপতিশিবের 'আটচালা'	মিথুনদৃশ্য

	(আ ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	
গম্ভীরনগর (শহর ঘাটাল)	'দে'পরিবারের ' পঞ্চরত্ন' তুলসীমঞ্চ (১৮১২)	হাতি ও গোড়ায় চড়ে হরিণশিকার, অশ্বপৃষ্ঠে ব্যাঘ্রশিকার, সাহেব ও তার সামনে বন্দুকধারী গোরাসৈন্য, দুজন অশ্বারোহীর হরিণ ও বন্যবরাহশিকার, উটে দুজন আরোহী, শিকারীকে ব্যাঘ্রের আক্রমণ, জনৈক অপরাধীকে ব্যাঘ্রমুখে নিঃক্ষেপ
গড় ময়না (ময়না)	লোকেশ্বরশিবের 'আটচালা'	পতাকাধারী মুসলমান সৈনিক,অশ্বারোহীর শিকার কয়েকজন অশ্বারোহী, হার্মাদ রণতরী, হংসপংক্তি
গোবিন্দনগর, চেঁচুয়া (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দ ও রাধারমনের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১)	সাহেবের শিকারদৃশ্য হাতির ওপর বন্দুকধারী শিকারীঅশ্বারোহী দুই যোদ্ধার সম্মুখযুদ্ধ, হার্মাদ রণতরী, মুঘল সেনার যুদ্ধযাত্রা, ঝাম্পানে লোকলস্কর পরিবৃত জমিদার-নিচে শিকারীকুকুর ও ভালুকনাচ, দ্বিতল প্রাসাদকক্ষে উপবিষ্টা রমণী, হুকাসেবনরত সাহেব
গোবিন্দপুর (পাঁশকুড়া)	তারকনাথের 'আটচালা'(১৮৮১)	অর্ধোন্মুক্ত ভিনিসীয় দরজায় দণ্ডায়মান নারী
গোয়ালতোড়	সনকার 'চারচালা' (আ. ১৭ শতক)	মিথুনদৃশ্য
গোঁসাইবাজার (শহর চন্দ্রকোণা)	'দে'দের বিষ্ণুর চাঁদনি (পরিত্যক্ত, আ. ১৮ শতক)	তামাকুসেবনরত এক বাবু
গৌরা (দাসপুর)	হাঁড়াদের লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন(১৮২৪)	মিথুনদৃশ্য
ঘোষপুর (কেশপুর)	পলমলদের লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (আ. ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	মিথুনদৃশ্য

চাউলি (ঘাটাল)	শীতলানন্দের 'আটচালা (শিবের মাড়ো,১৮০৯)	মিথুনদৃশ্য
	জানাদের শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮)	ঝাম্পানে জমিদারের গমন, অশ্বারোহী ও বন্দুকধারী সৈন্য, জলদস্যু, বন্যজন্তু শিকার
চাঁইপাট (নায়েকপাড়া)	রাধাগেবিন্দের 'আটচালা') (১৭৫৯)	ব্যাঘ্রশিকার, হাতির পিঠে-চড়ে কুমীরশিকারকুচকাও-য়াজরত সৈনিক, নগ্না স্ত্রীলোক
	রাজরাজেশ্বরের 'নবরত্ন'(১৮২৮)	নগ্নানারী, মিথুনদৃশ্য
জলচক (পিংলা)	রামচন্দ্রের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১৭)	ভাঙ্প্রস্তুতকারী তপস্বী, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত বস্তুত, শকুন্তলা বা জনৈক রমনীর হরিণশাবককে খাওয়ানো মিথুনদৃশ্য,নগ্ন স্ত্রীপুরুষনগ্নাবস্থায় প্রসাধনরতা নারী
জোতমুরি (দাসপুর)	গঙ্গাধর শিবের 'আটচালা' (১৮২৮)	মিথুনদৃশ্য
তমলুক	বর্গভীমার 'দেউল' (আ. ১৭ শতক)	লীলাপমহস্তা নায়িকা
তিলন্তপাড়ার (সবং)	জানকীবল্লভের 'পঞ্চরত্ন'(১৮১১)	পোর্তুগীজ জলদস্যুদের বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্য, চেয়ারে উপবিষ্ট সাহেব-মেমের সম্ভোগদৃশ্য, নীচে কুকুর জমিদারের বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পদব্রজেগমন পরিচারক ছত্রধারী, শিকারদৃশ্য অশ্বারোহী সাহেবের হরিণশিকার, উটের পিঠে বাজনা বাজিয়ে বনে হরিণ 'খেদা'দৃশ্য, রতিবিলাস।
দ্বন্দ্বীপুর (ঘাটাল)	রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ. ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)	হার্মাদ রণতরী, গোরাসৈন্য ফরাসবিলাসী জমিদার ও

		তার পারিষদবৃন্দ, শিকার-দৃশ্য, অর্ধোন্মুক্ত দরজায় গাউন ও আধুনিক বেশধারিণী নারী, বেশ্যামূর্তি
দাসপুর	সিংহের গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬)	শিকারদৃশ্য, ফরাসবিলাসী জমিদারের ঝাম্পানে যাত্রা, হার্মাদ রণতরী ও নৌযুদ্ধ, ফুললতাপাতার সূক্ষ্মকাজ
নবগ্রাম (ঘাটাল)	সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (১৭০৯)	শঙ্খবাদনরতা স্ত্রী, গায়িকা, সন্ন্যাসী বাদকজনৈক স্ত্রীলোকের টিয়াপাখিকে আহারদান
পলাশপাই (দাসপুর)	শ্রীধরজীউর 'দেউল' (১৮৩৪)	মিথুনদৃশ্য, সাহেব-মেমের মূর্তি
পাইকপাড়ি (ডেবরা)	সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন' (এখন 'একরত্ন'. ১৭৭০)	প্যান্ট ও শার্টপরা পুরুষমূর্তি শঙ্খবাদনরতা নারীমূর্তি
পিংলা	উত্তরপাড়ায় শিবের 'দেউল' (১৮৬৯) বোসপাড়ায় চণ্ডীর 'চাঁদনি' (১৮৫৫)	নারীসহ বিলাসী জমিদার অনাবৃত বক্ষ ঘাঘরাপরা স্ত্রীমূর্তি
পুরুষোত্তমপুব (ডাকবলিহারপুর)	ব্রজরাজকিশোরের 'এক.রত্ন' (১৭৭২)	অশ্বারোহণে ব্যাঘ্রশিকার, ঝাম্পানে জমিদারের মৃগয়া, পোর্তুগীজ জলদস্যুদের জল যুদ্ধ, মৃগদল অনুসরণকারী শিকারী, পলায়মান মৃগদল
পূর্বগোপালপুর (পাঁশকুড়া)	রাধাবিনোদের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৭৪)	মিথুনদৃশ্য, পশুমৈথুন
বাগরুই (কেশপুর)	লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' (পরিত্যক্ত আ: ১৯ শতক)	কমলেকামিনী
বৈষ্ণবচক (খড়গপুর লোক্যাল)	শ্রীধরজীউর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৬১)	ধনপতি ও শ্রীপতির সিংহলযাত্রা এবং কমলেকামিনী দৃশ্য, দুটি বিশাল নারীমূর্তি

		উর্ধ্বাঙ্গে স্তনবাস ও নিম্নাঙ্গে ঘাঘরা
ভট্টগ্রাম (গোয়ালতোড়)	দামোদরের 'আটচালা' (১৮৬৭)	সাহেবসুবো, গেরাপল্টন
মালঞ্চ (খড়গপুরলোক্যাল)	শ্যামাঠাকুরাণীর 'আটচালা'(১৭১২)	শিকার ও যুদ্ধদৃশ্য বাঈজী-নাচ
রঘুনাথবাড়ি (গোয়ালতোড়)	রঘুনাথের 'নবরত্ন' (পাথরেতৈরি, আ. ১৭ শতক)	শিকার ও অন্যান্য সামাজিক দৃশ্য
রাজনগর (পাঁশকুড়া)	ঝাড়েশ্বরের 'দেউল' (আ ১৯ শতক)	বাউলসন্ন্যাসী, বেহালা বাদনরতা নারী লোলচর্চ্চা বৃদ্ধা, স্ত্রীলোকের কেশ পরিচর্যা, শিবলিঙ্গপূজা, সাধুর ভাঙঘোঁটা, মিথুনদৃশ্য
রাজহাটি (পাঁশকুড়া)	যুগলকিশোরের দেউল (পরিত্যক্ত, আ ১৯ শতক)	বিজয়দৃশ্য
রাধাকান্তপুর (দাসপুর)	দাসেদের গোপীনাথের 'একরত্ন' (আ ১৮ শতকের প্রথম, সংস্কার১৮৪৪)	যুদ্ধযাত্রার দৃশ্যের একটি প্যানেল, রণতরী, নৌযুদ্ধ, শিকারদৃশ্য, চড়ক, খেজুর রসের জন্য খেজুরগাছে আরোহণ
	রঘুনাথের পঞ্চরত্ন (দত্তদের) (পরিত্যক্ত, ১৮৪৬)	বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য
রামগড় (বিনপুর)	কালাচাঁদের 'সপ্তদশরত্ন' (১৮৫৬)	বন্দুকধারী গোরাসৈন্য, অশ্বযানে সাহেব-মেমের যাত্রা
লস্করদীঘি (পাঁশকুড়া)	পন্ডাদের রঘুনাথের 'নবরত্ন' (১৭৯৬)	মিথুনদৃশ্য
লাওদা (দাসপুর)	বাঁকারায়েব 'নবরত্ন' (১৮০১)	উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপের মৈথুনদৃশ্য, পশুমৈথুনদৃশ্য
লালগড় (বিষ্ণুপুর)	রাধামোহনের দ্বিতল 'চাঁদনি' (আ ১৯ শতক)	মিথুনদৃশ্য
	দুর্গার 'চাঁদনি'	নর্তকী
লোয়াদা (ডেবরা)	রাধাকৃষ্ণের 'পঞ্চরত্ন' (১৮০৫)	ময়ূরের সর্পবধ, নগ্না নারী মূর্তি
শিরোমণি (মেদিনীপুর)	সিংহবাহিনীর 'একরত্ন' (পরিত্যক্ত, আ ১৯ শতক)	দুটি দণ্ডায়মান দ্বারী ও দ্বিতলগৃহ
শ্যামসুন্দরপুর-পাটনা (পাঁশকুড়া)	বিষ্ণুর পঞ্চরত্ন (পরিত্যক্ত, ১৮১৩)	মিথুনদৃশ্য

শ্রীধরপুর (দাসপুর)	সামন্তদের রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৯ শতকের শেষদিক)	মাতৃক্রোড়ে শিশু, দধিভান্ড-বহনরত গোপ, অশ্বারোহীর ব্যাঘ্রশিকার, বৃদ্ধের স্কন্ধে উপবিষ্টা বৃদ্ধা
	নীলকণ্ঠ শিবের ভগ্ন 'পঞ্চবত্ন'	মিথুনদৃশ্য
সত্যপুর (ডেবরা)	সত্যেশ্বরের 'দেউল'	রাজারাণী, মিথুনদৃশ্য
	'নবরত্ন' রাসমঞ্চ	মিথুনদৃশ্য
সুরৎপুর (দাসপুর)	শীতলার 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৯)	ধনপতি-শ্রীপতির সিংহলযাত্রা ও কমলেকামিনীদৃশ্য, মিথুনদৃশ্য
সোনাখালি (দাসপুর)	পঞ্চাননের 'আটচালা' (১৭৭৩)	মিথুনদৃশ্য, পশুমৈথুন
সৌলান (দাসপুর)	অধিকারীদের শ্যামসুন্দরের 'পঞ্চরত্ন' (আ. ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)	কমলেকামিনীদৃশ্য
হবিবপুর (শহর মেদিনীপুর)	শিবের 'চারচালা'	মিথুনদৃশ্য
হরিনাগেড়িয়া (ঘাটাল)	বিশ্বেশ্বরের 'দেউল'	সাহেব-মেমের মিথুনদৃশ্য

হাওড়া

অমরাগড়ি (আমতা)	গজলক্ষ্মীর 'আটচালা' (১৭৩৯)	বন্দুকধারী গোরাসৈন্যের কুচকাওয়াজ, রণভেরী ও বাদ্যভাণ্ডসহ বাদক এবং ঢাল-তরোয়ালহাতে দেশি পাদতি, হরিণদল, বিকশিত পদ্ম ও কল্পলতা, হংসপংক্তি ও গোরুর পাল
	দধিমাধবের 'আটচালা' (১৭৬৪)	য়ুরোপীয় অর্ণবপোত ও নাবিক, হাতি বা ঘোড়ার পিঠে বসে শিকার, বাদ্যভাণ্ডসহ পদতি ঘোড়ার গাড়িতে ভ্রমণ, পালকিতে করে জনৈক

		বাবুর গমন, মিথুনদৃশ্য, বিভিন্ন শিকারদৃশ্য
আসণ্ডা (উদয়নারায়ণপুর)	শ্রীধরনাথজীউর 'নবরত্ন' (১৭৮৯)	বন্দুকসহ গোরা সৈন্য, বাদ্যভাণ্ডসহ পদাতি, পালকিতে ভ্রমণ, মল্লযুদ্ধ, মিথুনদৃশ্য
ইছানগরী (জগৎবল্লভপুর)	গড়চণ্ডীর (ভগ্ন) 'আটচালা' (আ ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)	মোহান্ত, প্রহরী, যোদ্ধৃবৃন্দ, সুন্দরী রমণী
কল্যাণপুর (বাগনান)	দামোদরের 'নবরত্ন' (১৭৮৬)	গৃহবধূর ঢেঁকিতে ধানভানা, ধোবার কাপড় পরিষ্কার, নাপিতের ক্ষৌরকর্ম, কামারের হাপর চালানো ও লোহা পিটানো, তাঁতি-মেয়ের চরকায় সুতোকাটা, মিথুনদৃশ্য
কুমারপুর (জগৎবল্লভপুর)	রাসমঞ্চ (আ ১৯ শতকের মধ্যভাগ)	জপমালাহস্তে সাধু, মাতৃস্তন্যপানরত শিশু, বর্শাধারী দ্বারী, বাদ্যযন্ত্রসহ বাদিকাবৃন্দ
খালনা (আমতা)	দামোদরজীউর চাঁদনি	শিশুকোলে স্ত্রী, পাখাহাতে স্ত্রীলোক, নর্তকী, কলসি কাঁখে গৃহবধূ, মল্লবীর, মৈথুনরত স্ত্রীপুরুষ বন্দুকধারী সাহেব, বিভিন্ন ভঙ্গিতে মোহান্ত
জগৎবল্লভপুর	শিবের আটচালা (১৭৬৩)	শিকার ও যুদ্ধযাত্রাদৃশ্য
ঝিখিরা (আমতা)	শ্যামসুন্দরের 'আটচালা' (১৬৯১)	শিকারদৃশ্য, পোর্তুগীজ জলদস্যুকর্তৃক ধৃত এদেশের স্ত্রী-পুরুষ-বোঝাই

		জাহাজ, মিথুনদৃশ্য, হংসমৈথুনদৃশ্য
	দামোদরজীউর 'আটচালা' (১৭৭৬)	ফরসিবিলাসী জমিদার ও তার সামনে যুদ্ধরত দুইমল্ল
মেল্লক (বাগনান)	মদনগোপালের 'আটচালা' (১৬৫১)	বেদেনীদের কলাকৌশল, মোহান্ত
রাউতাড়া (আমতা)	সীতারামের 'আটচালা' (১৭০০)	অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী, বর্শাহাতে অশ্বারোহী শিকারী, পালকিতে করে জমিদারবাবুর যাত্রা, যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত অশ্ব, ফরসি-বিলাসী বাবু,পাত্রমিত্র-সমেত ধনী বা জমিদারের নৌকাভ্রমণ, মোহান্ত, বাদক-বাদিকা
সীতাপুর (উদয়নারায়ণপুর)	শ্রীধরনাথজীউর 'পঞ্চরত্ন' রাসমঞ্চ (আ ১৮ শতকের মধ্যভাগ)	জমিদার বা বাবুর পদ-সেবারত স্ত্রী, নর্তকী,বন্দুক-হাতে শিকারী, হাতীর পিঠে শিকারী, হরিণশিকারী মিথুনদৃশ্য

হুগলি

আকনাপুর (তারকেশ্বর)	দুটি 'আটচালা' (পরিত্যক্ত, ১৭৫৮ ও ১৭৬০)	প্রথমটিতে (১৭৫৮) রাজদরবার এবং প্রমোদ-ভ্রমণের জন্য দেশীয় নৌকা এবং অন্যটিতে কামান-সজ্জিত য়ুরোপীয় জাহাজ ও অত্যাচারের দৃশ্য
আঁটপুর (জাঙ্গীপাড়া)	রাধাগোবিন্দের আটচালা (১৭৮৬)	য়ুরোপীয় দ্বিতল যুদ্ধ-

		জাহাজ ও অত্যাচারী দস্যু
ইলছোবা (পাণ্ডুয়া)	শিবের 'বারোচালা' (আ. ১৮ শতক)	জীবজন্তু ও ফুললতাপাতার নক্‌শা ও প্রতিকৃতি, য়ুরোপীয় রণতরী, ডেকের ওপর কামানধারী
	ঘোষেদের শিবের 'আটচালা' (১৭২৬)	ফুল লতাপাতা
কলিম্ব (খানাকুল)	শিবের আটচালা (১৭৭৩)	রাজদরবার
কয়াপাট (গোঘাট)	শ্রীধরের 'নবরত্ন' (১৮০৭)	রাজদরবার ,পশুপক্ষী
কাঁকড়াকুলি (ধনিয়াখালি)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'আটচালা' (১৭৩৩)	য়ুরোপীয় রণপোত, গোলা-বর্ষণরত লোক
কৃষ্ণপুর (পোলবা)	ঘোষেদের 'আটচালা' (১৭৬২)	রাজদরবার, পশুপক্ষী, য়ুরোপীয় বাণিজ্যপোত, কেবিনে হস্তী, ফুল লতাপাতা
খেদাইল (আরামবাগ)	দামোদরের 'আটচালা' (১৭৬৭)	য়ুরোপীয় যুদ্ধজাহাজ, কামানসহ সৈনিক,
গুপ্তিপাড়া (বলাগড়)	চৈতন্যদেবের জোড়বাংলা (আঃ ১৬ শতক)	কয়েকটি পদ্মফুল
	রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (আ ১৮ শতকের গোড়ার দিক)	দেশীয় প্রমোদতরণী, নাবিক, দরবারগৃহে অভিজাতব্যক্তি, বাদক, নর্তক-স্ব-স্ব কর্মরত
কোটালপুর (জাঙ্গীপাড়া)	(পরিত্যক্ত) আটচালা (১৭৭৪)	য়ুরোপীয় যুদ্ধজাহাজ, 'ডেকে' অদ্ভুত আকৃতির লোক, নিচে কামান, সৈন্যদের চারদিকে ছোট ছোট নৌকা ·
গোবিন্দপুর (পূর্ব-জোঙ্গীপাড়া)	পালেদের চণ্ডীর 'আটচালা'	দেশীয় প্রমোদতরণী,

	(১৭২৭)	সভাগৃহ ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি, সশস্ত্র প্রহরী
জঙ্গলপাড়া (পুরশুড়া)	মঙ্গলচণ্ডীর 'আটচালা' (আ ১৮ শতকের শেষ)	য়ুরোপীয় রণতরী, ডেকে সৈন্য, নিচে কেবিন ও কামান
তারকেশ্বরের 'আটচালা'	(১৭১১ বা ১৭২১?)	ঝাম্পানে জমিদারের অন্যত্র গমন এবং বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য
দশঘরা (ধনিয়াখালি)	বিশ্বাসদের গোপীনাথের পঞ্চরত্ন (১৭২৯)	১৯৩৭ সালের নতুন টালিতে আছে-স্ত্রীলোকের চরকাকাটা, মিথুনদৃশ্য, সপারিষদ ও ভক্তবৃন্দসহ শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের নামসংকীর্তন
দ্বারহাট্টা (হরিপাল)	রাজবাজেশ্বরের 'আটচালা' (১৭২৮)	পোর্তুগীজ বা হার্মাদ রণ-তরী, ডেক ও কেবিনের ওপর লোক এবং নীচে কামান - য়ুরোপীয়দের ক্ষুদ্র তরণী, একমাত্র মাস্তুল ও দুটি কামানসহ দেশীয় প্রমোদ তরণী, ওপরেরকক্ষে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং সশস্ত্র প্রহরী
পারুল (আরামবাগ)	রঘুনন্দনের 'আটচালা' (১৭৬৮)	রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী, ফুল-লতাপাতা
পুরুষোত্তমপুর (সিঙ্গুর)	বিশালাক্ষীর আটচালা (১৭৪০)	য়ুরোপীয় রণতরী— ভেতরে সশস্ত্র সৈন্য, নিচে কামান ও সেই সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী সহ আরও ছোট ছোট নৌকো

প্রসাদপুর (পাণ্ডুয়া)	পালেদের (পরিত্যক্ত) 'আটচালা' (১৭৬৪)	ফিরিঙ্গি জাহাজ-ডেক ও কেবিন
বদনগঞ্জ (গোঘাট)	শ্রীধরলালজীউর দ্বিতল 'চাঁদনি' (১৮০৬) এবং দামোদরের 'নবরত্ন' (১৮১০)	রাজদরবারের দৃশ্য
বরিজহাটি (চণ্ডীতলা)	মল্লেশ্বরের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৮ শতকেরগোড়া)	জীবজন্তু ও সামাজিক দৃশ্য
বাখরপুর (পুরশুড়া)	ভট্টাচার্যদের 'আটচালা'	রাজদরবার, পশুপক্ষী ও ফুল লতাপাতা
বাঁশবেড়িয়া	অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (১৬৭৯)	যুদ্ধদৃশ্য, অশ্বারোহী সৈনিক, নৌদৃশ্য, সমুদ্রযাত্রা, সাধুর নিকট রাজার দীক্ষা-গ্রহণ, ব্যাঘ্র, হরিণ
বাহিরগড় (জাঙ্গীপাড়া)	দামোদরের 'আটচালা' (১৭৪৩)	য়ুরোপীয় যুদ্ধজাহাজ, ডেকের ওপর লোক, নীচে কামান
বৈঁচিগ্রাম (পাণ্ডুয়া)		এখানের আঠার শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত বহু 'টেরাকোটা' মন্দিরে সুন্দর সুন্দর ফলকে নানা সামাজিক দৃশ্য আছে।
ভালিয়া (আরামবাগ)	রঘুনাথের 'আটচালা' (১৭৭২)	বহু 'ডেক'যুক্ত য়ুরোপীয় যুদ্ধ জাহাজ, রাজদরবার, পশুপক্ষী এবং ফুল-লতাপাতা
মামুদপুর ((গোঘাট)	রায়েদের বিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (১৮০৬)	দড়াদড়িসহ দেশীয় নৌকা, ওপরে সশস্ত্র সেনা, ডেকের নিচে কেবিনে

		লোক, জলদস্যুতা বা দাসব্যবসার জন্য জোড়া দেশীয় নৌকা
রাজবলহাট (জাঙ্গীপাড়া)	শ্রীধরদামোদরের 'আটচালা' (১৭২৪)	এখানে কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ খুবই উল্লেখ-যোগ্য-সশস্ত্র সৈন্য, পশু, ফুল লতাপাতা, রাজদরবার
	রাধাকান্তের 'আটচালা' (১৭৩৩)	বিভিন্ন সামাজিকদৃশ্য
রামনগর (আরামবাগ)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'আটচালা' (১৭৪১)	একজোড়া দেশীয় নৌকা, জলদস্যুতার দৃশ্য
শোঙালুক (পুরশুড়া)	গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (আ ১৮ শতকের গোড়া)	একজোড়া দেশীয় নৌকা— একটিতে লোকপরিপূর্ণ
শ্রীরামপুর	(পরিত্যক্ত) রাধাবল্লভের 'আটচালা' (আ ১৭ শতক) (পরবর্তীকালে 'হেনরি মার্টিনের প্যাগোডা')	ফুল, লতাপাতা ও বাতিদান
সাহাগঞ্জ-খামারপাড়া (চুঁচুড়া)	একটি পরিত্যক্ত আটচালা (১৭২৫)	বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য
সুখাড়িয়া (বলাগড়)	আনন্দময়ীর 'পঞ্চবিংশতিরত্ন' (১৮১৩)	মালাজপরত কৌপিনধারী মোহান্ত, পাশে ভাঙঘোঁটা কৌপিনধারী সন্ন্যাসী, শিবলিঙ্গপূজা, ময়ূরকে খাওয়ানো, ফরসীবিলাসী জমিদার, তরোয়ালধারী অশ্বারোহীর হরিণ শিকার, ঘোড়ার গাড়িতে জমিদারের গমন - সামনে লোকলস্কর, তিনটি হাতির ওপর হাওদায় পাগড়িধারী ব্যক্তিবর্গ।

হাটবসন্তপুর (আরামবাগ)	জয়চণ্ডীর আটচালা (১৭৩৭)	য়ুরোপীয় যুদ্ধজাহাজ, ডেকের ওপর লোক, নিচে কামান
ঘুরিষা (ইলামবাজার)	দত্তদের গোপাল ও লক্ষ্মী-জনার্দনের 'নবরত্ন' (১৭৩৮)	ফিরিঙ্গি সৈন্য, য়ুরোপীয় বেশভূষায় জনৈকা মহিলা
তারাপুর (তারাপীঠ)	তারামায়ের 'আটচালা' (১৮১৮)	শিকারদৃশ্য, শোভাযাত্রা, যুদ্ধের দৃশ্যাবলী, বলিদানের দৃশ্য
দুবরাজপুর, ময়রাপাড়া	'এয়োদশরত্ন' মন্দির	দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা-সমূহ
	ওঝাপাড়ায় শিবের 'ত্রয়োদশরত্ন'	হাতীর পিঠে শিকারী ও নৌকায় ভ্রমণ
সুরুল (বোলপুর)	দুটি দেউল	য়ুরোপীয় বেশভূষায় সজ্জিতা নারী, অন্তঃপুরিকা
	পশ্চিমপাড়ার 'দেউল' (১৮৬১)	অশ্বারোহী, গজসিংহমূর্তি, বাতায়নবর্তী সাহেব ও মেম
হেতমপুর (দুবরাজপুর)	চন্দ্রনাথের অষ্টকোণাকৃতি শিবমন্দির (১৮৪৭)	সামাজিক দৃশ্যাবলী, য়ুরোপীয় শৈলীর বিভিন্ন মূর্তি — কবি, জননায়ক, ভিক্টোরিয়া
নদীয়া		
কামালপুব (চাকদহ)	জীর্ণ 'আটচালা' (আ ১৮ শতক)	মিথুনদৃশ্য

দিগ্‌নগর (কোতোয়ালী)	রাঘবেশ্বরের 'চারচালা' (১৬৬৯)	পাল্‌কিতে করে বাবু বা জমিদারের যাত্রা, অশ্বারোহী শিকারী, হাতী ও উটের পিঠে সওয়ার, মিথুনদৃশ্য, হংসপংক্তি, শালভঞ্জিকা, সাধু, সৈনিক
দোগাছি (কোতোয়ালী)	ভগ্ন (চারচালা) মন্দির	মিথুনদৃশ্য, মোহান্ত
বীরনগর (উলা) (রাণাঘাট)	রাধাকৃষ্ণের জোড়বাংলা (১৬৯৪)	সাঙ্গোপাঙ্গসহ পাল্‌কিতে 'বাবুর' গমন, নৌকায় প্রমোদ-ভ্রমণ, শিকারদৃশ্য, সৈন্যদল, বাণিজ্যতরী
মাটিয়ারি (কৃষ্ণগঞ্জ)	রুদ্রেশ্বর শিবের 'চারচালা' (১৬৬৫ ?)	বর্মধারী সশস্ত্র বাদশাহী সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য ও যুদ্ধদৃশ্য, সাহেবদের ব্যাঘ্র ও হরিণশিকার, প্রাণভয়ে হরিণের পলায়ন, সাজসজ্জাযুক্ত হস্তী। বাদশাহী সৈন্যের আধিক্য এখানে লক্ষ করা যায়। ফুল লতাপাতার নক্‌শা ও জ্যামিতিক নকশা
বাণাঘাট (রাণাঘাট)	(পালচৌধুরী বাড়ির) শিবের দুটি আটচালা	ফুল লতাপাতার নকশা, সামাজিক বিভিন্ন দৃশ্য, প্রতিকৃতি শিবমন্দির
শান্তিপুর (শান্তিপুর)	জলেশ্বরের 'চারচালা' (আ ১৮ শতকের প্রথমদিক)	বন্দুকধারী ফিরিঙ্গি সৈন্য বা সাহেব, তীরন্দাজ ব্যাধ বা শিকারী, বণিক, ঢালসজ্জিত যোদ্ধা বা বীর, মিথুনদৃশ্য
শান্তিপুর	'হাটখোলাপাড়া'য় (মধ্যমগোস্বামীবাড়ি) অদ্বৈতপ্রভুর 'আটচালা' (আ ১৮ শতকের প্রথমার্ধ)	তীরন্দাজ ব্যাধ ও হরিণ-পালের পলায়নদৃশ্য, শিকারদৃশ্য, ঝাম্পান বা

পাল্‌কিতে 'বাবু' বা জমি-
দারের যাত্রা, ফুল-
লতাপাতা ও জ্যামিতিক
নকশা

সহায়ক গ্রন্থ

Michell, George (ed) · *Brick Temples of Bengal From the Archives of David Mccutchion*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশিত পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পূর্বোক্ত গ্রন্থ সমূহ

রায়, প্রণব ঃ (নদীয়ার) পুরাকীর্তি (স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কৃষ্ণনগর থেকে **'নদীয়া'** গ্রন্থে প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধ, প্রকাশকাল ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৩)

পরিশিষ্ট

ক

মন্দির-টেরাকোটা'য় রাধা

শেষ-মধ্যযুগ থেকে বাংলায় যে অসংখ্য মন্দির তৈরি হতে থাকে, তার বেশির ভাগই ছিল ইঁটের, তুলনায় পাথরের মন্দির খুবই কম। কয়েক হাজার ইঁটের মন্দিরের মধ্যে প্রায় পনের শতাংশ টেরাকোটা-মূর্তিফলকে সজ্জিত। মূর্তি ও মূর্তিফলকের আকার, আয়তন, বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গিমা ও অঙ্গবিন্যাস লক্ষ্য করে একথা বলা যায়, এগুলিতে আঞ্চলিক ও লৌকিক চরিত্রই বেশি করে ধরা পড়েছে। বিষয়টি পরিস্ফুট করার আগে আমরা মন্দিরগুলির নির্মাণকালপর্বকে মোটামুটিভাবে খ্রিস্টীয় ষোল শতক থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফেলতে পারি। অবশ্য, এই সময়সীমা যে একান্তই আনুমানিক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, এই কালপর্বকে আরও একশ বছর পিছিয়ে নেওয়াও অসঙ্গত নয়। তবে মন্দির 'টেরাকোটা' অলংকরণের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বোক্ত সময়সীমা নির্ধারণ খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, এই সময়েই 'টেরাকোটা' অলংকরণের অভূতপূর্ব বিকাশ ও সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

এই সময়ের টেরাকোটা-মূর্তিফলকগুলির বিষয়বস্তুতে দেবলীলা ও সমাজচিত্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার কবেছে। এর সঙ্গে বিচিত্র ধরনের নকশা, মূর্তিফলকগুলির বর্ণনীয় বিষয়কে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। দেবলীলার মধ্যেও কৃষ্ণের বিচিত্র কথা টেরাকোটা-অলংকরণশিল্পীদের কাছে বর্ণনীয় বিষয় হয়ে ওঠে। রামের ক্ষেত্রে বাল্মীকির চেয়ে কৃত্তিবাসের বামকথাকেই তাঁরা বরণ করে নিয়েছিলেন। অপরপক্ষে, কৃষ্ণও তাঁদের কাছে মহাভারত বা ভাগবতপুরাণের পুরুষোত্তম বা বীরোত্তম কৃষ্ণ নন, তিনি ছিলেন গোপিকারমণ কৃষ্ণ, বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণ —যার লীলাবিলাস আপামর বাঙালি জাতিকে ভক্তিরসে অভিষিঞ্চিত করেছিল। 'টেরাকোটা'-ফলকে সেই কৃষ্ণলীলার যেন জীবন্ত প্রতিরূপ লক্ষ্য করা যায়। এর সংখ্যাধিক্য থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, রাধাকৃষ্ণলীলা শিল্পীদের কাছে জনপ্রিয় ছিল। এই লীলারও আকর্ষণীয় ও মুখ্য কেন্দ্রে ছিলেন রাধা। রাধাকে এককরূপে তেমন লক্ষ্য করা না গেলেও রাধাকৃষ্ণ- ফলক প্রায় প্রতিটি মন্দিরে আদর্শ বা 'মোটিফ'রূপে নেওয়া হয়েছিল। যেমন রামকথার 'মোটিফ'গুলি ছিল 'লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য' ও 'রামরাজা'। বিশেষ করে, উনিশ শতকের মন্দিরগুলিতে দেখা যায় 'রামরাজা মোটিফ'টি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কেন এই রাধাকৃষ্ণলীলা 'টেরাকোটা' শিল্পীদের কাছে এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল? শিল্পীরা বেশির ভাগ ছিলেন গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষ, প্রায় নিরক্ষর। তার ফলে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে শিক্ষিত হওয়া আদৌ সম্ভবপর ছিল না। ধ্রুপদী শিল্পশাস্ত্রসমূহে তাদের অধিকার থাকার কথা তো ওঠেই না। তাদের প্রধান অবলম্বন ছিল স্থানীয় বাঙালি কবিদের লেখা কৃষ্ণলীলা কাহিনী, যার বহু পুঁথি পাওয়া গেছে গ্রাম-গঞ্জের অনেক স্থানে। যাত্রা-কথকতা-পাঁচালিগানে রাধাকৃষ্ণলীলাকাহিনীগুলো- ফুটিয়ে তুলতেন সেকালের বাঙালি কবিরা। বহুকাল আগে থেকে কৃষ্ণযাত্রা ছিল দারুণ জনপ্রিয়। এর বিষয় ছিল রাধাকৃষ্ণের জীবনের নানা কাহিনী। 'রাই উন্মাদিনী' 'স্বপ্নবিলাস', 'কালীয়দমন' প্রভৃতি পালাগানগুলো সেকালে সাধারণের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।[১]

কিন্তু এর আগে সুলতানী আমলের শেষদিকে পুরাণ-ভাগবতের কাহিনী নিয়ে কাব্যরচনা করতে শুরু করেছিলেন বাঙালি কবিরা। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের বেশ কিছুকাল আগে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচনা করলেন প্রেমভক্তিরসাশ্রিত পদাবলীকাব্য। রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনাই ছিল যার প্রধান বিষয়। রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়লীলাচিত্রণে এই দুই কবি এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন। রাধা-চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি, যেমন, 'পূর্বরাগ', 'দৌত্য', 'মিলন' এবং 'মাথুরে'র রূপায়ণে এঁরা ছিলেন সার্থক শিল্পী। এই পদাবলীসঙ্গীত ভক্তিরসসিক্ত গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হত পল্লীগ্রামের বহু মণ্ডপে। নিরক্ষর অল্পশিক্ষিত মানুষের মনে সেগুলো সাড়া জাগাত। 'টেরাকোটা' শিল্পীরা এর দ্বারা অবশ্যই অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন। এরপর কোন কোন রাজা বা সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণকাহিনীবিষয়ক পুরাণ অবলম্বনে কাব্য রচিত হতে থাকে। মালাধর বসু ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহের (খ্রি. ১৪৫৫-১৪৭৪) আনুকূল্যে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করে 'গুণরাজ খান' উপাধি পান।[২] মালাধরের পর আরও কোন কোন কবি, যেমন মাধবাচার্য 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং শঙ্কর কবিচন্দ্র 'গোবিন্দমঙ্গল', দুঃখী শ্যামদাস 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন। ঐসব গ্রন্থ প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর কালে রচিত।

উক্ত গ্রন্থগুলি এবং শ্রীচৈতন্য ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচারিত ভক্তিধর্ম সারা বাংলার মানুষের কাছে খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল। প্রাক-চৈতন্যযুগে এবং চৈতন্যোত্তর পর্বে কৃষ্ণলীলার জনপ্রিয়তা তা প্রমাণ করে। তবে এই কৃষ্ণলীলার দুটি দিক আমাদেব কাছে বিশেষ অনুসন্ধানযোগ্য। বালক ও কিশোর কৃষ্ণের অলৌকিক লীলা এবং রাধা ও কৃষ্ণের মাধুর্যলীলা। প্রাক-চৈতন্যযুগে পদাবলীসাহিত্য ও কিছু কিছু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য রচিত হলেও মন্দির 'টেরাকোটা'য় তার প্রভাব তেমন পড়েনি, যদিও এই ধরনের মন্দিরের সংখ্যা খুবই বিরল। ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বলে কথিত (এই লিপিটি সংস্কারকালীন) ঘাটাল-কোন্নগরের সিংহবাহিনী মন্দিরের 'চারচালা' জগমোহনের দেওয়ালে আমরা শুধু কৃষ্ণমূর্তিকেই দেখি। সেখানে রাধার উপস্থিতি নেই। চৈতন্যোত্তর যুগে, বিশেষ করে, ষোল শতকের শেষ থেকে আঠার শতকের মন্দিরে যে অজস্র কৃষ্ণলীলা কাহিনী রূপায়িত রয়েছে, তার মধ্যে কৃষ্ণকাহিনীর বেশির ভাগ দৃশ্যে রাধা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তবে, মহাভারতীয় কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরলীলার যে দৃশ্যফলকগুলি পাওয়া যায় তাতে, যেমন কালীয়দমন, তৃণবর্তাসুরবধ, পুতনাবধ প্রভৃতি দৃশ্যে কৃষ্ণের অলৌকিক কাহিনীগুলিই রূপায়িত হয়েছে। সেখানে স্বাভাবিকভাবে রাধার কোন ভূমিকাই নেই। এগুলির থেকে রাধাকৃষ্ণলীলাদৃশ্যফলকের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করে বলা যায়, শিল্পীরা কৃষ্ণের অলৌকিক লীলার চেয়ে রাধাকৃষ্ণলীলার বিচিত্র কাহিনীকে টেরাকোটা-ফলকে বেশি করে স্থান দিয়েছিলেন।

চৈতন্য-পরবর্তীকালের 'টেরাকোটা'-অলংকৃত অসংখ্য মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের সর্বাধিক উপস্থিতি মূলত চৈতন্যের ভক্তিরসাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের যে ফল, তাতে সন্দেহ নেই। এই জনপ্রিয়তার পশ্চাতে প্রাক-চৈতন্যযুগের প্রাতিষ্ঠানিক বৈষ্ণবভক্তির প্রভাব প্রায় কিছুই পড়েনি, যে বৈষ্ণবধর্ম বেদান্ত-ভাগবতের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়ে দক্ষিণ ভারতের রামানুজ, মাধবাচার্য, নিম্বাকাচার্য প্রমুখ সাধক-দার্শনিকদের মাধ্যমে বিকশিত হয় এবং বাংলায় চৈতন্যের পূর্ববর্তী বৈষ্ণবধর্মপ্রচারক মাধবেন্দ্র পুরীর মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে। বাংলায় ঐসব বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের

বহু মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ভক্তিধর্মকে বাঙালি ততটা স্বীকার করে নেয়নি, যতটা নিতে পেরেছিল শ্রীচৈতন্যের উদার প্রেমধর্মকে। তাই ধর্ম শুধু আচারসর্বস্ব না হয়ে সরল অনাড়ম্বরভাবে সর্বশ্রেণীর মানুষের হৃদয়-মনকে আপ্লুত করেছিল।

শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হয়ে বাঙালির কাছে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা থেকে শ্লোক উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, রাধা স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমের বিলাসরূপিণী হ্লাদিনী শক্তি তাই রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা হয়েও অনাদিকাল থেকে বিলাসবাসনায় এই পৃথিবীতে পৃথক পৃথক দেহ স্বীকার করেছিলেন। এখন তাঁরা দুজনে এক হয়ে চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ঐ জন্যই শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব এবং রাধার ন্যায় তাঁর উজ্জ্বল কান্তি।[৩] তাঁরা দু'জনে পরস্পর পরস্পরের রস আস্বাদনের জন্য বিলাস করেন। রাধাভাবযুক্ত কৃষ্ণরূপ চৈতন্য আবির্ভূত হন তিনটি রস একই সঙ্গে আস্বাদনের জন্য— শ্রীরাধার প্রেমমহিমা, রাধার দ্বাবা আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমাধুর্য এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুভবজনিত শ্রীমতী রাধার আনন্দ।[৪] তাই অবতাব শ্রীচৈতন্য স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ।

শ্রীচৈতন্যের নবপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণ এইভাবে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। বাঙালির ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বহু মন্দিরও নির্মিত হয়। প্রাক-শ্রীচৈতন্যযুগে রাধা এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেননি। তখন বিষ্ণুই বেশি পূজা পেতেন। কোন কোন সময় বেণুগোপাল শ্রীকৃষ্ণও পূজিত হতেন। দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন মন্দিরগাত্রে (যেমন বেলুড়, হালেবিড়) আমরা শুধু বেণুগোপাল শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি-ভাস্কর্য লক্ষ্য করেছি। (চেন্নাইয়ের একটি সংগ্রহশালায় এই বেণুগোপাল শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।)

বাংলায় প্রাক-মুসলিম যুগে রাধাকৃষ্ণ উপাসনাব কোন প্রমাণ তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। রাধাকৃষ্ণমূর্তির কোন প্রাচীন নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয়নি। পাহাড়পুরের (রাজশাহি জেলা) নবম-দশম শতকের ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহার-মন্দিরের স্তূপ থেকে যে বৃহদাকার টেরাকোটা-ফলক পাওয়া গেছে, তাতে রাধাকৃষ্ণের একটি ফলক লক্ষ্য করা গেলেও সেটি ঠিক রাধাকৃষ্ণের কিনা সে-বিষয়েও সন্দেহ থেকে গেছে। কিন্তু চতুর্ভুজ বিষ্ণুনারায়ণ মূর্তি গ্রামবাংলার নানা স্থানে এবং অনেক সংগ্রহশালায় দেখা যায়। সে কারণে অনুমান করা যেতে পাবে, প্রাচীন বাংলায় রাধাকৃষ্ণ ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেননি। বিষ্ণুনারায়ণ উপাসনাই এই অঞ্চলে বেশি প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুর সঙ্গে সূর্যও পূজিত হতেন এবং এঁদের কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরও অনেক নির্মিত হয়েছিল। মুসলমানশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেইসব 'উচ্চশিখর' দেউল মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ ও মিনারে রূপান্তরিত করা হয়, যার কিছু কিছু নিদর্শন লক্ষ্য করা গেছে হুগলির ত্রিবেণী, পাণ্ডুয়া এবং মালদার পাণ্ডুয়ায়।[৫]

কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রাচীনকালে কৃষ্ণ ও রাধা যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করতেন, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'শ্রীরাধা যেমন কৃষ্ণের সর্বদা প্রিয়তমা, রাধাকুণ্ডও সেরূপ।[৬] শ্রীরূপের মতে, রাধা শুধু নববয়স্কা ও সুন্দরী শিরোমণি নন, তিনি নর্মপণ্ডিত ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী এবং সর্বোপরি তিনি মহাভাবস্বরূপিণী। মহাভাব হল রাধার বৈশিষ্ট্য, রুক্মিণী-সত্যভামা প্রমুখের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি থাকলেও মহাভাব নেই। রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে দেখিয়েছেন, প্রেম থেকে স্নেহ, স্নেহ থেকে মান, মান থেকে প্রণয়, প্রণয়

থেকে রাগ, রাগ থেকে অনুরাগ এবং অনুরাগ থেকে মহাভাব উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।[৭] শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধার এই আকুতি, যা চৈতন্যের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাই ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তির মূল ভিত। এই বৈষ্ণবভক্তির প্লাবনে সমগ্র বাংলা যে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তারই প্রমাণ পাই আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী ও পদকর্তাদের রচনায়, মন্দির-'টেরাকোটা'র অজস্র কৃষ্ণলীলাফলকে, পল্লীর কৃষিকুটিরে হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যে, কৃষ্ণযাত্রা ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কথকতায়। এই সময় থেকে রাধা বাঙালিমানসে স্থায়ী মর্যাদার আসন লাভ করতে থাকেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তির বন্যায় প্লাবিত মন্দিরসূত্রধর-শিল্পীসম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন কৃষ্ণলীলাবিষয়ক এমন সব দৃশ্য, যা সহজেই ভক্তমনকে আকর্ষণ করতে পারে। বিশেষ করে, সতের-আঠার শতকের ফলকগুলিতে রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। টেরাকোটা-শিল্পের এই পুনরভ্যুদয়ের যুগে কৃষ্ণলীলার প্রাধান্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

এই যুগের 'টেরাকোটা'-ফলকে কৃষ্ণকথার যে যে বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছিল, সেগুলি হল 'দানলীলা' (শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাপূরণ), 'নৌকোবিলাস' (নৌকায় রাধা ও গোপীদের বিলাস), 'বস্ত্রহরণ' (কদম্ব-বৃক্ষে উপবিষ্ট কৃষ্ণকর্তৃক রাধা ও অন্যান্য গোপীদের বস্ত্রহরণ) এবং 'রাসলীলা' (যুগল রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদের নৃত্য)। এগুলি ছাড়া 'নবনারীকুঞ্জর' 'মোটিফ'টিও 'টেরাকোটা' শিল্পীদের কাছে জনপ্রিয় ছিল। 'নবনারীকুঞ্জর'-এ নয়জন গোপী একটি হাতির আকার ধারণ করে। কোন কোন সময় কৃষ্ণ তার ওপর বসেও থাকেন। পূর্বোক্ত বৈষ্ণবকবি ও পাঁচালি রচয়িতাদের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। এছাড়া, রাধা ও গোপীদের ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রায় তাদের বিলাপদৃশ্যও 'টেরাকোটা'-ফলকে রূপায়িত হতে দেখা যায়।

মন্দির 'টেরাকোটা' শিল্পে এই বিষয়গুলি বারবার রূপায়িত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এই যুগের বৈষ্ণবকবিরা রাধাকৃষ্ণের এইসব লীলামাহাত্ম্য নিয়ে যে অসংখ্য পদ রচনা করেছিলেন এবং যাত্রা-গান-কথকতার সাহায্যে সেগুলির যে ব্যাপক প্রচার হয়, 'টেরাকোটা' ফলক তৈরিতেও তার প্রভাব পড়েছে। সে তুলনায় ভাগবতপুরাণে বর্ণিত দেবতা কৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক অলৌকিক লীলা ততটা আকর্ষণীয় হয়নি।[৮] বিষ্ণুর অবতাররূপে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ, এমনকি শাক্তদের নিকটও স্বীকৃত হন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা রাধার প্রণয়লীলাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সহজিয়া গুরুরা রাধার এই প্রণয়কে ঠিকমত না বুঝে তাঁদের শিষ্যদের ওপর রাধার গুণগুলি 'আরোপ' করে এবং নিজেদের কৃষ্ণ মনে করে ভজনা করেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা রাধার সখি বা 'মঞ্জরী' ভাবের সাধনার প্রবর্তন করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মঞ্জরীরা রাধার চেয়েও বেশি গুরুত্ব লাভ করত।[৯] মন্দির 'টেরাকোটা'র ক্ষেত্রে রাধার সখি বা মঞ্জরীর উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। এরা অনেক সময় রাধার বিভিন্ন অবস্থায় তাঁর পরিচারিকার কাজ করত। যেমন, হেতমপুরের (বীরভূম) গোপাল-লক্ষ্মী মন্দিরের প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থে কৃষ্ণবিরহিত রাধাকে দেখা যাচ্ছে, তার দুই সখির মধ্যে একজন ছত্রধারণ করে আছে, অপরজন চামরব্যজনরতা। এরা সম্ভবত ললিতা-বিশাখা।

সতের, আঠার, এমনকি উনিশ শতকের মন্দিরেও রাধাকৃষ্ণ 'মোটিফ' মন্দিরের প্রধান স্থানগুলিতে বসানো হত। অথবা কোণের প্যানেলে কখনও বা এককভাবে রাধাকৃষ্ণফলক স্থান পেত। প্রায়ই দেখা যায়, ফলকে কৃষ্ণ রাধার কাঁধ বেষ্টন করে আছেন অথবা তার চিবুক স্পর্শ করছেন। কখনও বা কোন গোপী অনুরূপভাবে দণ্ডায়মান। মূর্তিগুলিকে দণ্ডায়মান বা আসীন

অবস্থায়ও দেখা যায়। বিশেষভাবে, উনিশ শতকের অনেক মন্দিরে খিলান-প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থে রাধাকৃষ্ণমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মেদিনীপুরের দাসপুর গ্রামে লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির, পাঁশকুড়া থানার গোবিন্দপুরের তারকনাথের এবং রাধাকান্তপুরের (দাসপুর) গোপীনাথ মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া, পারুলের (হুগলি) বিশালাক্ষী মন্দিরেও ঐরূপ প্যানেল দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরের (১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রায় সর্বত্র দেখা যায়, রাধাকৃষ্ণ কখনও বৃক্ষতলে, কখনও বা চাঁদোয়া বা ছোট্ট ছোট্ট প্রতিকৃতি মণ্ডপে দণ্ডায়মান। বহু গোপী ও বাদকবৃন্দের সঙ্গে কখনও বা রাধাকৃষ্ণ সিংহাসনে সমাসীন। এ-ধরনের চিত্র বেশি করে পাওয়া যায় গোবিন্দপুর, রাধাকান্তপুর, মাংলই-এর (পাঁশকুড়া) সতেরোচুড়ো রাসমঞ্চ এবং রামগড়ের (বিনপুর) কালাচাঁদের 'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দিরে (১৮৫৬)। কোন কোন সময় রাধা ও কৃষ্ণকে স্তম্ভগাত্রে দোলায় লক্ষ্য করা যায়, যেমন, বড়নগরের (মুর্শিদাবাদ) গঙ্গেশ্বরের 'জোড়বাংলা' মন্দির। কখনও বা রাধার সামনে হাঁটু গেড়ে কৃষ্ণের নম্রতা প্রদর্শন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, যেমন, আলংগিরির (এগরা, মেদিনীপুর) রঘুনাথ মন্দির।

রাসলীলায় বংশীবাদনরত কৃষ্ণ ও রাধা এবং অপর একজন গোপীকে কেন্দ্র করে তাদের চারপাশে গোপীরা পরস্পর হস্তধারণ করে নৃত্যরত। কোন কোন সময় কেন্দ্রীয় চক্রটির চারপাশে আরও কয়েকটি চক্রে গোপীদের নৃত্যরত অবস্থায় দেখি। এই 'রাসমণ্ডলচক্রে'র নিদর্শন আমরা শ্যামরায়ের মন্দিরে (বিষ্ণুপুর ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দ) লক্ষ্য করি। বৃহদাকার এই 'রাসমণ্ডলচক্রে'র বলিষ্ঠরূপ বাংলার অন্য কোথাও তেমন পাওয়া যায় না। যদিও 'রাসমণ্ডলচক্র' 'মোটিফ'টি মন্দির টেরাকোটা অলংকরণে বিশেষ জনপ্রিয়। হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় অনন্তবাসুদেব (১৬৭৯) ও গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্রমন্দিরে এই টেরাকোটা মোটিফ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অনন্তবাসুদেব মন্দিরে খিলান-প্রবেশপথের ওপরে প্রতীক 'আটচালা' মণ্ডপে অনেকগুলি রাধাকৃষ্ণফলক সন্নিবেশিত হয়েছে। কান্তনগরেব (দিনাজপুর বর্তমানে বাংলাদেশ) কান্তনাথের মন্দিরেও (১৭৫২) এই ধরনের 'রাসমণ্ডলচক্র' পাওয়া যায়।[১০] আঠার শতকের অনেক মন্দিরে খিলান-প্রবেশপথের ওপরের প্রধান প্রস্থগুলিতে অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে এই 'রাসমণ্ডলচক্র' সন্নিবেশ করা একটা প্রথায় নিবদ্ধ হয়ে বিষয়টিকে বিশেষ জনপ্রিয় করেছে।[১১] এর অজস্র উদাহরণের মধ্যে চেলিয়ামার রাধাবিনোদ মন্দির, কালনার (বর্ধমান) গোপালবাড়ির মন্দির, পুঠিয়ার (বাংলাদেশ) গোবিন্দমন্দির, মালঞ্চের (খড়্গাপুর লোকাল) শ্যামাঠাকুরাণীর মন্দির (১৭১২) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরও বহু মন্দির আছে; যেমন, সিউড়ির রাধাশ্যাম মন্দির, বনপাশের (বর্ধমান) মিস্ত্রিপাড়ার শিবমন্দির। ইলামবাজারের (বীরভূম) মন্দিরে গোপীরা হাত ধরাধরি করে থাকলেও নৃত্যরত নয়, কানাশোলের (কেশপুর) ঝাড়েশ্বর মন্দিরে (১৯ শতকের প্রথমার্ধ) গোপীদের মাঝখানে হাত ধরাধরি অবস্থায় কৃষ্ণের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ফুললতাপাতাকে ঘিরে এদের অবস্থান। সুরৎপুরের (দাসপুর) শীতলামন্দিরেও (১৮৪৯) এই দৃশ্য দেখা যায়। সম্ভবত ফুললতাপাতাযুক্ত কুঞ্জে রাসোৎসব রূপায়িত করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য ছিল। এই রাসমণ্ডলচক্রে রাধা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কারণ, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিলাস রাসোৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য। নৃত্যরত অবস্থায় গোপীদের আনন্দোল্লাস এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। 'টেরাকোটা' ফলকগুলিতে তারই প্রতিফলন।

মন্দির 'টেরাকোটা'য় 'নবনারীকুঞ্জর' মোটিফটিও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এখানেও রাধার উপস্থিতি লক্ষণীয়। অষ্টগোপী ও রাধা একটি হাতির রূপ নিয়েছিলেন দয়িত শ্রীকৃষ্ণের জন্য।

কোন কোন সময়ে এই কাল্পনিক হস্তীর ওপর কৃষ্ণকে আসীনও দেখা যায়। দেওয়ালের প্যানেলে এটাও ছিল অন্যতম অলংকরণ উপাদান। আলংগিরি (মেদিনীপুর) এবং ঘুড়িষার (বীরভূম) রঘুনাথমন্দিরে (১৬৩৩) এই দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় (১৬৪৩) এবং মদনমোহন মন্দিরের (১৬৯৪) স্তম্ভগাত্রে এই 'মোটিফ'টি পাওয়া যায়। আলংগিরির রঘুনাথমন্দিরে 'নবনারীকুঞ্জর'-এর ওপর হাওদায় ছোট্ট কৃষ্ণমূর্তি (মিনিয়েচার) লক্ষ্য করা যায়।

রাধাকৃষ্ণলীলার অপর জনপ্রিয় বিষয়টি হল, গোপীদের 'বস্ত্রহরণ'। কদমগাছে আসীন কৃষ্ণ কর্তৃক নগ্নাবস্থায় স্নানরতা গোপীদের বস্ত্রহরণ করে গাছের ডালে ঝোলানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এই বস্ত্রহরণের নায়ক। কোন কোন ক্ষেত্রে এখানে রাধার নগ্নাবস্থার অসহায় রূপটি বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অন্যান্য গোপীদের তুলনায় নগ্না রাধাকে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে, সেখানে রাধার লজ্জানিবারণের কোন চেষ্টা দেখা যায় না। এই 'বস্ত্রহরণ'-দৃশ্য বহু মন্দিরের সামনের প্রধান প্রস্থে পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণলীলাদৃশ্যে এই জনপ্রিয় মোটিফটি প্রায় সব মন্দিরেই দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫) এবং শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩) ছাড়াও অসংখ্য টেরাকোটা মন্দিরে এই দৃশ্যটিকে দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, কোতুলপুরের (বাঁকুড়া) শ্রীধরমন্দির, কালনার গোপালবাড়ি (১৮ শতক), সিউড়ির রাধাশ্যাম মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে।

কৃষ্ণকথার মধ্যে 'দানলীলা' অবলম্বনে 'টেরাকোটা' ফলকগুলিতে মস্তকে দধিভাণ্ডবহনরত গোপীদের মধ্যে রাধা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। নৌকোয় পারাপার করার সময় মাঝির রূপধারী কৃষ্ণকে পারানির কড়ি না দিলে রাধা ও গোপীদের পারাপার না করায় রাধা শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টিসাধন করেন। কোন কোন মন্দিরে রাধা কৃষ্ণের পাশে উপবিষ্ট রয়েছেন। যেমন, দাসপুরের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে (১৭৯১) দধিভাণ্ডমস্তকে রাধাকে পারাপার করার জন্যে কৃষ্ণকে অনুনয়-বিনয় করতে দেখা যায়। নৌকোয় কৃষ্ণ দাঁড় হাতে উপবিষ্ট এবং পাশে রাধা বাঁ হাতে কৃষ্ণের হাত ধরে আছেন। এই 'নৌকোবিলাসে' রাধা ও তৎসহ গোপীদের কৃষ্ণসংস্পর্শদৃশ্য 'টেরাকোটা' শিল্পীদের কাছে এক প্রিয় বিষয়রূপে পরিগণিত হয়েছে।

রাধা ও গোপীদের কাছ থেকে কৃষ্ণের মথুরাপ্রত্যাবর্তনে শোকাতুরা রাধা কৃষ্ণের রথের সামনে মূর্চ্ছিতা। গোপীগণ শোকবিহ্বল হয়ে এমনভাবে মাথা হেলিয়ে আছে যে, তাদের কেশ মাটি স্পর্শ করছে। কেউবা দু-হাতে করে মুখ ঢেকে ক্রন্দনরতা। কোন কোন স্থানে মূর্চ্ছিতা রাধাকে কেউ কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে। যেমন, দামোদরমন্দির, বদনগঞ্জ (হুগলি)। কৃষ্ণ-বলরাম রথের মধ্যে সমাসীন, রথটি 'পঞ্চরত্ন' রীতির। কোতুলপুর (বাঁকুড়া) মন্দিরেও এই ধরনের প্যানেল দেখা যায়। বিশেষ করে, আঠার শতকের মন্দিরের সামনের দিকের প্রধান প্রস্থগুলিতে এই করুণদৃশ্যকে টেরাকোটা শিল্পীরা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আবার উনিশ শতকের মন্দিরের খিলান-প্রবেশপথের ওপর সমান্তরাল প্যানেলে ঐ দৃশ্য পাওয়া যায়।[১২]

উপরি উক্ত বিষয়গুলিতে রাধা আবশ্যিকভাবেই টেরাকোটা-ফলকে স্থান পেয়েছেন। প্রায় সব টেরাকোটা-ফলকে কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাধার অবস্থান দেখানো হয়েছে। বাংলার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালাগানসমূহে একসময় ঐসব বিষয় অবলম্বনে মাধুর্যরস পরিবেশিত হত—যা বৈষ্ণবদের কাছে শ্রেষ্ঠ রস বলে স্বীকৃত। সাধারণ মানুষের মনকে তা নাড়া দিয়েছে। তাই টেরাকোটা-শিল্পীরা রাধাকৃষ্ণলীলা প্যানেলে ঐ বিষয়গুলিকে খুবই গুরুত্ব দিতেন।

কিন্তু এই টেরাকোটাশিল্প ছিল একান্তভাবেই দেশজ। নিরক্ষর বা সামান্য অক্ষরজ্ঞান

সম্পন্ন শিল্পী-কারিগরদের হাতে তা এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। একে আমরা লোকশিল্পও বলতে পারি। এই শিল্পের কারিগরদের নাম-ধাম তেমন পাওয়া যায় না। কোন কোন মন্দিরের লিপিতে মন্দিরস্থপতি সূত্রধরের নাম-ধাম লিপিবদ্ধ থাকলেও টেরাকোটাফলকগুলি যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁদের পরিচয় কিছুমাত্র জানা যায়নি। দু-একটি ক্ষেত্রে হয়তো বা ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া আছে। (বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির ১৭৯১, কোন্নগর, ঘাটাল)।[১৩] এই শিল্পের উপাদান ও শিল্পী উভয়েই দেশজ, বহিরাগত নয়। দৃশ্য বা চরিত্রচিত্রণে বিধিবদ্ধ কোন শাস্ত্রীয় অনুশাসন তাঁরা মেনে চলেননি। একান্তভাবেই তাঁরা নিজেদের মনের মতো করে, ঐতিহ্যসূত্রে এই শিল্পকে রূপ দিয়েছিলেন। টেরাকোটা-মূর্তিগুলোতে লোকশিল্পের যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান, সেগুলো হল, 'কৌতুককব' এবং ছন্দোময় বিকৃতি বা ভঙ্গি, বলিষ্ঠ পিণ্ড বা 'ম্যাস' ও রেখার সরলীকরণ, অকপটতা ও স্পষ্টতা।[১৪] বাংলার বহুবিচিত্র 'টেরাকোটা' প্যানেলগুলি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে তাতে লোকশিল্পের গুণগুলি যে বিদ্যমান রয়েছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এ-ছাড়াও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক প্যানেলগুলিতে কৃষ্ণ, রাধা ও গোপীদের মূর্তিগুলির বিন্যাস ও ভঙ্গিতে স্পষ্টতা ও অকপট সারল্যের পরিচয় দেশজশিল্পের ধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। সতের-আঠার শতকের মন্দিরগুলোতে রাধাকৃষ্ণলীলার দৃশ্যযুক্ত ফলকে অঙ্কিত মূর্তিব মধ্যে কিছুটা সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্য লক্ষ্য করা গেলেও তা একান্তই শিল্পীদের নিজস্ব ঐতিহ্যের সৃষ্টি। উনিশ ও বিশ শতকের মন্দিরে সেই সূক্ষ্মতা ও শিল্পসৌকর্য প্রায় তিরোহিত হয়ে মূর্তিগুলোকে অনেকটা বেমানান করে তুলেছে। দেহগঠনে স্থূলভাব এসেছে। তাতে লোকবৈশিষ্ট্য আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল (উদাহরণ--- বালির দামোদরের 'আটচালা', 'বস্ত্রহরণ', বাগরুই (কেশপুর)-এর লক্ষ্মীবরাহেব 'নবরত্ন', 'নৌকোবিলাস')। পরিশেষে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাঙালির একান্ত নিজস্ব এই মন্দিরটেরাকোটা শিল্পে কৃষ্ণ ও রাধা দু জনেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণবিষয়ক টেরাকোটা-ফলকের সংক্ষিপ্ত জেলাভিত্তিক তালিকা ঃ নিম্নলিখিত সব 'টেরাকোটা'-ফলকে রাধার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[১৫]

জেলা : বাঁকুড়া

গ্রাম	মন্দির	টেরাকোটা
কাদাসোল (বড়জোড়া)	শ্রীধরের পঞ্চরত্ন	রাধাকৃষ্ণফলক-রাসমণ্ডলচক্র
কোতুলপুর	শ্রীধরের পঞ্চরত্ন (১৮৩৩)	রাধাকৃষ্ণ ও গোপী এবং মানভঞ্জন
	শিবের আটচালা (আ.১৮ শতক)	
বালসি (পাত্রসায়ের)	(বাজার পাড়া) রাধাকৃষ্ণের	রাধাকৃষ্ণ ও গোপী কৃষ্ণলীলা, বস্ত্রহরণ
	পঞ্চরত্ন	বহু রাধাকৃষ্ণ ফলক ও রাধাকৃষ্ণের অজস্র টেরাকোটা ফলব
বিষ্ণুপুর	মদনমোহনের একরত্ন (১৬৯৪)	রাধা ও কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য
	শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন (১৬৪৩)	কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্যে রাধা উপস্থিত
	জোড়বাংলা (১৬৫৫)	
	বসুপাড়া শ্রীধরের নবরত্ন	
রাউতখণ্ড (জয়পুর)	(নাপিতপাড়া) পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন	রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক ফলব
হদলনারায়ণপুর	(বড় তরফ) সাতের চূড়া রাসমঞ্চ	রাধাকৃষ্ণফলব

(পাত্রসায়ের)

জেলা : মেদিনীপুর

আজুড়িয়া (দাসপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের নবরত্ন (১৮৭১)	কৃষ্ণলীলা-বস্ত্রহরণ, রাসমণ্ডলচক্র
	শীতলার দেউল (১৯ শতক)	রাধাকৃষ্ণ
আনন্দপুর (কেশপুর)	রাধাকৃষ্ণ ও দামোদর 'পঞ্চরত্ন' (১৮৬৯)	নৌকোবিলাস
	রঘনাথবিষ্ণুর 'পঞ্চরত্ন' (১৯ শতক)	নৌকাবিলাস
উত্তর গোবিন্দনগব (দাসপুর)	ভুবনেশ্বরের 'আটচালা' (১৮৫০)	রাধার অচৈতন্যাবস্থা, রাধাকৃষ্ণ, ললিতা, বস্ত্রহরণ
কানাশোল (কেশপুর)	ঝাড়েশ্বরের 'পঞ্চরত্ন'(১৮৩৪)	নৌকাবিলাস
ক্ষীরপাই (চন্দ্রকোণা)	দয়ালবাজার রাধাদামোদর ও শীতলাব 'পঞ্চরত্ন' (১৮১৭)	বস্ত্রহরণ
গড় ময়না (ময়না)	লোকেশ্বর শিবের 'আটচালা'	নৌকাবিলাস
চেঁচুয়া গোবিন্দনগর (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১)	কৃষ্ণলীলা
গোবিন্দপুর (পাঁশকুড়া)	তারকনাথের 'আটচালা' (১৮৮১)	বস্ত্রহরণ
চাউলি (ঘাটাল)	জানাদের শ্রীধরের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮)	কৃষ্ণলীলা, রাসমণ্ডল
ডিহিবলিহারপুর (দাসপুর)	রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৮)	নৌকাবিলাস
তিলন্তপাড়া (সবং)	জানকীবল্লভের 'পঞ্চরত্ন' (১৮১১)	কৃষ্ণলীলা
দলপতিপুর (ঘাটাল)	সঙ্কর্ষণ রাধাদামোদরের 'নবরত্ন' (১৮০৩)	বস্ত্রহরণ
দাসপুর	গোপীনাথের 'একরত্ন' (১৭১৬)	বস্ত্রহরণ
শ্রীধরপুর (দাসপুর)	সামন্তদের রঘুনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৯ শতকের শেষ)	নবনারীকুঞ্জর , রাসমণ্ডল
সত্যপুর (ডেবরা)	শীতলানন্দ রাধাকৃষ্ণের 'নবরত্ন' (১৯ শতক)	রাধাকৃষ্ণ
সৌলান (দাসপুর)	অধিকারীদের শ্যামসুন্দরের 'পঞ্চরত্ন' (১৯ শতক)	বস্ত্রহরণ

জেলা : হাওড়া

অমরাগড়ি (আমতা)	গজলক্ষ্মীর 'আটচালা'	কৃষ্ণলীলা
ইচ্ছাপুর (জগৎবল্লভপুর)	পরিত্যক্ত রাসমঞ্চ	রাধাকৃষ্ণ, বস্ত্রহরণ
কল্যাণপুর (বাগনান)	দামোদরের 'নবরত্ন' (১৭৮৬)	কৃষ্ণলীলা
খালনা (আমতা)	দামোদরের 'চাঁদনি'	কৃষ্ণলীলাব নানা দৃশ্য
জয়পুর (আমতা)	শ্রীধরের 'আটচালা' (১৭৮৪)	কৃষ্ণলীলা
ঝিখিরা (আমতা)	দামোদরের 'আটচালা' (১৭৭৬)	কৃষ্ণলীলা

জেলা : হুগলি

আঁটপুর (জাঙ্গীপাড়া)	রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (১৭৮৬)	রাসলীলা, রাধাকৃষ্ণ
উত্তরপাড়া	তারামন্দির এলাকায় শিবের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৯৪)	কৃষ্ণলীলা
গুপ্তিপাড়া (বলাগড়)	রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (১৮ শ)	রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণলীলা
বাঁশবেড়িয়া	অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (১৬৭৯)	নৌকাবিলাস, রাসলীলা
বৈঁচিগ্রাম	(বারোয়ারিতলায়) শিবের আটচালা	রাসমণ্ডলচক্র
ভালিয়া (আরামবাগ)	রঘুনাথের আটচালা(১৭৭২)	রাধাকৃষ্ণ

জেলা : বীরভূম

ইলামবাজার	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৪৬)	রাসমণ্ডল, মথুরাগমন রাধা ও গোপীগণ
উচকরণ (নানুর)	(চারটি) 'চারচালা' (১৭৬৮)	কৃষ্ণলীলা-রাধা ও গোপীগণসহ কৃষ্ণ
গণপুর (মহম্মদবাজার)	(কালীতলা) শিবের 'চারচালা'	কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, রাধাকৃষ্ণ, রাসমণ্ডল
	'আটচালা' বিষ্ণুমন্দির (১৭৬৯)	রাধা ও গোপীগণসহ কৃষ্ণ
ঘুড়িষা (ইলামবাজার)	(বড় মঠের) রঘুনাথের 'চারচালা' (১৬৩৩)	নবনারীকুঞ্জর, রাসমণ্ডল, বস্ত্রহরণ
চন্দনপুর (বোলপুর)	একটি 'দেউল' (১৮৬৪)	কৃষ্ণের মথুরাগমনকালীন রাধার করুণ দৃশ্য
জয়দেব-কেন্দুলী (ইলামবাজার)	রাধাবিনোদের 'নবরত্ন' (১৬৮৩)	কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য
তারাপুর (তারাপীঠ)	তারামায়ের 'আটচালা' (১৮১৮)	কৃষ্ণলীলা
দুবরাজপুর	(ময়রাপাড়া) 'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দির	কৃষ্ণলীলা
সেরাণ্ডি (বোলপুর)	নারায়ণের 'ত্রয়োদশরত্ন'	রাধাকৃষ্ণ
সিউড়ি	রাধাদামোদরের 'আটচালা' (আ. ১৮ শতকের প্রথমদিক)	রাসমণ্ডল, বস্ত্রহরণ
সুরুল (বোলপুর)	লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন'	কৃষ্ণলীলার দৃশ্যাবলী

জেলা : নদীয়া

কামালপুর (চাকদহ)	জীর্ণ আটচালা (পরিত্যক্ত) (আ. ১৮ শতক)	রাধাকৃষ্ণ
দিগনগর (কোতোয়ালি)	রাঘবেশ্বরের চারচালা (১৬৬৯)	রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণলীলার নানা দৃশ্য, বস্ত্রহরণ
দোগাছি (কোতোয়ালি)	ভগ্ন (চারচালা?) মন্দির	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য
বীরনগর (উলা)	রাধাকৃষ্ণের 'জোড়বাংলা'	কৃষ্ণলীলাদৃশ্য

(রাণাঘাট)	(১৬৯৪ খ্রি.)	
মাটিয়ারী (কৃষ্ণগঞ্জ)	রুদ্রেশ্বর শিবের 'চারচালা'	বস্ত্রহরণ, নৌকোবিলাস
শান্তিপুর	জলেশ্বরের চারচালা (আ. খ্রি. ১৮ শতক)	কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য
	অদ্বৈতপ্রভুর 'আটচালা' (হাটখোলাপাড়া, আ. খ্রি. ১৮ শতক)	কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. মিশেল, জর্জ (সম্পাদিত) *ব্রিক টেম্পলস অভ বেঙ্গল ফ্রম দি আর্কাইভস অভ ডেভিড ম্যাককাচ্চন* গ্রন্থে জুলেখা হকের প্রবন্ধ, পৃ. ১৭২

২. রায়, প্রণব, *বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য*, ১৯৯৯, পৃ. ৩১ এবং হক, জুলেখা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

৩. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস : *চৈতন্যচরিতামৃত*, ১৩৮৬, পৃ. ১৮

৪. তদেব, পৃ. ২

৫. মজুমদার, রমেশচন্দ্র : *হিস্টরি অভ মেডিইভ্যাল বেঙ্গল*, ১৯৭৪, পৃ. ৪২ এবং ব্রাউন, পার্সি: *ইণ্ডিয়ান আরকিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড, ১৯৭৫), পৃ. ৩৭

৬. জানা, নরেশচন্দ্র : *বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী*, (১৯৯৬), পৃ. ২৫৮

৭. তদেব

৮. হক, জুলেখা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

৯. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, *বৈষ্ণবিজম্ ইন বেঙ্গল*, (১৯৮৫), তদেব, পৃ. ৩১০

১০. মিশেল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

১১. তদেব

১২. তদেব : পৃ. ১৪৪

১৩. রায়, প্রণব, *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ* (১৯৮৬), পৃ. ৯৬

১৪. ম্যাককাচ্চন, ডেভিড, '*বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ*' (প্রবন্ধ) : পশ্চিমবঙ্গ, ৭ জুলাই, ১৯৭২, পৃ. ৬৮৬

খ

মন্দির 'টেরাকোটা'য় গণেশ

বাংলায় মধ্যযুগে যে অসংখ্য ইঁট ও পাথরের মন্দির তৈরি হয়েছিল, তার অনেকগুলিতে পোড়ামাটি মূর্তিফলক ও প্রস্তরভাস্কর্য বহিরঙ্গের অলংকরণরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। খুব কম ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গের অলংকরণরূপে এগুলির ব্যবহার সীমিত ছিল। মূর্তিফলকগুলির বিষয়বস্তু ছিল মুখ্যত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী। সেসব কাহিনী সাধারণ মানুষ, শিল্পী স্থপতিরা কথকতা, যাত্রা-গানের মাধ্যমে শুনে শুনে মনে রাখতেন। বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপচিত্র, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবই শিল্পীমনের কল্পলোকে রূপান্তরিত হয়ে নতুন করে মন্দির-অলংকরণে উপস্থাপিত হত। সেসব চিত্র ছিল বাঙালি শিল্পীর একান্ত নিজস্ব— শাস্ত্রীয় দেবদেবীর সঙ্গে এদের মিল খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত, যদিও আকার ও নামে এদের কোন হেরফের ছিল না।

বাংলার মন্দিরের 'টেরাকোটা' ও প্রস্তরভাস্কর্য-ফলকগুলি লক্ষ্য করলে উপরি উক্ত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই বক্তব্য শুধুমাত্র শেষ-মধ্যযুগের (খ্রি. ১৬ শতক-১৮ শতক) মন্দিরগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য। এই সময় টেরাকোটা ও প্রস্তরভাস্কর্যশিল্পে একটি নতুন ধারার সূচনা হয়। (এ-সম্পর্কে লেখক পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-প্রকাশিত 'ইতিহাস অনুসন্ধান' ১৪ গ্রন্থে (২০০০ খ্রি.) 'মধ্যযুগের বাংলায় 'টেরাকোটা'-শিল্পের নতুন ধারা', পৃ. ১৮৪-১৯১ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।) আলোচ্য পৌরাণিক দেবতা গণেশ এই কালপর্বের মন্দিরসজ্জাফলকে বিপুল মাত্রায় উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁর দেবত্বের চেয়ে লৌকিক বৈশিষ্ট্যই বেশি করে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় পাথরের মন্দিরের চেয়ে ইঁটের মন্দির খুব বেশি থাকায় পোড়ামাটি ফলক বা 'টেরাকোটা' প্যানেলগুলিতে পৌরাণিক দেবদেবীর লৌকিক চরিত্র রূপায়ণের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট সংখ্যায় লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীদৃশ্য ও বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে গণেশের অবস্থান যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা গেলেও তাঁর স্থান নিতান্ত গৌণ বলেই মনে হয়। এর কারণ, গণেশ বাঙালি-মানসে কখনই প্রধান দেবতার মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। যদিও পুরাণে গণেশকে সর্বাগ্রে পূজা করার কথা বলা হয়েছে। পূজ্য পঞ্চপ্রধান দেবতার মধ্যে গণেশই সর্বপ্রথম পূজা পাওয়ার যোগ্য। ক্রমানুসারে পূজ্য এই পঞ্চদেবতার মধ্যে প্রথম হলেন গণেশ, এরপর সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা। এই পূজ্য পঞ্চপ্রধান দেবতার মধ্যে মধ্যযুগের মন্দিরশিল্পে (মন্দিরগাত্র অলংকরণে) সূর্য ছাড়া উক্ত সব দেবতারই কম-বেশি ফলক দেখা যায়। তবে এদের মধ্যে বিষ্ণুর ফলক খুব কম লক্ষ্য করা গেছে। গরুড়বাহন বিষ্ণুর 'টেরাকোটা' ফলক বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্তবাসুদেব মন্দিরে (১৬৭৯ খ্রি.) এবং গুপ্তিপাড়ার (হুগলি) রামচন্দ্রমন্দিরে (আ. খ্রি. ১৮ শতকের প্রথম) পাওয়া যায়। শিব ও দুর্গারও বহু ফলক মন্দিরসজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে, হর-পার্বতীর একক ফলক। কিন্তু গণেশের একক ফলক প্রায় দেখাই যায় না। পক্ষান্তরে, গণেশের প্রায় সব ফলকই মহিষমর্দিনী দুর্গার সাথে লক্ষ্য করা যায়, যা সপরিবার মহিষমর্দিনী রূপে বহু টেরাকোটা মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চেঁচুয়া-গোবিন্দনগরের (দাসপুর) রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১ খ্রি.) এবং আঁটপুরের রাধাগোবিন্দের 'আটচালা'র (১৭৮৬ খ্রি.) নাম করা যেতে পারে। এছাড়া, সপরিবার এই দুর্গা-প্যানেল আছে বালি-দেওয়ান গঞ্জে দুর্গার 'জোড়বাংলা-নবরত্ন' মন্দিরে এবং গোবিন্দপুরের

(পাঁশকুড়া) তারকনাথের আটচালায় (১৮৮১ খ্রি.)। উল্লিখিত সব মন্দিরেই গণেশ নিজস্ব ভঙ্গিমায় উপস্থিত। সপরিবার মহিষমর্দিনী দুর্গা প্যানেলে গণেশ দেবী দুর্গার ডাইনে একেবারে শেষ প্রান্তে উপস্থিত থাকেন। তাঁর পাশে থাকেন লক্ষ্মী। দুজনের বাহন যথাক্রমে মূষিক ও পেচক। দুর্গার বাম দিকে থাকেন ময়ূরবাহন কার্তিকেয় ও হংসবাহনা সরস্বতী। কার্তিকেয় সর্ববামে অবস্থান করেন। দুর্গা বা বাসন্তী পূজা উপলক্ষে প্রতিমার এই সংস্থাপন রীতিটি মন্দির-'টেরাকোটা' প্যানেলে নিখুঁতভাবে অনুসৃত হয়েছে। টেরাকোটা-ফলকে একক মহিষমর্দিনী মূর্তি অবশ্য লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে গণেশের অনুপস্থিতি স্বাভাবিক। তবে গণেশকে লক্ষ্যসিদ্ধির দেবতারূপে এককরূপে সংস্থাপিত হতে দেখা যায়। সাধারণত এই একক গণেশমূর্তি মন্দিরের সামনের দিকের ওপরের কার্নিশের কেন্দ্রস্থলের কোন কুলুঙ্গীতে সন্নিবেশিত দেখা যায় অথবা দুপাশে ওপরে-নিচের কোন কোন কুলুঙ্গীতেও দেখা যায়।

পুরাণের ধ্যানমন্ত্রে গণেশের যে রূপ কল্পনা করা হয়েছে, মধ্যযুগের মন্দির-শিল্পে তার প্রতিফলন ঘটলেও তাঁর ও তাঁর বাহনের আকৃতির মধ্যে লোকবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। খর্বাকৃতি, লম্বোদর, হস্তিমুখ এবং চতুর্হস্ত গণেশ বহু ক্ষেত্রে একটি বৃহদাকার মূষিকের ওপর আসীন থাকেন। শিল্পীর কলাকৌশলে মূষিকটি হয়ে উঠেছে শূকরের মতো অথবা এটি যেন কোন জলহস্তী বা শুণ্ড বিহীন হস্তী। কারণ, তার প্রভুর একটি দোদুল্যমান পায়ের ওপর অপর একটি পা তুলে বসতে হলে মূষিকটি এরূপ না হলে চলে না। শিল্পী সেটি মাথায় রেখে গণেশের এই বাহনকে নিজস্ব কল্পনায় নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে স্বয়ং গণেশ তাঁর দেবমহিমার গাম্ভীর্য হারিয়ে শুঁড় দিয়ে তাঁর এক হাতের ওপর রাখা মোদকভক্ষণে রত। এদিকে দেবী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা যেখানে অসুরসংহারে ব্যস্ত, সেখানে গণেশের এই নিশ্চিন্ত ভাব শিল্পীমানসের এক বিশেষ ধারণার অভিব্যক্তি। খ্রিস্টীয় সতের শতক থেকে উনিশ শতকে নির্মিত বাংলার ইঁটের মন্দিরে দেবদেবীর অসংখ্য 'টেরাকোটা' ফলকে এই লোকচরিত্রটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। মন্দিরস্থাপত্য এবং 'টেরাকোটা' অলংকরণের যে একটি নতুন ধারার সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটেছিল এই সময়ে, তাতে প্রতিমাশিল্পের প্রাচীন শাস্ত্রীয় অনুশাসন রক্ষা করার কোন প্রবণতাই এর মধ্যে ছিল না। প্রতিমাশিল্প সম্পর্কে জানারও তেমন কোন সুযোগ ছিল না সে সময়ে। শুধুমাত্র সহজ সরল যাত্রাপালাগান, কথকতা, মঙ্গলকাব্যের কাহিনী, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত এবং কৃষ্ণলীলাকথা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে যেমন পুষ্ট করেছিল, তেমনি বাংলার নিজস্ব মন্দিরস্থাপত্য 'চালা', 'চাঁদনি', 'দালান', 'রত্ন', ও 'দেউল' শৈলীরও সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সঙ্গে মন্দিরের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ অলংকরণের জন্যে 'টেরাকোটা' শিল্পের নতুন ধারারও উদ্ভব হয়, যার মধ্যে নমনীয় মাটির ফলকে লোকভঙ্গিমা বা লৌকিক চরিত্র বেশি করে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এমনকি, বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির শিল্পোৎকর্ষ সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে এই ভাবটি লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দান অসামান্য তা অবশ্যই স্বীকার্য।

মন্দির-'টেরাকোটা' অলংকরণে গণেশের অপর একটি চিত্র লক্ষ্য করা যায় দেবী চণ্ডীর কোলে শিশু গণেশের মধ্যে। এটি টেরাকোটা-শিল্পের 'গণেশ-জননী' 'মোটিফ'। সতের থেকে উনিশ শতকের মধ্যে তৈরি বহু মন্দিরে এই 'মোটিফ' স্থান পেয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র গণেশজননী-'টেরাকোটা'-ফলকের চেয়ে এই দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে 'চণ্ডীমঙ্গলে' বর্ণিত 'কমলেকামিনী' দৃশ্যের মধ্যে। সেখানে সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় দেবী চণ্ডী বা অভয়া একটি বিকশিত পদ্মের ওপর আসীনা,

তাঁর কোলে শিশুগণেশকে তিনি যেন স্তন্যপান করাচ্ছেন। দেবীর একটি পা দোদুল্যমান, অপর পা ভাঁজ করা অবস্থায় সেই পায়ের ওপর ন্যস্ত। দেবীর দুদিকে দুটি নৌকোর একটিতে (ডানদিকে) ধনপতিসদাগর ও তাঁর লোকজন, মাঝি এবং অপরদিকে (বামদিকে) অনুরূপ একটি নৌকোয় ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি। শ্রীপতি সিংহল যাত্রাপথে এবং ধনপতি যাওয়া আসার পথে এই অলৌকিক দর্শন লাভ করেছিলেন। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' মতে এবং 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কাহিনী অনুসারে কিন্তু 'কমলেকামিনী' গণেশজননী নন, তিনি মাঝদরিয়ায় পদ্মের ওপর বসে একটি হাতিকে একবার গলাধঃকরণ করছিলেন, অপরদিকে সেই হাতিকে মুখ থেকে আবার বের করছিলেন। এই অলৌকিক বস্তু দর্শনে দুজনেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। টেরাকোটা-শিল্পী এই বীভৎস দৃশ্যের থেকে করুণাময়ী গণেশজননীর মূর্তিই রূপায়িত করেছেন প্যানেলে। ফলকে খোদিত ক্রোড়ে স্তন্যপানরত গণেশকে নিতান্ত বালকরূপে দেখানো হয়েছে। দুই সদাগর ঐ দৃশ্য দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ। অনেকসময় মহিষমর্দিনী দুর্গার প্যানেল ঠিক ওপরে রেখে তার নিচে এই 'কমলেকামিনী' বা 'গণেশজননী' দৃশ্য দেখানো হয়েছে। আমরা এমন একটি দৃশ্য পাই মাংলই-শ্যামবল্লভপুর গ্রামে (পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর) মাইতিদের রাধাদামোদরের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে (আ. খ্রি. ১৯ শতকের প্রথমার্ধ)। এখানে অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী প্যানেলের ঠিক নীচে 'কমলে-কামিনী' দৃশ্য আছে। এছাড়া গণেশজননীদৃশ্য আছে দাসপুর থানার সুরৎপুরের শীতলার 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে। আরও বহু মন্দিরে এই দৃশ্য পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বাংলার 'টেরাকোটা'-অলংকরণে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী টেরাকোটা শিল্পীদের কাছে খুবই পরিচিত হয়ে উঠেছিল। কমলেকামিনী বা গণেশজননী ফলক তারই প্রতিফলন। জনসাধারণ ও মন্দির-প্রতিষ্ঠাতাদের কাছেও এই কাহিনী খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অসংখ্য টেরাকোটা-ফলকের সমাবেশে তা প্রমাণিত হয়।

বাংলার দুর্গোৎসবে বহুকাল ধরে শুধুমাত্র মহিষমর্দিনী দুর্গার পুজো না হয়ে গণেশাদিসহ সপরিবার দুর্গার পুজো হয়ে আসছে, যদিও শুধুমাত্র মহিষমর্দিনী দুর্গার পুজোও বিরল নয়। বাংলার অনেক স্থানে এই মহিষমর্দিনীর পুজো হয়। আমরা নদীয়ার শান্তিপুরে বহু পরিবারে শুধুমাত্র মহিষমর্দিনী দুগামূর্তির পুজো হতে দেখেছি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাঙালি মা চণ্ডী বা দুর্গাকে তাঁর পুত্র পরিজন সহ দেখতে ও আরাধনা করতে অভ্যস্ত। তাই যুগ যুগ ধরে গণেশাদি সহ মা দুর্গার পুজো পাড়ায় পাড়ায় ও ঘরে ঘরে আজও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কোন কোন স্থানে দেবী বিশালাক্ষীর সঙ্গে গণেশ ও কার্ত্তিকেয়কেও লক্ষ্য করা গেছে, যেমন বরদার (ঘাটাল) বিশালাক্ষী। গণেশ ও কার্ত্তিকেয় যে শিবপুত্র তার উল্লেখ প্রাচীন শিলালিপিতেও পাওয়া যায়। দেওপাড়া, নৈহাটি ও বারাকপুর লিপিতে একথার উল্লেখ আছে। সপরিবার চণ্ডী বা দুর্গার পূজা কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে খুল্লনার চণ্ডীপূজাতেও পাওয়া যায়। খুল্লনা প্রথমে লম্বোদর বা গণেশের পুজো করেন। পরে তিনি ময়ূরবাহন ষড়ানন বা কার্ত্তিকেয় এবং তার পরে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পুজো করেন। এরপর চণ্ডিকাকে তিনি নানা উপচার দিয়ে পুজো করেন। বাঙালির কাছে তাই চণ্ডিকা আসেন গণেশ প্রভৃতি পুত্রকন্যাকে নিয়ে সপরিবারে। কিন্তু মার্কণ্ডেয় চণ্ডী কথিত তাঁর মহিষাসুরমর্দিনী রূপটি কিন্তু বাঙালি শিল্পী বিস্মৃত হননি। গণেশ এবং কার্ত্তিকেয়কেও মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় রূপায়িত করা হয়েছে প্রতিমাশিল্পে ও মন্দির টেরাকোটায়। 'টেরাকোটা'য় গণেশের হাতেও আমরা তাই ধনুর্বাণ দেখি। গণেশসহ সপরিবার দুর্গা মহিষমর্দিনী রূপের বদলে আমরা কোন কোন মন্দিরে হর-পার্বতীর সঙ্গে গণেশাদির অবস্থান লক্ষ্য করি। যেমন চন্দ্রকোণার

(মেদিনীপুর) রঘুনাথপুরে পার্বতীনাথের '*সপ্তদশরত্ন*' মন্দির (আ. ১৯ শতক)। এখানে বাইরের দেওয়ালে উপরিউক্ত '*স্টাকোর*' মূর্তি লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যযুগীয় বাংলার মন্দিরশিল্পে গণেশ প্রসঙ্গে এতক্ষণ যে কথা বলা হ'ল, তার সূত্র ধরে আমরা প্রাচীন বাংলার মন্দিরশিল্পে গণেশের যে রূপটি পাই, তার আলোচনায় এখন আসতে পারি। সেই সঙ্গে গণেশের দেবতারূপে উদ্ভব ও শাস্ত্রীয় প্রতিমাশিল্পে গণেশের রূপ কেমন ছিল, তার প্রসঙ্গেও আলোচনা করতে পারি।

মহাভারতে বলা হয়েছে, রুদ্রগণের যিনি অধিপতি, তিনিই গণেশ বা গণেশ্বর। রুদ্রশিবই হলেন গণেশ বা গণপতি। পরে গণেশ রুদ্রশিব থেকে আলাদা হয়ে শিবপুত্র গণেশরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। অসুরনাশের জন্য বিঘ্ন দূর করার প্রার্থনা জানিয়ে দেবগণ শিবের কাছে বর প্রার্থনা করলে শিব গণেশের রূপ ধারণ করলেন। এইভাবে শিব থেকে গণেশের উদ্ভব হয়। এরপর গণেশ সম্পর্কে তাঁর জন্ম বিষয়ে বহু কাহিনী পুরাণে পাওয়া যায়। 'চণ্ডীমঙ্গলে' দেখা যায়, পার্বতীর দেহমল থেকে গণেশের উৎপত্তি হয়। পরে মুণ্ডহীন দেহে হাতির মাথা কেটে বসিয়ে দিলে গণেশের এরূপ আকৃতি হয়। এই সব কাহিনী বা কথার মধ্য দিয়ে প্রাচীনকালে গণেশের রূপ কল্পিত হয়েছিল।

পুরাণকল্পিত গণেশ পরবর্তীকালে এক জনপ্রিয় দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রমশ সাহিত্যে ও শিল্পে তাঁর প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। বাংলাদেশে 'পালযুগে' নির্মিত কিছু কিছু গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে, যেগুলি অবশ্যই মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ে প্রায় সব গণেশমূর্তিই ছিল মূষিকের ওপর নৃত্যপরায়ণ। 'তাঁর হাতে একটি ফল; এই ফল সিদ্ধির প্রতীক'। বাংলাদেশের সব সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে বণিক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে গণেশ সিদ্ধিফলদাতা বলে পূজিত হন। খ্রিস্টীয় নবম শতকে ব্যবসায়ে সমৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্যে গণেশপূজা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে গণেশের অস্তিত্ব আরও প্রাচীনকালে ছিল জানা যায় বাংলার বাইরে। কানপুরের কাছাকাছি ভিতরগাঁও গ্রামে দুর্গার ইঁটের 'শিখর' মন্দিরের (আ. খ্রি. ৫ম শতক) দেওয়ালে গণসহ মোদকহস্তে গজমুখ গণেশের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। মথুরায় প্রাপ্ত লাল রঙের পাথরে খোদিত গণেশের একটি নগ্নমূর্তিকে বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের বলে স্থির করেছেন। তবে সাহিত্যে কালিদাস (আ. খ্রি. ৪র্থ শতক) এবং ভারবির (আ. খ্রি. ৬ষ্ঠ শতক) কাব্যে অন্যান্য দেবতার নাম থাকলেও গণেশের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকি, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যাভিনয়ের বিঘ্নবিনাশের জন্যও তাঁর কোন উল্লেখ পাই না। খ্রি. ৫ম শতক পর্যন্ত প্রাচীনকালের কোন লেখে গণেশের নাম পাওয়া যায়নি। সে কারণ গণেশের কোন মূর্তি বা গণেশপূজার প্রচলনের কোন প্রমাণ খ্রি. ৫ম-৬ষ্ঠ শতকের আগে পাওয়া যায়নি। তাই গণেশের পৃথক দেবতারূপে প্রকাশ ঠিক কোন্ সময়ে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। ভাণ্ডারকরের মতে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগের আগে গণেশের পূজার প্রচলন হয়নি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (খ্রি. ৬ষ্ঠ শতক?), বাণভট্টের কাদম্বরী (খ্রি. ৭ম শতক) এবং ভবভূতির মালতীমাধব নাটকে (খ্রি. ৭ম শতক) গণপতি বা গণেশের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। মহাভারতের লেখকরূপে (scribe) গণেশের যে পরিচিতি এবং সে-সম্পর্কে যে উপাখ্যান আছে, তা গবেষকদের মতে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে রচিত এবং মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ। 'অমরকোষে' (আ.৬ষ্ঠ শতক) গণপতি বা গণেশের কয়েকটি নাম পাওয়া যায়— বিনায়ক, বিঘ্নরাজ, দ্বৈমাতুর, গণাধিপ, একদন্ত, হেরম্ব, লম্বোদর ও

গজানন (অমরকোষ, স্বর্গবর্গ)। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে তৈরি কাম্বোডিয়ার (কাম্বোজ) মাইসন মন্দিরে মোদকহস্তে দ্বিভুজ গজানন মূর্তি প্রমাণ করে যে, সপ্তম শতকে গণেশপূজা সেখানেও প্রচলিত ছিল।

এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জনৈক গবেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্তশাসনাধিকারকালে রুদ্রগণের অধিপতি রুদ্র-গণেশ শিবপুত্ররূপে পৃথকভাবে আবির্ভূত হন এবং তাঁর পূজা প্রচলিত হতে থাকে। ৭ম-৮ম শতকে তা আরও জনপ্রিয় হয়। ভাণ্ডারকর মনে করেন, খ্রিস্টিয় ৫ম থেকে ৮ম শতকের মধ্যে মহারাষ্ট্রে গণেশপূজা চলিত হয়।

'*অগ্নিপুরাণে*' প্রতিমালক্ষণ থেকে জানা যায়, গণেশের মূর্তি কয়েকপ্রকার। এর মধ্যে নৃত্ত-গণেশ হ'ল, নৃত্যকারী গণেশ। এটি রুদ্রশিব বা নটরাজমূর্তিব নামান্তর। এই মূর্তি সাধারণত অষ্টভুজবিশিষ্ট, আবার ছয়টি হাতও দেখা যায়। নৃত্ত-কালের হাবভাবের সুবিধার জন্যে এক হাত খালি থাকে, এতে কিছুই থাকে না। নৃত্ত-মূর্তি বোঝানোর জন্যে এর বাঁ পা কিছুটা বাঁকাভাবে স্থিত। ডান পা বাঁকাভাবে শূন্যে স্থিত। প্রধান দুটি হাতের মধ্যে ডান হাতে অভয়মুদ্রা এবং বাঁ হাত বাইরে প্রসারিত এবং দোদুল্যমান। এটি 'গজহস্ত'। অন্যান্য হাতে দণ্ড, অক্ষমালা, কুঠার, মূলক, মোদকপাত্র, সর্প প্রভৃতি থাকে। আবার ধ্যানমন্ত্র অনুসারে এর হাতে থাকে পাশ, অঙ্কুশ, কুঠার, দণ্ড, বলয় ও অঙ্গুরীয়। এর পায়ে নূপুর, কোমরে মেখলা ও সূত্র, হাতে বলয়।

'*নৃত্তগণেশ*' বাহন মূষিকের ওপর নৃত্যরত। বাংলাদেশে যেমন শিবের মধ্যযুগেব নৃত্যমূর্তিগুলি বাহন বৃষের পৃষ্ঠের ওপর নৃত্যশীল, গণেশও সেইরূপ নৃত্যশীল। শিব-নটরাজের মূর্তির অনুকরণে এইরূপ মূর্তি কল্পিত হয়। গণেশের যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে তিন শ্রেণীব মূর্তি লক্ষ্য করা যায়, দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও নৃত্যশীল। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মূর্তি অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু দণ্ডায়মান মূর্তির সংখ্যা তুলনায় কম। চতুর্ভুজ গণেশের সংখ্যা বেশি, কিন্তু দ্বিভুজ গণেশ কম। গণেশের প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে পুস্তক ও লেখনীহস্ত মূর্তি পাওয়া যায় না। বাংলায় 'পাল'যুগে নির্মিত গণেশমূর্তির মধ্যে একটি '.েশমূর্তি পাওয়া গেছে রাজশাহি জেলার (বাংলাদেশ) হাজিগঞ্জ থেকে। মূর্তিটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১০ম-১১শ শতকের। মূর্তিটির বাঁ পা আলতোভাবে ওঠানো। 'পঞ্চরথ' একটি পাদপীঠে অবস্থিত প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর সুঠাম এই মূর্তিটি 'পাল'যুগের ভাস্কর্যকলার এক বিশিষ্ট নিদর্শন। শাস্ত্রীয় প্রতিমালক্ষণের সব বৈশিষ্ট্যই এতে উপস্থিত।

প্রাচীন বাংলায় শাস্ত্রানুসারী বহু গণেশমূর্তি তৈরি হয়েছিল। মন্দির-অলংকরণ ও বিগ্রহরূপে সেগুলি ব্যবহৃত হত। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর (বাংলাদেশ) মন্দিরের (আ. খ্রি. নবম শতক) লোকায়ত মৃৎশিল্পে কৃষ্ণ-বলরাম, ইন্দ্র, যম, কুবেরের সঙ্গে গণেশমূর্তিও লক্ষ্য করা গেছে। কোন কোন সময় দেবীপ্রতিমার সঙ্গে গণেশকেও দেখা যায়। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত এ ধরনের কিছু মূর্তি লক্ষ্য করা গেছে। ওড়িশার পরশুরামেশ্বর মন্দিরের (ভুবনেশ্বর, খ্রি.৭ম শতক) দক্ষিণদিকের কুলুঙ্গীতে সিংহাসনে আসীন চতুর্ভুজ গণেশমূর্তি দেখা যায়। তার নীচের বাঁ হাতে একটি পাত্রে রাখা নাড়ু শুঁড়ের সাহায্যে ভক্ষণরত অবস্থায় দেখা যায়, অপরদিকে ওপরের বাঁ হাতে ধৃত একটি পরশু লক্ষণীয়। এই মন্দিরের একটি বরগায় (লিন্টেল) খোদিত শিব-পার্বতীর সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি গণেশও দেখা যায়।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা গণেশ-সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি। পুরাণে সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্নবিনাশকরূপে তিনি কল্পিত হয়েছেন। শিল্পে-ভাস্কর্যে তার অনেকটা প্রতিফলন ঘটেছে। প্রাচীন বাংলার গণেশমূর্তিগুলিতে প্রতিমাশাস্ত্রলক্ষণের নিয়ম অনেকটা অনুসৃত হত। পক্ষান্তরে, বাংলার মধ্যযুগের ইঁট ও পাথরের মন্দিরে পুরাণোক্ত বা শাস্ত্রীয় লক্ষণযুক্ত গণেশ মূর্তি অপেক্ষা বাঙালিশিল্পীর নিজস্ব কল্পনায় সৃষ্ট গণেশের অনেক ফলক মন্দিরসজ্জায় স্থান পেয়েছিল, যদিও পুরাণের কাহিনী বা বর্ণনা সেখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়নি। গণেশজননী রূপকল্পনা 'স্কন্দপুরাণের' প্রভাসখণ্ডে কিছুটা পাওয়া যায়। সেখানে গণেশজননী কর্তৃক পুত্র গণেশকে মোদকপূর্ণ ভোজ্যপাত্র দেওয়ার কথা আছে। আবার 'কমলেকামিনী'র সূত্র আছে বৃহদ্ধর্মপুরাণে। গণেশ আজও তাঁর জনপ্রিয়তা হারাননি। বহু গণেশমূর্তি এখনও তৈরি হয়। নবনির্মিত কোন কোন মন্দিরে সেগুলি স্থাপিতও হয়। সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্নবিনাশকরূপে গণেশমূর্তি আজও পূজিত হয়।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. রায় নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দে'জ ২য় সং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

২. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, *হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, ফার্মা কে.এল.এম., কলিকাতা, ১৯৯৫

৩. কবিকঙ্কণ চক্রবর্তী মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কণচণ্ডী*, বসুমতী সং

৪. ভাণ্ডারকর, *বৈষ্ণবিজম্* (ইং)

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ, *পঞ্চোপাসনা*

৬. ঘেট্টি এলিস, গণেশ (ইং)

৭. *অগ্নিপুরাণ*, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত)

৮. *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*

৯. চক্রবর্তী, রামেশ্বর, *শিবায়ন*; পঞ্চানন, চক্রবর্তী (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

১০. মিত্র, দেবলা, *ভুবনেশ্বর* (ইং), ৩য় সং, ১৯৬৬, আর্কিওলজিক্যাল সারভে অভ ইণ্ডিয়া

১১. *ইতিহাস অনুসন্ধান* ১৩, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ফার্মা কে.এল.এম., কলিকাতা, ১৯৯৯ এবং ঐ ১৪, ২০০০

গ

মন্দির-'টেরাকোটা'য় দুর্গা

বাংলায় মধ্যযুগে খ্রিস্টীয় সতের থেকে উনিশ শতকের মধ্যে যে অসংখ্য 'টেরাকোটা'-মন্দির তৈরি হয়েছিল, তার অনেকগুলিই ছিল পোড়ামাটির মূর্তি ও বিভিন্ন ফুলকারি নকশায় অলংকৃত। পনের শতকের শেষাশেষি থেকে পোড়ামাটির ফলক দিয়ে মন্দিরের দেওয়াল সজ্জিত করার প্রথা চলিত হয়। সে-সময় সুলতানী আমলের শেষ পর্যায়। মুসলমান শাসনাধিকার বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে পাল-সেন আমলে হিন্দুমন্দিরের দেওয়ালে পোড়ামাটি-ফলক বা 'টেরাকোটা' স্থান পেত, তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে-সময়ের বৌদ্ধ বা জৈন মন্দিরে মূর্তিফলক না থাকলেও পোড়ামাটির ফুলকারি নকশা ও কিছু কিছু জীবজন্তুর ফলক লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু ঐ সব মন্দিরের অধিকাংশই মুসলমান-আক্রমণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল পরে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী সময়ে ষোল-সতের শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলাব নিজস্ব 'চালা', 'চাঁদনি', 'দালান', 'রত্ন', ও 'দেউল' শৈলীর যে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়, তার অনেকগুলিতে 'টেরাকোটা'-অলংকরণ শোভা পেতে থাকে। এই ধরনের বহু মন্দির আজও গ্রামে গ্রামে ঘুরলে দেখতে পাওয়া যায়।

'টেরাকোটা'-অলংকরণের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত পৌরাণিক। তার মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের জনপ্রিয় কাহিনীগুলিও ছিল। এছাড়া ছিল সেকালের সমাজচিত্রমূলক বহু দৃশ্য, জীব জন্তুর মূর্তি, ফুলকারি নকশা ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩), কেষ্টরায়ের জোড়বাংলা (১৬৫৫), মদনমোহনের 'একরত্ন' (১৬৯৪) প্রভৃতি মন্দিরে এইসব কাহিনী মূলক টেরাকোটা-সজ্জার বিপুল সমারোহ দেখা যায়।

মন্দিরগুলির বেশির ভাগের সামনের দেওয়ালে, প্রবেশপথের ওপরে নিচে পৌরাণিক, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীগুলির মধ্যে কৃষ্ণলীলা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, দেব-দেবীর বহু ফলক ও 'প্যানেল' সন্নিবেশিত দেখা যায়। হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে সব থেকে আকর্ষণীয় হ'ল মহিষাসুর-মর্দিনী দুর্গা মূর্তি। এই মূর্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দশভুজা, কোন কোন ক্ষেত্রে অষ্টাদশভুজা, খুব কম ক্ষেত্রে চতুর্ভুজা ও অষ্টভুজাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দশভুজা দুর্গা মূর্তির সংখ্যাই বেশি। এই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গামূর্তির সঙ্গে গণেশাদি তাঁর পরিবার পরিজনের ফলকও দেখা যায়। আবার একক মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তিও লক্ষ্য করা যায়। বাংলার ঘরে ঘরে সপরিবার মহিষমর্দিনী দুর্গাপ্রতিমা প্রাচীনকাল থেকে আজও পূজিত হয়ে আসছে। মন্দির-টেরাকোটা-শিল্পীরা সেটাই প্রতিফলিত করেছেন। কোন কোন সময় রাম-রাবণের ভয়ঙ্কর লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যে মুখোমুখি যুদ্ধরত রাম ও রাবণের মাঝখানে শুধুমাত্র মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজার আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এটা সম্ভবত কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'অকালবোধনে'র কথা স্মরণে রেখে শিল্পী নির্মাণ করেছিলেন। এ যেন যুদ্ধজয়ের জন্যে রামের আকুল আহ্বানে বা আরাধনায় দুর্গার আবির্ভাব ও তাঁকে বরদান। এই ধরনের মূর্তি আমরা পেয়েছি কালনার (বর্ধমান) প্রতাপেশ্বর দেউলে (১৮৪৯) এবং হদলনারায়ণপুরের (বাঁকুড়া) রাধা-দামোদরের 'নবরত্ন' মন্দিরে।

প্রাচীন কোন কোন মন্দিরে একক মহিষমর্দিনী মূর্তিও পাওয়া গেছে। যেমন, গোকর্ণের (মুর্শিদাবাদ) নৃসিংহের 'চারচালা' (১৫৮৮)। এই মন্দিরে একটি 'টেরাকোটা' ফলকে দেবী দশভুজার

সুন্দর দশভুজা মূর্তি দেখা যায়। রাজশাহি জেলার (বাংলাদেশ) পুঠিয়ায় মহিষমর্দিনী দুর্গার একটি বীরত্বব্যঞ্জক টেরাকোটা-মূর্তি পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবাংলার বহু মন্দিরে অজস্র মহিষাসুরমর্দিনীমূর্তির সমারোহ আমাদের বিস্মিত করে। শরৎকালে দেবীর অতিপ্রিয় আরাধনার মতো তাঁর মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি টেরাকোটা অলংকরণে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠে। এটি একটি 'মোটিফ'-রূপে(motif)গৃহীত হয়। অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ের আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠে। যেমন, লঙ্কাযুদ্ধ, কৃষ্ণলীলার মধ্যে গোপীদের 'বস্ত্রহরণ', 'কালীয়দমন', 'নৌকোবিলাস', 'নবনারীকুঞ্জর', রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে পূর্বোক্ত 'লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য' ছাড়াও 'মায়ামৃগ', 'শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন' প্রভৃতি দৃশ্য। এইসব দৃশ্য প্রায় প্রতিটি 'টেরাকোটা'-মন্দিরে দেখা যায়।

মেদিনীপুর জেলার বহু মন্দিরে আমরা টেরাকোটা দশভুজা, *অষ্টাদশভুজা* মহিষমর্দিনী দুর্গার ফলক লক্ষ্য করেছি। বিশেষ করে, উত্তর-পূর্ব ও মধ্য মেদিনীপুরের অনেক ইঁটের মন্দিরে এই টেরাকোটা-ফলক পাওয়া গেছে। এর একটি বিশাল তালিকা হতে পারে। দুর্গা টেরাকোটা প্যানেলগুলির মধ্যে অষ্টাদশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর (মাংলই-শ্যামবল্লভপুর, পাঁশকুড়া, আ. ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায়) একটি টেরাকোটা-ফলক উল্লেখযোগ্য। এই প্যানেলটির ঠিক নিচেই 'চণ্ডীমঙ্গলে'র প্রসিদ্ধ 'কমলেকামিনী' দৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দশভুজা দুর্গার (সপরিবার ও একক) টেরাকোটার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ চেঁচুয়া-গোবিন্দনগরের (দাসপুর) রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১), লক্ষ্মীজনার্দনের 'পঞ্চরত্ন' (দাসপুর, ১৭৯১), চাউলির (ঘাটাল) শীতলানন্দ শিবের 'আটচালা' (১৮০৯)। কার্তিকেয়-গণেশাদি সহ *চতুর্ভুজা* মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তির টেরাকোটা-প্যানেল আমরা লক্ষ্য করেছি বাগরুই গ্রামে (কেশপুর) মাইতিদের লক্ষ্মীবরাহের 'নবরত্ন' মন্দিরে। মন্দিরটি আনুমানিক উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। দুর্গা-টেরাকোটার অন্যান্য প্যানেলগুলি হল, ব্রাহ্মণবসানের (দাসপুর) শ্রীধরের 'আটচালা' (আ. খ্রি. ১৯ শতক, এখানে সপরিবার দশভুজা দুর্গা প্যানেল আছে), ভট্টগ্রামের (গোয়ালতোড়) দামোদরের 'আটচালা', (১৮৬৬, এখানে 'কমলে-কামিনী' দৃশ্যও আছে), লালগড়ের (বিনপুর) রাধামোহনের দ্বিতল-'চাঁদনি' মন্দিরে 'স্টাকো'র দশভূজা মহিষমর্দিনী, সৌলান গ্রামের (দাসপুর) ভুএগাদের 'নবরত্ন' (১৮১৭, এখানে সপরিবার দশভুজা ও কমলেকামিনীও আছে) প্রভৃতি আরও অনেক মন্দিরে দুর্গার 'টেরাকোটা' ফলক লক্ষ্য করা যায়।

হুগলি জেলায় যেসব মন্দির আছে, তার মধ্যে আঁটপুরের (জাঙ্গীপাড়া) রাধাগোবিন্দের 'আটচালা'য় (১৭৮৬) সপরিবার ও একক দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দ্বারহাট্টার (হরিপাল) রাজরাজেশ্বরের 'আটচালা' (১৭২৮) মন্দিরেও আমরা দশভুজামূর্তি ফলক লক্ষ্য করেছি। এই জেলারই বালি-দেওয়ানগঞ্জের (গোঘাট) দুর্গার জোড়বাংলা-নবরত্নে সপরিবার দুর্গার 'টেরাকোটা'-ফলকগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবাংলার আরও বহু জেলার ইঁটের মন্দিরে 'টেরাকোটা'-প্যানেলের মধ্যে এ ধরনের বহু ফলক পাওয়া গেছে।

বাংলার মন্দির টেরাকোটায় একসময় দুর্গাফলক সন্নিবেশ এক প্রথায় পরিণত হয়েছিল, বিশেষ করে, খ্রিস্টীয় ১৮-১৯ শতকের মন্দিরে। সতের শতকের মন্দিরে এই দুর্গা 'টেরাকোটা'র তেমন সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায় না। বাংলার 'টেরাকোটা'-অলংকরণ লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের এক বিশিষ্ট উদাহরণ। এগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের সহজ-সরল ধ্যান-ধারণার বিশেষ প্রকাশ

ঘটেছে। মন্দিরগুলিও যেমন 'চালা', 'চাঁদনি' ইত্যাদি লোকস্থাপত্যেরই নিদর্শন। এগুলির মধ্যে বিরাট কোন পরিকল্পনা নেই। সাধারণ মানুষের বসবাসের জন্যে খোড়ো চালা যেমন বহু প্রাচীনকাল থেকে নির্মিত হয়ে আসছে, তেমনি গ্রাম-দেবতার বসবাসের জন্যেই এই সাদামাটা স্থাপত্যের সৃষ্টি হয়। মন্দির-টেরাকোটাশিল্পেও সেই লোকভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ

মন্দির-'টেরাকোটা'য় নৌযান

নদীনালায় ভরা পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে নৌযান বা নৌকোই ছিল যাতায়াতের প্রধান উপায়। স্থলপথ সে-সময় তেমন ছিল না এখনকার মতো। বিশেষ করে, স্থলপথ ছিল অনেক ক্ষেত্রে দুর্গম, বনজঙ্গলে ভরা - চোরডাকাতের স্বর্গরাজ্য! অবশ্য, নদীপথেও চোরডাকাতের ভয় ছিল, তবে কম। নৌকো করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া অনেকটা সহজ ছিল। নদীগুলোও ছিল গভীর, নৌ-চলাচলের অনুকূল— জোয়ার-ভাঁটায় স্রোতের সুবিধাও ছিল, সহজে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর পক্ষে। একারণে, প্রাচীন বাংলায় নৌকোর বিকল্প তেমন কিছু ছিল না। নৌকোর সঙ্গে জড়িত ছিল গরিব মৎস্যজীবীদের পেশা, বণিক সদাগরের দেশান্তরে বাণিজ্যযাত্রা, জলদস্যুতার সহজ উপায়, ভ্রমণযাত্রা ইত্যাদি। এসবের জন্যে নানান ধরনের নৌকোও তৈরি হয়েছিল সেকালে। এগুলো ছিল একান্তই দেশজ, সম্পূর্ণ লোক-উপাদানে তৈরি, বাংলার মাটি-মানুষের নিজস্ব কৃৎকৌশলের উদাহরণ। হারিয়ে যাওয়া এসব প্রাচীন নৌ-কৃৎকৌশলের ভগ্নজীর্ণ ধ্বংসাবশেষের নমুনা মেলে প্রত্যন্ত গ্রামবাংলায় মজে যাওয়া বা শুকনো হয়ে যাওয়া পুরানো নদীনালা খাতের ভেতর থেকে, মাটি খুঁড়ে। অনেক সময় নৌকোর ভাঙা কোণা বা দাঁড়ও পাওয়া গেছে অনেক মজা খাল-বিল থেকে। সেগুলো ছিল সেকালের বহমান নদী। আজ আর তার কোন অস্তিত্ব নেই।

এ থেকেই বোঝা যায়, নদী-নালার দেশ বাংলায় নৌযান বা নৌকো কত জনপ্রিয় ছিল সেকালে। মধ্যবাংলার ব-দ্বীপ এলাকায় অসংখ্য নদীনালা ও ছোট-বড় নদীতে বিভিন্ন কাজে নৌকোর ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল।

মধ্যবাংলায় চৈতন্যোত্তর যুগে (খ্রিস্টীয় ষোল শতক থেকে) যে নবপর্যায়ের মন্দিরচর্চা শুরু হয়, সেখানে 'টেরাকোটা'-সজ্জায় রামলীলা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি দেবদেবীলীলার অজস্র ফলক লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে সমকালীন সামাজিক দৃশ্যচিত্র এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। কৃষ্ণলীলার 'নৌকোবিলাস' থেকে শুরু করে সাধারণ নৌকোয় ভ্রমণ— সব কিছুর মধ্যে নৌকোর অনেক ছবি টেরাকোটা-ফলকে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি. হাওড়া, মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম) এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অনেক টেরাকোটা-অলঙ্কৃতমন্দিরে আমরা দুধরনের নৌযানের ছবি লক্ষ্য করি — ১. নদীপথে চলাচলের নৌকো এবং ২. দূরদেশগামী জাহাজ বা বিদেশী জাহাজ। এখানে নদীপথের দেশীয় নৌকোই আলোচ্য। নদীপথের ছোট বড় যে-সব নৌকো এই ব-দ্বীপের নদীনালাগুলোতে চলাফেরা করত, সেগুলো স্থানীয় শিল্পীদের হাতে এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। মধ্যবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নদীখালবিলে তারা সে-সব নৌকোকে ঘোরাফেরা করতে দেখে সেগুলোর ছবি টেরাকোটা-ফলকে যেন জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলত। খ্রিস্টীয় আঠার থেকে উনিশ শতকের মধ্যে এ ধরনের অজস্র নৌকোফলক আমরা লক্ষ্য করি।

গ্রামবাংলার নদী-খালে চলাফেরা করা নৌকোগুলো সম্পর্কে কোন কোন বিদেশী পর্যটক ও লেখক কিছু আলোচনা করেছেন। জে. হরনেল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নদী গঙ্গার ওপর যেসব নৌকো মাল পরিবহন করত এবং যেসব অতি সাধারণ নৌকো চলত, সে সম্পর্কে তাঁর 'দি বোট্স

অভ দ্যা গ্যাঞ্জেস' নিবন্ধে লিখেছেন, গঙ্গার ওপর দিয়ে এত বিচিত্র ধরনের নৌকো চলত, যা ভারতের অন্য কোন নদীতে লক্ষ্য করা যায় না। গঙ্গার অনেক শাখা-প্রশাখা এবং খাঁড়িতে এরা ভিড় জমাত। বড় বড় নৌকোয় অজস্র মালপত্র যেমন বোঝাই করা থাকত, তেমনি গ্রাম্য ছোট-খাটো নৌকোগুলোতেও থাকত এক টন থেকে দু টনের মতো মাল। এগুলোর কোন কোনটির সাদা পালও দেখা যেত, কতকটা ভেনিসের নৌকোর মতো। এসব পালতোলা বড় বড় নৌকো গঙ্গার মূল স্রোত হয়ে চওড়া চওড়া শাখা নদীর ওপর দিয়ে তীরবর্তী জনবহুল নগরগুলোতে এসে পৌঁছত।

টি. এ. বাউরি ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে 'জিওগ্রাফিকাল অ্যাকাউন্ট অভ দ্যা কান্ট্রিজ রাউণ্ড দ্যা বে অভ বেঙ্গল' গ্রন্থে পূর্ব ভাবতের যে পাঁচটি নৌযানের ছবি দিয়েছেন, সেগুলো হল, 'পটোলা', 'উলাক', 'বজরা', 'পুরগো' এবং 'ভড়'।

মধ্যবাংলার অনেক মন্দির 'টেরাকোটা' ফলকে এই ধরনের নৌকোর কিছু কিছু প্রতিফলন ঘটলেও দাঁড় বা বৈঠাচালিত হালকা নৌকোর (স্কিফ) বহু ছবি পাওয়া যায়। এগুলোর কোন কোনটি লম্বা, কিন্তু চওড়ায় কম, দ্রুত যাতায়াতের পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। এই 'ছিপ'-নৌকোর দুদিকের দুপ্রান্ত সরু ও সংকীর্ণ, সরু চন্দ্রকলা বা অর্ধচন্দ্রের মতো দেখতে। খোলের গায়ে ছাড়া ছাড়া পেতলের পাত দিয়ে মোড়া, গায়ে মাঝে মাঝে কারুকার্য, অনেকগুলো দাঁড়বাহিত, দেখতে বেশ সুন্দর। যেন নৌকোর শরীরে মাঝে মাঝে মালা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এধরনের ফলকগুলো খ্রি আঠার-উনিশ শতকের অনেক মন্দিরে পাওয়া যায়। যেমন, দ্বারহাট্টার (হুগলি) রাজরাজেশ্বর (খ্রি. ১৭২৮), খেদাইলের (হুগলি) দামোদর (১৭৬৭), রাজবলহাটের দামোদর (১৭২৪), আকনাপুরের (তারকেশ্বর, হুগলি) পরিত্যক্ত একটি মন্দির (১৭৫৮), জঙ্গলপাড়ার (পুড়শুড়া, হুগলি) একটি পরিত্যক্ত মন্দির (আ. খ্রি. ১৮ শতকের শেষ), মামুদপুরের বিষ্ণু (১৮০৬)। এছাড়া ঘুড়িষার (১৬৩৩) (ইলামবাজার, বীরভূম) রঘুনাথ এবং ইলামবাজারের (বীরভূম, খ্রি. ১৮ শতকের শেষ) গৌরাঙ্গমন্দিরেও এই ফলক পাওয়া যায়। এগুলোতে আবার সুন্দর করে তৈরি করা ছোট ঘরও (কেবিন) আছে। দ্রুত চলার জন্যে এই ছিপগুলির দুই প্রান্ত এত ওপরে থাকে, মনে হয় সেগুলো যেন জলকে আদৌ না ছুঁয়ে জোরে ছুটে চলেছে।

এছাড়া আরও কোন কোন মন্দিরে এমন ধরনের নৌকোফলক দেখা গেছে, যেগুলোতে শুধু যুদ্ধবিগ্রহ বা জলদস্যুতার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। আমাদের দেশী নৌকোতে সেকালে ডাকাতি বা দস্যুতার জাজ্বল্যমান অনেক 'টেরাকোটা' ফলক বহু মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। বেশ ছোট এই নৌকোগুলো দ্রুতগতির ছিল। দেশী ও বা সেকালের বিদেশী হার্মাদ (পোর্তুগীজ) ডাকাতরা ক্ষিপ্রগতির এই সব ছোট মজবুত নৌকো করে আগন্তুকদের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে পালাত। পূর্বোক্ত মামুদপুরের (গোঘাট, হুগলি) বিষ্ণুমন্দিরের (১৮০৬) টেরাকোটা-ফলকের দেখানো হয়েছে, বন্দুকহাতে হার্মাদ ডাকাতদের একটা নৌকোর পাশে একটি যাত্রীনৌকোকে ঘিরে সবর্স্বলুণ্ঠনে রত। ঢেউয়ের ওপর একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি নৌকোর মাঝি জোরে দাঁড় টেনে পলায়নোদ্যত। ঝিখিরার (আমতা, হাওড়া), শ্যামসুন্দরের (১৬৯১) অপর এক মন্দিরে হিংস্র পশুর মুখোশ পরিহিত হার্মাদ দস্যুর ক্ষিপ্রগতির নৌকো জোরে ছুটে চলেছে। মাঝিরও মুখমণ্ডল পশুর মুখোশে ঢাকা। সে লম্বা বাঁশ বা লাঠি জলে ডুবিয়ে নৌকোটাকে জোরে টেনে নিয়ে চলেছে। নৌকোর পাটাতনে মাঝি যেমন দৌড়ে দৌড়ে জলে লগি ডুবিয়ে নৌকোকে বয়ে নিয়ে যায়, ঠিক সেভাবে মাঝি সামনে

টেনে নিয়ে চলেছে। দস্যুতার(পায়্যারেসি) আর এক জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে শ্রীরামপুরের (আরামবাগ, হুগলি) বিষ্ণুমন্দিরে (১৭৭২)। সেখানে নৌকোর সব যাত্রীকে পাশে ডাকাতদের নৌকোয় অপহরণ করা হয়েছে। ডাকাতদের নৌকোয় যাত্রীদের মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার দৃশ্যও প্রতিফলিত হয়েছে। হার্মাদ দস্যুদের নৌকোর অজস্র টেরাকোটা-ফলক বাংলার, বিশেষ করে ব-দ্বীপ অঞ্চলের বহু মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছে। কারণ, এই অঞ্চলেই সংঘটিত হত দেশী বিদেশী ডাকাতদের ভয়ঙ্কর অভিযান। ছোট নৌকোগুলি (টাইনি বোট্‌স) নিয়ে ডাকাতি করার পর বড় নৌকো বা জাহাজে বন্দী ও লুঠ করা জিনিসগুলো তোলা হত। এরপর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তারা পালিয়ে যেত। অনেক সময় সমুদ্রে জলজন্তু বা হাঙরের মুখে নিরীহ বন্দীদের ফেলে দেওয়া হত। তার জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী দৃশ্যগুলো টেরাকোটা-শিল্পীরা রূপায়িত করেছেন। যেমন, কৃষ্ণপুরের (দাদপুর, হুগলি) একটি পরিত্যক্ত মন্দিরে (১৭৬২) দেখা যাচ্ছে, সেকালের একটি য়ুরোপীয় পোতে এক বন্দীকে জাহাজের দোতালা থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হাঙরের মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। বন্দী দড়িটি ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে বাঁচার জন্যে। হাঙর তার ধারাল দাঁত বের করে হতভাগ্য ব্যক্তিটিকে খাওয়ার চেষ্টা করছে। নিচে ঢেউগুলোকে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে। দৃশ্যটি বড়ই মর্মস্পর্শী।

এই ধরনের ছোটখাটো দ্রুতগতির নৌকোগুলোকে 'পিনিস'(pinnace) বলা চলে। বড় নৌকো বা জাহাজের সঙ্গে এটা থাকে - ডাকাতি বা লুঠ করার জন্যে। এছাড়া ছোট খুবই মজবুত এক ধরনের নৌকো যুদ্ধের জন্যে সেকালে ব্যবহার করা হত; যাকে বলা হত, 'ফ্রিগাট' (frigate)। এর গোটা শরীরটাই জলের ওপর ভেসে থাকত। দুপাশে থাকত আরাম কেদারার মতো অংশ, যাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুকধারী পাহারা দিত বা দূরের দিকে লক্ষ্য রাখত। পূর্বোক্ত দ্বারহাট্টার রাজরাজেশ্বর মন্দিরে (১৭২৮) এ ধরনের একটি টেরাকোটা ফলক পাওয়া গেছে। আরও অনেক মন্দিরেও আছে।

টেরাকোটা-ফলকে যাত্রীনৌকোর গঠন একটু ভিন্ন ধরনের। এখনকার যাত্রীবাহী নৌকোর সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও সেকালে এর পেছনটা সামনের অংশের চেয়ে অনেকটা উঁচু করে তৈরি করা হত। দাঁড় বা বৈঠাচালিত হালকা নৌকোর থেকে এটা আরও বড় ছিল। এর পেছন বা সামনের অংশে থাকত হাঙর, ময়ূর বা হাতির মুখ। পেছনের অংশটা হত সুন্দরভাবে বাঁকানো। দু প্রান্তে দুজন দাঁড়ি বা মাঝি দাঁড় নিয়ে বসে থাকত। সুরৎপুরের (দাসপুর) শীতলা (১৮৪৯), উত্তর গোবিন্দনগরের (দাসপুর) ভুবনেশ্বর মন্দিরে (১৮৫০) এ ধরনের টেরাকোটা-ফলক লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া দাসপুরের লক্ষ্মীজনার্দন (১৭৯১), হরিরামপুরের (দাসপুর) শীতলানন্দ (আ. ১৯ শতক) এবং শ্রীধরপুরের রঘুনাথ (আ. ১৯ শতক) মন্দিরগুলোতে এইরূপ নৌকো লক্ষ্য করা গেছে। অনেক সময় পেছনের উচ্চ পাটাতনে প্রমোদ বা বিশ্রামকক্ষও দেখা যায়।

যাত্রীনৌকো কোন কোন সময় ছোট আকারেও তৈরি করা হত। এখানেও সামনের দিকটা নিচু। প্রতিকূল স্রোতে চালানোর জন্যে নৌকোর গঠন হত এইরূপ। পেছন দিকটা উঁচু তো ছিলই. খাড়া করেও তৈরি করা হত। যাতে মাঝিমাল্লা দূরের দিকে ভালো করে দেখতে পায়, সেজন্যেই ঐরকম তৈরি করার রীতি ছিল। সাধারণত একজন মাঝি নৌকোটা চালাত একটা চৌকো বড় দাঁড় দিয়ে। পূর্বোক্ত উত্তর গোবিন্দনগর, দাসপুর ও শ্রীধরপুরের টেরাকোটা-ফলকগুলোতে এই ধরনের নৌকো লক্ষ করা গেছে।

পেছনের উচ্চ পাটাতনের ওপর যে কক্ষ নির্মাণ করা হত, সেটা সাধারণ নৌকোয় বাঁশের ও ছই দিয়ে তৈরি হত ঠিকই, কিন্তু বড়লোক জমিদার বা উচ্চপদস্থদের জন্যে কাঠের দেওয়াল ও কামরার ছাদের মতো করে তৈরি করা হত, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ভাগ ভাগ করা কামরা থাকত, ভিনিসীয় জানালা লাগানো হত, দামী পরদাও টাঙানো থাকত। সামনের প্রান্তে বসত দাঁড়ি মাঝিমাল্লা। পূর্বোক্ত হরিরামপুরের শীতলানন্দ ও শ্রীধরপুরের রঘুনাথ মন্দির টেরাকোটা-ফলকে এটা দেখা গেছে।

যাত্রী বা প্রমোদতরণীর পেছনের উঁচু বাঁকানো অংশটা জলের ওপরে ভাসমান যেন জলের সঙ্গে তার কোন ছোঁয়াও নেই। নৌকোর কাঠামোটা উঁচু পাটাতনের দ্বারা আচ্ছাদিত। সেটা চমৎকার কারুকার্য করা, সুসজ্জিত কামরায় লোকজন, বিচিত্র ধরনের পোশাকে সজ্জিত যাত্রীবা কেউ বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে, মাঝি দাঁড় হাতে পেছনের উঁচু প্রান্তে দাঁড়িয়ে। নৌকোটি এইভাবে ধীর শান্তচ্ছন্দে ভেসে চলেছে জলের ওপর দিয়ে। এরূপ টেরাকোটা-ফলক লক্ষ্য করা গেছে অনেক মন্দিরে। উদাহরণস্বরূপ, হরিরামপুর, শ্রীধরপুর ও রাধাকান্তপুরের (দাসপুর) মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এখানে গণেশজননীর দুদিকে দুটি নৌকোতে ধনপতি ও তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি সদাগর ও তাদের লোকজনকে দেখা যায়। নদী বা সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় প্রস্ফুটিত বিশাল একটি পদ্মের ওপর দেবী চণ্ডী গণেশজননীরূপে গণেশকে কোলে নিয়ে আসীনা। পূর্বোক্ত সুরৎপুরের মন্দিরে এই দৃশ্য দেখা যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘাটাল অঞ্চলের আরও অনেক মন্দিরে এই দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

উপরি উল্লিখিত এই টেরাকোটা-নৌকোগুলোর সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য আছে পূর্ব গোবিন্দপুরের (জাঙ্গীপাড়া, হুগলি) চণ্ডীমন্দিরের (১৭২৭) নৌকোর এবং পূর্বোক্ত রাধাকান্তপুরের গণেশজননীর দুপাশের দুটি নৌকোর (আ. ১৮ শতকের গোড়া)। কিন্তু এগুলির পেছনের প্রান্তভাগ আগেরগুলির তুলনায় অনেকটা নিচু। দ্রুত চলার জন্যে এভাবে এমন নৌকো তৈরি হয়। বিশেষ করে, পূর্ব গোবিন্দপুরের নৌকোটির পেছনে যে প্রমোদকক্ষ আছে, সেখানে কোন বড়লোক জমিদারের মিথুনদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মাঝি প্রান্তভাগে আসীন। সামনে বন্দুকহাতে কয়েকজন প্রহরী। নৌকোটির কাঠামো বেশ মজবুত, নিচে জলের ওপর অবলীলাক্রমে ভেসে চলেছে। তবে এ ধরনের নৌকোর সঙ্গে বাংলার গ্রাম্য ডোঙার সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট করে ধরা পড়েছে। পূর্বোক্ত দুটির সঙ্গেও এই সাদৃশ্য চোখে পড়ে। গ্রামের ডোঙা বা ডিঙি খালবিলে যথেষ্ট সংখ্যায় এককালে চলাফেরা করত। খালবিলে মাছ ধরা বা ঘোরার জন্যে এসব ডিঙির ব্যবহার হত এককালে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এসব টেবাকোটা-ফলকে।

দ্বারহাট্টার রাজরাজেশ্বর মন্দিরে পূর্বোক্ত নৌকোর (যাকে 'পিনিস' আখ্যা দেওয়া যায়) সজ্জিত কামরায় সম্ভ্রান্ত বা জমিদার শ্রেণীর কোন ব্যক্তি তামাকু-সেবনরত। কামরার আগভাগে ও পেছনে সশস্ত্র রক্ষী এবং আরও তিনজন সশস্ত্র রক্ষী দণ্ডায়মান, তাদের পেছনে মাঝি দাঁড় হাতে দাঁড়িয়ে। নৌকোর তলে দুদিকে জলের ওপর ভাসমান দুটি জলজন্তু। ঝিখিরার (আমতা, হাওড়া) শ্যামসুন্দরের মন্দিবে (১৬৯১) নৌকায় প্রহরীবেষ্টিত একটি কামরায় উপবিষ্ট সম্ভবত কোন রাজা বা নবাব। নিচে জলের ওপর অনেকটা মুখতোলা অবস্থায় হাঙর মূর্তি- হাঙরমূর্তির দেহের যে অংশটি বেরিয়ে আছে, তাতে আঁশের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়।

মন্দির 'টেরাকোটা'য় আরও একশ্রেণীর নৌকো লক্ষ্য করা যায়। সেগুলিকে 'পরিবারিক

ভ্রমণতরী' বলা যায়। এর কাঠামোতে (hull) দেখা যায়, তলদেশ বেশ চ্যাপ্টা, চওড়া ও গোলাকৃতি। দুইপ্রান্ত (সামনে ও পেছনে) সমান উঁচু খাড়া। এতে থাকে একটি ভালো কাঠের তৈরি কামরা (কেবিন), কতকটা 'বাংলো'র মতো আরামদায়ক ও অন্যান্য সুবিধাযুক্ত। দাসপুরের চেঁচুয়া গোবিন্দনগরের রাধাগোবিন্দ (১৭৮১), সুরৎপুরের শীতলা (১৮৪৯) এবং দাসপুরের দধিবামনের (১৮৪৬, পরিত্যক্ত) মন্দিরে এই ধরনের নৌকো লক্ষ্য করা গেছে। নৌকোর ওপর একটি দণ্ডের ওপর পাল স্পষ্ট চিহ্নিত। বাংলোর মতো কামরার জানালা দরজা সেকালের রীতিতে 'ভিনিসীয়' রীতির (সুরৎপুর)। বাংলোর একাধিক কক্ষে নারী ও পুরুষ, বাংলোর বাইরে আরামকেদারায় বিলাসীবাবু - মাথায় পাগড়ি (সুরৎপুর ও দাসপুর)। চেঁচুয়া গোবিন্দনগরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে (১৭৮১) দেখা গেছে, বৃহৎ কাঠামোটাতে কড়ির দাগ। পেছনের প্রান্তভাগ (স্টার্ন) সামনের প্রান্ত (বাউ) থেকে অনেকটা উঁচু, ডেক বা পাটাতনের ওপর দু কামরার বাংলোর মধ্যে বাতায়নবর্তী দুই ব্যক্তি, একটি মাস্তুল ও একটি বড় হাল (দাঁড়), নৌকোর তলদেশে জল। জলের ওপর ভেসে থাকা এক দানবাকৃতি মনুষ্য - সম্ভবত তার হাতে মোটা একটা দড়া বা নোঙ্গর। বাংলোর বাইরে ডেকের ওপর আরামকেদারায় এক সাহেব, আরও কয়েকজন সাহেবকে দেখা যাচ্ছে, এক সাহেব সম্ভবত হাতে দূরবীন নিয়ে দূরে কিছু দেখছে। আবার ঘুড়িষার (ইলামবাজার, বীরভূম) লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরে(১৭৩৮) দেখা গেছে, নৌকোর আকার ছোট, তলভাগ গোলাকার। কিন্তু লম্বায় ছোট হলেও চওড়ায় বেশি, অগ্রপ্রান্তে একটি প্রাণীর মস্তক। পেছনের প্রান্তদেশে সুন্দরভাবে বাঁকানো। নৌকোর দাঁড়টা সমকোণ ত্রিভুজাকৃতি।

সেকালে প্রমোদভ্রমণের নৌকো ছিল সুসজ্জিত। অবস্থাপন্ন লোকেরাই তা ব্যবহার করত। মন্দির 'টেরাকোটা'-ফলকে পূর্বোল্লিখিত 'ড্রাগন'মস্তক শোভিত নৌকো বহু মন্দিরে পাওয়া যায়। ড্রাগনমুখ নৌকোর অগ্রভাগে বসানো থাকে। এগুলোর কোন কোনটি ছিল অর্ধচন্দ্রাকৃতি, যেমন পুরুষোত্তমপুরের (দাসপুর) ব্রজরাজকিশোর মন্দির(১৭৭২)। অপরপক্ষে, বাঁশবেড়িয়ার (হুগলি) অনন্তবাসুদেব মন্দিরের (১৬৭৯) ড্রাগনমুখ নৌকোর তলদেশ দীর্ঘ ও সোজা। বক্রাকার বা গোলাকাব নয়, শুধুমাত্র লেজের প্রান্তভাগটা একটু বেঁকে ওপরে উঠে গেছে। দুই মাঝি দুদিকে বিশাল দাঁড় হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান। নিচের ডেকে ছজন মাল্লা দাঁড় হাতে নিয়ে নৌকো টেনে নিয়ে চলেছে। ওপরের ডেকে সশস্ত্র সেনা বর্তমান।

দেশীয় নৌকোগুলোর মুখ প্রায়ই কোন পাখি বা কোন জন্তু— যেমন, ময়ূর, হাতি, কুমির প্রভৃতির মুখের আদলে তৈরি করা হত। যেমন উত্তর গোবিন্দনগরের ভুবনেশ্বর (১৮৫০, ময়ূরমুখ), শ্রীধরপুরের (দাসপুর) রঘুনাথ, দাসপুরের দধিবামনের মন্দির (১৮৪৬) প্রভৃতি। অবশ্য, ড্রাগনমুখ নৌকো ভারতে প্রচলিত ছিল না। আর. কে. মুখার্জির 'ইণ্ডিয়ান শিপিং' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সাঁচির ১নং স্তূপের (খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) ভাস্কর্যের মধ্যে একটি বজরার মুখে ডানাওয়ালা ঈগলের মুখ ও সিংহসদৃশ দেহের প্রতিকৃতি বসানো আছে। পেছনের প্রান্তভাগ মাছের লেজের মতো। নৌকোর সামনে এই ড্রাগনমাথার প্রচলন বার্মা, থাইল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার অনেক রণতরী বা বজরায় লক্ষ্য করা যায়। তাই এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, লোকশিল্পীরা এই বিষয়টি তাদের মাথায় রেখেছিল। দেশীয় নৌকোগুলোর অগ্রপ্রান্তে এই প্রতিকৃতি মাথাগুলো তারা বসিয়ে দিত বা ঐভাবে মাথাগুলো তৈরি করত, যেন নৌকোটা একটা জীবন্ত প্রাণী এটা বোঝাবার জন্যে।

খ্রিস্টীয় সতের শতকের মাঝামাঝি বা শেষ থেকে বঙ্গোপসাগরের পূর্বভাগে এ ধরনের

মিশ্ররীতির নৌকোগুলো বেশি করে দেখা যেতে থাকে, কেননা, বাংলার এই অঞ্চলের নদনদীগুলো ছিল দেশী-বিদেশী সংস্কৃতির পারস্পরিক মিলন-মিশ্রণস্থল। তার থেকে এ ধরনের নৌশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভবপর। এই বিচিত্রশিল্পের নৌযান আরাকান ও হার্মাদ দস্যুরা ব্যবহার করত। কারণ, বাংলার এই ব-দ্বীপ অঞ্চলে তাদের উপদ্রব বেশি করে দেখা দিয়েছিল। সুন্দরবন ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে নদীর গোলকধাঁধায় তারা নদীপথে দস্যুবৃত্তি করে সহজেই পালিয়ে যেতে পারত। মন্দিরশিল্পীরা এই শিল্পটিকে তাদের কাজের মধ্যে সার্থক করে তুলেছিল। তারই অজস্র নমুনা মন্দির টেরাকোটা-ফলকে লক্ষ্য করা গেছে।

উল্লিখিত নৌযানগুলি সবই বাংলার নিজস্ব। এগুলোর সঙ্গে য়ুরোপীয় নাবিকদের খ্রি. সতের-আঠার শতকে আঁকা নৌকোগুলোর বেশ মিল আছে। মন্দির-টেরাকোটায় তারই বাস্তবরূপ পাওয়া যায়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জি. এ. প্রিনসেপ টেরাকোটায় যে পঁচিশটি নৌকোর রেখাচিত্র আঁকেন, তাতেও আমরা এগুলোর রূপটিকে পাই। সেগুলো খুবই সুন্দর। যেমন, ছোট ঢাকা ফুলওয়ার, উলাক, বুদ্রা খুলিয়া, পিনিস, ময়ূরপঙ্খী, সোনামুখী, ভাউলা প্রভৃতি কত নাম!

পুরানো বাংলায় এমন কত নৌকো যে নদীনালাখাল দিয়ে চলাফেরা করত, তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। ধনপতি ও চাঁদসদাগরেরা এসব নৌকোর কোন কোনটি নিয়ে দূরপাল্লায় নদী সাগরে বাণিজ্যযাত্রা করত। বজরা নিয়ে দেবী চৌধুরানির দুঃসাহসিক অভিযান বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করে গেছেন। তবে মন্দির-টেরাকোটায় আমরা সেগুলোব প্রতিচ্ছবি আজও চোখের সামনে দেখতে পাই।

৬

দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি মন্দির

দক্ষিণবঙ্গের অনেক মন্দিরের কথা আগে বলা হলেও হুগলি নদীর উভয়তীরবর্তী বা আশপাশে এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উল্লেখযোগ্য কিছু মন্দির নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। এগুলির মধ্যে প্রায় অজ্ঞাত কোন কোন মন্দিরও আছে, যেগুলির স্থাপত্যকৌশল লক্ষণীয়ভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

মন্দিরগুলি প্রায় সবই প্রথাগত শৈলীর। তবে বেশিরভাগই 'আটচালা' রীতির এবং কমবেশি 'রত্ন'শৈলীর। 'দোচালা', 'চারচালা' ও 'দেউল' মন্দির এই অঞ্চলে তেমন দেখা যায় না। গঙ্গার দুই তীরে একসময় (খ্রি. ১৮-১৯ শতকে) বেশ কয়েকটি ঠাকুরবাড়ি ('টেম্পল-কমপ্লেক্স') গড়ে উঠেছিল, সুবিখ্যাত দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ি তার মধ্যে অন্যতম। গঙ্গার উভয়তীরবর্তী ও তার আশপাশে অবস্থিত এই মন্দিরগুলি মূলত হুগলি, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পড়ে। সরেজমিন অনুসন্ধানে এই মন্দিরগুলি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারা গেছে।

দ্বারহাট্টা (জাঙ্গীপাড়া, হুগলি)

১. এখানে সিংহরায় পরিবারের ইঁটের তৈবি রাজরাজেশ্বরের বিশাল 'আটচালা'টি উল্লেখযোগ্য। মন্দির পূর্বমুখী। উল্লেখযোগ্য হল, মন্দিরের লিপি ও টেরাকোটা অলংকরণ। ইঁটের ফলকে খোদিত দুইসারির লিপি ঃ

শুভমস্তু সকাব্দা ১৬৫০
সন ১১৩৫ সাল

১৬৫০ শকাব্দ = ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ
১১৩৫ সাল বা বঙ্গাব্দ =১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ প্রতিষ্ঠাকাল।

মন্দিরে রাজরাজেশ্বর শালগ্রামশিলা অধিষ্ঠিত।

মন্দিরটির সামনের দিকে 'টেরাকোটা' অলংকরণের প্রাচুর্য বিস্ময়কর। কারুকার্যও উচ্চমানের। খ্রিস্টীয় আঠার শতকের গোড়ার দিকে তৈরি উৎকৃষ্ট অলংকবণযুক্ত এই মন্দির একটি অপরূপ দেবালয়। মন্দিরটির ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরে সামনের দেওয়ালে, থামের গায়ে, কার্নিশের নিচে ছোট্ট ছোট্ট কুলুঙ্গিতে বহু টেরাকোটা মূর্তিফলক, নকশা সন্নিবেশিত।

টেরাকোটা প্যানেলগুলোর মধ্যে আছে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য, কৃষ্ণলীলা, কালীয়দমন, নৌকোবিলাস, কদম্ববৃক্ষতলে কৃষ্ণ ও গোপী। ভিত্তিবেদিসংলগ্ন প্যানেলে সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা-ফলকের মধ্যে আছে শিকারদৃশ্য, অশ্বারোহী, সুন্দর সুন্দর ফুলের নকশা, হংসপংক্তি। কালীয়দমন ও নৌকোবিলাসের ঠিক নিচের প্যানেলে আছে নবাব বা কোন রাজা জমিদারের নৌকোযাত্রা — সামনে পেছনে অস্ত্রধারী সেনা ও প্রহরী। নৌকোয় একটি ছাউনিতে নবাবী পাগড়ির মতো পাগড়ি পরিহিত নবাব বা কোন রাজা জমিদার। এখানে সম্ভবত নবাবের নৌকোর সামনে-পেছনে কয়েকজন

প্রহরী বা সৈন্য থাকলেও পেছনে অপর একটি ছোট্ট নৌকোয় ঢাল-তরোয়ালধারী মুসলমান সৈন্য। নবাবের বড় নৌকোর নিচে জলে বৃহদাকার জলজন্তু ওপরে মুখ তুলে আছে দেখা যায়। কেন্দ্রীয় খিলান-প্রবেশপথের ওপরে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যের অজস্র টেরাকোটা ফলক লক্ষ্য করা যায়, এর সঙ্গে পোড়ামাটির কয়েকটি ফুলও দর্শনীয়। লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্যে এত ফলক অন্য কোন মন্দিরে বিরল। আর একটিমাত্র মন্দিরে আমরা লক্ষ্য করেছি, সেটি পশ্চিম মেদিনীপুরের চাঁইপাটের (দাসপুর) রাধাগোবিন্দের 'আটচালা'(১৭৫৯ খ্রি.)। আঁটপুরের রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' মন্দিরের (১৭৮৬ খ্রি.) অনেক আগে এই রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি তৈরি হলেও উৎকৃষ্টমানের অলংকরণ ও দৃশ্যবৈচিত্র্যের জন্য এটি আঁটপুরের থেকেও সুদৃশ্য একটি দেবালয়।

মন্দিরের সামনের তিনটি 'ইমারতি' থাম মন্দিরের স্থাপত্যগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

২. রাজরাজেশ্বর মন্দিরের কিছু দূরে দ্বারিকাচণ্ডীর ইঁটের ভগ্ন ও প্রায়-বিধ্বস্ত দেবালয়টি আরও প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়। ইঁটের গঠন, পোড়ামাটির ছোট্ট ছোট্ট টালিতে মূর্তি ও নকশা লক্ষ্য করে এটি খ্রিস্টীয় সতের শতকের বলে মনে করা যেতে পারে। মন্দিরের গায়ে ছোট ছোট অলংকৃত টালির ব্যবহার খ্রিস্টীয় সতের শতকের অনেক মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে, মন্দিরটি একেবারে ভেঙে গেছে। শুধুমাত্র সামনের দুপাশের দেওয়ালের কিছু অংশ খাড়া আছে। দেওয়ালে পোড়ামাটির ফুলগুলি রাজরাজেশ্বর মন্দিরের চেয়ে একটু অন্য ধরনের। চারপাশের বৃহৎ বৃত্তটির ভেতরে রয়েছে প্রস্ফুটিত একটি পুষ্প। এতে পুরানো রূপটি প্রকটিত। বৃক্ষসমাকীর্ণ এই মন্দিরটির ওপরের অংশ বহুকাল বিধ্বস্ত। গঠনবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে এটিও 'আটচালা' রীতির ছিল বলে অনুমান করা যায়। প্রচুর টেরাকোটা-ফলকও ছিল।

এই ভগ্ন মন্দিরের কাছেই আর একটি প্রাচীন ছোট 'আটচালা' মন্দির বর্তমান। মন্দিরটি শিবের। এটির একমাত্র প্রবেশপথের ওপরে অতি অস্পষ্ট লিপিটির অনেক কষ্টে পাঠোদ্ধার করা গেছে। ইঁটের একটি ছোট্ট টালিতে অস্পষ্ট লিপিটির পাঠ এখানে দেওয়া গেল ঃ

শ্রীরাম সকা
বদা ১০৯৮

এখানে 'শকাব্দে'র উল্লেখ থাকলেও শকাঙ্ক দেওয়া নেই। ১০৯৮ অঙ্কটি শকাব্দ হতে পারে না। এটি বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দ। অতএব মন্দিরটি খ্রিস্টীয় সতের শতকের শেষে তৈরি হয়. বৃক্ষসমাকীর্ণ এই মন্দিরটির নিচের কিছু অংশ ক্ষয়ে গেছে। একমাত্র প্রবেশপথের ওপর বা অন্য কোথাও কোন টেরাকোটা নেই।

দ্বারহাট্টা হুগলি জেলার একটি প্রাচীন স্থান। কোন কোন মূর্তি ও অন্যান্য পুরাবস্তু এখান থেকে পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।

মূলাজোড় (শ্যামনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা)

গঙ্গার (হুগলি নদী) পূর্ব তীরবর্তী শ্যামনগর স্টেশনের পশ্চিমে অবস্থিত মূলাজোড় সেকালে খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। শ্যামনগরে খ্রিস্টীয় আঠার শতকের মাঝামাঝি মধ্যযুগের সুবিখ্যাত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের বাড়ি ছিল। মূলাজোড় ছিল একসময় সংস্কৃত শিক্ষার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। এখানে সংস্কৃত কলেজের বিশাল সৌধটি খুবই দর্শনীয় ছিল (সম্প্রতি, ২০০৩-এ সেটি ভেঙে ফেলে নতুন সৌধ নির্মিত হয়েছে)।

মূলাজোড়ের ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ি খুবই প্রসিদ্ধ। পৌষমাসে এখানে বড় মেলা ও উৎসব হয়। কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের গোপীমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এই ঠাকুরবাড়ি ও ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির।

১. ব্রহ্মময়ী কালীমন্দিরটি 'নবরত্ন' শৈলীর, গঙ্গার দিকে পশ্চিমমুখী। ইঁটের তৈরি এই মন্দিরটির সঙ্গে হুগলি জেলার মহানাদের ব্রহ্মময়ী মন্দিরের অনেকটা মিল আছে। বিশাল এই মন্দিরটির নিচের ও ওপরের দালানের কার্নিশ সোজা, বাঁকানো নয়। নিচের ও ওপরের দালানের ছাদের চারকোণে চারটি করে খাঁজকাটা 'রত্ন'। ওপরের কেন্দ্রীয় 'রত্ন'টি স্বাভাবিকভাবেই একটু বড়। নিচের দালানের সামনে (পশ্চিমদিক) ত্রিখিলান প্রবেশপথ। 'কলাগেছ্যা' থাম। ওপরের 'দালানে'ও অনুরূপ প্রবেশপথ লক্ষ্য করা যায়। ত্রিখিলান প্রবেশপথযুক্ত ঢাকা বারান্দা অতিক্রম করে 'গর্ভগৃহ'। গর্ভগৃহে দক্ষিণাকালী মূর্তি অধিষ্ঠিত। প্রায় দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মতো। মহাকালের বুকে প্রথমে ডান পা ও পেছনে বাম পা। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বহু আগে এই মন্দির নির্মিত হলেও ব্রহ্মময়ীর মূর্তির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

পূর্বোক্ত ঢাকা বারান্দার দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে পাথর বা পঙ্কচুনে খোদিত গোপীমোহন রচিত একটি ভক্তিগীতি খোদিত। সেটি এখানে যেমন যেমন সারি আছে, সেইভাবে উদ্ধার করা হল ঃ

রাগিনী গৌড় সারঙ্গ

শিবে শবাসনা লোলরসনা
ভীষণা দিগ্বসনা বিকটদশনা
লজ্জারূপা নাহি লজ্জা
মেয়ে হয়ে রণসজ্জা
রুধিরে মগনা।।
সভয়া অভয়া বরে
সতী নিজ পতি পরে
একি বিবেচনা
কহিছে গোপীমোহনে
ঐরূপ জাগে মনে
কালী ত্রিনয়না।।
সন ১২১৯

ওপরের সন থেকে জানা যাচ্ছে, ১২১৯ বঙ্গাব্দ বা ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে এই গানটি দেওয়ালে খোদাই করা হয়।

অবশ্য, প্রতিষ্ঠাকালীন দুটি দীর্ঘ লিপি (সংস্কৃত ভাষায় রচিত) মন্দিরসম্মুখবর্তী সিঁড়ির দু-পাশের দেওয়ালে স্লেটপাথরে খোদিত। লিপিদুটি এখানে উদ্ধার করা হ'ল ঃ

১. (গঙ্গার দিক থেকে দর্শকের বামদিক)
শাকে সত্যশিবাব্ধিশৈলশশিনো মোক্ষার্থিনা শ্রীমতা
গোপীমোহনশর্ম্মণা ত্রিপথগাতীরে স্বরাজ্যাস্পদে

প্রাসাদে নবচুড়ক্যেত্র বিধিবৎশ্রীকালিকা স্থাপিতা
নাম্না ব্রহ্মময়ী মঠস্থপুরজিল্লিঙ্গৈর্দ্বিষট্‌কৈঃ সমং

এর অর্থ হল, সত্য = ১, শিবাক্ষি = ৩, শৈল = ৭, শশী = ১ শাকে অর্থাৎ ১৭৩১ শকাব্দ ('অঙ্কস্য বামা গতিঃ', এই নিয়ম অনুসারে অঙ্কগুলির বামদিকে গতি) অর্থাৎ ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে গোপীমোহন শর্মা গঙ্গাতীরে নিজ রাজ্যে এখানে নবচূড় প্রাসাদ বিধিপূর্বক নির্মাণ করে ব্রহ্মময়ী নামে কালীকে স্থাপন করলেন। এই মন্দিরের সঙ্গে দুদিকে ছয়টি করে ত্রিপুরাসুর জয়ী শিবলিঙ্গও মোট বারটি মন্দিরে স্থাপিত হল।

২. ডানদিকে অপর সংস্কৃত লিপিটি হল ঃ (যথাযথ সারি অনুসারে)

শাকে রন্ধ্র বিভাবসুক্ষিতিধরক্ষামে সুপুণ্যোদয়া
গোপীমোহনশর্ম্মণাত্মসদনে যস্য প্রতিষ্ঠা কৃতা
স্যোয়ং তত্তনয়ৈর্বিভাগপরতস্তৎকীর্ত্তিসম্বর্দ্ধকৈ
গোপীকান্ত ইহান্ত কস্য দিশি ভূভাগে শ্রিয়া স্থাপিত

এই লিপি দুটি সংস্কৃত শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত।

এই লিপি থেকে ১৭৩০ শকাব্দ বা ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ জানা যায়।

এই লিপিদুটির কিছু ওপরে সিঁড়ির দুধারে দুটি প্রাচীন চতুর্ভুজ বিষ্ণুনারায়ণ মূর্তি (প্রতিটির প্রায় ২ ফুট উচ্চতা)। ডানদিকেরটি খুবই কারুকার্যমণ্ডিত, বামদিকেরটি অপেক্ষাকৃত সাদামাটা। মূর্তিদুটি সেন-আমলের বলে অনুমান করা যায় (খ্রি. ১১শ-১২ শতক)। তবে বামদিকেরটি আরও প্রাচীন মনে হয়। ব্রহ্মময়ী মন্দিরের মূল গর্ভগৃহের ভেতরের ছাদের গঠন ঃ দুটি বৃহদাকার খিলানের ওপর ভল্টে গঠিত। ভল্টের নিচের চারকোণে ছোট্ট লহরা। গর্ভগৃহ প্রশস্ত— সামনে, উত্তরে ও দক্ষিণে দরজা। পেছনের দেওয়ালের দুপাশে দুটি দরজা। দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি আছে। লিপি অনুসারে মন্দিরটি প্রকৃতই প্রাসাদের মতো করে তৈরি করা হয়।

ব্রহ্মময়ীর মূল মন্দিরের সামনে একটি প্রশস্ত নাটমন্দির (সম্প্রতি ২০০৩ এটির সংস্কার করা হয়েছে)। মূলমন্দিরসংলগ্ন পুবদিকের দুপাশে ছয়টি করে বারটি শিবমন্দির। উত্তরপাশের শিবমন্দিরগুলির প্রথমটি 'পঞ্চরত্ন'। এই মন্দিরটির গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ সকলের চেয়ে বড়। এর পাশে পর পর পাঁচটি 'আটচালা' রীতির মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণদিকে অনুরূপ পাঁচটি 'আটচালা'র পর সর্বশেষটি 'পঞ্চরত্ন'। কিন্তু এই সারিতে মাঝখানের মন্দিরটিতে বৃহদাকার শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। 'আটচালা' ও 'পঞ্চরত্ন' দুটি সবই একদ্বারবিশিষ্ট। 'আটচালা'গুলির চাল বেশ ঢালু ও কার্নিশ বাঁকানো ও সুদৃশ্য।

ঠাকুরবাড়ির চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত। উত্তরদিকের একটি বহির্গমনপথ এবং প্রশস্ত অঙ্গন। এখানেই মূলাজোড়ের বিখ্যাত সংস্কৃত কলেজটি ছিল। এখন 'রবীন্দ্রভবনে' পরিণত। এখানে আবার একটি উত্তরদিকে দরজা দিয়ে গঙ্গার একটি প্রাচীন ঘাট।

ঠাকুরবাড়ি অঙ্গনের পুবদিকের একটি দরজা দিয়ে রাধাকৃষ্ণের 'দালান' মন্দিরে যাওয়া যায়। গর্ভগৃহে রাধাকৃষ্ণের সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দির অঙ্গনে পশ্চিমে গঙ্গার পাশে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মন্দির আছে।

মন্দিরচত্বরের বাইরে বাজার এলাকায় শিবের একটি বড় 'পঞ্চরত্ন' লক্ষ্য করা যায়।

মন্দিরের কার্নিশ সোজা। ছাদের 'রত্ন'গুলির শিখর খাঁজকাটা। 'রত্ন'গুলি খর্বাকৃতি। বাইরের দেওয়ালের পলেস্তারা প্রায় উঠে গেছে এবং মন্দিরটি বেশ জীর্ণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল, এই মন্দিরে একটি বেশ বড় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। অনেকটা কলকাতার ভূকৈলাসের শিবলিঙ্গের অনুরূপ। শিবলিঙ্গের নাম হরনাথ (সম্ভবত গোপীমোহনের পুত্র হরনাথ ঠাকুরের নামে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'পঞ্চরত্নে'র দুপাশে দুটি বিশেষ ধরনের 'একরত্ন' বর্তমান। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত।

এই মন্দিরচত্বর পেরিয়ে পাকা রাস্তায় এসে গঙ্গার একটি প্রাচীন ঘাটে আসা যায় (এখন 'ফেরিঘাট') এরই ঠিক দক্ষিণপাশে ঠাকুরপরিবারের বিশাল অট্টালিকা ছিল। আশপাশে আরও দুএকটি পুরানো বাড়ি ছিল। বর্তমানে লুপ্ত ও বিধ্বস্ত।

তালপুকুর ঃ

গঙ্গার পূর্ব তীরবর্তী তালপুকুরের আগের নাম ছিল 'চানক'। স্থানটি ব্যারাকপুর লাটবাগানের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী।

তালপুকুরের অন্নপূর্ণার 'নবরত্ন' মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রানি রাসমণির এক কন্যা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অন্নপূর্ণার এই মন্দিরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধেশ্বরী বা ভবতারিণী 'নবরত্ন' মন্দিরের সাদৃশ্য খুবই বেশি। উভয় মন্দিরই একই পরিকল্পনায় তৈরি হয়।

ইঁটের এই উচ্চ মন্দিরটি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মতো দক্ষিণমুখী। সামনে প্রশস্ত নাটমন্দির। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী ও তালপুকুরের অন্নপূর্ণার নাটমন্দির প্রায় একই ধরনের। অন্নপূর্ণার এই নাটমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণদিকে পাঁচটি করে খিলানপ্রবেশপথ এবং পূর্ব ও পশ্চিমের খিলান-প্রবেশপথ সাতটি করে। খুবই চাকচিক্যময় এই নাটমন্দির। সেকালের উঁচু গোল থাম নাটমন্দিরের চারদিকে সংন্যস্ত।

অন্নপূর্ণার 'নবরত্ন'টি একটি উচ্চ বেদির ওপর অবস্থিত। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে পাঁচটি করে 'খিলান' প্রবেশপথ। স্তম্ভগুচ্ছ খুবই সুন্দর। আঞ্চলিক পরিভাষায় একে 'কলাগেছ্যা' থাম বলা হয়। খিলান-প্রবেশপথে কলাপাতাসহ কলাগাছের কাণ্ড খুব সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। এ ধরনের থাম পশ্চিমবাংলার আরও বহু মন্দিরে লক্ষ্য করা গেছে। দ্বিতলেও এই মন্দিরের তিনটি করে খিলান-প্রবেশপথ একই স্তম্ভগুচ্ছের শ্রেণী। প্রতিদিকে দুটি করে বাঁকানো কার্নিশ ছাদের কার্নিশযুক্ত চালার ন্যায় বক্র এবং তার ঠিক ওপর দ্বিতল ও ত্রিতলে রেলিং দেওয়া অনুচ্চ দেওয়াল। মাঝের অংশ ফাঁকা। ওপর ও নিচের মাঝখানের অংশে যেসব ছোট ছোট কুলুঙ্গি আছে, সেগুলো খালি। কোন মূর্তি বা নকশা নেই। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেও ওই একই পরিকল্পনা। পূর্বোক্ত মূলাজোড়ের ব্রহ্মময়ী ও এখানে এবং দক্ষিণেশ্বরে 'প্রাসাদে'র রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। মহানাদের (হুগলি) ব্রহ্মময়ী মন্দিরেও (১৮৩০ খ্রি.) এই রূপটি পাই।

অন্নপূর্ণার এই মন্দিরের দ্বিতল ও ত্রিতলে যে নয়টি 'রত্ন' আছে, সেগুলি খাঁজকাটা দেউলাকৃতি। প্রতিটির শীর্ষে চক্র স্থাপিত। এই মন্দিরেও দক্ষিণেশ্বরের মতো কোথাও কোন অলংকরণ নেই শুধু 'স্টাকো'র কয়েকটি ফুল ছাড়া। মন্দিরে প্রতিষ্ঠাকালজ্ঞাপক কোন লিপি নেই। তবে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের (১৮৫৫ খ্রি.) বেশ কয়েক বছর পরে নির্মাণ করা হয় বলে অনুমান। এই

মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের ওঠার সিঁড়িগুলিও দর্শনীয়। অন্নপূর্ণার এই মন্দিরের দক্ষিণদিকের ঢাকা বারান্দা কিছুটা অপ্রশস্ত, দক্ষিণেশ্বরের মতো চওড়া নয়। এর ভেতরের ছাদ খিলানে গঠিত। গর্ভগৃহে আসীনা দেবী অন্নপূর্ণা পাশে দাঁড়ানো মহাদেবকে অন্নদানে রতা মাতৃমূর্তি। প্রতিবছর অন্নপূর্ণা পূজায় এখানে ধুমধাম করে পুজো হয়।

মন্দিরের চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত। পূর্বদিক থেকে প্রধান প্রবেশপথ। প্রাচীরসংলগ্ন চারপাশে ছোট ছোট ঘর। পশ্চিমে ছয়টি করে বারটি 'আটচালা'-রীতির শিবমন্দির। প্রতিটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। 'আটচালা'গুলির ঢালু চাল ও বাঁকানো কার্নিশ দর্শনীয়।

খড়দহ ঃ

১. *গোস্বামীপাড়া ঃ* এখানে শ্যামসুন্দরের 'আটচালা'-রীতির মন্দির একটি প্রসিদ্ধ দেবালয়। ইঁটের তৈরি এই মন্দিরটি বিশাল আয়তনের এবং পূর্বমুখী। প্রভু নিত্যানন্দ ও তাঁর পুত্র বীরভদ্রের স্মৃতিবিজড়িত খড়দহের 'গোস্বামীপাড়া'। রাধাশ্যামসুন্দরজীউর বিগ্রহ প্রভু নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত বলে জানা যায়।

মন্দির একটি উচ্চ বেদিতে অধিষ্ঠিত। সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথ ও ঢাকা বারান্দা। নিচে প্রশস্ত নাটমন্দির। চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত। উত্তরদিক দিয়ে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করতে হয়।

এই মন্দিরটি ঠিক কোন্ সময়ের জানা যায় না। তবে পার্শ্ববর্তী কতকটা এই ধরনের এক 'আটচালা' মন্দির রাধামদনমোহন জীউর। ওই মন্দিরটি বাংলা ১২৯১ সাল বা ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।

রাধাশ্যামসুন্দরজীউর মন্দির আরও পুরানো অনুমান করা যায়। গঠনশৈলীদৃষ্টে খ্রিস্টীয় আঠার শতকের শেষ বা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল, অনুমান করা যায়।

এই মন্দির যে অন্তত একবার সংস্কার করা হয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, উত্তরদিকে প্রধান তোরণদ্বারের গায়ে একটি ইংরাজি লিপি থেকে। কিন্তু সেখানে কোন তারিখ দেওয়া নেই। লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হল ঃ

This temple
of
Sree Sree RadhaShyam Sundar Jiu
is renovated by
P.C. Robertson Esq.
Manager
Khardah Jute Mills

পাশে নহবৎখানার দেওয়ালে মারবেল ফলকে অপর একটি লিপি ঃ

শ্রী অমৃতলাল গোস্বামী

শিষ্য
শ্রীমতি অম্বিকামনী দাসী
সাং টালার পাঠশালা
সন ১৩০৭ ইং ১৯০০ সাল

পার্শ্ববর্তী 'মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি'রও চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত। মদনমোহনের 'আটচালা'টিও বিশালাকৃতি। প্রবেশপথের ওপরে মারবেল পাথরে খোদিত লিপিটি উদ্ধার করা হল ঃ

শ্রীশ্রীরাধার মদনমোহন ঠাকুর জীউর
এই বাটী, খড়দহ
সন ১২৯১ সাল
তারিখ ১৯।২৯ (?) ফাল্গুন

লিপি অনুসারে, এই ঠাকুরবাড়ি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. রাধাশ্যামসুন্দরজীউ ঠাকুরবাড়ির কিছু উত্তরে শ্রী শ্রী নিত্যানন্দপ্রভু যেখানে বাস করতেন, সেখানে একটি সাদামাটা 'দালান'মন্দির বর্তমান। প্রবেশপথের ভেতরে একটি লিপি ঃ

শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর বাসস্থান
শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর
পুত্র ও কন্যা
*বীরভদ্র গোস্বামী
*গঙ্গামণি দেবীর
জন্মস্থান

বাইরে গেটের দেওয়ালে মারবেল পাথরে একটি ইংরাজি লিপি ঃ

This old Temple of
Sree Sree Shyamsundar Jiu
Is thoroughly repaired through Generousity of
Messrs. Khardaha Co. Ltd.
By
A. Wright Esq.
J. Scott Esq.
1st Jannuary, 1942

এই স্থানেই শ্যামসুন্দরজীউর পুরানো মন্দির ছিল। বর্তমান একটি সাধারণ 'দালান' মন্দিরেই বিগ্রহগণ পূজিত হতেন।

খড়দহ-গোস্বামীপাড়ার কিছুটা উত্তরে একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি মহাপ্রভুর এক বিশাল 'নবরত্ন' মন্দির। প্রথমে নিচে একটি প্রশস্ত সমতল কার্নিশযুক্ত 'দালান', তার ওপর একটি প্রশস্ত দালান। এর ছাদের চারকোণে 'রথ'-বিন্যাসযুক্ত অনেকটা 'চালা'রীতির দেউল— এই দালানের ছাদের ওপর আর একটি ছোট্ট দালান। এর ছাদে নিচেরগুলির মতো একই ধরনের পাঁচটি 'রত্ন'। এটি একটি বিশিষ্ট স্থাপত্য নিদর্শন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে হনুমানজীউর

'নবরত্ন' কতকটা এই রীতিতে তৈরি। মন্দির-দেওয়ালে কোনরকম অলংকরণ নেই। চারপাশে প্রাচীরবেষ্টিত। পশ্চিমদিক থেকে প্রবেশদ্বারের লেখা থেকে জানা যায়, 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট' মন্দিরটির সংস্কার করেন ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে, মন্দিরের দেওয়াল সিমেন্টের পলেস্তারায় ঢাকা। সম্ভবত ওই সময়েই পলেস্তারা দেওয়া হয়।

৩. ***বিশ্বাসপাড়া, বাবুঘাট ঃ*** খড়দহের বিশ্বাসপাড়ায় ছাব্বিশটি 'আটচালা' রীতির শিবমন্দির একেবারে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। প্রথমে কুড়িটি মন্দিরের একটি বৃত্ত নিয়ে 'টেম্পল-কমপ্লেক্স'। উত্তরদিকের প্রবেশদ্বারে মারবেল পাথরে লেখা আছে ঃ

ঁরামহরি বিশ্বাস
জাতস্য পুত্র
ঁপ্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস
শিবালয়

লিপি থেকে জানা যাচ্ছে, রামহরি বিশ্বাসের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এই শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু লিপিতে প্রতিষ্ঠাকাল নেই।

এই শিবালয়ের সব মন্দিরই 'আটচালা'-শৈলীর। কয়েকটি এর মধ্যেই ভগ্ন জীর্ণ ও বৃক্ষসঙ্কুল। ঠাকুরবাড়িটি অনাদৃত ও অবহেলিত। মন্দিরগুলির সন্নিবেশ এইরূপ ঃ প্রধান ফটকের দুপাশে বামে তিনটি ও ডানদিকে দুটি (এটি উত্তরদিকে)। পূর্বদিকে পাঁচটি, দক্ষিণদিকে চারটি এবং পশ্চিমে গঙ্গার দিকে ছয়টি। এই পশ্চিমদিকের নৈর্ঋত কোণের (দক্ষিণ-পশ্চিম) মন্দিরে শিবলিঙ্গ পূজিত হন। মন্দিরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উত্তর-পশ্চিম কোণের মন্দিরও পরিষ্কার ও শিবলিঙ্গ বর্তমান। অন্যান্য মন্দিরে শিবলিঙ্গ থাকলেও সেগুলি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন এবং সেখানে পুজোপাঠও হয় না ।

অপর ছয়টি 'আটচালা' শিবালয় এই পশ্চিমদিকের মন্দিরগুলির উত্তরে সমরেখায় গঙ্গাতীরে পর পর অবস্থিত। এটিও প্রাচীরবেষ্টিত। ছয়টি শিবালয়ের মাঝখানে স্নানঘাট, ওপরে ছাদবিহীন 'চাঁদনি', শুধুমাত্র দেওয়াল আছে। ঘাটের ইঁট খুবই পাতলা ও পুরানো। গঠনদৃষ্টে এই ঘাট প্রায় দুশ বছরের পুরানো মনে হয়। পশ্চিমদিকের এই বারটি মন্দির বৃহৎ ও সুদৃশ্য।

'আটচালা' মন্দিরগুলির কোথাও কোন লিপি ও অলংকরণ নেই। তবে চালাগুলির স্থাপত্য দর্শনীয়। এই ঠাকুরবাড়ি 'ছাব্বিশ শিবমন্দির' নামে পরিচিত।

দক্ষিণেশ্বর ঃ

তালপুকুর অন্নপূর্ণা মন্দিরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের যে অদ্ভুত মিল আছে, তা আগেই বলা হয়েছে। সম্ভবত দুটি মন্দিরই একই মন্দির-সূত্রধরদের দ্বারা নির্মিত। কারণ, মূলমন্দির, নাটমন্দির ও দ্বাদশ শিবালয়ের মধ্যে এত মিল আছে, যা খুব কম মন্দিরেই পাওয়া যায়। অবশ্য, এই দুটি মন্দির রানি রাসমণি ও তাঁর কন্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায় সমসাময়িক।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি দীর্ঘকাল ধরে শুধুমাত্র একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান নয়, স্থাপত্যের নিরিখে এটি পশ্চিমবাংলার একটি প্রতিনিধিস্থানীয় মন্দিররূপে পরিগণিত। 'প্রাসাদ'সাদৃশ্য ও ঐশ্বর্যময় যেসব মন্দির দক্ষিণবঙ্গে আছে, তার মধ্যে এটি অন্যতম। টেরাকোটা-অলংকরণ ছাড়া শুধুমাত্র

স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যের জন্য কোন মন্দির যে কত আকর্ষণীয় হতে পারে, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির তার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনাস্থলরূপে এই ঠাকুরবাড়ি পৃথিবী বিখ্যাত হলেও মন্দিরগুলির স্থাপত্য খুবই প্রশংসনীয়।

মন্দিরগবেষক অধ্যাপক ডেভিড ম্যাককাচ্চনের মাপ অনুযায়ী মূল 'নবরত্ন' মন্দিরটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৪৬ ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় ১০০ ফুট। কলকাতার অন্যতম এক বিশাল মন্দিররূপে এটি পরিচিত। এই ধরনের অপর আর একটি মন্দির টালিগঞ্জের রাধানাথের 'নবরত্ন'। লক্ষণীয়, কলকাতায় 'পঞ্চরত্নে'র চেয়ে 'নবরত্নে'র সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত গোবিন্দরাম মিত্রের 'ব্ল্যাক প্যাগোডা' নামে পরিচিত সু উচ্চ 'নবরত্ন' মন্দির ড্যানিয়েলের চিত্রে লক্ষ্য করা যায়। (দ্রষ্টব্য, ম্যাককাচ্চন, দ্যা টেম্পলস অভ ক্যালকাটা, বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট, জানুয়ারি- জুন ১৯৬৮, পৃ. ৫২)।

ভবতারিণীর কালীমন্দিরটি একটি উচ্চ বেদিমঞ্চের ওপর দণ্ডায়মান। নিচের প্রশস্ত 'দালানের' ওপরের দুটি তলে নয়টি খাঁজকাটা 'দেউল'-রত্ন সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ দক্ষিণদিকের ঢাকা বারান্দা 'পরিদর্শন কক্ষ' রূপে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণে প্রবেশপথ পাঁচটি 'খিলান' যুক্ত। পশ্চিমদিকেও অনুরূপ খিলান প্রবেশপথ আছে।

কালীবাড়ির প্রশস্ত বাঁধানো চত্বরের দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে এবং পশ্চিমের সিঁড়ি দিয়েও মূল মন্দিরে যেতে হয়। প্রবেশপথের খিলানগুলি গোলগুচ্ছস্তম্ভের 'কলাগেছ্যা' রীতির। গর্ভগৃহ প্রশস্ত। দেবী ভবতারিণী দক্ষিণকালী দেবী মূর্তি শিবের বক্ষ উপরি দণ্ডায়মানা। গর্ভগৃহের ভেতরের ছাদ গোলাকার ভল্টে গঠিত এবং বারান্দার ছাদ খিলানে গঠিত।

মন্দিরটি ত্রিতল। গর্ভগৃহের পূর্বদিকে সিঁড়ি আছে। সেখান দিয়ে ওপরে আসা যায়। মন্দির-দেওয়ালে কোন টেরাকোটা-অলংকরণ নেই। তবে মূল 'নবরত্নে' ও নাটমন্দিরে পঙ্কচুনের ফুল-লতাপাতার কিছু কাজ লক্ষ্য করা যায়।

নাটমন্দির ঃ 'নবরত্ন' মন্দিরটির সামনে দক্ষিণে আয়তক্ষেত্রাকার সুদৃশ্য এই নাটমন্দিরের সঙ্গে পূর্বোক্ত অন্নপূর্ণার নাটমন্দিরের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এর চারদিকের খিলান- প্রবেশপথগুলির স্থাপত্যসৌন্দর্য আকর্ষণীয়। চাবপাশ খোলা নাটমন্দিবেব পূর্ব ও পশ্চিমে ৭+৭ এবং উত্তর ও দক্ষিণে ৫+ ৫ খিলান প্রবেশপথ বর্তমান। দশটি বড় বড় গোল থামের ওপর নাটমন্দিরের ছাদ স্থাপিত। থামগুলি নাটমন্দিরের ভেতরের চারপাশে খোলা অংশকে তিন ভাগে ভাগ করেছে।

রাধাকৃষ্ণের দালান ঃ

এটি একটি বৃহৎ 'দালান'শৈলীর মন্দিরের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পশ্চিমমুখী এই দালানের সামনে সাতটি খিলান-প্রবেশপথ। ছোট গোল থামের সুদৃশ্য 'কলাগেছ্যা' থামের মধ্যে স্থাপত্যসৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢাকা বারান্দা। গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ ও রাধিকা অষ্টধাতুর মূর্তি।

একটি উচ্চ ভিত্তিবেদির ওপর দালানটি অবস্থিত।

দ্বাদশ 'আটচালা' শিবমন্দির ঃ

প্রশস্ত মন্দিরচত্বরের পশ্চিমদিকে গঙ্গাতীরবর্তী ছয়টি করে 'আটচালা'শৈলীর মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। 'আটচালা'গুলির ঢালু চাল ও বাঁকানো কার্নিশ সুদৃশ্য। প্রতিটি 'আটচালা'র ভেতরের ছাদ ভল্টে গঠিত। প্রতিটিরই একটিমাত্র প্রবেশপথ। প্রত্যেক শিবলিঙ্গের পৃথক নাম জলেশ্বর, মহেশ্বর ইত্যাদি। আয়তক্ষেত্রাকার বিশাল বাঁধানো মন্দিরচত্বরের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে সারি সারি ঘর, অতিথিশালা প্রভৃতি। উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার দিকের কক্ষটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের।

কোন মন্দিরগাত্রেই প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও এই ঠাকুরবাড়ির সব মন্দিরই প্রতিষ্ঠা করেন রানি রাসমণি ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৬২)।

দ্বাদশ আটচালা শিবমন্দিরের মাঝে গঙ্গার ঘাটের ওপর একটি চারপাশ খোলা চাঁদনি উল্লেখযোগ্য। চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত এই কালীবাড়ির প্রবেশপথ উত্তরদিকে। মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থান নহবৎখানা, রানি রাসমণির মন্দির প্রভৃতি।

জয়মিত্র কালীবাড়ি (বরাহনগর) ঃ

১. দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অনেকটা দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্তী ইঁটের তৈরি দক্ষিণমুখী কৃপাময়ী কালীর 'নবরত্ন' ও দ্বাদশ 'আটচালা'শৈলীর শিবমন্দির 'জয়মিত্র কালীবাড়ি' নামে পরিচিত। এটি বরাহনগরের 'মালাপাড়া' বা 'জেলেপাড়া'য় অবস্থিত এবং কুঠিঘাটের নিকটবর্তী। পাকা রাস্তার পাশে চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত কৃপাময়ীর 'নবরত্ন' মন্দিরটির সঙ্গে পূর্বোক্ত মূলাজোড়ের ব্রহ্মময়ী মন্দিরের সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। যদিও কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কৃপাময়ীর মন্দিরটি ১২৫৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন শোভাবাজারের জয়নারায়ণ মিত্র। কিন্তু উভয় মন্দিরের স্থাপত্যগত সাদৃশ্য এত বেশি যেন দুটি মন্দিরই একই মিস্ত্রির হাতে গড়া মনে হয়।

পূর্বোক্ত ব্রহ্মময়ী মন্দিরের মতো এরও নিচের 'দালান' প্রশস্ত ও কার্নিশ সোজা। ত্রিখিলান প্রবেশপথ 'কলাগেছ্যা' রীতির গোল স্তম্ভগুচ্ছের সমষ্টি। দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ি আছে। ভেতরে ঢাকা বারান্দা ও পরে গর্ভগৃহ। ঢাকা বারান্দার ভেতরের ছাদ খিলানে গঠিত। গর্ভগৃহে দেবী কৃপাময়ী দক্ষিণাকালী মূর্তি।

নিচের দালানের চার-কোণে চারটি খাঁজকাটা দেউল এবং ওপরের অপেক্ষাকৃত ছোট দালানের প্রতিকোণে চারটি ও কেন্দ্রস্থলে একটি বড় রত্ন নিয়ে 'নবরত্ন' মন্দির। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে লিপিটি এই ঃ

প্রতিষ্ঠা সন ১২৫৭ সাল।
চৈত্র সংক্রান্তি

নিচে মন্দির অঙ্গনে একটি বড়ো নাটমন্দির ছিল। কিন্তু এর ওপরের ছাদ অনেকদিন পড়ে গেছে। শুধু গোল থামগুলো দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনেকগুলি সারি সারি তুলসীমঞ্চ দেখা যায়। নবরত্নটির উত্তরে পূর্ব থেকে পশ্চিমদিক বরাবর ছয়টি 'আটচালা'রীতির

সুদৃশ্য শিবমন্দির এবং তার মুখোমুখি দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সারি সারি আরও ছয়টি 'আটচালা' বর্তমান। 'চালা'র ঢালু চালের ছাঁচা ঠিক খোড়ো চালাঘরের মতো, কিছুটা নামানো। কিন্তু 'নবরত্ন'টিতে য়ুরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর কিছুটা প্রভাব পড়েছে দেখা যায়, যেমন দ্বিতলের ছোট দালানের দেওয়ালে ভিনিসীয় দরজা-জানালার চিহ্ন ও ওপরে 'ফ্যানলাইট'।

খাঁটি 'চালা'রীতিতে তৈরি আটচালাগুলির গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ সমূহের নাম উত্তরদিকে (পূর্ব থেকে পশ্চিমে) পশুপতিনাথ, বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ, চন্দ্রনাথ, অমরনাথ ও ভুবনেশ্বর। দক্ষিণে (পশ্চিম-পূর্ব) রামেশ্বর, উমানন্দ, কেদারনাথ, সোমনাথ, তারকনাথ, আদিনাথ।

কৃপাময়ী কালীর কাছে অনেক আগে পশুবলি হত। এতে বেদনার্ত তারানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ (ব্রহ্মচারী) সেই বলিদান প্রথা তুলে দেন। সময় ১৩০৭ বঙ্গাব্দ (১৯০০ খ্রি.)। এ বিষয়ে তাঁরা একটি পদ্য মন্দিরের পাদদেশের কাছে একটি তুলসীমঞ্চের দেওয়ালে খোদাই করে দেন। পদ্যটি এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

> সিন্ধু বিন্দু নেত্র চন্দ্র পরিমিত সনে,
> পূর্ণানন্দে সাথে করি এক শুভক্ষণে,
> বালানন্দ ইষ্টদেব আসিয়া হেথায়,
> হেরিলেন জীববলি আর্ত্ত বেদনায়
> ক্ষান্ত কর রক্তস্রোত দিলেন বিধান।
> সে বিধান মেনে নিল ভক্ত পুণ্যবান।।
>
> — *তারানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ*

অর্থাৎ সিন্ধু =৭, বিন্দু = ০, নেত্র = ৩, চন্দ্র = ১। অঙ্কের বামদিকে গতি এই নিয়ম অনুসারে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে (=১৯০০ খ্রি.) বালানন্দ ব্রহ্মচারী এক শুভক্ষণে পূর্ণানন্দকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে জীববলি দেখে বেদনার্ত হন। সেই রক্তস্রোত বন্ধ করার জন্য তিনি বিধান দিলে পুণ্যবান ভক্তগণ তা মেনে নেন।

বালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য তারানন্দ পরে রিষড়ার বাঁশতলায় (হুগলি) অর্ধনারীশ্বরের 'প্রেমমন্দির মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। জয়মিত্র কালীবাড়ির মুখোমুখি ওপারে বেলুড়মঠ (হাওড়া) ও প্রসিদ্ধ 'রাসবাড়ি' বর্তমান।

মূলাজোড়ের ব্রহ্মময়ী (১৮০৯) ও বরাহনগর-কুঠিঘাটের কৃপাময়ী মন্দির (১৮৫০) দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের (১৮৫৫) পূর্ববর্তী। দক্ষিণাকালীর মূর্তি ওই দুটি মন্দিরে আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার হুগলির মহানাদের ব্রহ্মময়ীও (১৮৩০ খ্রি.) একই রূপে অধিষ্ঠিতা। কাজেই গঙ্গাসন্নিহিত স্থানে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা বহু আগে থেকেই শুরু হয়। গঙ্গাতীরে কলকাতার ধনী জমিদারেরা ওই সব মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির সেই একই চেষ্টার ফলশ্রুতি।

২. *সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি ঃ*

জয়মিত্র কালীবাড়ির কিছুটা দক্ষিণপূর্বে কুঠিঘাট এলাকার কাছাকাছি সিদ্ধেশ্বরী কালীর 'দালান' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দালানটি দক্ষিণমুখী ও বেশ প্রশস্ত। এই কালী খুবই প্রসিদ্ধা। জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁরই কাছে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আরোগ্য কামনায়

ডাবচিনি মানত করেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকবার আসেন। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী, জয়মিত্র-প্রতিষ্ঠিত কৃপাময়ী, এই দেবী সিদ্ধেশ্বরী ও বরাহনগরের ব্রহ্মময়ী খুবই প্রসিদ্ধ।

এখানের কিছুটা দূরে প্রসিদ্ধ বরাহনগর মঠ। এখানেই একটা পুরানো বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দসহ শ্রীরামকৃষ্ণের বারজন শিষ্য সন্ন্যাস অবলম্বন করে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

রাসবাড়ি (বেলুড়, হাওড়া) ঃ

হাওড়ার বালি এলাকায় 'রাসবাড়ি' নামে খ্যাত এক ঠাকুরবাড়ি গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী। দক্ষিণেশ্বর বিবেকানন্দ সেতুর কিছুটা দক্ষিণে বেলুড়ের নিকটবর্তী। কলকাতা হাটখোলার এক ধনী পূর্ণচন্দ্র দাঁ এই রাসবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা ১২৯৭ সালে (খ্রি. ১৮৯০-৯১)। রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে এখানে মহাসমারোহে রাসমেলা হয়। মেলা একমাস চলে। বহু জনসমাগম হয়।

এখানকার মন্দিরগুলি হল, ১. রাধারমণজীউর 'নবরত্ন' ও সামনে নাটমন্দির, ২. দশটি খোলা দ্বারযুক্ত বহুচূড় গোলাকৃতি রাসমঞ্চ, ৩. ৬টি 'আটচালা'রীতির শিবালয়, ৪. গঙ্গার ধারে থামওয়ালা একটি ঘড়ির মঞ্চ।

রাধারমণজীউর 'নবরত্ন' মন্দিরটি ইঁটের তৈরি, দক্ষিণমুখী। ধনুকের মতো ঈষৎ বাঁকানো কার্নিশ, দ্বিতলে চারটি খাঁজকাটা 'রত্ন' ও ত্রিতলে পাঁচটি 'রত্ন'। মন্দিরটির স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য হল, নিচের 'চালা'টি ওপরের 'চাঁদনি'টির তুলনায় বেশ উঁচু ও বৃহৎ। নিচেরটির মতো দ্বিতলেও ত্রিখিলানপ্রবেশপথ আছে। ঠিকভাবে দেখলে দ্বিতলে ছাদের ওপর একটি ছোট সুদৃশ্য 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা পশ্চিমবাংলার অনেক স্থানে লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটিতে কোথাও কোন অলংকরণ নেই। অবশ্য, কোন না কোন সময় সংস্কার কাজ যে হয়েছিল, তা বোঝা যায়। গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী এমন এক উচ্চ মন্দির খুবই দর্শনীয়। মন্দিরের 'রত্ন'গুলিও সুঠাম সুন্দর।

মন্দির-দেওয়ালে প্রতিষ্ঠাকালীন কোন লিপি দেখা না গেলেও এর মারবেল পাথরের প্রশস্ত সিঁড়ির একস্থানে লেখা আছে ঃ

শ্রীমতি কাদম্বিনী দাসী
শ্রী পূর্ণচন্দ্র দাঁ
প্রতিষ্ঠা ২২ শে জ্যৈষ্ঠ
সন ১২৯৭ সাল

এটি যে পূর্ণচন্দ্র দাঁ প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ি, তা জানা যায় গঙ্গার দিকে যে ঘড়িযুক্ত তোরণ আছে, তা থেকে। লেখা আছে—

স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়ী
(রাসবাড়ী) বালী হাওড়া

অতএব জানা যাচ্ছে, কাদম্বিনী দাসী ও পূর্ণচন্দ্র দাঁ ১২৯৭ সাল বা ১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরবাড়িটি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু উক্ত তোরণ নির্মিত হওয়ার সময় তিনি জীবিত ছিলেন না। 'ক্লক টাওয়ারে' আর একটি লিপি আছে ঃ

শ্রী শ্রী ৺রাধারমণজীউ
প্রতিষ্ঠা
২২ শে জ্যৈষ্ঠ সন ১২৯৭

এই রাসবাড়ির রাসমঞ্চটি বেশ বড়, গোলাকার ও দশটি খোলা দ্বারযুক্ত। রাসের সময় প্রতিদ্বারে রাধাকৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করা হয়। মঞ্চের মাঝের কক্ষে রাধাকৃষ্ণ ও তাদের দু-পাশে ৪+৪ সখীদের মূর্তি রাখা হয়। মঞ্চের ছাদে আছে অনেকগুলি চূড়া। এই ধরনের স্থাপত্য (বিশেষ করে রাসমঞ্চের) খুবই বিরল। সব দ্বারগুলিই খিলানযুক্ত।

'নবরত্নে'র ঠিক উত্তরে অবস্থিত রাসমঞ্চটির পূর্বদিকে তিনটি 'আটচালা'-রীতির মন্দির। এরপর দক্ষিণদিকে নাটমন্দিরের পাশে আরও তিনটি একই শৈলীর শিবালয়। তিন মন্দিরগুচ্ছের প্রতিটির পাশে নহবতখানা। পাশে নাটমন্দিরটির অনেকগুলি গোলাকার থাম আছে।

শিবের ছয়টি 'আটচালা'র চালগুলি বেশ ঢালু। খোড়ো চালের মতো বাঁকানো ছাঁচা। প্রতিটি আটচালা একদ্বারযুক্ত এবং উচ্চ বেদির ওপর অবস্থিত। নিচের চালাটি যতটা উচুঁ, সে তুলনায় ওপরের চালা খুবই ছোট, কিন্তু চালার ভাবটি পরিস্ফুটিত।

জানা যায়, পূর্ণচন্দ্র দাঁয়ের শালকিয়ার হরগঞ্জ বাজারের আয়ে এই ঠাকুরবাড়ির খরচ চলত। পরে সরকার তা অধিগ্রহণ করলে ক্ষতিপূরণের টাকায় এর খরচ চালানো হতে থাকে।

বেলুড়মঠ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির

বিশ্বখ্যাত বেলুড়মঠ পূর্বোক্ত 'রাসবাড়ি'র কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত। বেলুড়মঠ এলাকার প্রধান স্থাপত্যকীর্তি শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির ছাড়া বেলুড়মঠে আরও কয়েকটি স্থাপত্যকীর্তি হল বেলুড়মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির, শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির ও স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের আবাসগৃহও উল্লেখযোগ্য পুরানিদর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির পশ্চিমবাংলার এক অনন্য স্থাপত্যকীর্তি। এটি ভারতের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের এক আদর্শরূপে স্বীকৃত। সম্প্রতি বেলুড় স্টেশনের কাছাকাছি অনেকটা এর আদলে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি স্টেশন নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনটি রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত 'নবরত্ন' মন্দিরস্থাপত্যের আদর্শে কয়েকবছর আগে নির্মিত হয়েছে।

বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির বাংলায় প্রচলিত নির্দিষ্ট কোন মন্দিরস্থাপত্যশৈলীর মধ্যে পড়ে না। আবার স্বামীজির ইচ্ছা অনুযায়ী স্থাপত্যটি সম্পূর্ণ রূপায়িতও হয়নি। স্বামীজির মৃত্যুর ছত্রিশ বছর পরে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি তাঁর গুরুভাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই মন্দির উৎসর্গ করেন। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল, তাঁর পরিকল্পিত স্থাপত্যে তিনি পুব ও পশ্চিমের স্থাপত্যকলার এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটাবেন। তিনি তাঁর বাণী ও রচনার এক স্থানে লিখেছেন ঃ 'পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্প সম্বন্ধে যত সব idea নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দির নির্মাণে বিকাশ করার চেষ্টা করব। বহু সংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরি হবে। তার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র বসে ধ্যানজপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি এমন বড় করে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির ও নাটমন্দিরটি এমনভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক 'ওঁকার' বলে ধারণা হয়। মন্দিরমধ্যে একটি রাজহংসের

উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটি ছবি এইভাবে থাকবে— একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে— অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব idea রয়েছে। এখন জীবনে কুলোয় তো কাজে পরিণত করে যাব। নতুবা ভাবী generation ঐগুলি ক্রমে কাজে পরিণত করতে পারে তো করবে।'

কিন্তু স্বামীজি তাঁর এই আইডিয়া বা ভাবকে বাস্তবরূপ দিয়ে যেতে পারেননি। এর পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (যিনি নিজেও একজন ইনজিনিয়র ছিলেন) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই স্নানযাত্রার দিন বর্তমান মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর আগে অবশ্য তাঁর অন্য গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দ (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ) ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ প্রথমবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু ঠিক সে জায়গায় মন্দিরটি না হয়ে কিছুটা সুবিধার জন্য সামান্য দূরে মন্দিরটি স্থাপিত হয়। আগের নকশার চেয়ে তখন অর্থের অপ্রতুলতার জন্যে কিছুটা কমিয়ে দিয়ে অন্য একটি নকশায় মন্দির নির্মাণ করা হয়।

বর্তমান মন্দিরস্থাপত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ অনুসারে সর্বধর্মসমন্বয়েব চেষ্টা করা হয়েছে। বিশাল এই মন্দিরের বহির্ভাগের আয়তন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ২৩৫ ফুট ও ১৪০ ফুট এবং সর্বোচ্চ 'রত্ন' বা চূড়ার উচ্চতা ১০৮ ফুট।

এই মঠের স্থাপত্যকর্মের তিনটি অংশ লক্ষ্য করা যায়- ১ দক্ষিণমুখী উচ্চ প্রবেশ মণ্ডপ ২ হলঘর বা সাধারণের উপাসনাস্থল এবং ৩ গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিকশিত পদ্মের ওপর ধ্যানমগ্ন আসীন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ছাদের ওপর ও শীর্ষভাগে 'চালা' ও 'গম্বুজে'র একত্র সমাবেশ ঘটেছে। সামনের প্রবেশ মণ্ডপটি যেন দক্ষিণভারতের বাংলা 'গোপুরম' - অবশ্য শুধুমাত্র উচ্চতার দিক থেকে, যদিও এখানে ভাস্কর্য তেমন কিছু নেই, সামনে প্রবেশদ্বারের ওপরে স্বামীজি প্রকল্পিত 'প্রতীক' অংশটি ছাড়া। প্রতীকটি কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের সমন্বয়ে পরমাত্মদর্শনের ইঙ্গিতবাহী - অর্থাৎ জল, তার ওপর প্রস্ফুটিত পদ্ম. এর ওপর উদীয়মান সূর্য, এগুলিকে বেষ্টন করে আছে সাপ, মধ্যে হংস। বাইরের দেওয়ালে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু দেবদেবীর ভাস্কর্যমূর্তি সন্নিবদ্ধ।

মন্দিরটির স্থাপত্য-কৌশল লক্ষ্য করার মতো। সুপ্রাচীন 'নাগর'শৈলীর 'শিখর'-দেউল রীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে এখানে দক্ষিণভারতীয় হিন্দুমন্দিরশৈলীর আদলটাই বেশি করে ধরা পড়েছে। বিশেষ করে, কর্নাটক রাজ্যে প্রশস্ত পাদপীঠের ওপর বৃহদায়তন হালেবিড়ু, বেলুর প্রভৃতি স্থানের যেসব প্রাচীন মন্দির আমাদের চোখে পড়েছে, তার সঙ্গে যেন কোথায় এর কিছু সাদৃশ্য ক্ষীণভাবে রয়েছে। যদিও আকার ও প্রকৃতিতে পার্থক্যটাই বেশি করে চোখে পড়ে। তবে সেখানে 'ভদ্র' বা 'শিখর' শৈলীর ছোঁয়া অনেকটা লেগেছে।

স্থাপত্যালঙ্কার ও ভাস্কর্যের অফুরন্ত সমারোহ সেখানে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। হালেবিড়ুর হৈসলেশ্বর মন্দিরে তার সাক্ষ্য রয়েছে।

বেলুড়মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির পশ্চিমবাংলায় স্থাপত্যসৌকর্যের এক অনন্য নিদর্শন। নিচের অংশ 'প্রাসাদ' রীতিতে গঠিত হলেও শিরোভাগের 'রত্ন'গুলির বেশির ভাগই 'চালা'-শৈলীর। প্রবেশমণ্ডপের শিরোদেশে তিনটি সুদৃশ্য 'চারচালা' সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'চালা'র ঢালু চালগুলি অনেকটাই ছত্রাকৃতি - কিছুটা রাজকীয় ছত্রের সাদৃশ্য পরিস্ফুটিত। চালের বাঁকানো ছাঁচা দেওয়াল থেকে অনেকটা নিচে প্রসারিত। ওপরে স্বর্ণাভ দণ্ড। কারুকার্য করা 'দোচালা' রত্ন

গর্ভগৃহের গম্বুজাকৃতি মূল শিখরটির সঙ্গে যুক্ত। পার্শ্ববর্তী অপর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ এবং তার পাশে 'চারচালা'। উল্লেখ্য, সব চালারই শীর্ষে 'পতাকাদণ্ড' শোভিত। 'রত্নে'র মধ্যে 'চালা'র পরেই আছে 'গম্বুজ'রত্ন। গম্বুজশীর্ষে আছে 'আমলক', ঘণ্টা, কলস, দণ্ড। গম্বুজের বাইরের দেওয়াল ওপরে - নিচে খাঁজকাটা। প্রাসাদটির ছাদের কিনারগুলোতে মাঝে মাঝে সন্নিবেশিত করা হয়েছে 'গম্বুজ'রত্ন। মূল প্রাসাদ থেকে উদ্‌গত সংকীর্ণ উচ্চ সৌধের মাথায় 'গম্বুজ' রত্নগুলো বসানো হয়েছে। এই সৌধগুলোর নিচের দেওয়ালে রয়েছে দুটি করে আয়তক্ষেত্রাকার 'চৈত্য'। প্রাচীন মন্দিরগুলোতে এই চৈত্যের প্রয়োজন হত মূর্তিস্থাপনের জন্যে। এখানে শুধুমাত্র স্থাপত্যসৌন্দর্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে এই চৈত্যগুলো তৈরি করা হয়।

প্রবেশমণ্ডপ ও গর্ভগৃহের মাঝখানে প্রশস্ত উপাসনাকক্ষ বা নাটমন্দির। এর ছাদ স্তম্ভশ্রেণীর ওপর সংন্যস্ত। এখানে প্রতিবছর দুর্গোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উপাসনা হলের দৈর্ঘ্য ১৫২ ফুট ও প্রস্থ ৭২ ফুট এবং উচ্চতা ৪৮ ফুট।

তবে এই শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে একথা বলা যায়, এটি নতুন এক স্থাপত্যের নিদর্শন হলেও কিছুটা এলোমেলোভাবে 'চালা' ও গম্বুজ বসিয়ে অনেকটা সৌন্দর্য হানি করা হয়েছে, যা আমাদের বাংলার প্রাচীন মন্দিরগুলোতে দেখা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের উত্তরপূর্ব কোণে গঙ্গাতীরবর্তী স্বামীজির আবাসগৃহ। এখানে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষিত। নিচে আমগাছটি তাঁর স্মৃতিপূত। এর পাশে আর একটি দ্বিতল গৃহে স্বামীজির অন্যান্য গুরুভাইরা থাকতেন।

কিছুটা দক্ষিণে স্বামী ব্রহ্মানন্দের 'রত্ন'-মন্দির। মসজিদের গম্বুজের ন্যায় 'গম্বুজ'রত্ন ছাদের চারকোণে চারটি এবং মধ্যবর্তী একটি করে 'একচালা' রত্ন। নিচের 'দালান'টির ত্রিখিলান প্রবেশপথ যুক্ত ঢাকা বারান্দা। চারপাশে প্রদক্ষিণপথ। গর্ভগৃহে ব্রহ্মানন্দের যোগী মূর্তি স্থাপিত। শ্রীশ্রী ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য 'ঈশ্বরকোটি' স্বামী ব্রহ্মানন্দের (রাখাল মহারাজ) শেষকৃত্য এখানে সম্পন্ন হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর স্মৃতিমন্দির 'দালান' রীতির। তবে ছাদে একটি খাঁজকাটা গম্বুজাকৃতি 'রত্ন' স্থাপিত। ছাদের ওপরে রেলিং দেওয়া বারান্দা। নিচে দালানের ত্রিখিলান প্রবেশপথযুক্ত ঢাকা বারান্দা। গর্ভগৃহে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি অধিষ্ঠিত। গঙ্গার ঘাটের সম্মুখবর্তী পূর্বমুখী এই স্মৃতিমন্দিরটির স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

এর কিছু দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্তী স্বামীজির উচ্চ স্মৃতিমন্দির একটি আকর্ষণীয় পুরাকীর্তি। এটি একটি 'নবরত্ন' শৈলীর মন্দির। কিন্তু 'রত্ন'গুলি গম্বুজাকৃতি। ত্রিতল এই মন্দিরের নিচের 'দালানে'র দুপাশে দুটি ঘোরানো সিঁড়ি। সিঁড়ির নিচে দালানকক্ষে গঙ্গার দিকের দেওয়ালে স্বামীজির যোগী মূর্তি 'বাস-রিলিফে' খোদিত। সিঁড়ি দিয়ে উঠে 'দালানে'র গর্ভগৃহে 'ওঁ' চিহ্নিত। সামনে দুটি 'গথিক' স্তম্ভ। চারপাশে প্রদক্ষিণপথ। ত্রিতলে বক্রাকৃতি কার্নিশযুক্ত খর্বাকৃতি দালানের ছাদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি বেশ বড়। শীর্ষভাগে ত্রিশূল। চারকোণে চারটি গম্বুজ বেশ ছোট। বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের অনুকরণে মেদিনীপুর শহরের নূতন বাজারে যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে, তার দৈর্ঘ্য একশ ফুট ও প্রস্থ পঁয়ত্রিশ ফুট এবং উচ্চতা ষাট ফুট। মন্দিরটির নির্মাণ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং কাজ শেষ হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ। সেসময় মোট খরচ হয়েছিল তিন লক্ষ টাকা।

মহেশ্বর শিবমন্দির (বহুবাজার, কলকাতা) ঃ

স্বল্প পরিচিত ও প্রায়-অজ্ঞাত একত্রে তিনটি 'রত্ন' মন্দির বৌবাজার এলাকার কেনডারডাইন লেনে অবস্থিত। মন্দির তিনটি মহেশ্বর শিবের নামে উৎসর্গীকৃত। কলকাতায় 'রত্ন' মন্দিরের সংখ্যা যেখানে খুবই কম, সেখানে খ্রিস্টীয় আঠার শতকের শেষদিকে নির্মিত পাশাপাশি এই তিনটি 'রত্ন'মন্দির খুবই আকর্ষণীয়।

মন্দিরগুলি ইঁটের তৈরি ও দক্ষিণমুখী। কোথাও কোনরকমের কারুকার্য লক্ষ্য করা যায় না। তবে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে কম আকর্ষণীয় নয়। বাঁকানো কার্নিশযুক্ত নিচের 'চালা'র ছাদে খাঁজকাটা 'রত্ন'-শিখরগুলি সুদৃশ্য। সুস্পষ্ট 'রথ' বিন্যাসযুক্ত রত্নগুলির খাঁজ 'পিঢ়ার' অনুরূপ। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, এ ধরনের 'রত্ন'মন্দিরে যেখানে ত্রিখিলান প্রবেশপথ, সেখানে সবগুলিরই সামনে (দক্ষিণে) একটি ও পুবদিকে একটি প্রবেশপথ বর্তমান। তবে মাঝের ও তার পুব পাশের মন্দিরের পশ্চিমেও দ্বারপথ বর্তমান, যাতে প্রথম মন্দির থেকে একেবারে সোজাসুজি সব মন্দিরেই যাওয়া যায়।

প্রতিটি মন্দিরেই মসৃণ ব্ল্যাক বেসল্ট-পাথরের বৃহদাকার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। নাম মহেশ্বর। ভূকৈলাসের বৃহৎ শিবলিঙ্গের চেয়ে কিছুটা ছোট হলেও মহেশ্বর শিবলিঙ্গও কলকাতার অন্যতম বৃহৎ শিবলিঙ্গ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, রাস্তার পাশে প্রথম মন্দিরটি 'পঞ্চরত্ন', দ্বিতীয়টি 'নবরত্ন' এবং তৃতীয়টি 'পঞ্চরত্ন'। তিনটি মন্দিরই সুরক্ষিত ও সংস্কারিত।

মন্দিরে কোন লিপি না থাকলেও প্রথম মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে এই মন্দিরের একসময়ের সেবায়েত স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরগুলির সংস্কার করিয়ে যে একটি মারবেল ফলকে ইংরাজি লিপি খোদাই করেন, তা থেকে জানা যায়, ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ান ত্রিলোকরাম পাকড়াশি এই 'নবরত্ন' (এবং 'পঞ্চরত্ন') মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরাজি লিপিটি এখানে উদ্ধার করা হ'ল (যেমন যেমন সাঁ'ন আছে) ঃ

In 1785
This Navaratna Temple
of Maheswaram
has been founded by
Dewan Trilok Ram Pakrasy
The Ancestor of the present sevait
Satish Mukhopadhay B.L.
of 61 Wellington Street Calcutta
Who has repaired the temple in 1940

সতীশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন দেওয়ান ত্রিলোকরাম পাকড়াশির বংশধর। বর্তমানে (২০০৩) এটি একটি 'হেরিটেজ বিলডিং'-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত। কলকাতা কর্পোরেশন ৩০.৮.২০০১ তারিখে এই মর্মে বাইরের দেওয়ালে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। মন্দিরটির পুনঃসংস্কার করা হয়েছিল ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বংশধর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে।

ভূকৈলাস রাজবাড়ি (খিদিরপুর, কলকাতা) ঃ

কলকাতার খিদিরপুর এলাকায় 'ভূকৈলাস রাজবাড়ি' দীর্ঘকাল সুপরিচিত। খ্রিস্টীয় আঠার শতকে এখানের রাজপরিবার খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই রাজবংশের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ছিলেন সেকালের একজন খুবই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটে।

১. ভূকৈলাসের সর্বাপেক্ষা দু'টি উল্লেখযোগ্য মন্দির হল, রক্তকমলেশ্বর ও কৃষ্ণকমলেশ্বরের দুটি বিশাল 'আটচালা' মন্দির। মন্দির দুটিরই 'চাল' বেশ ঢালু এবং চালের কার্নিশ বেশ বাঁকানো - অনেকটা খড়ের চালাঘরের বাঁকানো ছাঁচার মতো, বিশেষ করে, রক্তকমলেশ্বরের বিশালাকার 'আটচালা'র চালের ঢালু ও বক্রভাব খুবই আকর্ষণ করে। ওপরের 'চারচালা'টি নিচেরটির তুলনায় খুব ছোট হলেও তার মধ্যে স্থাপত্য-সৌন্দর্য পরিস্ফুট, এটা বোঝা যায়। শীর্ষভাগে অনেকগুলো কলস ওপরে ওপরে বসিয়ে ত্রিশূল সন্নিবেশ করা হয়েছে।

রক্তকমলেশ্বরের দেওয়ালগাত্রে বিশেষ কোন অলংকরণ নেই, নিচের ও ওপরের 'চারচালা'য় পোড়ামাটির কয়েকটি ফুল ছাড়া। পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য দিক হল, এর সমানে কোন ত্রিখিলান প্রবেশপথ না থাকলেও দুটি প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢাকা বারান্দায় প্রবেশ করা যায়। দক্ষিণদিকের দেওয়ালে একটি প্রবেশপথ আছে, গর্ভগৃহে রক্তকমলেশ্বর শিবলিঙ্গ বিশালাকৃতি। এত বড় মসৃণ ব্ল্যাক বেসল্ট-পাথরের শিবলিঙ্গ খুব কমই দেখা যায়। সেক্ষেত্রে ভূকৈলাসের রক্তকমলেশ্বর শিবলিঙ্গটি পশ্চিমবাংলার যেকোন বৃহদাকার শিবলিঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়।

পশ্চিমদিকে (সামনে) ঢাকা বারান্দার বাইরের দেওয়ালে যে সংস্কৃতলিপি আছে, সেটি এখানে উদ্ধার করা হল ঃ

চৈত্রেস্কপক্ষগণিতেহনি পূর্ণিমায়াং
শাকেক্ষিশূন্যজলধীন্দুমতেয
হোসুন্দ্রো (?) শ্রীযুক্তরক্তকমলেশ্বর
শ্রীমালগুরুবারে রবেঃ পশু
পতেঃ কৃপায়াধিবাস
শকাব্দা ঃ ১৭০২

সংস্কৃত বসন্ততিলক ছন্দে রচিত লিপির সারমর্ম হল, ১৭০২ শকাব্দ বা ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীযুক্ত রক্তকমলেশ্বরের মন্দির নির্মিত হল। কিন্তু এখানে প্রতিষ্ঠাতার নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। জানা যায়, মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল এই দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা বারান্দার ভেতরের উঁচু ছাদ খিলানে তৈরি। গর্ভগৃহের দেওয়ালে ওপরের তিন প্রস্থে 'স্টাকো'র কাজ। প্রবেশপথের ওপরে দু পাশে দুটি ঘোড়ার মুখ সিংহ যেন লতা বা গাছের ওপর দিয়ে ধাবমান। নিচে ৫+ ৫ 'পিঢ়া' দেউলরীতির প্রতীক মন্দিরে শিবলিঙ্গ। মাঝের প্রস্থে ষাঁড়ের ওপর আসীন দ্বিভুজ মহাদেব ও দুপাশে নন্দী (শিঙ্গাবাদনরত-ডানদিকে) এবং ত্রিশূলহস্তে দণ্ডায়মান ভৃঙ্গী (বামদিকে)। গর্ভগৃহের ত্রিখিলান প্রবেশপথ বর্তমান। থামগুলি 'ইমারতি'-রীতির।
রক্তকমলেশ্বর মন্দিরের আনুমানিক উচ্চতা ৬০ ফুট এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় ৩৫ ফুট।

২. রক্তকমলেশ্বরেরই মুখোমুখি মন্দিরচত্বরের পশ্চিমদিকে কৃষ্ণকমলেশ্বরের 'আটচালা'-রীতির ত্রিচূড় মন্দিরটিও বিশাল আকৃতির। রক্তকমলেশ্বরের মতো এটিও একটি উঁচু ভিত্তিবেদিতে অবস্থিত। নিচের চারচালাটি খুবই খাড়া উঁচু। এর প্রতিদিকের ঢালু চাল ঠিক যেন একটি ওল্টানো নৌকা বা বাঁকানো অর্ধচন্দ্র, যার মধ্যে স্থাপত্য-সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

পূর্বমুখী ইঁটের মন্দিরটির সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথযুক্ত ঢাকা বারান্দা। থামগুলি কতকটা 'ইমারতি' রীতির। তবে আদিতে হয়তো খাঁটি 'ইমারতি' ছিল। সংস্কারের ফলে অনেকটা রূপান্তরিত। সাম্প্রতিক সংস্কার যে হয়েছে, তা বোঝা যায়। খিলান প্রবেশপথের ওপর তিনটি প্রস্থ থাকলেও কোথাও কোন টেরাকোটা বা ফুল বা নকশা নেই। গর্ভগৃহে বৃহদাকার কালো মসৃণ বেসল্ট-পাথরের শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। রক্তকমলেশ্বরের মতো এই মন্দিরের ভেতরের ছাদ গোলাকার ভল্টে গঠিত। দুটি মন্দিরেরই বারান্দার ছাদ খিলানাকার।

কিন্তু কৃষ্ণকমলেশ্বর মন্দিরে প্রতিষ্ঠাকালজ্ঞাপক কোন লিপি নেই। তবে স্থাপত্যগঠন-বৈশিষ্ট্যদৃষ্টে দুটি মন্দিরই সমকালীন অনুমান করা যায়। এই মন্দিরের তিনদিকে দরজা আছে।

৩. এই মন্দির দুটির দক্ষিণপার্শ্ববর্তী একটি দীঘি। দীঘির দক্ষিণতীরে ঘোষাল রাজবংশের সত্যচরণ ঘোষালের একটি স্মৃতিমন্দির দর্শনীয়। স্মৃতিমন্দিরটির গোল 'গথিক' থাম ও গম্বুজ সেকালে য়ুরোপীয় ঐশ্বর্যময় সমাধিমন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভেতরে সত্যচরণ ঘোষালের এক আসীন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই স্মৃতিমন্দিরের দেওয়ালে পাথরে খোদিত যে সংস্কৃত লিপিটি আছে, সেটি ঠিক ঠিক সারি অনুসারে এখানে উদ্ধার করা হল ঃ

> ভূকৈলাসস্য শোভায়ৈ নিয়তঃ সুপ্রযত্নবান
> রাজঃ শ্রীসত্যচরণ ঘোষালঃ শরণাগ্রজ ঃ
> তদাজ্ঞয়া শ্রিয়া রামকমল কর্ম্মপ্রেশলঃ
> মুখোপাধ্যায়কঃ স্বৈরং কৃতবান খেয়মুত্তমম
> শম্ভোঃ(?) কারুণা (করুণয়া ?) তস্য রচিতঃ সক্রমোত্তমঃ
> বেদর্ত্তুব্ধি নিশানাথ সম্মিতে শকবৎসরে
> জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে সম্পুর্ণ বিনির্মিতবুদৌ (?)

এই লিপি থেকে জানা যায়, ১৭৬৪ শকাব্দে বা ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে এটা তৈরি হয়।

৪. পূর্বোক্ত মন্দিরদুটির উত্তর পার্শ্ববর্তী একটি ভগ্ন-দালানের শুধুমাত্র গোল থামগুলি খাড়া আছে। পাশে জীর্ণ ভগ্ন রাজবাড়ি। রাজবাড়ির অন্দরমহলে পতিতপাবনী দুর্গার 'দালান' মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। সামনে বাঁধানো চত্বর। প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে দালানে ওঠা যায়। 'দালানে'র দু'টি অংশ ঃ ত্রিখিলান চৌকো থামযুক্ত প্রশস্ত প্রবেশপথ। খিলানের সঙ্গে 'ফ্যানলাইট' থাকায় য়ুরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব কিছুটা পড়লেও ছাদের ওপরে রেলিং দেওয়া বারান্দার সঙ্গে দুকোণে দুটি ছোট্ট 'আটচালা' প্রতীক মন্দির ও কার্নিশের মধ্যবর্তী স্থানে তিনটি বিশিষ্ট রীতির মন্দির এই 'দালান'শৈলীকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে, যা সচরাচর দেখা যায় না। এই মন্দির ও অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হলে পূর্বদিকের একটি দ্বারপথ দিয়ে আসতে হয়।

দালানটির ঢাকা বারান্দার পর প্রশস্ত গর্ভগৃহে দুর্গামূর্তি বর্তমান। প্রতিবছর দুর্গাপুজোর সময় সমারোহের সঙ্গে এখানে পুজো হয়। পতিতপাবনী দুর্গা মূর্তিটি ঘোষাল-রাজবংশের কুলদেবী বলে জানা যায়। দেবীমূর্তি মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী। মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের প্রতিষ্ঠিত। দুর্গাদালানের দু-পাশে দুটি প্রকোষ্ঠ। ঢাকা বারান্দা ও গর্ভগৃহ খুবই প্রশস্ত। সেকালে পুজোয় বহু জনসমাগম হত, বোঝা যায়। (জবাফুলের মালায় গোটাটা ঢাকা থাকায় মূর্তির আসল রূপ বোঝা যায় না। তবে প্রাচীন মূর্তির মুখমণ্ডল দেখে এটি যে ক্ষুদ্রাকৃতি মহিষমর্দিনী মূর্তি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।)

এই দালানের কয়েকটি স্থানে ইংরাজি, ফার্সি ও সংস্কৃতে খোদাই করা লিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বারান্দা বা দর্শককক্ষের পূর্বদিকের দেওয়ালে ৪ফুট x ২ ফুটএকটি তাম্রফলকে প্রথমে ২৫ সারির ইংরাজি লিপি ও তার নিচে ১২ সারির ফার্সি লিপিতে ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের জীবনী ও রাজবাড়ির ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ইংরাজি লিপির প্রথমে আছে ঃ

Life of Moha Rajah Joynarain Ghossaul বারান্দার একেবারে বাইরের দেওয়ালে ডাইনে ও বামে কালোপাথরে খোদিত দীর্ঘ সংস্কৃত লিপি বর্তমান। এখানে লিপি দুটির কিছু অংশ উদ্ধার করা হল ঃ

শ্রীমন্নারায়ণো
জয়তি

সুধানিধির্বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়স্তৎসুতো মহান্।
আদিসূরস্য যজ্ঞার্থমাগতো রাঢ়দেশভাক্।।
তৎসুতশ্রীধরস্তস্য ঘোষালঃ সুরভিঃ স্মৃতঃ।
তৎসুতঃ সাগরস্তস্য তয়োঃ সহ উদাহৃতঃ।।
বিশ্বামিত্রঃ .... (এরপর ৯ সারির লিপি)
(শেষসারি শকাব্দা ঃ ১৭৬৭ সন ১২৫২)
(শ্রীযাদবচন্দ্র ভাস্করেণ খোদিতম্)

এই লিপি থেকে সন জানা যাচ্ছে, ১৭৬৭ শকাব্দ বা ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ।

বামে কালোপাথরে বড় ছয় সারির লিপি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করা হল। প্রতি সারি শেষ হলে একটি মাত্রা (/) দেওয়া হ'ল ঃ

শিবেক্ষণ বিয়ন্মুনীন্দুমিত শাকবর্ষে বিধৌ দিনে দিনকরেভি/সংক্রমিতমীনরাশৌ ঘটতি।
ইদং কলিভবার্ণবে পতিতমেষ্য/ সংরক্ষিতুং জগতপতিতপাবনীকরুণয়াবি
রাসীদিয়াং।। ভুণ্ডা/ দগীতসুমোদদায়ি
সুমনোরাজীবিরাজিস্যুরম্নানাবল্লি চয়াঞ্চিত/
টবি সদানন্দ্যুল্লসত্তান্তবং। কৈলাসে শশিবাম্বিতং
পুরমিদং কৈলা/সতুল্যাং ভুবি তস্মাদর্থবিদাকৃতাং

জগতি ভূকৈলাস সংজ্ঞাং যযৌ।/

এই লিপির ভাবার্থ হল, ১৭০৩ শকাব্দ বা ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে জগৎপতিতপাবনী দুর্গা করুণা করে এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই স্থান ছিল উদ্যান দীর্ঘিকাশোভিত, যেখানে অজস্র সুগন্ধি পুষ্পের সমারোহ হত। এটা শিবের কৈলাসের মতো ছিল। পৃথিবীতে বলে এর নাম ভূকৈলাস।

লিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে, মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের সময়ে এই দালান মন্দিরে পতিতপাবনী দুর্গা অধিষ্ঠিতা হন। এব একবছব আগে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে রক্তকমলেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়নাবায়ণ ঘোষাল আনুমানিক ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি উনিশ শতকে প্রথমার্ধের কোন সময় পরলোকগমন করেন।

জটার দেউল ঃ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব অন্তর্গত সুন্দরবন এলাকায় পশ্চিম জটার সু-উচ্চ ইঁটের দেউল-মন্দির পালযুগের একটি উল্লেখযোগ্য দেবালয়। পশ্চিমবাংলায় যে কটি হিন্দু আমলের মন্দির এখনও বর্তমান, উত্তর জটার এই মন্দিরটি তাদের মধ্যে অন্যতম। মন্দিরটি যে স্থানে অবস্থিত, সেটি এখনও দুর্গম রয়ে গেছে। খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষপাদে যখন এই মন্দির তৈরি হয়, তখন এই অঞ্চলে বেশ জনবসতি ছিল, অনুমান কবা যায়। প্রাচীন দীঘি, কঙ্কণদীঘির কয়েকটি ঢিবি, পাতলা ইঁটে তৈরি স্নানের ঘাট, মাটিব নিচে ইঁটের দেওয়াল বা ভিত্তি — এসব কিছুটা প্রমাণ করে, সেই প্রাচীনকালে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ ছিল। কালক্রমে সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে মাত্র দেউলটি অবশিষ্ট থাকে। ইঁটের এই দেউলটির মাথা-ভাঙা। জানা যায়, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্মিথ নামে এক সাহেব এই দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করানোর সময় এর শীর্ষভাগটা ভেঙে দেন।

তবুও এখন এই মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট বলে জানা গেছে। এটি একটি প্রাচীন 'শিখর'দেউল। পাল-সেন যুগের শৈলী অনুসারে তৈরি করা হয়। যেমন, বাঁকুড়াব বহুলাড়া ও সোনাতপল, বর্ধমানের দেউলিয়ার মন্দিরগুলো যে শৈলীতে তৈরি হয়েছিল, পশ্চিম জটার এই দেউলটি কতকটা সেই রীতিতেই তৈরি।

পলেস্তারাবিহীন ইঁটের এই দেউলটির গায়ে 'রথ'বিন্যাস আছে। নিচের 'বাঢ়'-অংশের 'বান্ধনা'র ভাঁজ এখনও আছে। লক্ষণীয়, 'রথ'-বিন্যাস নিচ থেকে একেবারে সোজা উঠে গেছে ওপরে শীর্ষদেশ পর্যন্ত।

একটি উচ্চ ঢিবির ওপর দেউলটি অবস্থিত। জানা যায়, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ওই অঞ্চলে তদানীন্তন জমিদার ওই স্থানের মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটি তাম্রফলক আবিষ্কার করেন। এটি ছিল তাম্রশাসন। সেটি থেকে জানা যায়, ৮৯৭ শকাব্দ বা ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জনৈক রাজা জয়ন্ত ওই দেউলটি নির্মাণ করান। পূর্বমুখী দেউলটির প্রবেশপথ নয় ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চ। এর গর্ভগৃহে প্রায় ৭ ফুট সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। প্রায় সব প্রাচীন মন্দিরে গর্ভগৃহ সমতলভূমি থেকে অনেকটা নিচুতে থাকে। যেমন, বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর, পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রাচীন কয়েকটি মন্দিরে এই রীতি অনুসৃত হয়েছে।

উত্তর জটার এই দেউলের মতো আরও একটি দেউল কুলতলা থানার দেউলবাড়ি দ্বীপে

ছিল বলে জানা গেছে। আর একটি ওইরূপ 'বেখ'দেউল মন্দির ছিল পাথরপ্রতিমা থানার বনশ্যামনগর গ্রামে নদীতীরে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অনেক পরবর্তীকালে (শেষ মধ্যযুগে) বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তাদের অনেকগুলিই এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এদের মধ্যে যে কয়েকটি তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন কোনটির এখানে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া গেল। নিচের মন্দিরগুলির বেশির ভাগ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা (২০০০) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রভাত ভট্টাচার্য লিখিত 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মঠমন্দির মসজিদ ও গির্জা' নামক দীর্ঘপ্রবন্ধ থেকে।

১. *অম্বুলিঙ্গ মন্দির ঃ*

কাশীনগর এলাকায় বড়শী বা অম্বুলিঙ্গ মন্দিরটি 'আটচালা'রীতির। এর গর্ভগৃহে সব সময় জল থাকে বলে জানা যায়। অম্বুলিঙ্গ একটি শিবলিঙ্গ। কবি কৃষ্ণরাম দাস রচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্যে (১৬৮৬ খ্রি.) এর নাম আছে। 'চৈতন্যভাগবতে'ও অম্বুলিঙ্গ ঘাটের নাম পাওয়া যায়।

২. *পাটেশ্বরী মন্দির ঃ*

কলাগাছিয়ায় (ডায়মণ্ড হারবার) পাটেশ্বরীর এই মন্দির 'আটচালা'রীতির। মন্দিরগর্ভগৃহে পাটেশ্বরী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। জানা যায়, এই অঞ্চলের কর-বংশীয় কোন জমিদারের পূর্বপুরুষ এই মন্দিব প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। আনুমানিক খ্রি. সতের শতকে তৈরি। আগে এর দেওয়ালে অনেক টেরাকোটা ছিল। কয়েকবার সংস্কার হওয়ায় সেগুলি লুপ্ত। দেবী পাটেশ্বরী জমিদারবংশীয় রায়চৌধুরীদের কুলদেবীরূপে পূজিতা। তার আগে কর-বংশীয় কোন জমিদার মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. *কেশবেশ্বরের 'আটচালা' (বাহিনচাওড়া, মন্দিরবাজার) ঃ*

কেশবেশ্বরের বিশালাকৃতি 'আটচালা'টি মন্দিরবাজার থানা এলাকায় অবস্থিত। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, ওই অঞ্চলের জমিদার কেশব রায়চৌধুরী নিজে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাট থেকে লিঙ্গমূর্তি বয়ে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বিশাল মন্দিরটি রামচন্দ্রপুরের মন্দিরসূত্রধর বাসুদেবকে দিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করান। ১৬৭০ শকাব্দ বা ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. *ভুবনেশ্বর ও যোগেশ্বর মন্দির, হাউড়ির হাট ঃ*

হাউড়ির হাটে ভুবনেশ্বর ও যোগেশ্বর শিবের দুটি মন্দির উল্লেখযোগ্য। মন্দিরদুটি নস্করপরিবারের হাউড়ি নামে জনৈকা মহিলার দানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভুবনেশ্বর শিবমন্দির বাংলা ১৩৭৩ সালের আশ্বিন মাসে ভেঙে পড়লে ওই বছরেরই ফাল্গুন মাসে তা পুনর্নির্মাণ করা হয়।

যোগেশ্বর মন্দিরটি প্রাচীন। বর্গক্ষেত্রাকার এই মন্দিরটিতে চালার ভাবটাই বেশি ফুটে উঠেছে। নিচের অংশে বাঁকানো কার্নিশের ওপর যে চতুষ্কোণ দেওয়ালটি রয়েছে, সেটি খাঁজকাটা ও 'রথ' বিন্যাসযুক্ত। এতে 'পিঢ়া'শৈলীর ভাবটা পরিস্ফুট। মন্দিরটির শিখরদেশ অষ্টকোণ ছত্রাকৃতি। এক বিশেষ ধরনের স্থাপত্যকর্মের জন্য মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য।

৫. আদ্যামহেশ মন্দির, দক্ষিণ বারাসত ঃ

মন্দিরটি 'আটচালা'শৈলীর। আদ্যামহেশ শিবলিঙ্গ। স্থানীয় জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের এক পূর্বপুরুষ মাটির গভীরে শিবলিঙ্গের সন্ধান পান এবং তার চারপাশে মন্দির নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। আদ্যামহেশ শিবলিঙ্গ প্রায় কুড়ি ফুট নিচে গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত।

৬. অনাদীশ্বর মন্দির, বোলসিদ্ধি ঃ

অনাদীশ্বর শিবকে কেন্দ্র করে এখানে গাজন, চড়ক প্রতিবছর ধুমধাম করে হয়। পুরানো মন্দিরটি নষ্ট হয়ে গেলে নতুন 'আটচালা' মন্দির বাংলা ১৩৩৬ সাল বা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয়।

৭. খড়োশ্বর মন্দির, জয়রামপুর ঃ

আগে চালাঘরে খড়োশ্বরের পুজো হত। বাংলা ১৩২৯ সালে (খ্রি. ১৯২২) বন্দেলের জমিদার প্রিয়নাথ রায় ও তাঁর পত্নী কুসুমকুমারী দেবী বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করে দেন। শিবরাত্রি ও চৈত্রমাসের গাজন এখানের প্রধান উৎসব।

৮. বুড়ো শিবমন্দির, পাইকান (বজবজ) ঃ

এখানের বুড়ো শিবের মন্দির প্রায় দুশ বছর আগে তৈরি। সামনের দেওয়ালের লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় বাংলা ১১৮৮ সাল বা ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে। বুড়ো শিবের গাজন ও ঝাঁপ প্রসিদ্ধ।

৯. পাঁচটি শিবমন্দির, মথুরাপুর, বাপুলিবাজার ঃ

এখানে একসঙ্গে পাঁচটি 'আটচালা' শিবমন্দির বর্তমান। 'বাপুলি' পদবীধারী ব্রাহ্মণ জমিদার এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানের একটি মন্দির খাড়া 'চারচালা'রীতিতে তৈরি। মন্দিরটি খুবই পুরানো, সামনে একটিমাত্র প্রবেশপথ। কোন ঢাকা-বারান্দা নেই। নিচের যে চাঁদনিটি আছে, তার কার্নিশ বেশ বাঁকানো। এ ধরনের 'চারচালা'মন্দির পশ্চিমবাংলা তথা বাংলাদেশে এক বিশেষ শ্রেণীর 'চারচালা'র সৃষ্টি করেছে।

১০. *ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির* ঃ

ত্রিপুরাসুন্দরীর 'দালান'মন্দিরটি কুলপি থানার কামারের চকের ঈশান কামার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক বাংলা সন ১২৫০-৬০ অর্থাৎ ১৮৪৩-৫৩ খ্রিস্টাব্দ। বোড়ালেও ত্রিপুরাসুন্দরীর একটি বিশেষ ধরনের 'রত্ন' মন্দির আছে। মন্দিরটি নয়টি চূড়াযুক্ত।

১১. *বিশালাক্ষী ও শিবমন্দির, শিবকালীনগর* ঃ

৭ নং লাট শিবকালীনগরে বিশালাক্ষীব বৃহদাকার 'আটচালা'রীতির মন্দির ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠা করেন পূর্বোক্ত ঈশানচন্দ্র কামার। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটির গর্ভগৃহে ছয়ফুট উচ্চতার পেতলের চতুর্ভুজ দেবীমূর্তি অধিষ্ঠিত। এর পশ্চিমদিকে একটি পূর্বমুখী 'আটচালা'মন্দির ঈশানেশ্বব শিবের। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (খ্রি ১৯২৭) ঈশানচন্দ্রের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করেন।

১২. *রাধাবল্লভের মন্দির, খাড়ি* ঃ

'আটচালা'শৈলীর বাধাবল্লভের মন্দির মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে অনুমান। খাড়ি বহুকাল আগে থেকে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

১৩. *বিশ্বেশ্বর ও রুদ্রেশ্বর শিবমন্দির, বেলপুকুর* ঃ

বিশ্বেশ্বরের 'আটচালা' মন্দির জয়নগরের জমিদারের নায়েব সদাশিব পাত্রের পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ বাংলা ১২৮৯ সালে (খ্রি. ১৮৮২) প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগাত্রে অনেক 'টেরাকোটা' আছে।

১৪. *নন্দিকেশ্বর মন্দির, বারুইপুর* ঃ

এখানে 'দালান' মন্দিরে নন্দিকেশ্বর শিব অধিষ্ঠিত। এখানে বারুইপুর কলেজের কাছে সামনে জোড়া 'আটচালা' শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণমুখী প্রথম মন্দিরটি নাবায়ণীশ্বরের, উত্তরমুখী দ্বিতীয় মন্দিরটি রামনাথেশ্বরেব। প্রবেশপথের ওপরে সাদা মারবেল পাথরের দু'টি ফলকে খোদিত লিপি ঃ

১. নেত্রযুগাব্ধিতারেশ শাকে
ইদং মন্দিরং কৃতং নারায়ণীশ্ব
রস্য শ্রীকালীচরণ শর্ম্মণা।

২. ত্রিযুগাব্ধিন্দু শাক্যেত্র
নির্ম্মিতমন্দির সুভং রামনাথেশ্ব

অর্থাৎ নেত্র = ৩, যুগ = ৪, অব্ধি = ৭, তারেশ = ১ বা ১৭৪৩ শকাব্দে (খ্রি. ১৮২১) শ্রীকালীচরণ শর্মা এই নারায়ণীশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। দ্বিতীয়টির অর্থও এই একই।

১৫. *গৌরনিতাই মন্দির, আটিসারা ঃ*

বারুইপুরের পুরানো বাজারের কাছে একটি মন্দিরে গৌর-নিতাইয়ের দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। সেখানে চৈতন্যদেবের পদচিহ্নও বর্তমান। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' বলা হয়েছে, মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে আদিগঙ্গার ধারে আটিসারায় সারারাত হরিনাম-সংকীর্তন করেন।

১৬. *দ্বাদশ 'আটচালা' শিবমন্দির, জয়নগর, মিত্রপাড়া ঃ*

১ জয়নগরের জমিদার রামগোপাল মিত্রের পৌত্র কামদেব মিত্র আগে যেখানে আদিগঙ্গার প্রবাহ ছিল, সেই মিত্রগঙ্গার তীরে দ্বাদশ শিবমন্দিরের প্রথম মন্দিরটি ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তাঁর অন্যান্য বংশধর একটি একটি করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলির মধ্যে একটি 'নবরত্ন', অন্যগুলি 'আটচালা' রীতির। কোন কোন মন্দিরে টেরাকোটা ফলক ও কিছু মূর্তি চোখে পড়ে। একটি দোলমঞ্চও বর্তমান। 'আটচালা' মন্দিরগুলির ওপরের চারচালাটি কতকটা খাড়া চারচালা। কিন্তু নিচের 'চারচালা'গুলিতে ঢালু ও বক্রভাব প্রকটিত।

২. জয়নগরে রাধাবল্লভের 'চাঁদনি' ও একটি দোলমঞ্চও আছে। প্রতিষ্ঠা করেন জয়নগরের মিত্রদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণমোহন মিত্র।

৩ জয়নগর পৌরসভার শেষপ্রান্তে দুর্গাপুরে শ্যামসুন্দরের একটি বিশাল 'আটচালা' মন্দির আছে। এখানে দারুমূর্তি শ্যামসুন্দর। দোলমঞ্চও একটি আছে।

৪. এখানের উত্তরপাড়ার বাসুদেবমন্দিরটি 'দালান'-রীতির। বাসুদেব বিষ্ণুনারায়ণ মূর্তিটি বেশ প্রাচীন, পালযুগের বলে অনুমান করা যায়।

১৭. *বৈদ্যনাথশিবের 'আটচালা', মজিলপুর-ভট্টাচার্যপাড়া ঃ*

বৈদ্যনাথ তর্কপঞ্চানন নামে এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এখানে বৈদ্যনাথের একটি 'আটচালা' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৩৭ শকাব্দ বা ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকে যে সংস্কৃত লিপিটি আছে, সেটি এখানে দেওয়া হল ঃ

ধীরৈ র্গঙ্গাজলৈঃ কদম্ববিটপৈরাম্রৈঃ পলাশৈ র্দ্বিজৈ
শ্ছাত্রৈ র্দৈবগৃহে মার্জ্জুলপুরে উমানাথালয়ং নির্ম্মমে।
শাকে সিন্ধু শিবাক্ষিসাগরধরামানে হিরূশিল্পিনা।
কাশীনাথপদারবিন্দ মধুলিট্ শ্রীবৈদ্যনাথদ্বিজঃ।।

সিন্ধু = ৭, শিবাক্ষি = ৩, সাগর = ৭, ধরা = ১ অর্থাৎ ১৭৩৭ শকাব্দ বা ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ প্রতিষ্ঠাকাল। মজিলপুর সেকালে সংস্কৃত শিক্ষার এক প্রসিদ্ধ 'বিদ্যাস্থান' ছিল। অনেক সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম ওয়ার্ডের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায়, এখানে সেসময় প্রায় কুড়িটির মতো টোল ছিল।

২. মজিলপুর-ভট্টাচার্যপাড়ায় অন্য একটি 'আটচালা' শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন উক্ত বৈদ্যনাথ তর্কপঞ্চাননেরই বংশধর চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য।

৩. এখানে আর একটি 'আটচালা' শিবমন্দির স্থাপন করেন কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত।

১৮. *বৈদ্যপুর নলপুকুরের 'আটচালা' শিবমন্দির* ঃ

মন্দিরটি আটচালা রীতির হলেও এর ওপরের 'চারচালা'টি খুবই ক্ষুদ্র। একটিমাত্র প্রবেশপথ, যা সচরাচর 'আটচালা' মন্দিরে দেখা যায় না।

১৯. *মদনগোপাল মন্দির, ডায়মণ্ডহারবার* ঃ

এখানে শারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত মদনগোপালের 'আটচালা' মন্দিরটি উচ্চ। ওপরের 'চারচালা' শিখরটি খুবই ছোট। চালগুলি ঢালু হলেও অর্ধচন্দ্রাকৃতি। মন্দিরটির সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথ ও আটকোণা থামযুক্ত ঢাকা বারান্দা বর্তমান।

২০. *হরিহরধাম, টালিগঞ্জ* ঃ

টালিগঞ্জ আদিগঙ্গার পূর্বে বাওয়ালির মণ্ডলপরিবারের প্যারীলাল মণ্ডল ১২৫৩ বঙ্গাব্দ বা ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে হরিহরধাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে 'আটচালা' দ্বাদশ শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য।

২১. *সীতারাম মন্দির, গোপালনগর* ঃ

গোপালনগরে সীতারামের ইঁটের তৈরি 'আটচালা'শৈলীর মন্দির দীর্ঘকাল ধরে খুবই জরাজীর্ণ ও গাছ-গাছালিতে পূর্ণ। 'আটচালা'র চালগুলি বেশ ঢালু এবং কার্নিশ বক্রাকৃতি। এর মধ্যে বাংলার খড়ের চালাব ভাব খুবই পরিস্ফুট হয়েছে। চালের ছাঁচা দেওয়াল থেকে অনেকটা প্রসারিত। মন্দিরের সামনে একটিমাত্র প্রবেশপথ। খুবই জরাজীর্ণ এই মন্দিরটি কমপক্ষে খ্রিস্টীয় আঠার শতকে নির্মিত। কোন টেরাকোটা অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় না। মন্দির বহুকাল পরিত্যক্ত।

২২. *রাধাকৃষ্ণের 'আটচালা' মন্দির, গোকুলনগর* ঃ

এটি একটি সুদৃশ্য অতি জীর্ণ 'আটচালা' ইঁটের মন্দির। বহুকাল পরিত্যক্ত। চালের ঢালুভাব ও বক্রাকার কার্নিশ প্রাচীন 'আটচালা'গুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। এটির সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথযুক্ত ঢাকা বারান্দা আছে। বৃক্ষসঙ্কুল এই মন্দিরের ইঁটের গড়ন লক্ষ্য করে এটি অন্তত খ্রিস্টীয় আঠার শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়।

২৩. *বাওয়ালির ঠাকুরবাড়ি* ঃ

ডায়মণ্ডহারবারের দিকে আমতলা থেকে বাওয়ালি মোড়ের কাছে 'শখের বাজার' পেরিয়ে এখানে আসা যায়। এখানে প্রাচীন জমিদার মণ্ডল-পরিবারের প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মন্দির আছে।

ঠাকুরবাড়ি চত্বরে অনেকগুলি জীর্ণ ভগ্ন প্রায়বিধ্বস্ত মন্দির, রাসমঞ্চ, আবাসগৃহ, জলটুঙি, নাটমন্দির প্রভৃতি বর্তমান। এই স্থান উক্ত পুরাকীর্তিগুলির জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মণ্ডল-পরিবারের গোপীনাথের উচ্চ 'নবরত্ন' মন্দিরটি প্রাচীন 'নবরত্ন'শৈলীর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর সঙ্গে টালিগঞ্জের ওই একই মণ্ডল-পরিবারের প্রতিষ্ঠিত 'নবরত্ন' এবং দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর 'নবরত্ন' তুলনীয়। তবে বাওয়ালির এই গোপীনাথের 'নবরত্ন' আরও প্রাচীন। মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, এই মন্দির ১২০১ বঙ্গাব্দ বা ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে মণ্ডলবংশের মানিক মণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন।

ত্রিতল এই মন্দিরের চূড়া বা রত্নগুলি প্রথাগত শৈলীর খাঁজকাটা দেউলরীতির, যা মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলিতে বেশি দেখা যায়।

এই 'নবরত্নে'র সামনে যে নাটমন্দিরটি আছে, তার চারদিকে অনেকগুলো খিলানদ্বার বর্তমান। দক্ষিণেশ্বর ও তালপুকুরে যে ধরনের নাটমন্দির উন্মুক্ত খিলানদ্বারযুক্ত দেখা যায়। পাশেই রয়েছে বহুচূড় একটি রাসমঞ্চ। সবগুলিই খুবই ভগ্নজীর্ণ ও গাছপালায় ভরা।

মণ্ডলপরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্তের 'আটচালা'-রীতির মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন মণ্ডলবংশের হরানন্দ মণ্ডল ১৬৯৩ শকাব্দে বা ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে। 'কলাগেছ্যা'শৈলীর ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারযুক্ত ঢাকা বারান্দা মন্দিরটির সামনে আছে। এই আটচালাটির ঢালু চাল, বাঁকানো কার্নিশ এবং ওপরে ক্ষুদ্রাকৃতি 'চারচালা' শিখর প্রাচীন প্রথাগত শৈলীর পরিচায়ক। কিছু কিছু টেরাকোটা এই মন্দিরে ছিল। এখনও সামান্য কিছু বর্তমান। বাওয়ালির মণ্ডল-পরিবারের এই মন্দিরগুলি পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২৪. রাধাবল্লভের 'আটচালা', বাখরাহাট ঃ

বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাটে রাধাবল্লভের বিশাল 'আটচালা'-রীতির মন্দির দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক আকর্ষণীয় পুরাকীর্তি। জানা যায়, মন্দিরটি মণ্ডল-পরিবারের এক জ্ঞাতি কৃষ্ণচরণ মণ্ডল বাংলা ১২১৯ সাল বা ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁটের এই মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। মন্দিরগর্ভগৃহে কাঠের সিংহাসনে কালো পাথরের কৃষ্ণ ও পেতলের গোপাল বিগ্রহ অধিষ্ঠিত।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এছাড়াও বহু মন্দির বর্তমান। বেশির ভাগই 'আটচালা'শ্রেণীর। 'রত্ন', বিশেষ করে, 'পঞ্চরত্ন' ও 'নবরত্নে'র সংখ্যা খুবই কম। 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সংখ্যার (২০০০) প্রচ্ছদের তৃতীয় পৃষ্ঠায় সুন্দরবন এলাকায় ইঁটের যে একটি পলেস্তারাবিহীন প্রাচীন মন্দিরের ছবি ছাপা হয়েছে, তা খুবই আকর্ষণীয়। নিচের একটি বৃহৎ 'চারচালা'র ওপর চারপাশ খোলা একটি খাঁজকাটা 'পিঢ়া'রত্ন স্থাপিত। চালাটির ঢালু চাল ও বাঁকানো কার্নিশ লক্ষণীয়। তার কেন্দ্রস্থলে 'পিঢ়া'রত্ন মন্দিরটির অভিনব স্থাপত্যকৌশলের পরিচয় দেয়। সুন্দরবন এলাকায় প্রাচীনকাল থেকে বহু মন্দির একসময় নির্মিত হয়েছিল। ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত উত্তর জটার পূর্বোক্ত দেউল তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

ক. বাংলা

কবিরাজ কৃষ্ণদাস, *চৈতন্যচরিতামৃত*, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লী, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৩

কিশোরীদাস বাবাজী, *শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ-পর্যটন* (দ্বিতীয় সং), হালিসহর, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ

কৃত্তিবাস, *রামায়ণ*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং, কোং, কলকাতা, ১৯৯৪

কুণ্ডু শম্ভুনাথ, *প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৯৬

গঙ্গোপাধ্যায় মনোমোহন, *স্থাপত্যশিল্পের ভূমিকা*, কলিকাতা, ১৯৫৯

গঙ্গোপাধ্যায় কল্যাণকুমার, *বাংলার ভাস্কর্য*, ১৯৪৭, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সুবর্ণরেখা সংস্করণ

গোস্বামী সনাতন (সম্পাদিত), *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্যদেব*, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৮৮

ঘোষ প্রদ্যোত, *মালদা জেলার পুরাকীর্তি*, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭

ঘোষ বিনয়, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, ৩য় খণ্ড, কোলকাতা, ১৯৮০

চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, বসুমতী সংস্করণ, কোলকাতা

চক্রবর্তী দেবকুমার, *বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্তবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭২

চক্রবর্তী রতনলাল, *বাংলাদেশের মন্দির*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৭

চক্রবর্তী রমাকান্ত, *বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম*, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৯৯

চট্টোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র, *দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা*, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭

চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ, ১৯৯০; *সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস*, জিজ্ঞাসা, কোলকাতা, ১৯৭৬

চন্দ রমাপ্রসাদ, *গৌড়রাজমালা*, ১৯৭৫

চট্টোপাধ্যায় গৌতম (সম্পাদিত), *ইতিহাস অনুসন্ধান* ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ফার্মা কে. এল. এম. কোলকাতা

জগবন্ধু কুণ্ডু (সম্পাদিত), *হুগলি জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, সাহিত্য সেতু প্রকাশনী, বাঁশবেড়িয়া, পরিবেশক পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ২০০৩

দাশগুপ্ত পরেশচন্দ্র, *প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা*, অণিমা প্রকাশনী, কোলকাতা

দাস বিবেকানন্দ, *কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিঃ, কোলকাতা, ১৯৯৯

দাস গোপীজনবল্লভ, *রসিকমঙ্গল*, ২য় সংস্করণ, পঃ মেদিনীপুর, গোপীবল্লভপুর, ১৯৪২

দাস সুধীররঞ্জন, *কর্ণসুবর্ণ মহানগরী*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কোলকাতা, অগস্ট, ১৯৯২

নাগরিক পরিষদ, *কৃষ্ণনগর, নদীয়া* (প্রকাশক নদীয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর), স্বাধীনতা

রজতজয়ন্তীবর্ষ, প্রকাশকাল ২৬, জানুয়ারি, ১৯৭৩

বসু যোগেশচন্দ্র, *মেদিনীপুরের ইতিহাস*, ১ম ভাগ, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৮, কোলকাতা (১৯২১ খ্রি.),১ম ও ২য় খণ্ড (২য় সং), সেন ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়কুমার, *বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি*, পূর্তবিভাগ, পঃ বঃ সরকার, ১৯৭১

বাহুবলীন্দ্র প্রণব (সম্পাদিত), *তমলুক পৌরসভা তথ্যপঞ্জী*, ২০০০, তমলুক ২০০০

বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়কুমার, পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ ঃ মুর্শিদাবাদ, ১৯৮২

ব্যানার্জী অমলেন্দু, *প্রত্নতত্ত্বে বিজ্ঞানের প্রয়োগ*, ডেল্টা ফার্মা. বইমেলা ২০০০

ভট্টাচার্য তারাশঙ্কর, *বৃহত্তর গড়বেতার ইতিহাস*, মেদিনীপুর, ১৯৮২

ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ, *হুগলি জেলার পুরাকীর্তি*, *প্রত্নতত্ত্ব অধিকার*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অগস্ট, ১৯৯৩

ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, *বর্ধিষ্ণু বর্ধমান*, ফার্মা কে. এল. এম প্রা লি., কোলকাতা, ১৯৯৮

ভৌমিক শ্যামাপদ, *বৈচিত্র্যময় মেদিনীপুরের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, সুবর্ণরেখা, কোলকাতা, ১৯৯৯; *খড়্গপুরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, কোলকাতা ১৯৯৪

ভৌমিক সুহৃদকুমার, *ঝাড়খণ্ডে মহাপ্রভু*, মারাং বুরু প্রেস, মেছেদা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯৯৪

মজুমদার রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)*, ৭ম সং, ১৯৮১

মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ঘাটাল, *ঘাটাল বর্ষপঞ্জী*, ২০০২

মাইতি প্রদ্যোতকুমার, *সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, তমলুক, ১৯৯৫, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সমাজ ও জীবন*, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, তমলুক, ১৯৯৪ *মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি*, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, তমলুক, ২০০১

মুখোপাধ্যায় সুখময়, *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব*, সাহিত্যলোক, কোলকাতা, জুন, ১৯৮৮

মিত্র সুধীরকুমার, *হুগলী জেলার দেবদেউল*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কোলকাতা, প্রথম অপর্ণা সং, ১৯৯১

মৈত্রেয় অক্ষয়কুমার, *গৌড়লেখমালা* (তারিখ অজ্ঞাত), *গৌড়ের কথা*, সাহিত্যলোক, কোলকাতা, ১৯৯০

রক্ষিত ত্রৈলোক্যনাথ, *তমোলুকের ইতিহাস*

রহিম আবদুর মহম্মদ, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রায় নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা, ২য় সং ১৪০২ বঙ্গাব্দ

রায় পঞ্চানন কাব্যতীর্থ, *দাসপুরের ইতিহাস*, প্রকাশক প্রণব রায়, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ (১৯৫৮ খ্রি.)

রায় প্রণব, *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ*, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬

মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, ৩য় খণ্ড, (সম্পাদিত ও লিখিত) সাহিত্যলোক, কোলকাতা, ২০০২

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, *জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ*, মেদিনীপুর, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জানুয়ারি, ২০০২

শাস্ত্রী হরপ্রসাদ, মহামহোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতম্*

সরকার জগদীশনারায়ণ, *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক* (মধ্যযুগ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কোলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ

সরকার সাধনচন্দ্র, *বৌদ্ধ শিল্প* ও *স্থাপত্য*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৪০৪ (১৯৯৭)

সেন দীনেশচন্দ্র, *বৃহৎবঙ্গ*, ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ১৯৯৩

সেন সুকুমার, ১ *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫;
২ *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী*, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

সুর অতুল, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, জিজ্ঞাসা, বিচিত্রবিদ্যাগ্রন্থমালা, কোলকাতা, ১৯৭৭

খ. ইংরাজি

Ahmed Nazimuddin, *Epic Stories in Terracotta Depicted on Kantanagar Temple, Bangla Desh*, The University Press limited, Dacca, 1990

Banerjee Adris, *Temples of Tripura*, 1968

Bhattasali N.K., *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculpture in the Dacca Museum*

Banerjee Manabendu (ed.), *Essays on Ancient Indian Science and Technology*, Sanskrit Sahitya Parishad, 2003

Bhattacharya Tarapada, *The Canons of Indian Art or A Study on Vastuvidya*, 1963

Bhattacharya Amitabha, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, 1977

Biswas S. S., *Terracotta Art of Bengal*, 1981

Bose Nirmal Kumar, *Canons of Orissan Architecture*, 1932; Indian Temple Designs, Saraswat Library, Calcutta, 1981

Brown Percy, *Indian Architecture* (Buddhist and Hindu) Vol. I, 1971, *Indian Architecture* (Islamic Period) Vol. II, 1975

Govt. of Bengal : *List of Ancient Monuments in Bengal*, Cal, 1896

Chakravarti Ramakanta, *Vaisnavism in Bengal* 1486-1900, Sanskirt Pustak Bhandar, October, 1985

Chatterjee Gouripada, *History of Bagri Rajya, Garhbeta*, 1976

Das Bishnupada, *Some aspects of Socio-Economic changes in South West Frontier Bengal since Introduction of Neo-Vaishnivism*

Das Sudhir Ranjan, *Rajbadi danga*, Chiruti, Jadupur, The Asiatic Society, 1968; *Archaeological Discoveries from Murshidabad*, The Asiatic Society, 1971

Datta Bimal K., *Bengal Temples*, 1975

Dasgupta P. C ,1. *The Archaeological Treasures from Tamralipta*, Tamralipta Museum & Research Centre, Tamluk.
2. *Early Teracottas of Tamralipta*, Calcutta, 1959

Deva Krishna. *Temples of North India*, National Book Trust, 1969

Havell E.B., *The Ancient and Mediaeval Architecture of India*, Reprint. 1972

Haque Julekha, *Terracotta Decorations of late Mediaval Bengal Portrayal of a Society*, The Asiatic Society of Bangla Desh, 1980

Khan Sahib, M. Abid ali Khan, *Memoirs of Gaur and Pandua*, The Department of Information and Cultural Affairs, Government of West Bengal, Reprint, 1986

Kundu Kamal Kumar, *Sutradharas of Bengal*, New Delhi, 2002,

Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, *Temples of India*, Second Reprint, 1990

McCutchion David, *Late Mediaeval Temples of Bengal - Origins and Classifications*, The Asiatic Society, Calcutta, 1972

Michell George ed. *Brick Temples of Bengal from the Archives* of David McCutchion , Princeton University Press, New Jersey, 1983, *The Hindu Temple*, London, 1977

Majumder R.C., *History of Ancient Bengal*, 1971

Maity Pradyot Kumar, 1. *Some Aspects of Indian Culture*, Purvadri Prakashani, Tamluk, 1989

2. *The Goddess Bargabhima. A Socio Cultural Study*

3 *A Historical Study in the Cult of the Goddess Manasa A Socio-cultural Study*, Calcutta

4. *Folk Rituals of Bengal*

History-Famed Tamluk Through The Ages, Purvadri Prakashani, 2000

Mandal P.K., *Interpretation of Terracottas from Tamralipta*, Tamralipta Museum and Research Centre, Tamluk, 1987

Mukherjee B.N., *Kharosti and Kharosti-Brahmi Inscriptions in West Bengal* (India), Calcutta, 1990

O'Malley L.S S., *Bengal District Gazetteers, Bankura*, Govt. Of West Bengal, Reprint, 1995

Sanyal Hitesh Ranjan, *Social Mobility in Bengal*, Calcutta, 1981

Saraswati S. K., *Early Sculpture of Bengal*, 1962

Architecture of Bengal, Book I, 1976

Sen Tulika (ed.), *Nirmal Kumar Bose, Life, Works and Vision*, The Asiatic Society, 2003

Stella Kramrisch, *Indian Sculpture*

গ. নির্বাচিত প্রবন্ধ ঃ বাংলা

বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস, 'মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ', বিনয় ঘোষের *'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'* তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত, ১৯৮০, বাণী, ১৩১২ ব.

রায় প্রণব, ১. পুরাকীর্তি (নদীয়া জেলা), দীর্ঘ প্রবন্ধ, কৃষ্ণনগর নাগরিক পরিষদ কর্তৃক স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে *'নদীয়া'* গ্রন্থে প্রকাশিত, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৩

২. মন্দিরময় মেদিনীপুর (ধারাবাহিক প্রবন্ধ, *মেদিনীপুব বার্তা*, মে ১৯৭৫-জুন ১৯৭৬)
৩. মেদিনীপুর জেলার মন্দির স্থাপত্য (*ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মেদিনীপুর, ১৯৭৪)
৪. বাংলার মন্দির স্থাপত্য ভাস্কর্যে অনুসৃত রীতি, *বিশ্ববাণী*, রামকৃষ্ণ বোদান্তমঠ, কোলকাতা, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
৫. মেদিনীপুর জেলার মন্দির স্থাপত্যে উৎকলীয় প্রভাব, *বসুধা*, কুলটিকরি (পঃ মেদিনীপুর), ২য়-৩য় যুগ্ম সংকলন, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ
৬. লোকায়ত বাংলামন্দির, *হুগলি মহসীন কলেজ পত্রিকা*, চুঁচুড়া, হুগলি, ১৯৭৪
৭. বাংলার মন্দির ঃ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে, *দিবাকর*. হুগলি, শারদ সংখ্যা, ১৯৭৬
৮. বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি, *ভূমিলক্ষ্মী*, ৯ বৈশাখ, ১৩৮৪ ব.
৯. মন্দিরটেরাকোটায় চণ্ডী উপাখ্যান, *ভূমিলক্ষ্মী*, ১৯ আশ্বিন, ১৩৮৫ ব.
১০. বাংলার মন্দিরভাস্কর্যে দেবী দশভূজা, রবিবাসরীয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২২ আশ্বিন, ১৩৭৯ ব.
১১. বিষ্ণুপুরমন্দিবের পোড়ামাটিসজ্জা, '*দেশ*', ১৮ মার্চ, ১৯৭৮
১২. বাংলা মন্দিরস্থাপত্য ও হুগলি জেলার দুই মন্দির ঃ হংসেশ্বরী ও যণ্ডেশ্বব, *যণ্ডেশ্বর স্মরণিকা*, চুঁচুড়া, ১ বৈশাখ, ১৩৮৬ ব.
১৩. মেদিনীপুর জেলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, *চতুরঙ্গ*, কোলকাতা, শ্রাবণ আশ্বিন, ১৩৮৭ ব.
১৪. মন্দিরলিপিতে ইতিহাস ও সমাজচিত্র, '*চতুরঙ্গ*', কোলকাতা, কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৮৮ ব.
১৫. মেদিনীপুবের মন্দিরশিল্প, '*বেতার জগৎ*', ১৬-৩০ এপ্রিল, ১৯৮১
১৬. পুরাতত্ত্বের আলোকে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি স্থান, '*মাধবী*', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মেদিনীপুর, ১৩৮৮ ব.
১৭. মন্দিরগড়ার বিশ্বকর্মা ঃ সূত্রধর সম্প্রদায়, '*পশ্চিমবঙ্গ*', ২৫ নভেম্বর, ১৯৮৩
১৮. হুগলির মন্দির ও তার অলংকবণ, ১ম পর্ব, '*যারা যাযাবর*', কোলকাতা, শারদীয়া সংখ্যা, সেপ্টেম্বর - নভেম্বর (৫ম), ২০০২
১৯ হুগলিব মন্দির ও তাব অলংকরণ (শেষ পর্ব), বসন্ত সংখ্যা, '*যারা যাযাবর*', কোলকাতা, মার্চ-মে, ২০০৩ (৭ম)
২০. শ্রীচৈতন্য ও বাংলার নব মন্দির শিল্প ভাবনা, '*গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্য*' গ্রন্থে প্রকাশিত সম্পাদনা সনাতন গোস্বামী, ১৩৮৮ ব. ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কোলকাতা
২১ ৩৬৮ অব্দের নব আবিষ্কৃত খণ্ডিত মাধবপুব শিলালেখ (ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহযোগে), '*বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*' কোলকাতা, ৯৫ বর্ষ, ১ম - ২য় সংখ্যা
২২. বাঙালির স্থাপত্যচর্চা ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ, '*ইতিহাস অনুসন্ধান*'১৩ (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ), ফার্মা কে এল. এম প্রা. লি., কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৯০-১০৮
২৩. মধ্যযুগের বাংলায় 'টেরাকোটা' শিল্পের নতুন ধারা, '*ইতিহাস অনুসন্ধান*' ১৪, ২০০০, ঐ, পৃ. ১৮৪-১৯১
২৪. শোভাসিংহ ও সমকালীন নথিপত্র, 'ইতিহাস অনুসন্ধান', ১৫, ২০০১, ঐ, পৃ. ২৮২-২৯৬
২৫. বাংলার মন্দিরলিপি ঃ মধ্যযুগ, '*ইতিহাস অনুসন্ধান*', ১৭, ২০০৩, পৃ. ১৪০-১৫২
২৬. হুগলি ঃ প্রত্নসম্পদ, '*হুগলী জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*' (গ্রন্থে প্রকাশিত, পৃ. ১৫৪ -১৭৮, সাহিত্য সেতু প্রকাশনী, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি ২০০৩

২৭. 'বাহান্নবাজার তিপান্নগলি'র শহর চন্দ্রকোণা', '*আজও অন্বেষণ*', বার্ষিক সংকলন, খড়্গপুর, অক্টোবর, ২০০২

২৮. পুরাকীর্তি, *ঘাটাল বর্ষপঞ্জী*, ২০০২, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ঘাটাল ২০০৩- এ প্রকাশিত, পৃ. ১১৭-৩১

২৯. মেদিনীপুরের মন্দিরসূত্রধর, '*প্রকৃত অঙ্গীকার*', শারদীয় ১৪১০ ব., ঘাটাল, পৃ. ১০০-০৯

৩০. মন্দিরস্থাপত্য সমীক্ষা, '*মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন*' ৩য় খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত, কোলকাতা, ২০০২

ম্যাককাচ্চন ডেভিড, 'বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ, '*পশ্চিমবঙ্গ*', ৭ই জুলাই, ১৯৭২ ঢাকার 'সাহিত্যপত্রে ব ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ আষাঢ় সংখ্যায় পূর্ব-প্রকাশিত

সরস্বতী সরসীকুমার, 'পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকলা', বিনয় ঘোষ রচিত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে (১৯৮০) প্রকাশিত

সাহা প্রভাতকুমার, 'মুর্শিদাবাদ জেলার মন্দিরস্থাপত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ', '*ইতিহাস অনুসন্ধান* ১২, পৃ. ২৫৩-২৬২, ফার্মা কে. এল. এম. ১৯৯৮

ঘ. প্রবন্ধ ঃ ইংরাজি

Mukherjee B.N. and Ray P. (Ray Pranab), Madhavpur Fragmentary Inscription of the year 368. *Indian Museum Bulletin*, Calcutta, 1991. vol. XXVI

Chakravarti, Manomohan, 1. Bengali Temples and their General Characteristics, *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, New Series vol. V, 1909 May.

2 Geography of Orissa in the Sixteenth Century (*J A.S.B.*, vol. 12, 1916)

McCutchion David, 1. Pinnacled Temples of Bengal, Quest

2. Notes on Some Representative Temples of Midnapore district, *District Census Handbook, Midnapore*, 1961. vol.I

3. Temples of Midnapore and Bankura ('*Welcome to India*'), S.W. Railway Magazine, vol. IX, Nos. 89, Aug-Sep. 1966

N.V.Malyyya,Nagara Dravida, Vesara, *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, vol. 9, 1941

4. The Temples Calcutta. *Bengal Past and Present*. Jan. - June, 1968

5. The Temples of Birbhum, The Viswa Bharati Quarterly, vol. 31, No. 4 -

Ray Pranab, 1. Tradition of Temple Builders of Midnapur, *Journal of the Asiatic Society*, Calcutta, vol. XXIII, 1981

2. Temple Architecture and Art in South-Western Bengal *Journal*

of the Asiatic Society, 1985, vol. I

3. Earth Shrines for Celestial Beings : Vishnupur's Terracotta Temples, *The India Magazine*, New Delhi, January, 1984

4. Hamseswari Temple at Bansberia: A novel attempt to Bengali Temple Style, '*Srigurubani*, Srirampur-Chatra', Hooghly, 29 Agrahayana, 1386 B.S.

5. Concept of Ancient Indian Architecture in Sanskrit Texts, *Essays on Ancient Indian Science and Technology* ed. Professor Manabendu Banerjee, Sanskrit Sahitya Parisad, Kolkata, January, 2003

6. Study of Temple Architecture and Professor Nirmal Kumar Bose, *Nirmal Kumar Bose. Life, Works and Vision*, ed. Tulika Sen, The Asiatic Society, Kolkata

7. Temple Architecture of Bengal. *Proceedings of the Indian History Congress*, Section II, 62nd Session, Bhopal, 2001

8. Rebel Zamindar Sobha Singh and some contemporary Records', Proceedings of the I H C, Millennium Session 2000

Saraswati S.K., 1. Temples of Bengal. *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, vol. II, 1934

2. Temple Architecture in the Gupta Age (*JISOA*, vol. VIII, 1940)

3. The Begunnia Group of Temples (*JISOA*, vol. I, 1933)

4. Indo-Muslim Architecture of Bengal (*JISOA*, vol. 9, 1941)

5. Origin of Mediaeval Temple Styles (*Indian Culture*, vol. 8, 1941-42)

S. Krishnaswami Aiyangar, Nagara, Vesara. Dravida etc. (*JISOA*, vol III, 1934)

Sanyal H.R., 1. Temple Promotion and Social Mobility. History and Society, *Essays in Honour of Nihar Ranjan Ray*, Cal, 1978

2. Religious Architecture in Bengal (15th-17th Century): A study of the Major trends, *Journal of Indian Anthropological Society* 5, 1970

3. Continuity and Social mobility in traditional and modern Society in India : Two case study of caste mobility in Bengal, *Journal of Asian Studies*. February. 1971

4. Social mobility in Bengal - its sources and contents, *Journal of Historical Research*, vol. 2, No. 1 July, 1975

নির্ঘণ্ট

ই

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ঝ

ট

প

ফ

য

ল

শ

ষ

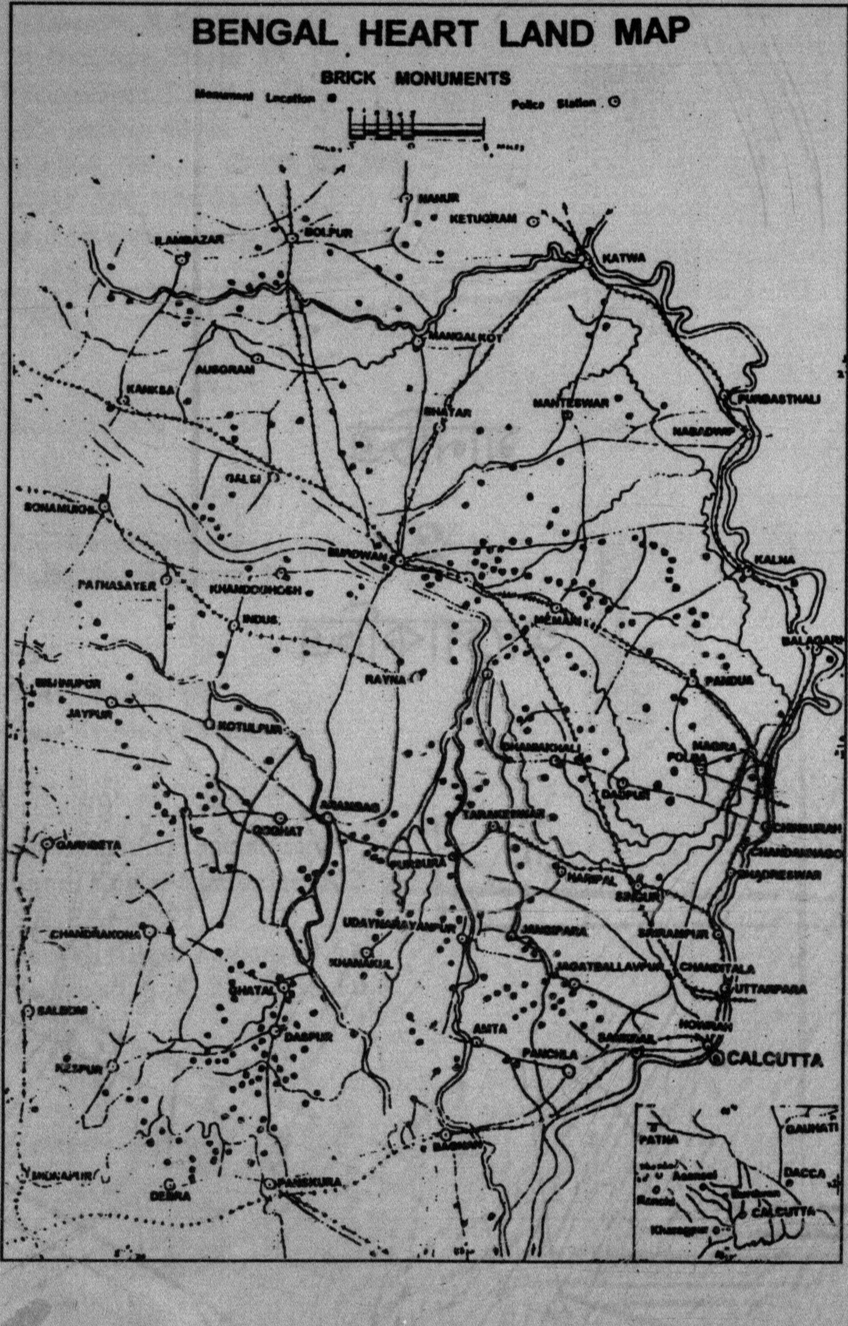
স

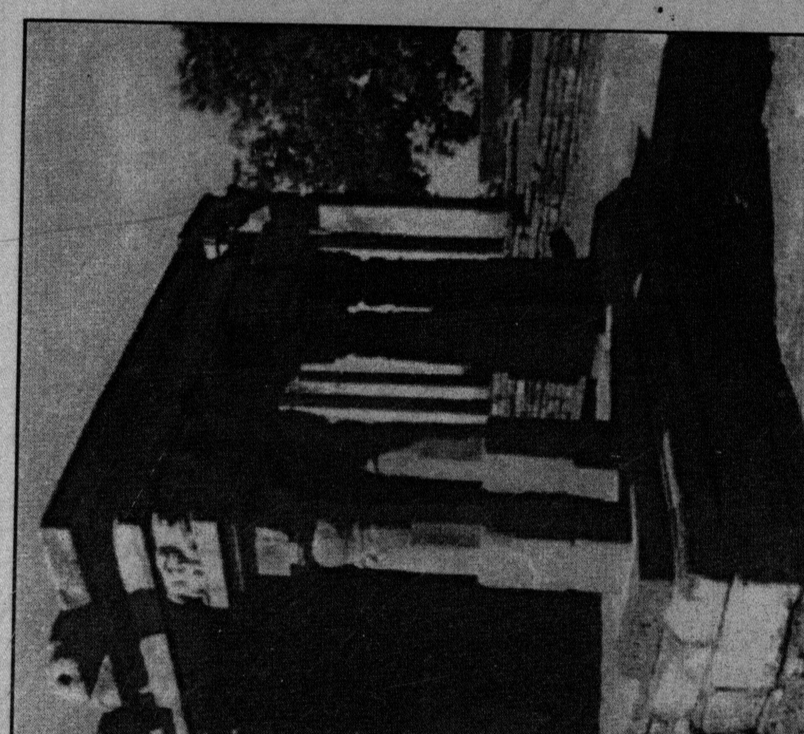
হ

মানচিত্র

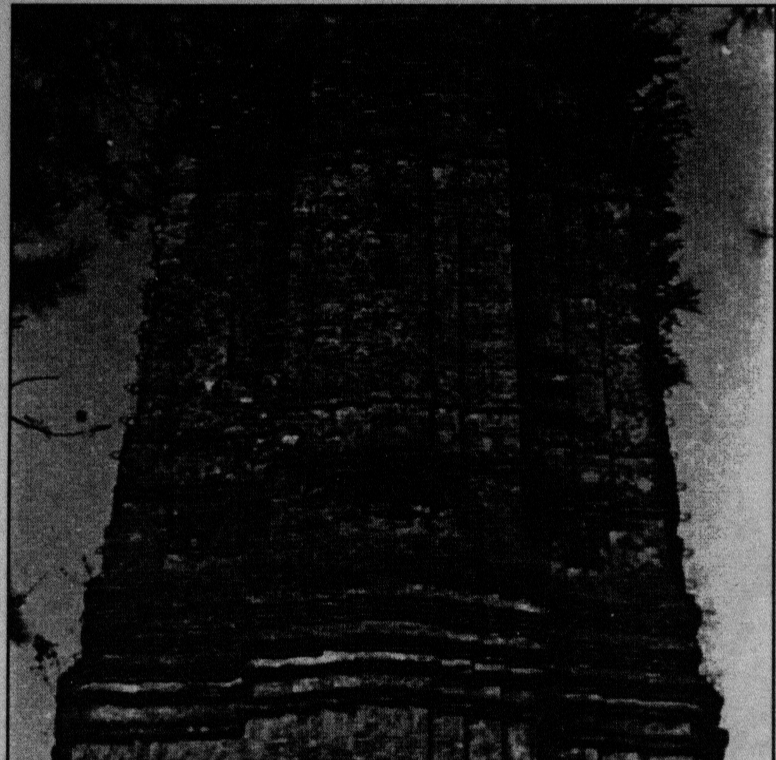
ও

আলোকচিত্র

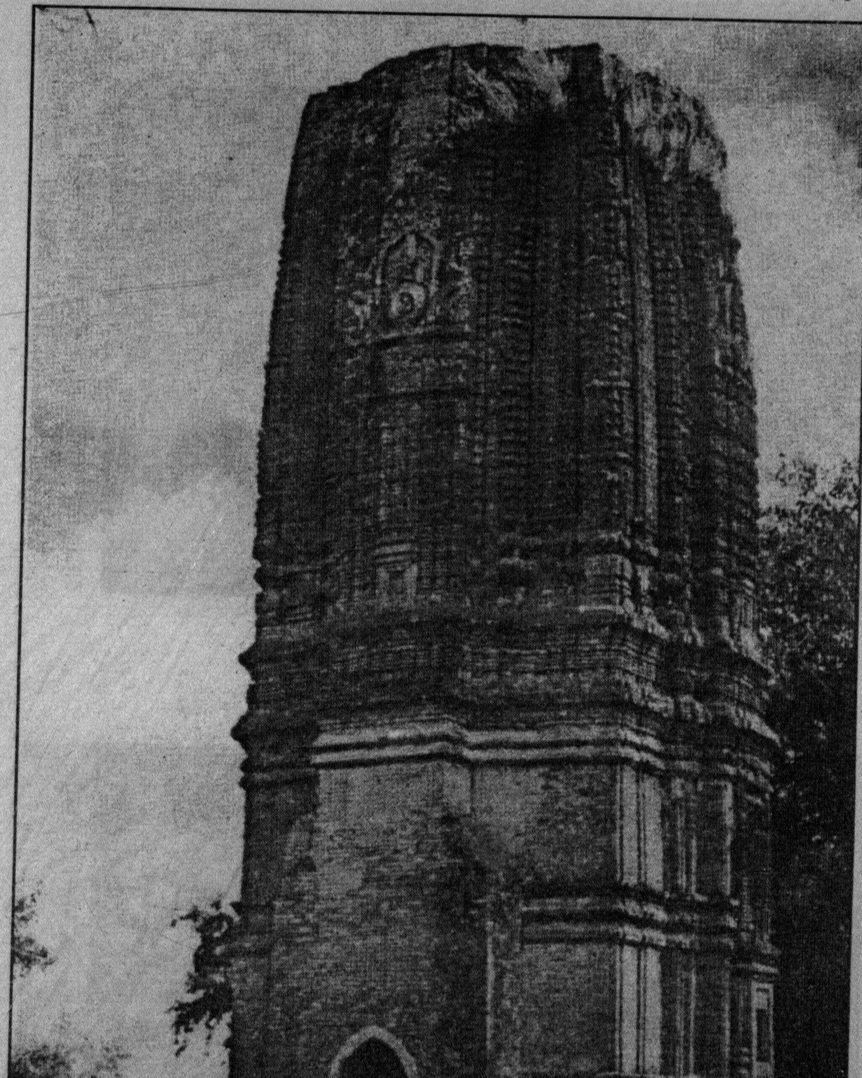

BENGAL HEART LAND MAP
BRICK MONUMENTS
Monument Location
Police Station
NANUR
KETUGRAM
BOLPUR
ILAMBAZAR
KATWA
MANGALKOT
AUSGRAM
KANKSA
PURBASTHALI
MANTESWAR
BHATAR
NABADWIP
GALSI
SONAMUKHI
BURDWAN
KALNA
PATRASAYER
KHANDOGHOSH
INDUS
MEMARI
BALAGARH
RAYNA
PANDUA
BISHNUPUR
JAYPUR
KOTULPUR
DHANIAKHALI
POLBA
ARAMBAG
TARAKESWAR
CHINSURAH
GARHBETA
GOGHAT
PURSURA
HARIPAL
CHANDERNAGORE
BHADRESWAR
SINGUR
UDAYNARAYANPUR
CHANDRAKONA
MANSPARA
SERAMPUR
KHANAKUL
JAGATBALLAVPUR
CHANDITALA
GHATAL
UTTARPARA
SALBONI
DASPUR
AMTA
HOWRAH
PANCHLA
SANKRAIL
CALCUTTA
KESPUR
BAGNAN
PANSKURA
DEBRA
MIDNAPUR
PATNA
GAUHATI
DACCA
CALCUTTA



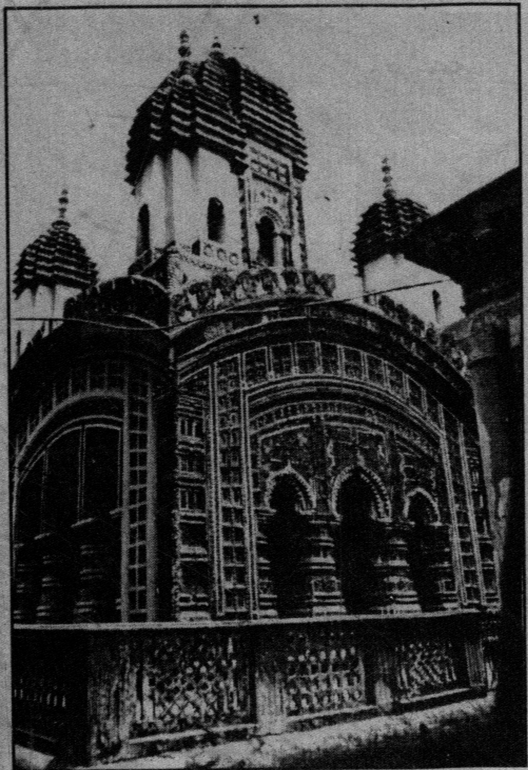
সাঁচির (মধ্যপ্রদেশ) গুপ্তযুগের দালান (বাংলার শেষ মধ্যযুগের 'দালান' ও 'চাঁদনি' মন্দিরের অতি প্রাচীন পূর্বরূপ), (আ. খ্রি. ৫ম-৬ষ্ঠ শতক) (পৃ. ৩৮)



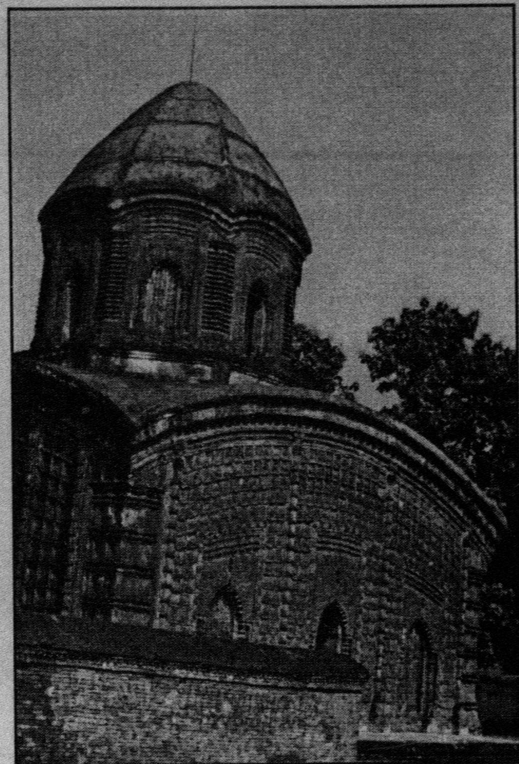
উত্তর জটার প্রাক মুসলিমযুগের দেউল, মথুরাপুর (দ. ২৪ পরগনা),
(ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত), (৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ) (পৃ. ৩৬৯)



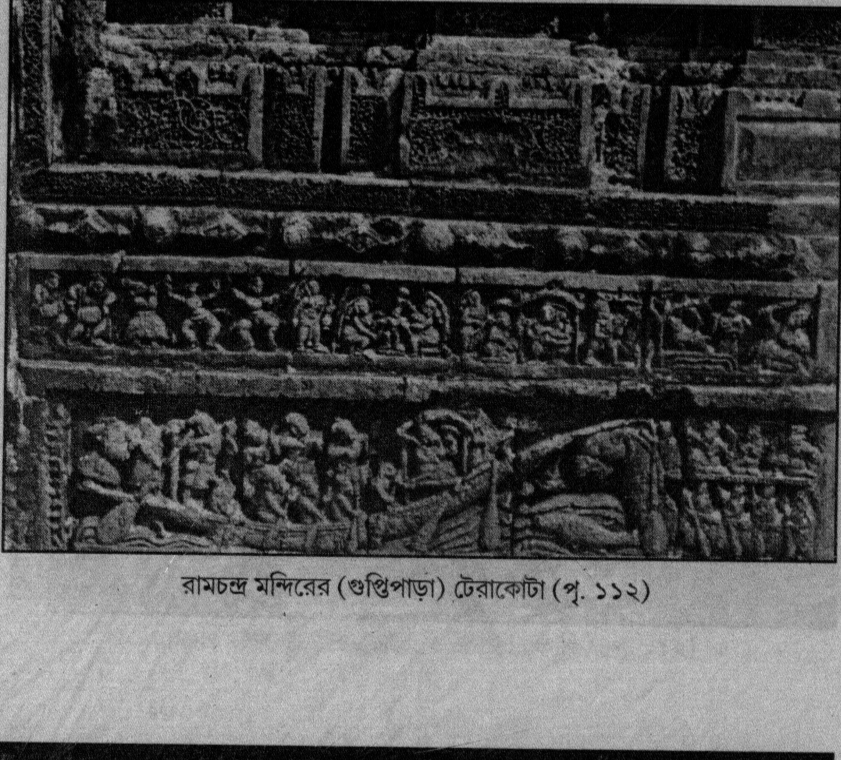
সিদ্ধেশ্বর শিবের দেউল (প্রাক-মুসলিম যুগ), বহুলাড়া, বাঁকুড়া,
আ. খ্রি. ১১ শতক (পৃ. ৬৭)



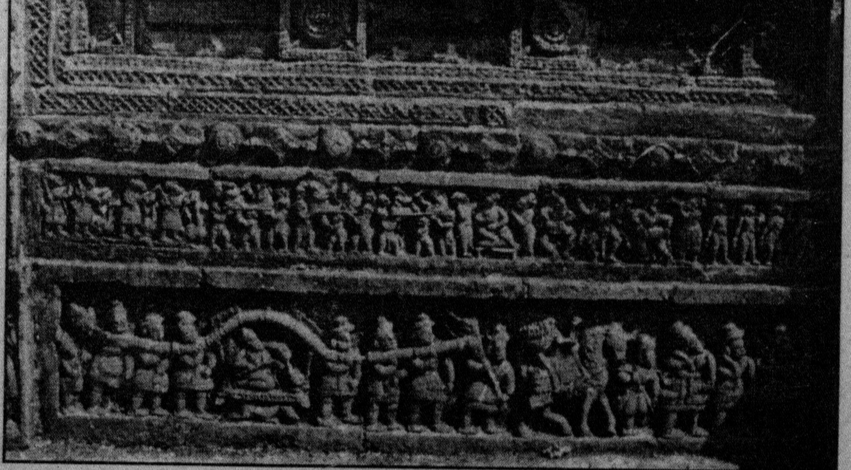
গোপীনাথের 'পঞ্চরত্ন' (১৭২৯ খ্রি.) দশঘরা, হুগলি
(পৃ. ১১০)



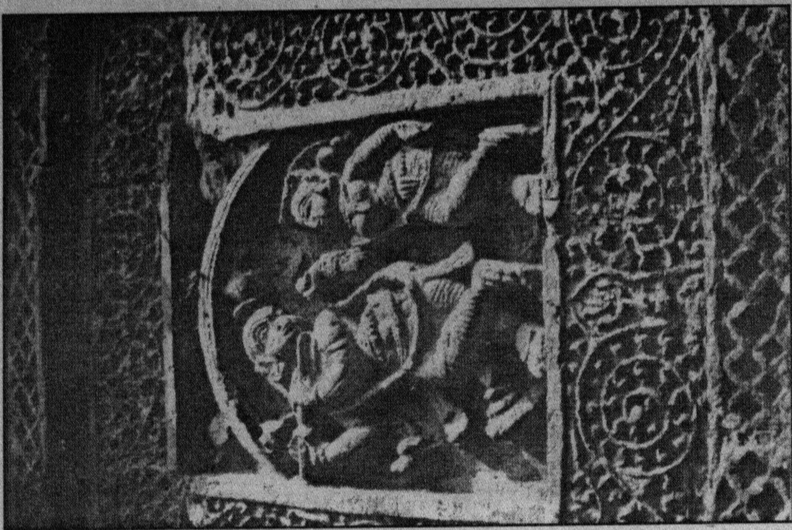
রামচন্দ্রের 'একরত্ন' (আ. ১৭শতক), গুপ্তিপাড়া (হুগলি)
(পৃ. ১১১)



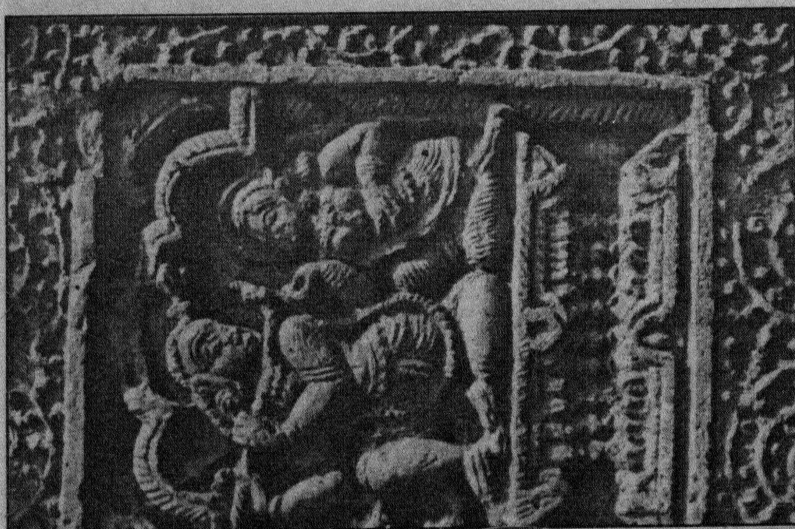
রামচন্দ্র মন্দিরের (গুপ্তিপাড়া) টেরাকোটা (পৃ. ১১২)



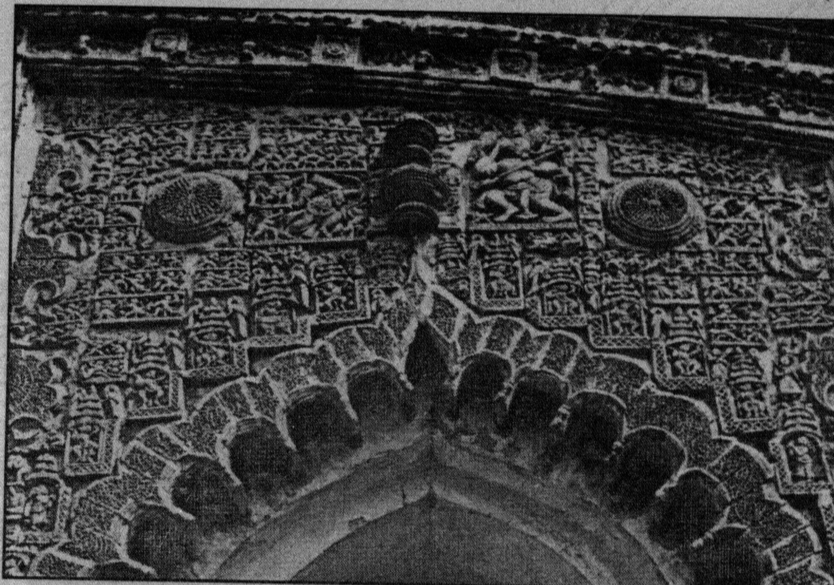
রামচন্দ্র মন্দিরের (গুপ্তিপাড়া) টেরাকোটা (পৃ. ১১২)



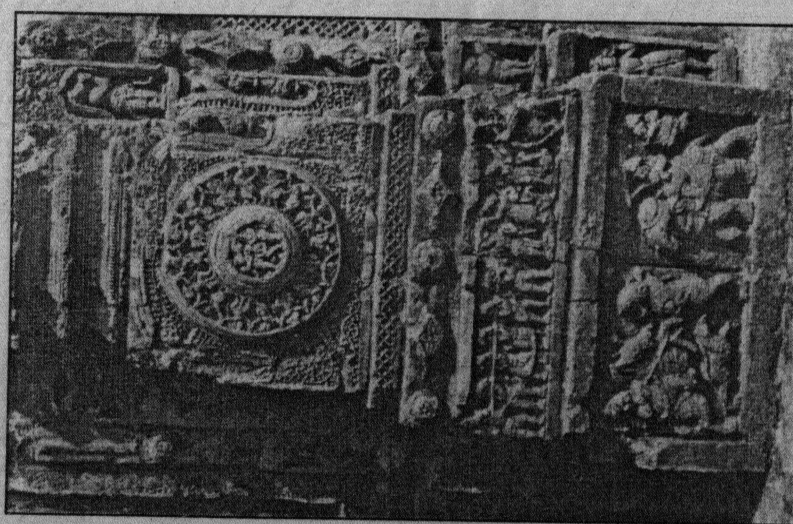
রামচন্দ্র মন্দিরের (গুপ্তিপাড়া) টেরাকোটা (পৃ. ১১২)



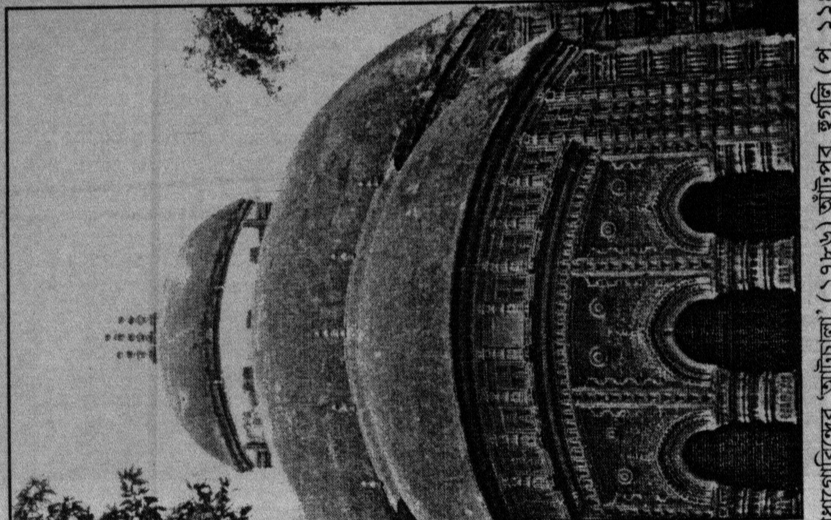
রামচন্দ্র মন্দিরের (গুপ্তিপাড়া) টেরাকোটা (পৃ. ১১২)



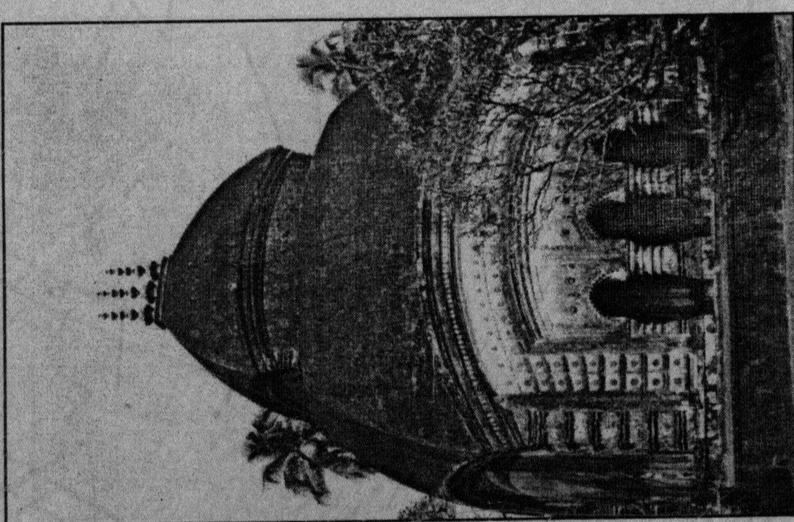
রামচন্দ্র মন্দিরের 'টেরাকোটা', গুপ্তিপাড়া (হুগলি) (পৃ. ১১২)



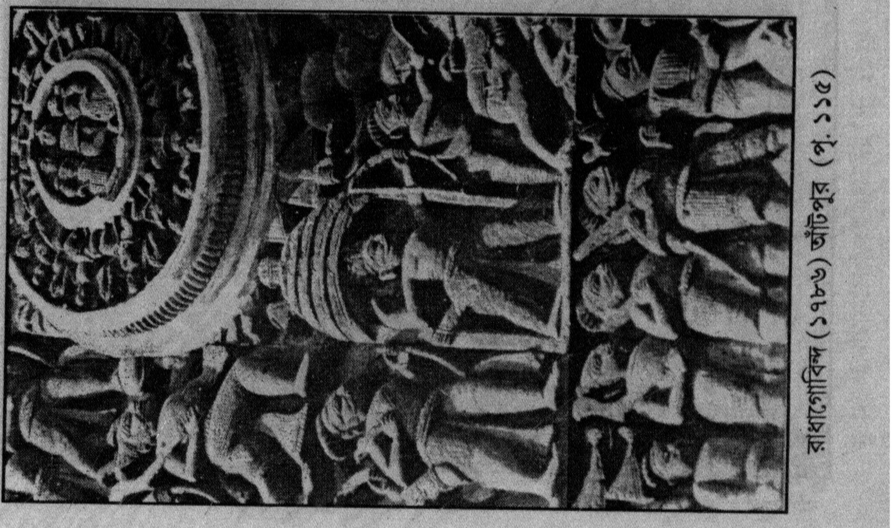
রামচন্দ্র মন্দিরের (গুপ্তিপাড়া) টেরাকোটা (পৃ. ১১২)



রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' (১৭৮৬) আঁটপুর, হুগলি (পৃ. ১১৪)



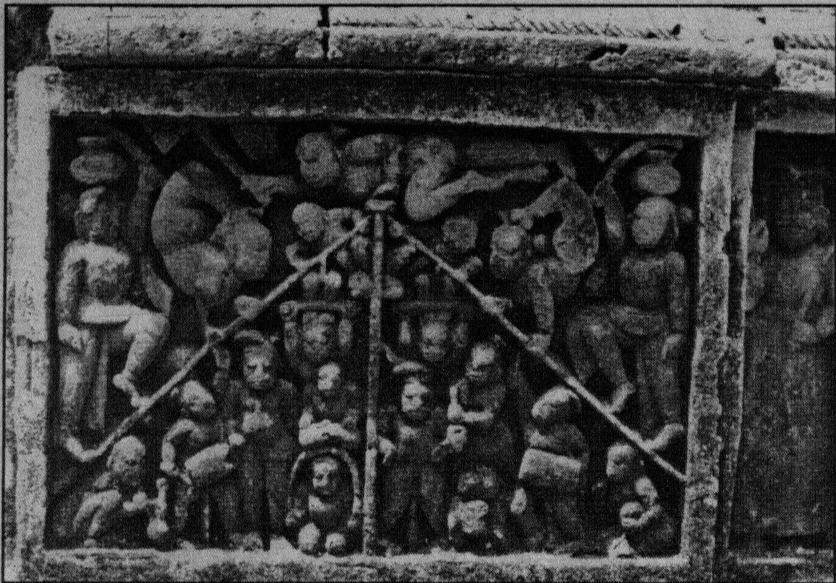
বৃন্দাবনচন্দ্রের 'আটচালা' গুপ্তিপাড়া (পৃ. ১১২)



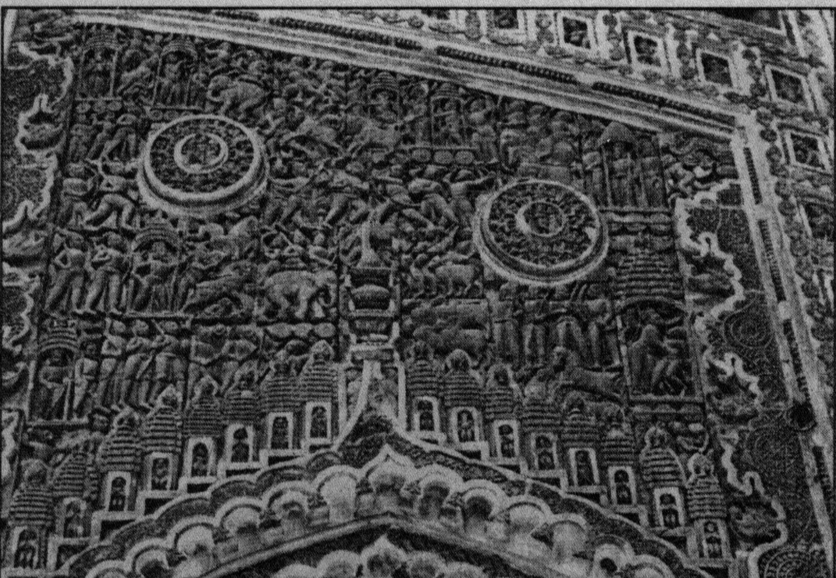
রাধাগোবিন্দ (১৭৮৬) আঁটপুর (পৃ. ১১৫)



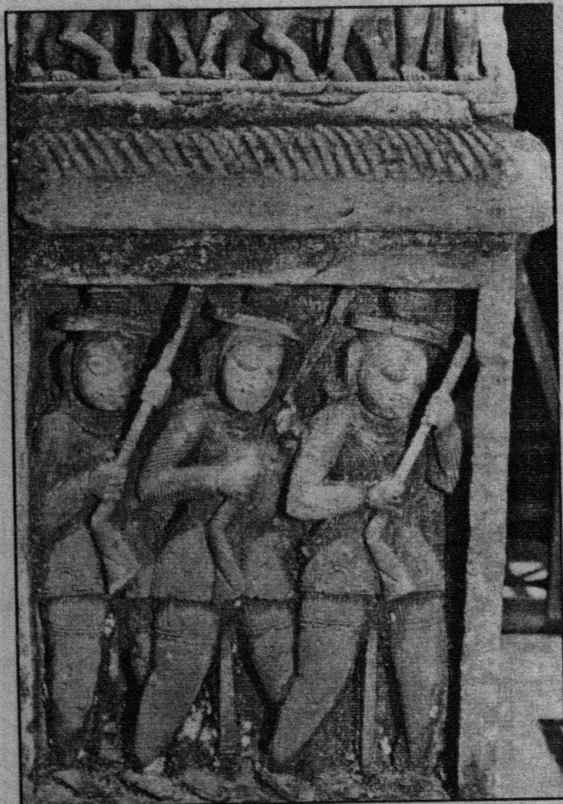
রাধাগোবিন্দের 'আটচালা' মন্দিরের (১৭৮৬) টেরাকোটা কালীমূর্তি, আঁটপুর (পৃ. ১১৫)



আঁটপুর ঃ রাধাগোবিন্দ মন্দিরের 'টেরাকোটা' সামাজিক দৃশ্য ও সার্কাস-বাজিকর (পৃ. ১১৫)



আঁটপুর ঃ রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সামনের টেরাকোটা, যুদ্ধদৃশ্য (পৃ. ১১৫)



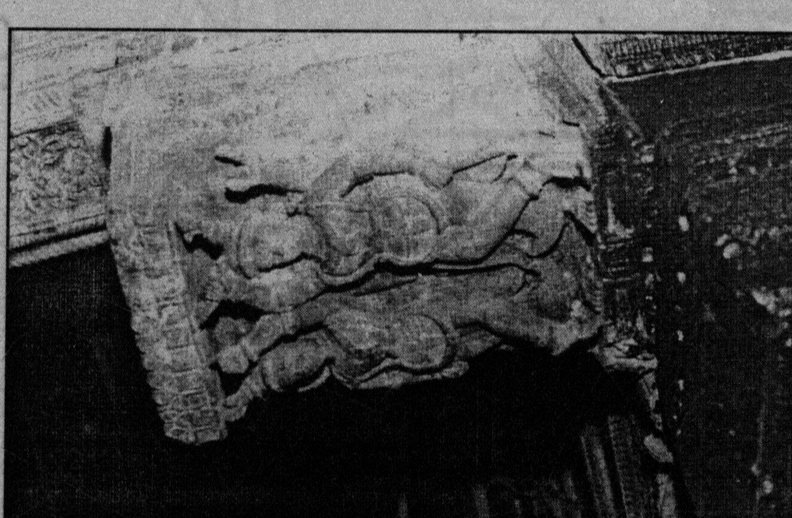
আঁটপুর (রাধাগোবিন্দ মন্দির) কুচকাওয়াজরত গোরাসৈনিক (পৃ. ১১৫)



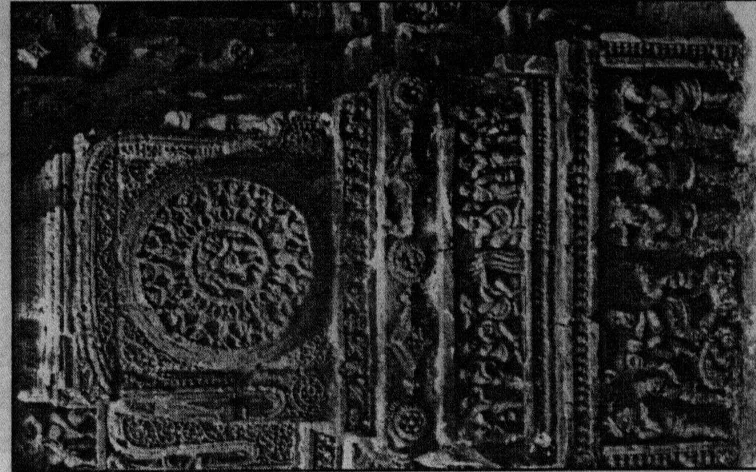
আঁটপুর, রাধাগোবিন্দ মন্দিরের দেওয়ালের টেরাকোটা—
সাহেবের নারীসম্ভোগ ও অনুচরদ্বয় (পৃ. ১১৫)



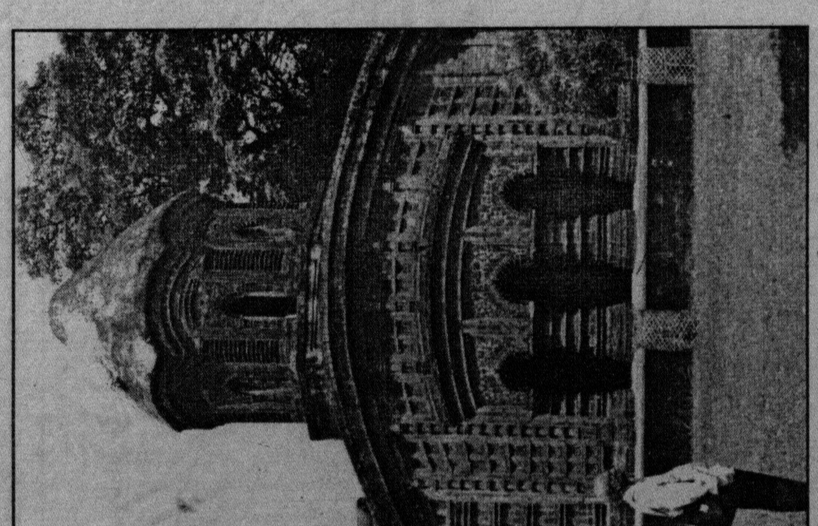
আঁটপুরের (হুগলি) চণ্ডীমণ্ডপ (পৃ. ১১৫)



আঁটপুর ঃ চণ্ডীমণ্ডপ (দোচালা) উৎকৃষ্টমানের কাঠের কারুকার্য (পৃ. ১১৫)



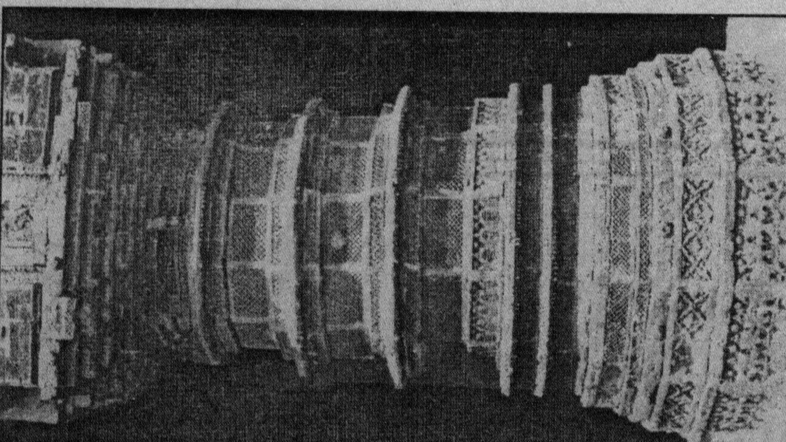
অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (১৬৭৯ খ্রি.) পুবদিকের নিচের
'টেরাকোটা'-প্যানেল — 'রাসমণ্ডলচক্র', ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ ইত্যাদি (পৃ. ১১২)



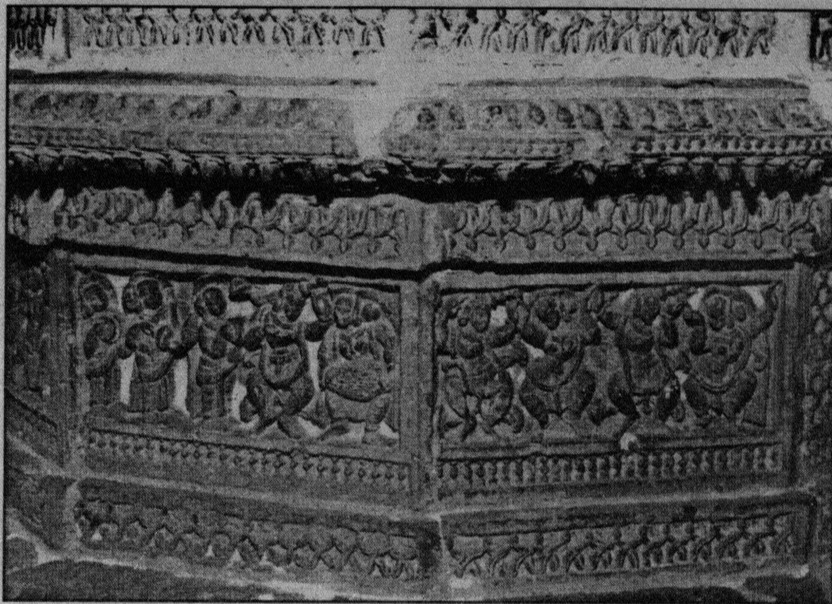
অনন্তবাসুদেবের 'একরত্ন' (১৬৭৯ খ্রি.), বাঁশবেড়িয়া (পৃ. ১১২)



বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব মন্দিরের লিপি, ১৬৭৯ খ্রি. (পৃ. ১১২)



অনন্তবাসুদেব মন্দিরের দক্ষিণদিকের 'ইমারতি' থাম (পৃ. ১১২)



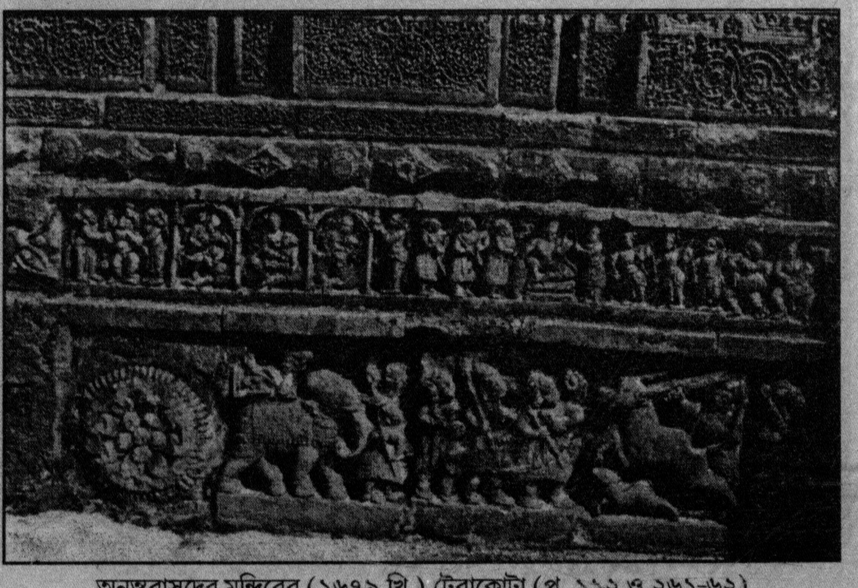
অনন্তবাসুদেব মন্দিরের পুবদিকের থামের গায়ে টেরাকোটা, সংকীর্তনদৃশ্য (পৃ. ১১২ ও ২৬১-৬২)



অনন্তবাসুদেব মন্দিরের (১৬৭৯) পৌরাণিক দেবাসুরযুদ্ধ, নিচে যুদ্ধের মধ্যে বিষ্ণু-নারায়ণের আবির্ভাব (পৃ. ১১২ ও ২৬১-৬২)



অনন্তবাসুদেব মন্দিরের পুবদিকের নিচের 'টেরাকোটা'-প্যানেল, ওপরে যশোদার দধিমন্থন, অশোকবনে সীতা ও হনুমান। নিচে জমিদারের অন্যত্র গমন, সামনে- পেছনে লোকলস্কর (পৃ. ১১২ ও ২৬১-৬২)



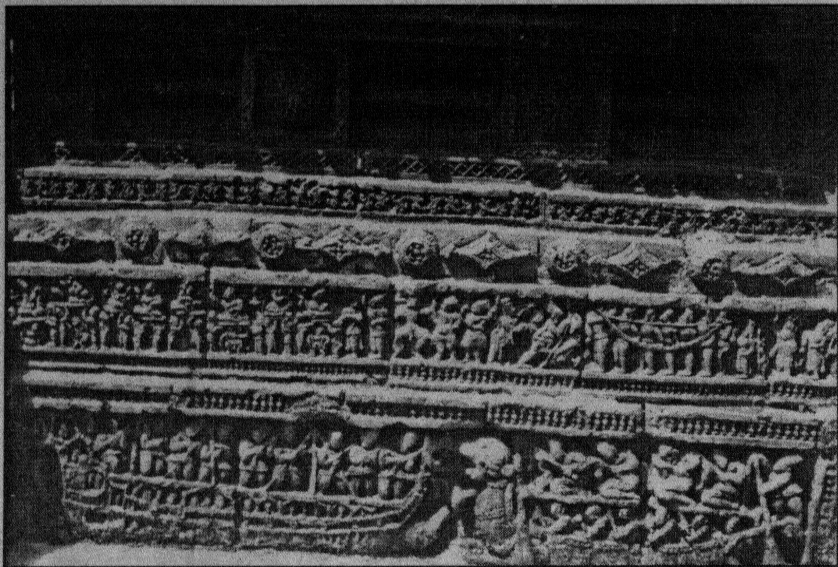
অনন্তবাসুদেব মন্দিরের (১৬৭৯ খ্রি.) টেরাকোটা (পৃ. ১১২ ও ২৬১-৬২)



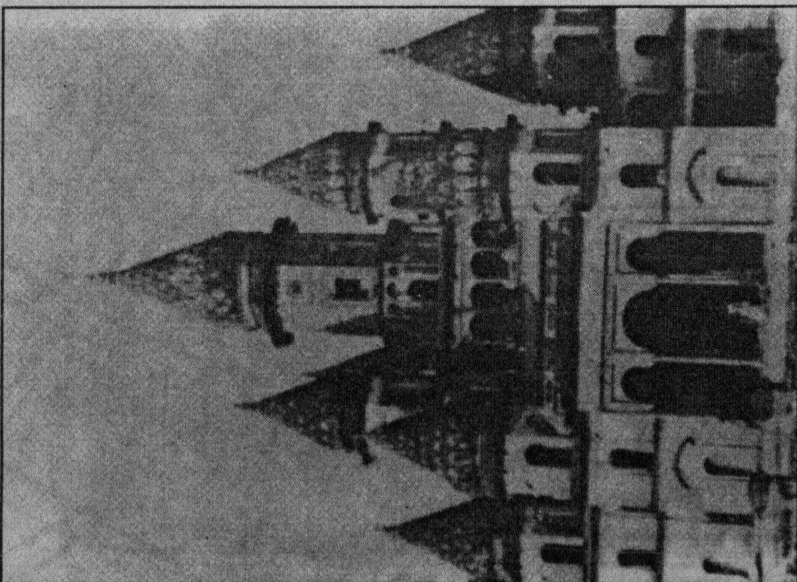
অনন্তবাসুদেব মন্দিরের দক্ষিণদিকের গর্ভগৃহের দেওয়ালে 'টেরাকোটা'-ফুল (পৃ. ১১২)



ফুলকারি নকশা ও রাধাকৃষ্ণ, অনন্তবাসুদেব মন্দির (পৃ. ১১২)



অনন্তবাসুদেব মন্দিরের পুবদিকের দেওয়ালের নিচের 'টেরাকোটা'-প্যানেল, হরধনুবৃত্তান্ত (নিচে) জলদস্যুদের যুদ্ধ (পৃ. ১১২ ও ২৬১-৬২)



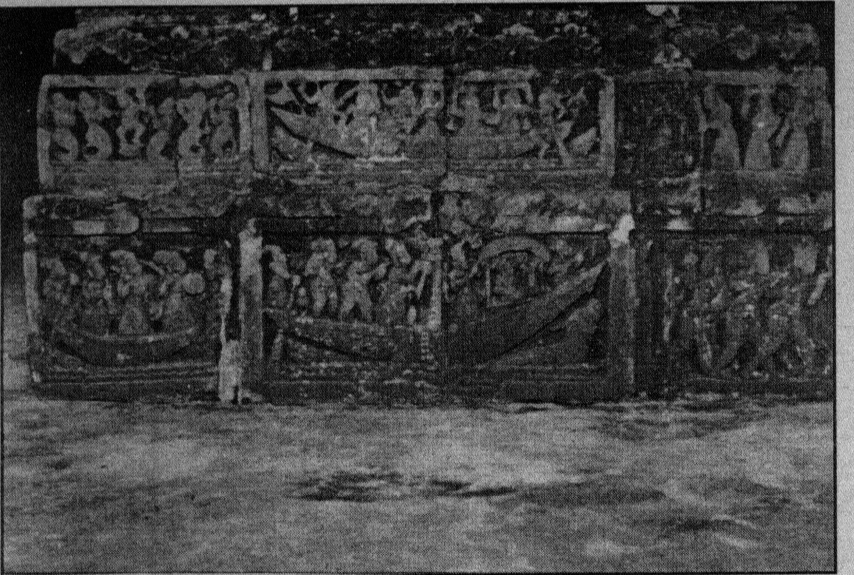
হংসেশ্বরী মন্দির, বাঁশবেড়িয়া (হুগলি)



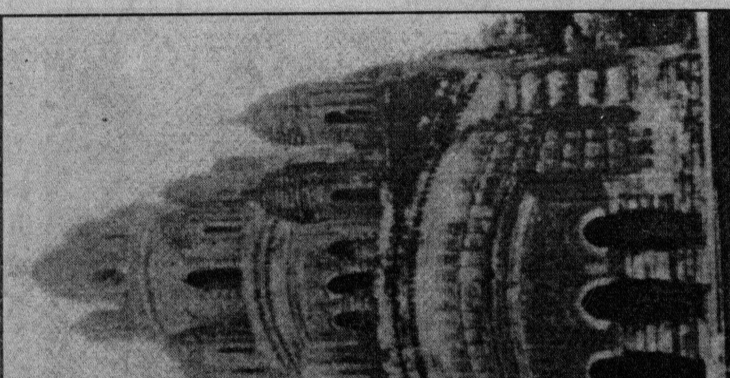
দ্বারহাট্টা (হুগলি) ঃ রাজরাজেশ্বরের 'আটচালা' মন্দির ১৭২৮, (পৃ. ৩৫০)



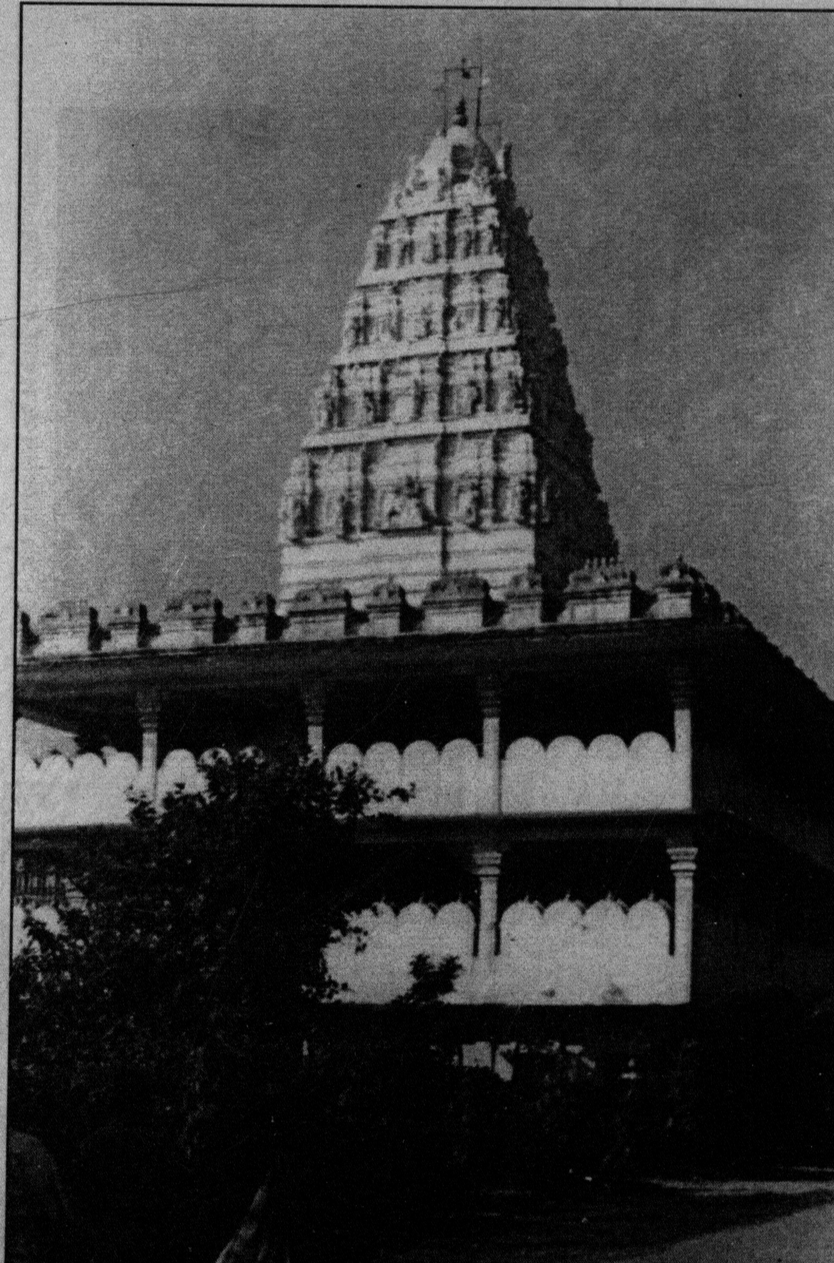
দ্বারহাট্টা ঃ দ্বারিকাচণ্ডীর ভগ্নমন্দির (আ. খ্রি. ১৭ শতক), (পৃ. ৩৫১)



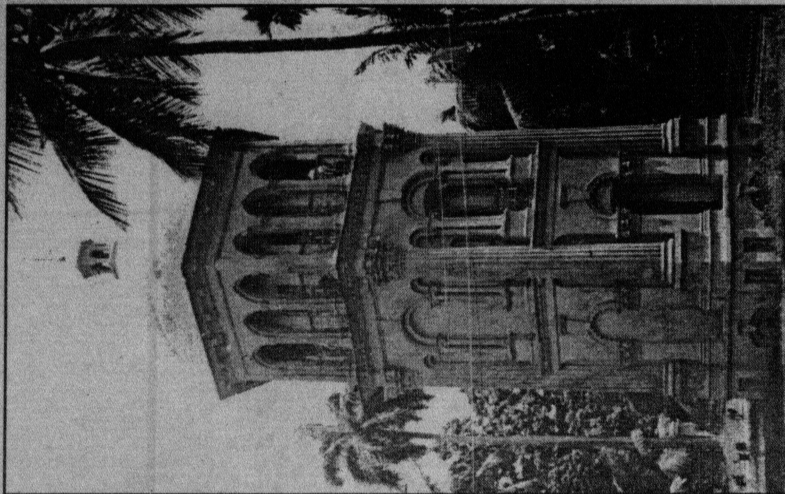
দ্বারহাট্টা ঃ রাজরাজেশ্বর-মন্দিরের নিচের টেরাকোটা-প্যানেল, ওপরে কৃষ্ণলীলা - কালীয় দমন, নৌকাবিলাস, কদম্ব বৃক্ষতলে কৃষ্ণ ও গোপী (ওপরে)। রাজা বা নবাবের নৌযাত্রা ও সৈন্যসামন্ত (নিচে) (পৃ. ৩৫০-৩৫১)



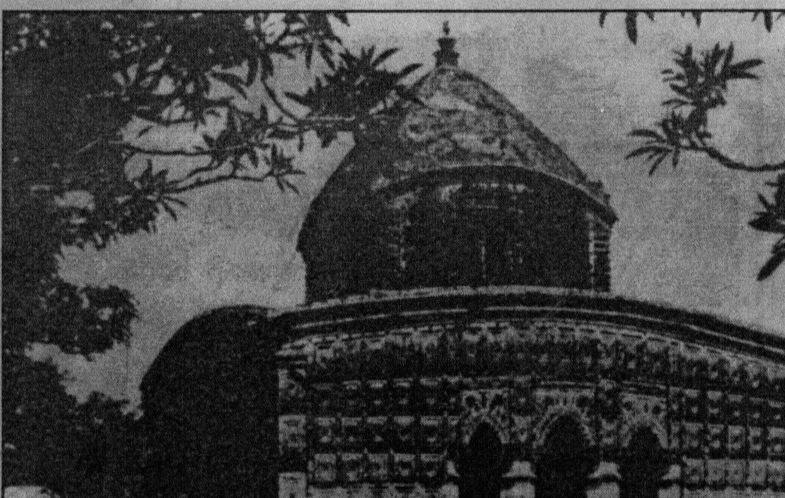
আনন্দময়ীর পঁচিশচূড়া মন্দির, সুখাড়িয়া (হুগলি) (পৃ. ১১২-১১৩)



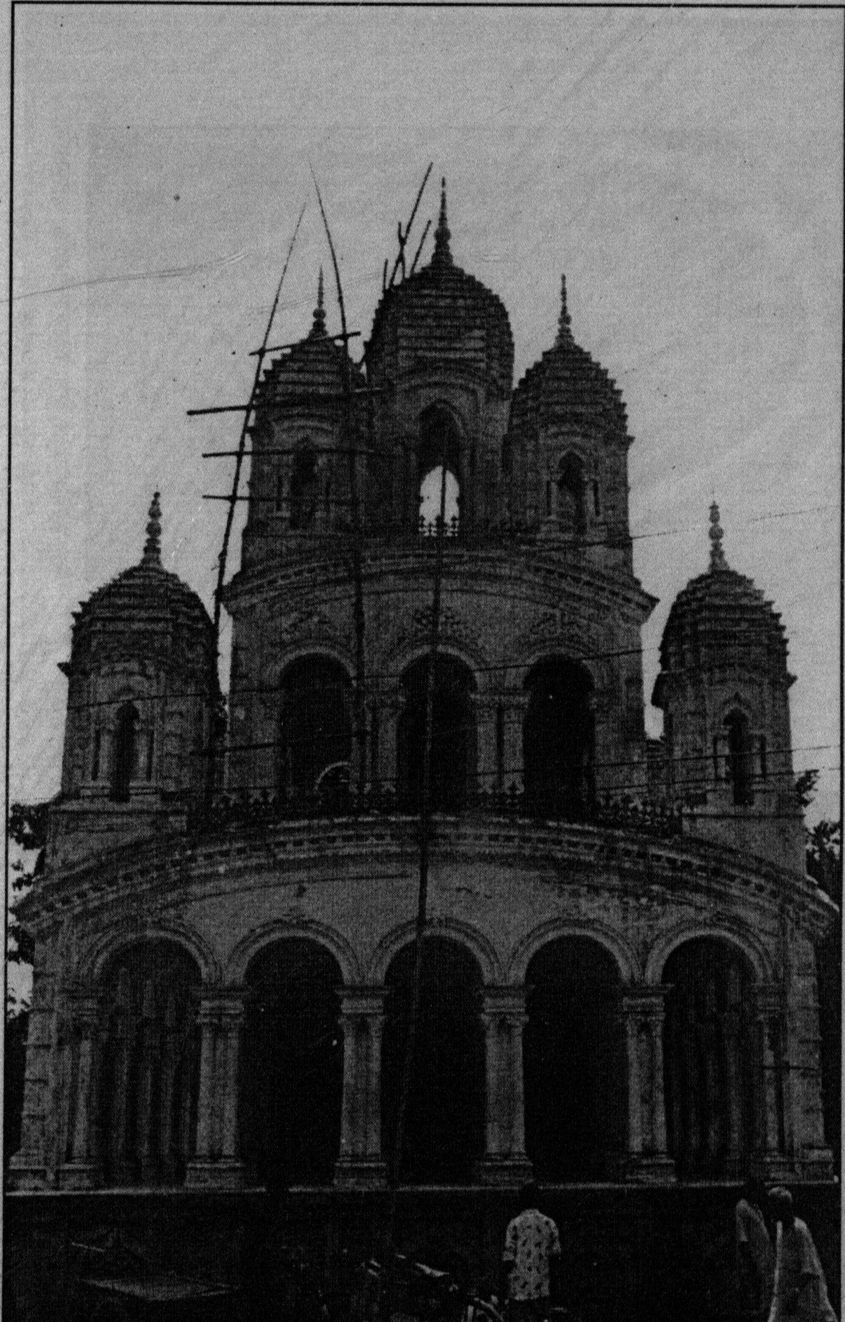
দক্ষিণ-ভারতীয় রীতিতে নবনির্মিত মন্দির, উত্তরপাড়া, হুগলি



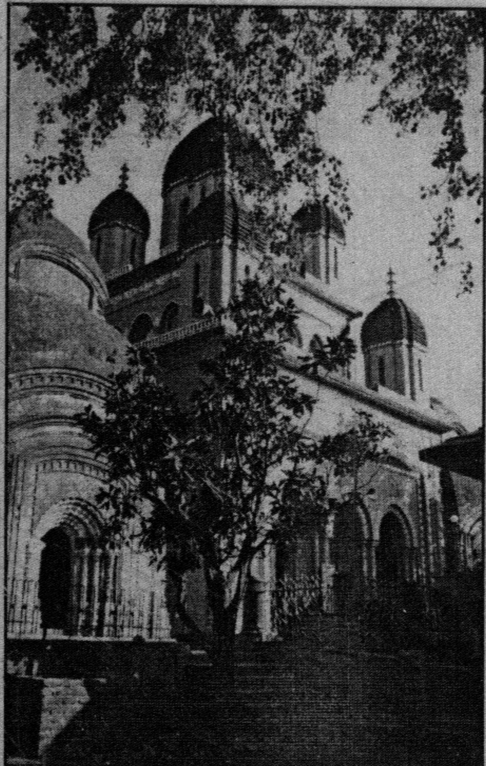
সাহ পরিবারের নহবৎখানা, ধান্যকুড়িয়া, বসিরহাট



রাধাবল্লভের 'একরত্ন' আ. ১৭ শতকের প্রথম, কৃষ্ণনগর, হুগলি



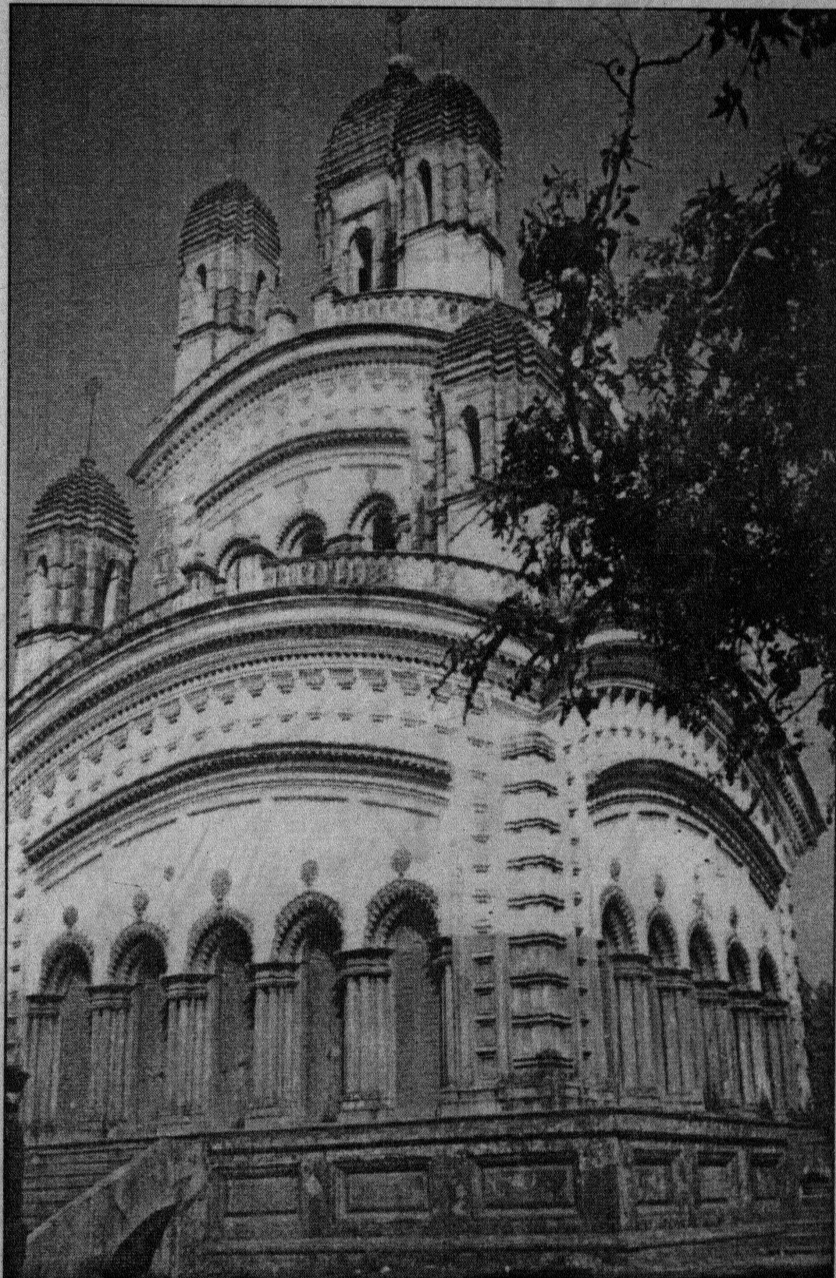
'নবরত্ন', রাসমঞ্চ, ধান্যকুড়িয়া, বসিরহাট, উ. ২৪ পরগনা



ব্রহ্মময়ী দক্ষিণাকালীর 'নবরত্ন', মূলাজোড়, শ্যামনগর, উ. ২৪ পরগনা ও পাশে আটচালা শিবমন্দির, খ্রি. ১৮০৮ - ১৮০৯ (পৃ. ৩৫২)

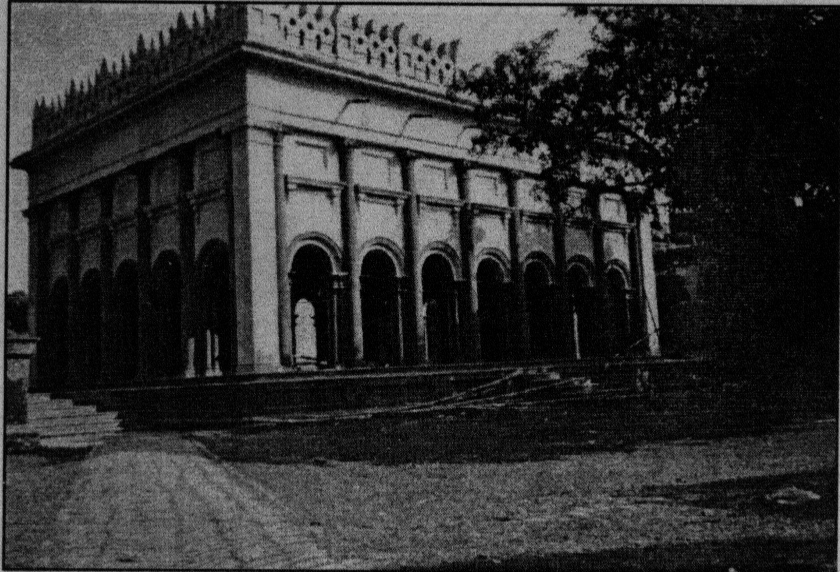


নারায়ণ বিষ্ণুমূর্তি, মূলাজোড় কালীবাড়ি, শ্যামনগর, আ. খ্রি. ১১শ শতক (পৃ. ৩৫৩)

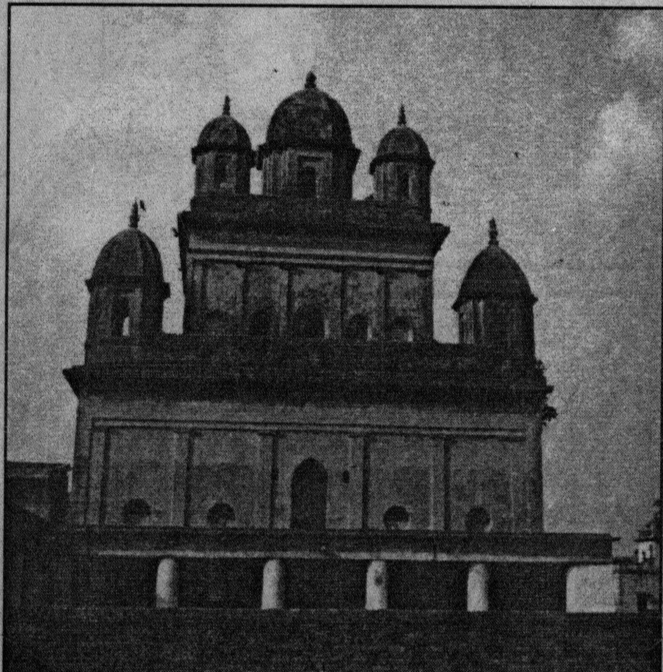


অন্নপূর্ণার 'নবরত্ন', তালপুকুর (ব্যারাকপুর), চানক, উ. ২৪ পরগনা

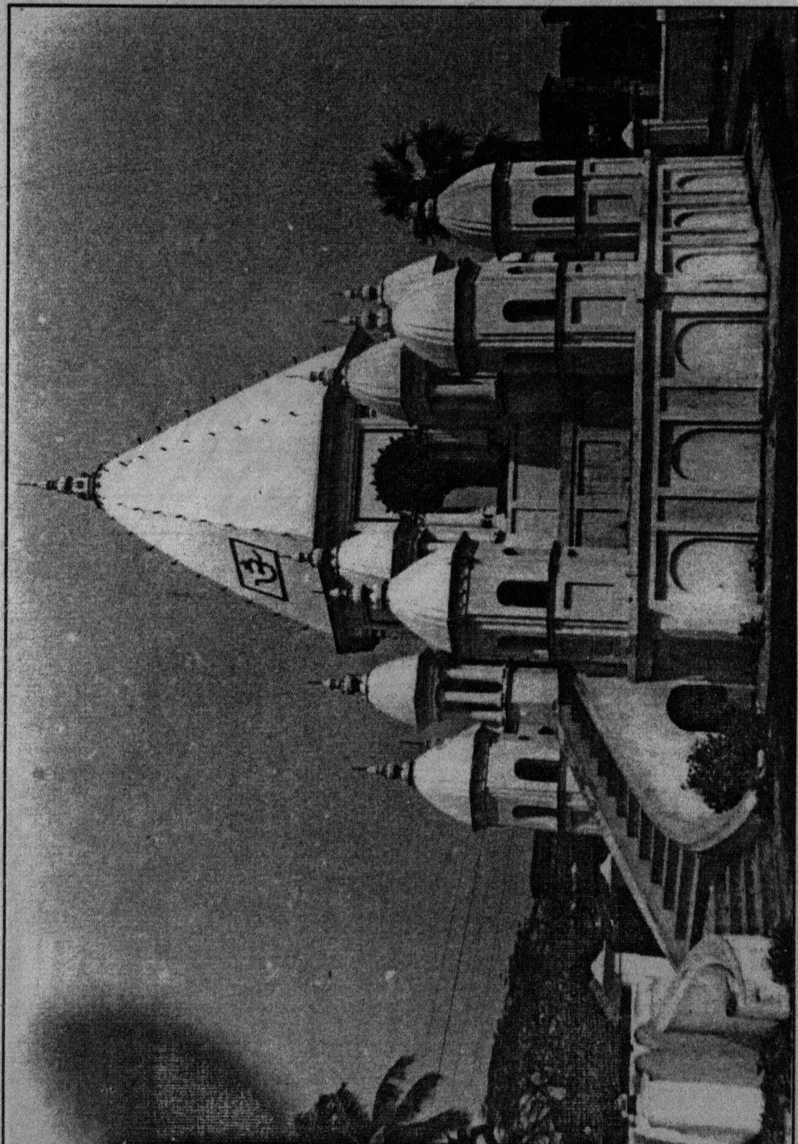
(পৃ. ৩৫৪)



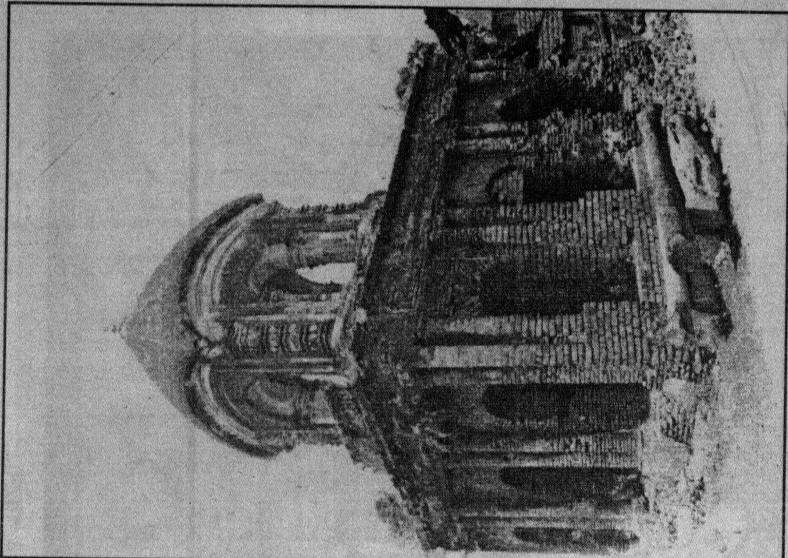
অন্নপূর্ণা মন্দিরের সামনে নাটমন্দির, তালপুকুর, ব্যারাকপুর (পৃ. ৩৫৪)



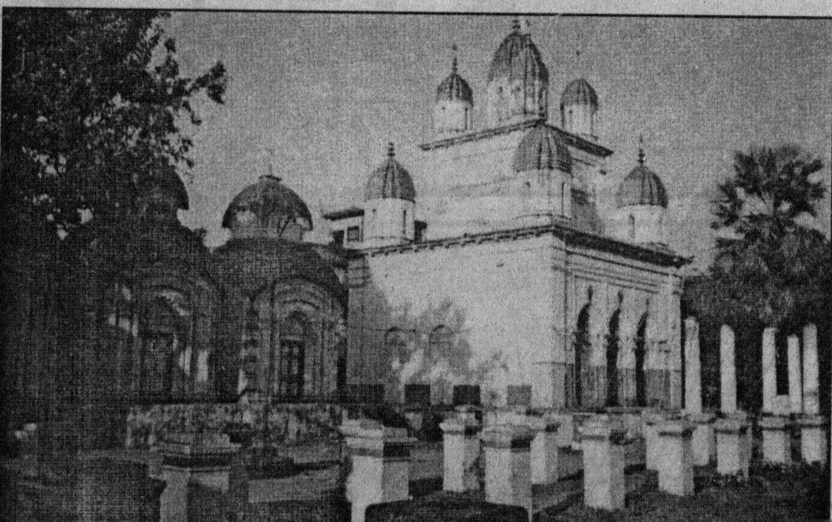
মহাপ্রভুর 'নবরত্ন' মন্দির, খড়দহ (গোস্বামীপাড়ার উত্তরে), উ. ২৪ পরগনা (পৃ. ৩৫৬)



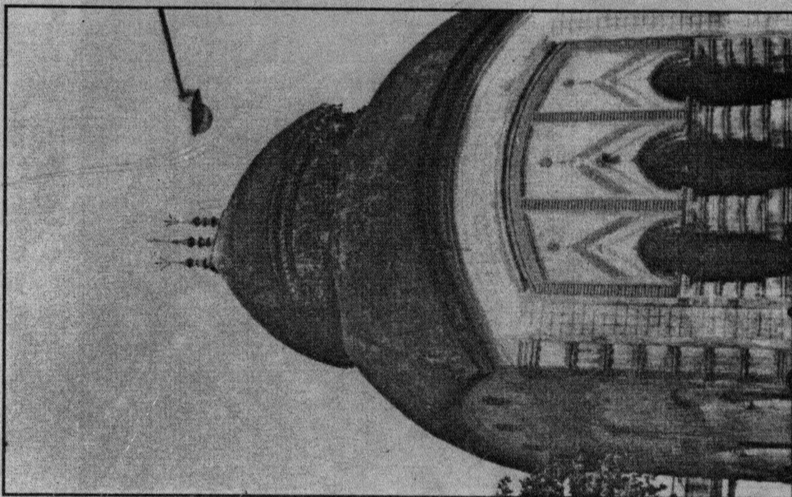
রাসমঞ্চ, খড়দহ, উ. ২৪ পরগনা



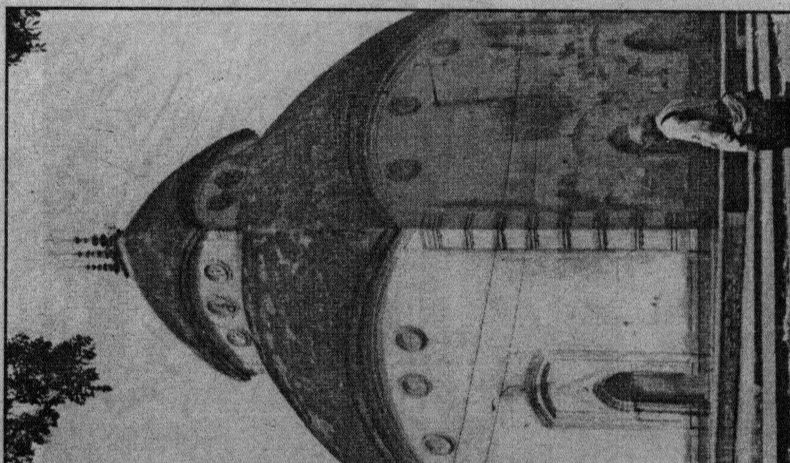
ঘোষচৌধুরী-বংশের ঘটেশ্বরের দোলমঞ্চ, মন্দিরবাজার, দ. ২৪ পরগনা



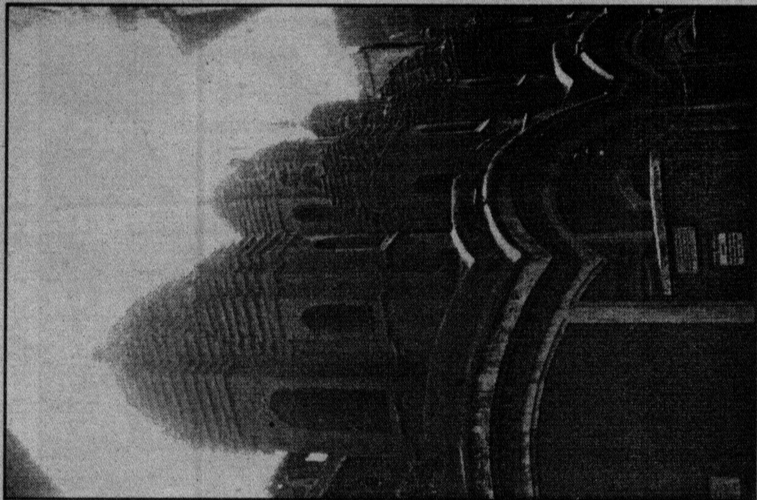
কৃপাময়ী কালীর 'নবরত্ন', দ্বাদশ শিবালয় ও ভগ্ন নাটমন্দিরের একাংশ (খ্রি. ১৮৫০), জয় মিত্রের কালীবাড়ি, কুঠিঘাট, মালাপাড়া, উ. ২৪ পরগনা, বরাহনগর (পৃ. ৩৫৯)



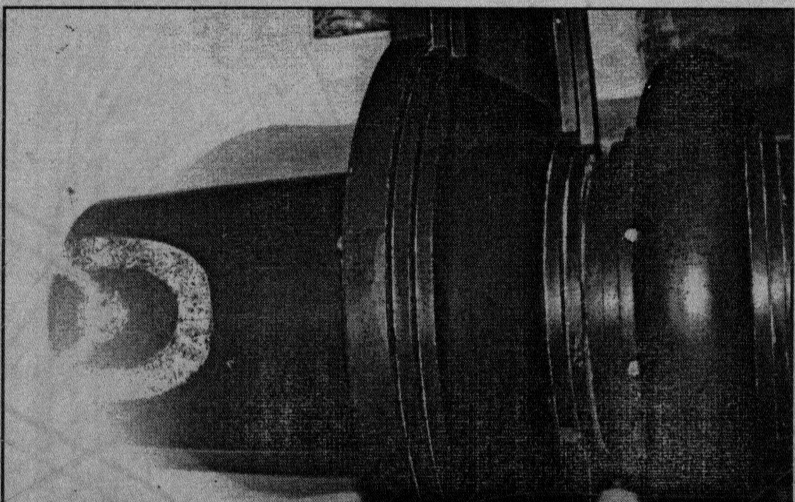
কৃষ্ণকমলেশ্বরের 'আটচালা', ভূকৈলাস, কোলকাতা (পৃ. ৩৬৭)



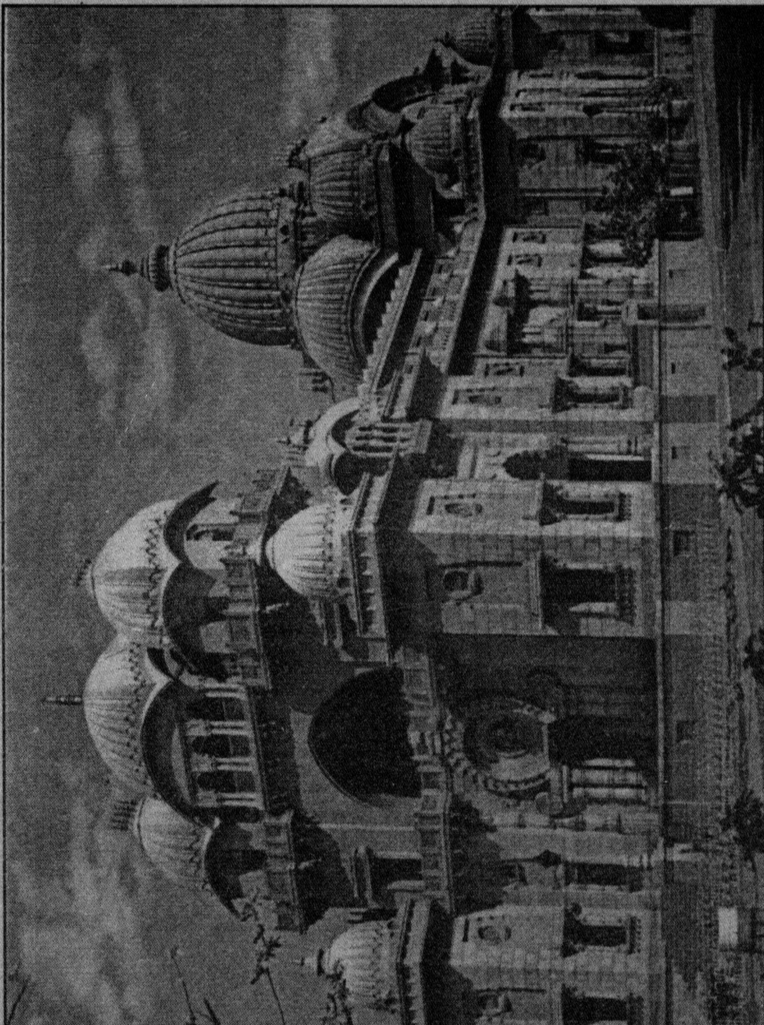
রক্তকমলেশ্বরের 'আটচালা', ভূকৈলাস, কোলকাতা (পৃ. ৩৬৬)



মহেশ্বরের 'পঞ্চরত্ন' ও 'নবরত্ন', কেনডারডাইন লেন, বহুবাজার, কোলকাতা (পৃ. ৩৬৫)

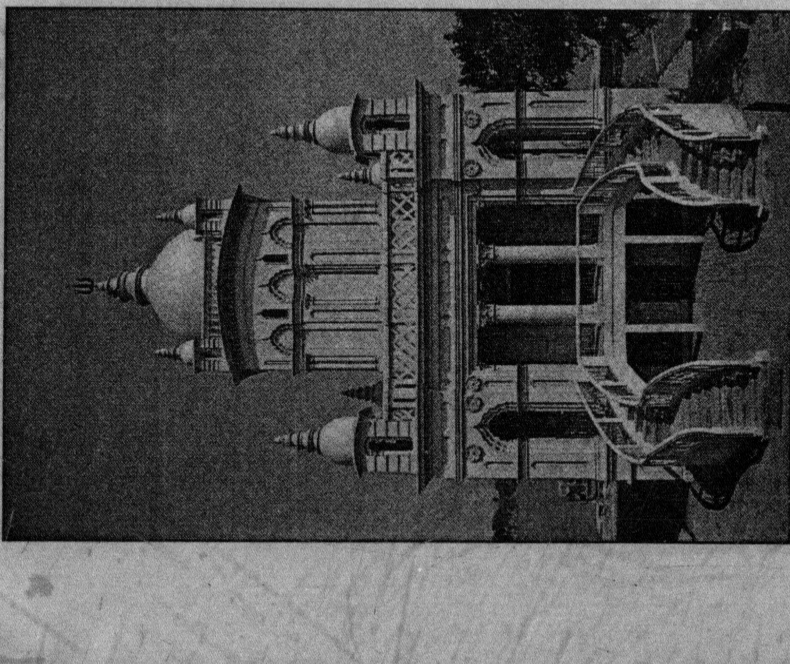


কৃষ্ণকমলেশ্বরের শিবলিঙ্গ ভুকৈলাস, খিদিরপুর (পৃ. ৩৬৭)

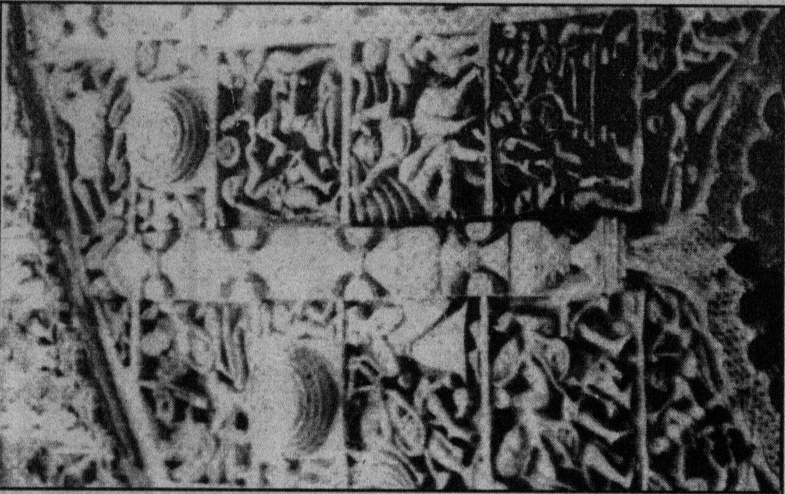


শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির, বেলুড় মঠ। আলোকচিত্র : বেলুড় মঠের সৌজন্যে

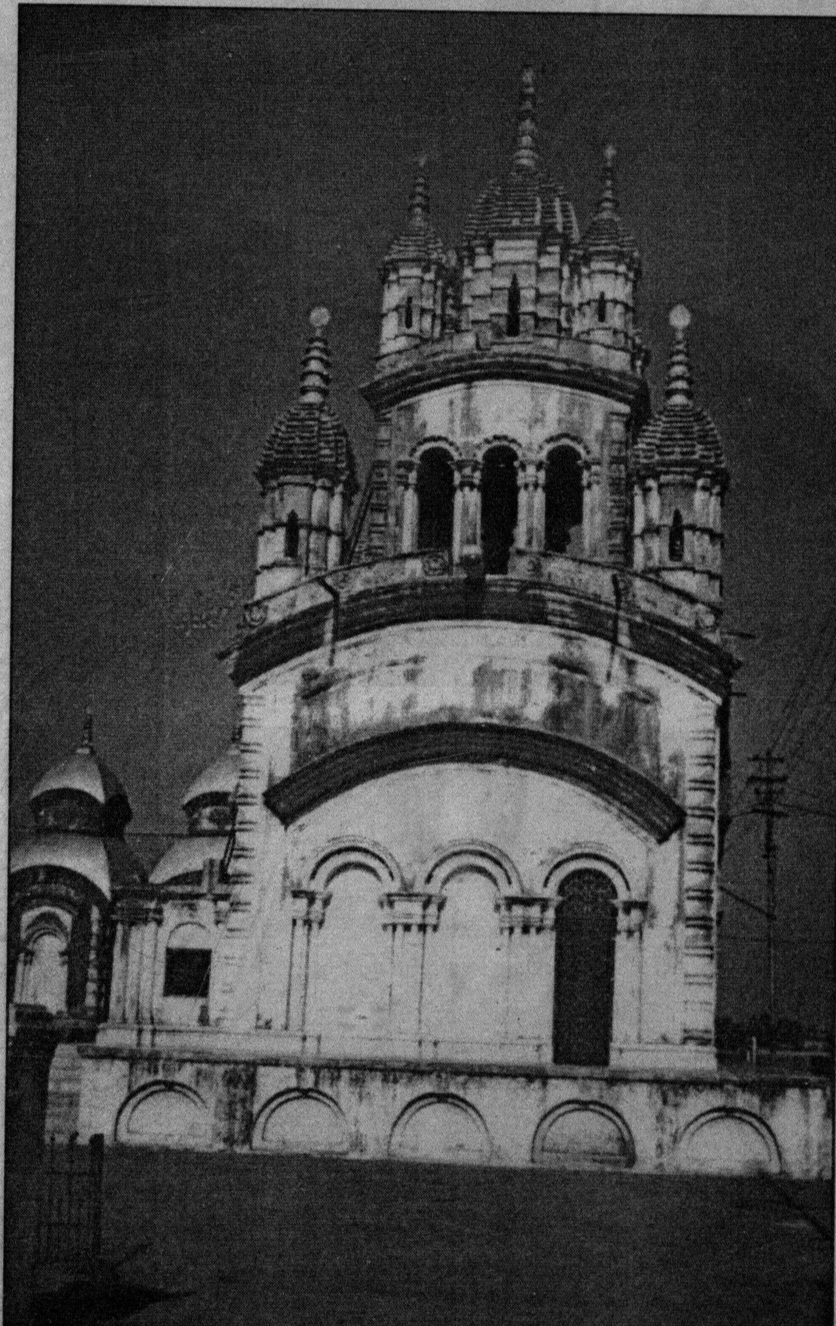
(পৃ. ৩৬২)



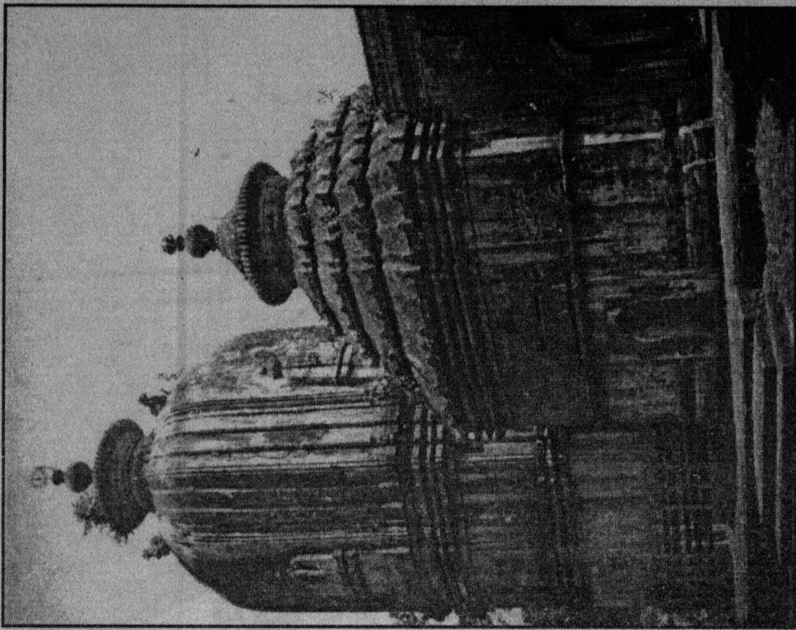
স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মন্দির, বেলুড় মঠ। বেলুড় মঠের সৌজন্যে



শ্রীধরজীউর 'নবরত্নে'র (১৭৮৬খ্রি.) টেরাকোটা, আসণ্ডা, হাওড়া



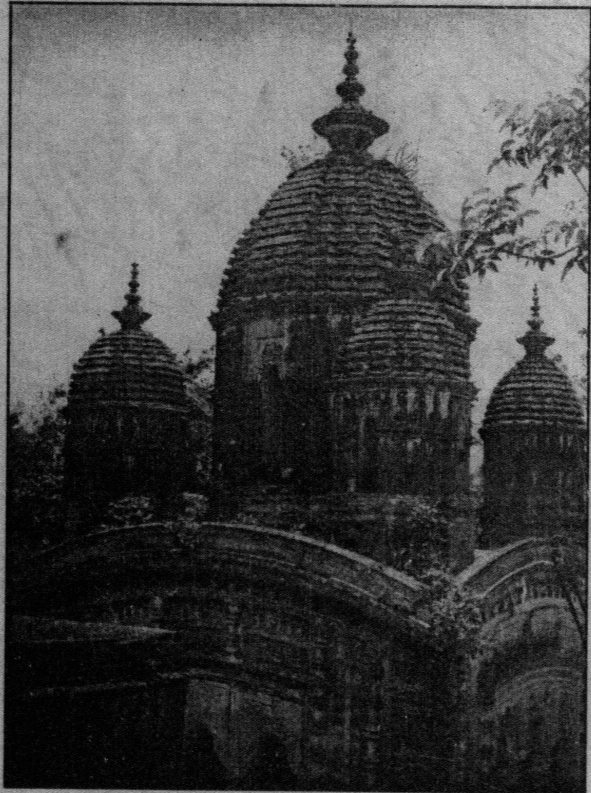
রাধারমণজীউর 'নবরত্ন', রাসবাড়ি, বেলুড়, হাওড়া, খ্রি. ১৮৯০ (পৃ. ৩৬১-৬২)



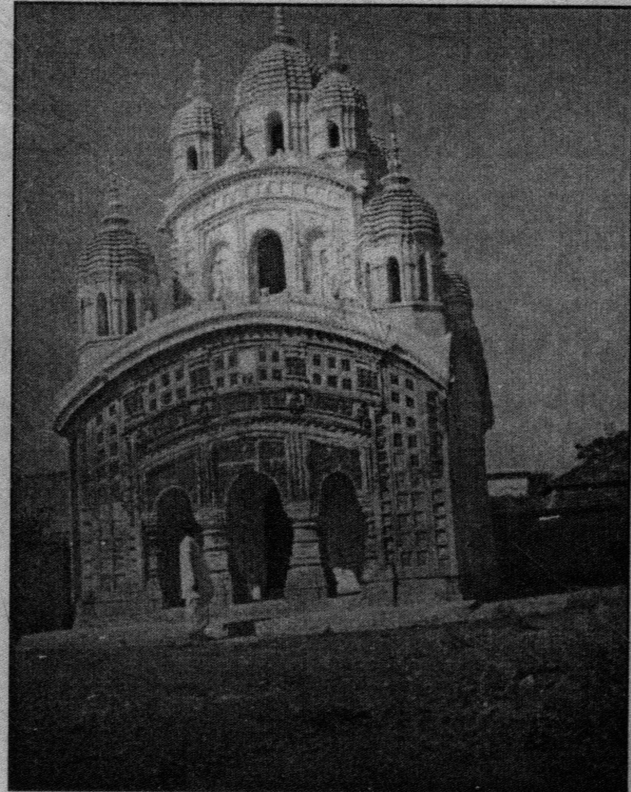
রঘুনাথের দেউল, অযোধ্যা, চন্দ্রকোনা শহর, পশ্চিম মেদিনীপুর (পৃ. ৮০)



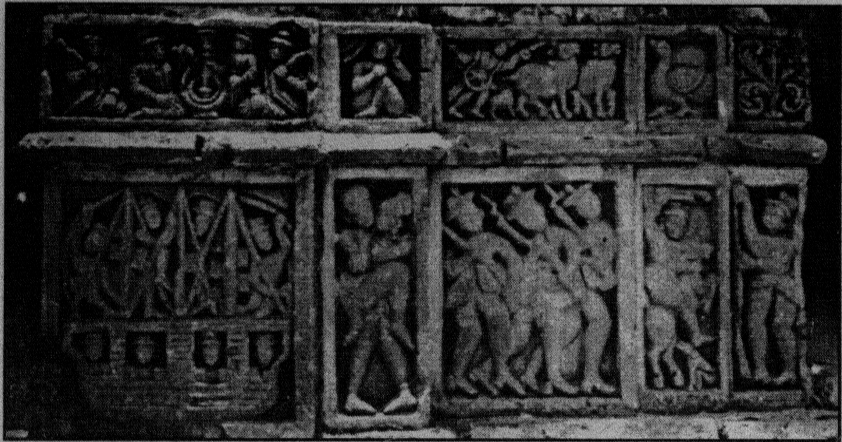
রাধারমণজীউর রাসমঞ্চ, রাসবাড়ি, বেলুড়, হাওড়া (পৃ. ৩৬২)



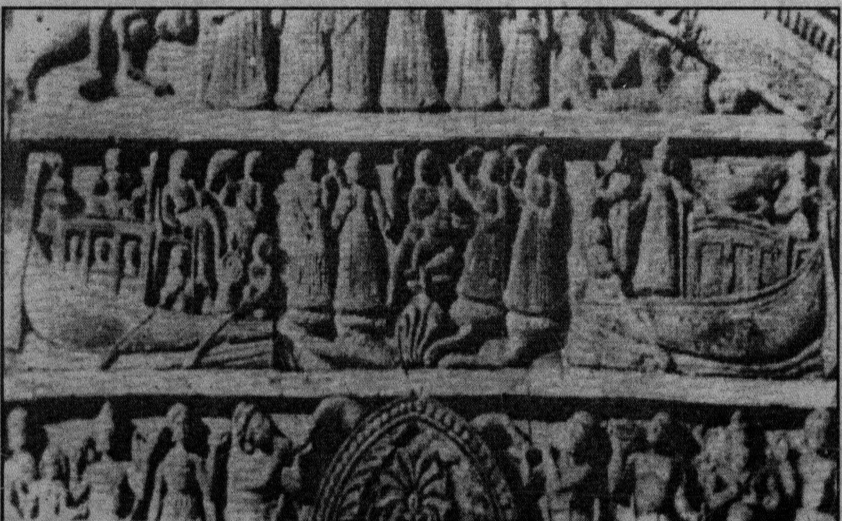
মল্লেশ্বরের 'পঞ্চরত্ন', চন্দ্রকোনা শহর (পৃ. ৮৬)



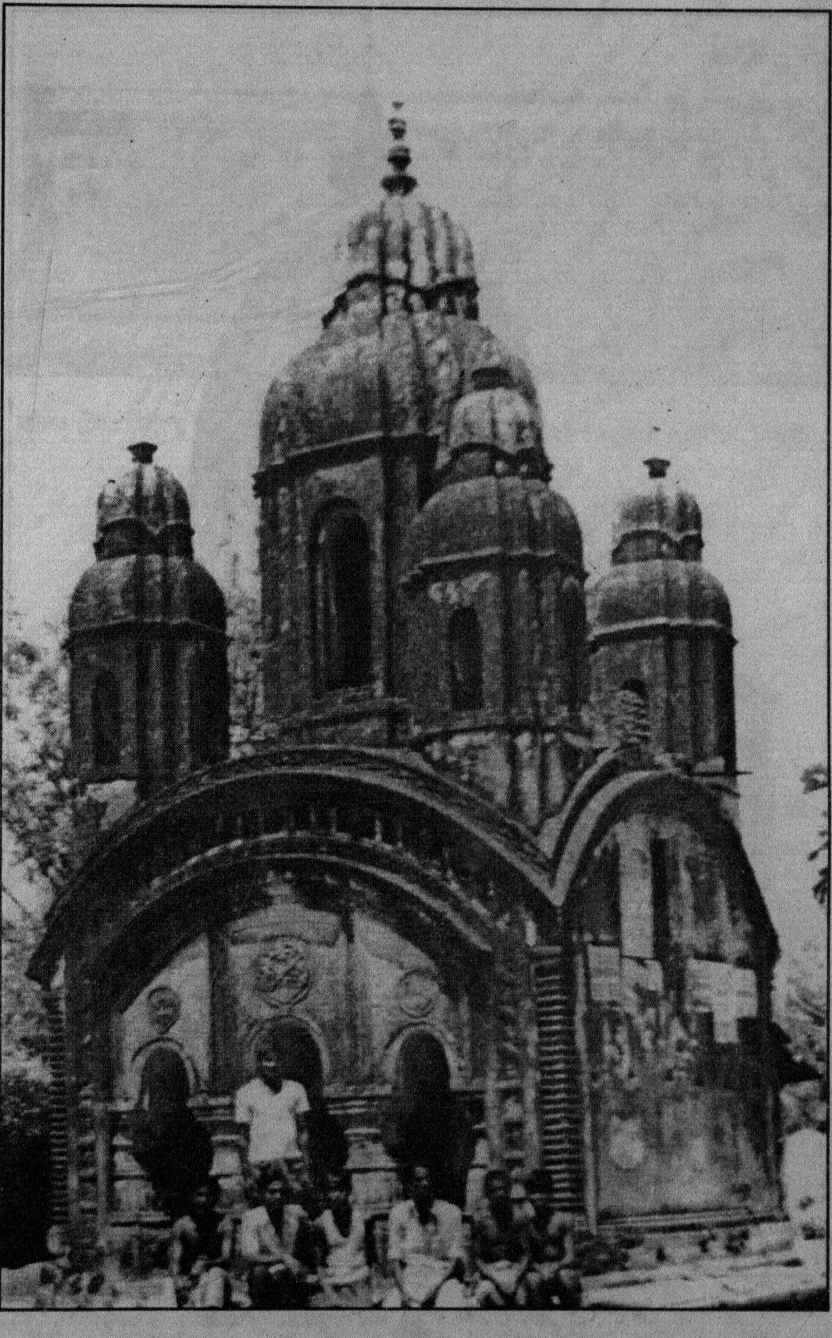
শান্তিনাথ শিবের 'নবরত্ন' (খ্রি. ১৮২৮) মিত্রসেনপুর, চন্দ্রকোনা শহর (পৃ. ৮৭)



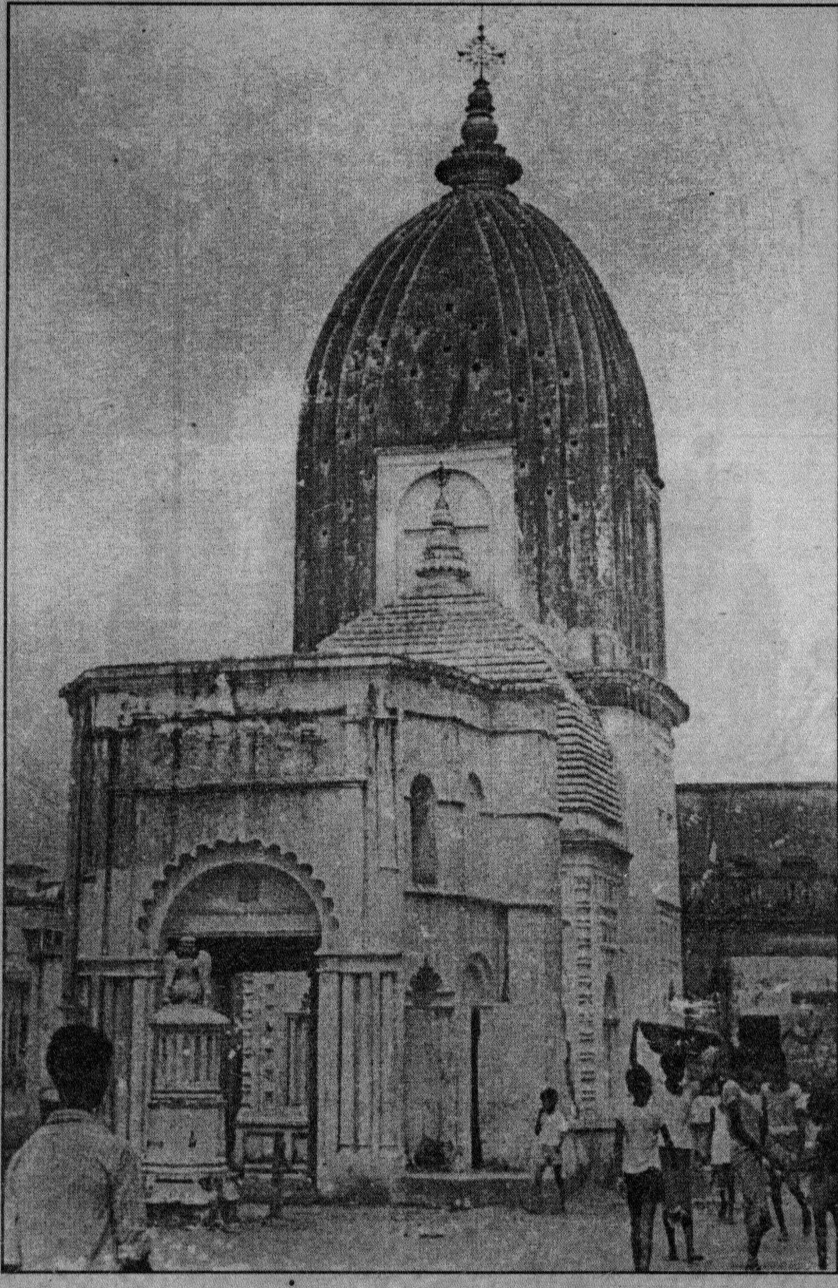
'রঘুনাথের পঞ্চরত্নে'র (আ. ১৯ শতকের প্রথমার্ধ) টেরাকোটা, দ্বন্দ্বীপুর, ঘাটাল, ফরসিবিলাসী, চিন্তামগ্না নারী, গোষ্ঠবিহার, হার্মাদ রণতরী, মিথুনদৃশ্য, সৈনিকদের কুচকাওয়াজ, শিকার প্রভৃতি চিত্র।



টেরাকোটায় কমলে কামিনী, রাধাকান্তপুর, দাসপুর (পৃ. ৮৬)



'আটচালা রত্ন'যুক্ত পঞ্চরত্ন, হিরাধরপুর, চন্দ্রকোনা থানা, পশ্চিম মেদিনীপুর



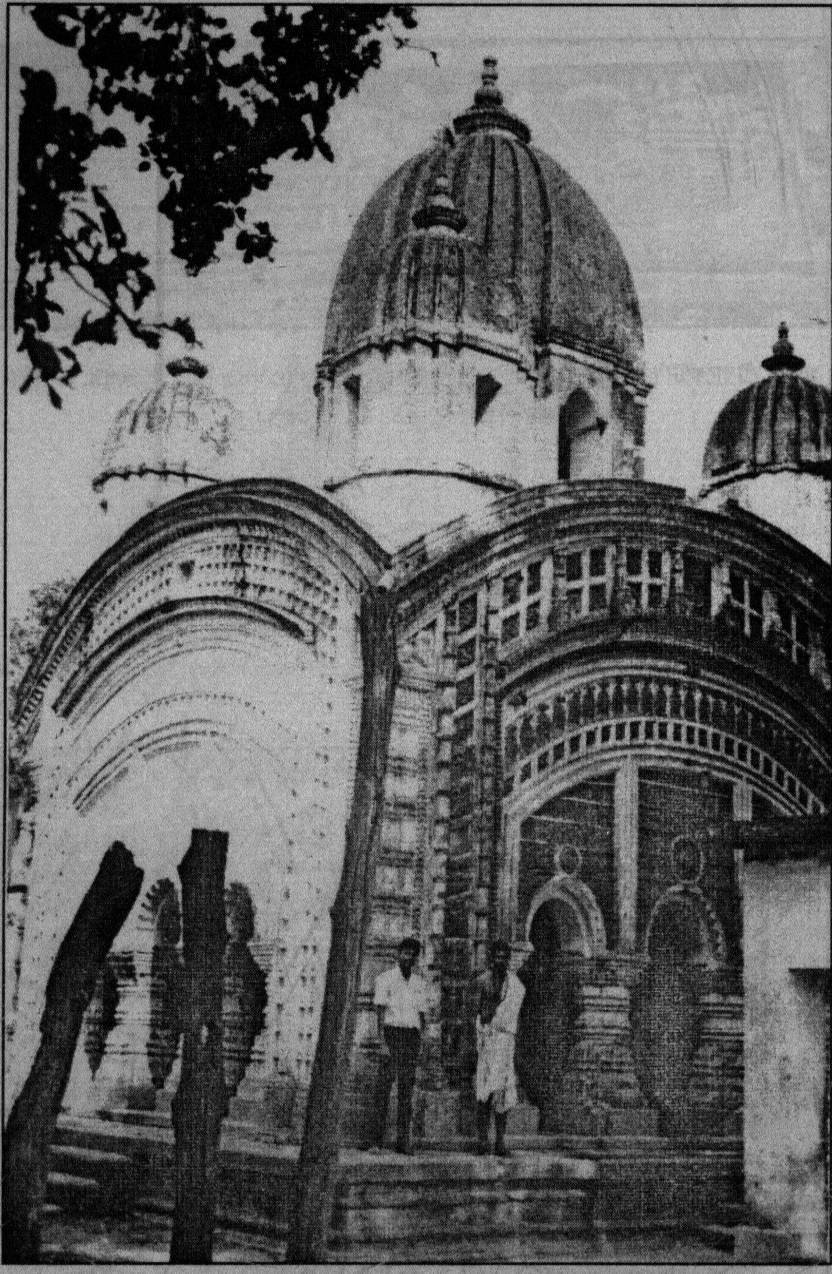
জগন্নাথের দেউল, জগমোহন, নাটমন্দির ও গরুড়স্তম্ভ,
জগন্নাথমন্দিরচক, মেদিনীপুর শহর. ১৮৫১ খ্রি. (পৃ. ৮৮)



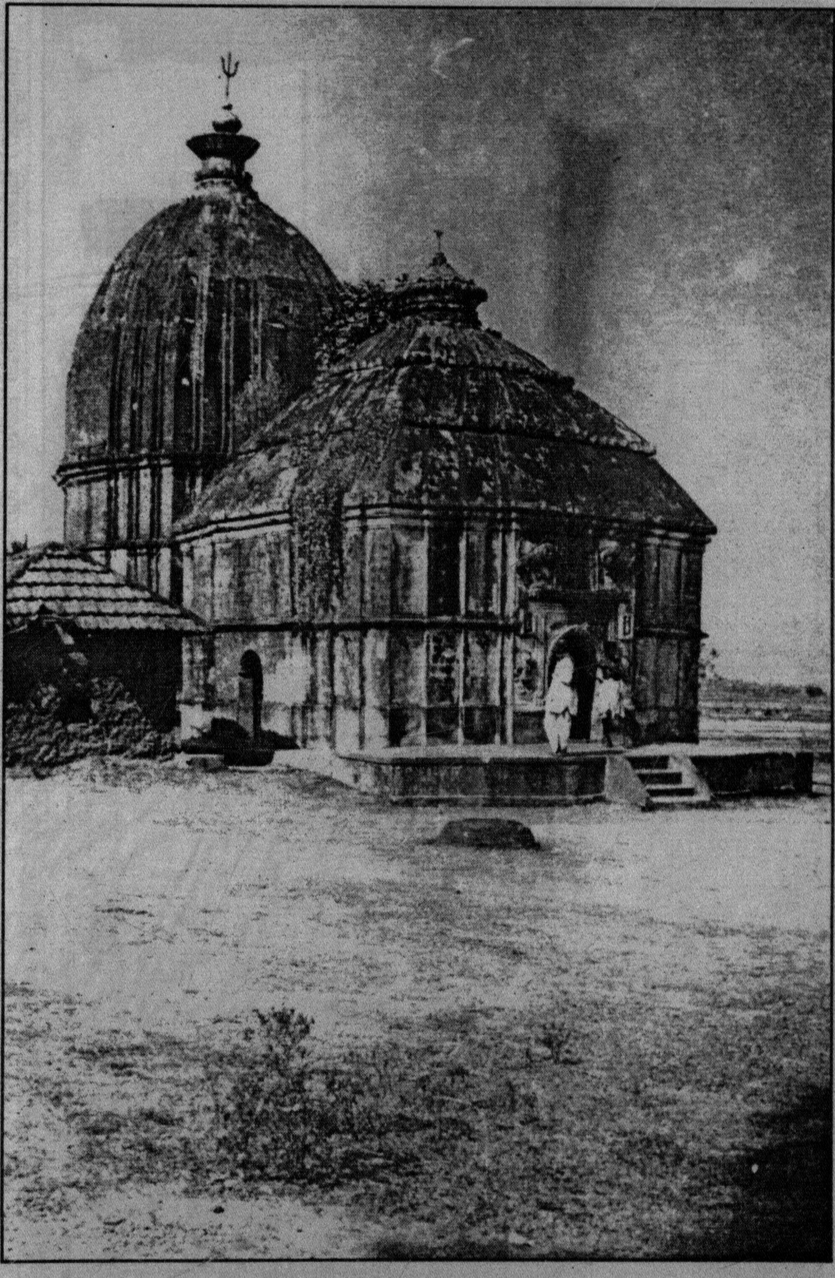
মন্দির টেরাকোটা'য় 'কমলে-কামিনী'দৃশ্য, শীতলার পঞ্চরত্ন (১৮৪৯ খ্রি.), সুরৎপুর, দাসপুর, মেদিনীপুর (পৃ. ৫৪, ৯১ ও ৩৩৭)



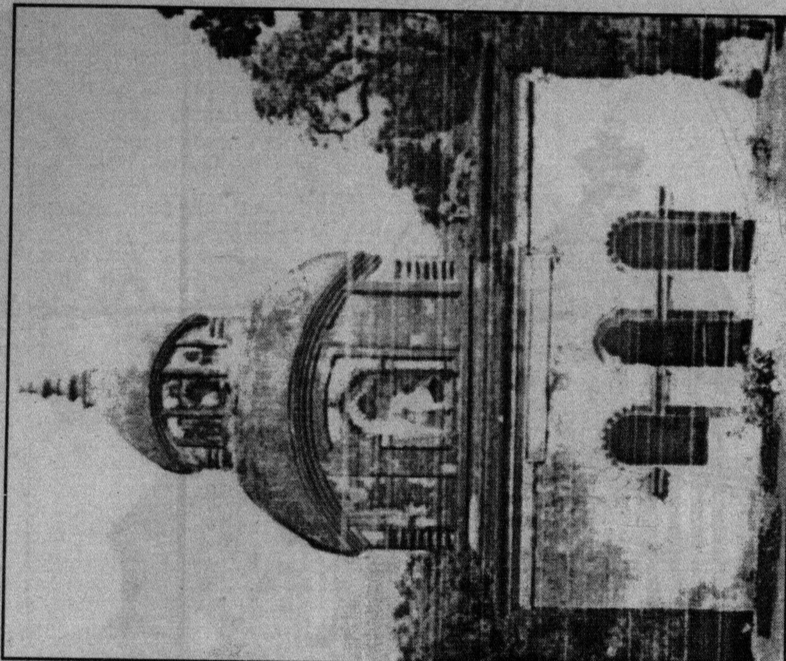
মন্দির টেরাকোটা, রাম-রাবণের যুদ্ধ



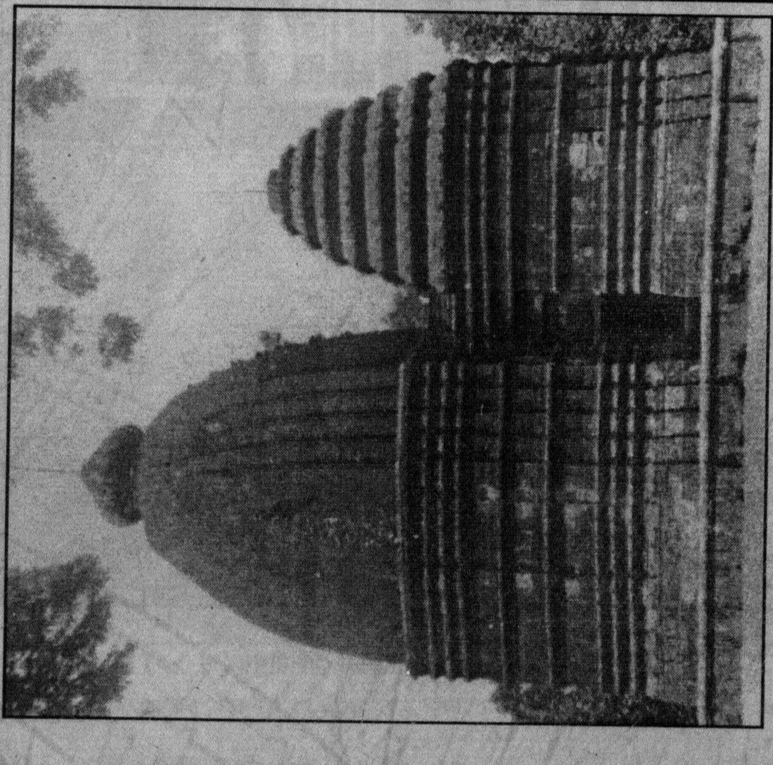
ঝাড়েশ্বরের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৩৪ খ্রি.), কানাশোল, কেশপুর, মেদিনীপুর (পৃ. ৮৭)



নেড়া দেউল, কুঁয়াই, কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর (পৃ. ৮০)

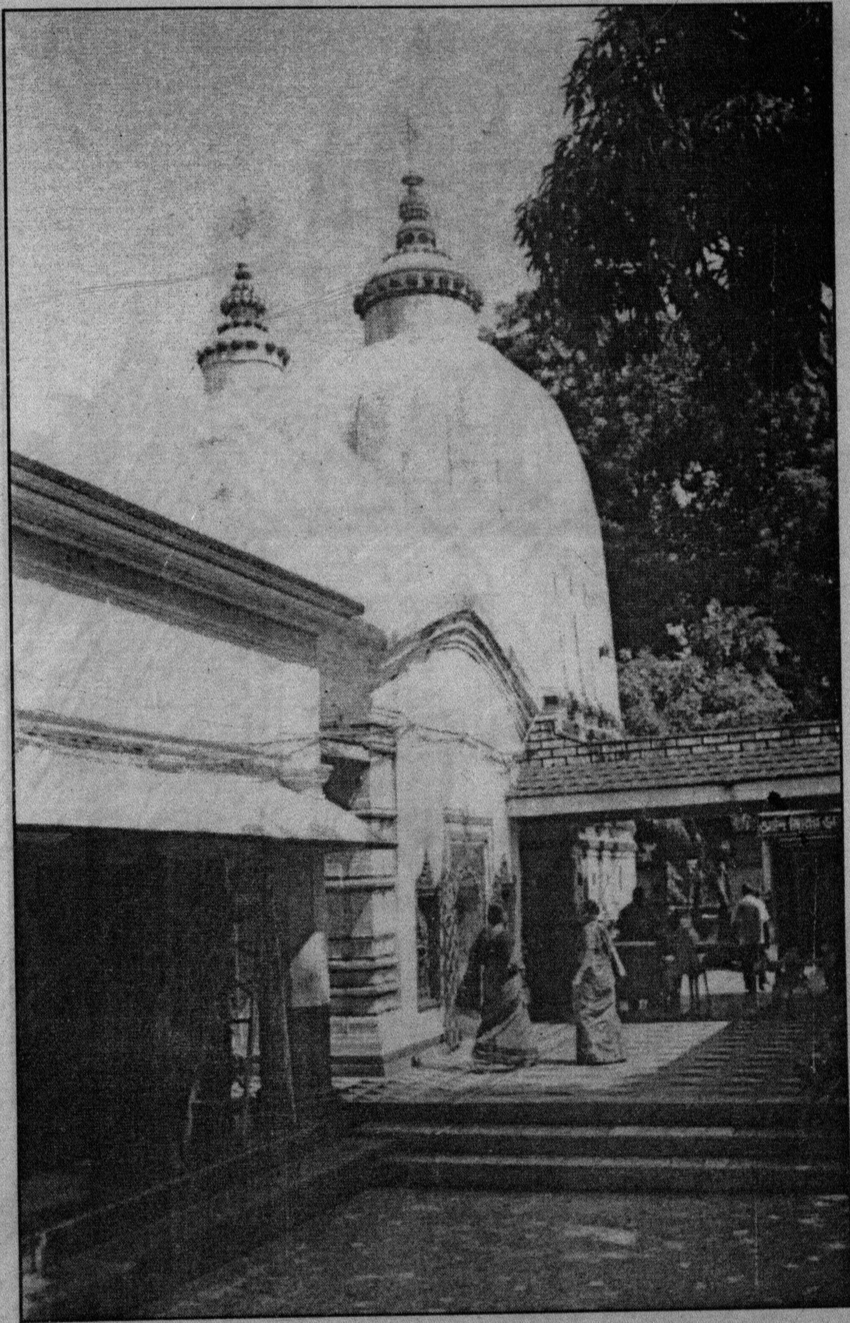


লোকেশ্বরের 'আটচালা একরত্ন', ময়না রাজবাড়ি (মেদিনীপুর)

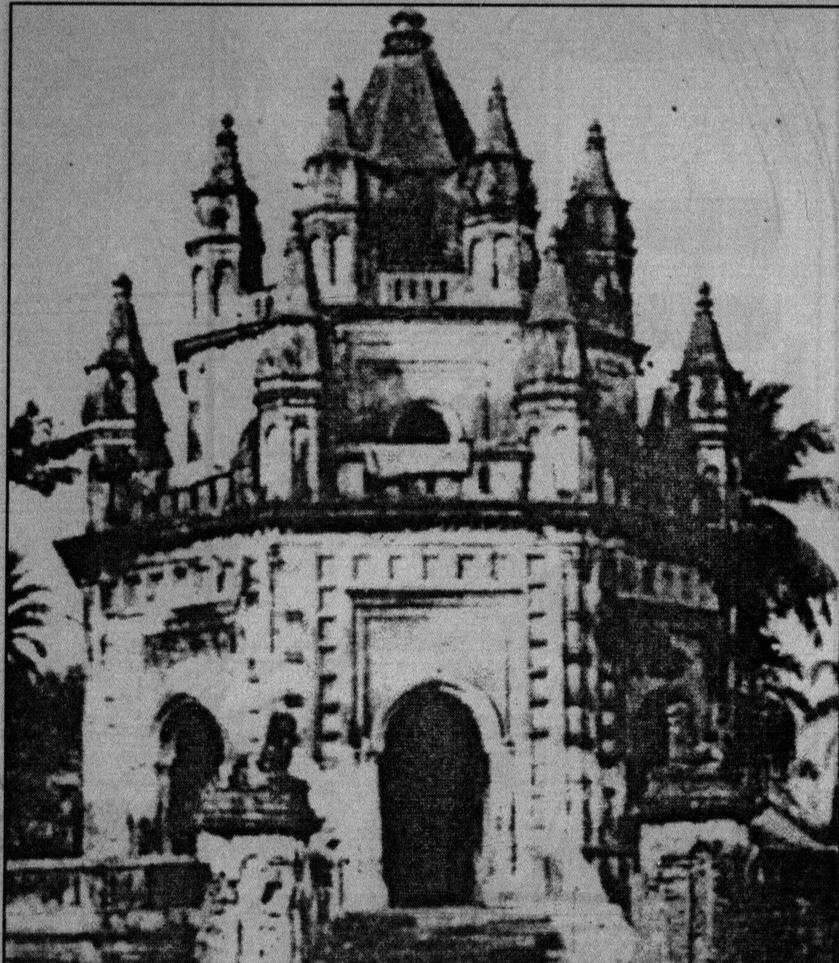


জগন্নাথের দেউল ও জগমোহন, বাহিরি, ১৫৮৪, কাঁথি, মেদিনীপুর

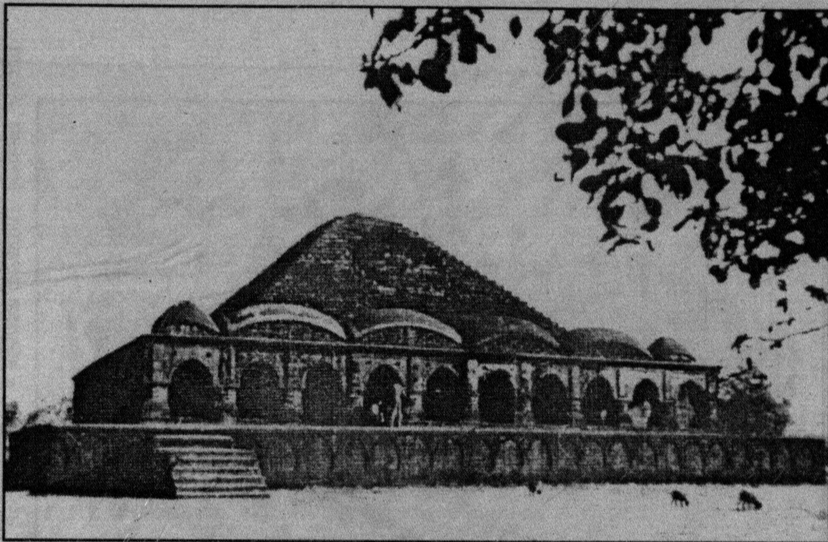
(পৃ. ৮০ ও ২৭৫)



বর্গভীমার দেউল ও জগমোহন, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর (পৃ. ৮১)



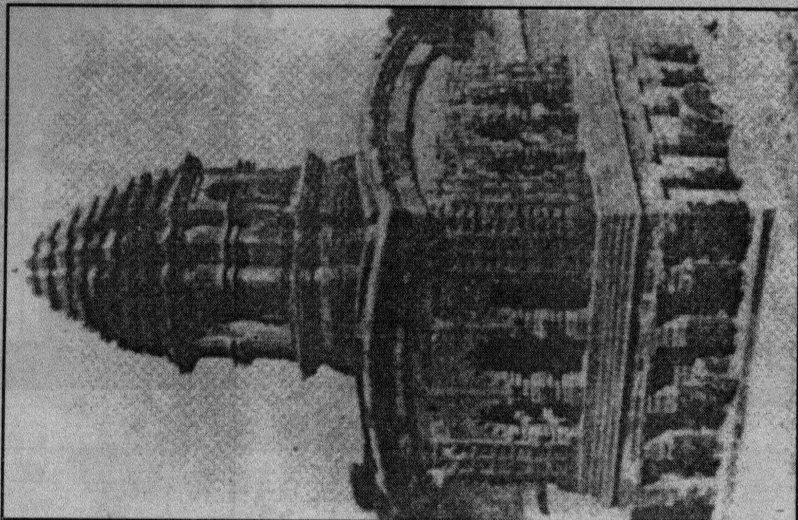
সতেরো চূড়া রাসমঞ্চ, মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর। বর্তমানে লুপ্ত



রাসমঞ্চ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, আ. ১৬০০ খ্রি. (পৃ. ৭৬)



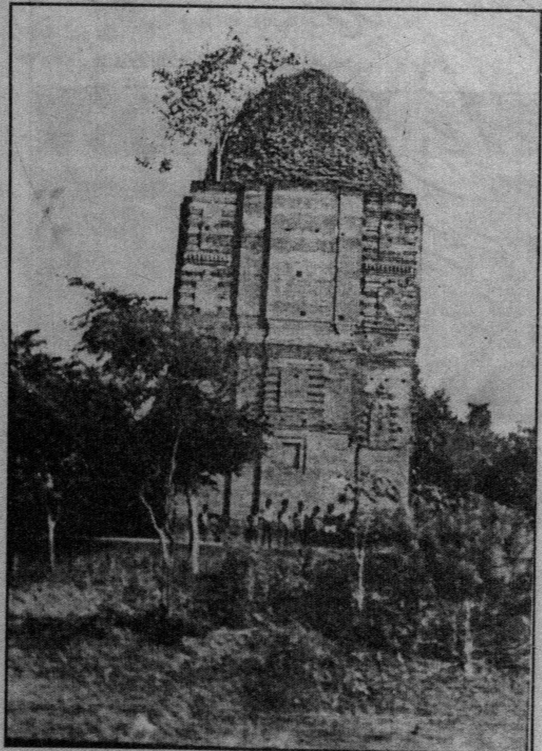
শ্যাম রায় (১৬৪৩), বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া (পৃ. ৭৩-৭৪ এবং ২৭১)



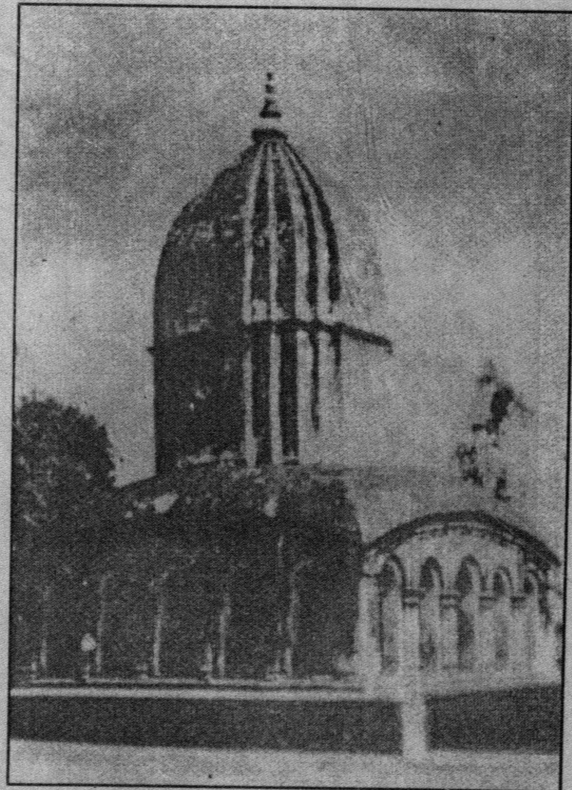
ইঁটের 'একরত্ন' রথ (আ. খ্রি. ১৮ শতকের মধ্যভাগ), বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া



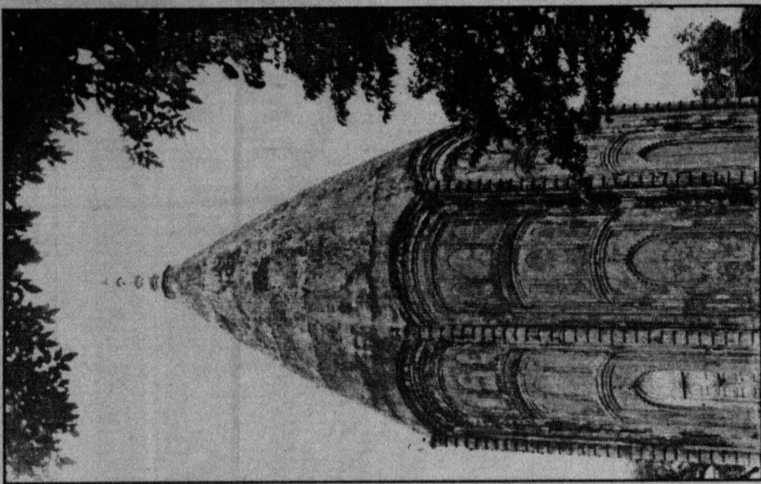
রাসমণ্ডলচক্র, শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' মন্দির (১৬৪৩ খ্রি.) বিষ্ণুপুর (পৃ. ৭৪)



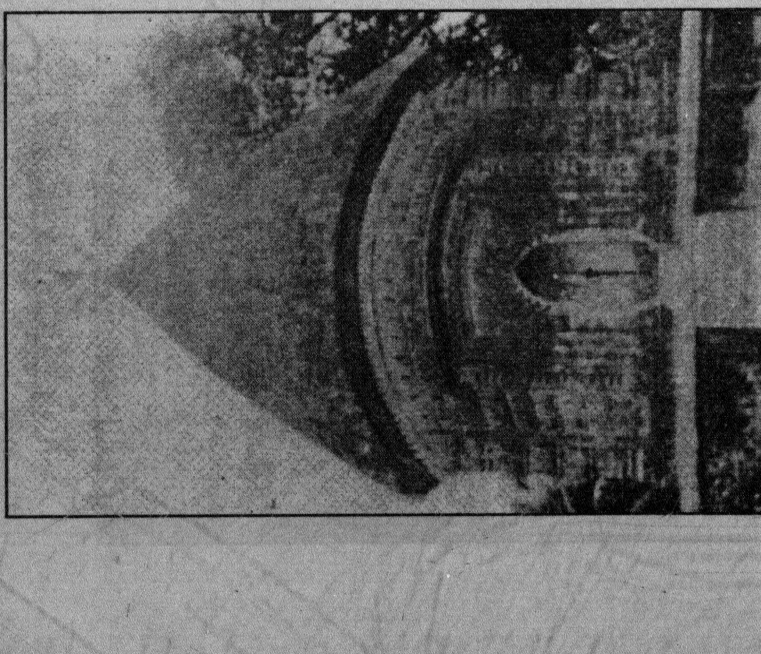
প্রাক-মুসলিম যুগের দেউল, সোনাতোপল, বাঁকুড়া
সম্প্রতি সংস্কারিত (পৃ. ৬৭)



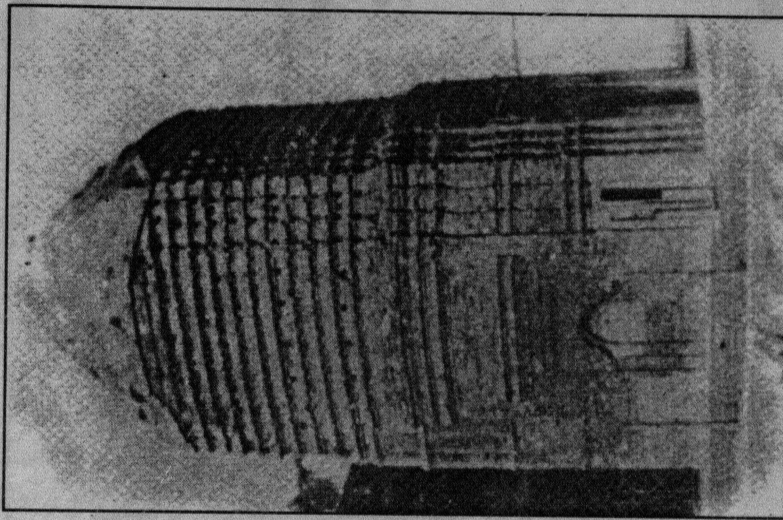
কালঞ্জয় শিবের 'একরত্ন'(আ. খ্রি. ১৮ শতকের মধ্যভাগ), পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া।



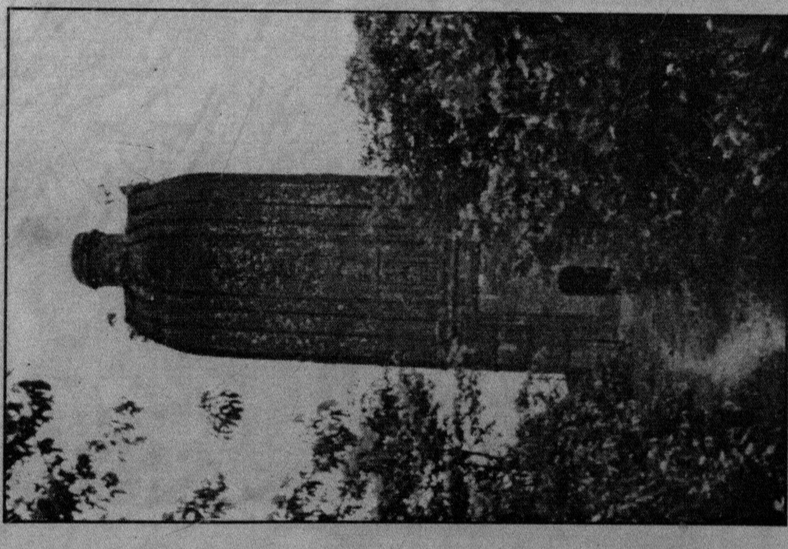
রাজীশ্বরের মন্দির, শিবনিবাস, নদীয়া
(পৃ. ১৪০ ও ২৭৪)



রাঘবেশ্বরের 'চারচালা' দিগনগর, নদীয়া
(পৃ. ১৩৬ ও ২৭৪)



শ্রীকৃষ্ণ দেউল (১৫৯৮ খ্রি.), বৈদ্যপুর, বর্ধমান



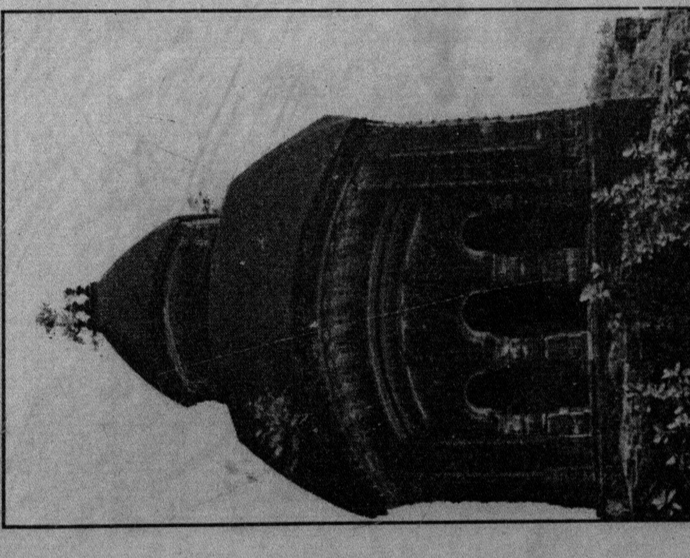
ইছাই ঘোষের 'দেউল', গৌরাঙ্গপুর, বর্ধমান, আ. খ্রি. ১৭ শতক



আ.খ্রি.১৬ শতকের পূর্বের মদনগোপাল মন্দির, কুলিনগ্রাম, বর্ধমান



জগন্নাথঘাটের শিবের 'আটচালা'র টেরাকোটা, কালনা, বর্ধমান (পৃ. ১৫৭)



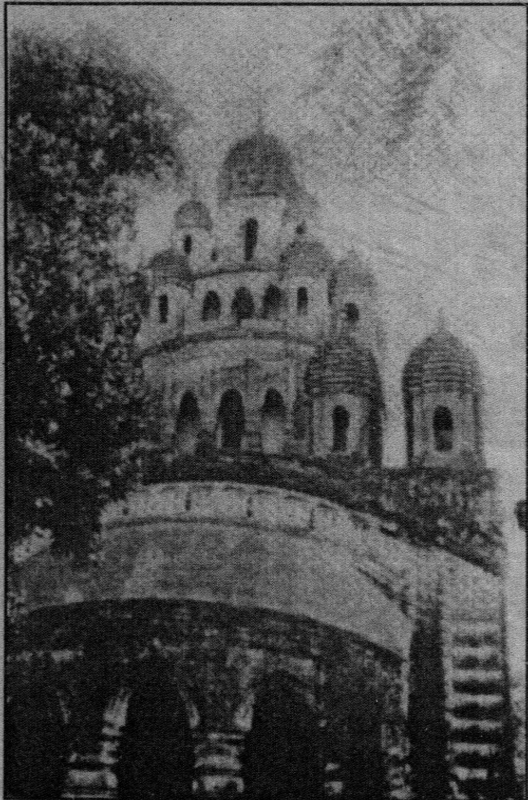
শিবের জীর্ণ 'আটচালা' (১৭৫৩ খ্রি.), শ্যামগঞ্জ-জগন্নাথতলা, কালনা, বর্ধমান, বর্ধমানের রাজা চিত্রসেনের রানির প্রতিষ্ঠিত (পৃ. ১৫৭-৫৮)



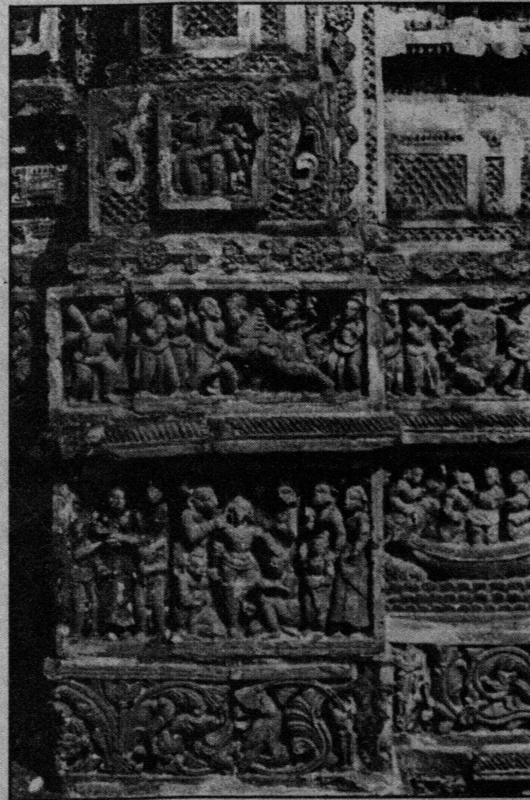
শ্যামগঞ্জ (কালনা) শিবের 'আটচালা'র টেরাকোটা, 'ঝাম্পানে' রাজা বা জমিদারের যাত্রা (পৃ. ১৫৭)



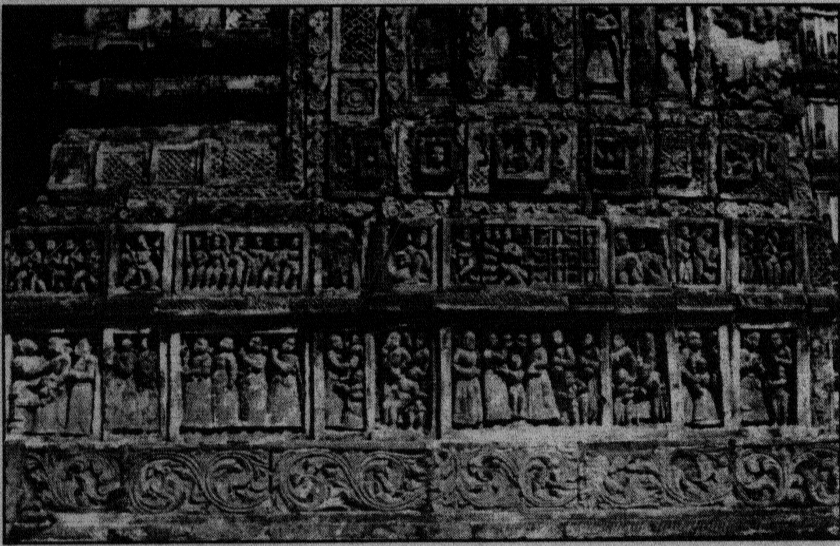
শ্যামগঞ্জের (কালনা) শিবের 'আটচালা'র জলদস্যুদের জাহাজ (নিচে) এবং শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ (ওপরে) - টেরাকোটা (পৃ. ১৫৭)



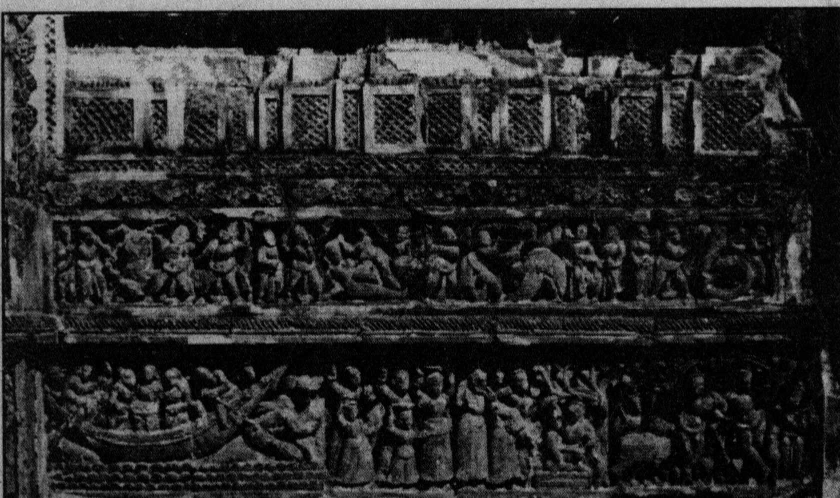
কৃষ্ণচন্দ্রের পঁচিশচূড়া মন্দির, কালনা, বর্ধমান (পৃ. ১৬২ ও ২৭৩)



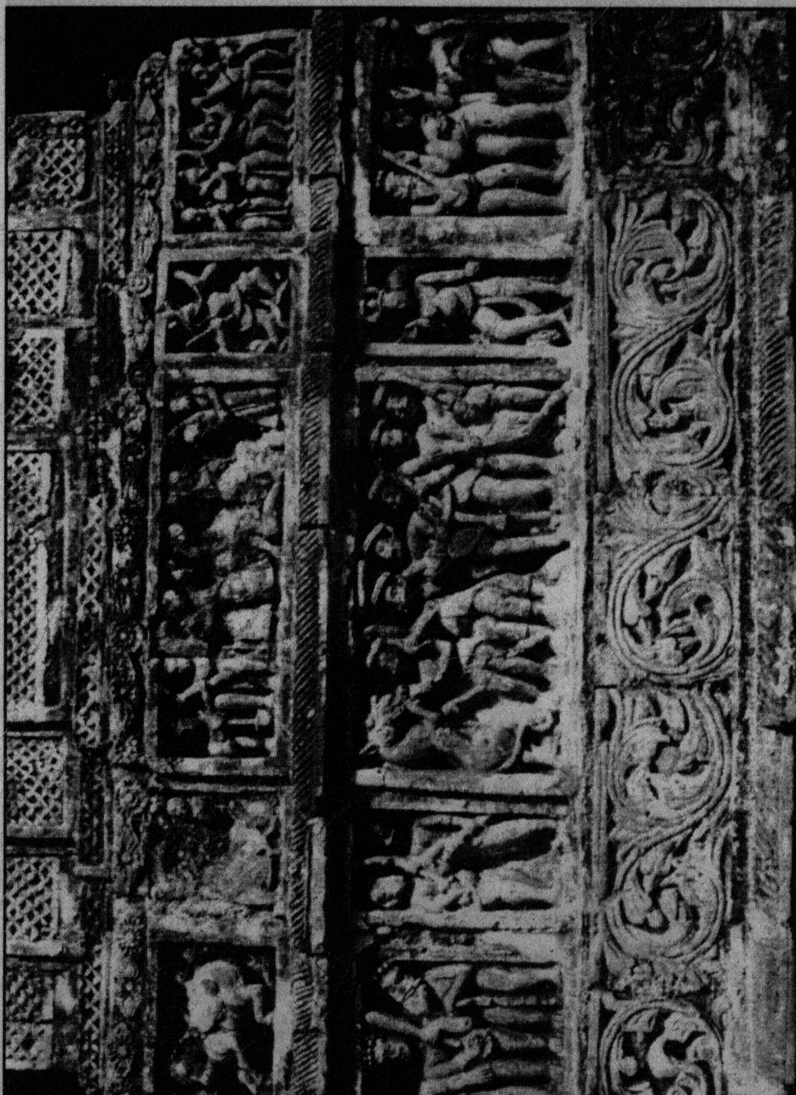
কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের 'টেরাকোটা', কালনা, ১৭৫১ (পৃ. ১৬৩)



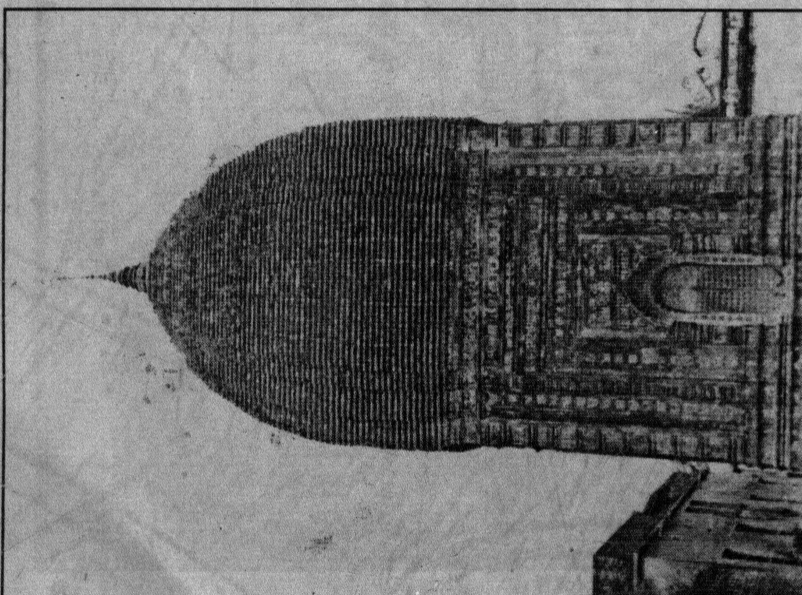
কৃষ্ণচন্দ্রের পঁচিশচুড়ো মন্দিরের টেরাকোটা, কালনা, বর্ধমান (পৃ. ১৬৩)



কৃষ্ণচন্দ্রের পঁচিশচুড়া মন্দিরের (১৭৫১ খ্রি.) 'টেরাকোটা', কালনা, বর্ধমান (পৃ. ১৬৩)



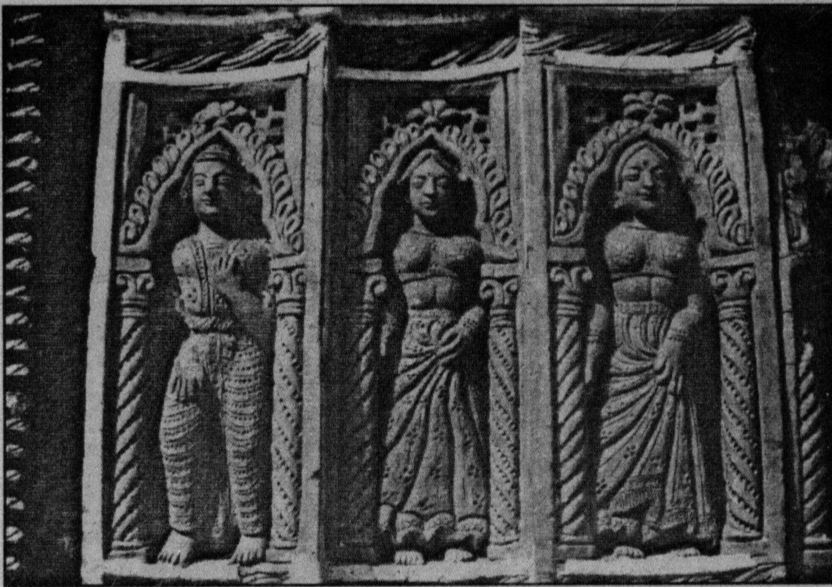
কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের (কালনা) টেরাকোটা, ১৭৫১ (পৃ. ১৬৩)



প্রতাপেশ্বর দেউল (১৮৪৯) কালনা, বর্ধমান (পৃ. ১৬৩-৬৪)



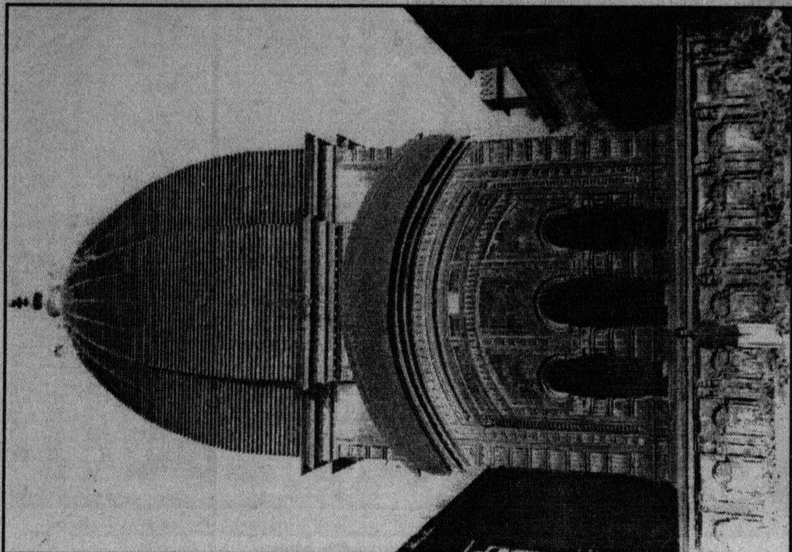
প্রতাপেশ্বর দেউলের (কালনা, ১৮৪৯) টেরাকোটা (পৃ. ১৬৪)



প্রতাপেশ্বর দেউলের, (১৮৪৯), টেরাকোটা, কালনা (পৃ. ১৬৪)



দশভুজা মহিষমর্দিনী, প্রতাপেশ্বর দেউল, কালনা, বর্ধমান
(পৃ. ১৬৪)

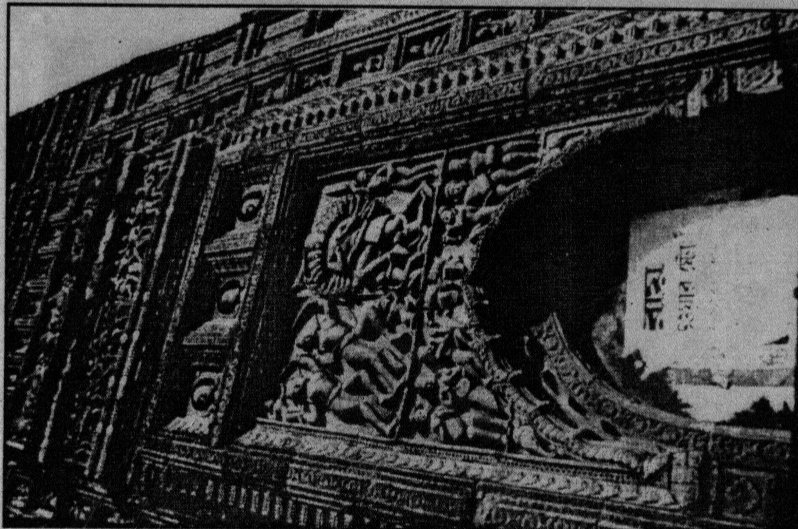


লক্ষ্মীজনার্দনের দেউল ও 'চালা' জগমোহন (১৮৪০ খ্রি.), দেবীপুর, বর্ধমান

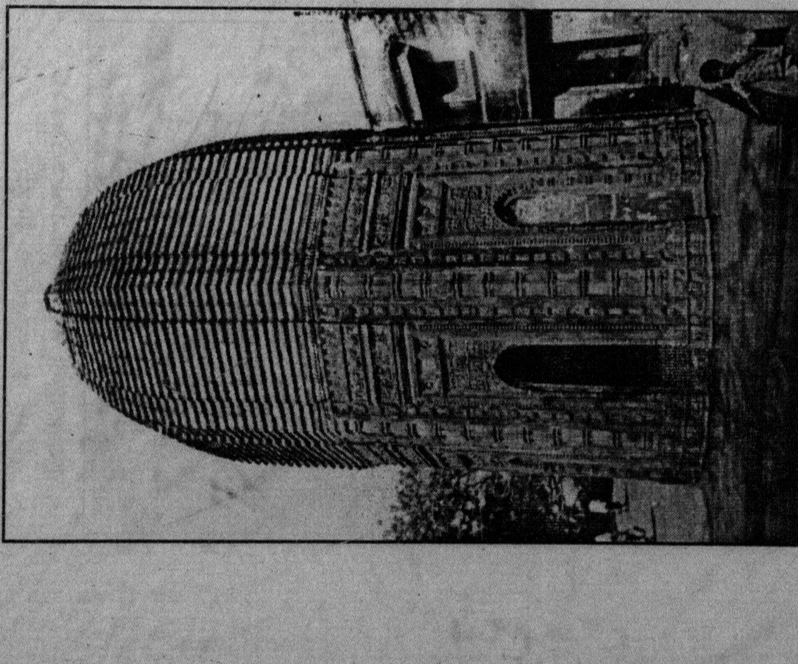


রাজা তেজশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ১০৯ শিবমন্দিরের একাংশ (১৮০৯ খ্রি.), কালনা

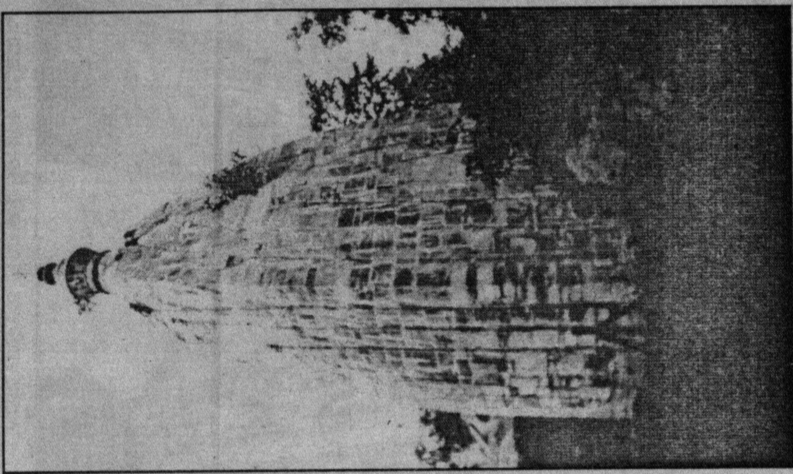
(পৃ. ১৫৮-৫৯ ও ২৭৩)



শিবের দেউলের টেরাকোটা, বনপাস, বর্ধমান



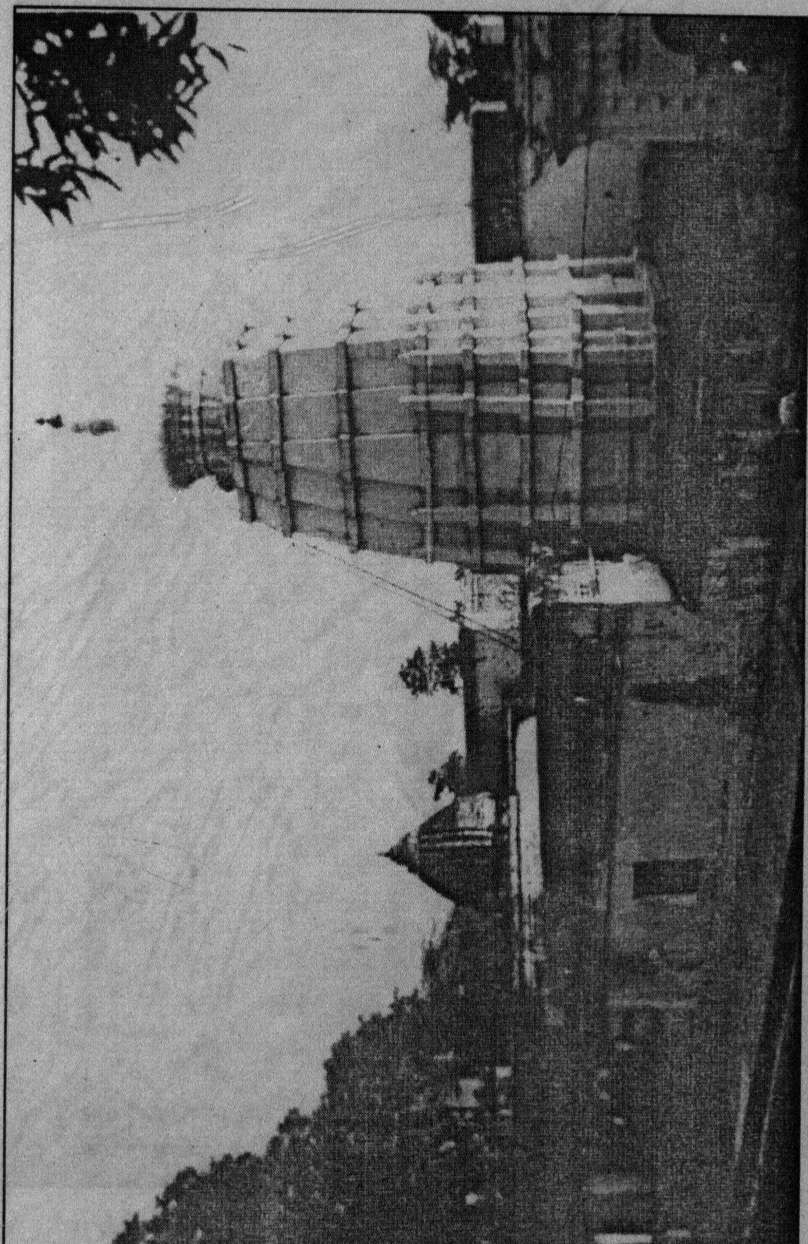
শিবের দেউল (১৮২৬), বনপাস, বর্ধমান



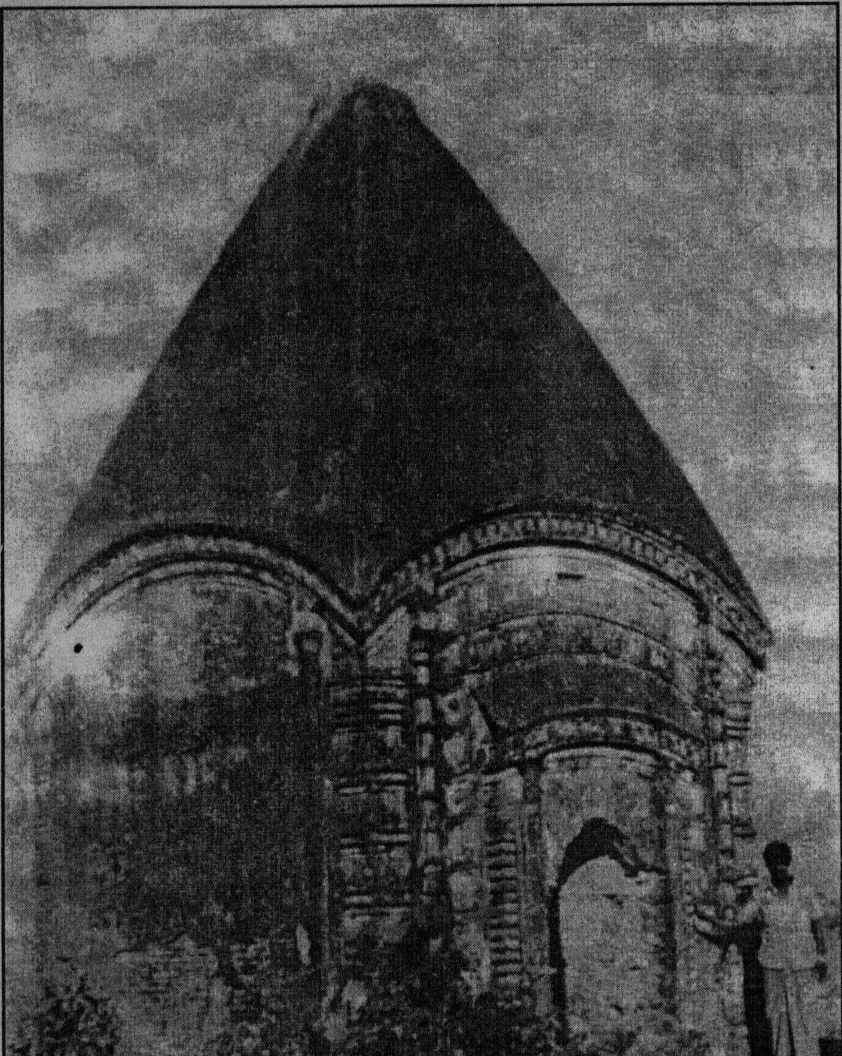
ধর্মরাজের দেউল, ১৬৪৩, কবিলাসপুর, বীরভূম



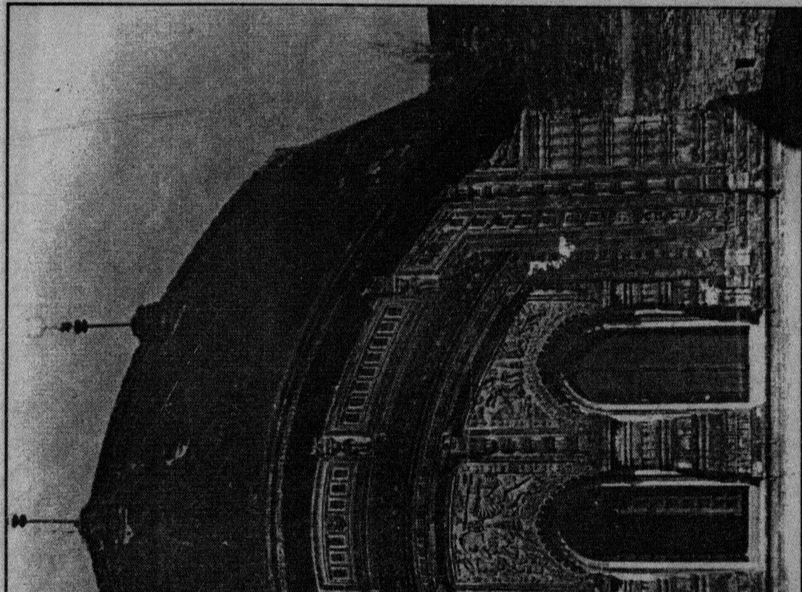
রাধাবিনোদের 'নবরত্ন' (আ. ১৬৮৩-১৬৯২), জয়দেব-কেঁদুলি, বীরভূম



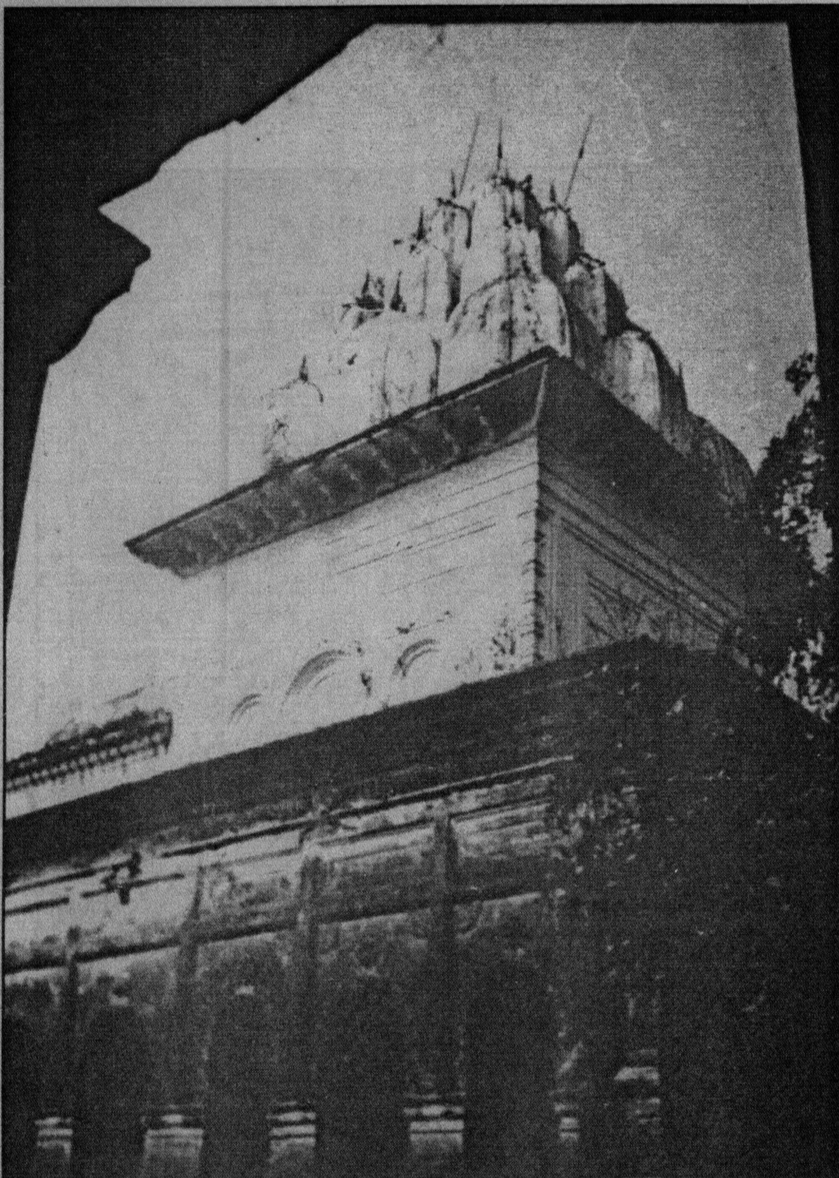
আ. খ্রি. ১৭ শতকের বক্রেশ্বর শিব, বক্রেশ্বর, বীরভূম



শিবের 'চারচালা (পরিত্যক্ত, খ্রি. ১৮ শতকের শেষ) বড়নগর, মুর্শিদাবাদ
(পৃ. ১৭২)



চারবাংলা ১৭৬০ খ্রি. (উত্তর), বড়নগর, মুর্শিদাবাদ (পৃ. ১৭১-৭২)



রামচন্দ্রের মন্দির, নসিপুর রাজবাটি, মুর্শিদাবাদ

(পৃ. ১৭১)



সিদ্ধনাথ শিবমন্দির (আ. খ্রি. ১৮ শতক) ধৌলাবাড়ি, কোচবিহার (পৃ. ১৯৬)

গ্রন্থ সম্পর্কে (১ম সং) অভিমত ঃ

১. ‘অধ্যাপক প্রণব রায় অনেককাল ধরে বাংলার মন্দির সম্বন্ধে গবেষণা করে চলেছেন। ব্যাপক ক্ষেত্রকর্মের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর গ্রন্থ (১৯৮৬) সমাদৃত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থেও তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বিষয়ে অভিনিবেশ প্রশংসনীয়। ...... প্রণব রায়ের গবেষণাপদ্ধতি ইতিহাসসম্মত। গ্রন্থটির প্রথম ভাগে পাঁচটি অধ্যায়ে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মন্দিরের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, ব্যাখ্যাত হয়েছে বিবিধ নির্মাণশৈলীর ক্রমবিকাশ। ...... বাংলার মন্দির সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে হলে গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগ মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে....’

২. ‘ডেভিড (ম্যাককাচ্চন) তাঁর মন্দিরস্থাপত্যের বর্গীকরণের সময় পঞ্চানন রায়ের ঋণ স্বীকার করেছেন অকপটে। পঞ্চাননবাবুরই সুযোগ্য পুত্র প্রণব রায় বাংলার মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিস্তৃততর অন্বেষণে ঐতিহাসিক ক্রমকে অনুসরণ করেছেন এবং সে সূত্রেই শৈলীর আলোচনা এসেছে। বইটির দ্বিতীয় অংশে আছে জেলাভিত্তিক মন্দিরগুলির বর্ণনা.... সবচেয়ে আকর্ষণীয় মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির ফলক নিয়ে বিষয়সন্ধানী আলোচনা....’

৩. ‘বইটিতে বাংলার মন্দিরের গঠনরীতি নিয়ে যে আলোচনা তা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তা সত্ত্বেও বলতে হয়, দ্বিতীয় পর্বে মন্দিরের অলংকরণের আলোচনায় তিনি আরও সাবলীল। সেই আলোচনার মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলার ইতিহাস এবং সমাজজীবনকে ছুঁতে পেরেছেন। বইটি উৎসাহী পাঠকদের সংগ্রহের তালিকায় স্থান পাবেই।’ — ‘বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য’/ প্রণব রায়